



Library

SHREE SHREE MA ANANDAMAYEE PASHRAM

3/250

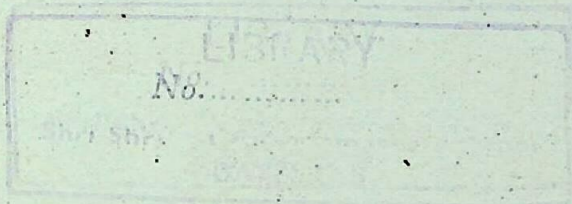
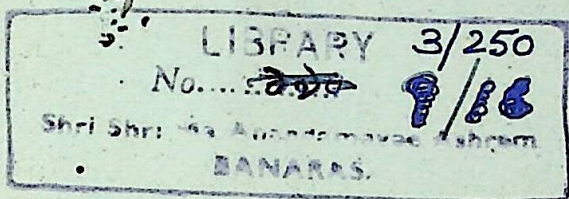
Bhadaini, Varanasi-I

No.

Books should be returned by date (last) noted below or re-issue arranged. Otherwise a fine of -/10/- N. P. daily shall have to be paid.

31-5 27

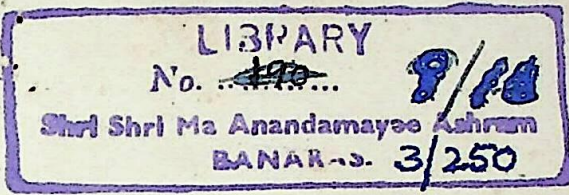
190



3/250

(যোগী ফেরাও)

9/14



হিন্দু চরণসংকলন
(Auto biography of a Yogi.
উৎসর্গ।
যনুয়ারী.)

শঙ্করাচার্য্যপ্রতিষ্ঠিত "সাধুসভা"র সভাপতি,

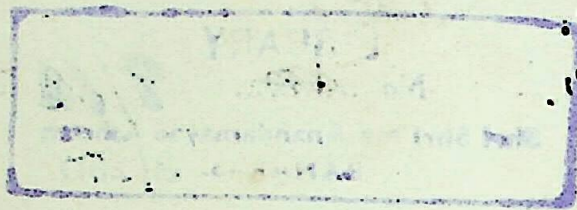
মদীয় পরমারাধ্য গুরুদেব—

শ্রীমৎ স্বামী শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজী মহারাজের

শ্রীকরকমলে—

অর্পিত হইল।

যোগানন্দ।



পরমহংস যোগানন্দজীর আশীর্বাদ ।

—(∴)—

“মৎপ্রণীত ইংরেজি ‘অটোবায়োগ্রাফি অফ্ এ যোগী’র বঙ্গানুবাদে
 শ্রীমান্ ইন্দ্রনাথ শেঠের স্বচ্ছাপ্রণোদিত প্রয়াস এবং গ্রন্থখানি
 সূচাক্রমে সম্পাদনে ‘যোগদা মঠে’র ধর্ম্মাধ্যক্ষ ব্রহ্মচারী
 শ্রীপ্রকাশের অক্লান্ত প্রচেষ্টার জন্ত তাঁদের আমি
 ধন্যবাদ ও আমার শ্রেষ্ঠ আশীর্বাদ
 জানাই।”

২৯শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৫২ ।
 সলফ্ রিয়্যালাইজেশন ফেলোশিপ,
 লস্ এঞ্জেলিস্ ৬৫, ক্যালিফোর্নিয়া,
 ইউ, এস, এ।

} পরমহংস যোগানন্দ ।

সূচীপত্র

| | পৃষ্ঠা |
|--|--------|
| ভূমিকা | ১১/০ |
| নিবেদন | ৫২/০ |
| পরিচ্ছেদ | |
| ১। পিতামাতা ও বাল্যজীবন | ১ |
| ২। মাতৃবিয়োগ ও মন্ত্রপূত কবচ | ১৭ |
| ৩। দুইদেহধারী সাধু (স্বামী প্রণবানন্দ) | ২৫ |
| ৪। হিমালয় পলায়নে বাধা | ৩৪ |
| ৫। গন্ধবাবার অলৌকিক ঘটনা প্রদর্শন | ৫২ |
| ৬। সোহহং স্বামী | ৬৩ |
| ৭। লক্ষ্মীসিদ্ধ সাধু (নগেন্দ্রনাথ ভাট্টা মহাশয়) | ৭৭ |
| ৮। ভারতের সুবিখ্যাত বৈজ্ঞানিক জগদীশ চন্দ্র বসু | ৮৪ |
| ৯। মাষ্টার মহাশয় | ৯৫ |
| ১০। গুরুর সাক্ষাৎলাভ (শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজীমহারাজ) | ১০৪ |
| ১১। বৃন্দাবনে দুইটি কপর্দকহীন বালক | ১১৯ |
| ১২। গুরুর আশ্রমে বহুবৎসর | ১৩১ |
| ১৩। বিনিজ সাধু (শ্রীরামগোপাল মজুমদার মহাশয়) | ১৭২ |
| ১৪। সমাধিলাভ | ১৮২ |
| ১৫। ফুলকপি চুরি | ১৯৩ |
| ১৬। গ্রহশাস্তি | ২০৬ |
| ১৭। শশী ও তিনটি নীলা | ২১৯ |
| ১৮। মুসলমান যাদুকর (আফ্ জল খাঁ) | ২২৮ |
| ১৯। কলিকাতাস্থ গুরুদেবের শ্রীরামপুরে সশরীরে আবির্ভাব | ২৩৬ |
| ২০। কাশ্মীর ভ্রমণে বাধা | ২৪১ |
| ২১। এবার কাশ্মীর যাত্রা | ২৪৭ |
| ২২। পাষণ দেবতার হৃদয় | ২৫৯ |
| ২৩। ইউনিভার্সিটির ডিগ্রীলাভ | ২৬৭ |

| | | | |
|-----|---|------|-----|
| ২৪। | সন্ন্যাসগ্রহণ | ... | ২৭৬ |
| ২৫। | ভ্রাতা অনন্ত ও ভগিনী নলিনী | | ২৮৫ |
| ২৬। | “ক্রিয়াযোগ” বিজ্ঞান | | ২৯২ |
| ২৭। | রাঁচিতে যোগবিদ্যালয় স্থাপন | ... | ৩০২ |
| ২৮। | কাশীর পুনর্জন্ম ও পুনরাবিষ্কার | ... | ৩১২ |
| ২৯। | রবীন্দ্রনাথ ও আমার মতবাদের আলোচনা | ... | ৩১৯ |
| ৩০। | অলৌকিক ঘটনার নিয়ম | ... | ৩২৫ |
| ৩১। | পুণ্যশীলা মাতা কাশীমণি দেবীর সহিত সাক্ষাৎ | ... | ৩৪০ |
| ৩২। | রামের পুনর্জীবন | ... | ৩৫৫ |
| ৩৩। | বাবাজী—বর্তমান যুগের যোগী অবতার | ... | ৩৬৭ |
| ৩৪। | হিমালয়ে প্রাসাদসৃষ্টি | ... | ৩৭৮ |
| ৩৫। | লাহিড়ী মহাশয়ের পুণ্যময় জীবন | ... | ৩৯৬ |
| ৩৬। | বাবাজীর প্রতীচ্যের প্রতি আকর্ষণ | ... | ৪১২ |
| ৩৭। | আমার আমেরিকা গমন | ... | ৪২৭ |
| ৩৮। | লুথার বারব্যাঙ্ক (গোলাপবাগের সাধু) | ... | ৪৪১ |
| ৩৯। | থেরেসা নিউম্যান (খৃষ্টকৃতাঙ্কধারিণী ক্যাথলিক) | ... | ৪৪৯ |
| ৪০। | ভারতবর্ষে প্রত্যাবর্তন | ... | ৪৬১ |
| ৪১। | দাক্ষিণাত্যে পল্লীভ্রমণ | ... | ৪৭২ |
| ৪২। | শুকুর সঙ্গে শেষদেখা | ... | ৪৯০ |
| ৪৩। | শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজীর পুনরুত্থান | ... | ৫১০ |
| ৪৪। | ওয়ার্ডার মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে | ... | ৫৩৭ |
| ৪৫। | আনন্দময়ী মা | ... | ৫৬১ |
| ৪৬। | নিরাহারা যোগিনী | ... | ৫৬৮ |
| ৪৭। | আমেরিকায় প্রত্যাবর্তন | ... | ৫৮৪ |
| ৪৮। | ক্যালিফোর্নিয়ায় এন্সিনিটাসে | ... | ৫৯০ |
| ৪৯। | ১৯৪০—১৯৫১ | ... | ৫৯৫ |
| | পরিশিষ্ট | ... | ১ |

No. 140

Shri Sri Anandamayee Ashram

BANARAS

ভূমিকা

[শ্রীসরোজকুমার দাস, এম-এ, পি-এইচ, ডি, (লন্ডন),
অধ্যাপক, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কর্তৃক লিখিত ।]

পরমহংস যোগানন্দ বিরচিত “যোগীর আত্মজীবনচরিত” ইউরোপীয় ছয়টি ভাষায় ইতিমধ্যে অনূদিত হয়ে প্রসিদ্ধিলাভ করেছে। সম্প্রতি যোগানন্দজীর মাতৃভাষায় এই বিশ্ববিশ্রুত গ্রন্থখানির অল্পবাদ সুসম্পন্ন হয়েছে। তাঁ’র ভক্তসাধক ও স্নেহলেখক শ্রীহরিনাথ শেঠ মহাশয়ের রুতিতে। এই পাণ্ডুলিপিখানি আমি আত্মোপাস্ত সাগ্রহে পাঠ করেছি, এবং আমার ধারণা যে এটিকে “অল্পবাদ” আখ্যায় পরিবর্তে “গুরু-শিষ্য-সংবাদ” এই অভিধানেই অভিহিত করা সমীচীন ও শোভন। শ্রদ্ধাবিলসিত অথচ ভাবোচ্ছ্বাসহীন ভক্তহৃদয়ের এই অবদান তাঁ’র রচনাবৈদগ্ধ্য ও ভাবগাভীর্যের পরিচয় দেয়। শেষ অধ্যায়ে যোগানন্দজীর “দি সাউণ্ডলেস্ রোর্” নামক এক প্রণবপ্রশস্তিমূলক কবিতা সন্নিবেশিত হয়েছে। শেঠ মহাশয় “অনাহত-ধ্বনি” শীর্ষক পট্যল্পবাদে এর পদ ও ভাবগৌরব যে সর্বথা অক্ষুণ্ণ রেখেছেন, তা’ নিঃসঙ্কোচে বলা যেতে পারে। মরণী পাঠকদের নিকট তাঁ’র এই আয়াসবহুল প্রচেষ্টা যথাযোগ্য সমাদর লাভ ক’রবে, আমরা সর্বাস্তঃকরণে বিশ্বাস করি।

এই “আত্মজীবনী”র প্রচার-ব্রত-উদ্‌যাপনে ভূমিকা লেখকের স্থান অতি গোণ এবং নগণ্য। এক্ষেত্রে লেখক তাঁ’র দায় ও দায়িত্ব সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সচেতন এবং তদধিক নিজ অযোগ্যতাবিষয়ে। বলা বাহুল্য, অনেক সময় এই দৈন্যনিবেদনের মধ্যে প্রচ্ছন্ন অহমিকার আভাস পাওয়া যায়। কিন্তু ইহাও প্রণিধানযোগ্য যে অহং প্রদীপমাত্র, আর আত্মা নিরপেক্ষ, নিরবচ্ছিন্ন আলোক। প্রদীপের পরিচয় তৈলাধার বা তৈলবর্তিকায় নয়, কিন্তু দীপ-শিখার উজ্জলতায়। সেইজন্মই ভগবান্ বুদ্ধের উপদেশ-বাণী ছিল—“আত্ম-দীপো ভব” অর্থাৎ আপনাকে প্রদীপ করিয়া তুলিবে। এই অহমিকার

আবরণ, যা'কে কবির ভাষায় বলা যায়—“আপনারে দিয়ে রচিলি এ কি এ আপনারি আবরণ”—যখন অপমৃত হয় তখনই প্রকাশিত হয়, উপনিষদ-বর্ণিত সেই “তচ্ছব্রং জ্যোতিষাং জ্যোতি স্তদ্ যদাত্মবিদো বিদ্বঃ”, সেই আলোর আলো, যা'কে আত্মদৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তিরাই কেবল জানতে পারেন। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য মধ্যবুগীয় মরমী সাধক ও ভক্ত ধ্বনি অগষ্টিনের বাণী—“যে জ্যোতির্ম্মণ্ডলের দীপ্তি প্রতিভাত হয় এই মর্ত্যলোকবাসী প্রতি মানবের হৃদয়ক্ষেত্রে।”

সৌভাগ্যক্রমে আমাদের আলোচ্যবিষয় এমন একটি স্বপ্রতিষ্ঠ, স্বয়ং-জ্যোতিঃ, সুসম্পূর্ণ নিবেদিতজীবন, যা'র পূর্ণ পরিচয় পাই যোগানন্দজীর পরম প্রিয় রবীন্দ্রনাথের এই গানটিতে :—

“আমার এ ঘরে আপনার করে গৃহ-দীপখানি জ্বালো হে।

... ..

পরশমণির প্রদীপ তোমার, অচপল তার জ্যোতি,

সোনা ক'রে লবে পলকে আমার সকল কলঙ্ক-কালো।”

যে আত্মানুভূতির প্রেরণা যোগানন্দজী পূর্ব্বজন্মের সংস্কাররূপে, গুরু-পরম্পরাগত আধ্যাত্মিক সম্পদের উত্তরাধিকারক্রমে লাভ করেছিলেন কৈশোরে, আকৈশোর-যৌবন যা'র সাধনা করেছিলেন অতন্দ্র, অনলস, অনন্তপর “ক্রিয়াযোগ”মাধ্যমে এবং যা'র পূর্ণাঙ্গ পরিণতি সম্ভাবিত হয়েছিল বিশ্বব্যাপী চুরাশীটি আত্মানুসন্ধান সংঘের প্রতিষ্ঠায়, সেই প্রেরণার ছায়াপাত হয়েছিল তাঁ'র শৈশবে এক অরণীয় ঘটনায়।

পরমহংস যোগানন্দজীর ভক্তপ্রাণা ক্রিয়াযোগদীক্ষিতা মাতৃদেবীর স্বর্গারোহণের প্রায় মাস চৌদ্দ পরে, মৃত্যুশয্যায় কথিত এবং জ্যেষ্ঠপুত্র অনন্তের নিকট স্মরকিত বিবরণী হ'তে আমরা জানতে পারি যে তাঁ'র পরমগুরু (এবং মাতৃদেবীর গুরুদেব যোগিরাজ লাহিড়ী মহাশয়) শিশু যোগানন্দকে কোলে বসিয়ে আধ্যাত্মিক দীক্ষাদানের মত কপালে হাত রেখে বলেছিলেন তাঁ'কে—“মা জননি, তোমার ছেলে একটি যোগী হ'বে, আর আধ্যাত্মিক ইঞ্জিনের মত এ বহুলোককে ভগবানের রাজ্যে টেনে নিয়ে যাবে” (দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ, ২২ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। পরে আর একবার এই

নিবেদিতজীবনের পরম এক সন্ধিক্ষণে, আমেরিকা যাত্রার প্রাক্কালে, যখন সমস্তই নৈরাশির কুহেলিকায় আচ্ছন্ন, তখন পেলেন সেই প্রত্যাশা, সেই ভবিষ্যদ্বাণী। সেই মুক্তধারা, যা সকল বাধাবিলম্ব ভাসিয়ে দিয়ে, যুক্তরাষ্ট্রের “ক্রিয়াযোগ”-উন্মুখীন মহামিলনতীর্থে এই স্বামী যোগানন্দকে উত্তীর্ণ ক’রে দিয়েছিল। সেই যুগবাণীর যেমন তদানীন্তন, তথা চিরন্তন মূল্যও আছে, এবং সেই কারণে এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য :—

“আমার জন্মভূমি, আমার গুরুদেব সব ত্যাগ ক’রে আমেরিকার কোন অজানা দেশে পাড়ি জমাবার জন্তে যখন তৈরী হ’তে লাগলুম—মন যে ভয়ে একটুও কাঁপেনি তা’ নয়।... অবশ্য আমেরিকায় যা’বার জন্তে মন পূর্বে থেকেই স্থির ক’রে ফেলেছিলুম, কিন্তু প্রথমে ঈশ্বরের অল্পমতি আর তাঁ’র আশ্বাসবাণী শোনার জন্তে মনে সঙ্কল্প আরও দৃঢ়তর হ’য়ে উঠেছিল। প্রার্থনা চলতে লাগল—বিরাম নেই। বুকের কান্না বুকে চেপে রেখে অনড় হয়ে বসে সমস্ত অন্তর উজ্জাড় ক’রে ভগবচ্চরণে আমার কাতর প্রার্থনা করুণভাবে নিবেদন করতে লাগলুম... যত্না আর সহ্য করতে গেলে মনে হচ্ছিল যেন মাথা বুঝি বা এখনই ফেটে যায়! সেই মুহূর্তে আমাদের গড়পার রোডের বাড়ীর ঘরের সামনের বারান্দার কাছে একটা আঘাতের শব্দ শুনতে পেলুম। দরজা খুলে দেখি, কৌপীনধারী এক নবীন সন্ন্যাসী... অতি মধুর হিন্দীতে বললেন, ‘আমাদের পরমপিতা পরমেশ্বর তোমার প্রার্থনা শুনেছেন, তিনি তোমায় বলতে আমাকে আদেশ করেছেন যে তুমি গুরুর আজ্ঞা শিরোধার্য ক’রে আমেরিকায় যাও, ভয় কোরো না। ঈশ্বরই সর্বদা তোমায় রক্ষা করবেন।... তোমাকেই আমি পশ্চিমে ‘ক্রিয়াযোগ’র বাণী প্রচার করবার জন্তে নির্বাচিত করেছি। বহুদিন পূর্বে কুণ্ডমেলায় তোমার গুরুদেবের সঙ্গে আমার দেখা হয়। তখন আমি তাঁ’কে বলেছিলুম যে তোমাকেই আমি তাঁ’র কাছে শিক্ষার জন্তে পাঠাব।... ঈশ্বরানুভূতির যে বৈজ্ঞানিক প্রণালী তা’ সবদেশেই শেষে বিস্তারলাভ করবে—আর মানুষের সেই অনন্তকরণীয় পরমপিতার ব্যক্তিগত অতীন্দ্রিয় অনুভূতির মধ্য দিয়েই জাতিসমূহের মিলন সাধিত হ’বে।’ (৩৭শ পরিচ্ছেদ ; পৃ: ৪৩০-২)। বত্রিশ বৎসর পূর্বে সহরতলীর সাধারণ পরিবেশের মধ্যে যে অসাধারণ মানসিক পরিস্থিতিতে এই দিব্যদৃষ্টিসূচক ভবিষ্যদ্বাণী উচ্চারিত হয়েছিল,

তা'র একমাত্র ঐতিহাসিক অথবা পৌরাণিক নিদর্শন দেখি ভগবদ্গীতার একাদশ অধ্যায়ে বিশ্বরূপদর্শনপ্রকরণে। যোগানন্দজীর চিন্তে তাৎকালিক ভাবাবেশ যে তা'ই হয়েছিল, তা'র প্রকৃষ্ট প্রমাণ পাই এই ভাবাবেগবর্ণনাকল্পে দ্বাদশ স্লোকের উদ্ধৃত ভাষণে :—

“নভোমণ্ডলে যদি সহস্র তপনের দীপ্তি একই সময়ে উদ্ভিত হয়, তবেই সেই ভাস্বতী প্রভার সহিত বিশ্বাশ্রুপী এই দৃষ্টিভাতির কথঞ্চিৎ সাদৃশ্য মিলিতে পারে।”

এই বিশ্বাশ্রুদৃষ্টিপ্রভাবের ছন্দানুবর্তনে যোগানন্দজীর সাক্ষাৎ গুরু শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজী যাত্রার প্রাক্কালে তাঁ'কে এই সূত্রভাষ্যকল্প নির্দেশ দিয়েছিলেন :—

“ভুলে যাও যে তুমি একজন হিন্দু হয়ে জন্মেছ আর মার্কিনদেরও জীবনধারার সব কিছু যেন নিয়ে বোসো না। উভয়ের যা' সব চেয়ে ভাল তা'ই গ্রহণ করো। অমৃতের পুত্র তুমি—তোমার যা' স্বরূপ, তাইতেই প্রকাশিত হ'য়ো। আর পৃথিবীর চারদিকে বিভিন্ন জাতির মধ্যে ছড়িয়ে রয়েছে যে তোমার সব ভাইয়েরা, তা'দের মধ্যে যা' কিছু সব সন্মুখ, তা' নিয়ে নিজেকে গড়ে তুলো।”

এই বিশ্বতোমুখী দৃষ্টির বীজ যখন উগ্ধ হ'ল সূদূর পশ্চিমে আমেরিকার ক্রিয়ামূলক মননশীলতার চিত্তক্ষেত্রে, তখনই অক্ষুরিত হ'ল অনতিকালমধ্যে শাখাপ্রশাখাবিসর্পী যোগদা আত্মশক্তিবিশায়িনী সজ্জবৈজ্ঞানী (সেল্ফ-রিয়্যালাইজেশন ফেলোশিপ)। ঋষিসুলভ ধ্যানচক্ষুতে এই গুরুকৃত্রিয় দেখেছিলেন যে এই প্রণালীতেই চিরপ্রবাহবান্ ভারতের সনাতনধর্ম ও কৃষ্টি জগতে প্রচার করতে হবে এবং তা'র জন্তু চাই যুগোপযোগী মনোবৃত্তি ও প্রচার পরিকল্পনা। এর অর্থ নয় যে ভারতীয় সংস্কৃতির ঐতিহ্যকে অগ্রাহ্য ক'রে পরকীয়া কৃষ্টির শরণাপন্ন হ'তে হবে আমাদের এই অধ্যাত্মসাধনার ক্ষেত্রেও। দূরাবগাহী মননশক্তিতে এই সাধকত্রয় দেখেছিলেন যে, “সনাতন বলা যায় তা'কেই, যা' আজ এখানেই নবজীবনে সঞ্জীবিত হয়ে উঠেছে।” (“সনাতন-মেনমাহরুতাদ্য স্যাৎ পুনর্বঃ”—অথর্ববেদ)।

ভারতীয় জীবন-দর্শনের এই চিরন্তনবাণী যে অদ্যতন জীবনে বিস্তৃত ও বিলুপ্তপ্রায়, তা' অস্বীকার করা যায় না। প্রাগৈতিহাসিক যুগের ঋগ্বেদীয়

শাখার ত্বেরেয়ত্রাঙ্গণ গ্রাহ্যে এই জীবন-দর্শনের নজীর ও নিদর্শন পাই
 রূপকের ভাষায়, রাজপুত্র রোহিতের বিরামবিহীন পর্যটনের মধ্যে।
 “চলাটাতেই হয় অমৃতত্বলাভ, চলাতেই লাভ হয় তা’র স্বাদুস্বিষ্ট ফল,
 চেয়ে দেখ স্বর্ষ্যের কি আলোকসম্ভার—যে স্বর্ষ্য সৃষ্টির প্রথমতম মুহূর্ত থেকে
 অতদ্রিত চলার পথে এগিয়ে চলেছে। অতএব চল, এগিয়ে চল।”

“চরন্ বৈ মধু বিন্দতি চরন্ স্বাদুস্বদ্বরম্।

স্বর্ষ্যস্ত পশ্য শ্রেমাণন্ যো ন তন্ত্রয়তে চরন্ ॥ চরৈবেতি চরৈবেতি।”

এরই কি প্রতিধ্বনি আজ শুনতে পাচ্ছি না আমেরিকার গহন-গোপন
 আধ্যাত্মিক জীবনের বাণীতে, যা’ স্ফুরিত হয়েছে ওয়াশ্‌ট্‌ছইটম্যানের (দি
 সঙ্‌ অফ্‌ দি ওপন্‌ রোড্‌) “উন্মুক্ত রাজপথের উদাত্ত সঙ্গীতে” :—

“হে পথিক বন্ধু মোর ! যে কেহ হওনা তুমি,

এস আজি, চল মোর সাথে ;

ভ্রমিলে আমার সাথে, পাইবে খুঁজিয়া যাহে

ক্লাস্তি কভু স্পর্শে না তোমাতে ।

...

...

...

...

হতাশ হইয়ানা কভু, অগ্রসর হয়ে চল,

এস তুমি মোর পাশে আজ ;

ছড়িয়ে রয়েছে জেনো, দিব্যৈশ্বর্যভার,

চলিবার এ পথেরি মাঝ।”

কেবল ভাবোচ্ছ্বাসেরই মধ্যেই যে এই জীবন-দর্শনের সমাধি হয়েছে,
 তা’ নয়—সম্প্রদায়নির্বিশেষে এই গতিশীল জীবন-দর্শন, “অর্থক্রিয়াকারিত্ব”
 (প্র্যাগ্‌ম্যাটিক্‌, প্র্যাক্‌টিক্যাল্‌ এফিসিয়েন্সি) কেই সত্যত্বাবধারণ বা সত্তার
 মানদণ্ডরূপে স্বীকার ক’রে এসেছে।

ক্রিয়াযোগের যে প্রধান বৈশিষ্ট্য এ যুগে দেশে ও বিদেশে প্রচারিত হয়েছে
 চল্লিশ বছরের উপর এবং এখনও যা’ পূর্ণতর ভাবে সক্রিয় রয়েছে, তা’ই এই
 “আত্মজীবনী”র মূল প্রতিপাদ্য বিষয়। “ভূমিকা”র এর অবতারণা সুবিবেচনার
 পরিচায়ক নয়। স্থায়ী পাঠকবর্গের এটাই লক্ষ্য ক’রবার বিষয় যে প্রাচ্যে
 ও প্রতীচ্যে ক্রয়েডের মনোবিকলন বা বিশ্লেষণ (সাইকো-এনালিসিস্‌)-

পদ্ধতি অবলম্বনে যে উন্মাদনা চলেছে, তা' যে এই মানসধর্মশাস্ত্রের শেষ কথা নয়; তা' বিজ্ঞানসম্মত আধুনিক প্রমাণপর্যায়সহ প্রতিপাদিত হয়েছে যোগানন্দজীর জীবনভাষ্যোজ্জ্বলিত এই জীবন-বেদে। মনঃসমীক্ষণ বা মনোবিকলনের উদ্দেশ্যে যে মনঃসঙ্কলন বা মনঃসংশ্লেষ (সাইকো-সিহেসিস্) এর স্থান, ফ্রেয়েডের অবচেতন (আনুকমাস্), প্রাক্চেতন (প্রি-কমাস্) এবং চেতন (কমাস্) অন্তঃকরণের এই সর্ববাদিসম্মত প্রবিভাগের উদ্দেশ্যে যে প্রত্যগাত্মার (সুপার-এগো) বা উন্ননী-আত্মশক্তির স্বীকৃতি রয়েছে, তা'রই পরিপূর্ণ-বিকাশ-পদ্ধতি নির্দেশকল্পে এই “আত্মজীবনী” এই যুগের একখানি শ্রেষ্ঠগ্রন্থ। “যোগ” যে কেবলমাত্র “চিন্তাবৃত্তিনিরোধ” নয়, কিন্তু চিন্তাবৃত্তি-বিকাশ-পরিকল্পনা পদ্ধতি—এই যুগবাণী প্রচার আজ সার্থক হয়েছে।

হে যোগিবর! তোমাকে আজ আহ্বান করি তোমার চির-অভীষিষ্ট ব্রত-উদ্যাপনক্ষেত্রে। তুমি যে সেই উপনিষদ-বর্ণিত “প্রাণো বিরাট্”, বিরাট প্রাণেরই অংশীভূত, তাই তোমার অনুপ্রাণনা আজও সমভাবেই সক্রিয়। তোমার মত পরিপূর্ণপ্রাণ ব্যক্তির কখনও প্রয়াণ সম্ভবপর নয়—“ন তস্য প্রাণাঃ উৎক্রামন্তি”। তাই তোমায় আহ্বান করি আমাদের শ্রদ্ধার্ঘ্য-রচিত হৃদয়াসনে, নব নব রূপে তুমি জন্মপরিগ্রহ কর দৈহিকসম্পর্কবিরহিত আমাদের চিন্তালোকে :—

“উদ্যতে নমঃ, উদায়তে নমঃ, উদিতায় নমঃ।

বিরাজে নমঃ, স্বরাজে নমঃ, সম্রাজে নমঃ ॥”

“উদিত হইবে যে তুমি তোমায় নমস্কার, উদীয়মান যে তুমি তোমায় নমস্কার, উদিত যে তুমি তোমায় করি নমস্কার। বিরাজিত যে তুমি তোমায় নমস্কার, স্বয়ংপ্রকাশ স্বরাট্ তোমায় নমস্কার, স্বমহিমায় অধিষ্ঠিত সম্রাট্ তোমাকে করি নমস্কার।”

নিবেদন

সনাতন ধর্ম কোন জাতিগত মতবাদ ও বিশ্বাসের উপর প্রতিষ্ঠিত নয়, তা'র মূল হচ্ছে মহামানবের মিলনতীর্থ ভারতের জীবনে, যা'র সাংস্কৃতিক, সামাজিক ও ব্যবহারিক আদর্শের সঙ্গে এ ওতঃপ্রোতঃভাবে নিজেডিত। সনাতন ধর্মের বিশ্বজনীন উদারতা ও তা'র মহাসত্য উদাত্তগন্তীর স্বরে বিশ্বলোকের নিকট অতীতে যে আহ্বানবাণী প্রেরণ করেছিল, “শৃঙ্খল বিধে অমৃতস্য পুত্রাঃ”, তা'র বার্তা বহন ক'রে যুগপ্রবর্তক মহাপুরুষগণ যুগে যুগে অগ্রসর হয়েছেন দেশে ও বিদেশে, প্রাচ্যে ও প্রতীচ্যে। আবহমানকাল হ'তে ভারত দান ক'রে এসেছে দর্শন ও বিজ্ঞানে, ললিতকলা ও চারুশিল্পে, কাব্য ও সঙ্গীতে এবং তা' শতধারে উৎসারিত হয়ে উঠেছে মানবের বিচিত্র জীবনধারায়; কিন্তু তা'র সর্বশ্রেষ্ঠ দান হচ্ছে তা'র অপূর্ব ভাগবত সম্পদ,— অধ্যাত্ম-সাধনজগতে। ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রসার সনাতন ধর্মেরই প্রসার। ভারতীয় সাধনার ইতিহাসে যোগের স্থান যে সর্বশ্রেষ্ঠ, তা' নির্দেশিত হয়েছে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার ৬ষ্ঠ অধ্যায়ের ৪৬ শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণের অমর উপদেশবাণীতে :—

“তপস্বিত্যোহধিকো যোগী জ্ঞানিত্যোহপি মতোহধিকঃ।

কর্মিত্যোশ্চাধিকো যোগী তস্মাৎ যোগী ভবাজ্জুনঃ ॥

যোগী কৃচ্ছচ্ছাভ্রাণাদি তপোনিষ্ঠগণ হইতে শ্রেষ্ঠ, শাস্ত্রজ্ঞ জ্ঞানবান-দিগের অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ। ইষ্টপূর্তকর্মকারিগণ হইতেও যোগী শ্রেষ্ঠ, ইহাই আমার মত। অতএব হে অর্জুন, তুমি যোগী হও।”

ভারতীয় সৌচিত্র্য ও সংস্কৃতি তথা সনাতন হিন্দুধর্মের বাণী প্রচারকরে ভারতের যে সব স্নসস্তানগণ স্মদূর প্রাচ্য ও প্রতীচ্য পরিব্রাজনের জন্ত গমন করেছেন, পরমহংস যোগানন্দজী তাঁ'দের মধ্যে অন্যতম। ভারতীয় সভ্যতা ও হিন্দুধর্মের বাণীই যে আমেরিকায় গমন ক'রে প্রচার করা পরমহংস যোগানন্দজীর একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল তা' নয়, তাঁ'র জীবনের চরম

উদ্দেশ্য ছিল পৃথিবীর বিভিন্ন জাতিসমূহকে তা'দের বিভিন্ন কর্মপন্থা, বিচিত্র জীবনধারা, তাঁ'দের নানা মত ও পথ এবং তা'দের দৈনন্দিন জীবনের বহুবৈচিত্র্যের মধ্যে এক আধ্যাত্মিক যোগস্থলে তা'দের আবদ্ধ ক'রে ঈশ্বরভাবে উদ্ভূত করা। এর জন্ত তাঁ'র জীবনব্যাপী সাধনা ছিল “ক্রিয়া যোগে”র মাধ্যমে আর তাঁ'র সেই কৃচ্ছ্রসাধ্য তপশ্চর্যার চরম ফল তিনি দান ক'রে গেছেন বিশ্ববাসীর আত্মোৎকর্ষের মঙ্গলকামনায় এবং তা' চরম পরিণতি লাভ করেছে পৃথিবীর নানাস্থানে সংসঙ্গ-আশ্রম ও কেন্দ্র প্রতিষ্ঠায়। আজ লক্ষ লক্ষ প্রাচ্য ও প্রতীচ্যবাসী তাঁ'র প্রদর্শিত ঈশ্বরানুসন্ধানের সহজ ও সরল পথের সন্ধান পেয়ে তৃপ্ত ও ধৃত।

এ ত' গেল তাঁ'র কর্মজীবনের আলেখ্য। মহাপ্রয়াণেও তিনি যোগের যে অপূর্ব ঐশ্বর্য প্রদর্শন ক'রে গেছেন তা' অলৌকিক এবং অবিস্মরণীয়।

পরমহংস যোগানন্দজী গত ৭ই মার্চ, ১৯৫২ তারিখে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়া প্রদেশস্থ লস এঞ্জেলিস শহরে আমেরিকায় ভারতীয় দূত শ্রীবল্লভ বিনয় রঞ্জন সেন মহাশয়ের সম্বন্ধনাসভায় বক্তৃতা দেবার পর মহাসমাধিতে লীন হন।

সঙ্গে সঙ্গে পরমহংস যোগানন্দজীর পুণ্যদেহ তাঁ'র ভক্তশিষ্যবৃন্দ কর্তৃক লস এঞ্জেলিসের আশ্রমে আনীত হয়। পরে ১১ই মার্চ ১৯৫২ তারিখে তাঁ'র শেখরুতাদির পর ভারত থেকে তাঁ'র দু'টি ভক্তশিষ্যের আগমন অপেক্ষায় তাঁ'র দেহ সেখানকার ফরেষ্ট লন্ এসোসিয়েশনের শবাগারের একটি কক্ষে সমাধির জন্ত রাখা হয়। উক্ত শিষ্যদ্ব'টির আগমনের বিলম্ব আছে জানা গেলে ২৭শে মার্চ তারিখে শবাধার সীল করে এঁটে দেওয়া হয়। এই সময় একটি অলৌকিক ঘটনা ঘটে। শবাগারের ডাইরেক্টর মিঃ হ্যারি টি. রো'র লিখিত পত্রে ঘটনার বিবরণ হ'তে অংশবিশেষের মন্ত'নীচে উদ্ধৃত হ'ল :—

“আমাদের অভিজ্ঞতায় এক অত্যন্ত ঘটনা। পরমহংস যোগানন্দজীর মৃত্যুর বিশদিন পরেও তাঁ'র দেহে কোনরূপ বিকৃতির চিহ্ন দেখতে পাওয়া যায় নি।

“হাত দু'টির আকার সকল সময়েই স্বাভাবিক ছিল আঙ্গুলের অগ্রভাগ শুষ্ক বা সঙ্কুচিত হ'বার কোন লক্ষণই দেখা যায় নি। ঈষৎ

হাস্তমণ্ডিত ও ঠুঁতর তা'দের পুষ্ঠতা বরাবরই বজায় রেখেছে। কোন সময়েই তাঁ'র দেহ হ'তে পচনজনিত কোন দুর্গন্ধ নির্গত হয় নি।

“পরমহংস যোগানন্দজীর দৈহিক আরতি ৭ই মার্চ তারিখে যেমন ছিল, তাঁ'র শবাধারের ব্রোঞ্জ ঢাকনা এঁটে দেবার সময়ও ঠিক সেই একই রকম অবিরত অবস্থায় ছিল। তাঁ'র মৃত্যুর রাত্রে যেমন, ২৭শে মার্চ তারিখেও তেমনি তাঁ'র শরীর দেখলে কিছুতেই বলতে পারা যে'ত না যে তাঁ'র দেহে পচনক্রিয়ার জ্ঞাত কোন চিহ্ন দেখা যাচ্ছে। এই সব কারণেই আমরা আবার বলছি যে পরমহংস যোগানন্দজীর দেহত্যাগ আমাদের অভিজ্ঞতায় অভূতপূর্ব, অলৌকিক।”

প্রাচীন গুরুকুল আশ্রমের আদর্শে স্নকুমারমতি বালকগণের ব্রহ্মচর্য্য এবং ধর্মশিক্ষাপ্রদানে পরমহংস যোগানন্দজীর আগ্রহ ও উৎসাহ ছিল অপরিমিত। ভারতে তাঁ'র কর্মজীবন শুরু হয় দামোদর তীরে ডিহিকা গ্রামে মাত্র সাতটি ছাত্র নিয়ে যোগদা ব্রহ্মচর্য্য বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায়। বিদ্যালয়ের দ্রুত উন্নতিতে স্থান সংকুলানের অভাব হওয়ায় পরলোকগত কাশীম-বাজারের মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দীর সাহচর্য্য ও আশ্রুকুল্যে ১৯১৭ সালে পরমহংস যোগানন্দ কর্তৃক রাঁচিতে সুবিস্তৃত উদ্যানসম্বলিত আশ্রমবাটিকায় যোগদা ব্রহ্মচর্য্য বিদ্যালয় স্থানান্তরিত হয়।

এই বিদ্যালয়ে অবস্থানকালেই ১৯২০ সালে পরমহংস যোগানন্দজী বোষ্টন সহর থেকে ইন্টারন্যাশনাল কংগ্রেস অফ রিলিজিয়াস্ লিবারেলস্-এর ধর্মসভায় ভারতীয় প্রতিনিধিরূপে আহ্বত হয়ে আমেরিকা গমন করেন। সেখানে তাঁ'র বক্তৃতার পর মার্কিনবাসীদের আগ্রহ ও উৎসাহ এতদূর বর্দ্ধিত হয় যে আমেরিকার বিভিন্ন প্রদেশ হ'তে বহু ইউনিভার্সিটি, সোসাইটি, চার্চ, ও ক্লাব প্রভৃতির কর্তৃপক্ষ তাঁ'দের অগণিত সভ্যবৃন্দের সম্মুখে বক্তৃতা প্রদানের জ্ঞাত তাঁ'কে আহ্বান করেন। পরমহংস যোগানন্দজীর বক্তৃতা, উপদেশ ও শিক্ষাপ্রণালীর লোকপ্রিয়তা সর্বত্র এতদূর বর্দ্ধিত হয় যে পৃথিবীর নানাস্থানে তিনি চুরাশীটি সংসঙ্গ-আশ্রম ও কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেন। এক আমেরিকাতেই দুইলক্ষ পঞ্চাশ হাজারের উপর তাঁ'র শিষ্য ও তাঁ'র প্রবর্তিত “যোগদা” প্রণালীর শিক্ষার্থীগণ বর্তমান।

পরমহংস যোগানন্দজী কর্তৃক আমেরিকার প্রধান কেন্দ্র স্থাপিত হয়

১৯২৫ সালে লন্স এঞ্জেলিস্ সহরে। বর্তমানে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন প্রদেশে এবং মেক্সিকো, ক্যানাডা প্রভৃতি স্থানে বহু কেন্দ্র আছে এবং ইউরোপে ইংল্যান্ড, স্কটল্যান্ড, ফ্রান্স, জার্মানী, হল্যান্ড, ফিনল্যান্ড, নরওয়ে, সুইডেন, ফারোস দ্বীপপুঞ্জ প্রভৃতি স্থানেও বহু কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত আছে। এ ছাড়া পশ্চিম ও দক্ষিণ আফ্রিকা, ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ এবং হাওয়াইতেও কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

পরমহংস যোগানন্দ ১৯৩৫ সালে একবার ভারতে প্রত্যাবর্তন করেন। সেই সময়ে অবস্থানকালে তিনি ভারতের নানা কেন্দ্রের সংস্কার ও উন্নতিসাধন করেন। ভারতীয় প্রধান কেন্দ্র যোগদা মঠ, দক্ষিণেশ্বর; যোগদা আশ্রম, বরাহনগর ও কলিকাতা কেন্দ্রের বিবরণ পুস্তকের অভ্যন্তরে সন্নিবেশিত হয়েছে। এ ছাড়া হাওড়া, কদমতলায়ও একটি সংসঙ্গ-আশ্রম প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বর্তমানে নিম্নলিখিত স্থানগুলিতে সংসঙ্গ-আশ্রম সকল প্রতিষ্ঠিত আছে :—

যোগদা সংসঙ্গ আশ্রম ও শ্রীযুক্তেশ্বর বিদ্যাপীঠ—স্বর্গদ্বার, পুরী, উড়িষ্যা।

যোগদা সংসঙ্গ বিদ্যাপীঠ ও আশ্রম—লক্ষ্মণপুর, মানভূম বিহার।

যোগদা সংসঙ্গ আশ্রম—গুরুধাম, শ্রীরামপুর; সোনারগাঁও, গোসাবা, সুন্দরবন। মেদিনীপুরে নিম্নলিখিত স্থানসমূহে যোগদা সংসঙ্গ আশ্রম প্রতিষ্ঠিত হয়েছে :—ভোরদহ, খুকুরদহ, লছিপুর, গোবর্দ্ধনপুর, হান্দোল, এজমালিচক, ডোঙ্গাতাঙ্গা, ভুসুলিয়া, পিঙ্গাই, ষাটাল, সোনাখালি ও ভিষিণ্ডিপুর।

যোগদা সংসঙ্গ আশ্রম—মায়লাপুর, মাদ্রাজ।

সনাতন ধর্মের বাণীপ্রচার ও বিশ্বজনীন মানবহিতৈষণার বিরাট কর্ম-প্রচেষ্টার অন্তরালে পরমহংস যোগানন্দজী গভীর ধর্মভাবপূর্ণ বহু প্রবন্ধ, কবিতা ও মূল্যবান পুস্তকাদি রচনা ক'রে গেছেন। পরমহংসজীলিখিত “হুইস্পাস ফ্রম ইটার্নিটি”, “সায়েন্স অফ রিলিজন্”, “সঙ্স অফ দি সোল্”, “সায়েন্টিফিক হিলিং এফ্যামেশন্স” প্রভৃতির মধ্যে তাঁর “অটোবায়োগ্রাফি অফ এ যোগী” বিশ্বব্যাপী প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। এই “অটোবায়োগ্রাফি” ইতিমধ্যেই ফরাসী, জার্মান, স্প্যানিশ, ইটালিয়ান, ডাচ ও সুইডিশ প্রভৃতি ভাষায় অনূদিত হয়ে প্রকাশিত হয়েছে এবং পৃথিবীর দ্বাদশটি প্রধান ভাষায়

এর অনুবাদ ক'রে প্রকাশিত করবার ব্যবস্থা হয়েছে। সম্প্রতি হিন্দী ও জাপানী ভাষায় এর অনুবাদের আয়োজন চলছে। হিন্দী ব্যতীত তামিল, তেলেগু, গুজরাতি, আসামী, উড়িয়া, গুরুমুখী এবং ভারতের অসংখ্য প্রধান ভাষায়ও এই গ্রন্থ প্রকাশের অভিপ্রায় আছে।

বিদেশীভাষায় লিখিত পুস্তকের অনুবাদকার্যে হস্তক্ষেপ ক'রে মূলগ্রন্থের লিপিচাতুর্য, ভাষার সাবলীলগতি, রচনাসৌকুম্য ও তা'র ভাবসম্পদ বজায় রেখে তা'র সৌভাগ্য ক'রে পাঠকের চিত্তলোকে পৌঁছিয়ে দেওয়া যে কত দুর্লভ ব্যাপার, তা' সহজেই অনুমেয়। বর্তমান ক্ষেত্রে তা' কতদূর সফল হয়েছে, তা' স্মৃতিগণের বিচার্য। তবে যদি বিষয়বস্তু পাঠকের মনে আত্মমুগ্ধকান ও সদ্বস্তুর প্রতি কিঞ্চিৎপ্রভাও অনুপ্রাণনা জাগিয়ে তুলতে পারে, তবেই আমাদের সকল প্রয়াস সার্থক হয়েছে ব'লে মনে ক'রব।

পুস্তকখানি পাঠকালীন পাঠকের মনে হয়ত' এই প্রশ্ন উঠতে পারে যে পাদটিকায় প্রদত্ত নানাবিষয়ের পংক্তির সঙ্গে বাইবেল হ'তে পংক্তি-সমূহ উদ্ধৃত করার এত বাহুল্য কেন? এ স্থলে বলা যেতে পারে যে পুস্তকখানি রচিত হয়েছে ইংরেজি ভাষায় এবং তা'র বহুল প্রচার হয়েছে খৃষ্টীয় ধর্মজগতে। খৃষ্টীয়পাঠক নিজ ধর্মমতে সুপ্রতিষ্ঠিত থেকেও যা'তে উপলব্ধি করতে পারেন যে ভারতীয় দর্শন ও বিজ্ঞানে, ইতিহাস ও পুরাণে যে সব মহাসত্যের চিরন্তন বাণী ধ্বনিত হয়েছে, উদ্ধৃত পংক্তিগুলিতে তা'র মূলগত ঐক্য এবং ভাবসাম্য প্রদর্শনে রয়েছে তা'রই প্রতিধ্বনি এবং খৃষ্টীয়পাঠক গ্রন্থোক্ত বিষয়গুলি নিঃসংশয়চিত্তে ও অকুণ্ঠবিশ্বাসের সঙ্গে গ্রহণ ক'রতে পারেন, তা'তে তা'র নিজ ধর্মমতের সঙ্গে কোথাও কোন ঠোঁট নাই।

পুস্তকখানির দ্রুতপ্রকাশের আগ্রহাতিশয্যে দু'এক স্থলে মুদ্রাকরপ্রমাদের আবির্ভাবের সম্ভাবনা; আশা করি স্মৃতি পাঠকবর্গ তা' নিজগুণে মার্জনা ক'রে নেবেন।

পরিশেষে আর একটি কথা উল্লেখ না করলে এক বিশেষ ক্রটি থেকে যায়। পরমারাধ্য পরমহংস যোগানন্দজী রচনাকালে তাঁ'র পুণ্যস্পন্দ পরমাশীর্বাদে যে অনুপ্রেরণা ও উৎসাহ প্রদান করেছেন এবং স্নেহাস্পদ শ্রীমান্

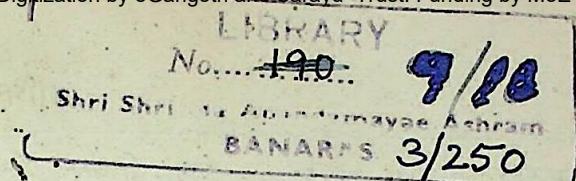
রামেশ্বর দাস মুদ্রণকার্যে যে অকাতর পরিশ্রম ও অবাচিত সাহায্যদান
করাতে পুস্তকরচনা, মুদ্রণ ও প্রকাশন সম্ভবপর হয়ে উঠেছে, তা'র জন্য
তা'দিগকে যথাক্রমে ভক্তিনতচিত্তে প্রণাম ও স্নেহাশীষ জ্ঞাপন করি। ইতি—

২১০, আপার সারকুলার রোড,
কলিকাতা।

পরমহংস যোগানন্দ জন্মতিথি,
৫ই জানুয়ারী, ১৯৫৩।
(২১শে পৌষ, ১৩৫৯)।

নিবেদক,
ইন্দ্রনাথ শেঠ।

দায়ে



১ম পরিচ্ছেদ

পিতামাতা ও বাল্যজীবন

ভারতীয় সংস্কৃতির বিশিষ্ট লক্ষণ বহু প্রাচীনকাল থেকেই পরমতত্ত্বের অন্বেষণ ও তা'র আত্মবন্দিক গুরুশিষ্যবাদের ভিতর দিয়ে তা' জানবার চেষ্টা করা। ঈশ্বর লাভের আকাঙ্ক্ষা আমার জীবনে এমন এক ভগবৎতুল্য ঋষিগুরুকে এনে দিয়েছিল, যা'র অপূর্ব সুন্দর জীবন সকল যুগের আদর্শরূপে গড়া। ভারতের একমাত্র অবশিষ্ট সম্পদ হচ্ছে—তা'র সাধু ঋষিগণ। আমার গুরুদেব হ'চ্ছেন তাঁ'দের মধ্যে একজন শ্রেষ্ঠ মহাপুরুষ—জ্ঞানাবতার। তাই যুগে যুগে এঁদের আবির্ভাব ভারতবর্ষকে ব্যাবিলন মিশরের মত ভাগ্যবিপর্যয়ের হাত হ'তে বাঁচিয়ে এসেছে।

পূর্বজন্মের কতকগুলি বিচ্ছিন্ন ঘটনার সমাবেশে আমার বাল্যস্মৃতি আচ্ছন্ন। বেশ স্পষ্ট মনে পড়ে যে, অতীত জীবনে আমি হিমালয়ের তুবারময় প্রদেশে যোগীরূপে ঈশ্বরলাভের জন্তে ব্যাকুল হ'য়ে কঁদে কঁদে বেড়িয়ে ছিলাম। অতীতের এই সব ক্ষীণস্মৃতি কোন অদৃশ্য যোগস্থলে আমার ভবিষ্যৎ জীবনেরও আভাস দিয়েছিল।

ছেলেবেলাকার অসহায় অবস্থার পীড়ন আমার মন থেকে মুছে যায় নি। বেড়াতে না পেরে বা আপনাকে পরিপূর্ণভাবে প্রকাশ করতে না পেরে আমি অভিমান আর নিতান্ত দুঃখ বোধ করতুম। আমার কিশোর দেহের অপটুতার কথা স্মরণ হ'লে মনের মধ্যে প্রার্থনার তরঙ্গ উদ্বেলিত হ'য়ে উঠত। প্রবল ভাবপ্রবণ আমার জীবন বিভিন্ন ভাষার নীরব বাণীতে রূপ পে'লে। আমার হৃদয়ের ভাব অন্তরের মধ্যে নানাবাণী উচ্ছ্বসিত হ'য়ে উঠত। কিশোর মনের অন্তরালে তাদের প্রতিধ্বনি বেশ স্পষ্ট শুনতে পেতুম। অন্তরের নীরব ভাষা বিভ্রাটের মধ্যে আমার কাণ আত্মীয়-স্বজনের অবিরাম বাঙলা ভাষা শুনে শুনে ক্রমশঃ সেই ভাষায় অভ্যস্ত হয়ে উঠল।

গুরুজনেরা আমার দেখে মনে করতেন যে আমার শিশুমন পেলনা আর বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ লেহনেই নিমগ্ন রয়েছে।

মনের নানা অকারণ উদ্বেগ, অজানা উচ্ছ্বাস আর অপরিণত মস্তিষ্কের অসামর্থ্য আমার মধ্যে বহু একটানা কান্নার বেগের সৃষ্টি করত। আল্লীয়স্বজনেরা এই অযথা ক্রন্দনের কোন কারণ আবিষ্কার করতে না পেরে বিস্মিত ও ব্যথিত হ'তেন। স্মৃতির স্মৃতিগুলিও অতীতের অন্ধকার হ'তে বেরিয়ে এসে মনের মধ্যে ভিড় করে দাঁড়াত। মায়ের আদর, ভাবার অশ্রুট উচ্চারণে আমার প্রথম প্রচেষ্টা, আর হাঁটি হাঁটি পা পা বুলির সঙ্গে সঙ্গে হাঁটবার চেষ্টা—এসবই স্মৃতির আলোকে পরিষ্কার দেখতে পেতুম। বাল্যজীবনের এই সব প্রথম সাফল্য যদিও শীঘ্রই ভুলে যেতুম, তবুও তা'রা পরে আত্মবিশ্বাসের একটা স্বাভাবিক আর সুদৃঢ় ভিত্তি হয়েই দাঁড়িয়েছিল।

মাতৃগর্ভে আমার অবস্থানের কথা আর আমার নিত্যশুশুকালের নানা বিষয়ের স্মৃতি আমার মনে বেশ স্পষ্টভাবে অঙ্কিত হ'য়ে রয়েছিল, সেটা যে খুব বেশী আশ্চর্যের কথা তা' নয়। অনেক যোগীদের জানা গিয়েছে যে, এই জগৎ নাট্যশালায় তাঁ'দের এক জীবন হতে উৎক্রান্ত হ'য়ে মৃত্যুপথে পরবর্তী জীবনে আবির্ভাব তাঁ'রা পরিপূর্ণ স্মৃতির আলোকে দেখতে পেয়েছেন। মানুষ যদি কেবল দেহমাত্রই সার হয়, তাহ'লে তা'র সে দেহনাশের সঙ্গে সঙ্গেই তা' সব চুকে গেল। শত শত বর্ষ ধ'রে, মহাপুরুষ অবতারগণ পরিপূর্ণ আত্মজ্ঞানবলে এই জীবনের অমরতার বিষয় অলান্ত সত্য বলে নির্দ্বারিত করে গেছেন। মানুষের অহংজ্ঞান ইঞ্জিয়বোধের সঙ্গে কেবল সাময়িকভাবে সংযুক্ত হয় মাত্র।

যদিও স্মৃষ্টি আর অদ্বুত বাল্যস্মৃতির কথা সাধারণতঃ শুনতে পাওয়া যায় না, তবুও মাঝে মাঝে ছেলেবেলাকার আশ্চর্য্য স্মৃতির বহু উদাহরণ এখন জানতে পারা গিয়েছে। নানা দেশবিদেশে বেড়াবার সময় এইরকম অদ্বুত বাল্যস্মৃতির পরিচয় আমি ও বহুবার পেয়েছি।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশকে আমার জন্ম হয়, আর আমার বাল্য-জীবনের প্রথম আট বৎসর গোরক্ষপুরেই অতিবাহিত হয়। উত্তরপ্রদেশে

যোগিকথামৃত

৩

আমার জন্মস্থান। তাই ভগ্নী মিলে আমরা আটজন। চার ভ্রাতা ও চার ভগ্নী। সংসার জীবনে আমি মুকুন্দলাল ঘোষ* নামে অভিহিত। পিতামাতার আমি দ্বিতীয় পুত্র এবং চতুর্থ সন্তান। এক জ্যেষ্ঠভ্রাতা ও দুই ভগ্নী বড়দিদি ও মেজদিদির পর আমার জন্ম।

আমার পিতামাতা ক্ষত্রিয়বংশসম্ভূত বাঙ্গালী। উভয়েই সাধুপ্রকৃতি-সম্পন্ন। তাঁদের অন্তরে পরম্পরের প্রতি প্রশান্ত মহিমময় প্রীতি কখনও চপলতার দ্বারা লঘু হ'তে দেখিনি। পিতামাতার পরিপূর্ণ ত্রৈক্যের শান্তিময় জীবনকে কেন্দ্র করে আমাদের আটটি জীবন ঘুরতে আরম্ভ করলে।

পিতা ভগবতী চরণ ঘোষ—দয়ালু, গম্ভীর, কিন্তু সময় সময় কঠোরভাব প্রকাশ করতেন। তাঁকে অন্তরের সঙ্গে ভালবাসলেও আমরা শিশুর দল কিন্তু তাঁর সঙ্গে দেবতার গ্রাম বেশ একটা সম্মানসূচক দূরত্ব রক্ষা করেই চলতুম। তিনি অসাধারণ গণিতজ্ঞ ও গ্রায়কুশলী ছিলেন ব'লে, প্রধানতঃ নিজের বুদ্ধিবলেই চালিত হ'তেন। কিন্তু মা ছিলেন আমাদের অন্তররাজ্যের রাণী। তিনি কেবল শুধু ভালবাসার দ্বারাই আমাদের অন্তরে ভাল হ'বার ইচ্ছা আর চেষ্টা জাগ্রত করতেন। মার মৃত্যুর পর পিতা তাঁর অন্তরের কোমলতা আরও বেশী করে প্রকাশ ক'রতে লাগলেন। তাঁর চোখে তখন মায়ের স্নেহকোমল আঁখির ছায়া ভাসতে দেখতে পেতুম।

মায়ের কাছেই সর্বপ্রথম আমাদের শাস্ত্রাদির সঙ্গে তিক্তমধুর পরিচয় লাভ হয়। রামায়ণ আর মহাভারতের কাহিনী ও উদাহরণ থেকে বেছে নিয়ে মা আমাদের সেই সব, শাসন উপদেশ আর নীতিশিক্ষার বিষয়ে স্মৃচতুর ভাবে প্রয়োগ করতেন। শিক্ষা আর শাসন পাশাপাশি চলত।

প্রত্যহ বৈকালে মা আমাদের সবঙ্গে পরিপাটিক্রমে সাজিয়ে দিয়ে বাড়ীর বাইরে রাস্তায় দাঁড় করিয়ে রাখতেন—পিতাকে অফিস হ'তে বাড়ী ফেরবার সময় অভ্যর্থনা জানাবার জন্তে। প্রথমে বি, এন, ডব্লু রেলের এজেন্টের তিনি প্রধান সহকারী ছিলেন। পরে বেঙ্গল নাগপুর রেলের ঐ পদে নিযুক্ত হ'য়েছিলেন।

*১৯১৪ খৃষ্টাব্দে আমি যখন সন্ন্যাস গ্রহণ করি, তখনই আমার নাম পরিবর্তিত হ'য়ে যোগানন্দ হয়। আমার গুরুদেব আমায় ১৯৩৫ সালে পরমহংস এই উপাধি দান করেন। (২৪শ ও ৪২শ পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)।

হুঃহু লোকেদের অভাব মোচনে মা সর্বদাই মুক্তহস্ত ছিলেন। পিতার অন্তঃকরণও দয়ালু ছিল; কিন্তু তাঁর সংসারখরচ দানধ্যান প্রভৃতি একটা নির্দিষ্ট ধারায় চলত। মা একবার দরিদ্রনারায়ণের সেবায় 'চৌদ্দ' দিনের মধ্যেই পিতার একমাসের আয়ের চেয়েও বেশী খরচ করে ফেলেছিলেন। তাই একদিন তিনি মা'কে ডেকে গম্ভীরভাবে বললেন, “দেখ, তোমায় আমি শুধু এই কথাটুকু বলতে চাই যে, তোমার দানধ্যানগুলো যেন একটু ঋয়সঙ্গত ভাবে-চলে। ধার করে দানটান করা কি ভাল?” পিতার এই মৃদু তৎসনা-টুকুও মায়ের অন্তরে প্রবল আঘাত দিলে। মা তখনই এক ভাড়াটে গাড়ী ডাকালেন। ছেলেদের কাছে পিতার সঙ্গে মনান্তরের কথা বিন্দুমাত্র উল্লেখ না করে শুধু হুঃখভরে বললেন, “আজ আমি বাপের বাড়ী চলুম।” স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে অমিলনসূচক এই ব্যবস্থা দেখে বুঝলুম যে, পিতামাতার মধ্যে অজানা একটা কিছু গোলযোগ ঘটেছে।

আমরা ত' অবাক হ'য়ে কান্না জুড়ে দিলুম। রাঙামামাও অকস্মাৎ সেখানে সময়মত এসে উপস্থিত হ'লেন, আর স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে পুনর্মিলন ঘটাবার উদ্দেশ্যে কিঞ্চিৎ সুপ্রাচীন উপদেশও পিতার কর্ণে চুপে চুপে প্রয়োগ করলেন। ফলে এই হ'ল যে, পিতার সঙ্গে কতকগুলো আপোষসূচক কথাবার্তার পর মা সন্তুষ্টচিত্তে গাড়ী ফিরিয়ে দিলেন। যা'ই হো'ক পিতামাতার এই রকম মতান্তরের বিব্রাট' যা' আমি কেবল একবার মাত্র ঘটতে দেখেছিলুম, তা'র সন্তোষজনক নিষ্পত্তি হ'ল। কিন্তু আর একটিবার উভয়ের মধ্যে বাদানুবাদের একটা কথা আজ মনে পড়ল। সেইটা এবার বলি।

পাশের ঘর থেকে শুনতে পেলুম, মা বাবাকে বলছেন, “দেখ, একটি বড় হুঃখিনী মেয়ে নিচের বৈঠকখানায় এসে হাজির হয়েছে। বেচারীর বড্ডই অভাব। গোটা দশেক টাকা তা'র এখন নিতাস্তই দরকার।” মেয়েটির হুঃখ দূর করবার চেষ্টায় মায়ের হাসিমুখে আরজি পেশ করাতে বাবার উপর বেশ প্রভাব বিস্তার করলে। তবুও বাবা বললেন, “দশটাকা কেন? এক টাকাইত' যথেষ্ট।” তারপর আত্মপক্ষ সমর্থনের উদ্দেশ্যে তিনি শুরু করলেন, “দেখ, যখন আমার বাবা আর ঠাকুরদাদা ঠাকুরমা হঠাৎ মারা গেলেন, তখন আমার দারিদ্র্যের সঙ্গে প্রথম পরিচয়। একটি মাত্র ছোট্ট কলা খেয়ে

যোগিকথাযুত

৫

মাইলের পর মাইল হেঁটে ইস্কুলে যেতুম। শেষে বহুকষ্টে ইস্কুল থেকে ইউনিভার্সিটিতে প্রবেশ করি। পড়াশুনা চালাবার জন্তে দারিদ্র্যের পীড়নে চোখের জলে ভেসে এক ধনী জজের কাছে মাসিক একটি মাত্র করে টাকা সাহায্য চাইতে যাই। ‘একটা টাকাই কি কিছু কম না কি?’ বলে কিছু না দিয়েই তিনি আমায় বিদায় ক’রে দিলেন।” মায়ের করুণাঙ্গীদয়েও সঙ্গে সঙ্গে একটা প্রবল যুক্তির উদয় হওয়াতে প্রত্যন্তরে তিনি বলেন, “যেই একটি মাত্র টাকা হ’তে বঞ্চিত হ’বার স্বত্তি কত দুঃখের সঙ্গে মনের মধ্যে পুনে রেখেছেন, বলুন ত’। আর আপনিও কি এই দারুণ অভাবগ্রস্ত দুঃখিনী মেয়েটিকে দশটি টাকা সাহায্য না করে, আপনারই মত তা’র স্বত্তিকেও তেমনি তিক্ত করে তুলবেন?” “নাঃ, তুমিই জিতলে দেখছি,”—এই বলে বাক্যযুদ্ধে স্বামীদের সনাতন পরাজয়ের মুখভাব অবলম্বন করে মনিব্যাগ খুলে পিতা বললেন, “এই নাও দশ টাকার নোট। আমার শুভেচ্ছার সঙ্গে নিচে গিয়ে তা’কে নিজে হাতে দিয়ে এস।”

নতুন কোন প্রস্তাব উপস্থিত হ’লে পিতা প্রথমতঃ ‘না’ বলে বসতেন। এই দুঃখিনী অপরিচিতা নারীটির প্রতি মায়ের হৃদয় স্নেহবিগলিত হওয়া সত্ত্বেও পিতার আচরণ তাঁ’র সকল বিষয়ে সাবধানতার পরিচয় দেয়। কোন বিষয়ে হঠাৎ সম্মতিপ্রদান না করার প্রতিকূলতা পাশ্চাত্য দেশের ফরাসী প্রকৃতির বিশিষ্ট পরিচয়। প্রকৃতপক্ষে বলতে গেলে, এই স্বভাব “যথোচিত বিবেচনা করে সব কায করা উচিত”—এই নীতির অল্পসরণ মাত্র। পিতার আচরণ সর্বদাই গ্রায়সঙ্গত এবং তাঁ’কে বিচারবিবেচনায় সর্বত্র সমদর্শী দেখতুম। যদি আমি আমার নানারকমের আবদার অল্পরোধ তাঁ’র কাছে বেশ একটা প্রবল যুক্তির সঙ্গে সমর্থন ক’রে দেখাতে পারতুম, তা হ’লেই তিনি আমায় সেই বাঞ্ছিত বস্তুটি পা’বার সুযোগ ঘটিয়ে দিতেন—তা’ সে ছুটিতে দেশ ভ্রমণই হোক আর একটা নতুন মোটর সাইকেলই হোক।

শৈশবে পিতৃদেব আমাদের কঠিন নিয়মনিষ্ঠ শিক্ষকরূপে শাসন করতেন। তাঁ’র নিজের আচার ব্যবহারও অতি কঠোর তপস্বীর গ্রায় ছিল। তা’র প্রমাণ এই যে, জীবনে তিনি কখনও থিয়েটার দেখেন নাই। তাঁ’র আমোদপ্রমোদ বা অবসরবিনোদনের জন্তে তিনি আধ্যাত্মিক সাধনা

বা গীতাপাঠেই আনন্দ লাভ করতেন। ভোগবিলাস ত্যাগ করে তিনি একজোড়া জুতা যতদিন পর্যন্ত না একেবারে ব্যবহারের অযোগ্য হয়ে পড়ত, ততদিন পর্যন্ত তা' দিয়ে চালাতেন। মোটরগাড়ী জনপ্রিয় হয়ে উঠলে ছেলেরা তাঁকে একটা গাড়ী কিনে দেয়। কিন্তু তিনি প্রত্যহ ট্রামে চড়েই আফিস যাতায়াত করে সন্তুষ্ট থাকতেন। ক্ষমতালাভের জন্তে ধনসঞ্চয় তাঁর প্রকৃতিবিরুদ্ধ ছিল। কলকাতার আব্বান ব্যাঙ্ক গড়ে তুলতে তিনি বিশেষরূপে সাহায্য করেন। কিন্তু তিনি সে সময় নিজের লাভের জন্তে তাঁর শেয়ার কেনা বা তাঁর ষ্টক ধরে রাখা সমীচীন বোধ না করে তা' প্রত্যাখ্যানই করেছিলেন। অবসরকালে তিনি সাধারণের প্রতি এইরূপ কর্তব্য করেই সন্তুষ্ট থাকতেন।

বাবা চাকরী হতে অবসর ও পেন্সন নেবার বহু বৎসর বাদে বিলেত থেকে একজন ইংরেজ হিসাব পরিদর্শক বেঙ্গল নাগপুর রেলওয়ে কোম্পানীর হিসাব পরীক্ষা করতে এলেন। তিনি দেখে আশ্চর্য্য হয়ে গেলেন যে, বাবা তাঁর বহুদিনের প্রাপ্য অতিরিক্ত বোনাসের জন্তে কোম্পানীর কাছে কখনও কোন আবেদন করেন নি।

বাবা অল্প বেতনে তিন জন লোকের কাষ একলাই চালাতেন বলে হিসাব পরিদর্শক সাহেব রেলকর্তৃপক্ষদের নিকট তাঁর হয়ে ক্ষতিপূরণের জন্তে এক অভিযোগ উত্থাপন করেন। তিনি হিসেব করে দেখালেন যে, তাঁর বাকী বেতনের প্রাপ্য টাকার পরিমাণ দাঁড়াচ্ছে একলক্ষ পঁচিশ হাজার! এই আবেদনের ফলে সেই কর্মচারীটি বাবাকে ঐ পরিমাণ টাকার চেক পাইয়ে দেন। পিতা কিন্তু এত টাকা হঠাৎ পেয়ে গিয়ে কিছুমাত্র চাঞ্চল্য বা উচ্ছ্বাস প্রকাশ করলেন না। পরে অনেক দিন বাদে আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা বিষ্ণু ব্যাঙ্কের এতগুলো টাকার একটা বড় রকমের জমার হিসাব পেয়ে অত্যন্ত আশ্চর্য্য হয়ে তাঁকে এই বিষয়ে প্রশ্ন করে।

পিতা বিষ্ণুকে উপদেশচ্ছলে বললেন, “পার্থিব লাভে উল্লসিত হও কিসের জন্তে? সুখে দুঃখে মন যা'র অবিচলিত, সে লাভে উল্লসিত বা লোকসানে মূবড়ে পড়ে না। সে জানে যে, মানুষ এ পৃথিবীতে আসে কপর্দকহীন আর যায়ও কপর্দকহীন।”

যোগিকথাযুত

৭

বিবাহের কিছুকাল পরেই পিতামাতা কাশীর যোগাবতার লাহিড়ী মহাশয়ের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। এই সংযোগ পিতার স্বাভাবিক তাপস স্বভাব দৃঢ়তর করে তুলেছিল। মা আমার বড়দিদি রমার নিকট এক অদ্ভুত কথা প্রকাশ করেছিলেন, “তোমার বাবা ও আমি বৎসরে কেবল একবার মাত্র স্বামী-স্ত্রীর সম্বন্ধ পালন করি, তা’ও বংশরক্ষাকারী সন্তান লাভের জন্তে।”

লাহিড়ী মহাশয়ের সঙ্গে বাবার প্রথম সাক্ষাৎকারলাভ হয় অবিনাশ বাবুর সাহায্যে। ইনি রেল কোম্পানীর গোরক্ষপুর আফিসের একজন কর্মচারী ছিলেন। অবিনাশবাবু আমার কিশোর বয়সে ভারতের সাধুসন্ন্যাসীদের বহু আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য কাহিনী শুনাতেন। সে সব কাহিনীর পরিসমাপ্তি ঘটাবার সময় তিনি সর্বদাই তাঁ’র নিজগুরু লাহিড়ী মহাশয়ের অপূর্ব মহিমার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে গল্প শেষ করতেন।

গ্রীষ্মের এক অলস অপরাহ্নে অবিনাশবাবু আর আমি যখন বাড়ীর আঙ্গিনায় বসে গল্পগুজব করছি তখন তিনি এই অভিনব প্রশ্নটি করে বসলেন, “মুকুন্দ, তোমার বাবা কি আশ্চর্য্য উপায়ে লাহিড়ী মহাশয়ের শিষ্য হয়েছিলেন তা’ কি কখনও শুনেছ?” আমি হেসে মাথা নেড়ে তাঁর এই অপরূপ প্রশ্নের উত্তরের অপেক্ষায় তাঁ’র মুখের দিকে তাকিয়ে রইলুম।

অবিনাশবাবু বলতে শুরু করলেন, “তোমার জন্মাবার অনেক বছর আগে আমাদের বড়বাবু—তোমার বাবার কাছে, কাশীতে আমার গুরুদেবকে দর্শনের জন্তে গোরক্ষপুর রেল আফিস হ’তে এক সপ্তাহের ছুটি চাইলুম। তোমার বাবা ত’ আমার মতলবটি হেসেই উড়িয়ে দেবার চেষ্টা করে বললেন, ‘ধর্ম্ম ধর্ম্ম করে পাগল হ’বে নাকি? চাকরীতে যদি উন্নতি করতে চাও ত’ অফিসের কাষকর্মে ভাল করে মন দাও।’ অত্যন্ত বিষম্মনে সে দিন আফিস হ’তে বাড়ী ফিরছি। দেখি যে, হু’ধারে গাছে ঘেরা ছান্নায় ঢাকা রাস্তার মাঝখান দিয়ে তোমার বাবা পাক্কী চড়ে চলেছেন। চোখে চোখ পড়তেই তিনি পাক্কী থেকে নেমে পড়লেন, আমার সঙ্গে হেঁটে বাড়ী ফেরবার জন্তে। পাক্কী আর বেহারাগুলোকে বিদায় করে দিলেন। সাস্তুনা দে’বার ছলে তোমার বাবা পার্থিব উন্নতির চেষ্টাতে যে নানা সুবিধা আছে সে কথা আমায় বুঝাতে লাগলেন। উদাসীনভাবে তাঁ’র কথাগুলো শুনে

চলেছিলুম। অন্তর কিন্তু বারবার কেন্দ্রে উঠে বলতে লাগল, ‘লাহিড়ী ম’শায়, লাহিড়ী ম’শায়, এবার কিন্তু আপনাকে দেখতে না পে’লে আমি আর বাচব না।’

“তোমার বাবা আর আমি হেঁটেই বাড়ীর দিকে ফিরতে শুরু করলুম। রাস্তা ধ’রে আমরা একটি প্রশস্ত মাঠের ধারে এসে পড়লুম। শেখ অপরাহ্নের সূর্য্যকিরণ তখনও চেউখেলান বন্য ঘাসের ডগাগুলো রাঙিয়ে তুলছিল। অবাক বিশ্বয়ে আমরা দাঁড়িয়ে পড়লুম সেই মনোরম শোভা দেখবার জগ্গে। সেই শূন্য মাঠের মাঝখানে মাত্র কয়েক গজ দূরেই আমার পরমারাধ্য গুরুদেব লাহিড়ী মহাশয় হঠাৎ আবিভূত হ’লেন! * তাঁ’র বাণী আমাদের বিশ্বয়স্কর শ্রবণে এসে ধ্বনিত হ’ল, ‘ভগবতী, তুমি তোমার কর্মচারীদের ওপর বড়ই কঠিন।’ যেমনি অদ্ভুতভাবে তিনি আবিভূত হ’লেন, তেমনি আশ্চর্য্যভাবেই তিনি অস্তর্ধানও করলেন। তখনই নতজান্ন হ’য়ে আমি প্রাণভরে ডাকতে লাগলুম, ‘লাহিড়ী ম’শায়, লাহিড়ী ম’শায়।’ তোমার বাবা বিশ্বয়ে হতবাক হ’য়ে বহুক্ষণ নিশ্চল ভাবে সেখানে দাঁড়িয়ে রইলেন।

“তোমার বাবা তখন বললেন, ‘অবিনাশ, তোমাকেই যে শুধু ছুটি দি’ছি তা’ নয়, আমি নিজেও ছুটি নি’ছি, কালই তোমার সঙ্গে কাশী যা’বার জগ্গে। তোমার সাহায্যের জগ্গে যিনি ইচ্ছামাত্রই আবিভূত হ’তে পারেন, সেই যোগিরাজ লাহিড়ী মহাশয়কে আমি দেখবই। আমি সঙ্গীক এই মহাগুরুর কাছে গিয়ে তাঁর সাধন পথে দীক্ষা নেব। তুমি আমাদের তাঁর কাছে নিয়ে যাবে কি?’

“আমি বললুম, ‘নিশ্চয়ই ভগবতীবাবু, নিশ্চয়ই নিয়ে যাব।’ আমার প্রার্থনা এই রকম অলৌকিকরূপে পূরণ হ’য়ে যাওয়াতে এবং ঘটনার দ্রুত আর অমূল্য পরিবর্তনে মন তখন আনন্দে পূর্ণ হয়ে গিয়েছিল।

“পরদিন সন্ধ্যাবেলা তোমার বাবা, মা আর আমি কাশীর গাড়ীতে চড়ে বসলুম। তাঁ’র পরের দিনই কাশীতে পৌঁছে ঘোড়ার গাড়ী করে অনেকটা দূর গিয়ে এক যায়গায় এসে নেমে পড়লুম। তারপর একটা সরু গলির ভিতর দিয়ে খানিকটা পায়ে হেঁটে এসে গুরুদেবের নিরালা বসতবাটিতে গিয়ে পৌঁছলুম। তাঁ’র ছোট বৈঠকখানায় ঢুকতে দেখা গেল যে, যোগাবতার

* মহাগুরুর অলৌকিক শক্তির বিষয় ৩০শ পরিচ্ছেদে বর্ণিত হয়েছে।

যোগিকথামৃত

৯

লাহিড়ী মহাশয় তাঁ'র অভ্যন্ত পদ্মাসনে বসে আছেন, ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করলুম। অক্লান্তমূলিত চক্ষু'টি খুলে তাঁ'র অন্তর্ভেদী দৃষ্টি তোমার পিতার উপর রেখে লাহিড়ী মহাশয় বললেন, 'ভগবতী, তুমি তোমার কর্মচারীদের ওপর বড়ই কঠিন।'।

“দু'দিন আগে রেল অফিস হ'তে ফেরবার সময় গোরক্ষপুরের মাঠে আবিভূত হ'য়ে তিনি ঠিক এই কথাগুলো দিয়ে ঠিক এমনি ভাবেই তোমার বাবাকে মৃত্ণু ভৎসনা ক'রেছিলেন। তা'র পর তিনি বললেন, 'আজ আমার বড় আনন্দ যে, তুমি অবিনাশকে আমার কাছে আসতে দিয়েছ, আর তুমি নিজেও এখানে সন্তীক এসেছ।'।

“তোমার বাবা ও মা সেই মহাশয়ের কাছে ক্রিয়াযোগের * আধ্যাত্মিক সাধনায় দীক্ষা লাভ করে অপরিসীম আনন্দ লাভ করলেন। তোমার বাবা আর আমি—দুই গুরুভাই, লাহিড়ী মহাশয়ের সেই অবিস্মরণীয় আবির্ভাবের দিন হ'তেই অন্তরঙ্গ বন্ধু হ'লুম। মুকুন্দ, তোমার নিজের জন্ম বিষয়েও লাহিড়ী মহাশয় বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ ক'রে ছিলেন। তোমার জীবন নিশ্চয়ই সেই মহাশয়ের জীবনের সহিত সংযুক্ত হয়ে থাকবে। গুরু মহারাজের আশীর্বাদ কখনও ব্যর্থ হয় না।”

আমার এ সংসারে আসবার কিছুকাল পরেই লাহিড়ী মহাশয় ইহজগৎ পরিত্যাগ করেন। বাবা যখন যে সব সহরে বদলী হ'তেন, সেই সব সহরে আমাদের বাড়ীর ঠাকুর ঘরে অলঙ্কৃত ক্রমে বাঁধান লাহিড়ী মহাশয়ের ছবি নিত্যপূজার জন্ত রাখা থাকত। প্রায় প্রত্যহই সকাল ও সন্ধ্যায়—মা আর আমি একটি সত্তরচিত বেদীর উপর লাহিড়ী মহাশয়ের ছবি চন্দনসিক্ত পুষ্পে সজ্জিত করে গভীরভাবে ধ্যানে বসতুম। ধূপ ধূনা আর গুগ্গুলের সঙ্গে মা ও ছেলের মিলিত ভক্তিদ্বারায় আমরা দেবত্বের পূর্ণবিকাশ লাহিড়ী মহাশয়ের প্রতি আমাদের অন্তরের ভক্তি ও শ্রদ্ধা নিবেদন করতুম।

লাহিড়ী মহাশয়ের ছবিটি কিন্তু আমার জীবনে অত্যধিক প্রভাব বিস্তার ক'রেছিল। বয়স হ'বার সঙ্গে সঙ্গে যোগিরাজের বিষয়ে চিন্তাও আমার

* ইন্দ্রিয়ের দ্বারবন্ধ করে মানবকে সমাধির পথে অগ্রসর করে দেবার যৌগিক প্রণালী।

সঙ্গে বাড়তে লাগল। ধ্যানে বসে আমি প্রায়ই দেখতে পেতুম যে, তাঁ'র ফটোগ্রাফের মূর্তি ছবির ছোট ফ্রেম হ'তে বেরিয়ে এসে একটি জীবন্ত মূর্তি ধারণ করে আমার সামনে এসে বসেছে। যেমনি সেই জ্যোতিষ্ময় দেহের চরণ স্পর্শ ক'রতে হাত বাড়াতুম, অমনি তখুনিই তা' বদলে গিয়ে আবার ফটোগ্রাফের ছবি হ'য়ে দাঁড়াত। শৈশব হতে কৈশোরে উপনীত হ'য়ে দেখলুম যে, লাহিড়ী মহাশয় আমার মনে ক্রমে আঁটা একটা ছোট ছবি থেকে একটি জীবন্ত ভাবসঞ্চারী সত্য পরিণত হয়েছেন। সঙ্কটকালে ও বুদ্ধিবিপর্যয়ে আমি তাঁ'র সাস্থনাদায়ক অভয়বাণীর নির্দেশ পে'তুম। তিনি শরীরে বর্তমান না থাকাতে প্রথম প্রথম বড়ই দুঃখ বোধ ক'রতুম, কিন্তু পরে যখন তাঁ'র গুঢ় সর্বব্যাপিত্ব আমার কাছে প্রকাশ হ'তে শুরু হ'ল, তখন আর আমার ক্ষোভের কোন কারণ রইল না। তাঁ'কে দেখতে অত্যন্ত উৎসুক শিষ্যদিগকে তিনি প্রায়ই লিখতেন, “দেখ, তোমাদের কূটস্থের মধ্যেই যখন আমি সর্বদা রয়েছি, তখন এই হাড়মাংসের খাঁচাটা আর দেখতে আসা কেন?”

আট বছর বয়সের সময় লাহিড়ী মহাশয়ের ফটোগ্রাফের রূপায় আমার একবার অত্যশ্চর্য্যভাবে রোগমুক্তি ঘটেছিল। এই ঘটনায় আমার ভক্তি আরও গাঢ়তর করে তুলেছিল। বাংলায় একবার আমাদের ইছাপুরের বাড়ীতে থাকতে আমি দারুণ এসিয়ার্টিক কলেরায় আক্রান্ত হই। জীবনের আর কোন আশাই রইল না। ডাক্তারেরা কিছুই করতে পারলেন না। রোগশয্যার পাশে ব'সে মা আমার মাথার উপর দেওয়ালে টাঙান লাহিড়ী মহাশয়ের ছবির দিকে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করবার জেতে উন্মত্তের মত প্রাণপণে চেষ্টা ক'রতে লাগলেন।

তিনি জানতেন যে, আমি এত দুর্বল যে প্রণাম করবার মত হাত তোলবার ক্ষমতাও আমার নাই। তাই বললেন, “মনে মনে প্রণাম ক'র। যদি তোমার আন্তরিক ভক্তি থাকে, আর মনে মনে তাঁ'কে সান্ধীপ্ণে প্রণাম ক'র, তা হলেই তুমি প্রাণে বেঁচে যাবে।”

আমি ফটোগ্রাফের দিকে চেয়েই রইলুম। হঠাৎ দেখলুম, সেখানে এক চোখ বলসান উজ্জল আলো, আমার সমস্ত শরীর আর ঘর ছে'য়ে ফেল্লে।

আমার বমির ভাব আর অত্যন্ত প্রবল উপসর্গসকল একেবারে অন্তর্হিত হ'ল। আমি বেশ সুস্থ হ'য়ে উঠলুম। গুরুর প্রতি মায়ের অপরিমেয় বিশ্বাসের পরিচয় পেয়ে নিচু হয়ে হাত বাড়িয়ে মায়ের পায়ের ধুলো নেবার জন্যে যথেষ্ট শক্তিও আমি সঙ্গে সঙ্গেই পেয়ে গেলুম। মা বারম্বার সেই ক্ষুদ্র ছবিটিতে মাথা ঠেকিয়ে বনুতে লাগলেন, “হে সর্বব্যাপি গুরুদেব, আপনার জ্যোতিঃই আমার সন্তানকে রক্ষা করেছে, আপনাকে প্রণাম, আপনাকে প্রণাম।” আমি বেশ বুঝতে পারলুম যে, তিনিও সেই অত্যাশ্চর্য জ্যোতিঃের বিকাশ লক্ষ্য করেছিলেন, যা'র দ্বারা আমি সেই সাংঘাতিক করাল ব্যাধি হ'তে সত্ত্ব সত্ত্ব মুক্তিলাভ করতে পেরেছিলুম।

আমার সর্বাপেক্ষা অমূল্য সঞ্চয় গুলির মধ্যে হ'চ্ছে সেই ফটোগ্রাফটি। পুণ্যস্পন্দ সেই প্রতিকৃতিটি লাহিড়ী মহাশয় স্বয়ং পিতাকে দিয়েছিলেন। ছবিটির একটি অলৌকিক কাহিনী ছিল। পিতার গুরুভাই শ্রীকালী কুমার রায় মহাশয়ের কাছ থেকে আমি তা' গুনেছি।

মনে হয়, লাহিড়ী মহাশয় তাঁ'র কোন ফটোগ্রাফ তুলতে দিতে একান্ত বিরূপ ছিলেন। তাঁ'র আপত্তি সত্ত্বেও কালীকুমার রায় সমেত একদল শিষ্যের সঙ্গে তাঁ'র একটা গ্রুপ ছবি একবার তোলা হয়। ফটোগ্রাফার বিশ্বাসে সন্তুষ্ট হ'য়ে দেখলে যে, প্লেটে যদিও অন্যান্য শিষ্যদের ছবিগুলো বেশ স্পষ্ট হ'য়ে কুটে উঠেছে, কিন্তু মাঝখানে যে স্থানে সে লাহিড়ী মহাশয়ের প্রতিকৃতি স্বভাবতঃই দেখবে বলে আশা করেছিল, সেস্থানটি একেবারেই শূন্য, একদম কিছুই নেই। এই অদ্ভুত ব্যাপার নিয়ে ত'বহ সোরগোল চলল।

গঙ্গাধর বাবু ছিলেন তাঁ'র একজন শিষ্য এবং সুদক্ষ ফটোগ্রাফার। তিনি সগর্বে ঘোষণা করলেন যে, লাহিড়ী মহাশয়ের পলাতক মূর্তি আর তাঁ'র হাত এড়িয়ে যেতে পারবে না। তা'র পরদিন সকাল বেলায় গুরুদেব যখন পিছনে পরদা টাঙান একটা কাঠের বেষ্টিতে পদ্মাসনে উপবিষ্ট, গঙ্গাধরবাবু তখন তাঁ'র সাজসরঞ্জাম সমেত এসে উপস্থিত হ'লেন। সাফল্যলাভের জন্যে সর্ববিধ সতর্কতা অবলম্বন করে সোৎসাহে তিনি রারটি প্লেট একে একে এক্সপোজার দিলেন। আশ্চর্য্য! প্রত্যেকটাতেই তিনি দেখলেন যে,

কাঠের বেঞ্চি ও পরদার ছাপ উঠেছে, কিন্তু এবারেও তা'তে গুরুদেবের মূর্তি নাই।

দর্পচূর্ণ হওয়াতে গঙ্গাধর বাবু ত' গুরুদেবের চরণপ্রান্তে গিয়ে পড়লেন। বহুক্ষণ পরে নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে লাহিড়ী মহাশয় অর্থপূর্ণ বাণীতে বললেন, “আমিই সেই আত্মা। তোমার ক্যামেরা কি যা সর্বব্যাপী আর যা দৃষ্টিরও অগোচর, তা'র ছবি তুলতে পারে?”

“তাইত দেখছি—পারে নাইত’ বটে! কিন্তু ঠাকুর, আমার ক্ষুদ্র দৃষ্টিতে কেবলমাত্র যে দেহ মন্দিরটিতে আত্মা পূর্ণভাবে বিরাজমান বলে মনে হয়, তা'র ছবিটি পে'তে যে বড়ই ইচ্ছে করছে।”

“তা' হলে কাল সকালে এসো, তোমার জন্যে আমি বসব।” আবার ফটোগ্রাফার মহাশয় ছবি তুললেন। এবার কিন্তু সেই পুণ্যমূর্তি রহস্যময় অদৃশ্যাবরণ থেকে মুক্ত হয়ে প্লেটের উপর অতি সুস্পষ্ট ভাবে প্রকাশিত হ'ল। এরপর লাহিড়ী মহাশয় আর কোন ফটোগ্রাফ তোলাবার জন্যে বসেন নি। অন্ততঃ আমি ত' তাঁ'র আর কোন ছবি দেখিনি।

ফটোগ্রাফটি এই পুস্তকে সন্নিবেশিত হয়েছে। সকল দেশের লোকেদেরই উপযোগী গঠন, লাহিড়ী মহাশয়ের গৌরবর্ণ সুন্দর আকৃতি, কোন্ জাতির তা' সহসা বুঝে ওঠা কঠিন। ভূমানন্দলাভের গভীর অনুভূতি তাঁ'র কতকটা রহস্যময় মুহূ হাসিতে ঈষৎ প্রকাশিত। তাঁ'র নয়ন দু'টি অর্দ্ধোন্মীলিত অবস্থায় বহির্জগতের দিকে নাম মাত্র লক্ষ্যবদ্ধ—আবার অর্দ্ধনিমীলিতও বটে। পার্থিব জগতের তুচ্ছ আকর্ষণ সম্পূর্ণভাবে বিস্মৃত হ'য়ে, তাঁ'র রূপাপ্রার্থী আগত নরনারীদের আধ্যাত্মিক উন্নতি বিধানে তিনি কিন্তু সদাই জাগরুক ছিলেন।

লাহিড়ী মহাশয়ের প্রতিকৃতির অলৌকিক শক্তিপ্রভাবে আরোগ্যলাভের অল্পকাল পরেই আমার এক অদ্ভুত আধ্যাত্মিক দর্শন লাভ হয়।

একদিন সকাল বেলায় বিছানায় বসে থাকতে থাকতেই এক গভীর স্বপ্নে মগ্ন হ'লুম। “বদ্ধ চক্ষুর অন্ধকারের অন্তরালে কি আছে” এই ব্যাকুল প্রশ্নই মনের মধ্যে প্রবল ভাবে উদয় হ'ল। সঙ্গে সঙ্গে অন্তঃচক্ষুর সামনে এক বিরাট জ্যোতিঃর স্ফরণ হ'ল। পর্বতগুহার মধ্যে ধ্যানে উপবিষ্ট সাধু-

সন্তদিগের দিব্য মূর্তি সকল আমার ললাটের ভিতর প্রশস্ত জ্যোতিঃপটে সিনেমার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছবির মত প্রতিভাত হ'ল।

চিৎকার করে বলে উঠলুম, “আপনারা কে?” উত্তর এল, “আমরা সব হিমালয়ের যোগী।” সে স্বর্গীয় বাণী বর্ণনা করা কঠিন। হৃদয় আনন্দে উল্লসিত হ'য়ে উঠল।

বললুম, “আমারও অন্তরের একান্ত বাসনা যে, হিমালয়ে গিয়ে আপনাদের মত যোগী হই।” দৃশ্যটি মিলিয়ে গেল। কিন্তু তার রূপালী রশ্মিরেখা ক্রমবর্দ্ধমান বৃত্তাকারে অনন্তের দিকে প্রসারিত হয়ে প'ড়তে লাগল।

প্রশ্ন করলুম, “এই অপূর্ব আলোর ছটা কিসের?” মেঘমন্ডরধ্বনিতে উত্তর এল, “আমিই ঈশ্বর, আমিই জ্যোতিঃ!” বললুম, “তোমার সঙ্গে আমার এক করে নাও।” তা'রপর সেই স্বর্গীয় আনন্দ ধীরে ধীরে মিলিয়ে যে'তে লাগল। তা'র ভিতর থেকে আমি ঈশ্বরানুসন্ধানের প্রেরণা লাভ করবার চিরউত্তরাধিকার খুঁজে পেলুম। “তিনি শাস্ত, তিনি চির নবীন আনন্দ!”—এই স্মৃতি, সেই পরমানন্দ লাভের দি'ন হ'তে বহুকাল স্থায়ী হ'য়েছিল।

*

*

*

*

আর একটি কৈশোরের স্মৃতি আজও আমার মনের মধ্যে জাজ্জল্যমান, কারণ আজ পর্য্যন্তও তার ক্ষতচিহ্ন আমি অঙ্গে বহন ক'রে আসছি।

আমার জ্যেষ্ঠা ভগিনী উমাদিদি আর আমি একদিন সকালে আমাদের গোরক্ষপুরের বাড়ীর উঠানে এক নিমগাছের তলায় বসে আছি। নিকটস্থ টিয়াপাখীদের পাকা নিম ফল খাওয়া দেখার ফাঁকে ফাঁকে একটা বাঙ্গলা শিশুপাঠ্য পুস্তকের সাহায্যে তা'র কাছে আমার পাঠাভ্যাস চলছিল। পায়ে ফোড়া হয়েছে বলে উমাদিদি একটা মলমের শিশি আনলে। মলমের খানিকটা আঙ্গুলে নিয়ে আমিও আমার হাতের ওপর লাগিয়ে দিলুম। উমাদিদি বললে, “শুধু শুধু ভাল হাতে মলম লাগান হ'চ্ছে কেন?” বললুম, “দেখ দিদি, আমার মনে হ'চ্ছে কাল আমার হাতে একটা ফোড়া হ'বে। যে যায়গায় ফোড়াটা বেরবে, সেইখানে তোমার মলমটা লাগিয়ে দেখছি।”

“ধ্যেৎ, মিথ্যুক কোথাকার !”

“দিদি, খবরদার আমার মিথ্যুক বোলো’না যেন, যতক্ষণ না দেখে যে, কাল সকাল বেলা কি হয়।” ক্রোধে আমার অন্তর পরিপূর্ণ হ’য়ে গিয়েছিল। উমাদিদির মনে কিন্তু কোন রেখাপাত হ’ল না। উপরন্তু বার তিনেক ত’ আমার টিটকারী দিলে। স্বরে দৃঢ় সঙ্কল্প প্রকাশ ক’রে ধীরে ধীরে বল্লম, “আমার অন্তরের প্রবল ইচ্ছা শক্তির জোরেই আমি বলছি যে, কাল আমার হাতে ঠিক এই যায়গাটিতেই বেশ বড়গোছের একটি ফোড়া বে’রবে, আর তোমার ফোড়াটি এই সাইজের ঠিক ডবল হ’য়ে ফুলে উঠবে, দেখো।”

সকাল বেলায় দেখা গেল, ঠিক নির্দিষ্ট স্থানটিতে আমার একটি সুপুষ্ট ফোড়া জন্মেছে, আর উমাদিদির ফোড়াটির আকার দ্বিগুণ হ’য়ে দাঁড়িয়েছে! চিৎকার করে দিদি মা’কে বলতে ছুটল, মুকুন্দ একটি যাহুকর হয়ে দাঁড়িয়েছে। মা ত’ সব দেখে শুনে একেবারে অবাচ্ হয়ে গেলেন। তা’রপর গভীর ভাবে আমার বারণ করলেন যা’তে ক’রে আমি কা’রও কোন ক্ষতি ক’রবার জন্যে যেন বাক্যের শক্তির অপব্যবহার না করি। আমিও তাঁ’র উপদেশ সর্বদা স্মরণে রেখে আজ পর্য্যন্ত তা’ পালন ক’রে এসেছি।

আমার ফোড়াটি কাটাতে হ’ল। ডাক্তারের অল্প প্রয়োগের সুস্পষ্ট চিহ্ন এখনও আছে। মানুষের শুধু মাত্র বাক্যের শক্তির নিত্যস্মারক সেই ক্ষতচিহ্ন আমার দক্ষিণ হস্তের উপর আজও বিরাজমান।

উমাদিদির প্রতি ঐ সব সরল আর আপাতনির্দোষ কথাগুলি গভীর একাগ্রতার সঙ্গে উচ্চারিত হ’বার সময় অন্তর্নিহিত শক্তিবলে বোমার মতন বিস্ফোরণ ঘটয়ে, ক্ষতিকর অথচ নিশ্চিত ফল প্রসব করেছিল। পরে অবশ্য আমি বুঝেছিলুম যে, বাক্যের ভিতরকার বিস্ফোরক স্পন্দনশক্তি, সুবিবেচনার সঙ্গে প্রয়োগ ক’রতে পা’রলে মানুষের জীবনকে আপন্নত ক’রতে পারা যায়, আর তা’র ক্রিয়া প্রকাশের জন্যে ক্ষত চিহ্ন উৎপাদন বা তা’র জন্যে ভৎসনালভ, কিছুই প্রয়োজন হয় না।*

*ওঙ্কার ধ্বনি হ’তেই শব্দের অসীম শক্তির উৎপত্তি। এই প্রণব ঝঙ্কারই হ’চ্ছে সকল আণবিক শক্তির মধ্যে নিহিত মহাব্যোমের স্পন্দন শক্তি। কোন বাক্য সুস্পষ্ট অনুভূতি আর গভীর মনঃসংযোগ বলে উচ্চারিত হ’লে—তা’র একটা প্রত্যক্ষ ফললাভ দেখা যায়। কোন ভাবোদ্দীপক

আমাদের পরিবারের সকলে পাঞ্জাবের লাহোর সহরে চলে গেল। সেখানে গিয়ে আমি মা কালীর একখানি পট সংগ্রহ ক'রে নিলুম। সেটিকে আমাদের বাড়ীর বারান্দায় কুলুঙ্গির মত ছোট একটা পুজার বায়গায় স্থাপন করলুম। আমার মনে তখন এই অখণ্ড বিশ্বাস হ'ল যে, সেই পুণ্য-পীঠে যে প্রার্থনাই উচ্চারণ করি না কেন, তা' নিশ্চয়ই সফল হ'বে।

একদিন সেখানে উমাদিদির সঙ্গে দাঁড়িয়ে আছি। দেখলুম যে, সামনের খুব সরু গলির বিপরীত দিকের বাড়ীগুলোর ছাতের ওপর দুটো ঘুঁড়ি উড়ছে।

উমাদিদি আমার একটা ঠোনা দিয়ে বল্লে, “তুমি এত চুপচাপ কেন?” বললুম, “আমি কেবল ভাবছি যে কি আশ্চর্য্য বল দেখি, মা কালীর কাছে যা'ই চাই না কেন তা'ই পা'ব।”

ভগিনী ত' ঠাট্টার হাসি হেসে বল্লে, “আমি চাই যে মা কালী তোমায় ঐ ঘুঁড়ি দু'টি পাইয়ে দেন।”

“তাই বা হ'বে না কেন?” বলে তা' পা'বার জন্যে নীরবে প্রার্থনা শুরু ক'রে দিলুম।

ঘুঁড়ির স্থতোয় বোতলচূর আর শিরিষের মাঞ্জা দিয়ে প্যাচ্ কাটাকাটি

বাক্যের উচ্চৈঃস্বরে বা নীরব আবৃত্তি যে ফলপ্রসূ তা' ‘কুইইজম’ অথবা অনুরূপ মানস চিকিৎসা প্রণালীতে দেখা গেছে। এর গুপ্তরহস্য হ'চ্ছে মনের স্পন্দন শক্তির গতির ক্রমবর্ধন। কবি টেনিসন তাঁর জীবনস্মৃতিতে, সচেতন মন অতিক্রম ক'রে অতীন্দ্রিয় জ্ঞানে পৌছতে পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি কৌশলের বিষয় উল্লেখ ক'রে গেছেন।

টেনিসন লিখেছেন, “ছেলেবেলা থেকে যখন আমি একেবারে একলা থাকতুম—উপযুক্ত কথার অভাবে বলতে গেলে—এক রকম সজাগ তন্দ্রা আমার প্রায়ই আসত। এটা ঘটত আমার নিজের নাম নীরবে বারবার আবৃত্তি ক'রে। তারপর হঠাৎ আমার আত্মজ্ঞানের গহন থেকে, আত্মবোধটাই যেন মিলিয়ে গিয়ে অসীম সত্যায় পরিণত হ'ত। আর এটা কোন রকম বিভ্রান্ত অবস্থা নয়, একেবারে অত্যন্ত সুস্পষ্ট, অতি স্থানিশ্চিত, বাক্যের অতীত অবস্থা—যেখানে মৃত্যু হ'চ্ছে প্রায় একটা হাশ্বকর অসম্ভব ব্যাপার। আর এই ব্যক্তিত্বের নাশে (যদি এ তাইই হয়) একেবারে নিশ্চিহ্ন হ'য়ে বিলোপ পাওয়া বোধ হয় না—তাই কিন্তু একমাত্র সত্য জীবন।” তিনি আরও লিখেছেন,—“এ মনে কোন কুহেলিকাময় অস্পষ্ট আনন্দের সৃষ্টি করে না—এ কিন্তু পরিপূর্ণ স্বচ্ছ মনে এক রকম আশ্চর্য্য অতীন্দ্রিয় অবস্থা।”

খেলা হয়। একপক্ষ অপর পক্ষের ঘুঁড়ি প্যাচ্ কেটে ফেলে দিতে চেষ্টা করে। হুতো কাটা ঘুঁড়ি, ছাতের ওপর দিয়ে হাওয়ায় ভেসে যায় আর তা'ল টুকান বা ধ'রে ফেলাতে প্রচুর আমোদ। যে হেতু উমাদিদি আর আমি বারান্দায় ছিলুম, সে হেতু প্যাচ্কাটা ঘুঁড়ি যে আমাদের হাতে এসে প'ড়বে, তা' একরকম অসম্ভব ব'লেই বোধ হ'ল—কারণ স্বভাবতঃই তা'র হুতো ছাতের ওপরই ঝুলতে থাকবে।

গলির উপরে লোকগুলো ঘুঁড়ির প্যাচ্ কাটাকাটি শুরু ক'রে দিলে। একটার হুতো কাটা যে'তে তৎক্ষণাৎ সেটা আমাদের দিকে ভেসে এল। হঠাৎ হাওয়া কমে যাওয়াতে সেটা মুহূর্তেক স্থির হ'তে বিপরীত দিকের বাড়ীর ছাতের উপর এক মনসা কাঁটার গাছে তা'র হুতো বেশ শক্তভাবে জড়িয়ে গেল, আর আমার ধ'রবার জন্যে বেশ চমৎকার একটা ফাঁস ও তৈরী হ'য়ে গেল। উমাদিদিকে ঘুঁড়িটি উপহার দিলুম।

উমাদিদি বললে, “এ একটা অদ্ভুত দৈব ঘটনা, এ তোমার প্রার্থনার ফল নয়। ঐ ঘুঁড়িটাও যদি তোমার কাছে আসে তবেই আমি তা' বিশ্বাস করতে পারি।” কথার চেয়ে তা'র কালো চোখ দু'টিতে আরও গভীরতর বিশ্বাস ফুটে উঠল।

আমি ক্রমবর্ধমান গভীরতার সঙ্গে প্রার্থনা জানাতে লাগলুম। অপর লোকটি সজোরে টান দিতে হঠাৎ ঘুঁড়িটার হুতো ছিঁড়ে গেল। হাওয়ায় নাচতে নাচতে ঘুঁড়িটা আমার দিকেই ভেসে এল। আমার সহায় সেই ফণীমনসার গাছটি, যা'তে ক'রে আমি ধ'রে ফেলতে পারি, এমন ভাবে ঘুঁড়ির হুতোয় ফাঁসটি বানিয়ে সেটাকে গাছে আটকে ফেললে। এবারেও আমার দ্বিতীয় বিজয় চিহ্নটি উমাদিদিকে উপহার দিলুম।

“সত্যিই না কালী তোমার কথা শোনে! ওরে বাবা, এসব যেন ভেঙ্কি বাজী!” বলে ভয়ত্রস্তা হরিণীর মতই দিদি ছুটে পালাল।

২য় পরিচ্ছেদ

মাতৃবিয়োগ ও মন্ত্রপূত কবচ

মায়ের একান্ত ইচ্ছা ছিল যে আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার বিবাহ দেন। “হায় রে, কবে অনন্ত’র বৌয়ের মুখ দেখে মর্ত্যে স্বর্গস্থ দেখতে পাব,” ব’লে বংশরক্ষার প্রবল আগ্রহে মা’কে প্রায়ই এই রকম করে খেদ প্রকাশ ক’রতে দেখতুম।

অনন্তদা’র পাকা দেখার সময় আমার বয়স বছর এগার। মা কলকাতায় পরমানন্দে বিবাহের আয়োজনে ব্যস্ত। কেবল বাবা আর আমি তখন বেরিলী সহরে আমাদের বাড়ীতে ছিলাম। বছর দুই বাদে বাবা ওখান হ’তে লাহোরে বদলী হ’য়ে গেলেন।

পূর্বে আমি আমার দুই জ্যেষ্ঠা ভগিনী রমা ও উমাদিদির বিবাহে খুব ঘটা দেখেছিলাম। কিন্তু বাড়ীর জ্যেষ্ঠপুত্র ব’লে অনন্তদা’র বিবাহের আয়োজন সত্যিই খুব বিরাট গোছের হ’য়েছিল। প্রত্যহই দেশ বিদেশ হ’তে নানা আত্মীয় কুটুম্ব পরিজনেরা সব এসে পড়ছেন। তাঁ’দের আদর আপ্যায়নে মা খুবই ব্যস্ত। ৫০নং আমহাষ্ট’ ষ্ট্রীটে সত্ত্ব সংগৃহীত একটি প্রকাণ্ড বাড়ীতে তাঁ’দের আরামে থাকবার ব্যবস্থা করা হ’য়েছিল। বিরাট ভোজের নানাবিধ খাদ্যসম্ভার, দাদা যে চতুর্দোলায় চ’ড়ে কনের বাড়ী যাবেন—সেই চতুর্দোলা, রঙীন আলোর সারি, প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড কাগজের হাতী ও উট প্রভৃতি, ইংরাজী, স্কটিশ ও দেশী বাজনার দল, পেশাদারী গাইয়ে বাজিয়ের দল, বিবাহ অনুষ্ঠানের জন্তে ব্রাহ্মণাদি সবই প্রস্তুত।

পিতা ও আমি উৎকুল মনে, বিবাহ উৎসবে ঠিক সময় মত বাড়ীতে গিয়ে হাজির হ’ব ব’লে মতলব করেছিলাম। কিন্তু সেই বিবাহ দিবসের অব্যবহিত পূর্বেই আমি একটা অমঙ্গলসূচক স্বপ্ন দেখলাম।

বেরিলীর বাংলা বাড়ীর চাঁদনীর তলায় বাবার কাছে ঘুমুচ্ছি। রাত

তখন ছপুর। বিছানার ওপর মশারির গায়ে তখন একটা অদ্ভুত ফরফরানির শব্দ শুনে জেগে উঠলুম। মশারির পাতলা কাপড় স'রে গেল, দেখতে পেলুম, সেখানে মায়ের স্নেহময় মুখখানি!

অত্যন্ত চুপি চুপি স্বরে তিনি বললেন,—“মুকুন্দ, তোমার বাবাকে এখুনি ডেকে তো'ল—আর আমার যদি শেষ দেখা দেখতে চাও ত', ভোর চারটের গাড়ী ধ'রে কলকাতায় শীগ'গির রওনা হ'য়ে পড়!” ব'লেই ছায়ার মত মূর্তিটি অদৃশ্য হ'য়ে গেল!

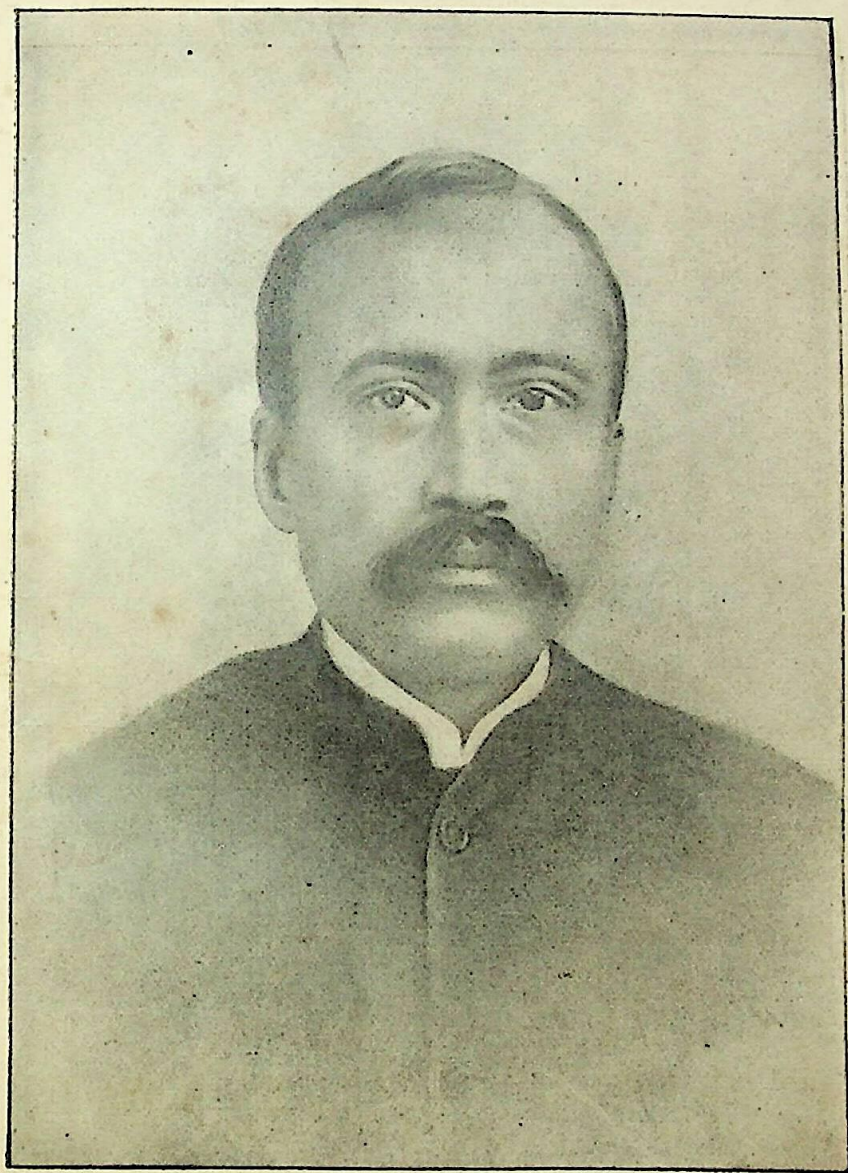
“বাবা, বাবা, মা যে মারা যাচ্ছেন।” আমার ভয়ানক কণ্ঠস্বর তাঁ'কে তখুনি জাগিয়ে তুললে। কান্দতে কান্দতে আমি তাঁ'কে এই নিদারুণ দুঃসংবাদ জানালুম।

ব্যাপারটাকে স্বভাবসিদ্ধ অবিশ্বাসের সঙ্গে গ্রহণ ক'রে তিনি বললেন, “তোমার ও মনের ভুল, কিছু ভেব না, তোমার মা বেশ ভালই আছেন। যদি কোন খারাপ খবরই আসে, তবে কালই আমরা বেরিয়ে প'ড়ব।”

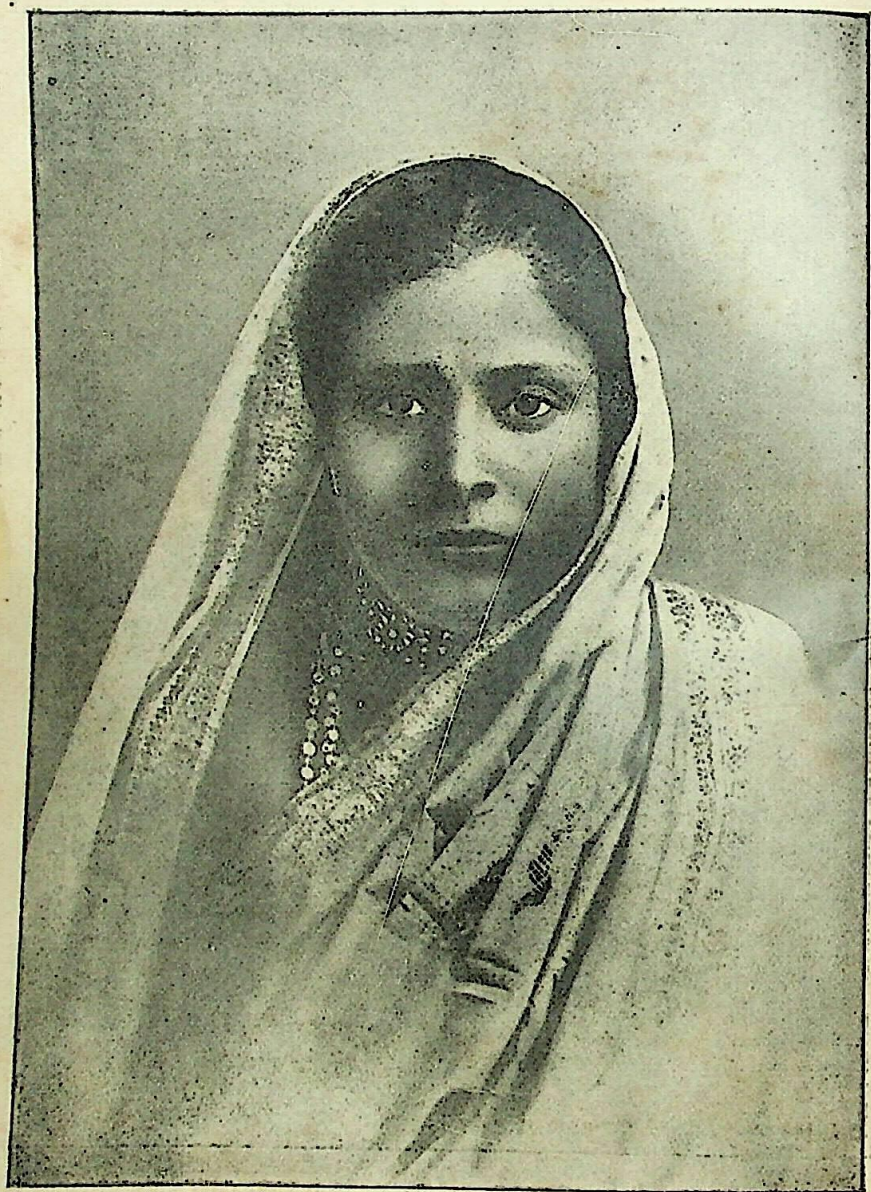
“এখুনি না বে'রুলে আপনি নিজে'কে কোন কালেও ক্ষমা করতে পারবেন না।” মানসিক যন্ত্রণা ও স্ফোভে আমি রাগের চোটে ব'লে ফেললুম, “আমিও আপনাকে কখনও ক্ষমা ক'রতে পারব না।”

বিবাদাচ্ছন্ন প্রাতঃকাল সুস্পষ্ট সংবাদ বহন করে এসে উপস্থিত হ'ল,— “মাতা সাংঘাতিক পীড়িত, বিবাহ স্থগিত, এখনই চলে আসুন।”

বাবা আর আমি পাগলের মত রাস্তায় বেরিয়ে পড়লুম। পথে গাড়ী বদল ক'রবার সময় আমার এক খুড়োম'শায়ের সঙ্গে দেখা হ'ল। একটা টেনে একটি ক্ষীণ বিন্দু হ'তে বিরাট আকার ধারণ করতে করতে বজ্রগর্জনে আমাদের দিকে ছুটে আসতে লাগল। মনের ভিতর দারুণ বিপ্লবের মধ্যে হঠাৎ একটা দৃঢ় সংকল্পের উদয় হ'ল যে, এবার রেল লাইনের উপর লাফিয়ে পড়ি। আমার মনে হ'তে লাগল যে, মা'কে হারিয়ে মরুভূমির মত এই হঠাৎ শূন্য পৃথিবী আর আমি কিছুতেই বরদাস্ত ক'রতে পা'রব না। এ জগতে মা'কেই আমি আমার সবার চেয়ে প্রিয় সাথী ব'লে ভাবতুম। তাঁ'র স্নেহকোমল সান্নাধ্যমধুর কালো চোখ দু'টি আমার শৈশবের তুচ্ছ বিয়োগ-ব্যথার পরম আশ্রয়স্থল ছিল।



মদীয় পিতৃদেব—ভগবতী চরণ ঘোষ



মদীয়া মাতৃদেবী

খুড়ো মহাশয়কে একটি মাত্র শেষ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা ক'রবার জন্তে দাঁড়িয়ে বসলুম, “মা কি এখনও বেঁচে আছেন?” তিনিও আমার মুখে দারুণ হতাশার ভাব লক্ষ্য ক'রে তৎক্ষণাৎ সাঙ্ঘনাচ্ছলেই বসলেন, “নিশ্চয়ই, তিনি বেঁচে আছেন বই কি।” আমি কিন্তু তা' সম্পূর্ণ বিশ্বাস করতে পারলুম না।

কলকাতার বাড়ীতে পা দিতেই হৃদয়স্তম্বনকারী মরণরহস্যের সম্মুখীন হ'য়ে এসে দাঁড়ালুম। আমি ত' অবসন্ন হ'য়ে মৃতপ্রায় হ'য়ে পড়লুম। জীবনের এই প্রথম নিদারুণ আঘাত মনকে একেবারে অসাড় করে তুললে। মনের স্বাভাবিক স্বেচ্ছা আবার ফিরে আসতে আমার বহুবৎসর কোটে গিয়েছিল।

স্বর্গের দুয়ার ভেদ করেই যেন আমার আন্তর্জন্মন অবশেষে জগন্মাতার চরণ প্রান্তে গিয়ে পৌঁছল। মনের রক্তবরা ক্ষতস্থানে কে যেন পরম শান্তির স্নিগ্ধ প্রলেপ বুলিয়ে দিলে। জগজ্জননীর অভয়বাণী কানে এসে পৌঁছল—“বহু জনমের বহু জননীর স্নেহের ভিতর দিয়েই আমি তোমার ওপর দৃষ্টি রেখে এসেছি। এ জনমের তোমার মা'য়ের সুন্দর কালো চোখ দু'টি যা' তুমি আজ হারিয়ে ফেলেছ, চেয়ে দেখ, আমারই দৃষ্টিতে তুমি তা' আবার খুঁজে পাবে!”

পরম স্নেহময়ী জননীর শ্রদ্ধাশান্তির পর, পিতা আর আমি আবার বেরিলীতে ফিরে গেলুম। আমাদের বাংলোর সামনে যেখানে সোনালী সবুজ ঘাসে ঢাকা সমতল মাঠের ওপর একটি বড় শিউলী গাছ ছায়া বিস্তার করে রয়েছে—সে যায়গাটা বেছে নিলুম। প্রতাহ সকালে সেখানে যেতুম শোকের সেই পুণ্যস্মৃতিতীর্থ দর্শনের জন্তে। কবিকল্পনায় মনে হ'ত, যেন শুভ্র শেফালীগুচ্ছ স্বতঃ উৎসারিত ভক্তি নিবেদনে নিজেদের উৎসর্গ ক'রে তৃণবেদীর উপর ছড়িয়ে পড়েছে! শিশিরের সঙ্গে অশ্রুধারা মিলনে আমি দেখতে পেতুম যে, অগ্নি জগতের একটি অপরূপ আলো যেন উনার অরুণাঞ্চল হতে ক'রে পড়ছে। ঈশ্বরলাভের দারুণ আকাঙ্ক্ষার গভীর যন্ত্রণা আমায় অভিভূত করে ফেলত। হিমালয় যেন আরও দৃঢ়ভাবে আমায় আকর্ষণ করছে অমুভব করতুম।

পুণ্যশৈল হিমাচল প্রদেশ ভ্রমণ শেষ ক'রে, আমার এক জ্ঞাতি ভাই বেরিলীতে আমাদের বাড়ীতে এসে উপস্থিত হ'লেন। যোগীশ্বরবিশ্বদেব আবাসস্থল তুঙ্গশীর্ষ সেই সব পার্বত্য প্রদেশের অপূর্ণ কাহিনী সকল আমি তাঁ'র কাছ থেকে অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গেই শুনতুম।

আমাদের বেরিলীর বাড়ীওয়ালার ছোট ছেলে দ্বারকাপ্রসাদের কাছে একদিন প্রস্তাব করলুম, “চল, হিমালয়ে পালান যা'ক।” কিন্তু সে কথা সে ত' কানেই তুলে না, বরং উল্টে বড়দা'র কাছে আমার সব মতলব ফাঁস ক'রে দিলে। বড়দাদা তখন বাবাকে দেখতে বেরিলীতে এসেছেন। নিতান্ত ক্ষুদ্র বালকের এইসব অসম্ভব পরিকল্পনা একটু লঘুভাবে হেসে উড়িয়ে দে'বার পরিবর্তে অনন্তদা', আমাকে ঠাট্টা করবার মতলবে বললেন, “তোমার গেকুরা বসন আগে কোথায় হে? এঁ্যা,—তা' ছাড়া ত' তুমি আর সন্ন্যাসী হ'তে পার না!”

কিন্তু আশ্চর্য্য! তাঁ'র এই কথাগুলোতে আমি কিন্তু এক অবর্ণনীয় আনন্দে উল্লসিত হ'য়ে উঠলুম! কথাগুলো যেন আমার সন্ন্যাসী বেশে ভ্রমণের একটা সুস্পষ্ট ছবি ফুটিয়ে তুলে। বোধ হয় তা'তেই আমার অতীত জীবনের একটা লুকোন স্মৃতি মনের মধ্যে জেগে উঠেছিল। যা'ই হো'ক আমি দেখতে পেলুম যে, কত সহজে আর কত শীগ'গির আমি প্রাচীন সন্ন্যাস আশ্রমের চিহ্ন গৈরিক বসন ধারণ ক'রবার সুযোগ পা'ব।

একদিন সকালে দ্বারকার সঙ্গে কথা বলতে বলতে টের পেলুম যে, ঈশ্বর-প্রেমের বশা যেন আমার অন্তরে মহাপ্লাবনের বেগে নেমে আসছে। বাক্যালাপের উচ্ছ্বাসে আমার সঙ্গীর মন তখন আংশিক সন্ধিবিষ্ট—আমি কিন্তু সে সময় অন্তরে কাণ পেতে কা'র নীরব বাণী শুনছিলাম।

সেই দিন বৈকালেই আমি হিমালয়ের পাদদেশে নৈনিতাল সহরে-পলায়ন ক'রলুম! অনন্তদা'ও দৃঢ় সঙ্কল্প নিয়ে আমার পিছু পিছু এসে আমায় ধ'রে ফেললেন। বিনম্রচিত্তে বেরিলীতে আবার ফিরে আসতে বাধ্য হ'লুম। একমাত্র তীর্থভ্রমণের অনুমতি ছিল, আমার সেই অত্যন্ত শিউলী তলায় সকাল বেলায় বেড়াতে যাওয়া। আপন জননী আর জগজ্জননী এ দুজনকেই আজ হারিয়ে আমার অন্তর কেঁদে কেঁদে ফিরতে লাগ'ল।

মায়ের মৃত্যুতে পারিবারিক বন্ধনে যে শূন্যতা এল তা' অপূরণীয়। পিতা তাঁ'র জীবনের অবশিষ্ট প্রায় চল্লিশ বৎসরের মধ্যে দ্বিতীয়বার আর দার-পরিগ্রহ করলেন না। দেখা গেল, তাঁ'র ক্ষুদ্র শিশুদের একাধারে পিতা-মাতার দায়িত্ব গ্রহণ ক'রে, তিনি আরও স্নেহকোমল আরও অনায়াসগম্য হ'য়ে উঠলেন। ধীরতা ও গভীর অন্তর্দৃষ্টির সাহায্যে তিনি বহু পারিবারিক সমস্যার সমাধান করে ফেলতেন। অফিস হ'তে ফে'রবার পর তিনি নিজের ঘরে ঢুকে কঠিনব্রত তাপসের মত একটা মিশ্র প্রশান্তির মধ্যে ক্রিয়াযোগাভ্য-শীলানে রত হ'তেন। মায়ের মৃত্যুর বহুকাল পরে পিতা যা'তে জীবনে আর একটু আরাম পান, আর একটু স্বাচ্ছন্দ্য লাভ করেন, সে জন্তে তাঁ'র সুখসুবিধার খুঁটিনাটি ব্যবস্থায় একটু লক্ষ্য রাখবার জন্তে একজন ইংরেজ নাস' রেখে দেবার চেষ্টা করেছিলেন। বাবা কিন্তু মাথা নেড়ে বারণ করলেন।

জীবনব্যাপী স্নগভীর প্রীতিতে মিশ্র তাঁ'র দৃষ্টি স্তূদুরে প্রসারিত ক'রে তিনি বললেন, “তোমার মায়ের যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই আমারও সেবা যত্ন সব যুচে গেছে। আর আমি অত্র কোন স্ত্রীলোকের পরিচর্যা গ্রহণ ক'রব না।”

মায়ের স্বর্গারোহণের প্রায় মাস চৌদ্দ পরে জানতে পারলুম যে, মা আমার জন্তে একটি বিশেষ প্রয়োজনীয় কথা ব'লে গেছেন। অনন্তদা' তাঁ'র মৃত্যুশয্যাপাশ্বে উপস্থিত ছিলেন এবং তিনিই সেই কথাগুলো লিখে রেখেছেন। যদিও মা বছর খানেকের মধ্যেই আমার কাছে ঐ কথাগুলো প্রকাশ ক'রে বলতে ব'লেছিলেন, কিন্তু অনন্তদা' তা' করেন নি, দেবী করছিলেন। কিন্তু এবার তাঁ'কে বেরিলী ছেড়ে কলকাতায় যেতে হ'বে—মায়ের সেই পছন্দ করা মেয়েটিকে বিবাহ করবার জন্তে, কাষেই একদিন সন্ধ্যায় সময় আমার কাছে ডেকে বসেন, “মুকুন্দ, আমি তোমায় এ অদ্ভুত খবরটা দিতে অনিচ্ছুকই ছিলাম।” তাঁ'র স্বরে হতাশা ও নিরুপায়ের ভাব,—“আমার বড় ভয় ছিল যে, এতে তোমার বাড়ী থেকে পালানর মতলব আবার জেগে উঠ'বে। কিন্তু যাই হো'ক, মন তোমার এখন দৈব উদ্দীপনায় পূর্ণ। হিমালয়ের রাস্তা থেকে সম্প্রতি তোমায় যখন পাক্‌ড়ে আনলুম, তখনই মন একেবারে স্থির ক'রে ফেললুম। এবার আমি আমার গুরু প্রতিজ্ঞা পূরণ ক'রতে আর বেশী দেবী ক'রব না।” এই ব'লে অনন্তদা' আমার

হাতে একটি ছোট বাক্স দিয়ে দিলেন। মায়ের কথিত বিবরণের সম্পূর্ণ লেখাটি তাঁর মধ্যে ছিল।

মা বলেছিলেন, “আমার আদরের মুকুন্দ, এই কথাগুলোই তোমার কাছে আমার শেষ আশীর্বাদ। তোমার জন্মের পর কতকগুলো অলৌকিক ঘটনা ঘটেছিল, তা’ বলবার এখনই সময় এসেছে। কোলে যখন তুমি আমার ছোট্ট খোকাটি, তখনই তোমার জন্মে নির্দিষ্ট পথ যে কি, তা’ আমি প্রথম জানতে পারি। সে সময় আমি তোমায় তখন একবার কাশীতে আমার গুরুদেবের কাছে নিয়ে যাই।

“যোগিরাজ লাহিড়ী ম’শায় তখন গভীর ধ্যানে বসে আছেন। চারিদিকে বহু শিষ্য তাঁ’কে ঘিরে আড়াল ক’রে,—অতি অল্পই তাঁ’কে দেখা যাচ্ছিল। কোলে শুইয়ে তোমায় চাপড়াচ্ছি আর মনে মনে নিবেদন করছি, গুরুদেব যেন তোমায় দেখতে পে’য়ে তাঁ’র আশীর্বাদ তোমায় দেন। আমার নীরব প্রার্থনা গভীর থেকে গভীরতর হ’তে তিনি চোখ খুলে আমার দিকে চাইলেন আর তাঁ’র কাছে যে’তে ইঙ্গিত করলেন। সকলে তখন আমায় রাস্তা ক’রে দিতে, আমি তাঁ’র সেই পুণ্যপদতলে দিয়ে প্রণাম করলুম। আমার গুরুদেব তখন তোমায় কোলে বসিয়ে আধ্যাত্মিক দীক্ষাদানের মত তোমার কপালে হাত রেখে বললেন,—‘মা জননি, তোমার ছেলে একটি যোগী হ’বে, আর আধ্যাত্মিক ইঞ্জিনের মত এ বহু লোককে ভগবানের রাজ্যে টেনে নিয়ে যাবে।’

“সর্বদর্শী গুরুদেব কর্তৃক আমার গোপন প্রার্থনা পূর্ণ হওয়াতে, আমার হৃদয় আনন্দে নেচে উঠল। তোমার জন্মাবার কিছু আগেই কিন্তু তিনি আমায় বলেছিলেন যে, তুমি তাঁ’রই পথ অনুসরণ ক’রবে।

“তা’রপর বাছা, তোমার দিদি রমা আর আমি তোমার সেই বিরূপ জ্যোতিঃ দর্শনের কথা জানতে পারি। কারণ পাশের ঘর থেকে তোমায় বিছানার ওপর নিশ্চল অবস্থায় বসে থাকতে দেখে, দেখতে পে’লুম যে, তোমার ছোট্ট মুখখানি স্বর্গীয় জ্যোতিঃতে উদ্ভাসিত। ঈশ্বর লাভের জন্মে হিমালয়ে যাবার কথা বলবার সময় দেখলুম যে, তোমার স্বরে লৌহ কঠিন সঙ্কল্পের দৃঢ় প্রকাশ!

“এই সব রকমে বাছা, আমি টের পেয়েছিলুম যে, তোমার পথ এই সব পার্থিব বাসনা কামনা হ’তে বহুদূরে। আর তা’ ছাড়া আমার জীবনে সবচেয়ে এক আশ্চর্য ঘটনা এ বিশ্বাস আরও দৃঢ়তর ক’রে তুলেছিল। ঘটনাটি এমনই অলৌকিক যে, আমি আজ এই মৃত্যুশয্যায় শুয়েও তোমায় তা’ জানাতে বাধ্য হ’চ্ছি।

“সেটা হ’চ্ছে পাঞ্জাবে থাকতে একটি সাধুর দর্শনলাভ। লাহোরে তখন আমাদের পরিবারের সকলেই রয়েছেন। একদিন সকালে বাড়ীর চাকরটা হঠাৎ আমার ঘরে এসে বললে, ‘মা ঠাকুরণ, একটি অদ্ভুত সাধু আমাদের বাড়ীতে এসেছেন। তিনি বলছেন যে, তিনি মুকুন্দ’র মা’র সঙ্গে দেখা করতে চান।’

“এই নিতান্ত সরল আর সোজা কথাগুলো কিন্তু আমার হৃদয় তন্ত্রীতে গভীর ভাবে আঘাত করলে। আমি তখুনিই সাধুটিকে অভ্যর্থনা ক’রবার জন্তে এগিয়ে গেলুম। পাদস্পর্শ ক’রে প্রণাম ক’রতেই টের পেলুম— আমার সামনে এক সিদ্ধ মহাপুরুষ দাঁড়িয়ে।

“তিনি বললেন, ‘সিদ্ধপুরুষ মহাপুরুষগণ তোমায় জানিয়ে দিতে চান যে, পৃথিবীতে তোমার অবস্থান আর বেশী দিন নয়। এর পরে যে অস্থখে পড়বে তাতেই তোমার শেষ।’* তা’র পর এল এক গভীর নিস্তব্ধতা, তা’র মাঝে আমি এক প্রগাঢ় শান্তির স্পন্দন ছাড়া কোন ভয়ই আর টের পেলুম না। অবশেষে তিনি আমায় বললেন,—‘তোমার কাছে একটি রূপোর কবচ গচ্ছিত থাকবে। এ কিন্তু তোমায় আমি আজ দিয়ে যা’ব না। আমার কথা যে ফলবে, তা প্রমাণ ক’রবার জন্তে, কাল যখন পূজোয় ব’সবে, কবচটি তখন আপনা আপনিই তোমার হাতের মুঠোর ভেতর এসে যা’বে। তোমার মৃত্যুশয্যায় তোমার বড়ছেলে অনন্তকে কিন্তু অতি অবগ্ন ব’লে যা’বে যে, কবচটি এক বছর তা’র কাছে রাখবার পর যেন সে তোমার

*এই কথাগুলির মধ্যে যখন আমি আবিষ্কার করলুম যে, মা তাঁর স্বজায়ুর কথা গোপনে জানতে পেরেছেন, তখনই আমি প্রথম বুঝতে পারলুম যে, কেন তিনি অনন্তদাঁর বিবাহের সব আয়োজন তাড়াতাড়ি শেষ করবার জন্তে তৎপর হ’য়ে উঠেছিলেন। যদিও বিবাহের পূর্বেই তাঁর মৃত্যু ঘটে, তবুও তাঁর মাতৃহৃদয়ের স্বাভাবিক আকাঙ্ক্ষা ছিল—বিবাহ উৎসবটি দেখবার জন্তে।

দ্বিতীয় পুত্র মুকুন্দকে সেটি দিয়ে দেয়। মুকুন্দ এর মর্শ্ব মহাপুরুষদের কাছ হ'তেই জানতে পারবে। পার্থিব আশা, আকাঙ্ক্ষা ত্যাগ ক'রে যখন সেই স্বরানুসন্ধানের জন্তে মনেপ্রাণে প্রস্তুত, প্রায় সেই সময় নাগাদ সে এটা পাবে। কবচটি কিছুকাল ধারণ ক'রবার পর, তা'র উদ্দেশ্য সিদ্ধ হ'য়ে গেলেই কবচটিও অন্তর্দান ক'রবে। যতদূর গোপনীয় স্থানেই লুকিয়ে রাখ না কেন, কবচটি যেখান থেকে এসেছিল, সেখানেই আবার ঠিক ফিরে যাবে।

“আমি সাধুটিকে ভিক্ষাদান ক'রে পরম ভক্তিভরে প্রণাম করলুম। কিন্তু ভিক্ষা গ্রহণ না করেই তিনি আশীর্বাদ ক'রে প্রস্থান ক'রলেন। তা'র পরের দিন সন্ধ্যাবেলায়, ঘোড় হাত করে ধ্যানে বসেছি, এমন সময় ঠিক সেই সাধুটির কথামত একটি রূপোর কবচ আমার হাতের মাঝখানে এসে গেল, —তা' টের পেলুম, বেশ একটা ঠাণ্ডা আর মোলায়েম স্পর্শে। দু' বছরের ও বেশী আমি কবচটিকে অতি যত্নে রেখে এসেছি। এখন অনন্ত'র হাতে দিলুম। আমার জন্ত শোক কো'রোনা মুকুন্দ। গুরুমহারাজ আমায় অনন্তের কোলে নিয়ে যাবেন। চললুম বাবা, মা জগদম্বাই তোমায় রক্ষা করবেন।”

কবচটি পেয়ে যেন অন্তরের জ্ঞানাগ্নিশিখা প্রজ্জ্বলিত হ'য়ে উঠল। বহু স্তম্ভ স্মৃতি জাগরিত হ'ল। গোল মতন পুরান সেই অদ্ভুত ধরনের কবচটির উপর সংস্কৃত অক্ষরে কি সব খোদাই করা ছিল। আমি পরে জানতে পে'রেছিলুম যে, যা'রা অদৃষ্টভাবে আমার জীবন পথে আমায় চালিয়ে নিয়ে যা'চ্ছিলেন, সেই সব পূর্ব জীবনের গুরুমহারাজদের কাছ থেকেই সে'টি এসেছিল। এর অর্থ একটা উদ্দেশ্য বা অর্থ ছিল নিশ্চয়ই, কিন্তু কবচের ভিতরে যে কি আছে তা কেউ সম্পূর্ণ প্রকাশ ক'রে বলে না।

কেমন করে কবচটি অবশেষে আমার জীবনের গভীর দুঃখজনক ঘটনার মধ্যে অন্তর্দান করলে, আর কেমন ক'রেই বা এর হারানতে আমার গুরু লাভের সূচনা হ'ল, এ পরিচ্ছেদে তা'র কথা এখন বলা যায় না। আর তা' বলবার সময়ও এখন আসে নি।

কিন্তু সেই ক্ষুদ্র কিশোরটি হিমালয়ে পলায়নের চেষ্টায় বারম্বার বাধা পেলেও, কবচের পক্ষ বিস্তারের সাহায্যে প্রত্যহ সে বহু দূর দূরান্তেই উড়ে বেড়িয়ে আসত !

৩য় পরিচ্ছেদ

দুই দেহধারী সাধু

(স্বামী প্রণবানন্দ)

পিতাকে একদিন জিজ্ঞাসা করলুম, “আচ্ছা বাবা, আমি যদি বিনা খরপাকড়ে বাড়ী ফেরবার কথা দি’, তা’ হ’লে কি একবার কাশী বেড়িয়ে আসতে পারি ?”

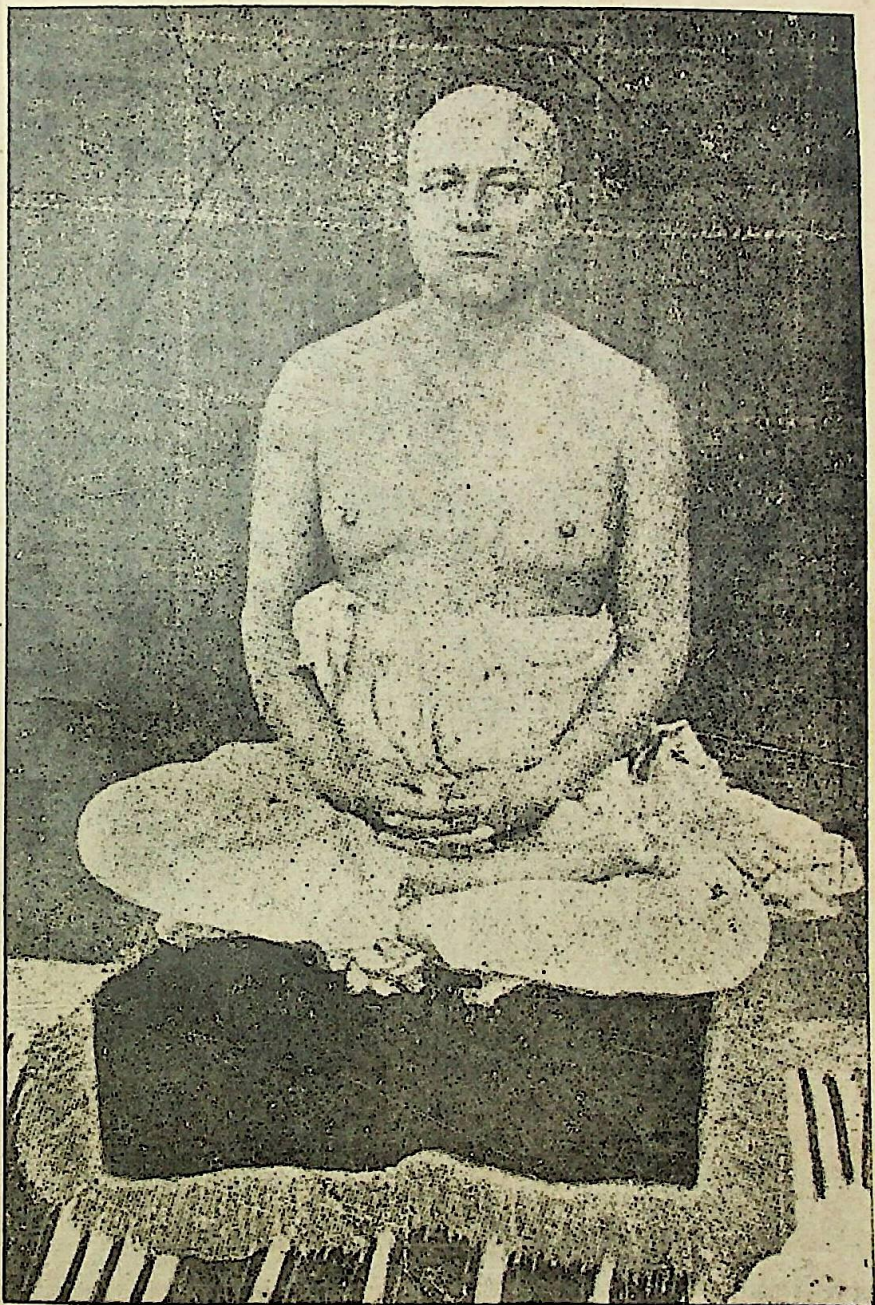
পিতা অবশ্য আমার দেশ ভ্রমণের প্রবল আকাঙ্ক্ষাকে কদাচিৎ বাধা দিতেন। ক্ষুদ্র বালক হ’লেও তিনি আমায় বহু সহর তীর্থস্থান প্রভৃতি বেড়াতে অন্তমতি দিতেন। প্রায়ই দু’ চার জন বন্ধু আমার সঙ্গে যে’ত। আরামে বেড়াবার জন্তে পিতাই আমাদের প্রথম শ্রেণীর পাসের ব্যবস্থা ক’রে দিতেন। পিতা একজন রেলের উচ্চপদস্থ কর্মচারী হওয়াতে আমাদের পরিবারের ভ্রমণবিলাসীদের সুবিধার কারণ হ’য়েছিল।

পিতা আমার অসুস্থরোধ যথোচিত বিবেচনা ক’রে দে’খবেন বলে অঙ্গীকার ক’রলেন। তা’রপরদিন বাবা আমাকে ডেকে বেরেলী হ’তে কাশী যাতায়াতের একখানি পাস, কিছু টাকা আর দু’খানি চিঠি দিয়ে বল্লেন, “কাশীতে গিয়ে আমার বন্ধু কেদারনাথবাবুকে একটি কাষের কথা বলতে হ’বে। দুর্ভাগ্যক্রমে আমি তাঁ’র ঠিকানাটা হারিয়ে ফেলেছি। কিন্তু আমার মনে হয়, আমাদের দুজনের বন্ধু স্বামী প্রণবানন্দের মাধ্যমে তুমি এই চিঠিখানা তাঁ’র কাছে পৌঁছুতে পারবে। স্বামীজি—আমার গুরুভাই, খুব উচ্চ আধ্যাত্মিক অবস্থা লাভ ক’রেছেন। তাঁ’র সঙ্গ লাভ ক’রে তোমার উপকারই হ’বে। আর এই দ্বিতীয় চিঠিখানি হ’চ্ছে তোমার পরিচয় পত্র।” বাবা তারপর একটু চোখ মিটমিট করে বল্লেন, “কিন্তু মনে থাকে যেন, বাড়ী থেকে তোমার আর পালা’ন হ’চ্ছে না, বুঝলে ?”

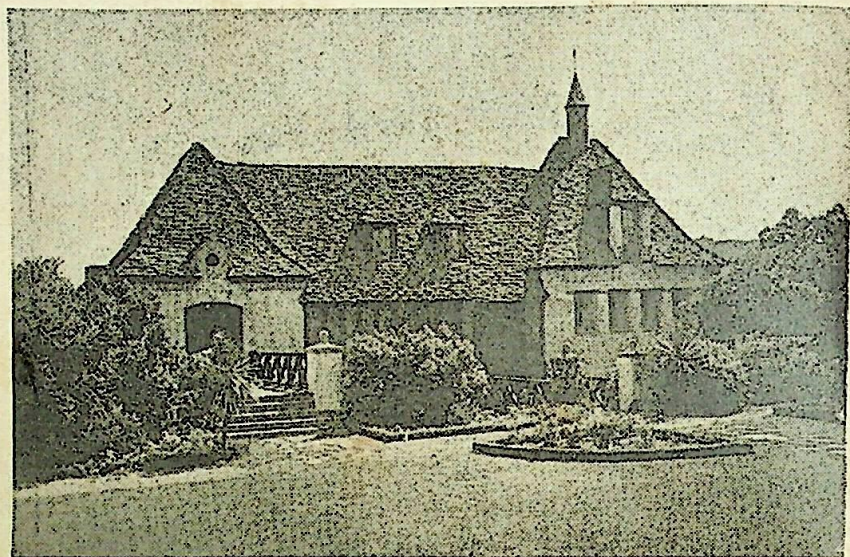
“বার বছর বয়সের প্রবল উৎসাহ নিয়ে আমি বেরিয়ে পড়লুম। (যদিও কালে আমার নতুন দৃশ্য, নতুন মুখ দেখবার আনন্দ ও উৎসাহ কিছুমাত্র হ্রাস ক’রতে পারে নি।) বনারসে পৌছেই আমি স্বামীজির বাড়ীর দিকে এগোলুম। সামনের দরজা খোলা ছিল; তেতলার একটি লম্বা হলের মতন ঘরে গিয়ে প্রবেশ করলুম। কিষ্কিৎ স্থলকায়, কটিবাসমাত্রপরিহিত স্বামীজি একটু উঁচু যায়গায় পদ্মাসনে উপবিষ্ট। তাঁ’র মাথা আর বলিহীন মুখমণ্ডল বেশ পরিস্কারভাবে কামান। স্বর্গীয় হাসি তাঁ’র ওষ্ঠপ্রান্তে খেলা ক’রছে। আমার অনধিকার প্রবেশের সঙ্কেচ দূর ক’রবার জন্তে তিনি চিরপরিচিতের মত আমায় সাদর অভ্যর্থনা ক’রে বল্লেন, “বাবা আনন্দ!” শিশুস্থলভ স্বরে তাঁ’র আন্তরিক সাদর সম্ভাষণ! নতজানু হ’য়ে তাঁ’র পাদস্পর্শ ক’রে প্রণাম ক’রে জিজ্ঞাসা ক’রলুম,—“আপনিই কি স্বামী প্রণবানন্দ?” তিনি মাথা নেড়ে বল্লেন, “হ্যাঁ”। তা’রপর পকেট থেকে বাবার চিঠিখানা বা’র ক’রবার পূর্বেই তিনি বল্লেন, “তুমি কি ভগবতীর ছেলে?” অত্যন্ত আশ্চর্য্য হ’য়ে তাঁ’কে আমার পরিচয় পত্রটি দিলুম, কিন্তু তা’ এখন একেবারেই নিরর্থক ব’লে বোধ হ’ল।

স্বামীজি তখন তাঁ’র অতীন্দ্রিয় দর্শনশক্তির সাহায্যে আমাকে পুনরায় আশ্চর্য্যাম্বিত ক’রে দিয়ে বল্লেন,—“দাঁড়াও, কেদারনাথবাবুকে তোমার জন্তে খুঁজে বা’র ক’রছি।” তারপর চিঠিখানার দিকে একটাবারমাত্র দৃষ্টিপাত ক’রে পিতার বিষয় কয়েকবার প্রীতিভরে উল্লেখ করে বল্লেন, “জান, এখন আমি দু’টি পেন্সন ভোগ করছি। একটি তোমার বাবার সুপারিসে, যা’র জন্তে এককালে আমি রেল অফিসে চাকরী পে’য়েছিলুম; আর একটি বিশ্বেশ্বরের রূপায়, যা’র জন্তে আমি এ সংসারে জীবনের কর্তব্য সকল নিখুঁত-ভাবে শেষ কর’তে পে’রেছি।”

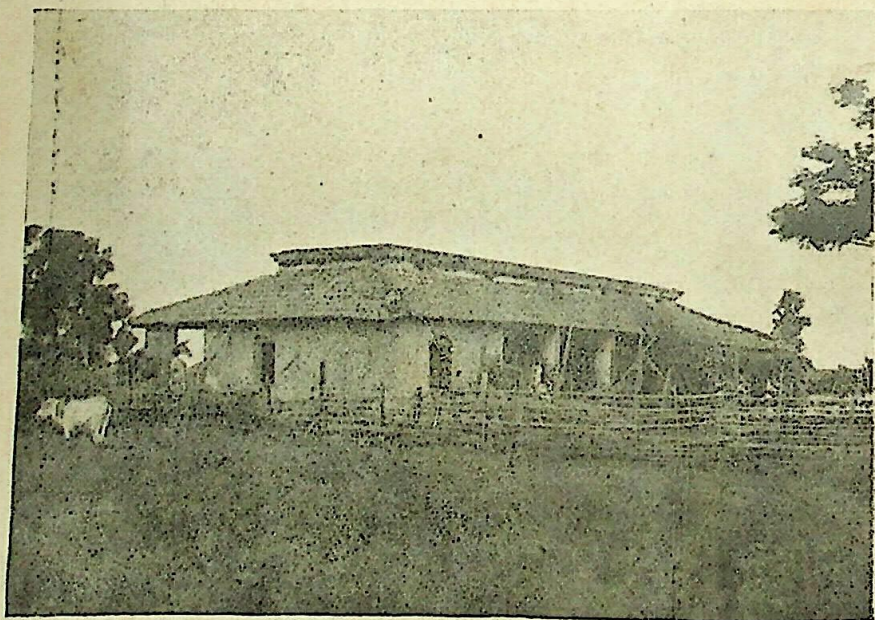
আমার কাছে তাঁ’র এ উক্তি অত্যন্ত দুর্বোধ্য ঠেকল। জিজ্ঞাসা ক’রলুম, “আজ্ঞে কি রকম পেন্সন ম’শায় আপনি বিশ্বেশ্বরের কাছ থেকে পা’ন? তিনি কি আপনার কোলে টাকার তোড়া এনে ফেলে দেন?” শুনে তিনি হেসে উঠে বল্লেন, “আমার পেন্সন মানে সুগভীর শান্তি। আমার বহু বছরের ধ্যানধারণার পুরস্কার। এখন আমার অর্থের প্রতি কোন লালসা নাই।



“दूईदेहधारी साधू”—स्वामी प्रणवानन्द



সেল্ফ-রিয়ালাইজেশন চার্চ অফ অল রিলিজিয়স, লং বীচ, ক্যালিফোর্নিয়া ।



ডিহিকা গ্রামে প্রতিষ্ঠিত প্রথম “যোগদা ব্রহ্মচর্য্য বিদ্যালয়” ।
পশ্চাতেই দামোদর নদ !

আমার সাংসারিক প্রয়োজন অতি অল্পই,—তা' পর্য্যাপ্ত ভাবেই মিটে যায়। এখন নয়, এর পরে তুমি দ্বিতীয় পেন্সনের মানে বুঝতে পারবে।”

হঠাৎ কথাবার্তা বন্ধ করে দিয়ে স্বামীজি গম্ভীর ও নিষ্পন্দ হ'য়ে পড়লেন। একটা গুচ্চ রহস্যময় ভাব যেন তাঁ'কে ঘিরে রইল। প্রথমতঃ তাঁ'র চোখ দু'টি অত্যন্ত উজ্জ্বল হ'য়ে উঠ'ল, যেন দূরে আগ্রহোদ্দীপক কোন কিছু দেখছেন, তা'রপরেই তা' নিশ্চিন্ত হ'য়ে পড়ল। আমি তাঁ'র বাক্‌স্বল্পতাতে একটু যেন সঙ্কুচিত হ'য়ে পড়লুম। এখনও কিন্তু আমায় তিনি এমন কিছুই ব'লেন নি যা'তে ক'রে আমি পিতার বন্ধুর দেখা পা'ব। ঈষৎ চঞ্চল হ'য়ে আমি সেই ঘরের চারদিকে চেয়ে দেখলুম, ঘরে আমরা দু'জন ছাড়া আর কেউ নেই। আমার অলস দৃষ্টি তত্ত্বপোনের নিচে তাঁর খড়ম জোড়ার ওপর নিয়ে পড়ল।

বল্লেন, “ছোট ম'শায়, * কিছু ভেবোনা। তুমি যা'কে দেখতে চাও, তিনি আশ্চর্য্যটার মধ্যেই তোমার সামনে এসে হাজির হ'চ্ছেন।” যোগিবর আমার মনের কথা সব যেন পড়ে নিচ্ছিলেন, যদিও তা' সে সময় বিশেষ কিছু কণ্টিন ছিল না।

আবার তিনি এক দুজ্জের স্তব্ধতার মধ্যে মগ্ন হ'য়ে গেলেন। ঘড়িতে দেখলুম তখন আশ্চর্য্যটাক মাত্র কেটেছে।

স্বামীজি জেগে উঠে বল্লেন, “কেদারনাথবাবু বুঝি দরজার কাছে এলেন?” সিঁড়ি দিয়ে কেউ যেন উপরে উঠে আসছে শুনতে পেলুম। একটা অদ্ভুত অবিশ্বাসের ভাব হঠাৎ মনের মধ্যে উদয় হ'ল। বিক্ষিপ্ত চিন্তা সকল মনের মধ্যে বিশৃঙ্খলভাবে ধাবিত হ'তে লা'গল। ভাবলুম, “লোক না পাঠিয়ে বাবার বন্ধুকে এখানে কেমন করে ডেকে আনা সম্ভবপর হ'ল? আমার আসার পর স্বামীজি ত' আমি ছাড়া আর কাউকে কোন কথাই ব'লেন নি।”

হঠাৎ সেই ঘর ছেড়ে সিঁড়ি বেয়ে নেমে পড়লুম। অন্ধপথে একটা ক্ষীণদেহ গৌরবর্ণ মধ্যমাকৃতি ভদ্রলোকের সঙ্গে সাক্ষাৎ হ'ল। দেখলুম অত্যন্ত দ্রুতবেগেই তিনি আসছেন।

*বহু সাধু সন্ন্যাসী আমায় এই বলেই সম্বোধন করতেন।

“আপনিই কি কেন্দরনাথবাবু?” উভেজনায়া আমার স্বর তখন কাঁপছে।

তিনি সন্মুখে হেসে বললেন, “হ্যাঁ, তুমিই না ভগবতীর ছেলে, আমার সঙ্গে দেখা ক’রবার জন্তে এখানে অপেক্ষা করছ?”

“আজ্ঞে হ্যাঁ, কিন্তু ম’শায়, আপনি এখানে এলেন কি করে? এঁয়া?” তাঁ’র রহস্যময় আবির্ভাবে আমি একেবারে হতবুদ্ধি হ’য়ে গিয়েছিলুম।

তিনি তখন বলতে লাগলেন, “আজ দেখছি যে সবই অদ্ভুত! ঘণ্টা খানেকেরও কিছু কম হ’বে এই খানিকক্ষণ আগে, গঙ্গায় সবেমাত্র স্নানটি সেরে উঠেছি, এমন সময় স্বামী প্রণবানন্দজী আমার কাছে এলেন। আমি ত’ কল্পনাই করতে পারি নি যে, আমি যে তখন সেখানে ছিলাম, তা’ তিনি জানলেন কি ক’রে? প্রণবানন্দজী বললেন, ‘ভগবতী বাবুর ছেলে তোমার জন্তে আমার ঘরে অপেক্ষা করছে। সঙ্গে আসবে না কি?’ আমি সানন্দে রাজী হ’লুম। হাত ধরাধরি ক’রে চলেছি; খড়ম পায়েই কিন্তু স্বামীজি আমায় আশ্চর্যভাবে ছাড়িয়ে এগিয়ে চললেন, পায়ে যদিও আমার তখন ঐ মজবুত জুতো জোড়াটা পরা!

“প্রণবানন্দজী হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ে’ জিজ্ঞাসা ক’রলেন, ‘আমার ওখানে পৌঁছতে তোমার কতক্ষণ লাগবে?’

“‘প্রায় আধঘণ্টা।’ ‘আমার এখন একটু কাষ আছে।’ ব’লে তিনি একটি রহস্যময় দৃষ্টি নিক্ষেপ ক’রে বললেন, ‘তোমার ফেলেই আমায় এখন এগোতে হ’বে। তুমি আমার বাড়ীতে এসো, সেখানে ভগবতীর ছেলে আর আমি তোমার জন্তে অপেক্ষা করছি।’

“আমি কোন কিছু আপত্তি তোলবার আগেই তিনি তাড়াতাড়ি আমাকে ছাড়িয়ে গিয়েই ভিড়ের মধ্যে একেবারে অদৃশ্য হ’য়ে গেলেন। আমি তা’ই এখানে যত শীগগির সম্ভব তাড়াতাড়ি চলে এসেছি।”

এই কৈফিয়তে আমি ত’ আরও হ’তবুদ্ধি হ’য়ে গেলুম। জিজ্ঞাসা করলুম, তিনি স্বামীজীকে কতদিন ধ’রে জানেন।

বললেন, “গেল বছরে বার কতক দেখা হ’য়েছিল মাত্র। কিন্তু সম্প্রতি নয়। যাই হো’ক স্নানের ঘাটে তাঁ’কে দেখতে পেয়ে ভারি আনন্দ হ’ল।”

শুনে বললুম, “কানে ত একথা বিশ্বাস হয় না! আমার মাথা কি গুলিয়ে

বাচ্ছে, এঁয়া ? আপনি কি তাঁকে স্বপ্নে দেখেছিলেন, না সত্যি সত্যিই তাঁকে প্রত্যক্ষ করেছিলেন, তাঁর হাত ধরে ছিলেন বা পায়ের শব্দ শুনে পেয়েছিলেন ?”

তিনি ত’ একেবারে চটে উঠে বললেন, “তুমি কি যে বলছ, তা’ বুঝিনে ! তোমার কাছে মিথ্যা বলছিলাম, তা’ জেন। আর এ কি তুমি বুঝতে পারছ না যে, একমাত্র স্বামীজি মারফত না হ’লে কি আমি জানতে পাবতুম যে তুমি আমার জন্তে এখানে অপেক্ষা করছ ?”

“কি আশ্চর্য্য ! উনি স্বামী প্রণবানন্দজী কিছু আমার এখানে ঘণ্টা খানেক আসার পর থেকে এক মুহূর্তের জন্তেও কোথাও নড়েন নি বা আমার চোখের আড়াল হ’ন নি।” বলে ত’ আমি সব ব্যাপারটাই প্রকাশ করে ফেললুম।

তিনি চক্ষু বিস্ফারিত করে বললেন,—“এঁয়া, আমরা কি এই জড়ের যুগে বাস করছি, না স্বপ্ন দেখছি ? জীবনে এমন অদ্ভুত ঘটনা দেখব বলে ত’ কখনও আশা করি নি। ভেবেছিলুম যে স্বামীজি নিতান্তই একজন সাধারণ গোছের লোক মাত্র ! এখন দেখতে পাচ্ছি যে, তিনি আর একটি স্বতন্ত্র দেহ ধারণ করে তা’ দিয়ে কাষ করতে পারেন।” দু’জনে আমরা সাধুজীর ঘরে প্রবেশ করলুম।

কেদারবাবু ফিস্ ফিস্ করে বললেন, “দেখ, দেখ, ঐ খড়ম জোড়াটা প’রেই তিনি ঘাটে গিয়েছিলেন। আর এখন যেমন দেখছি, ঠিক অমনিই তাঁর কোপীন পরা ছিল।”

কেদারবাবু তাঁর সামনে এসে প্রণাম করতেই তিনি হেঁয়ালির হাসি হেসে আমার বললেন, “তোমাদের এতে সন্তোষিত হ’য়ে যাবার কি আছে বল ত’ ? সত্যিকারের যোগীদের কাছে প্রত্যক্ষ আর অপ্রত্যক্ষ জগতের মধ্যে স্থল্ল ঐক্যের সম্বন্ধ কিছুমাত্র লুকোন নেই। আমি এখান থেকে মুহূর্তমধ্যে সূদূর কলকাতায় গিয়ে আমার শিষ্যদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে কথাবার্তা বলে আসতে পারি, আর তা’রাও ইচ্ছামাত্র এইভাবে সব রকম জড়বাধা অতিক্রম করতে পারে।”

সম্ভবতঃ স্বামীজি আমার তরুণ হৃদয়ে আধ্যাত্মিক উদ্দীপনা জাগিয়ে

দানের কথা শ্রবণ করে ধন্যবাদ দিতে গিয়েছিলুম। সেখানে গিয়ে কিছু আমায় আর একটি ব্যাপার উল্লেখ করতে হ'ল।

“গুরুদেব, আমি যে আর অফিসের কায কর্ম করতে পারিনে। দয়া করে আমায় রেহাই দিন। ব্রহ্মানন্দপানে মন সদাই বিভোর।”

“তোমার আফিস থেকে পেন্সন নাও।”

“এত অল্পদিনের চাকরী, কি কারণ দেখিয়ে বল্ব, বলুন।”

“যা মনে হয় তাই বো'লো।”

“তা'র পরদিন ত' দরখাস্ত ক'রে দিলুম। ডাক্তার আমার অসময়ে দরখাস্ত করার কারণ জিজ্ঞাসা করতে বল্লুম, ‘কায করতে করতে মেরুদণ্ডের* ভিতর দিয়ে কেমন যেন একটা প্রচণ্ড টান ওপর দিকে ঠেলে উঠছে বলে মনে হয়, আর সেটা সারা শরীরে ছড়িয়ে প'ড়ে আমায় একেবারে অকেবো করে দেয়।’

“আমায় আর দ্বিতীয় প্রশ্ন না ক'রে ডাক্তার খুব ভাল ভাবে আমার জন্তে পেন্সনের সুপারিস ক'রে দিলেন। আর তা' শীগগিরই পেয়ে গেলুম। আমি জানি যে লাহিড়ী মহাশয়ের দৈব ইচ্ছাই ডাক্তারের ভিতর আর তোমার পিতা প্রভৃতি উচ্চপদস্থ রেলকর্মচারীদের ভিতর দিয়ে কায করছিল। তাঁ'রা সেই মহাগুরুর দৈব নির্দেশ স্বতঃপ্রবৃত্ত হ'য়ে পালন ক'রে, সেই প্রাণের ঠাকুরের সঙ্গে অথও মিলনানন্দ সন্তোগের জন্তে আমার জীবনে মুক্তি এনে দিলেন।”†

এই অপূর্ব ঘটনা প্রকাশ ক'রবার পর প্রণবানন্দজী সুদীর্ঘকাল তুষ্টিস্তাব অবলম্বন ক'রে বসে রইলেন। ভক্তিতরে তাঁ'র পাদস্পর্শ করে বিদায় নেবার সময় তিনি আশীর্বাদ ক'রে বল্লেন, “তোমার জীবন ত্যাগ ও যোগমার্গ অবলম্বন ক'রবার জন্তে! তোমার বাবা আর তোমার সঙ্গে পরে আবার

* গভীর ধ্যানেতে প্রথম ব্রহ্মহুতুরি আবির্ভাব হয় মেরুদণ্ডের বেদীতে, তা'রপর হয় মস্তিষ্কের ভিতর। সে পরমানন্দের মহাপ্লাবনের বেগ ছুঁঁবার কিন্তু যোগী তাঁ'র বহিঃপ্রকাশের সংযমন শিক্ষা করেন।

† অবসর গ্রহণের পর প্রণবানন্দজী শ্রীমন্তগবলীতার একখানি গভীর পাণ্ডিত্যপূর্ণ টিকা রচনা করেন। এর বাংলা আর হিন্দী সংস্কারণ বেরিয়েছে।

আমার ফের দেখা হ'বে।” কিছুকাল পরে তাঁ'র এ দু'টি ভবিষ্যদ্বাণীই সফল হ'য়েছিল।

কেদারনাথ বাবু সন্ধ্যার ঘনায়মান অন্ধকারে আমার পাশে পাশে চলে লাগলেন। বাবার চিঠিখানি তাঁ'র হাতে দিলে, তিনি সেটি রাস্তার আলোয় পড়ে বললেন, “তোমার বাবা প্রস্তাব ক'রে পাঠিয়েছেন যে, তাঁ'দের রেল কোম্পানীর কলকাতার অফিসে আমি একটি পদ গ্রহণ করি। স্বামী প্রণবানন্দজী যে সব পেন্সন ভোগ করছেন, তা'র মধ্যে অন্ততঃ একটা হ'লেও তা' কত না আরামের হ'ত, বলত'! কিন্তু তা' ত' হ'বার নয়, আমি যে বনারস ছাড়তে পারি না। হায় রে, আমার ত' আর দু'টো শরীর এখনও হয় নি!”

৪র্থ পরিচ্ছেদ

হিমালয় পলায়নে বাধা

“হ্যাঁ হোক একটা তুচ্ছ অছিলা ক’রে ক্লাস থেকে স’রে পড়বে, আর একটা ঠিকে গাড়ী ভাড়া ক’রে এনে গলির মধ্যে এমন যায়গায় দাঁড় করাবে, যা’তে আমাদের বাড়ীর কেউ যেন না তা’ দেখতে পায়, বুঝলে?”

এই বলে ত’ অমর মিত্রকে আমার পাকা মতলব বাতলে দিলুম। সে ছিল আমার ইন্স্কুলের বন্ধু আর হিমালয় পলায়নে আমার সঙ্গী হ’বারও মতলব এঁটেছিল! স্থির হ’য়েছিল পরের দিন আমরা দুজনে পলায়ন ক’রব।

সাবধানতার বিশেষ প্রয়োজন ছিল, কারণ অনন্তদা’র দৃষ্টি ছিল অত্যন্ত সতর্ক। পালাবার মতলব যে আমার মনে অত্যন্ত প্রবল, তা’ ঠিকই সে সন্দেহ ক’রেছিল। তাই সেটাকে কাঁসিয়ে দে’বার জন্তে সে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হ’ল। কবচটির প্রভাব, আধ্যাত্মিক বীজের মত নীরবে আমার মধ্যে কাষ ক’রে চলেছিল। স্বপ্নে যা’র মুখ প্রায়ই দেখতে পেতুম, সেই গুরুকে হিমালয়ের তুবারের মধ্যেই খুঁজে পা’ব ব’লে, মনে আশা হ’য়েছিল।

পরিবারের সকলেই এখন কলকাতায় বাস ক’রছেন, কারণ বাবা এখন পাকাপাকি ভাবে এখানে বদলী হ’য়ে এসেছেন। আমাদের ৪নং গড়পার রোডের বাড়ীতে থাকবার জন্তে অনন্তদা’ তাঁ’র বৌকে নিয়ে এলেন। সেখানে একটি চিলে কোঠায় আমি নিত্য নৈমিত্তিক ধ্যান ধারণা আর ঈশ্বরলাভের সাধনায় মনকে নিয়োজিত ক’রে রাখলুম।

অশুভ বৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে সেই স্বরণীয় প্রভাত এসে উপস্থিত হ’ল। রাস্তায় অমরের গাড়ীর চাকার শব্দ শুনে আমি তাড়াতাড়ি একটা কবল, একজোড়া খড়ম, লাহিড়ী মহাশয়ের ছবি, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, একছড়া জপের মালা আর গোটা দুই কোপীন একটা পুঁটুলিতে বেঁধে নিলুম। পুঁটুলিটা চারতলার জানালা গলিয়ে নিচে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে তাড়াতাড়ি

সিঁড়ি বেয়ে নেমে পড়লুম। যা'বার সময় খুড়ো ম'শায়ের পাশ কাটিয়ে যেতে হ'ল, দেখলুম তিনি মৎস্য ক্রয়ে ব্যস্ত !

“এত তাড়া কিসের গো, এঁ্যা ?” বলতে বলতে তিনি তাঁ'র সন্দিগ্ধ দৃষ্টি আমার সর্ব্বশরীরের ওপর একবার বুলিয়ে নিলেন।

কিছু না বলে আমি নিতান্ত নিরীহ ভাবে হেসে রাস্তার দিকে এগিয়ে পড়লুম। পুঁটুলিটি সংগ্রহ ক'রে আমি অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে অমরের কাছে গিয়ে হাজির হ'লুম। তা'রপর গাড়ীতে ক'রে ধর্ম্মতলার চাঁদনী চকে গিয়ে পৌছলুম।

মাসের পর মাস ধ'রে আমরা সাহেবী পোষাক কেনবার জন্তে জল খাবারের পয়সা বাঁচিয়ে আসছিলাম, কারণ আমার অত্যন্ত চালাক জ্যেষ্ঠ-ভ্রাতাটি পাকা ডিটেক্টিভের মত আমাদের ধ'রে ফেলবে ভেবে মনে ক'রেছিলাম যে, সাহেবী পোষাকেই তা'কে ঠকান যাবে।

ষ্টেশনে যা'বার পথে যতীনদা'র (আমার খুড়তুতো ভাই, যতীন ঘোষ) জন্তে দাঁড়ালুম। তিনিও এ পথে নূতন এসেছেন, হিমালয়ে গুরু ধোঁজবার জন্তে। সদ্য সংগৃহীত নূতন স্লট একটি তিনি পরিধান ক'রলেন—আশা হ'ল, ছদ্মবেশ খুব ভালই হয়েছে। একটা গভীর তৃপ্তি আর উল্লাসের মলয় বাতাস মনের মধ্যে বইতে লাগল।

“এখন চাই কেবল একজোড়া ক্যাম্বিসের জুতো।” এই ব'লে ত' তা'দের একটা রবারের জুতোর দোকানে নিয়ে গিয়ে তুললুম। “চামড়ার জিনিষ, যা' সব কেবল জীব হত্যা ক'রেই তৈরী করা হয়, সে সব এ পুণ্য যাত্রায় সঙ্গে থাকা উচিত নয়,” বলে রাস্তায় দাঁড়িয়ে পড়ে গীতা হ'তে চামড়ার মলাট আর টুপীটা হ'তে চামড়ার ষ্ট্র্যাপ খুলে রাস্তায় ফেলে দিলুম।

ষ্টেশনে গিয়ে বর্ধমানের টিকিট কেনা হ'ল। সেখানে হিমাচলপদাশ্রিত হরিদ্বার যা'বার জন্তে গাড়ী বদল ক'রবার মতলব ক'রেছিলাম। টেন যখন আমাদের মনের গতির মতই দৌড়তে আরম্ভ করলে, স্রবো বুবো তখন আমি সঙ্গীদের কাছে আমার মনের ভিতরকার গুটিকতক উজ্জ্বল আশা ব্যক্ত করতে সুরু করলুম। বললুম—“ভাব দি'কি, গুরুর কাছে দীক্ষা নে'বার পর আমরা কেমন ব্রহ্মানন্দ উপভোগ ক'রব ? আর দেহের মধ্যে এমন একটা

আকর্ষণী শক্তি জন্মাবে, যা'তে ক'রে হিমালয়ের জঙ্গলের হিংস্র পশুগুলো পর্য্যন্ত নিতান্ত পোষ্যমানা জন্তুদেরই মত আমাদের কাছে এসে হাজির হ'বে। বাঘগুলো বাড়ীর নিরীহ বিড়ালগুলোর মত আদরের লোভে আমাদের কাছে এসে বসবে।”

এই রকম মস্তব্যে, বাস্তব ও রূপকের একটি মনোরম আশার লোভনীয় চিত্র অঙ্কনে, অমরের মুখে একটা উৎসাহসূচক হাসি ফুটে উঠল। কিন্তু যতীনদা' তা'র দৃষ্টি এড়িয়ে জানালায় ভিতর দিয়ে বাইরে দ্রুত অপস্রয়মান প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলীর মধ্যেই দৃষ্টি নিবদ্ধ করে চুপচাপ ব'সে রইলেন।

সুদীর্ঘ নীরবতা ভঙ্গ ক'রে যতীনদা' কিছুক্ষণ বাদে এই প্রস্তাবটি ক'রে বসলেন—“এস, এখন টাকাটা তিনভাগে ভাগ ক'রে ফেলা যা'ক। বর্দ্ধমানে প্রত্যেকেই নিজের নিজের টিকিট কিনবে, তা' হ'লে স্টেশনে কেউ আর সন্দেহ ক'রতে পা'রবে না যে, আমরা একসঙ্গে পালিয়ে যা'চ্ছি।”

বিন্দুমাত্র সন্দেহ না ক'রে আমি তখনই রাজী হ'য়ে গেলুম। সন্ধ্যার সময় আমাদের ট্রেন বর্দ্ধমানে এসে থামল। যতীনদা' টিকিট ঘরে ঢুকলেন। অমর আর আমি প্ল্যাটফর্মেই ব'সে রইলুম। মিনিট পনের অপেক্ষা ক'রবার পর যতীনদা'কে আর ফিরতে না দেখে তা'র বিস্তর খোঁজাখুঁজি শুরু হ'ল। চারিদিক খোঁজবার পর নিষ্ফল হ'য়ে আমরা ভয়ব্যাকুল কণ্ঠে যতীনদা'র নাম ধ'রে বার বার চিৎকার করে ডাক্তে লাগলুম। আর যতীনদা'! যতীনদা' ততক্ষণ সেই স্টেশনের অন্ধকারের মধ্যে একেবারে বেমানুম অদৃশ্য হয়ে গেছেন!

ব্যাপার দেখে ত' আমার হাত পা ঠাণ্ডা হ'য়ে একেবারে অবশ হ'য়ে এল। হায় রে, ভগবান পর্য্যন্ত এরকম চালাকির ব্যাপারে প্রশ্রয় দেবেন, তা' কি আর জানি? তাঁ'র জন্তেই ত' আমার এই প্রথম বিচিত্র পলায়ন, আর সেই উদ্দেশ্যে আমার এই সমস্ত রচিত মতলব এই বার এই রকম নিষ্ঠুর ভাবেই মাঠে মারা গেল! এটুকুও তিনি দেখলেন না, যাক!

ছোট ছেলেদের মতন তখন কান্না জুড়ে দিয়েছি, বললুম—“অমর, চল আর কি হ'বে, এবার বাড়ী ফেরা যা'ক। যতীনদা'র এ রকম নিষ্ঠুর ভাবে স'রে পড়াটা একটা অত্যন্ত অশুভ লক্ষণ। এবারকার যাত্রা নিষ্ফল হ'তে বাধ্য।”

“এই বুঝি তোমার ভগবানের ওপর টান? একটা সঙ্গীর বিশ্বাস-ঘাতকতার ছোট পরীক্ষা আর তুমি বরদাস্ত ক’রতে পা’র না?”

অমরের এই ব্যাপারকে ভগবানের একটা পরীক্ষা ব’লে উল্লেখ করাতে আমার মন কতকটা শান্ত আর স্থির হ’ল। বর্ধমানের প্রসিদ্ধ মিষ্টান্ন সীতাভোগ আর মিহিদানা সংযোগে ত’ জলযোগটা তখন সে’রে নেওয়া গেল। ঘণ্টাকতকের ভিতরেই আমরা বেরিলী হ’য়ে হরিদ্বারে যা’বার গাড়ীতে চেপে বসলুম। মোগলসরাইয়ে গাড়ী বদল ক’রতে হ’ল। নেমে প্ল্যাটফর্মে অপেক্ষা করবার সময় একটা গুরুতর বিষয়ের আলোচনা শুরু হ’য়ে গেল।

বললুম, “অমর, শীগগিরই হয়ত’ রেলের লোকেরা আমাদের ধ’রে জেরা শুরু ক’রে দিতে পারে। দাদার বুদ্ধির দৌড় যে খুব খাট, তা’ আমি আদৌ মনে করি না! তা’ যা’ হয় হো’ক, মিথ্যে আমি কিছুতেই বলছি নে।”

“মুকুন্দ, তুমি শুধু চুপ করে থে’কো। আমি যখন কথাবার্তা চালা’ব, খবরদার যেন তুমি তখন হেসে ফেল না বা দাঁত বে’র কোরো না, বুঝলে?” সঙ্গে সঙ্গেই এক ইউরোপীয় রেল কর্মচারীর সেখানে আবির্ভাব! হাত নে’ড়ে একটা টেলিগ্রাম দেখাতে তা’র মানে বুঝতে আর বাকী রইল না।

প্রশ্ন হ’ল “তোমরা কি রাগ করে বাড়ী থেকে পালিয়ে যা’চ্ছ?” তা’র ঠিক ঐ কথাগুলোর উত্তরে সজোরে “না” বলতে পে’রে অত্যন্ত স্বস্তি বোধ ক’রলুম। কারণ আমি ত’ জানি যে, “রাগ” নয়, “ঈশ্বরানুরাগ”ই আমার একরূপ অস্বাভাবিক ব্যবহারের কারণ!

কর্মচারীটি অমরের দিকে ফিরলে। তা’দের বুদ্ধির বৃদ্ধ এখন যা’ শুরু হ’ল, তা’তে ক’রে আমার বহু উপদিষ্ট গম্ভীর ঔদাসীনা বজায় রাখা এখন একান্ত কঠিন হ’য়ে দাঁড়াল।

লোকটি বেশ মুরুব্বিয়ানার সুরে বললে “দেখ, যা জিজ্ঞাসা করি, সত্যি ক’রে সব বলবে, বুঝলে? আচ্ছা, তৃতীয় ছেলেটি কোথায় এখন বল দেখি?”

“ম’শায়, দেখছি আপনি ত’ চশমা প’রে রয়েছেন। দেখতে পা’চ্ছেন না কি যে, আমরা কেবল মাত্র দু’ জন?” অমর এটু তাক্সিল্যের হাসি হেসে

বল্লে, “আমি ত’ আর বাত্বকর নই যে, ভেঙ্কির জোরে আর একজনকে এনে হাজির ক’রে দে’বো?”

কর্মচারীটি কিন্তু এই ঔদ্ধত্য প্রকাশে বেশ একটু বিরক্ত হ’য়ে আক্রমণের আর একটি নতুন পন্থা আবিষ্কার ক’রে বল্লে,—

“তোমার নাম কি?”

“আমার নাম টমাস, মা ইংরেজ, বাপ দিশী খুষ্টান।”

“তোমার বন্ধুটির নাম কি?”

“ওকে টমসন বলে ডাকি!”

আমার হাসি চেপে রাখা দায় হ’য়ে উঠ্লে। ছাড়বার জন্তে বাঁশী দিচ্ছে দেখে টেনের দিকে সোজা এগিয়ে গেলুম। অমর কর্মচারীটির পিছু পিছু চল্লে। সে কিন্তু সব কিছু সম্পূর্ণ বিশ্বাস ক’রে আমাদের একটা ইউরোপীয় কামরায় বসিয়ে দিয়ে গেল। দুজন ফিরিজী ছেলে নেটিভদের কামরায় যাচ্ছে দেখে, তা’র মনে হয় ত’ ক্ষোভেরই সঞ্চার হ’য়ে থাকবে। তা’র সবিনয় বিদায় গ্রহণের পর আমি ত’ বেষ্টিতে ঠেস দিয়ে ব’সে এক চোট প্রাণভরে খুব হেসে নিলুম! বন্ধুটিও একজন পাকা ইউরোপীয় কর্মচারীকে বুজির জোরে হারিয়ে দিয়েছে ভেবে বেশ একটা সানন্দ পরিতৃপ্তির ভাব প্রকাশ করলে।

প্ল্যাটফর্মের উপর আমি টেলিগ্রামটি লুকিয়ে পড়ে নে’বার চেষ্টা ক’রে ছিলুম। দাদার কাছ থেকে এসেছে—তা’তে লেখা ছিল, “মোগলসরাই হ’য়ে হরিদ্বারের দিকে সাহেবী পোষাকপরা তিনটি বাঙালী ছেলে বাড়ী থেকে পালা’চ্ছে। অনুগ্রহ ক’রে আমার না পৌঁছান পর্যন্ত তা’দের আটকে রাখুন। আপনার কাষের জন্তে প্রচুর পুরস্কার।”

সকোপকটাক্ষে আমি বল্লুম, “অমর, তোমায় না বাড়ীতে দাগ দেওয়া টাইম্ টেবল্ ফেলে রেখে আসতে বারণ ক’রেছিলুম? দাদা নিশ্চয়ই সেটা পেয়ে থাকবে।”

বন্ধুবর নিতান্ত নিরীহভাবে আঘাতটি হজম ক’রলে। বেরিলীতে অল্প কিছুক্ষণ অপেক্ষা করা গেল, কিন্তু সেখানেও দাদার টেলিগ্রাম নিয়ে দ্বারকা প্রসাদ আমাদের জন্তে অপেক্ষা ক’রছিল। পুরাতন বন্ধুটি খুব সাহস ক’রে

আমাদের আটকে রাখতে চেষ্টা করলে। আমি তা'কে বুঝিয়ে বললুম যে, আমাদের যাত্রা শুরু হয়েছে, ছেলেমানুষি ক'রবার জ্ঞে নয়। তা'কে সঙ্গে যা'বার জ্ঞে অস্বরোধও করলুম। কিন্তু আগের ম'ত এবারও দ্বারকা হিমালয়ে পলায়নে আমাদের আহ্বান প্রত্যাখ্যান করলে।

সেই রাতে একটা ষ্টেশনে গাড়ী দাঁড়িয়ে, আর আমিও আধঘুমে। একটা রেলের কর্মচারী অমরকে জাগিয়ে তুলে নানা প্রশ্ন ক'রতে আরম্ভ ক'রে দিলে। সেটিও 'টমাস' 'টমসনে'র বর্ণসঙ্করের ভাঁওতায় পড়ে ঠকে গেল। ট্রেনটি বিজয়গর্বে আমাদের বহন করে নিয়ে হরিদ্বারে গিয়ে পৌঁছুল ভোর বেলায়। আমাদের সাদর আহ্বান জানাবার জ্ঞেই যেন দূরে উত্তুঙ্গ পর্বতমালা আত্মপ্রকাশ করলে। ষ্টেশন হ'তে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়েই আমরা সহরের স্বচ্ছন্দবিহারী জনতার মধ্যে মিশে পড়লুম। তারপর আমাদের প্রথম কায হ'ল, দেশী পোষাক পরে ফেলা, কেন না অনন্তদা' কোনও রকমে আমাদের সাহেবী পোষাকের ছদ্মবেশ ধ'রে ফেলেছিল। ধরা পড়বার একটা অমঙ্গল আশঙ্কায় মনটা কিন্তু বরাবর ভারি হ'য়েই রইল।

হরিদ্বার অবিলম্বে পরিত্যাগ করা যুক্তিযুক্ত ভেবে, আমরা আরও উত্তরে যোগীশ্বরপদরজঃপুত হৃষীকেশ যা'বার জ্ঞে টিকিট কিনে ফেললুম। আমি ইতিমধ্যে ট্রেনে চড়ে বসেছি, আর অমর প্ল্যাটফর্মের উপর ঘুরে বেড়াচ্ছে। একটা পুলিশের লোকের চিৎকারে হঠাৎ সে দাঁড়িয়ে প'ডল। তা'রপর সেই লোকটি ত' আমাদের সটান ষ্টেশন বাঙ্গলোতে ধ'রে নিয়ে গিয়ে টাকাকড়ি যা' কিছু সব কেড়ে নিয়ে নিজের কাছে রাখলে। অত্যন্ত বিনয় সহকারে তিনি জানালেন যে, তাঁ'র কর্তব্য হ'চ্ছে, আমার বড়দাদা সেখানে না পৌঁছান পর্যন্ত আমাদের আটকে রাখা!

এই পলাতক ছ'টি কিশোরের গম্যস্থল হিমালয় গুনে তিনি তখন এক অদ্ভুত কাহিনী শোনাতে বসলেন;—

“তোমরা দেখ'ছি যে সাধু সন্ন্যাসীদের জ্ঞে একেবারে পাগল হ'য়ে উঠেছ। তবে একটা ব্যাপার ব'লি শোন। এই সবে মাত্র কালকে আমি যা' দেখেছি তা'র চেয়ে বড় সাধু আর তোমরা কোথাও দেখতে পা'বে না, বুঝলে?

আমার এক সহকর্মী আর আমি এই দিন পাঁচেক আগে তাঁ'র দর্শন পাই। এক খুনি আসামী পাকড়াবার জন্তে গঙ্গার ধারে খুব কড়া নজর রেখে আমরা পাহারা দিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছিলুম। আমাদের ওপর হুকুম ছিল, জ্যান্ত কি মরা যেমনই হোক, তা'কে ধ'রবার জন্তে। লোকটা তীর্থযাত্রীদের মধ্যে চুরি ক'রবার জন্তে সাধুর ছদ্মবেশে ঘুরে বেড়াচ্ছে, কেবল এইটুকু জানা ছিল। আমাদের ঠিক সামনেই অল্পদূরে একটা চেহারা দেখা গেল, তা' সেই আসামীর বর্ণনার সঙ্গে মেলে। চিৎকার ক'রে তা'কে দাঁড়াতে বললুম। লোকটা কিছু আমাদের থামবার হুকুম না মেনেই হন্ হন্ করে চলতে লাগল। আমরা তা'কে ধ'রবার জন্তে ত' দৌড়তে শুরু ক'রলুম। ধ'রতে না পেরে তা'র পিছন দিক দিয়ে গিয়েই প্রচণ্ড জোরে তা'র ওপর কুড়ুলের এক কোপ বসিয়ে দিলুম। বাস্ ! ডান হাতটি তা'র ধড় হ'তে প্রায় সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হ'য়ে এ'ল।

“কিছুমাত্র চিৎকার বা সেই ভীষণভাবে কাটা হাতের ওপর দৃকপাতমাত্র না ক'রেই সেই অজানা লোকটি আশ্চর্য্যভাবে তাড়াতাড়ি চলতে শুরু ক'রলে। আমরা ত' বিস্ময়ে অবাক হ'য়ে গেলুম। আসামী ভেগে যায় দেখে লাফিয়ে গিয়ে তা'র সামনে দাঁড়াতেই, অত্যন্ত নিরীহ আর শাস্ত্যভাবে সে বল্লে, ‘তোমরা যে খুনীকে খুঁজছ, আমি সে লোক নই।’

“এখন উপায় ? কিছুই ভেবে ঠিক ক'রতে পারি না। আমি ত' এক দেবপ্রতিম সাধুর অঙ্গচ্ছেদ ক'রে ফেলেছি দেখে, অন্তরে গভীর মর্ম্মন্তদ যন্ত্রণা অনুভব ক'রতে লাগলুম। সঙ্গে সঙ্গে তাঁ'র চরণতলে দণ্ডবৎ হ'য়ে পড়ে তাঁ'র কাছে কাতরস্বরে ক্ষমা ভিক্ষা চাইতে লাগলুম, আর তাঁ'র ফিন্‌কি দিয়ে পড়া রক্তশ্রোত বন্ধ ক'রবার জন্তে পাগড়ীর কাপড় খানিকটা হিঁড়ে নিয়ে ক্ষতস্থানটি বাঁধতে গেলুম।

“সাধুটি তখন অত্যন্ত স্নেহকোমল স্বরে বল্লেন, ‘বেটা, দেখছি যে তোমার একটা ভুল হয়ে গেছে। তা' যাক্, তুমি যাও, মনে কিছু দুঃখ কো'রো না। যা জগদম্বাই আমায় দেখছেন।’ তারপর তিনি ঝুলে পড়া সেই কাটা হাতটি কাঁধের ওপর বসিয়ে দিতেই—আশ্চর্য্য ! সেটা একেবারে বেমালাম জুড়ে গেল, আর সঙ্গে সঙ্গে রক্ত পড়াও আশ্চর্য্যভাবে বন্ধ হয়ে গেল !

“সাধুটি বললেন, ‘তিন দিন বাদে ঐ গাছতলায় আমার কাছে এসো, দেখবে আমি একদম সেরে গেছি। তা’ হ’লে তোমার আর কোন অনুতাপ ক’রতে হ’বে না।’

“কালকে আমি আর আমার সেই সহকর্মীটি অত্যন্ত ব্যাকুলভাবে সেই নির্দিষ্ট স্থানটিতে গিয়ে উপস্থিত হ’লুম। সাধুটি সেখানে বসেছিলেন; হাতটি বাড়িয়ে আমাদের দেখতে দিলেন—তা’তে কোন রকম কাটা বা আঘাতের চিহ্ন পর্য্যন্তও নেই! তা’রপর তিনি আমার আশীর্বাদ ক’রে বললেন, ‘এবার আমি দ্বীকেশ হ’য়ে হিমালয়ের কোন নির্জন স্থানে চলে যাব’, বলেই তাড়াতাড়ি তিনি প্রস্থান ক’রলেন। আমি নিশ্চয় জেনেছি যে, তাঁ’রই পুণ্যপ্রভাবে আমার জীবন উন্নত হ’য়ে গেছে।’ ভক্তিভরে এই কথাগুলি বলে তিনি তাঁ’র কাহিনী শেষ ক’রলেন।

এটা ঠিকই যে, এই ব্যাপারটাতে প্রকৃতই তা’র মনের গভীরতর স্তর আলোড়িত ক’রে তুলেছিল। চিত্তাকর্ষক ভঙ্গীতে সংবাদপত্রে প্রকাশিত সেই অলৌকিক ব্যাপারের একটা “কাটিং” আমার হাতে দিলেন। সংবাদপত্রে লোমহর্ষণ ব্যাপারের বর্ণনা সব সাধারণতঃ যেমন বিরূতরূপে প্রকাশিত হয়, (হায় রে! ভারতবর্ষেও এর অভাব নেই!) সংবাদদাতার এ বিবরণটিও, সেই রকম কিঞ্চিৎ অতিরঞ্জিত হ’য়েই প্রকাশিত হ’য়েছিল। এ’তে ছিল যে, সাধুটির মাথা ধড় হ’তে প্রায় বিচ্ছিন্ন হ’য়ে গিয়েছিল!

অমর আর আমি, সেই পরম যোগী—যিনি তাঁ’র উৎপীড়ককেও মহাপুরুষ যীশুখৃষ্টেরই মত ক্ষমা ক’রতে পারেন—তাঁ’র দর্শন লাভে বঞ্চিত হ’য়ে অত্যন্ত দুঃখ ও ক্ষোভ প্রকাশ ক’রতে লাগলুম। গত দুই শত বৎসর ধ’রে ঐহিক বিষয়ে দরিদ্র হ’য়ে পড়লেও, ভারতবর্ষে এখনও আধ্যাত্মিক সম্পদের অকুরন্ত ভাণ্ডার আছে। নেহাৎই সংসারের কীট এই পুলিশ কর্মচারীটির মত লোকেদের এখনও মাঝে মাঝে পথের ধারেই আধ্যাত্মিক জগতের গগনচুম্বী বিরাট ব্যক্তিত্বের দর্শন মেলে।

এই অপূর্ণ কাহিনীটি শুনিয়া আমাদের সময় কাটান’র একঘেষেয়ি দূর ক’রবার জন্তে আমরা পুলিশ কর্মচারীটিকে আন্তরিক ধন্যবাদ দিলুম। হয়ত’ তিনি বুঝতে চাইছিলেন যে, তিনি আমাদের চেয়ে বেশী ভাগ্যবান।

সম্ভবতঃ বিনা আয়াসে তিনি এক পরমজ্ঞানী শ্রেষ্ঠ সাধুর দর্শন লাভ ক'রতে পেরেছেন, আর আজ আমাদের ব্যাকুল অনুসন্ধান শেষ হ'য়েছে কোনো সঙ্গুরুপদাশ্রয়ে নয়, নিতান্তই স্থূল এক পুলিশের থানায় !

হিমালয় এত কাছে অথচ আটক থেকে আজ তা' থেকে আমরা কত দূরে ! অমরকে জানালুম, মুক্তিনাভের জন্তে মনে এখন হু'গুণ জোর এসে গেছে ।

উৎসাহ হৃচক হাসির সঙ্গে বললুম, “দেখ, স্বেযোগ পে'লেই এবার স'রে পড়া বা'ক, কি বল ? আর হবীকেশে আমরা পায়ে হেঁটেই যে'তে পা'রব ।”

আমার সঙ্গীটি কিন্তু আমাদের কাছ হ'তে বেশ একটু দূর অর্থবল অপসারিত হ'তে দেখে নিতান্ত নিরুৎসাহিত হ'য়ে পড়ে বললে, “যদি আজ আমরা এই বিপজ্জনক জঙ্গলের দেশে যাত্রা শুরু করি, তা' হ'লে আমরা সাধু সন্ন্যাসীদের আস্তানায় না পৌঁছে, পৌঁছব একেবারে সটান বাঘের পেটের ভিতর গিয়ে” ।

অনন্তদা' আর অমরের দাদা তিন দিন বাদে এসে পৌঁছলেন । অমর ত' মুক্তির আনন্দে কলকণ্ঠে তা'র দাদাকে অভ্যর্থনা ক'রলে । আমার কিন্তু মতলব টলল না । অনন্তদা'র আমার কাছ থেকে দারুণ ভৎসনা ছাড়া আর কিছুই লাভ হ'ল না ।

“তোমার মনে যে কি হ'চ্ছে তা' আমি বুঝতে পাচ্ছি ।” দাদা সান্ত্বনা দে'বার জন্তে বলতে লাগলেন, “শুধু তুমি একটিবার কাশীতে চ'ল । সেখানে গেলেই তোমার একটি সত্যিকারের সাধুর দর্শন লাভ হ'বে । তা'রপর কলকাতায় গিয়ে দিন কতকের জন্তে বাবাকে দেখে আস'বে । মনে মনে তিনি বড়ই কষ্ট পা'চ্ছেন । তা'রপর না হয়, আবার এখানে এসে গুরু অন্বেষণ শুরু ক'রে দিও, এ'্যা, কি বল মুকুন্দ ?”

আমাদের কথাবার্তার মাঝখানে অমর এই সময়ে এসে বললে যে, আমার সঙ্গে হরিদ্বারে ফেরবার আর তা'র কোনই ইচ্ছে নেই । পারিবারিক স্নেহরসের মধুর উষ্ণতা সে তখন অত্যন্ত পরিতৃপ্তির সঙ্গে উপভোগ ক'রছিল । আমার মনে কিন্তু বরাবরই ঠিক ছিল যে, গুরু অন্বেষণ আমি কখনই পরিত্যাগ ক'রব না ।

যা'ই হোক আমাদের দলটি ত' কাশীর গাড়ীতে চড়ে বসল। কাশীতে পৌঁছে, আমি আমার প্রার্থনার একটি অদ্ভুত আর প্রত্যক্ষ ফল সত্ত্ব সত্ত্বই পে'য়ে গেলুম।

অনন্তদা'র কিম্বদন্তি এর মধ্যে একটি অতি সুচতুর ব্যবস্থা আগে থেকেই ঠিক করা ছিল। হরিদ্বারে এসে আমাকে পাকড়াবার আগেই তিনি কাশীতে নেমে জনৈক শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতের সঙ্গে আমার দেখা ক'রবার ব্যবস্থা ক'রে এসেছিলেন। পণ্ডিতপ্রবর ও তত্ত্বপুত্র আমাকে সন্ন্যাসের পথ হ'তে নিবৃত্ত ক'রবার ভার গ্রহণের জন্তে নাকি প্রতিশ্রুতিও দিয়েছিলেন।

বাক, অনন্তদা' ত' আমাকে তাঁ'দের বাড়ীতে নিয়ে গিয়ে হাজির ক'রলেন। পুত্ররত্নটি, অন্নবয়সের আর কিঞ্চিং উচ্ছ্বাসপ্রবণ। উঠানে দাঁড়িয়েই আমাদের অভ্যর্থনা ক'রলে। তা'রপরে আমার সঙ্গে ত' এক লম্বা দার্শনিক তর্ক জুড়ে দিলে। আমার ভবিষ্যৎ জীবনের দিব্যজ্ঞান তাঁ'র আছে এই ভাণ ক'রে সে আমার সন্ন্যাসী হওয়ার মতলব দমিয়ে দে'বার জন্তে সূত্র ক'রলে,— “দেখ, তোমার সংসারের কর্তব্য সব ছেড়েছুড়ে দে'বার জন্তে যদি জিদ্ ক'র, তা' হ'লে তোমায় অনবরতঃ দুঃখই পে'তে হ'বে, আর তা' ছাড়া ভগবানকেও পা'বে না, বুঝ'লে? সাংসারিক কর্তব্য সম্পাদন না ক'রলে কখনও তোমার প্রাক্তন কর্মক্ষম হ'বে না, তা জেনে রেখো।”

উত্তরে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার নবম অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণের অমর বাণী আমার মুখে এসে প'ড়ল,—

“অপি চেৎ সূদূরাচারো ভজতে যামনন্যভাক্।

সাধুরেব স মন্তব্যঃ, সম্যগব্যবসিতো হি সঃ ॥৩০॥

ক্ষিপ্ৰং ভবতি ধর্ম্মান্না শম্ভচ্ছাস্তিঃ নিগচ্ছতি।

কৌন্তেয় প্রতিজানীহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্চতি ॥৩১॥

যদি কোন ব্যক্তি নিতান্ত দূরাচার হইয়াও অনন্তচিত্তে আমার ভজনা করে, তাহা হইলে সে সাধু বলিয়াই পরিগণিত হয়। কারণ তাহার অধ্যবসায় অতি শোভন ॥৩০॥

সে ব্যক্তি শীঘ্রই ধর্ম্মান্না হয় এবং নিত্যশাস্তি লাভ করে। হে কৌন্তেয়! তুমি ইহা নিশ্চয় জানিও যে, আমার ভক্ত কখনও বিনাশ প্রাপ্ত হয় না ॥৩১॥”

কিন্তু সেই যুবকটির প্রবল ভবিষ্যদ্বাণী আমার বিশ্বাসের মূল তখন কিঞ্চিৎ শিথিল ক'রে দিয়েছিল। অন্তরে অসীম ব্যাকুলতা নিয়ে আমি নীরবে ভগবানের কাছে গভীর প্রার্থনা জানাতে লাগলুম, “দয়াময়, আমার মনের সকল সংশয় ছিন্ন ক'রে, সব দ্বিধাদ্বন্দ্ব দূর ক'রে, এখানে এখনই উত্তর দাও যে, তোমার ইচ্ছা কি,—সন্ন্যাস জীবন বাপন ক'রব, না সংসারে প্রবেশ ক'রব?”

দেখলুম যে একটি সৌম্যমূর্তি সাধু পণ্ডিতজীর বাড়ীর সীমানার ঠিক বাইরেই দাঁড়িয়ে আছেন। তিনি সেই স্বয়ংসিদ্ধ ভবিষ্যদ্বক্তা আর আমার মধ্যে উঁচৈশ্বরে যে সব কথাবার্তা চলছিল, তা' বোধ হয় শুনতে পেয়েছিলেন, কারণ অপরিস্রব হ'লেও তিনি আমাকে তাঁ'র কাছে ডাকলেন। দেখলুম, তাঁ'র প্রশান্ত নয়নদ্বয় হ'তে এক প্রচণ্ড শক্তি নির্গত হ'চ্ছে।

বললেন, “বৎস, এই পণ্ডিতমূর্খের কথা কথ'খনো শুনো না। তোমার প্রার্থনার উত্তরে ঠাকুর তোমায় এই বলে আমার আশ্বাস দিতে বললেন যে, সন্ন্যাসই তোমার এ জীবনে একমাত্র পথ।” বিস্ময় ও কৃতজ্ঞতায় এই চূড়ান্ত নিষ্পত্তিতে আমি তৃপ্তির আনন্দে তখন হাসলুম।

উঠান হ'তে তখন পণ্ডিতমূর্খটি আমার ডাকছিলেন, “চলে এসো, চলে এসো, ও লোকটার কাছ থেকে স'রে এসো।” আমার জীবনের পথ প্রদর্শক সেই সাধুব্যক্তিটি হাত তুলে আমার আশীর্বাদ ক'রে ধীরে ধীরে প্রস্থান ক'রলেন। পক্ষকেশ পণ্ডিতপ্রবরটি তখন এই চমৎকার মন্তব্যটি প্রকাশ ক'রে বললেন যে, “ঐ সাধুটি তোমারই মত মাথাপাগলা।” তিনি ও তাঁ'র পুত্র-রত্নটি তখন আমার দিকে সখেদে তাকাচ্ছিলেন, বললেন, “শুনেছি, ঐ সাধুটি বৃথাই ঘর ছেড়ে বেরিয়েছে, ঈশ্বরলাভের জন্তে।”

আমি ফিরে চললুম। অনন্তদা'কে বললুম যে, আমি আর এদের সঙ্গে কোন বৃথা তর্ক ক'রতে চাইনে। এবার চল বাড়ী যাওয়া যাক। দাদাও তক্ষুণি ফিরতে রাজী হয়ে গেলে, কলকাতার ট্রেনে চড়ে বসলুম।

বাড়ী ফেরবার সময় কিন্তু আমার অদম্য কৌতূহল চেপে রাখতে না পে'রে জিজ্ঞাসা ক'রে বসলুম,—ডিটেক্টিভ ম'শায়, কি করে জানলে যে, আমি দু'জন সঙ্গীর সঙ্গে পালিয়েছি?”

দৃষ্ট হাসি হেসে দাদা বললে, “তোমাদের ইস্কুলে গিয়ে দেখলুম যে, অমর

ক্লাস থেকে বেরিয়ে আর বাড়ী ফেরেনি। তা'র পরদিন সকালে তা'দের বাড়ী গিয়ে একটা দাগ দেওয়া টাইম টেবল্ আবিষ্কার করলুম। অমরের বাবা সেই সময় গাড়ী ক'রে বেরুছিলেন, আর দুঃখ ক'রে কোচম্যানকে বলছিলেন 'ছেলেটা আজ আর আমার সঙ্গে গাড়ী ক'রে ইস্কুল যাবে না। সে পালিয়েছে।'।

"কোচম্যানটা তখন বললে, 'শুভ্রন বাবু, একটা গাড়োয়ানের কাছ থেকে শুনলুম যে, সাহেবী পোষাক পরা আপনার ছেলে আর দু'টিতে মিলে হাওড়া ইস্টিশানে গিয়ে গাড়ীতে চড়েছে। যা'বার সময় তা'দের চামড়ার জুতোগুলো কিন্তু তা'রা গাড়োয়ানটাকে বকশিস দিয়ে গেছে!'"

"এতে করে আমি তিনটি সূত্র পে'লুম—টাইম টেবল্, তোমাদের তিনমূর্ত্তি আর সাহেবী পোষাক!"

অনন্তদা'র রহস্তোদ্ঘাটন আমি মিশ্রিত আনন্দ আর বিরক্তির সঙ্গে শুনছিলুম। দেখা গেল, গাড়োয়ানের প্রতি আমাদের বদাগততা কিষ্কিৎ অপাত্রে গুস্ত হ'য়েছে!

"অবিশ্টি অমর টাইম টেবলে যে সব সহরের গায়ে দাগ দিয়েছিল, সেই সব যায়গার স্টেশন মাষ্টারদের কাছে তখনই টেলিগ্রাম ক'রতে ছুটলুম। বেরিলীর গায়েও দাগ দেওয়া ছিল, কাষেই সেখানে তোমার বন্ধু দ্বারকাকে তার করলুম। কলকাতায় আমাদের আল্লীয় স্বজনদের মধ্যে খোঁজখবর নিয়ে জানলুম যে, যতীনদা' একরাত্রি অল্পপস্থিত, কিন্তু তা'র পরদিন সকালবেলাই সাহেবী পোষাকে এসে হাজির। তা'কে খুঁজে বা'র ক'রে আমি বাড়ীতে নেমস্তন্ন করলুম। আমার বন্ধুত্বপূর্ণ ব্যবহারে সম্পূর্ণ নিঃশঙ্কচিত্তে সে নেমস্তন্নে এ'ল। রাস্তায় কোন রকম সন্দেহ না জাগিয়ে আমি তা'কে খানায় নিয়ে গিয়ে তুললুম। গোড়া থেকেই জনকতক ভয়ঙ্কর গোছের চেহারার পুলিশের লোক আমি বেছে রেখে এসেছিলুম। তা'রা ত' তা'কে নিয়ে ঘিরে বসল। তা'দের ভীষণ চাউনি দেখে যতীনদা' ভড়কে গিয়ে তখন তা'র রহস্তজনক আচরণের কৈফিয়ৎ দিতে রাজী হ'ল।"

"যতীনদা' বললে, 'হাক্কা আধ্যাত্মিক ভাব নিয়ে হিমালয়ের পথে বেরিয়ে পড়েছিলুম। শুরুরাভের আশায় মন উৎসাহে নেচে উঠ'ল। কিন্তু মুকুন্দ যেই

বললে, ‘হিমালয়ের গুহায় মধ্যে যখন ধ্যানে মজে বসে থাকব, সেখানকার বাঘগুলো তখন মস্তমুগ্ধ হ’য়ে পোষা বেড়ালের মতন এসে আমাদের চার ধারে বসবে।’ তখনই আশ্চর্যমুগ্ধ হ’বার উপক্রম হ’ল, কপালে ফোঁটা ফোঁটা ঘাম দেখা দিলে! ভাবলুম, আমাদের যোগবলে যদি বাঘগুলোর হিংস্রপ্রকৃতি সব না বদলায় তা’ হ’লে কি হ’বে, এঁ্যা? তা’রা কি তবুও আমাদের কাছে বাড়ীর পোষা মেনীবিড়ালটির মতই শান্ত শিষ্ট হ’য়ে বসে থাকবে? মনশ্চক্ষে দেখতে পেলুম, একেবারে পুরো ধড়টা না হ’লেও,— হাত পা গুলোর এক একটা কিস্তি পাঠিয়ে ইতিমধ্যেই আমি একটি বাঘের পেটের ভেতর ঢুকে গেছি!”

যতীনদা’র স’রে পড়াতে যে রাগ হয়েছিল, তা’ চ’লে গিয়ে আমার অত্যন্ত হাসি পেলে। ট্রেনের মধ্যে এই হাস্যোদ্দীপক উপসংহারে সে আমার যে মনঃকষ্ট দিয়েছিল, তা’ সব দূর হ’ল। যতীনদা’ও পুলিশের হাত এড়াতে পারেনি বলে, মনে যে কিঞ্চিৎ তৃপ্তির ভাব এসেছিল তা’ অবশ্য স্বীকার করতেই হ’বে।

হাসি পা’চ্ছিল আবার রাগও হ’চ্ছিল, বললুম, “অনন্তদা’, তুমি দেখছি জাত ডিটেক্টিভ। বাই হোক যতীনদা’কে আমি বলব যে, অবিজ্ঞি বিশ্বাসঘাতকতা করবার জন্তে নয়, নিজের প্রাণ বাঁচাবার জন্তেই যে সে একাধিক ফেলেছে, এতে আমার মনে একটুও দুঃখ নেই!”

কলকাতার বাড়ীতে পৌঁছলে বাবা ত’ অন্ততঃ স্কুলের লেখাপড়া সা’ না করা পর্য্যন্ত কোথাও পা না বাড়াতে সকাতর অন্তরোধ ক’রলেন। ইতিমধ্যে আমার অল্পপস্থিতিতে বাবা শাস্ত্রজ্ঞ সাধুপণ্ডিত স্বামী কেবলানন্দর্ষ মহারাজকে (শাস্ত্রী মহাশয়)* আমাদের বাড়ীতে নিয়মিত আসার ব্যবস্থা ক’রে রেখেছিলেন। বাবা এবার পরম নিশ্চিন্ত হ’য়ে বল্লেন, “শাস্ত্রী মহাশয়ের কাছে এবার থেকে তুমি সংস্কৃত পড়বে।”

পিতা আশা ক’রেছিলেন যে, আমার ধর্ম্মাকাজ্ঞা একজন শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতের

* সংসারজীবনে আশুতোষ চট্টোপাধ্যায় নামে পরিচিত ছিলেন। ১৮৬৩ সালে খুলনায় জন্মগ্রহণ করেন। ২৪শে চৈত্র, বুধবার ১৩৩৮ সালে দেহত্যাগ করেন। সম্ভ্রতি এ’র জীবনী প্রকাশিত হয়েছে।

শাস্ত্রোপদেশেই পরিতৃপ্ত করবেন। কিন্তু তাঁর বিপরীত ফল ফল্ন, অতি সুন্দরভাবে। আমার নব নিযুক্ত শিক্ষকটি, শাস্ত্রের শুকন কচ্‌কচির পরিবর্তে অন্তরে ঈশ্বরাকাজ্জ্বল্য প্রবল অগ্নি প্রজ্জ্বলিত ক'রে দিলেন। বাবার কিছু জানা ছিল না যে, শাস্ত্রী মহাশয় লাহিড়ী মহাশয়ের একজন উন্নত শিষ্য! সেই অদ্বিতীয় যোগিরাজের অমোঘ দৈবশক্তির চৌম্বক প্রভাবে সহস্র সহস্র শিষ্য তাঁর দিকে নীরবে আকৃষ্ট হ'য়েছিল। পরে আমি শুনেছিলুম যে, লাহিড়ী মহাশয় শাস্ত্রী মহাশয়কে প্রায়ই ঋষি আখ্যায় অভিহিত করতেন।

শাস্ত্রী মহাশয়ের সুন্দর মুখখানি কৌকড়ান চুলে ঘেরা। তাঁর কালো চোখ দুটি শিশুর গ্রায় স্বচ্ছ ও সরল। তাঁর স্নকুমার দেহের গতি একটা প্রশান্ত গান্ধীর্যের দ্বারা সংযত। চিরশান্ত ও স্নেহময় তিনি আশ্রয়প্রার্থীকে স্নানোদ্যত। গভীর ক্রিয়াযোগ অভ্যাসে তাঁর সঙ্গে ঘণ্টার পর ঘণ্টা পরমানন্দে কাটাতুম।

সনাতন ধর্মশাস্ত্রে শাস্ত্রী মহাশয় সুপণ্ডিত ছিলেন। তাঁর গভীর পাণ্ডিত্যের দরুণ তিনি “শাস্ত্রী মহাশয়” এই উপাধি লাভ ক'রেছিলেন এবং সচরাচর তিনি এই নামেই অভিহিত হ'তেন। কিন্তু সংস্কৃতে আমার উন্নতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য হয় নি। আমি সর্বদাই স্নযোগ খুঁজতুম কি ক'রে নীরস ব্যাকরণের হাত এড়িয়ে, যোগ আর লাহিড়ী মহাশয়ের আলোচনা শুরু করা যায়। শাস্ত্রী মহাশয় একদিন তাঁর গুরুর বিষয়ে নিম্ন লিখিত ঘটনাটি বিবৃত ক'রে আমার অপরিণীত উৎসাহ বর্ধনে বিশেষ অঙ্গুগৃহীত করেন।

শাস্ত্রী মহাশয় বললেন, “বহু পুণ্যের ফলে আমার লাহিড়ী মহাশয়ের কাছে বছর দশেক থাকবার অশেষ সৌভাগ্যলাভ ঘটেছিল। তাঁর কাশীর বাড়ীতে প্রায় রোজই রাতে যেতুম। দোতলার উপর সামনের বৈঠকখানায় তিনি সর্বদাই থাকতেন। একটা পিঠখোলা কাঠের আসনে তিনি পদ্মাসনে ব'সে থাকতেন, আর তাঁর শিষ্যবর্গ তাঁকে অর্ধচন্দ্রাকারে মালার মত বেষ্টিত ক'রে থাকত। তাঁর উজ্জল চোখ দু'টি স্বর্গীয় আনন্দে উদ্ভাসিত, অর্ধনিম্নীলিত থেকে সে দু'টি অন্তরের সুদূর প্রসারী দৃষ্টিমণ্ডলের ভিতর দিয়ে শাস্ত্রী মহাশয়ের রাজ্যে গিয়ে নিবদ্ধ হ'য়ে থাকত। শেষ পর্যন্ত কদাচিৎ তিনি কথ

বলতেন। কখন কখন কোন জিজ্ঞাসু শিষ্যের ওপর গিয়ে তাঁর দৃষ্টি সংহত হ'ত। তাঁর মধুমাক্ষা প্রাণারাম কথাগুলি তখন জ্যোতিঃপ্রপাতের মত ঝরতে শুরু হ'ত।

“গুরুদেবের দৃষ্টিপাতে মনের মধ্যে এক অপূর্ব শান্তি ফুটে উঠল। যেন একটি অনন্ত পদ্মের ভিতর থেকে তাঁর অবর্ণনীয় অমৃতনিশ্চন্দ্রী আনন্দসৌরভ আমার সকল সম্ভার ওপর পরিপূর্ণভাবে ব্যাপ্ত হ'য়ে পড়ল। তাঁর সংসর্গ, এমন কি দিনের পর দিন কোনরূপ আলাপ আলোচনা না ক'রেও আমার মধ্যে একটা আমূল পরিবর্তন এনে দিয়েছিল। যদি কোন অদৃষ্টপূর্ব বাধা আমার মনঃসংযোগের পথে এসে দাঁড়াত, তা'হ'লে আমি গুরুপদতলে বসে ধ্যান শুরু ক'রতুম। সেখানে নিতান্ত জটিল আর দুর্লভ অবস্থাও আমার কাছে অত্যন্ত সরল আর সহজ হ'য়ে আসত। এই সব অল্পভূতিগুলি প্রথমতঃ আমাকে নিরুপস্থিত গুরুর কাছে টেনে নিয়ে যেতে বিভ্রান্ত ক'রে তুলেছিল। গুরু ছিলেন সাক্ষাৎ ভগবানের মন্দির—তাঁর অন্তরদ্বার সকল শিষ্যদের কাছে ভক্তির জোরেই উন্মুক্ত হ'ত।

“লাহিড়ী মহাশয় পুণ্ড্রিগত বিদ্যার জোরে শাস্ত্র ব্যাখ্যা ক'রতেন না। বিনা আয়াসে তিনি ভগবানের পাঠশালায় প্রবেশ লাভ করেছিলেন। তাঁর সর্বজ্ঞতার উৎস হ'তে বাণীর ফেনোন্মি আর চিন্তার ধারা সহস্রধারে উৎসারিত হ'য়ে উঠত। যুগযুগান্ত পূর্বে বেদের মধ্যে নিহিত গভীর দার্শনিক তত্ত্বসকল নিরূপণ করবার অদ্ভুত কৌশল তাঁর চমৎকার ভাবে জানা ছিল। প্রাচীন শাস্ত্রে আয়ত্তজ্ঞানের বিভিন্ন স্তরের বিষয় বর্ণনা ক'রতে অনুরোধ ক'রলে, তিনি একটু হেসে বলতেন, ‘দাঁড়াও, আমি ঐ সব অবস্থার মধ্যে প্রবেশ ক'রে, এখনিহী আমার অল্পভূতিগুলো তোমাদের সব ব'লে দিচ্ছি।’ তিনি ছিলেন সেই সব গুরুদের সম্পূর্ণ বিপরীত, যাঁরা কেবলমাত্র শাস্ত্র মুখস্থ করে অল্পপল্লব বিষয়গুলোর অজীর্ণোদগারই ক'রতে পা'রতেন, আর কিছু নয়।

“নিকটস্থ কোন শিষ্যকে সেই বিচক্ষণ গুরু প্রায়ই এই উপদেশ দিতেন, ‘শ্লোক গুলোর মানে তোমার কাছে যেমন বোধ হয়, তেমনি ভাবে তা'দের ব্যাখ্যা ক'র। আমি তোমার চিন্তা পরিচালিত ক'রব, যা'তে ক'রে নিভুল ব্যাখ্যা হয়,

“এমনি করে লাহিড়ী মহাশয়ের বহু অমূল্যতিলক বিষয় তাঁ’র নানা শিষ্যদের বহুল ব্যাখ্যাসমেত লিপিবদ্ধ হ’য়েছিল।

“গুরুদেব কখনও অন্ধ বিশ্বাসে উপদেশ দিতেন না। তিনি ব’লতেন, ‘কথাগুলো কেবল খোসা, ধ্যানেন্তে নিজ আনন্দবোধরূপে ঈশ্বরোপলব্ধির প্রমাণ গ্রহণ ক’র।’

“শিষ্যের যা’ কিছু সমগ্রাই উপস্থিত হো’ক না কেন, তিনি তা’র সমাধানে ক্রিয়াযোগ সাধনেরই উপদেশ দিতেন। ব’লতেন, ‘যোগিক সমাধান কখনও তা’র উপযোগিতা হারাবে না, যখন আমি এ শরীরে আর তোমাদের দেখিয়ে দিতে উপস্থিত থাকব না। একটা কালনিক ধারণার মত এর অভ্যাসের কৌশল কখনও চাপা পড়ে আটকে থেকে ভোলা যাবে না। ক্রিয়ার সাহায্যে তোমার মোক্ষপথে অনবরত এর অভ্যাস ক’রে যাও, তা’তেই তোমার শক্তি বৃদ্ধি হ’বে।”

শাস্ত্রী ম’শায় তা’রপর এই অকাটা প্রমাণ দিয়ে শেষ করলেন যে, “সেই অনন্তপুরুষের সন্ধানে নিজের চেষ্টার সাহায্যে উদ্ভাবিত আজ পর্য্যন্ত যে সব মুক্তির উপায় বেরিয়েছে, তা’র মধ্যে এই ক্রিয়াযোগই হ’চ্ছে আমার মতে সব চেয়ে ফলপ্রসূ। এর অভ্যাসে দেখা গিয়েছে যে, সর্বশক্তিমান পরমেশ্বর সকল জীবের মধ্যে লুকিয়ে থাকলেও, লাহিড়ী ম’শায় আর তাঁ’র কতকগুলি বিশিষ্ট শিষ্যদের দেহে প্রত্যক্ষভাবে রূপ পরিগ্রহ করেছিলেন।

শাস্ত্রী ম’শায়ের সাক্ষাতে লাহিড়ী মহাশয়ের মহাপ্রভু বীণুখণ্ডের ম’তই এক অলৌকিক ব্যাপার ঘটেছিল। সংস্কৃত পাঠাভ্যাস বন্ধ রেখে এক দিন তিনি সেই ব্যাপারটি বলতে শুরু ক’রলেন,—

“রামু নামে তাঁ’র একটি অন্ধ ভক্ত শিষ্য ছিল। তা’র অবস্থা দেখে মনে বড় দয়া হ’ল। তাবলুম, যা’র মধ্যে ঐশীশক্তি পরিপূর্ণভাবে বিদ্যমান, সেই আমাদের গুরুদেবকে যখন সে আন্তরিক ভাবে সেবা করছে, তখন কি তিনি ওর জন্তে কিছুই ক’রতে পারবেন না? তা’র চোখের আলো কি চিরদিনের মতনই নিভে থাকবে,—না থাকা উচিত? যা’ই হো’ক একদিন সকালে আমি রামুর সঙ্গে এ বিষয়ে কথাটা পাড়লুম। একটা হাত পাখা নিয়ে রামু তখন অত্যন্ত ধৈর্যের সঙ্গে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধ’রে গুরুদেবকে বাতাস ক’রে

চলেছিল। রামু যখন উঠে পড়ল, তখন আমি তাঁ'র পিছু নিলুম। জিজ্ঞাসা ক'রলুম,—

“রামু, কতদিন তুমি অন্ধ হ'য়েছ?”

“জন্মাবধি ম'শাই, সূর্যের আলো কখনও চোখে দেখি নি।”

“আমাদের সর্বশক্তিমান গুরুদেব ত' তোমায় সাহায্য ক'রতে পারেন।

তাঁ'র চরণে একদিন তোমার কথাটা নিবেদন ক'রেই দেখ না কেন?”

“তা'রপর দিন রামু খানিক ইতস্ততঃ ক'রে, লাহিড়ী মহাশয়ের কাছে উপস্থিত হ'ল বটে, কিন্তু তাঁ'র আধ্যাত্মিক ঐশ্বর্যের কাছে সামান্য দেহসম্পর্ক ভিক্ষা ক'রতে রামু যেন একটু লজ্জিত হ'য়েই বললে, ‘গুরুদেব, সারা জগতে আলো যোগান যিনি, তিনি ত' আপনার ভেতরেই রয়েছেন, আপনার কাছে শুধু এইটুকু মাত্র ভিক্ষে য়ে, তাঁ'র আলো আমার চোখে ফুটিয়ে দি'ন, যা'তে ক'রে আমি এ জগতের সূর্যের আলো, যদিও সে আলোর কাছে তুচ্ছ, ত' যেন দেখতে পাই।’

“গুরুদেব বললেন, ‘রামু, এসব কথা তোমায় কে বলেছে? আমাদের ফ্যাসাদে ফেলবার জন্যে কিছু না জেনেই তোমায় কেউ এ সব কথা বলেছে। আমার ত' সারাবার কোন ক্ষমতা নেই, রামু!’

“রামু বললে, ‘ম'শায়, আপনার ভেতর যে অনন্ত শক্তি র'য়েছে, তা'তে ক'রে নিশ্চয়ই আপনি আমায় ভাল ক'রে তুলতে পারেন।’

“সে অবিশ্বি আলাদা কথা রামু। ভগবানের অনন্ত শক্তি, তা'র কোথাও সীমা নেই। যিনি তারায় তারায় আলো আর শরীর কোষে প্রাণের জ্যোতিঃ ফোটাতে পারেন, তিনি নিশ্চয়ই তোমার চোখে দৃষ্টির জ্যোতিঃও ফুটিয়ে তুলবেন।’ এই ব'লে গুরুদেব রামুর কপালের দুই ভ্রু মাঝখানে * স্পর্শ ক'রে বললেন, ‘তোমার মন ঠিক ঐ যায়গায় লাগিয়ে রেখো আর সাতদিন ধ'রে অবিরাম রামনাম জপ করো, সূর্যের আলোর নতুন অরুণোদয় আবার তোমার চোখে হ'বে।’ আশ্চর্য্য! এক হপ্তার মধ্যে তাই'ই হ'ল। জীবনে এই প্রথম রামু প্রকৃতির সুন্দর মুখ দেখতে পে'লে!

* তৃতীয় বা যোগনেত্রের স্থান। মৃত্যুকালে মানুষের চৈতন্য সাধারণতঃ এই পবিত্র স্থানেই আকৃষ্ট হয়—আর সেই হ'চ্ছে মৃতের উর্দ্ধ দৃষ্টির কারণ।

সর্বদর্শী তিনি শিষ্যকে নিভুলভাবে রাম নাম জপ ক'রতে দিয়েছিলেন, যা'র চেয়ে প্রিয় আর কোন নাম তাঁ'র কাছে ছিল না। রামুর মনের ভ্রমিতে ভক্তির চাব দেওয়া ছিল, যা'তে গুরুদত্ত রোগশান্তির মহাবীজ পড়ে অচিরেই তা' অঙ্কুরিত হ'য়ে উঠল।" মুহূর্তেক চুপ ক'রে থেকে শাস্ত্রী মহাশয় পুনরায় গুরুপ্রসঙ্গ স্মরু করলেন, "লাহিড়ী মহাশয়ের যা' কিছু অলৌকিক ব্যাপার ঘটত, তা'তে তিনি নিজের কৃতিত্ব দাবী করে কখনও কোন অহঙ্কারের প্রস্রয় দিতেন না। তাঁ'র আত্মনিবেদনের পরাকাষ্ঠায় তিনি রোগ নিরাময়ে সেই আদ্যাশক্তিকে নিজের মধ্য দিয়ে অবাধে পরিচালিত ক'রতে পারতেন।

"সংখ্যাভীত মানবদেহ, যা' লাহিড়ী মহাশয়ের ঐশী শক্তির দ্বারা চমকপ্রদভাবে আরোগ্য লাভ ক'রেছিল, অবিশ্রি শেষ পর্য্যন্ত তা' চিতার আগুনেই পুড়ে ছাই হ'য়েছে, কিন্তু যে নীরব আধ্যাত্মিক জাগরণ তিনি সংসাধিত ক'রেছিলেন, যে সব মহাজ্ঞানী শিষ্য তিনি তৈরী ক'রেছিলেন, তাঁ'রাই হ'চ্ছেন তাঁ'র অবিনশ্বর কীর্তি।"

সংস্কৃত বিদ্যায় আমার পণ্ডিত হওয়া কখনও ঘ'টে ওঠে নাই বটে, কিন্তু আধ্যাত্মিক বিদ্যায় শাস্ত্রী মহাশয় আমার আরও উচ্চতর শিক্ষা দান করেছিলেন।

৫ম পরিচ্ছেদ

গন্ধীবাবার অলৌকিক ঘটনা প্রদর্শন

“সব জিনিষ আর সব কাষেরই একটা উপযুক্ত সময় আছে,” এই মহাজন বাক্য আমি আমার আশ্বাস লাভের জন্য পাই নি। বাড়ী থেকে কোন যায়গায় গেলেই আমার সন্ধানী দৃষ্টি বেশ সজাগ ও সতর্ক রাখতুম, যদিই বা আমার ভাগ্যে নির্দিষ্ট গুরুর মুখটি কোনো যায়গায় চোখে পড়ে। কিন্তু আমার ইচ্ছার লেখাপড়া শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত তাঁ’র দর্শন কোথাও মেলে নি।

অমরের সঙ্গে হিমালয়ে পলায়ন আর শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজির আমার জীবনে আবির্ভাবের সেই পরম পুণ্য দিনটির মাঝখানে দু’বছর কেটে গিয়ে ছিল। এর মধ্যে আমি অনেকগুলি সাধু মহাত্মাদের দর্শন লাভ করেছিলাম, “গন্ধীবাবা”, সোহহং স্বামী, নগেন্দ্রনাথ ভাট্টা মহাশয়, এবং জগৎবিখ্যাত বাঙ্গালী বৈজ্ঞানিক শ্রীজগদীশ চন্দ্র বসু মহাশয়। গন্ধীবাবার সঙ্গে আমার সাক্ষাতের দু’টি ভূমিকা ছিল, একটি ছিল স্নমধুর আর একটি বেশ মজার!

“ঈশ্বরই পদার্থ আর সবই অ-পদার্থ। আপেক্ষিক জগতের এই জটিল প্রকৃতির মধ্যে কোন বস্তুর সার খুঁজতে যেয়ো না।” কালীমন্দিরের সামনে দাঁড়িয়ে আছি, এমন সময় এই সব দার্শনিক চরম তত্ত্ব সকল আমার কর্ণকুহরে এসে প্রবেশ করল। পিছন ফিরে তাকিয়ে দেখি যে, একটি দীর্ঘাকার পুরুষ—বাঁ’র পরিচ্ছদে, অথবা ব’লতে গেলে তাঁ’র অভাবে, তাঁ’কে পরিব্রাজক সাধু ব’লেই বোধ হ’ল।

আমি সক্রতজ্ঞভাবে হেসে বললাম, “সত্যিই আপনি আমার মনের জটিল চিন্তারাশির মধ্যে প্রবেশ করতে পেরেছেন। কালীপ্রতিমার মধ্যে প্রকৃতির

রুদ্র আর প্রসন্ন এই দুই ভাবের বৈপরীত্য আমার চেয়ে অনেক জ্ঞানী গুণীদেরও বুদ্ধি বিপর্যয় ঘটিয়েছে।”

তিনি বললেন, “অতি অল্পলোক ইচ্ছাছেন, যাঁরা তাঁর রহস্য ভেদ ক’রতে পারেন। এই দুই ভাবের দুর্ভেদ্য প্রহেলিকা সকল লোকের বুদ্ধির কাছে যেন এক বিরাট রহস্য। এর সমাধানের কোন চেষ্টা না ক’রে অধিকাংশ লোকই তাদের জীবন ব্যথাই ব্যয় করে। মান্ধাতার আমল হ’তে, এমন কি আজ পর্য্যন্তও লোকে সেই দণ্ডই দিয়ে আসছে। এক আধজন হয় ত’ তাঁদের বিরাট ব্যক্তিত্বের জোরে কখনও পরাজয় মানতে চায় না। দ্বৈত নারাবাদের মধ্যে হয় ত’ বা সে অদ্বৈতবাদের অথও সত্যের সন্ধান পায়।”

“আপনার কথাগুলি খাঁটি সত্য, ম’শাই।”

“বহুদিন ধ’রে অকপটভাবে নিজের অন্তর খুঁজে দেখেছি, জ্ঞানরাজ্যে প্রবেশের এ দারুণ কঠিন পথ। আত্মপরীক্ষা আর গভীর মনোনিবেশে কঠিন অভিজ্ঞতা জন্মে। প্রবল আত্মাভিমান এ চূর্ণ ক’রে দেয়। খাঁটি আত্মবিশ্লেষণেই কিন্তু স্তম্ভিত ভাবে সত্যদ্রষ্টার ভাব আনয়ন করে। আত্মপ্রকাশের ধারা বা ব্যক্তিগত মতবাদ শেষ পর্য্যন্ত তাঁদের আত্মসত্তারই ক’রে তোলে এই ধারণায় যে, জীব ও শিবের ব্যাখ্যায় তাঁদেরই একচেটে অধিকার।”

আলোচনাটি বেশ ভালই লাগছিল, বল্লুম, “এ রকম অপূর্ব মৌলিকত্বের কাছে কিন্তু সত্য নীরবে হারিয়ে যায়, তা’তে আর সন্দেহ নাই। মানুষ যতক্ষণ পর্য্যন্ত না তাঁর ব্যক্তিগত সংস্কার হ’তে মুক্ত হ’তে পারে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত সে শাস্ত্রত সত্য উপলব্ধি ক’রতে পারে না। মানুষের মন যুগ যুগান্তব্যাপী সংস্কারের পলিমাটিতে চাপাপড়া, সংখ্যাভীত জগৎমায়ার অধীন নিরানন্দ জীবনের নিষ্ফলতায় পরিপূর্ণ।”

“মানুষ যখন তাঁর অন্তঃশত্রুর সঙ্গে লড়াই শুরু করে, বুদ্ধিক্ষেত্রের ভীষণ লড়াই তখন তাঁর কাছে নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর হ’য়ে যায়। দুর্দীর্ঘ শারীরিক শক্তিতে পরাজিত হ’বার এরা মরজগতের শত্রু নয়! সর্বত্রই সজাগ দৃষ্টি, নিরন্তর নিরলস থেকে মানুষকে স্বপ্নেও এরা অনুসরণ ক’রে ফেরে। ভীষণ আর মারাত্মক রকমের অস্ত্রশস্ত্রে গুপ্তভাবে সজ্জিত হয়ে অন্ধ কামনার এই সব

সৈন্তের দল আমাদের হত্যা ক'রবার সুযোগ অনবরত খুঁজে বেড়ায়। অদৃষ্টের কাছে যে আত্মসমর্পণ করে, আর যে তা'র আদর্শের মৃত্যু ঘটায়, সে নিতান্তই দুর্বুদ্ধি আর কি! তা'কে অক্ষম, নীরস আর স্বগ্য ছাড়া, আর কিছু বোধ হয় কি?"

“মশায়, এই সব ভ্রান্ত হতভাগ্যদের জন্তে কি আপনার একটুও সহানুভূতি নেই?”

সামুটি মুহূর্তের জন্তে ক্ষান্ত হ'লেন, পরে একটু প্লেবের সঙ্গে বললেন, “সর্বগুণাধার অপ্রত্যক্ষ ঈশ্বর আর প্রত্যক্ষ মানুষ, যা'র প্রায় কিছুই গুণ নেই বললেই চলে, এই দু'জনকে সমান ভাবে ভালবাসা প্রায় অসম্ভবই বই কি? কিন্তু এ রহস্যেরও একটা সমাধান আছে! অন্তরের মধ্যে খুঁজে দেখলে, মানুষের মন যা' স্বার্থবুদ্ধিজড়িত, তা'র মধ্যেও একটা ঐক্যের ভাব শীগ'গিরই খুঁজে পাওয়া যায়। এক হিসেবে অন্ততঃ মানুষের বিরাট বিশ্ব-ভ্রাতৃত্বের পরিচয় মেলে। এই ঐক্যের প্রকাশে, মানুষের ক্ষুদ্র ও ভীত মন স্তম্ভিত হ'য়ে তা' মেনে নেয়। সেখানে মানুষের ওপর মানুষের দরদ এসে পড়ে। বিকাশোন্মুখ মানবাত্মার নিরাময় আর শান্তিপ্রেমায়িনী শক্তির বিষয়ে যে মন অন্ধ ছিল, তা' একটা উদার দিব্যদৃষ্টি লাভ করে।

“সকল যুগের সাধুসন্তরা ম'শাই, আপনারই মতন জগতের দুঃখে কাতর হ'য়েছেন।”

“কেবল হাক্কা মনের লোকেরাই অপর লোকেদের জীবনের দুঃখ দৈন্তের প্রতি সহানুভূতি হারায়, কারণ তা'দের নিজেদের ছোট খাট দুঃখকষ্টের মধ্যে তা'দের মন ডুবে থাকে।” সামুটির গম্ভীর বদন বেশ সুস্পষ্ট কোমল হ'য়ে এল। বলতে লাগলেন, “যে ছুরি দিয়ে চেরার মতন আত্মব্যবচ্ছেদ ক'রে দেখে, সেই'ই বিশ্বপ্রেমের বিস্তার অনুভব ক'রতে পারে। আর তা'র অহঙ্কারের কান ফাটান চিৎকারও থেমে আসে। এই সব জমিতেই ভগবৎ প্রেমের ফুল ফোটে। অবশেষে জীব আর কিছু না হো'ক, মনের যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে তা'র সৃষ্টিকর্তার দিকে তাকিয়ে বলে, ‘আর কেন প্রভু, আর কেন? আর যে পারি না।’ দারুণ দুঃখের কশাঘাতে জর্জরিত আর তাড়িত হ'য়ে মানুষ শেষে সেই অসীম সত্তার দিকেই ধাবিত হয়, যা'র

একমাত্র অল্পপম রূপের মাধুরীই তা'কে তাঁ'র নিকটে আকর্ষণ ক'রতে পারে।”

সাধুটি আর আমি কলকাতার বিখ্যাত কালীঘাটের মন্দির দর্শন ক'রবার জন্তে গিয়েছিলুম। আমার ক্ষণপরিচয়ের সাথীটি তখনই আবার সঙ্গে সঙ্গে বাগ্মীতার গান্ধীর্ষ্য দূরে সরিয়ে ফেলে ব'লে উঠলেন,—

“ইট কার্ঠে মনে কোন সাড়া জাগে না, হৃদয় কেবল প্রাণের স্মরেই উন্মুক্ত হয়।” স্বর্ঘ্যের কিরণ তখন বেশ মিষ্টি লাগছিল, আমরা দরজার দিকে এগোলুম। মন্দিরে প্রবেশার্থীর দল তখন যাওয়া আসা ক'রছিল।

সাধুটি আমায় চিন্তিতভাবে নিরীক্ষণ ক'রে বললেন, “তুমি শিশু, ভারত-বর্ষও শিশু! প্রাচীন মুনি ঋষিরা আধ্যাত্মিক জীবনের স্মৃতির আদর্শ স্থাপন ক'রে গেছেন। তাঁ'দের সনাতন প্রথা বর্তমান দেশ ও কালের পক্ষেও যথোপযুক্ত। জড়বাদের মোহে আচারভ্রষ্ট আর বিকৃত না হ'য়ে সেই সব ধর্ম্মানুশাসন বা তা'র উপদেশাদি এখনও ভারতবর্ষকে গড়ে তুলছে। হাজার হাজার বছর ধ'রে হতবুদ্ধি পণ্ডিতেরা যা' গণনাতেও নির্দ্ধারিত ক'রতে পারেন নি, সেই কালের বিচারে বেদের মূল্য আজ নিরূপিত হ'য়ে গেছে। এইটেই তোমার উত্তরাধিকার বলে গ্রহণ কো'রো।”

পরম বাগ্মী সেই সাধুটির কাছ হ'তে বিদায় গ্রহণ ক'রবার সময় তিনি এক ভবিষ্যদ্বাণী ক'রে বসলেন, “এখান থেকে যা'বার পরই কিন্তু তোমার একটি অদ্ভুত ব্যাপার ঘটবে দেখো।”

মন্দির সীমানা ছেড়ে আমি উদ্দেশ্যবিহীনভাবে ঘুরে বেড়াতে লাগলুম। একটা বাঁক ঘুরতেই বহুদিনের পরিচিত একটি লোকের সঙ্গে হঠাৎ দেখা হ'য়ে গেল। ইনি হ'চ্ছেন সেই সব মহাপ্রভুদের একজন, যাঁ'দের একবার আলাপ জুড়লে আর স্থানকালের কোন মাত্রা জ্ঞান থাকে না।

আমি কিন্তু তখন তা'র হাত এড়িয়ে তাড়াতাড়ি স'রে পড়বার মতলব ক'রছিলুম দেখে সে বললে, “আচ্ছা, তোমায় আমি শীগ'গিরই ছেড়ে দি'চ্ছি দাঁড়াও, কিন্তু আমাদের এই দু'বছর ছাড়াছাড়ির ভেতর যা' কিছু ঘটেছে, তা' সব একে একে বল দি'কি।”

বললুম, “কি মুঞ্চিল! আরে আমাকে যে এখুনিই যে'তে হ'বে।” কিন্তু

হ'লে কি হয়, কে বা শোনে কা'র কথা। সে ত' আমার হাতটি পাক্ড়ে যত সব টুকিটাকি খবর সব একে একে বা'র ক'রে নিতে লাগল। মজা মন্দ নয়! যতই আমি বলি, ততই সে ক্ষুধার্ত নেকড়ের মত আরও খবরের সন্ধানে লালায়িত হয়। মনে মনে আমি ত' মা কালীর কাছে, যা'তে আমি চট ক'রে পালাতে পারি, তা'র একটা উপায় বা'র ক'রে দে'বার জন্যে প্রার্থনা শুরু ক'রলুম।

লোকটি হঠাৎ আমাকে ছেড়ে চলে গেল। একটা মুক্তির নিঃশ্বাস ফেলে দ্বিগুণ জোরে পা চালিয়ে দিলুম এই ভয়ে যে, আবার তা'র পাল্লায় আর যা'তে না পড়তে হয়! পশ্চাতে দ্রুত পদধ্বনি শুন্তে পেয়ে আমিও গতি বৃদ্ধি করলুম। পিছনে তাকাতে আর সাহস হ'ল না। কিন্তু এরই মধ্যে একটি লক্ষ্যপ্রদানে বন্ধুবর খুব স্মৃতির সঙ্গে আমার কাঁধটি ধ'রে এসে দাঁড়াল। তার পরেই শুরু হ'ল,—

“আরে, আমি যে তোমায় গন্ধবাবার কথা বলতে একেবারেই ভুলে গিয়েছিলুম। উনি ঐ সামনের বাড়ীতেই থাকেন।” ব'লে সে গজ কয়েক দূরে একটা বাড়ী দেখিয়ে দিলে। তা'রপর বললে, “ওঁকে দর্শন ক'রে যেয়ো কিন্তু, বুঝলে? অতি আশ্চর্য্য লোক! তুমি অনেক অদ্ভুত ব্যাপার ওখানে দেখতে পাবে। যা'ই হো'ক, এখন আমি চললুম তবে।” ব'লে এবার কিন্তু সত্যি সত্যিই সে চলে গেল।

কালীঘাটের সেই সাধুটির ভবিষ্যদ্বাণীর কথা তখন আমার মনে পড়ে গেল। কোতুহলের বশবর্তী হ'য়ে সেই বাড়ীতে গিয়ে ত' ঢুকলুম। ঢুকে দেখি, একটি বেশ প্রশস্ত বৈঠকখানায় একটা গেকরয়া রঙের পুরু গালিচার ওপর বহু লোক এখানে ওখানে বসে রয়েছে। গিয়ে বসতে একটা অদ্ভুত বিশ্বয়ের চাপা ফিস্‌ফিসানি আমার কাণে এসে ঢুকল,—

“ঐ দেখ, গন্ধবাবা বাঘছালের ওপর বসে র'য়েছেন। উনি যে কোন গন্ধহীন ফুলের ভেতর স্বাভাবিক সুগন্ধ এনে দিতে পারেন। তা' ছাড়া, কোন শুকন কুঁড়ি ফুটিয়ে তুলতে অথবা কারুর গা থেকেও অতি মনোরম গন্ধ বা'র ক'রতে পারেন।”

শুনে সাধুটির দিকে আমি সোজা তাকালুম। সাধুটিরও চঞ্চল দৃষ্টি

আমার ওপর এসে স্থির হ'য়ে দাঁড়াল। শ্রামবর্ণ নখর দেহটি, শ্মশ্রুবিশিষ্ট, চক্ষু দুটি বেশ বড় বড় আর উজ্জ্বল। বললেন, “বাবা, তোমায় দেখে খুব খুসী হ'য়েছি। কি চাও বল? কোন কিছু গন্ধ চাই?”

মনে হ'ল, কথাগুলো যেন ছেলেমানুষের মত। জিজ্ঞাসা ক'রলুম, “কেন?”

বললেন, “অলৌকিক উপায়ে গন্ধ বে'রুচ্ছে, দেখতে পা'বে।”

“ভগবানকে গন্ধ তৈরীর কাষে লাগান নাকি?”

“তা'তে আর কি? ভগবানই ত' গন্ধ তৈরী করেন?”

“তা' বটে! তবে তিনি ফুলের নরম পাপড়ির ভেতরেই গন্ধ তৈরী করেন, সত্ত্ব সত্ত্ব ব্যবহার ক'রে ফেলে দে'বার জন্তে। আপনি ফুল তৈরী ক'রতে পারেন কি?”

“বাবাজি, আমি কেবল গন্ধই তৈরী ক'রতে পারি।”

“তা'হ'লে গন্ধ তৈরীর কারখানা ত' সব উঠে যাবে।”

“আরে না, না, তা'দের ব্যবসা টিক বজায় থাকবে। আমার নিজের উদ্দেশ্য হ'চ্ছে, ঈশ্বরের শক্তির পরিচয় দেওয়া মাত্র, আর কিছু নয়, বুঝ'লে?”

“ম'শায়, ঈশ্বরের প্রমাণের কোন দরকার করে নাকি? তিনি কি সর্বত্র সকল বিষয়েই অলৌকিক ব্যাপার দেখাচ্ছেন না, ব'লুন?”

“হ্যাঁ, কিন্তু তাঁ'র অনন্ত সৃষ্টিবৈচিত্র্যের মধ্যে সামান্য কিছু ত' আমরাও দেখাতে পারি।”

“কতদিন আপনার এ বিদ্যায় পারদর্শী হ'তে লেগেছে?”

“বার বৎসর।”

“অলৌকিক উপায়ে গন্ধ তৈরী করার জন্যে? পূজনীয় সাধুজি, মনে হয় যে, কোন গন্ধ বিক্রেতার দোকান থেকে গোটা কতক টাকার বদলে আপনি যা' পে'তে পারেন, তা'র জন্যে বৃথাই আপনি এই বারোটা বছর ব্যয় করেছেন।”

“গন্ধ ত' ফুলের সঙ্গে সঙ্গেই চলে যায়।”

“হ্যাঁ, কিন্তু গন্ধ ত' মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেও চলে যায়। শুধু মাত্র দেহেব তৃপ্তির জন্যে তা' আমি চাইব কেন?”

“দার্শনিক প্রবর! তোমার কথা শুনে খুব খুসী হ’লুম। নাও, তোমার ডান হাতটি বাড়িয়ে দাও ত’ দেখি,” বলে আশীর্বাদচ্ছলে দক্ষিণ হস্তটি প্রসারিত ক’রলেন।

গন্ধীবাবার কাছ থেকে আমি গজ কতক দূরে বসেছিলাম। আমার গা ছুঁয়েও কোন লোক সেখানে বসে ছিল না। আমি হাত বাড়ালে যোগিবর তা’ কিছু স্পর্শও ক’রলেন না। শুধু জিজ্ঞাসা ক’রলেন, “তোমার কি গন্ধ চাই?”

“গোলাপ।”

“বেশ, তা’ই হ’বে।”

অপরিসীম বিশ্বয়ে দেখলুম যে, গোলাপের মনোরম সৌরভ আমার কর-তলের মধ্যস্থল হ’তে তীব্রভাবে ফুটে বেরুচ্ছে। আমি একটু হেসে কাছের ফুলদানী থেকে একটি গন্ধহীন ফুল তুলে নিয়ে বললুম, “এই ফুলটিতে কি বুঁইফুলের গন্ধ হ’তে পা’রে?”

“তা’ই হ’বে।”

ফুলের পাপড়িগুলি থেকে তখনই বুঁই ফুলের গন্ধ ভর ভর করে বেরুতে লাগল। এই অপূর্ব ইন্দ্রজালের সৃষ্টিকর্তাকে ধন্যবাদ দিয়ে, তাঁ’র একটি শিষ্যের পাশে গিয়ে বসলুম। তিনি বললেন যে, গন্ধীবাবা, বাঁ’র আসল নাম বিশুদ্ধানন্দ স্বামী, তিব্বতে এক গুরুর কাছ হ’তে যোগের নানা আশ্চর্য্য প্রক্রিয়া শিক্ষা ক’রে এসেছেন। তিব্বতী যোগীটির বয়স শুনলুম, হাজার বছরেরও ওপর।

শিষ্যটি বেশ একটু প্রকাশ্য গর্বের স্বরে বললে—“তাঁ’র শিষ্য গন্ধীবাবা। আপনি এইমাত্র যে রকম দেখলেন, তেমনি যখন তখন উনি কথায় কথায় গন্ধ তৈরী করেন না। অবিশ্যি মেজাজ অনুযায়ী ঠুঁর কাষের অনেক তারতম্য হয়। ঠুঁর অদ্ভুত শক্তি! কলকাতার বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি ঠুঁর শিষ্যদের ভেতর আছেন।”

আমি মনে মনে ঠিক করলুম, আমি আর এদের দল বাড়াব না। একেবারে খাঁটি “অলৌকিক শক্তিশালী” গুরু আমার ঠিক মনের মত নয়। গন্ধীবাবাকে বিনম্র ধন্যবাদ প্রদান ক’রে সেখান হ’তে প্রস্থান ক’রলুম।

বেড়াতে বেড়াতে বাড়ী ফেরবার সময় সে দিনকার তিনটি বিচিত্র বিষয়ের কথা ভাবতে লাগলুম।

গড়পার রোডের বাড়ীর দরজায় পা দিতেই উমা দিদির সঙ্গে দেখা। বললে, “আজকাল বড্ডই চাল বেড়ে গেছে দেখছি, স্নগন্ধি ব্যবহার করা হচ্ছে। ব্যাপার কি বল দিকি?”

কথাটি মাত্র না ক’রে হাতটি বাড়িয়ে দিদির কাছে তা’ গুঁকতে ইসারা ক’রলুম। গুঁকেই চোঁচিয়ে বলে উঠল, “আঃ কি চমৎকার গোলাপের গন্ধ, আর কি অস্বাভাবিক উগ্র!” “সত্যিই ব্যাপারটা উগ্র রকমের অস্বাভাবিক” ভেবে নিঃশব্দে তা’র নাকের কাছে সেই অলৌকিক উপায়ে স্নগন্ধকরা ফুলটি ধরলুম!

“ওঃ যুঁইফুল আমি বড্ড ভালবাসি।” বললেই সে ফুলটি ছিনিয়ে নিলে। দিদি জানত যে, ও ধরণের ফুল একেবারেই গন্ধহীন, কিন্তু তা’ থেকে যুঁইফুলের গন্ধ বারম্বার গুঁকতে গুঁকতে তা’র মুখে এক রকম নির্ঝোঁধের মত হাসি দেখা দিলে। দিদির ওপর গন্ধের ক্রিয়াতে আমার এ সন্দেহটা দূর হ’ল যে, গন্ধীবাবা আমার আত্মসম্মোহিত অবস্থা আনাতে, তা’তে ক’রে কেবল আমিই যে গন্ধটা টের পাচ্ছিলুম, দেখছি যে তা’ নয়!

পরে আমি আমার বন্ধু অলকানন্দের কাছে হ’তে গন্ধীবাবার আর একটি অলৌকিক শক্তির কথা শুনে ছিলাম—যা শুনে মনে হ’ল যে, হায় রে, লক্ষ লক্ষ ক্ষুধিত এসিয়াবাসী এবং এখন ইউরোপবাসীদেরও আজকে যদি তা’ থাকত, তা’হ’লে কি যে হ’য়ে দাঁড়াত, তা’ বলা যায় না!

অলকানন্দ বললে, “বর্ধমানের গন্ধীবাবার আশ্রানায় এক উৎসব উপলক্ষ্যে শতাধিক অভ্যাগতদের মধ্যে আমিও উপস্থিত। খুব সমারোহ ব্যাপার। অনেকেই এসেছেন। যোগিবরের শূণ্য থেকে জিনিষ তৈরী ক’রবার কথা শুনে আমি একটু হেসে কিছু অসময়ের ট্যাঞ্জারিন্ লেবু তৈরী ক’রবার কথা বললুম। সঙ্গে সঙ্গে কলাপাতের ওপর পরিবেশন করা লুচিগুলো বেশ ফুলে উঠল। প্রত্যেকটি লুচির খোলার ভেতর একটি করে খোসা ছাড়ান ট্যাঞ্জারিন! আমারটিতে ত’ ভয়ে ভয়ে কামড় দিলুম। কিন্তু দেখলুম, তা’ অতি চমৎকার!”

বহু বৎসর পরে আমি আত্মোপলব্ধিবলে জানতে পেরেছিলুম, কি ক'রে গন্ধীবাবা ঐ সব তৈরী ক'রতেন। কিন্তু হায়! এ জগতের অর্থলোলুপ ব্যক্তিদের দল কোন কালেই সে প্রক্রিয়াটির ধারেও গিয়ে পৌঁছতে পা'রবে না। বিভিন্ন স্নায়বিক উদ্ভেজনা, বা মানুষের ওপর প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করে—শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ—তা' সব ইলেকট্রন আর প্রোটনের স্পন্দন তারতম্যে উৎপন্ন হয়। এই স্পন্দনগুলি আবার “লাইফট্রন” দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। এই “লাইফট্রন”ই হ'চ্ছে, হৃদয় প্রাণশক্তি অথবা পরমাণবিক শক্তি অপেক্ষাও হৃদয়তর শক্তি, স্নাকৌশলে পঞ্চতন্মাত্রের উপর প্রতিষ্ঠিত।

গন্ধীবাবা কতকগুলি ষৌগিক প্রক্রিয়া বিশেষের বলে নিজেকে এই মহাব্যোমশক্তির সঙ্গে একত্বেরে বেঁধে এই সব “প্রাণকণিকা” গুলির স্পন্দনশীল গঠন কার্যে পরিবর্তন সাধিত ক'রে, তা'দের ইচ্ছামত রূপ দিয়ে নিজের অভীষ্ট সিদ্ধ ক'রতে পারতেন। তাঁ'র গন্ধ তৈরী বা, ফল তৈরী বা অত্যাশ্চর্য্য কাণ্ড সকল এই সব মহাজাগতিক স্পন্দনেরই বাস্তব রূপ প্রদান, আর তা' সন্মোহিত অবস্থায় কোন আত্যন্তরীণ অভূতভূতি নয়!*

*বিংশ শতাব্দীতে বিজ্ঞানের বিরাট অগ্রগতি সাধারণ লোকে অতি অল্পই জানে। পৃথিবীর সর্বত্রই আজ বৈজ্ঞানিক গবেষণার সব কেন্দ্রে ধাতুর রূপান্তরসাধন আর অত্যাশ্চর্য্য কিম্বি বিদ্যার স্বপ্ন সকল প্রত্যহই সফলতা লাভ ক'রছে। ১৯২৮ সালে বস্টেনব্রোতে লব্ধপ্রতিষ্ঠ ফরাসী বৈজ্ঞানিক মঁসিয়ে জর্জেস ক্লুড এক বিজ্ঞানসভায় অল্পজ্ঞানের রূপান্তরসাধনের রাসায়নিক জ্ঞানবলে বহু অলৌকিক ব্যাপার প্রদর্শন করেন। তাঁ'র “যাত্রাকরের দণ্ড” ছিল, টেবিলের উপর নলের ভিতর ফুটন্ত শুধু অল্পজ্ঞান। বৈজ্ঞানিক মহাশয় একমুষ্টি বালুকাকে মহামূল্য প্রস্তর, লৌহকে গলিত চকোলেটের অবস্থায় এবং ফুলেদের বর্ণলোপ সাধন ক'রে তাদের কাছে পরিণত করেন।

মঁসিয়ে ক্লুড অল্পজ্ঞান-রূপান্তরসাধন বলে কেমন ক'রে সমুদ্রকে কোটি পাউণ্ডের অগ্নিশক্তিতে পরিণত, জল কি করে জ্বাল না দিয়েও ফোটান যায়, হৃদ্র বালুকাপিণ্ডকে, অল্পজ্ঞান রো-গাইপের একটিমাত্র ফুৎকারে নীলা, চুণি আর পোখরাজে পরিণত করা যায়, তা'র ব্যাখ্যা করেন। তারপর তিনি ভবিষ্যদ্বাণী করেন যে, এমন সময় আসবে যে, মানুষ ডুবুরির সাজসজ্জা বিনাই সমুদ্রতলে চলাফেরা করতে পারবে। অবশেষে তিনি স্বর্ধাকিরণ হতে রক্তবর্ণ শোষণ ক'রে নিয়ে দর্শকবৃন্দের মুখমণ্ডল কৃষ্ণবর্ণে পরিণত ক'রে সকলকে চমৎকৃত করেন।

এই হুবিখ্যাত বৈজ্ঞানিক সম্প্রসারণ ক্রিয়ায় তরল বায়ু উৎপাদন করেছেন—এতে তিনি বায়ু মণ্ডলের বিভিন্ন প্রকারের গ্যাস পৃথক করতে সমর্থ হ'য়েছেন, আর তা' ছাড়া সমুদ্র জলের তাপের তারতম্যের যান্ত্রিক ব্যবহারের নানাবিধ উপায়ও আবিষ্কার করতে সমর্থ হয়েছেন।

গন্ধীবাবা প্রদর্শিত অলৌকিক কার্যাবলী দেখতে অবশ্য খুবই আশ্চর্য-জনক বটে, কিন্তু আধ্যাত্মিক ভাবে সে সব একেবারেই নিরর্থক। একমাত্র আনন্দবিধান ছাড়া তা'র আর কোনও সার্থকতা না থাকাতে এরা গভীর ঈশ্বরানুসন্ধিৎসার পথ থেকে লক্ষ্যভ্রষ্ট করে।

যে সব লোকেদের এনেস্থিটিক প্রয়োগে বিপদ ঘটতে পারে, তা'দের ছোটখাট অস্ত্রোপচারে চৈতন্যবাসাদক ক্লোরোফর্ম হিসাবে ডাক্তারেরা সন্মোহনবিদ্যা প্রয়োগ করেন। কিন্তু যা'দের বারবার এ রকম অবস্থা উৎপাদিত হয়, তা'দের উপর সন্মোহনশক্তির প্রয়োগ অত্যন্ত ক্ষতিকর, কারণ এর ফলে পরে এমন একটা বিরুদ্ধ মনস্তাত্ত্বিক ক্রিয়া প্রকাশিত হয়, যা'তে ক'রে, কালে ক্রমে ক্রমে মস্তিষ্কের কোষগুলির মধ্যে একটা বিশৃঙ্খলার ভাব এনে ফেলে। সন্মোহনবিদ্যা হ'চ্ছে অপরের চিন্তভূমিতে অনধিকার প্রবেশ। এর সাময়িক ব্যাপার ঈশ্বরানুভূতিসম্পন্ন ব্যক্তিদের কার্যকলাপের তুল্য কখনই নয়। ঈশ্বরে উদ্বুদ্ধ প্রকৃত সাধুসম্ভরা, এই নিখিল বিশ্বস্বজনকারী যে একজন স্বপ্নদ্রষ্টা আছেন, তাঁ'রই ইচ্ছার সঙ্গে একত্বের বাঁধা তাঁ'দের ইচ্ছাশক্তিবলে এই স্বপ্নজগতে নানা পরিবর্তন সাধিত করতে পারেন।

খাঁটি গুরুরা কিন্তু অসাধারণ শক্তির অযথা ও সাড়স্বর প্রদর্শন আদৌ পছন্দ করেন না।

পারশ্ব দেশের মিষ্টিক, আবু সৈয়দ কিন্তু একবার এই জল, স্থল ও অন্তরীক্ষের উপর ক্ষমতালাভে দৃষ্ট কতকগুলি ফকিরকে মৃদু ভৎসনাচ্ছলে বলেছিলেন,—“ব্যাং জলে বাস করে, সেইটাই তা'র স্বাভাবিক স্থান, কাক-শকুন অতি সহজেই হাওয়ায় উড়ে বেড়ায়। শয়তানের গতিবিধি কিন্তু সর্বত্র। সত্যিকারের খাঁটি মানুষ কিন্তু সেই, যে তা'র স্বজনদিগের সঙ্গে সাধু ব্যবহার করে—ভবের হাটে যা'র বেচাকেনা চলে, কিন্তু মুহূর্তেকের তরেও সে ভগবানকে ভোলে না।” আর এক উপলক্ষ্যে পারশ্বদেশের সেই মহান শিক্ষাগুরু ধর্মজীবন সম্বন্ধে এই রকম উপদেশ দিয়েছিলেন,—

“তোমার মাথার ভেতর যা' সব ঢুকে আছে (স্বার্থপর চিন্তা আর নানা হুঁশা) তা' সব দূর ক'রে ফেল, তোমার হাতে যা' আছে, তা' সব

অকুণ্ঠভাবে বিতরণ কর। আর দুঃখেব আঘাতে কখনও মুবড়ে পোড়োনা।”

কালীঘাটের সেই নির্লিপ্ত সাধু, বা তিব্বতে শিক্ষাপ্রাপ্ত সেই যোগী কেউই আমার গুরু অব্যবহের আকাজ্জক্য পরিতৃপ্তি এনে দিতে পারেন নি।

আমার অন্তরে তাঁ’র পরিচয়ের জন্মে কোন উপদেষ্টারও প্রয়োজন হয় নি। শেষ পর্যন্ত যখন আমি আমার গুরুর সাক্ষাৎ পেলুম তখন একমাত্র তাঁ’র মহিমময় আদর্শের মধ্যেই প্রকৃত মাহুবাটির পরিচয় পেলুম—আর কিছুই দরকার রইল না।

৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদ

সোহহং স্বামী

স্কুলের বন্ধু চণ্ডী একদিন এসে এই মনোরম প্রস্তাবটি ক'রে বসলে,
“ওহে, সোহহং স্বামীর ঠিকানাটি এবার খুঁজে বা'র ক'রেছি—চল, কাল
তা'কে দর্শন করে আসা যা'ক।

সন্ধ্যাস নে'বার আগে তিনি শুধু হাতে বাঘ ধ'রে তা'দের সঙ্গে লড়াই
ক'রতেন ব'লে, সাধুটিকে দেখবার আমার অত্যন্ত আগ্রহ ছিল। এ রকম
দুঃসাহসিক আর অসাধারণ শক্তির অধিকারীকে দেখবার জন্যে বালকদের
মতন উৎসাহ মনে অত্যন্ত প্রবল হয়ে উঠল।

তা'রপর দিন সকালে খুব ঠাণ্ডা পড়েছে। বন্ধু চণ্ডী আর আমি
কিন্তু খুব স্মৃতির সঙ্গে রাস্তায় বে'রিয়ে প'ড়লুম। কলকাতার ভবানীপুরে
কিছুক্ষণ বৃথা খোঁজাখুঁজির পর খানিক বাদে ঠিক বাড়ীটা পে'য়ে গেলুম।
বহুক্ষণ প্রচণ্ড শব্দে কড়া নাড়ার পর বাড়ীর ভৃত্য মহাশয় গদাই লঙ্করী
চালে বে'রিয়ে এসে সহাস্য বদনে দর্শন দিলেন। তা'র সেই বিজ্ঞপাত্তক
হাসিতে বেশ বোঝা গেল যে, এত দারুণ শব্দ সৃষ্টি করেও আগন্তকেরা সাধু
মহারাজের আস্তানার নীরবতা ভঙ্গ ক'রতে অক্ষম!

যাই হো'ক, তা'র নীরব তিরস্কার ত' হজম ক'রে, আমরা দু'জনে বৈঠক-
খানায় গিয়ে বসতে পে'য়ে কৃতার্থ হ'য়ে গেলুম। বহুক্ষণ ধ'রে সেখানে বসে
অপেক্ষা কর'তে গিয়ে মনে নানা রকম অস্বস্তিকর ভাবের উদয় হ'তে লাগল।
সাধুসন্ন্যাসীদের খোঁজে যা'রা ফেরেন, অসীম ধৈর্য্য ধারণ ক'রে থাকাই হ'চ্ছে
তা'দের রীতি! হয় ত' সাধু মহারাজেরা ইচ্ছে ক'রেই তা'দের ঠিক
কতটা আগ্রহ আছে, তা' দেখবার জন্তেই এই রকম পরীক্ষা করেন। পশ্চিমে
কিন্তু ডাক্তার আর দস্ত চিকিৎসকদের দ্বারা এই ধরনের মনস্তাত্ত্বিক পরীক্ষা
চলে।

অবশেষে ভূত্যবর এসে আমাদের আহ্বান জানাতে চণ্ডী আর আমি একটি ঘরে গিয়ে প্রবেশ করলুম—দেখা গেল সেটি একটি শোবার ঘর। বিখ্যাত সোহহং স্বামী বিছানার ওপর বসে ছিলেন। তাঁর বিরাট বপু দর্শনে আমাদের অদ্ভুত ভাবান্তর উপস্থিত হ'ল। বিশ্বয়বিস্ফারিত নয়নে আমরা নির্ঝাঁকভাবে দাঁড়িয়ে রইলুম। এ রকম বিরাট বক্ষঃস্থল বা ফুটবলের মত হাতের গুলি আমরা জীবনে কখনো দেখি নি! সাধু ভাষায় যাঁকে বলে, “ব্যটোরঙ্গ বৃষঙ্গ শালপ্রাংগু মহাভুজ” তাঁই আর কি! প্রকাণ্ড ঘাড়ের ওপর স্বামীজির তীষণ অথচ শান্ত মুখ ঘন গোঁপ দাড়ি আর বাবরিচুলে ঘেরা! কালো চোখে তাঁর একাধারে হরিণের শান্তকোমল আর বাঘের হিংস্র তীষণ দৃষ্টি! পেশীবহুল কোমরে একটা বাঘছাল জড়ান ছাড়া আর কিছুই ছিল না!

গলার স্বর ফুটলে, বন্ধুটি আর আমি, বাঘের সঙ্গে লড়াইয়ে তাঁর অপূর্ণ শৌর্যের বিষয়ে শ্রদ্ধা প্রকাশে প্রণাম করে বললুম, “আচ্ছা স্বামীজি, অভয় দয়া করে একটু বলুন না, জঙ্গলে যে সব চেয়ে ভয়ঙ্কর জানোয়ার, সেই রয়েল বেঙ্গল টাইগারদের শুধু খালি হাতে কেমন করে দাবিয়ে রাখা বা কার্য করে ফেলা সম্ভব?”

“বাবা, বাঘের সঙ্গে লড়াই করা আমার কাছে কিছুই নয়। দরকার হ'লে আমি এখনিই লেগে যেতে পারি।” শিশুর মত সরল হাসিতে মুখখানি তাঁর ভরে গেল, বললেন, “তোমরা বাঘকে বাঘ বলেই দেখ, আমি কিন্তু ওদের শুধু মেনী বেড়াল বলেই ভাবি।”

“স্বামীজি, মনে হয়, অবচেতন মনে এ চিন্তা ঢোকালেও ঢোকাতে পারি যে বাঘেরা পুঁষি বেড়াল মাত্র, কিন্তু বাঘেদের কি তা' বিশ্বাস করাতে পার'ব?”

“অবিশ্রি শক্তিরও প্রয়োজন আছে। একটা শিশু, বাঘকে বাড়ীর পোষা বেড়াল ব'লে ভাবলে ব'লেই কি আর তা'র কাছ থেকে বাঘকে লড়াইয়ে হারান আশা করা যেতে পারে, ব'ল? আমার এই মজবুত হাত দু'টিই হ'চ্ছে আমার ব্রহ্মাঙ্গ!”

তাঁরপর তিনি আমাদের দালানের দিকে নিয়ে চললেন। সেখানে গিয়ে

একটা দেওয়ালের ধারে একটি ঘুঁসি মারতেই একটা ইঁট সোজা খুলে বেরিয়ে মেঝেতে পড়ল আর সেই দেওয়ালের ফোকলা দাঁতের ভেতর দিয়ে আকাশের বেশ খানিকটা বড় অংশ উঁকি মাবলে। হতভম্ব হ'য়ে ত' আমি ড্যাব্ ড্যাব্ ক'রে চেয়ে রইলুম। ভাবলুম, একটি ঘুঁষির ঘায়ে যিনি নিরেট দেওয়াল থেকে চুণস্বরকি দিয়ে পাকাপোক্ত ক'রে গাঁথা ইঁট খসিয়ে দিতে পারেন, নিশ্চয়ই তিনি বাঘের দাঁতও খসিয়ে দিতে পারেন।

স্বামীজি বললেন, “কতক গুলো লোকের আমার মত গায়ে জোর আছে বটে, কিন্তু মনে তা'দের দৃঢ় বিশ্বাস নেই। যা'রা শরীরে খুব মজবুত কিন্তু মনে তেমনি নয়, তা'রা কিন্তু জঙ্গলের মধ্যে হিংস্র জন্তুব উল্লম্বন দেখা মাত্রই মুছাঁ যে'তে পা'রে। স্বাভাবিক আবেষ্টনীর মধ্যে হিংস্র বাঘের সঙ্গে আর আফিম খাওয়ান সার্কাসের বাঘের সঙ্গে আকাশ পাতাল তফাৎ।

“ভীমের মত প্রচণ্ড শক্তিশালী এমন অনেক লোক একটা রয়েল বেঙ্গল টাইগারের একটা লাফের সামনে দারুণ ভয়ে একেবারে কাবু হ'য়ে পড়েছে, এও দেখা গে'ছে। এই রকমে বাঘেই মানুষকে তা'র নিজের মনের ভেতরেই তা'কে পোষা বেড়ালের মতন ভীকু আর নিরুপায় ক'রে তোলে। বেশ সবল আর দৃঢ় শরীর আ'র তা'র সঙ্গে অসীম মনের জোর যা'র ভেতরে আছে, সে উন্টে বম্বেকেই পোষা বেড়ালের মতন আত্মরক্ষায় অসমর্থ ক'রে ফেলতে পা'রে। ঠিক ঐ রকমই আমি যে কতবার ক'রেছি, তা'র আর ঠিক নেই।”

আমার সামনে যে ভীমমূর্তিটি, তা' বাঘকে যে একেবারে পোষা বেড়াল বানিয়ে ফেলতে পারে, তা' বিশ্বাস ক'রতে আমি সম্পূর্ণ প্রস্তুত ছিনুম। তাঁ'র এই কৌতূহলোদ্দীপক কাহিনীর মধ্যে কিঞ্চিৎ উপদেশ বিতরণও ছিল, আর তা' চণ্ডী আর আমি সসম্মুখে গুনতে লাগলুম,—“মনই আমাদের দেহের সব পেশী চালনা করে। হাতুড়ীর ঘা—কতটা জোর দেওয়া যায়, তা'র ওপর নির্ভর করে। মানুষের শরীরযন্তের দ্বারা যে শক্তির প্রকাশ হয়, তা' তা'র আক্রমণের জন্তে মনের দৃঢ়তা আর সাহসের উপর নির্ভর করে। শরীরটা প্রকৃতপক্ষে মনের দ্বারাই সৃষ্ট ও পুষ্ট। অতীত জীবনের সহজাত সংস্কারের প্রভাবেই শক্তি অথবা দুর্বলতা মানুষের চেতনার ওপর ধীরে ধীরে সঞ্চারিত হয়। প্রথমতঃ তা'রা অভ্যাসরূপে দেখা দেয়, তা'রপর তা'রা অভীক্ষিত বা

হ'য়ে পড়লুম। সূর্যের রোদ তখন খুব প্রচণ্ড—আড়াল ক'রবার জন্তে চাকরে মাথার ওপর ঝালর দেওয়া কারুকার্যময় একটা প্রকাণ্ড ছাতা খুলে ধ'রলে! সহরের ভেতর দিয়ে সহরতলীতে গিয়ে পড়ে, এমন নিশ্চিন্ত আরামে গাড়ী চড়ে বেড়ানটা পরম উপভোগ্য বলেই বোধ হ'চ্ছিল। রাজপুত্র স্বয়ং আমার রাজপ্রাসাদের দ্বারের অভ্যর্থনা ক'রবার জন্তে দণ্ডায়মান। ভিতরে নিয়ে গিয়ে তাঁর নিজের সোনার কারুকার্যকরা আসনটিতে আমার বসালেন—আর নিজে একটা সাধারণ গোছের চেয়ারেতেই বসলেন।

“উত্তরোত্তর বিশ্বয় আমার বেড়েই চলল। ভাবলুম, ‘এই সব খাতির দেখাবার উদ্দেশ্য হ'চ্ছে, আমার নিশ্চয়ই কোন কিছু একটা ক'রতে হ'বে। সেটা কি? সেটা কি?’ ভাবছি—দেখলুম রাজকুমারের মতলব ছ' একটা সাধারণ কথাবার্তার পরই বেরিয়ে পড়ল। বললেন, ‘সারা সহরে রাটে গেছে যে, আপনি শুধু হাতে জঙ্গলের বাঘের সঙ্গে লড়াইতে পারেন! সত্যি নাকি?’

“বললুম ‘খুবই সত্যি।’

“‘বলেন কি ম'শাই, আমার যে বিশ্বাসই হয় না! আপনি কলকাতার ভেতো বাঙ্গালী—সহরে লোকেদের মত সাদা চাল খেয়েই মানুষ! আচ্ছা ম'শাই, সত্যি করে বলুন দেখি, আপনি কি সেই সব কোমর ভাঙ্গা অফিস খাওয়ান, রিমিয়ে পড়া বাঘগুলোর সঙ্গেই কেবল লড়েন, না? স্বর তাঁর কিষ্কিৎ চড়া, আর টিটকারী দেওয়া—তা'তে কিছু প্রাদেশিকতার টানও আছে।

“তাঁর এই রকম অপমানজনক প্রশ্নে আমি কোন উত্তরই দিলুম না। চুপ করে বসেই রইলুম।

“কিছুক্ষণপরে আবার তিনি জ্বর ক'রলেন,—‘শুধুন ম'শায়, জঙ্গল থেকে একটি ভীষণ বাঘ টাটকা ধ'রা পড়েছে—নাম দিয়েছি তা'র “রাজা বেগম”। তা'র সঙ্গে লড়াই করতে আমি আপনাকে চ্যালেঞ্জ করছি, বুঝছেন? যদি আপনি তা'কে ঠেকাতে পারেন, আর তা'কে লোহার শিকল দিয়ে বেঁধে রেখে এসে, সজ্জানে খাঁচা থেকে বেরিয়ে আসতে পারেন, তবে আপনি এই রয়েল বেঙ্গল টাইগারটিকে ত' পাবেনই, তা' ছাড়া হাজার কতক টাকা আর

অত্যাগ পুরস্কারও বিস্তর পা'বেন। কিন্তু তা'র সঙ্গে লড়াই কর্তে যদি আপনি পিছিয়ে যান, তবে আমি সারা ষ্টেটের মধ্যে ঢাক পিটিয়ে দে'ব যে, আপনি একজন পাকা বাপ্পাবাজ !'

“তা'র আশ্পর্কার কথাগুলো যেন এক ঝাঁক গুলির মত এসে আমার বিধ্লে। আমি রেগে তখুনিই তা'র চ্যালেঞ্জ গ্রহণ ক'রলুম। শুনে ত' তিনি উত্তেজনায় অর্ধেক লাফিয়ে উঠে একটু দৈতো হাসি হেসে আবার থপ্ ক'রে বসে পড়লেন।... রোমসম্রাটদের কথা মনে পড়ল—যা'রা খৃষ্টানদের হিংস্র প্রাণীদের আস্তানার মধ্যে ছেড়ে দিতেন !

“বল্লেন,—‘আজ থেকে এক হপ্তা বাদে লড়াই স্থির। কিন্তু আগে থেকে আপনাকে বাঘটা দেখতে দেবার অল্পমতি না দিতে পে'রে আমি অত্যন্ত হুঃখিত !’

“রাজকুমার কি ভয় পে'য়ে গিয়েছিলেন যে—হয় ত' বা আমি বাঘটাকে হিপ্ নটাইজ ক'রে ফেল'ব কিনা আফিমই খাওয়া'ব, তা' জানি না।

“রাজপ্রাসাদ থেকে তা'রপর বে'রিয়ে এলুম। মজা দেখলুম যে, এবার আর আগেকার মত রাজছত্র বা চৌবুড়ি সে সব আর কিছুই নেই !

“পরের সপ্তাহে আসন্ন লড়াইয়ের জন্তে আমি শরীর আর মন দুই'ই নিয়মিতভাবে তৈরী ক'রতে লাগলুম। আমার চাকরের মারফতে নানা আজগুবি খবর সব কানে এসে পৌছতে লাগল। পিতার নিকটে সেই সাধুটির অন্তত ভবিষ্যদ্বাণী কোনও গতিকে বাইরে প্রচার হ'য়ে পড়েছিল—তা' সঙ্গে সঙ্গে বেড়েই চলেছিল। বহু সরল গ্রামবাসী সত্যি সত্যিই বিশ্বাস ক'রেছিল যে, একটা দুষ্ট আত্মা ঈশ্বরের অভিশাপে বাঘের রূপ ধারণ ক'রে জন্মেছে, রাজিবেলায় নানা রকম ভীষণকার রাক্ষসের মূর্তি ধারণ করে আর দিনের বেলায় ঠিক বাঘটি হ'য়ে থাকে। আমার মায়েস্তা ক'রবার জন্তে যে বাঘটাকে পাঠান হ'য়েছিল, সেটা এই রকমেরই একটা রাক্ষসবাঘ !

“আর একটা অদ্ভুত গুজব রটে গিয়েছিল যে, বাঘেরা তা'দের স্বর্গরাজ্যে কাতর প্রার্থনা পাঠাতে, এই ‘রাজা বেগমের’ আকারে তা'র উত্তর এসেছিল ! গোটা বাঘ জাতটার পক্ষে অত্যন্ত মানহানিকর এই হু'পেয়ে মানুষের আশ্পর্ককে শাস্তি দে'বার সেটাই হ'বে ব্রহ্মাজ্ঞ। হায় রে

মানান। তা'তে আমার এই অত্যন্ত সাধু সঙ্কল্পে কি ক'রে যে অমঙ্গল আসতে পারে, তা আমি কিছুতেই ভেবে পাই নে! আপনার কাছে আমার এই অনুরোধ বাবা যে, আমার জীবনের গতি বা'তে বদলে যায়, এমন কিছু আমার আদেশ ক'রবেন না।”

চণ্ডী আর আমার ঐ একই রকম সঙ্কটের কথা মনে উদয় হওয়াতে কথাগুলিতে বিশেষ মনোযোগ দিলুম, কারণ ছেলে ত' কখনও বাপের কথা লঘু ভাবে অমান্য ক'রে চলতে পারে না।

“একটা নীরব ঔদাসীয়ে পিতা ত' আমার কৈফিয়ৎ শুনলেন। উপায়ান্তর না দেখে অবশেষে তিনি গভীরভাবে আমায় বললেন,—‘শেষ অবধি তোমায় সব কথা খুলেই বলতে হ'ল দেখছি। তবে শোন, কাল যখন বারান্দায় আমি ধ্যানে যেমন বসি তেমনি বসেছি, এমন সময় একটি সাধু সেখানে এসে উপস্থিত হ'লেন। এসেই বলতে লাগলেন, “বন্ধুবর, আপনার লড়াইয়ে ছেলের জন্তে একটি কথা ব'লে যা'চ্ছি। বাঘকে পোষ মানান বা তা'দের সঙ্গে লড়াই করা প্রভৃতি তা'র এই সব হিংস্র আর বিপজ্জনক কাষগুলো এখনিই থামাতে বলুন। নইলে এর পরের বারেই বাঘের সঙ্গে লড়াইয়ে তা'কে এমনি ভয়ানক রকম জখম হ'তে হবে যে, মরণাপন্ন হ'য়ে পড়ে থেকে, ছ'টিমাস ধ'রে তা'কে ভুগতে হ'বে। তা'র পরেই তা'র একটা পরিবর্তন এসে যাবে, তখন সে এ সব চালচলন ছেড়েছুড়ে দিয়ে একেবারে সন্ন্যাসী ব'নে যাবে।’

“এ সব কথাতেও কিন্তু আমার মনে কোনও রেখাপাত হ'ল না। মনে হ'ল, পিতা এক ভ্রান্ত উন্মাদের পাল্লায় পড়ে এই সব বিশ্বাস ক'রে বসেছেন।”

সোহহং স্বামী কথাগুলো একটু অধীর ভাবেই প্রকাশ ক'রে বললেন, যেন কোন নির্বুদ্ধিতা প্রকাশ ক'রে ফেলেছেন।

অনেকক্ষণ চুপ ক'রে বসে থাকতে বোধ হ'ল যেন, আমরা যে বসে র'য়েছি, তা' একদম ভুলে গেছেন। তা'র পর হঠাৎ অত্যন্ত চাপাস্বরে গল্লের ছিন্নস্বত্র ধ'রে আবার শুরু ক'রলেন,—

“বাবার সাবধান ক'রে দে'বার খুব অল্প কিছুদিন পরেই আমি কুচবিহারের রাজধানী গিয়েছিলুম। ছবির মত দেশটি আমার চোখে নতুন

সৌন্দর্য্য এনে দিলে। এতে বিশ্রামের জন্তে বেশ একটা পরিবর্তনও হ'বে ব'লে আশা করলুম। সর্বত্র যেমন, সেখানেও তেমনি কৌতূহলী জনতা রাস্তায় বেগলেই আমার পিছু নি'ত। মাঝে মাঝে এই ধরনের আলাপের টুকরো এক আখটা আমার কানে এসে পৌঁছত,—

“এই লোকটি বুনো বাঘের সঙ্গে লড়াই করেন!”

“ও গুলো গুঁর পা, না গাছের গুঁড়ি, এঁয়া?”

“আরে, আরে, গুঁর মুখটা একবার দেখ, যেন জ্যান্ত বাঘের রাজা!”
এই সব আর কি!

“তোমরা জান ত' যে গাঁয়ের ছোকরারা সব এক একটা চলন্ত টাটকা খবরের কাগজ! তা'র পরে মেয়েদের মুখেও নতুনতর খবর সব কি রকম তাড়াতাড়ি বাড়ী বাড়ী বিলি হ'য়ে যায়। ঘণ্টা কতকের মধ্যেই আমার উপস্থিতিতে সহরের মধ্যে একটা প্রবল সাড়া ও উত্তেজনা দেখা দিলে।

“সন্ধ্যে বেলায় আমি নিশ্চিত্তে বিশ্রাম ক'রছি, এমন সময় ঘোড়ার খুরের শব্দ শোনা গেল। শব্দটা এসে আমার বাসার সামনে থামল। পর মুহূর্তেই ঘরে এসে ঢুকল একদল লম্বা, যোয়ান, পাগড়ীধারী পুলিশ!

“আমি ত' অবাক হ'য়ে গেলুম! ভাবলুম, মাস্তুমের আইনের এই সব রক্ষকদের কাছে সবই সম্ভব! হয় ত' বা আমার সম্পূর্ণ অপরিজ্ঞাত কোন বিষয়ের জন্তে বাড়ী ব'য়ে আমায় ধম্কাতে এসেছে! দেখলুম কিন্তু তা' নয়। লোকগুলো বেশ মোলায়েম ভাবে বিনয়নম্র ভাব প্রকাশ ক'রে অভিবাদন ক'রবার পর বললে, ‘হজুর, কুচবিহারের যুবরাজের তরফ হ'তে আমরা আপনাকে অভ্যর্থনা জানাবার জন্তে এসেছি। কাল সকালে তিনি তাঁ'র প্রাসাদে আপনাকে নিমন্ত্রণ ক'রেছেন।’

“আমি এ ব্যাপারের সম্ভাবনা কি হ'তে পারে, তা' কিছুক্ষণ ধ'রে মনে মনে তোলাপাড়া ক'রলুম। কোন অনির্দেশ্য কারণে আমার এই নিশ্চিত্ত ভ্রমণে বাধা পেয়ে মনে বড়ই অস্বস্তি বোধ হ'ল। কি করি, পুলিশের লোকেদের কাকুতিমিনতিতে অবশেষে যে'তে রাজী হ'তে হ'ল।

“তা'র পরদিন সদর দরজায় এসে দাঁড়াল এক বিরাট চৌধুড়ি! খুব জাঁকজমকের সঙ্গে ত' আমায় তুলে নিয়ে চলল। আমি একেবারে বিহ্বল

বা অনভীষিত দেহের অস্থি গঠন করে। বাইরের দুর্বলতার উৎস হ'চ্ছে, মনে। বিপরীত অবস্থায়, অভ্যাসে গড়া শরীর মনকে একেবারে অসাড় ক'রে ফেলে। মনিব যদি চাকরের হুকুমে চলে, তা' হ'লে চাকরই শেষকালে স্বেচ্ছাচারী হ'য়ে ওঠে। মনও সেই রকম—শরীরের হুকুমের কাছে আত্মসমর্পণ ক'রে তা'র দাস হ'য়ে পড়ে।”

আমাদের সনির্বন্ধ অল্পরোধে স্বামীজি তাঁ'র নিজের জীবনের অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক আর হৃদয়গ্রাহী ঘটনা থেকে কিছু ব'লতে শুরু ক'রলেন,—

“জীবনের সব চেয়ে বড় আকাজক্ষা ছিল, বাঘের সঙ্গে লড়াই করা! আমার ইচ্ছা ছিল প্রচণ্ড, কিন্তু শরীরটা ছিল নিতান্তই দুর্বল!”

বিশ্বয়ে আমার মুখ থেকে একটা অক্ষুট শব্দ বেরুল মাত্র! এই “বুড়োরঙ্গ বৃষঙ্গ” লোকটিকে দেখে দুর্বলতা যে কি, তা' কোন কালে তিনি কিছু জানতেন, তা' অবিশ্বাস্য ব'লেই বোধ হ'ল।

“স্বাস্থ্য ও শক্তি লাভের চিন্তায় অদম্য অধ্যবসায় বলে, আমি সে অল্পবিধা দূর ক'রতে পে'রেছিলুম। মনের প্রচণ্ড জোরই হ'চ্ছে আসল জোর, আর তা'দিয়েই যে রয়েল বেঙ্গল টাইগারকেও হারাতে পারা যায়, তা' বলবার আমার যথেষ্ট কারণ আছে।”

“পূজনীয় স্বামীজি, আপনি কি মনে ক'রেন যে—আমি কোনও কালে বাঘের সঙ্গে লড়াই ক'রতে পারি?”

হেসে বললেন, “হ্যাঁ নিশ্চয়ই, তবে বাঘ অনেক রকমের আছে, বুঝলে? তা'দের মধ্যে কতক আবার মানুষের কামনা বাসনার জঙ্কলে ঘুরে ফিরে বেড়ায়! জঙ্কলের পশুদের ঘুঁসির ঘায়ে অজ্ঞান ক'রে ফেলে ত' কোন আধ্যাত্মিক লাভ হয় না। তা'র চেয়ে অন্তরের মধ্যে যে সব হিংস্র জন্তু ঘুরে ফিরে বেড়ায়, তা'দেরই জয় ক'রবার চেষ্টা ক'রো।”

“তা' হ'লে ম'শায়, বুনো বাঘ বশ ক'রা থেকে, এই সন্ন্যাসের পথে এসে পড়লেন কি ক'রে, একটু দয়া ক'রে শোনান যদি!”

সোহহং স্বামী কিছুক্ষণ চুপ ক'রে বসে রইলেন। তাঁ'র দৃষ্টিতে স্তূদূরের আভাস, অতীতের স্বপ্ন দেখার আশায় আমার অল্পরোধ রাখবেন কি না, তা'

তখন তাঁর মনে তোলাপাড়া চলছিল সেটা বেশ লক্ষ্য করলুম। অবশেষে তিনি সম্মতিস্বচক হেসে বলতে আরম্ভ করলেন,—

“বশের উচ্চশিখরে পৌঁছে, আমার মনে গর্কের উদ্ভাদনা এ’ল। স্থির করলুম, শুধু যে বাঘের সঙ্গে লড়াই করব তা’ নয়,—তা’দের নিয়ে নানা রকম খেলাও দেখাব। আমার উচ্চাকাঙ্ক্ষা ছিল যে, বুনো জানোয়ারদের পোষমানা প্রাণীদের মতন চলতে শেখান। আমি লোকেদের সামনে খুব রুতিব্বের সঙ্গেই খেলা দেখাতে লাগলুম।

“একদিন সন্ধ্যাবেলা পিতা খুব চিন্তিত মনে ঘরে ঢুকে বললেন, ‘বাবা, তোমায় গুটিকতক কথা বলে সাবধান করে দিতে এসেছি,—তোমার কর্মফলের দরুণ ভাবী অমঙ্গলের হাত থেকে তোমায় বাঁচাতে হ’বে।’

“জিজ্ঞাসা করলুম, ‘আপনি কি অদৃষ্টবাদী বাবা? সংস্কারকে কি আমার শক্তিশালী কর্মশ্রোতকে আবিল করে তুলতে দিতে হ’বে?’

“তিনি বললেন, ‘বাবা আমি অদৃষ্টবাদী নই, শাস্ত্রের বিধানে, কর্মের প্রতিফলের ওপর আমার খুব বিশ্বাস আছে। বুনো জানোয়ারদের ভেতর তোমার ওপর যা’ রাগ জন্মে আছে, তা’ যদি জানতে! একদিন না একদিন তোমায় জীবনের মূল্যে তা’ পরিশোধ করতে হ’বে।’

“বাবা, আপনি আমায় অবাক করলেন! আপনি ভাল রকমই জানেন যে, বাঘেরা কি রকম প্রাণী—সুন্দর বটে কিন্তু ভীষণ হিংস্র! কোন হতভাগা প্রাণীর বিরূতি ভোজের পরক্ষণেই হয় ত’ আবার নতুন শিকার দেখলেই তা’র প্রাণিহিংসা প্রবল হ’য়ে ওঠে। হয় ত’ বা জঙ্গলের ঘাসের ওপর একটি আনন্দচঞ্চল হরিণ লম্বপায়ে নেচে বেড়াচ্ছে। তা’কে ধরেই তা’র নরম গলাটা ফুটো করে সেই দুর্দান্ত পশুটা তা’র একটুখানি রক্ত চেখেই আবার খুসীমত চলাতে আরম্ভ করে।

“বাঘগুলো হচ্ছে জঙ্গলের প্রাণীদের মধ্যে সবচেয়ে নিরুপ্ত! কে জানে হয় ত’ বা আমার গোটা কতক ঘুঁসি তা’দের মোটা মাথায় খানিকটা বুদ্ধি বিবেচনা ঢুকিয়ে দিতে পারে! ভব্যতা শেখাবার জঙ্গলের ইস্কুলে আমিই হ’চ্ছি হেডমাষ্টার!

“বাবা, আপনি জানবেন, আমার কাষ হ’চ্ছে বাঘকে মারা নয়, পোষ

নখদন্তবিহীন একটা মানুষ, নখদন্তবিশিষ্ট মজবুত হাড়ের একটা বাঘের সঙ্গে লড়াই ক'রতেও সাহস পায়! যুদ্ধে পরাজিত ব্যাঘ্রবরদের পুঞ্জীভূত হিংসার গতিবৃদ্ধিতে গুপ্ত অভিশাপ ফলে গিয়ে এই গর্কিত বাঘের খেলোয়াড়টিকে এবার রীতিমত আক্কেল দিয়ে দেবে।

“আমার চাকরটি এসে আরও একটু খবর দিয়ে গেল যে, রাজকুমারটি হ'চ্ছেন আসলে বাঘে মানুষে লড়াইয়ের ব্যাপারে একজন উদ্বোধনার ম'ত। এমনি সব কত কথাই তখন শুনলুম। যাই হোক অবশেষে দেখা গেল যে রাজকুমার, কয়েক হাজার লোক ধরতে পারে আর বাড়ে না উড়ে যায় এমন একটা বেশ শক্ত গোছের মণ্ডপ তৈরী করান স্ক্রু ক'রলেন। এর মাঝখানে একটা প্রকাণ্ড লোহার খাঁচায় ‘রাজা বেগম’কে রাখা ছিল—তা’র বাইরের খানিকটা যায়গাও বেশ নিরাপদ ক'রে ঘিরে রাখা হ'য়েছে। খাঁচায় বন্ধ করা ব্যাঘ্র মহাপ্রভু অনবরত বা’ গর্জন ছাড়'ছিলেন, তা’ শুনে গায়ের রক্ত জমাট হ'য়ে যায়, এমনি তা’ ভীষণ! তা’র ওপর তা’কে আধপেটা খাইয়ে রাখা হ'ত, তা’র দারুণ হিংসার আগুনে প্রচণ্ড ক্ষুধার ইন্ধন যোগাবার জন্তে! বোড়শোপচারে আয়োজন সম্পূর্ণ ক'র'ার ব্যবস্থা হ'চ্ছিল আর রাজপুত্র বোধ হয় ‘রাজা বেগমের’ জয়ের পুরস্কার স্বরূপ আমাকেই তা’র ভোজের ব্যবস্থা ব'লে ঠাউরে ছিলেন! যাই হোক, দিন ত’ ক্রমশঃ ঘনি়ে আসতে লাগল।

“এদিকে হ'য়েছে কি, ষ্টেট থেকে চারিদিকে ঢোল পিটিয়ে জানিয়ে দেওয়া হ'ল যে, বাঘে মানুষে অদ্ভুত লড়াই হ'বে। তা’ই না শুনে, সহর আর তা’র আশে পাশে নানা যায়গা থেকে হাজার হাজার লোক সহরে এসে অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে তামাসা দেখবার জন্তে টিকিট কিন্তে লাগল। এত টিকিট বিক্রি হ'য়েছিল যে, লড়াইয়ের দিনে যায়গার অভাবে শত শত লোককে ফিরে যেতে হ'ল! অনেকে বিনা টিকিটেই তাঁবুর ফাঁক দিয়ে ভিতরে ঢুকে পড়ল, অথবা গ্যালারির তলায় যেটুকু যায়গা ছিল, সেখানে গিয়ে ঢুকে ভিড় ক'রে দাঁড়াল।”

সোহং স্বামীর গল্পের সঙ্গে সঙ্গে আমারও উত্তেজনা চরম সীমায় উপস্থিত হ'ল। চণ্ডী ত’ ভাবাবেগে একেবারে নির্বাক!

“‘রাজা বেগম’র কানফাটান গর্জনের সঙ্গে ঈষৎ ভীত জনতার কোলাহলের মধ্যে নীরবে এসে দাঁড়ালুম। কোমরে সামান্য কাপড় ব্যতীত গায়ে আর অণু কিছু আবরণ ছিল না। বাইরের দিকের নিরাপদ ঘরটার হড়কো খুলে ভিতরে ঢুকে ধীরে ধীরে সেটাকে আমার পেছন থেকে এঁটে দিলুম। ‘রাজা বেগম’ রক্তের গন্ধ পেলে। লোহার রেলিঙের ওপর বাজের মত আছড়ে পড়ে ব্যাঘ্ররাজ ত’ আমার অভ্যর্থনা জানালেন। দারুণ ভয়ে, দর্শকবৃন্দ একেবারে নির্বাক নিশ্চল হ’য়ে বসে রইল। কারণ ক্রোধে উন্মত্ত, জঙ্গল হ’তে সত্ত্বত সেই ভীষণদর্শন ব্যাঘ্রবরের সন্মুখে আমাকে তখন একটি নিতান্ত নিরীহ মেঘশাবকের মতই দেখাচ্ছিল।

“চোখের পলকের মধ্যে আমি খাঁচার ভেতরে ঢুকে পড়লুম। দরজাটি বন্ধ করার সঙ্গে সঙ্গেই ‘রাজা বেগম’ বিদ্যুৎগতিতে আমার মাথার ওপর সোজা এসে কাঁপিয়ে পড়ল। সে আক্রমণ রোধ করতে গিয়ে ডান হাতটি আমার ভীষণভাবে ক্ষতবিক্ষত হ’য়ে গেল। নররক্ত বাঘের কাছে পরম উপাদেয় বস্তু। ভীষণভাবে তা’ হাত থেকে ঝরে পড়তে লাগল। সাধুটির ভবিষ্যদ্বাণী এবার বুঝি ফলে গেল দেখছি।

“আমি কিন্তু দারুণ আঘাতের প্রথম ধাক্কাটা তখনই সামলে নিলুম। রক্তমাখা আঙ্গুলগুলো কোমরের কাপড়ের তলায় ঢুকিয়ে চোখের সামনে থেকে লুকিয়ে ফেললুম। তা’রপর বেশ করে বাগিয়ে বাম হাত দিয়ে একটি হাড় গুঁড়োন ঘুঁসি লাগালুম। বাঘটা আর টান্ সামলাতে না পে’রে খাঁচার পিছন দিকে একটা পাক খেয়ে ঘুরে পড়ে গেল। তা’রপর কাঁপতে কাঁপতে এগিয়ে এসে সামনের দিকে আবার একটা লাফ মারলে। লাফিয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই আমার দারুণ ঘুঁসির বৃষ্টি তা’র মাথার ওপর পড়তে শুরু হ’ল।

“কিন্তু ‘রাজা বেগম’র নররক্তের স্বাদ, বহু দিনের পিপাসী নেশাখোরের প্রথম নদের চুমুকের মত তা’কে একেবারে পাগল ক’রে তুলেছিল। মাঝে মাঝে বুকের রক্ত হিমকরা গর্জনের সঙ্গে সঙ্গে তা’র আক্রমণ ক্রমশঃই ভীষণ হ’তে ভীষণতর হ’য়ে উঠতে লাগল। কিন্তু একটা মাত্র হাতের দ্বারা আত্মরক্ষা ক’রতে গিয়ে, আমার তা’র নখ আর দাঁতের আক্রমণের

কাছে খানিকটা দুর্বল হ'য়ে পড়ে থাকতে হ'ল। যাই হোক, শেষ পর্যন্ত তা'কে ঘুঁসির চোটেই ঠাণ্ডা ক'রে আনলুম। দু'জনেরই জয়ের আশায় মরণ বাঁচনের লড়াই চলতে লাগল। লড়াইয়ের চোটে চারধারে যেমনি রক্ত ছিটিয়ে পড়তে লাগল—বাঘটারও তেমনি। গলার ভেতর থেকে যন্ত্রণার তীব্র গর্জন বে'রতে আর তা'র সাজ্বাতিক আক্রমণ চেষ্টায় খাঁচাটা যেন একেবারে নরককুণ্ড হ'য়ে দাঁড়াল!

“দর্শকদের মাঝখান থেকে চিংকার উঠল, ‘গুলি কর, গুলি কর, বাঘটাকে মেরে ফেল, সাবাড় ক'রে দাও!’ বাঘে মাছুবে লড়াই এত দ্রুতগতিতে চলল যে, সেখানকার রক্ষীদের রাইফেলের গুলি পর্যন্ত লক্ষ্যভ্রষ্ট হ'য়ে গেল! এবার আমি আমার সকল ইচ্ছাশক্তি একত্র সংগ্রহ ক'রে তীব্র চিংকারের সঙ্গে প্রচণ্ড একটা ঘুঁষি মারলুম। বাস্! বাঘটা একেবারে ঠাণ্ডা হ'য়ে শুয়ে পড়ল। আর তা'র নড়ন চড়ন নেই!

আমি মাঝ পথে বলে উঠলুম, “ঠিক পুঁথি বেড়ালের মতন আর কি?” স্বামীজি পরম আপ্যায়িত হ'য়ে প্রাণ খুলে হাসলেন, তারপর আবার কৌতুহলোদ্দীপক গল্পটি শুরু ক'রলেন,—

“যাক—শেষ অবধি ত' ‘রাজা বেগম’ হা'রল। তা'র রাজগর্ভ (এবং সঙ্গে সঙ্গে বোধ হয় রাজপুত্রেরও) একেবারে চূর্ণ হ'য়ে গেল। ক্ষতবিক্ষত হস্তে সদর্পে তা'র চোয়ালটা ফাঁক ক'রে ধ'রে নাটকীয় ভঙ্গীতে আমি মুহূর্তেকের জন্তে সেই হাঁ ক'রা মরণের ফাঁদের মধ্যে মাথাটা গলিয়ে দিলুম—তা'রপর একটা শিকলের জন্তে চারিদিকে চাইলুম। মেঝের ওপরে ছিল একটা শিকলের থাক, তা'র ভেতর থেকে একটা শিকল টেনে এনে বাঘটার গলা খাঁচার ডাঙার সঙ্গে বেশ ক'রে বেঁধে ফেললুম। তা'র পরে বিজয় গর্বে দরজার দিকে আমি অগ্রসর হ'লুম।

“কিন্তু জীবন্ত সয়তান সেই ‘রাজা বেগম’র—তা'র কল্লিত রান্ধস-ভূতেরই মত দারুণ শক্তি ছিল। একটা অদ্ভুত বাটকান মেরে সে শিকলটা ছিঁড়ে ফেলে আমার পিঠের ওপর আচম্বিতে ঝাঁপিয়ে পড়ল। কাঁধটা আমার প্রচণ্ড জোরে কামড়ে ধ'রতেই, আমি হুমড়ি খেয়ে সামনে প'ড়ে গেলুম। কিন্তু পলকের মধ্যে আমি তা'কে উর্টে ফেলে আমার পায়ের তলায় চেপে

ধরলুম। নিদারুণ ঘুঁসির চোটে সেই বিশ্বাসঘাতক জানোয়ারটা আবার অর্দ্ধচেতন অবস্থায় এলিয়ে পড়ল। এবারে কিন্তু আমি তা'কে আরও সাবধানে খুব শক্ত ক'রে বেঁধে ফেললুম। তা'রপর আস্তে আস্তে খাঁচা ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে এলুম।

“এইবার কিন্তু একটা নতুন চিংকার শোনা গেল—সেটা প্রচণ্ড উল্লাসের। সেই বিপুল জনতা হ'তে প্রবল আনন্দে যে বিকট চিংকার বেরিয়ে এ'ল, তা' যেন একটি মাত্র বিরাট গলার ভিতর থেকে। দারুণভাবে ক্ষতবিক্ষত হ'লেও আমার কিন্তু লড়াইয়ের তিনটি সর্জ পূরণ ক'রতে হ'য়েছিল, এক—বাঘটাকে অজ্ঞান ক'রে ফেলা, দুই—তা'কে শিকল দিয়ে বেঁধে ফেলা, আর তিন—কারুর সাহায্য না নিয়ে একলা বেরিয়ে আসা। সেই জানোয়ারটাকে উপরন্তু আমি ঠেঙিয়ে ক্ষতবিক্ষত ক'রে, এমন ভয় পাইয়ে দিয়েছিলুম যে, সে তা'র মুখের মধ্যে আমার মাথাটি অতি সুখাদ্যের মতন পাওয়ার সুযোগটাও উপেক্ষা ক'রে স্থির হ'য়ে পড়েছিল।

“আমার যা গুলোর প্রাথমিক চিকিৎসার পর,—আমায় মালা পরিয়ে সম্মানিত করা হ'ল। শত শত সোনার মোহর আমার পায়ের কাছে রুষ্টির মত এসে পড়তে লাগল। সারা সহরে তখন যেন উৎসবের জোয়ার ব'য়ে গেল। সব চেয়ে বড় আর সব চেয়ে ভীষণ বাঘের সঙ্গে লড়াইয়ে আমারই যে জিত হ'য়েছে, তা' নিয়ে চাবিদিকে অফুরন্ত আলোচনা চলছে শোনা গেল। প্রতিজ্ঞা রক্ষার জন্মে ‘রাজা বেগম’কে আমায় যে উপহার দেওয়া হ'ল, তা' পেয়ে কিন্তু আমার মনে কোন উল্লাস বোধ হ'ল না। অন্তরে তখন কি রকম একটা আধ্যাত্মিক পরিবর্তন ঘ'টে গিয়েছিল। মনে হ'ল, খাঁচা থেকে আমার এই শেষ বারের মতন বেরিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে, আমার সকল পার্থিব উচ্চাশা আর আকাঙ্ক্ষারও দরজা যেন চিরতরে বন্ধ ক'রে দিয়ে এলুম!

*

*

*

*

“তা'রপর এল দুঃখের দিন। রক্তহৃষ্টির জন্মে ছ'মাস ধ'রে জীবনমরণ দোলায় ছলতে লাগলুম। কুচবিহার হ'তে বেকুবের মত একটু ভাল হ'লে নিজের দেশে ফিরে এলুম।

“এই লড়াইয়ের পর মনে যে বিপ্লব ঘটে গিয়েছিল, তা’তে এ পথে পা বাড়াতে আর প্রবৃত্তি রইল না। পিতার কাছে গিয়ে সবিনয়ে নিবেদন ক’রলুম, ‘যে পুণ্যাত্মা সাধুটি আমার সতর্ক ক’রে দিয়েছিলেন, তিনিই আমার গুরু। আহা, আজ যদি তাঁ’র দর্শন পেতুম!’ আমার ইচ্ছা যে খুবই আন্তরিক ছিল, তা’র প্রমাণ হাতে হাতেই পে’য়ে গেলুম, কারণ তা’রপর অতি শীগগির তিনি একদিন বিনা আহ্বানেই আমাদের কাছে এসে উপস্থিত হ’লেন।

“দেখলুম অপূর্বদর্শন, প্রসন্ন সৌম্য মূর্তি তাঁ’র, প্রণাম ক’রতেই অতি স্নিগ্ধ মধুর আশ্বাস দিয়ে বললেন, ‘তোমার বাঘকে পোষ মানান ত’ যথেষ্ট হ’য়েছে হে। এখন আমার সঙ্গে এস, মানুষের মনের জঙ্গলে অজ্ঞান অবিচার যে সব পশুর দল ঘুরে বেড়াচ্ছে, তা’দের কি ক’রে দমন ক’রতে হয়, তা’ তোমায় আমি শিখিয়ে দে’ব। এ জগতে ত’ বহু দর্শকদের প্রচুর উত্তেজনা আর আনন্দের খোরাক জুগিয়ে তা’দের আমোদ দিয়েছ, এবার তোমার যোগাভ্যাসের অদ্ভুত কৌশল দেখে স্বর্গবাসীরা তেমনি উল্লসিত হো’ক, কি বল?’

“তা’রপর সেই সাধু গুরুজির কাছে আমি আধ্যাত্মিক পথে দীক্ষালাভ ক’রলুম। আমার বহুদিনের অব্যবহৃত অনমনীয় মরুচেধরা আত্মার সিংহদ্বার, যেন তিনি নিজ হস্তে উন্মুক্ত ক’রে দিলেন! তা’রপর—তা’রপর আর কি? গুরুশিষ্যে, দু’জনে হাত ধরাধরি ক’রে সাধনার জন্তে শীগগিরই হিমালয়ের পথে বে’রিয়ে পড়লুম।”

চণ্ডী আর আমি সত্যিই তাঁ’র এই রকম যুগ্মবাত্যাবিস্কৃদ্ধ বিচিত্র জীবনের অপক্লপ কাহিনীর প্রত্যক্ষ বর্ণনায় অত্যন্ত রুতজ্ঞ হ’য়ে তাঁ’র চরণে প্রণত হ’লুম। যা’ই হো’ক, বেশ একটি স্নিগ্ধ আর শান্ত পরিবেশের মধ্যে স্নশীতল বৈঠকখানার ভিতরে, শিক্ষার্থীর আগ্রহে বহুক্ষণ অপেক্ষা ক’রার পুরস্কার তখন প্রচুর ভাবে পে’য়ে গেলুম ব’লেই মনে হ’ল!

৭ম পরিচ্ছেদ

লঘিমা সিদ্ধ সাধু

(ত্রীনগেন্দ্র নাথ ভাট্টা)

বন্ধুবর উপেন্দ্রমোহন চৌধুরী এসে একদিন বল্লেন, “ওহে, কাল রাত্তিরে একটি ধর্মসভায় গিয়ে হাজির হ’য়েছিলুম। গিয়ে দেখি, একটি যোগী ভূঁই হ’তে ফুট কতক উঁচুতে শূণ্ণে অবস্থান করছেন!” শুনে মনে একটা প্রবল কৌতূহলের সঞ্চার হ’ল।

উৎসাহব্যঞ্জক হাসির সঙ্গে বল্লুম, “বোধ হয় তাঁ’র নাম আমি আন্দাজ ক’রে বলতে পারি। আচ্ছা, তিনি কি আপার সারকুলার রোডের ভাট্টা ম’শাই?”

উপেন্দ্র নতুন খবর আমদানী করার কুতিত্ব হ’তে বঞ্চিত হ’য়ে একটু যেন ক্ষুধা হয়েই স্বীকৃতিসূচক মাথা নাড়লে। সাধু সন্ন্যাসীদের সম্বন্ধে আমার অদম্য কৌতূহল বন্ধুবান্ধবদের মধ্যে বেশ ভাল ভাবেই জানা ছিল, কায়েই নতুন খবর সংগ্রহ ক’রতে পা’রলে তা’দের বেশ মজাই লাগত।

বল্লুম, “উনি আমাদের বাড়ীর খুব কাছেই থাকেন, আর প্রায়ই আমি তাঁ’কে দেখতে বাই।” কথাটা শুনে উপেন্দ্রের মুখে বেশ একটা গভীর আগ্রহ ফুটে উঠল দেখে আমি আরও খানিকটা বলতে শুরু ক’রলুম,—

“তাঁ’র অনেক অদ্ভুত সব ক্রিয়াকলাপ দেখেছি। পতঞ্জলির অষ্টাঙ্গ যোগের মধ্যে প্রাণায়ামের বিভিন্ন প্রণালী তিনি খুব দক্ষতার সঙ্গে আয়ত্ত ক’রে ফেলেছেন। একবার তিনি ভক্তিকা প্রাণায়াম এমন ভয়ঙ্কর জোরের সঙ্গে ক’রে দেখালেন যে, মনে হ’ল যেন ঘরের মধ্যে সত্যি সত্যিই একটা প্রবল ঝড় উঠেছে। তারপর তিনি ঝড়ের মত নিশ্বাস থামিয়ে উচ্চ সমাধিতে নিমগ্ন হ’য়ে গিয়ে একেবারে নিষ্পন্দ হ’য়ে পড়লেন। ঝড়ের পর শান্তির স্বর্গীয় জ্যোতিঃর ছটা যা’ তাঁ’র বদনে দেখা গেল, তা’ ভোলবার নয়।”

“শুনেছি, সাধুটি নাকি বাড়ী থেকে কোথাও বড় একটা বে'রোন না ?”
উপেক্ষের স্বর যেন ঈষৎ সন্দিগ্ধ !

“সত্যিই তাই ! তিনি আজ কুড়ি বছর ধ'রে বাড়ীর ভিতরেই আছেন। কোথাও বড় একটা বে'রোন না। পালপার্কিংগের সময়েই কেবল তাঁ'র এ নিয়মের কিছু ব্যতিক্রম ঘটে—সে সময় হয় ত' বা সামনের ফুটপাথে একটু বেড়ালেন মাত্র ! তাঁ'কে দেখলেই ভিখিরীর দল সেখানে ছুটে যায়, কারণ সাধু তাহুড়ী ম'শায়ের দয়া সকলের কাছেই সুপরিচিত !”

“আচ্ছা, এই প্রবল মাধ্যাকর্ষণ শক্তি এড়িয়ে, কি ক'রে তিনি শূণ্ণে বুলে থাকেন, এঁ'রা ?

“কতকগুলো প্রাণায়ামের প্রক্রিয়ার পর যোগীদের শরীরের জড়ত্ব একেবারে কেটে যায়, তা'তে সেটা শূণ্ণে ভেসে ওঠে, অথবা ব্যাঙের মতন লাফিয়ে উঠতে পারে। এমন কি সাধু সন্ন্যাসীরা, যা'রা যোগপ্রণালীর কোন নির্দিষ্ট সাধনা আদর্শ অভ্যাস করেন না, জানা গেছে যে, ঈশ্বরের গভীর ধ্যানের সময় তাঁ'দেরও দেহ এমনিতির হাক্কা হ'য়ে যায়।”*

“তা' হ'লে ত', এ'র সম্বন্ধে আরও কিছু জানা দরকার। আচ্ছা, রোজ্জই কি তুমি সন্ধ্যার সময় সভায় যাও নাকি ?” উপেক্ষের চোখ দুটি কৌতুহলে চক্চক ক'রে উঠল।

“হ্যাঁ, আমি প্রায়ই সেখানে যাই। তাঁ'র জ্ঞানোপদেশের ভিতর সরসতা আমায় ভারি তৃপ্তি আর আনন্দ দেয়। মুশ'কিল এই যে, মাঝে মাঝে আমার একটানা হাসি কিন্তু সভার গাভীর্ঘ্য নষ্ট ক'রে ফেলে। উনি তা' ব'লে তা'তে কোন কিছু ব্যাঙ্গ্যার হ'ন না, কিন্তু ওনার শিষ্যরা যেন তেড়ে খুন ক'রতে আসে।”

তাহুড়ী ম'শায়ের আশ্রমের পাশ দিয়ে সে দিন স্কুল থেকে বাড়ী ফেরবার সময় একবার তাঁ'কে দর্শন ক'রে আসব ব'লে মনস্থ ক'রলুম। সাধারণ লোকেদের সেখানে প্রবেশ লাভ হুরহ। একটি মাত্র শিষ্য কেবল নিচের তলায় থেকে গুরুর নির্জনতা যা'তে ভঙ্গ না হয়, তা'র দিকে প্রথর দৃষ্টি রাখেন। শিষ্যটি দারুণ কড়া, সহজে কাউকে তাঁ'র কাছে ঘেঁসতে দেন না।

*অ্যাভিলার সেন্ট থেরেসা এবং খ্রীষ্টিয় সাধুদেরও প্রায়ই এরকম অবস্থায় দেখা গেছে।

জিজ্ঞাসা ক'রলেন, দেখা ক'রবার কোন কথা আগে থেকে ঠিক করা আছে কিনা। তাঁ'র গুরুটি কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে ঠিক সময়েই এসে প'ড়ে, আমার পত্রপাঠ বিদায়ের হাত থেকে বাঁচিয়ে দিলেন।

ভাছুড়ী মশাই চোখদুটি মিট মিট ক'রে বল্লেন, “মুকুন্দর যখনই ইচ্ছে হ'বে, তখনই আসবে। আমার নির্জনে থাকবার ব্যবস্থা আমার নিজের আরামের জন্তে নয়, বাইরের লোকেদের জন্তে, বুঝলে? সংসারের লোক সরলতা চায় না, যা'তে ক'রে তা'দের মোহ টু'টে যায়! সাধুরা যে কেবল বিরল তা' নয়, তাঁ'দের বুঝে ওঠাও একটু কঠিন। শাস্ত্রেও তাঁ'দের চালচলন একটু খাপছাড়া ধরনেরই বলে।”

আমি ভাছুড়ী ম'শায়ের উপর তলা আস্তানায় গিয়ে পৌঁছলুম। এখান থেকে কদাচিৎ তিনি কোথাও ন'ড়তেন। সাধারণ পার্থিব সুখদুঃখের পসরা সাধুগুরুদের দৃষ্টি বিশেষভাবে আকর্ষণ করে না, এ তাঁ'দের দৃষ্টির বাইরেই থাকে, যতক্ষণ পর্যন্ত না তা' যুগসিদ্ধ হ'য়ে দাঁড়ায়। সাধুঋষিগণের সমসাময়িকেরা এই সঙ্কীর্ণ বর্তমানেই কেবল একমাত্র ন'ন।

বল্লুম, “মহর্ষি, আমার পরিচিত যোগীঋষিদের ভেতর কেবল আপনাকেই দেখলুম, যিনি সর্বদাই অন্তরালে থাকেন।”

“ভগবান সময় সময় সাধুসন্ন্যাসীদের একান্ত অপ্রত্যাশিত স্থানে এনে ফেলেন, বুঝলে? পাছে আমরা ভেবে বসি যে, তিনি একটা প্রাণহীন বিধি নিয়মের প্রতীক ছাড়া আর কিছুই ন'ন।”

ভাছুড়ী মশায় অতঃপর পদ্মাসনে উপবিষ্ট হ'লেন। তাঁ'র সমস্ত বছর বয়সে, বার্দিক্যজনিত অথবা তাঁ'র কর্মহীন জীবনের অপ্রীতিকর কোন চিহ্নই দেখতে পেলুম না। সুপুষ্ট দেহ, সরল মন, ধর্মপ্রাণ ভাছুড়ী ম'শায় সকল বিষয়েই আদর্শ। শাস্ত্রবর্ণিত প্রাচীন মুনিঋষিদের ম'তই তাঁ'র প্রসন্ন আনন, আনন্দোজ্জ্বল প্রশান্ত সৌম্য মূর্তি। উন্নত দেহ, প্রচুর শাস্ত্রমণ্ডিত, উর্দ্ধনিবদ্ধ দৃষ্টি, তিনি সর্বদাই ঋজু ও দৃঢ়ভাবে আসনে উপবিষ্ট!

আমরা দু'জনে ধ্যানে ব'সলুম। ঘণ্টাখানেক পরে তাঁ'র মধুর শাস্ত্রস্বরে আমি জেগে উঠলুম। কেবল ধ্যানের চেয়ে ভগবানকে আরও বেশী ক'রে ভালবাসতে স্মরণ করিয়ে দে'বার জন্তে বল্লেন, “প্রায়ই ত' নীরবে ধ্যানে

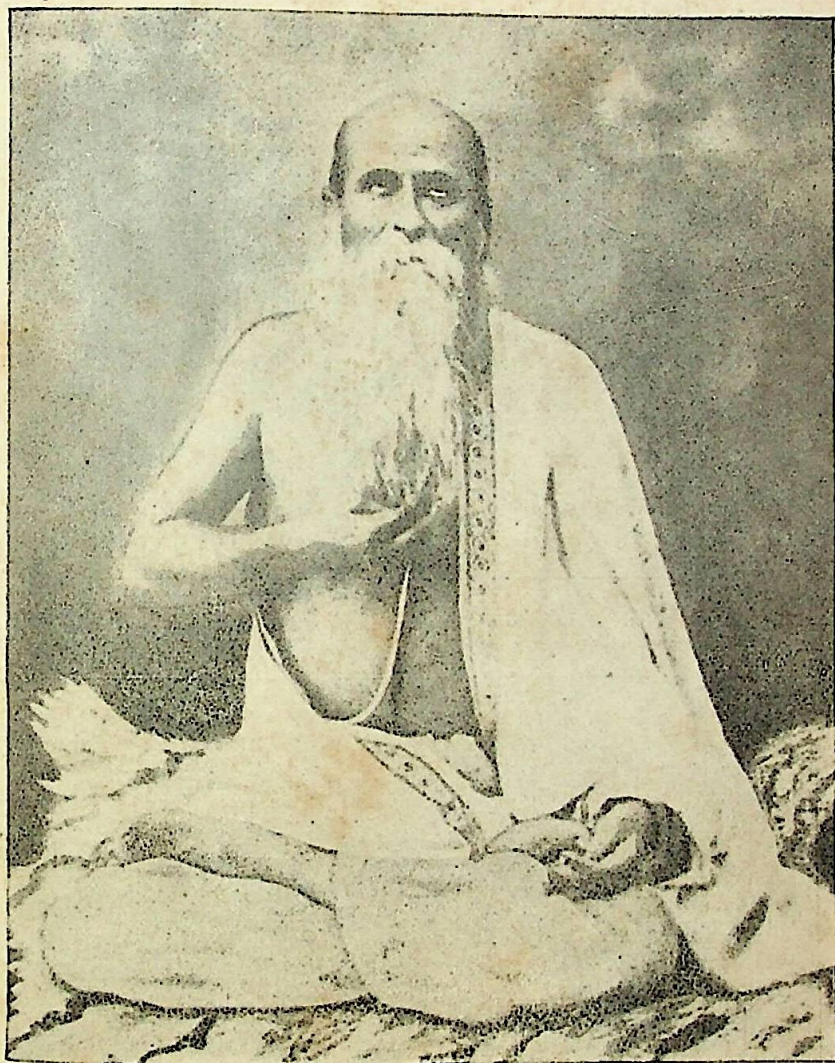
বস, কিন্তু কোন কিছু অল্পভূতি লাভ তোমার হ'য়েছে কি? সিদ্ধিলাভের প্রশ্নালীটি যেন ভুলো না কিন্তু।”

ধ্যান শেষ হ'বার পর তিনি উঠে প'ড়লেন, তা'রপর কয়েকটি আম আমায় খেতে দিলেন। গম্ভীর প্রকৃতির মধ্যেও তাঁ'র সরস মনের পরিচয় মেলে। রসিকতা ক'রে বললেন, “সাধারণ লোকেরা ধ্যানযোগের চেয়ে জলযোগের কথাটাই বেশী বোঝে, জান্লে হে!” তাঁ'র এ “যৌগিক” রসিকতা আমায় হাসিতে উচ্ছৃসিত ক'রে তুল্লে। বললেন, “বাবা, তোমার কি হাসি!” তাঁ'র দৃষ্টিতে কৌতুক ও স্নেহের দীপ্তি! তাঁ'র নিজের মুখ কিন্তু সদাই গম্ভীর, আর তা'তে একটি স্বর্গীয় হাসির পরশ লাগা! তাঁ'র পদ্মলোচন, একটি অস্তুগূঢ় দিব্য হাসিতে উজ্জ্বল।

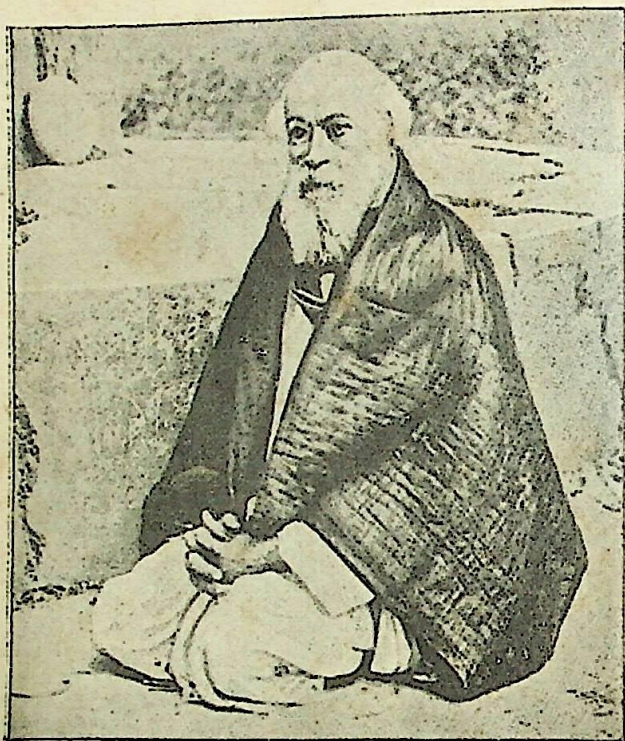
টেবিলের ওপর কতকগুলো মোটা খাম দেখিয়ে তিনি বললেন, “সুদূর আমেরিকা হ'তে এই চিঠিগুলো এসেছে। সেখানকার গোটাকতক সভা-সমিতির লোকেদের সঙ্গে আমার চিঠিপত্র লেখালেখি হয়। দেখছি তা'দের সভ্যদের যোগ সম্বন্ধে খুব আগ্রহ। কলম্বাসের চেয়েও সূক্ষ্মতর দিকনির্ণয়ের জ্ঞানের আভাস পেয়ে এরা ভারতবর্ষকে নতুন ক'রে আবার আবিষ্কার ক'রেছে। আমি তা'দের এ বিষয়ে সাহায্য ক'রে খুব খুসী। অব্যাহত দিনের আলোর মত যোগের জ্ঞান যে'ই চায়, সেই বিনামূল্যে পে'তে পারে।

“মাহুঘের মুক্তির জন্তে মুনিঋষিরা যা' একান্ত প্রয়োজনীয় ব'লে বোধ ক'রেছিলেন, সে'টা প্রতীচ্যের লোকেদের জন্তে হান্ধা ক'রে দি'য়ে আর কা'র নেই। আত্মায় এক, কিন্তু বাইরের অভিজ্ঞতায় ভিন্ন হ'লেও কি পশ্চিম, কি পূর্ব, কেউই কিছু উন্নতি ক'রতে পা'রবে না, যদি না ঠিক কোন বিধি নিয়মামুযায়ী যোগ অভ্যাস করা যায়।”

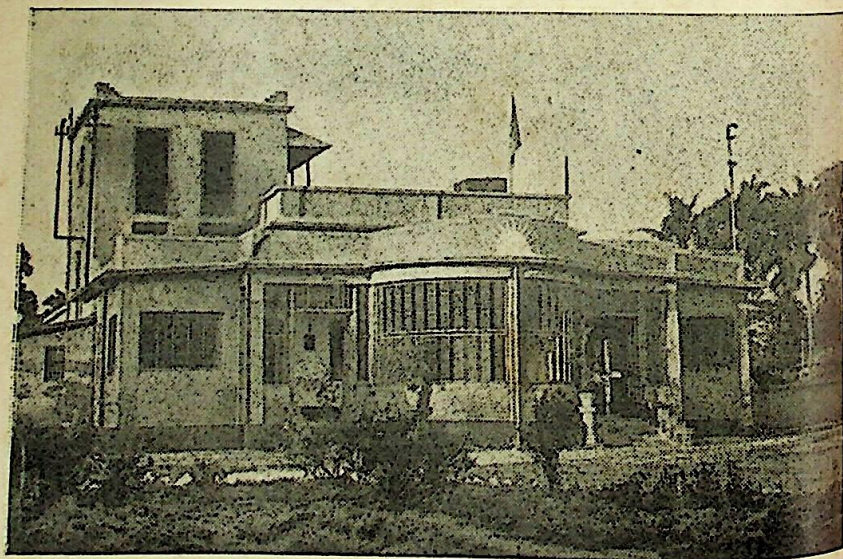
সাধু মহাশয় তাঁ'র শাস্ত ও স্নিগ্ধ দৃষ্টি দ্বারা আমায় অভিযুক্ত ক'রলেন। আমি তখন বুঝতেই পারিনি যে, এইসব কথাগুলোর মধ্যে আমার ভবিষ্যতের এক গুঢ় ইঙ্গিত নিহিত আছে। আজ এই কথাগুলো লিখতে ব'সে এখন বুঝতে পারছি যে, সময় সময় আমায় তিনি যে সব ইঙ্গিত ক'রতেন, তা'র পরিষ্কার মানে এই ছিল যে, হয় ত' কোন দিন বা আমায় ভারতের সংস্কৃতি আমেরিকায় বহন ক'রে নিয়ে যে'তে হবে।



ভাদুড়ী মহাশয় (লক্ষ্মী সিদ্ধ সাধু)।



মাষ্টার মহাশয়—শ্রী“ম”



কলিকাতার নিকটস্থ বরাহনগরে—যোগদা সংসদ আশ্রম

“মহর্ষি, আমার বড় ইচ্ছে যে, আপনি জগতের উপকারের জন্তে যোগ সম্বন্ধে একটা বইটাই লেখেন।”

তিনি বললেন, “আমি শিষ্যদের সব তৈরী করছি। তা’রা আর তা’দের শিষ্যরাই হবে সব এক একটা জীবন্ত বই। তা’রা হ’বে কালের স্বাভাবিক বিনাশ বা ক্ষয় অথবা সমালোচকদের অস্বাভাবিক সমালোচনার ক্ষতির অতীত।” ভাড়াড়ী মহাশয়ের রসিকতার আবার বাড় ব’ইল।

সন্ধ্যায় তাঁ’র শিষ্যেরা না আসা পর্য্যন্ত আমি একলা তাঁ’র সঙ্গে বসে রইলুম। ভাড়াড়ী মহাশয় তাঁ’র অননুकरणीয় অপূর্ব প্রসঙ্গ সুরু করলেন। শান্তির প্লাবন বইয়ে তিনি শ্রোতৃবৃন্দের মানসিক জালজঞ্জাল সব ধুয়ে মুছে যেন ভগবানের দিকে তাসিয়ে নিয়ে চললেন। রূপকচ্ছলে নীতিকথা তিনি বেশ বিস্তৃত বাংলায় ব’লতেন।

এদিন সন্ধ্যাবেলা ভাড়াড়ী মহাশয় মীরাবাইয়ের জীবনের বিবিধ দার্শনিক তত্ত্বের ব্যাখ্যা করছিলেন। রাজকুমারী মীরাবাই ছিলেন একজন রাজপুতানী, যিনি সাধুসঙ্গলাভের জন্তে রাজৈশ্বর্য্য পর্যাঙ্ক ও ত্যাগ ক’রে চ’লে এসেছিলেন।

একজন খুব বড় সাধু তাঁ’কে স্ত্রীলোক ব’লে দর্শন দিতে অস্বীকার করাতে তিনি ব’লেছিলেন,—“তোমার গুরুজিকে বো’লো যে, এক ঈশ্বর ছাড়া আর কেউ যে পুরুষ (বিশ্বস্রষ্টা) আছেন, তা’ আমি জানি না। তাঁ’র কাছে আমরা কি সবাই নারী (মায়া বা প্রকৃতি) নই?” জবাব শুনে সন্ন্যাসীপ্রবর মীরাবাইয়ের পদতলে এসে প’ড়ে মার্জ্জনা ভিক্ষা ক’রলেন।

মীরাবাই বহু ভক্তিরসায়ক সঙ্গীত রচনা ক’রে গেছেন,— তা’ ভারতের সর্বত্র সাদরে গীত হ’য়ে থাকে। এখানে তা’র একটি উদ্ধৃত হ’ল,—

নিত নুহানে সে হরি মিলে তো জল জন্ত হোই,

ফলমূল থাকে হরি মিলে তো বাঁড়ুড় বাঁদরাই।

তুলসী পূজন্সে হরি মিলে তো মৈঁ পুঁজু তুলসী কাড

পাথর পূজন্সে হরি মিলে তো মৈঁ পুঁজু পহাড় ॥

ভূণ ভখন্সে হরি মিলে তো বহত মৃগী অজা

স্ত্রী ছোড়নসে হরি মিলে তো বহত রাহে হৈ খোজা ॥

দুধ পিনেসে হরি মিলে তো বহুত বৎস বাল্য

মীরা কহে বিনা প্রেমসে মিলে নহি নন্দলালা ॥

ভাছুড়ী মহাশয় যেখানে যোগাসনে বসেছিলেন, সেখানে তাঁ'র পায়ে
কাছে তাঁ'র জন কয়েক শিষ্য কিছু প্রণামী রাখলেন। এই শ্রদ্ধানিবেদনের
অর্থ যে শিষ্য তাঁ'র পার্থিব সকল সম্পদ গুরুপদতলে অর্পণ ক'রলেন।

কৃতজ্ঞ বন্ধুরা ভগবানেরই ছদ্মরূপ, তিনি স্বরূপের সন্ধানই ফেরেন।

পিতৃপ্রতিম সেই মহাবীর নিকট হ'তে বিদায় নিতে গিয়ে, একদৃষ্টে চেয়ে
চেয়ে তাঁ'র এক শিষ্য উচ্ছ্বসিত আবেগে ব'লে উঠলেন, “গুরুদেব, আশ্চর্য্য
আপনি! ভগবানের খোঁজে আপনি আপনার আরাম, ঐশ্বর্য্য, সর্ব্বস্ব ত্যাগ
ক'রে এসে আজ আমাদের জ্ঞান বিলোচ্ছেন, সত্যিই অদ্ভুত!” সকলেই জানত
যে, একান্ত মনে যোগমার্গ অবলম্বন করবার সময় ভাছুড়ী মহাশয় বাল্যকাল
হ'তেই তাঁ'দের বংশের বিরাট ঐশ্বর্য্য অতি অবহেলায় ত্যাগ ক'রে
চলে এসেছেন!

সাধুপ্রবর যুগ ভৎসনার সঙ্গে বললেন, “তুমি উন্টো কথা কইছ। আমি
সামান্য গোটাকতক টাকা বা তুচ্ছ কয়েকটা সংসার স্মৃতি ত্যাগ ক'রে চলে
এসেছি বটে, কিন্তু তা'র বদলে কি পে'য়েছি জান? অপার ভূমানন্দের
অনন্ত সাম্রাজ্য! তা' হ'লে আমি সব ত্যাগ ক'রলুম কি ক'রে, ব'ল? আমি
সে ধন উপভোগের আনন্দ জানি। তা' কি ত্যাগ হ'ল? অদূরদর্শী
সাংসারিক লোকেরাই ত্যাগী। কারণ তা'রা সামান্য গোটাকতক সংসারের
খেলনার লোভে তা'দের অতুলনীয় স্বর্গের অধিকার ত্যাগ ক'রে বসে!”

ত্যাগের এই অপরূপ ব্যাখ্যা শুনে আমি হাসতে লাগলুম। এ ব্যাখ্যার
জোরে সাধু ভিখারী কুবেরের ঐশ্বর্য্য পায় আর ধনগরী কোটীপতিরা
তা'দের নিজের অজ্ঞাতসারে ক্রমশঃ এই পথের পথিক হ'য়ে পড়ে।

তিনি আবার বলতে শুরু ক'রলেন, “জানলে, ঈশ্বরের বিধান, যে কোন
ইন্সিওরেন্স কোম্পানীর চেয়ে আমাদের ভবিষ্যতের জন্তে বেশ ভাল ভাবেই
ব্যবস্থা করা আছে, তা'র আর কোন ভুল নেই!” কথাগুলি অবশ্য তাঁ'র
ব্যক্তিগত মতবাদের প্রত্যক্ষ উপলব্ধিজাত সত্য। “বাইরের নিরাপত্তার
বিষয়েই সংসারের সকল লোক খোঁজে। তা'দের সংসারজীবনের ক্লিষ্ট চিন্তা-

সকল তা'দের কপালে কাটা দাগেরই মতন ফুটে আছে। যিনি আমাদের প্রথম নিঃশ্বাস নেবার সঙ্গে সঙ্গেই বায়ু, দুগ্ধ, মাতৃস্তন্য প্রভৃতির ব্যবস্থা করে রেখেছেন—তিনি তাঁ'র ভক্তদের দিনের পর দিন কি করে রক্ষা করে চলতে হয়, সে ব্যবস্থাও তিনি জানেন বই কি।”

স্কুলের ছুটির পর সেই সাধুর কাছে আমার প্রত্যহই যাতায়াত চলতে লাগল। নীরব উৎসাহ দানে তিনি আমায় প্রত্যক্ষ অনুভূতি লাভে সাহায্য করতেন। একদিন তিনি আমাদের গড়পার রোডের বাড়ীর কাছেই রাম-নোহন রায় রোডে উঠে গেলেন। তাঁ'র ভক্তশিষ্যগণ সেখানে “নগেন্দ্র মঠ” নামে একটি আশ্রম স্থাপনা করেছেন।

যদিও এটা আমার এ কাহিনীর কয়েক বছর পরের কথা, তবুও ভাঙুড়ী ম'শায়ের শেষ কথাগুলো এখানে একবার উল্লেখ করব। পশ্চিমে যাবার অব্যবহিত পূর্বেই আমি তাঁ'র কাছে বিদায় আশীর্বাদ নেবার জন্তে নত-জান্ন হ'য়ে বসতেই তিনি বললেন, “বাবা, আমেরিকায় যাও, ভারতের প্রাচীন গৌরবই হ'বে তোমার বিজয়বন্দ্র। স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি তোমার কপালে বিজয়লেখ। দূর দূরান্তের, দেশ বিদেশের সব বড় বড় মনীষীরা তোমায় খুব আদর যত্ন ক'রেই বরণ ক'রে নেবে, তা' দেখে নিও।”

৮ম পরিচ্ছেদ

ভারতের সুবিখ্যাত বৈজ্ঞানিক

জগদীশ চন্দ্র বসু

“জগদীশ চন্দ্র বসুর বেতার আবিষ্কার মার্কণির আগে হয়েছিল।” এই চাক্ষু্যকর উক্তি শুনে একটু এগিয়ে দেখলুম যে, ফুটপাথের উপর জনকতক অধ্যাপক বৈজ্ঞানিক তর্ক জুড়ে দিয়েছেন। তাঁদের সঙ্গে তর্কে যোগদানের অভিপ্রায় যদি আমার জাতীয় গর্বপ্রণোদিত হয়, তা’ হ’লে অবশ্য আমি দুঃখিত। ভারতবর্ষ শুধু দর্শনে কেন, পদার্থবিজ্ঞানও জগতে শ্রেষ্ঠ আসন লাভ করতে পারে। তা’র এই প্রমাণ প্রদর্শনে আমি আর প্রবল আগ্রহ উপেক্ষা করতে পারলুম না।

জিজ্ঞাসা করে বসলুম “তা’র মানে কি ম’শায়।”

অধ্যাপকটি অল্পগ্রহ করে ব্যাখ্যা করে শোনালেন, “বসু মহাশয়ই হ’চ্ছেন বেতার গ্রাহকযন্ত্র, আর বৈদ্যুতিকতরঙ্গ প্রতিক্ষেপণ নির্দেশক যন্ত্র আবিষ্কারে প্রথম। কিন্তু আমাদের এই ভারতীয় বৈজ্ঞানিক তাঁ’র আবিষ্কার ব্যবসায়ে লাগাতে পারেন নি। শীগগির কিন্তু তিনি অজৈব হ’তে জৈব জগতে তাঁ’র মনোযোগ নিবেশিত ক’রলেন। উদ্ভিদতত্ত্ববিদ হিসাবে তাঁ’র যুগান্তকারী আবিষ্কার কিন্তু পদার্থবিদ হিসাবে, এমন কি তাঁ’র মৌলিক গবেষণাকেও ছাড়িয়ে যা’চ্ছে।”

আমার ব্যাখ্যাতাকে আমি ধন্যবাদ দিতে তিনি বললেন, “বসু মহাশয় প্রেসিডেন্সী কলেজের আমার সহাধ্যাপক।”

তা’র পরদিনই আমি সেই খাষি জগদীশ চন্দ্রের বাড়ীতে উপস্থিত হ’লুম। গড়পার রোডের আমাদের বাড়ীর কাছেই তাঁ’র বাড়ী। দূর থেকেই বরাবর আমি তাঁ’কে শ্রদ্ধা করে চলতুম। গম্ভীর, প্রশান্ত, সৌম্য-

মুক্তি, বহু মহাশয় আমায় সাদরে অভ্যর্থনা ক'রে নিয়ে গেলেন। পঞ্চাশ বছর বয়সেও তাঁ'র সুন্দর জুঠাম দেহ, ঘন চুল, প্রশস্ত কপাল, চোখ দু'টি স্বপ্নময়। সুস্পষ্ট কণ্ঠস্বর, তাঁ'র জীবনব্যাপী বৈজ্ঞানিক প্রকৃতির পরিচায়ক।

জগদীশ চন্দ্র বললেন,—

“আমি সম্প্রতি পশ্চিমের বিজ্ঞান সভাগুলি পরিদর্শন ক'রে ফিরছি। প্রাণী বা উদ্ভিদ জগতের মধ্যে এক অবিভাজ্য অথও প্রাণের ঐক্য প্রদর্শক আমার আবিষ্কৃত সূক্ষ্ম যন্ত্রগুলির বিষয়ে তাঁ'রা অসীম আগ্রহ প্রকাশ করলেন।* জগদীশ বহুর আবিষ্কৃত ক্রেকোগ্রাফ (কুঞ্জনমান) যন্ত্রে আরতন এক কোটি গুণ বড় দেখায়। অলুবীক্ষণযন্ত্রে কেবলমাত্র কয়েক হাজার গুণ বড় দেখায়। তাইতেই এ প্রাণিতত্ত্ববিদ্যায় বিশেষ অল্পপ্ৰেরণা এনে দিয়েছে। ক্রেকোগ্রাফ বিজ্ঞানে অগণিত পথ উন্মুক্ত ক'রে দিয়েছে।”

বল্লভ, — “আপনি ম'শায় বিজ্ঞানের অদৃশ্য হাত দিয়ে পূর্ব পশ্চিমের দ্রুত মিলন ঘটাতে যথেষ্টই সাহায্য করেছেন।”

বহু মহাশয় শুরু করলেন, “কেস্থিজে আমার শিক্ষালাভ হয়। পশ্চিমের সব মতবাদেরই সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম পরীক্ষামূলক সত্যনির্ধারণ প্রণালী প্রয়োগ কি সুন্দর! এই রকম প্রণালীতে জ্ঞানসঞ্চয় অন্তর্দৃষ্টির সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। এইটাই আমার প্রাচ্যের উত্তরাধিকার! মুক জড়প্রকৃতির চিরমৌন অবগুণ্ঠন উন্মোচন করতে আজ তা'রাই আমায় সাহায্য করেছে। আমার ক্রেকোগ্রাফের † স্বয়ংসিদ্ধ লিপিগুলো দারুণ সন্দেহবাদীদেরও কাছে প্রমাণ ক'রে দিয়েছে যে, গাছেরও সুখদুঃখবোধের স্নায়বিক উত্তেজনা আছে, এবং বিচিত্র ভাবানুভূতির জীবনও আছে। প্রাণিজগতে যেমন, গাছদেরও ভিতর সেইরকম একই ধরনের ভালবাসা, ঘৃণা, ভয়, আনন্দ, ক্রেশ ও উত্তেজনা, মোহ প্রভৃতি আর অসংখ্য রকমের উত্তেজনার যথোপযুক্ত ভাবানুভূতিও আছে।”

“অধ্যাপক ম'শায়, এই নিখিল বিশ্বসৃষ্টির মধ্যে অপূর্ব প্রাণস্পন্দন,

* সব বিজ্ঞানই অতীন্দ্রিয় জ্ঞানময়, তা' না হ'লে তা'র অস্তিত্ব থাকে না। উদ্ভিদবিদ্যাও যথার্থ মত এখন গ্রহণ করছে। ব্রহ্মার অবতারবাদও সম্বন্ধেই প্রাণিবিজ্ঞানের পাঠ্যপুস্তকরূপে দেখা যাবে—এমার্সন।

† ক্রেকোগ্রাফ ও অন্যান্য আবিষ্কারের জন্য জগদীশচন্দ্র ১৯১৭ খ্রষ্টাব্দে নাইট উপাধিতে ভূষিত হন।

আপনার আবির্ভাবের পূর্বে কেবল কবিকল্পনার মধ্যেই নিবদ্ধ ছিল। আমি একটি সাধুকে জানুতুম, যিনি কখনও ফুল তুলতেন না। বলতেন, ‘গোলাপ কুঞ্জকে তা’র সৌন্দর্যের সমারোহ থেকে বঞ্চিত ক’রবে কেন? আমার নিষ্ঠুর চয়নে কি এর মহিমার অপহৃত ঘটান উচিত হ’বে?’ তাঁ’র দরদী কথাগুলো অক্ষরে অক্ষরে আপনার আবিষ্কারের সত্যতা প্রমাণ করেছে।”

“কবির কারবার সত্যের সঙ্গে বটে, কিন্তু বিজ্ঞানী এগোন বড় বিপরীত ভাবে। একদিন আমার ল্যাবরেটরীতে এসে ক্রেক্সোগ্রাফের অবিসম্বাদিত প্রমাণ সব দেখে যাবেন।”

সকৃতজ্ঞ চিন্তে আমি তাঁ’র নিমন্ত্রণ গ্রহণ ক’রে প্রস্থান ক’রলুম। পরে আমি শুনেছিলুম যে, উদ্ভিদতত্ত্ববিদ বসু মহাশয় প্রেসিডেন্সী কলেজ পরিত্যাগ করেছেন এবং কলকাতায় একটি গবেষণাকেন্দ্র স্থাপনের চেষ্টায় আছেন।

বসু বিজ্ঞান মন্দির প্রতিষ্ঠার সময় আমি অস্থানে যোগদান করেছিলুম। শত শত উৎসাহী লোক সেই উপলক্ষ্যে মন্দিরে গিয়েছিলেন। নূতন বিজ্ঞান মন্দিরের অপূর্ব কারুকার্য আর তা’র আধ্যাত্মিক প্রতীকের দর্শনে আমি মোহিত হ’য়ে গিয়েছিলুম। সন্মুখের প্রবেশদ্বারে দেখা গেল—কোন সুদূর তীর্থক্ষেত্র হ’তে আনীত বহু শতাব্দীর প্রাচীন এক স্মৃতিচিহ্ন! পদ্মাকৃতি ফোয়ারার পিছনে উদ্ধাবাহিনী এক খোদিত কল্যাণীমূর্তি, অনির্বাণ জ্ঞানালোকবর্তিকার চিরবাহিকা নারীর প্রতি ভারতীয় শ্রদ্ধার অপূর্ব নিদর্শন! উদ্যানের মধ্যে একটি ক্ষুদ্র মন্দির প্রকৃতির লীলাতীত অরূপের প্রতি উৎসৃষ্ট। বেদীতে কোন মূর্তি প্রতিষ্ঠার অভাব, দেবতার অশরীরী ভাবেরই সূচনা প্রকাশ করছিল। আজকের অস্থান উপলক্ষ্যে প্রদত্ত জগদীশ চন্দ্রের নিম্নলিখিত বাণী শুনে মনে হ’ল যেন, ভাবানুপ্রাণিত প্রাচীন কোন ঋষির মুখ হ’তে তা’ নিঃসৃত হয়েছে,—

“আজকের দিনে এই গৃহ আমি মাত্র পরীক্ষাগার রূপে নয়, প্রকৃতই মন্দির রূপে উৎসর্গ ক’রলুম।” তাঁ’র শ্রদ্ধাপ্লুত গম্ভীরবাণী, তখন সেই জনপূর্ণ প্রেক্ষাগারের উপর এক অদৃশ্য প্রভাব বিস্তার করলে। “আমার পরীক্ষার সময় আমার অজ্ঞাতসারে আমি জড় ও শরীরবিজ্ঞান সীমারেখায় উপস্থিত হ’য়ে পড়েছিলুম। আশ্চর্যের বিষয় আমি দেখতে পেলুম যে, সীমারেখা

ক্রমশঃ অদৃশ্য হ'য়ে বা'চ্ছে আর জড় ও প্রাণের রাজ্যের সংযোগ ধীরে ধীরে প্রকাশ পাচ্ছে! অজৈব পদার্থ বোধ হ'ল, জড় ছাড়া যেন অস্ত্র কিছু, বহু বিচিত্র শক্তির ক্রিয়াপ্রকাশে এতে এক অপূর্ব পুলক শিহরণ!

“দেখলুম,—একই সাধারণ প্রতিক্রিয়ায় ধাতু, বৃক্ষ, প্রাণী প্রভৃতি সব একই সাধারণ নিয়মের অধীন। তা'রা সকলেই মূলতঃ একই রকমের ক্লাস্তি আর অবসাদ বোধ করে—একই রকমের তা'দের আরোগ্যলাভ বা আনন্দ শিহরণ অথবা মরণে একই রকমের চিরস্থায়ী স্থির নিষ্পন্দ ভাব। এই বিরাট ঐক্যে বিশ্বয়ে অভিভূত হ'য়ে উৎসাহের সঙ্গে আমার পরীক্ষার ফলগুলি আমি রয়েল সোসাইটির গোচরীভূত করি। সেখানে উপস্থিত শারীরতত্ত্ববিদেরা আমার পরীক্ষার ফলগুলি জড় জগতের সীমার মধ্যেই নিবদ্ধ রেখে আমায় নিরস্ত হ'তে বললেন—আর জানালেন যে, তা'তেই আমার নিশ্চিত সাফল্য এবং তাঁ'দের রাজ্যে যেন অনধিকার প্রবেশ না করি! আমি হয় ত' আমার অজ্ঞাতসারে এক রকমের জাতিভেদের এলাকায় ঢুকে পড়ে বোধ হয় তাদের ভব্যতা লঙ্ঘন ক'রে ফেলেছিলুম।

“অজানিত একটা ধর্মের গোঁড়ামি গোছের জিনিষও সেখানে বর্তমান ছিল—যা'তে ক'রে বিশ্বাসের সঙ্গে অজ্ঞতার একটা বিসদৃশ সংমিশ্রণ ঘটায়। এ আমরা প্রায়ই ভুলে যাই যে, যিনি চিরবিবর্তনশীল সৃষ্টিরহস্তে আমাদের ঘিরে রেখেছেন, তিনি আমাদের অস্তরের মাঝে জিজ্ঞাসা ও উপলব্ধির ইচ্ছাও সূপ্ত রেখেছেন। বহুদিনের ভ্রান্তির মধ্যে জানতে পেরেছিলুম যে, বিজ্ঞানীদের উৎসৃষ্ট জীবন অলঙ্ঘনীয় অস্তুহীন সংগ্রামে পরিপূর্ণ। লাভ ক্ষতি ফলাফল একই ভেবে তাঁ'দের জীবন উৎসর্গ ক'রতে হয়।

“কালে পৃথিবীর বিশিষ্ট বিজ্ঞানসমিতিগুলি আমার মতবাদ আর তা'র পরীক্ষার ফলগুলিও গ্রহণ ক'রলেন আর বিজ্ঞানে ভারতের দানের প্রাধান্যও স্বীকার ক'রে নিলেন।* সঙ্কীর্ণ বা সীমাবদ্ধ কোন কিছু কি ভারতীয় মনে তৃপ্তি আনতে পারে,—যেখানকার বাণী হচ্ছে “নাগ্নে স্তম্ভমস্তি—ভূমৈব স্তম্ভং”

* “বর্তমানে কেবলমাত্র ঘটনাচক্রেই ভারতবর্ষ, আমেরিকার কলেজ ছাত্রদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সমর্থ হয়েছে। আটটি বিশ্ববিদ্যালয়ে (হার্ভার্ড, ইয়েল, কলম্বিয়া, প্রিন্সটন, জনস্ হপকিন্স, পেন্সিলভেনিয়া, শিকাগো আর ক্যালিফোর্নিয়া) ভারততত্ত্ব অথবা সংস্কৃতে অধ্যাপনার ব্যবস্থা

অল্পতে, ক্ষুদ্রতে স্মৃতি নাই, ভূমিতেই স্মৃতি? বহু প্রচলিত প্রাচীন প্রথা আর পুনরুজ্জীবনের প্রাণশক্তিবলে এই ভারতভূমি বহু পরিবর্তনের ভিতর দিয়ে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আপাতমনোহর আর সাময়িক পুরস্কারের আকর্ষণ দূরে ফেলে রেখে ভারতবাসীরা সর্বদাই এগিয়ে চলেছে জীবনের সর্বোচ্চ আদর্শ উপলব্ধির সন্ধানে,—আর তা' নিষ্ক্রিয় ত্যাগে নয়, সক্রিয় সংগ্রামের ভিতর দিয়ে। দুর্বল যে সংগ্রাম অস্বীকার ক'রে কিছুই পায় নি, তা' ত্যাগ করবারও ত' কিছু নেই। বুদ্ধনীরত থেকে যিনি জয়লাভ করেছেন, তিনিই কেবল তাঁর বিজয়লব্ধ অভিজ্ঞতার ফলে জগৎকে সমৃদ্ধ করতে পারেন।

“বস্তু বিজ্ঞান মন্দিরে ইতিমধ্যেই আরও পরীক্ষায় জড়ের উপর প্রতিজ্ঞা এবং উদ্ভিদ জগতে অপ্রত্যাশিত আবিষ্কার—পদার্থবিজ্ঞান, শারীরতত্ত্ব, চিকিৎসা, কৃষি এমন কি মনস্তত্ত্ববিজ্ঞানেও জ্ঞানলাভের বিস্তৃত পন্থা উন্মুক্ত ক'রে দিয়েছে! যে সব সমস্যার সমাধান আজ পর্যন্ত অসম্ভব ব'লে বিবেচিত হ'ত, তা'রা আজ পরীক্ষামূলক গবেষণার সীমার মধ্যে এনে পড়েছে!

“কিন্তু নিশ্চিত সত্য নির্ণয় ছাড়া ত' আর চরম সাফল্য লাভ করা যায় না। কাষেই আমার পরিকল্পিত হুম্মাহুভূতিসম্পন্ন যন্ত্র সকলের সুদীর্ঘ শ্রম প্রবেশ গৃহের মধ্যে আপনাদের সন্মুখেই আজ রাখা হয়েছে। তা'রা হচ্ছে

আছে। কিন্তু ভারতবর্ষ ইতিহাস, দর্শন, ললিতকলা, রাজনীতি, সমাজতত্ত্ব বিভাগে দ্বি-মানসিক উৎকর্ষ বা বুদ্ধিবৃত্তির ভ্রূয়োদর্শন,—যা'তে আমরা দেখেছি ভারতবর্ষের দান বিরাট, তা' অস্বাভাবিক বিভাগের কোন একটায় ভারতবর্ষ বস্তুত: এখনও অপরিচিত ... হ'তরাং আমাদের মনে এ-যে, কোন প্রধান বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন বিভাগ, বিশেষত: সাহিত্যাদি বা ললিতকলা পাঠ্যক্রমের ভারতীয় বিভাগের উপযুক্তভাবে শিক্ষিত বিশেষজ্ঞ ব্যতীত পরিপূর্ণভাবে হুম্মাহুভূতি হ'তে পারে না। আমরা এও বিশ্বাস করি যে, প্রত্যেক কলেজ, যা'র লক্ষ্য হচ্ছে তা'র গ্রাজুয়েট বাসোপযোগী ক'রে গড়ে তোলাবার জন্তে এই পৃথিবীতে তা'দের উপযুক্ত কর্তব্য ক'রবার জ-তৈরী করা, তা'র শিক্ষকদলের মধ্যে ভারতবর্ষের সভ্যতার বিষয়ে অভিজ্ঞ একজন অধ্যাপক রাখা অবশ্যই কর্তব্য। (পেন্সিলভ্যানিয়া ইউনিভার্সিটির প্রফেসর ডব্লিউ নর্থম্যান ব্রাউনের প্রবন্ধ ইহা সন্নিবিষ্ট।)

আপাতপ্রতীয়মান শ্রাস্তিজনক সাদৃশ্য হ'তে, অদৃশ্য প্রকৃত সত্তাকে খুঁজে বার করতে বা মাহুঘের সক্ষীর্ণ বুদ্ধির সীমা অতিক্রম করতে অবিরাম ধৈর্য্য, শ্রম আর উপায় উদ্ভাবনের সুদীর্ঘ প্রচেষ্টারই সাক্ষী। শ্রষ্টা বৈজ্ঞানিকেরা, যাঁরা সব সাফল্য লাভ করেছেন, তাঁরা সব সকলেই জানেন যে, আসল পরীক্ষাগার হচ্ছে মন, যেখানে মায়ার আড়াল হ'তে তাঁরা প্রকৃত সত্যটি খুঁজে বা'র করেন।

“এখানকার বহুতা কোন অপ্রত্যক্ষ লক্ষজ্ঞানের পুনরাবৃত্তি হবে না। এই মন্দিরে নতুন আবিষ্কারগুলি আজ সর্বপ্রথম দেখান হবে। মন্দিরের গবেষণাকার্যের বিবরণীর নিয়মিত প্রকাশে ভারতের এই সব দানগুলি জগতের সর্বত্রই পৌঁছতে পারবে, আর তা' সাধারণের সম্পত্তিই হবে। এর ওপর কখনও কোন পেটেন্ট নেওয়া হবে না। আমাদের জাতীয় কৃষ্টির ভাব এই চায় যে, ব্যক্তিগত লাভের জন্যে আমরা জ্ঞানের ব্যবহারের মর্যাদাহানি থেকে যেন চিরতরে মুক্ত থাকি।

“আর এও আমার ইচ্ছে যে, এই বিজ্ঞান মন্দিরের সমস্ত স্বেযোগ স্বেদিতা সকল দেশেরই কর্মীদের কাছে সহজলভ্য হয়। এ বিষয়ে আমি আমাদের প্রাচীন প্রথাই অনুসরণ করতে চেষ্টা করছি। আড়াই হাজার বছর আগে ভারতবর্ষ তা'র প্রাচীন বিশ্ববিদ্যালয়সকল নালন্দা ও তক্ষশীলায় পৃথিবীর সর্বত্র হতে বিদ্যার্থীদের সাদর আহ্বান জানিয়েছিল। বিজ্ঞান যদিও প্রাচ্য বা প্রতীচ্য কোন দেশবিশেষের নয়, বরং সার্বজনীনতায় এ আন্তর্জাতিক, তবুও ভারতবর্ষ জগৎকে তা'র বিরাট দানের জন্ত বিশেষ ভাবে উপযুক্ত।

প্রাচীন হিন্দুদের কাছে পদার্থের আণবিক সংগঠন সুপরিচিত ছিল। ভারতীয় ষড়দর্শনের মধ্যে বৈশেষিক একটি—সংস্কৃত “বিশেষ” অর্থাৎ আণবিক সত্ত্ব হ'তে এর ব্যুৎপত্তি। বৈশেষিক দর্শনের বিশিষ্ট টীকাকারদের মধ্যে প্রধান হচ্ছেন ঔলুকা,—যিনি কণাদ নামেও পরিচিত, ২০০০ বৎসর পূর্বে জন্মগ্রহণ করেন।

১৯৩৪ সালের “ইষ্ট ওয়েস্ট” পত্রিকায় বৈশেষিক দর্শনের বৈজ্ঞানিক মতবাদের সংক্ষিপ্ত সার নিম্নলিখিতরূপে প্রকাশিত হয়েছে, “যদিও আধুনিক আণবিকতত্ত্ব সাধারণতঃ বিজ্ঞানের নূতন উন্নতি বলেই পরিকল্পিত হয়, কিন্তু এ কণাদ কর্তৃক বহু বহু পূর্বেই ব্যাখ্যাত হয়েছিল। সংস্কৃত অণু, গ্রীকশব্দ এটমের ভাবার্থ “অবিভাজ্য” রূপে উপযুক্তভাবেই অনুদিত হ'তে পারে। ষ্ট্রটপূর্ব যুগের

“ভারতের প্রচণ্ড কল্লনা, যা’ আপাতবিরোধী সত্যসকল হ’তে নতুন ধারা প্রবর্তন করে, তা’ গভীর মনঃসংযোগের অভ্যাসে সংযত। এই সংযম কিন্তু অসীম ধৈর্যের সঙ্গে সত্যানুসন্ধানে শক্তি যোগায়।”

এই জগৎ বিখ্যাত বৈজ্ঞানিকের শেষ কথাগুলিতে আমার চক্ষে অশ্রু এল। “ধৈর্য্য” কথাটা কি ভারতবর্ষ এই নামের প্রতিশব্দ নয়—যা’ কালের গতি অথবা ঐতিহাসিকদের নাগালের বাইরে?

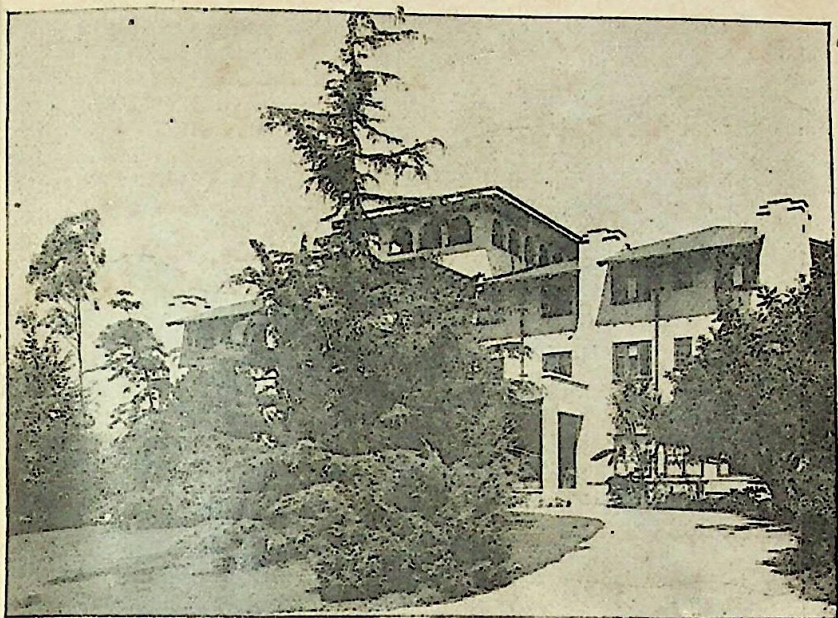
প্রতিষ্ঠা দিবসের অল্প কিছুদিন পরেই আবার একবার সেই বিজ্ঞান মন্দির দেখে এলুম।

সুবিখ্যাত উদ্ভিদতত্ত্ববিদ মহাশয়, তাঁ’র প্রতিশ্রুতি স্মরণ ক’রে, তাঁ’র নির্জন পরীক্ষাগারে আমায় নিয়ে গেলেন। তাঁ’রপর একটা পরীক্ষা সুরু ক’রে বসলেন, “আমি এই ফার্ণগাছের সঙ্গে আমার “ক্রেস্কোগ্রাফ” লাগিয়ে দিচ্ছি। এ বহুশুণ বাড়িয়ে দেখায়। ঐ অল্পপাতে যদি শামুকের গতি বাড়িয়ে দেখান যায়, তবে তা’কে এক্সপ্রেস ট্রেনের মত দৌড়তে দেখা যাবে।”

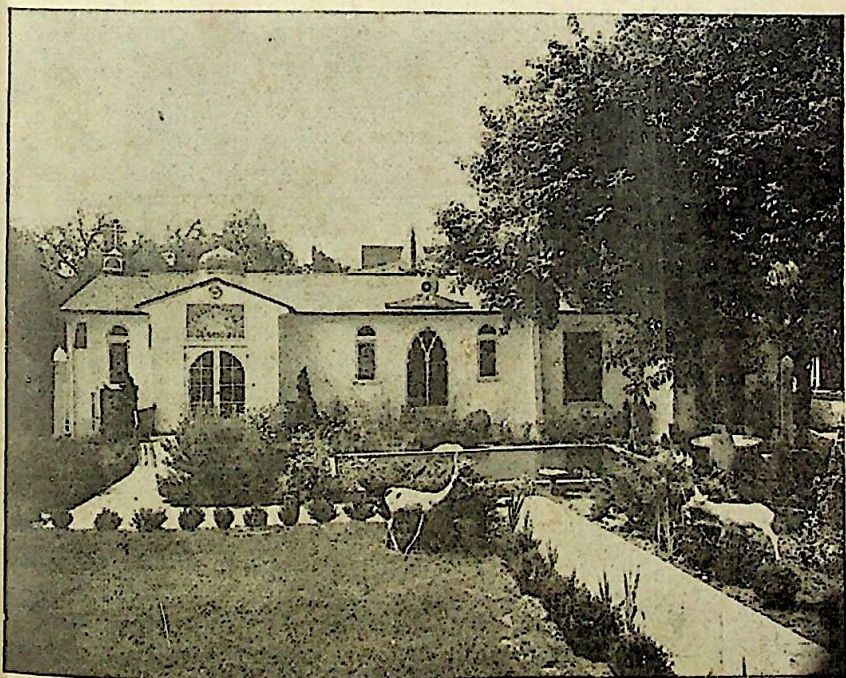
পরদার ওপর খুব বড় ক’রে প্রতিফলিত ফার্ণ গাছের ছায়ার ওপর আমার

বৈশেষিক দর্শনের অষ্টাঙ্গ বৈজ্ঞানিক তথ্যসকলের মধ্যে হ’চ্ছে—(১) চুম্বকের দিকে সূচের গতি (২) বৃক্ষমধ্যে জলসঞ্চালন (৩) আকাশ বা ইথর জড় ও অবয়বহীন,—স্বল্পশক্তি সঞ্চালনের ভিত্তি। (৪) সৌরায়ু সর্বপ্রকার উত্তাপের কারণ (৫) উত্তাপই আণবিক গঠন পরিবর্তনের কারণ (৬) মাধ্যাকর্ষণ হ’চ্ছে, পৃথিবীর অণুমধ্যস্থ গুণ, যা’ তা’দের নিম্নাভিমুখী আকর্ষণ শক্তি দেয় (৭) সকল শক্তির গতিপ্রকৃতি—যা’র কার্যকারণতত্ত্বে শক্তিরব্যয় অথবা গতির পুনঃসংস্থান নিহিত। (৮) আণবিক বিচ্ছেদে জগতের প্রলয় (৯) তাপ ও আলোর কিরণের বিচ্ছুরণ হ’চ্ছে, ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র স্বল্পকণার চতুর্দিকে অবিখ্যস্ত দ্রুতবেগে ছুটে চলা (আধুনিক “কসমিক রে” বা মহাব্যোমরশ্মি মতবাদ) (১০) স্থান ও কালের আপেক্ষিকতা।

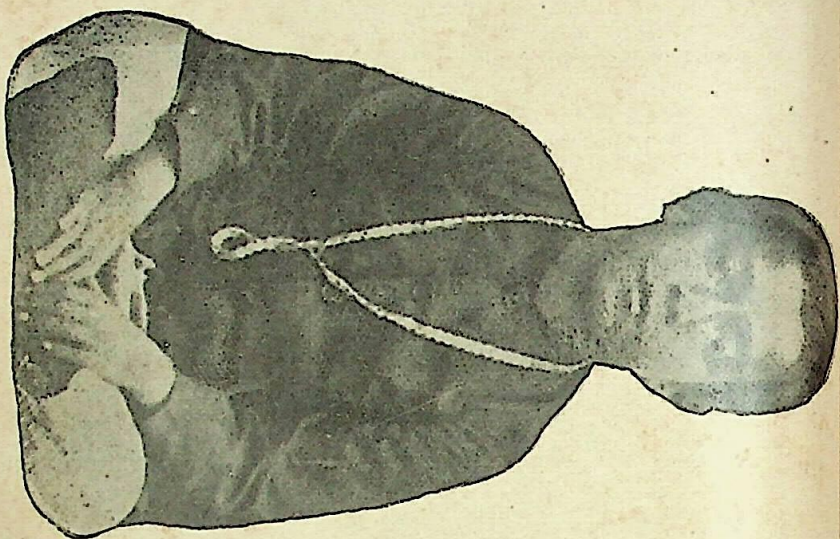
বৈশেষিক দর্শন, অণুই জগতের উৎপত্তির কারণ ব’লে নির্দেশ করেছে—অনন্ত তা’দের প্রকৃতি অর্থাৎ তা’দের চরম বৈশিষ্ট্য। এই অণুগুলি অবিরাম স্পন্দনগতিবিশিষ্ট ব’লে পরিকল্পিত হয়েছে। অণু যে একটি ক্ষুদ্র সৌরজগৎ, এই নূতন আবিষ্কার প্রাচীন বৈশেষিক দার্শনিকদের কাছে কোন নূতন কথা নয়। এ’রা সময়কেও তা’র গাণিতিক সংজ্ঞায় ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত ক’রে, তা’র একককে ‘কলা’ বলে অভিহিত করেছেন, আর তা’ হ’চ্ছে অণুর নিজ অবকাশে ঘুরতে যেটুকু সময় লাগে, কেবল সেইটুকু সময় মাত্র।



আমেরিকান লস এঞ্জেলিস্‌ সहरस्‌ সেলফ্‌ রিয্যালাইজেসন
ফেলোশিপের প্রধান কেন্দ্ৰ।



সেলফ্‌ রিয্যালাইজেসন ফেলোশিপ্‌ অফ অল
রিলিজন্স্—হলিউড, ক্যালিফোর্নিয়া।



আমার ছাত্রবৎসর বয়সে



অগস্ত্যসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক অগস্ত্যসিদ্ধ বসু

দৃষ্টি গিয়ে পড়ল। স্বপ্ন জীবনের স্পন্দন এখন বেশ স্পষ্টই দেখতে পাওয়া গেল। আমার মুখ চোখের সামনে গাছটি ধীরে ধীরে বাড়তে লাগল। বৈজ্ঞানিক মহাশয় ফার্ন গাছটির ওপর একটি ছোট ধাতু খণ্ড দিয়ে ছুঁয়ে দিলেন। নীরব বুদ্ধির অঙ্গসঞ্চালন হঠাৎ বন্ধ হ'য়ে গেল! দণ্ডটি সরিয়ে নিতেই আবার বুদ্ধির মুখর ছন্দ শুরু হ'ল। বস্তু মহাশয় বললেন, “দেখলেন ত', বাইরের সামান্যতমও কোন বাধা, অল্পভূতিসম্পন্ন তত্ত্বগুলির পক্ষে কি রকম ক্ষতিকর! দেখুন, এবার আমি ক্লোরোফর্ম প্রয়োগ করব, তা'রপর এর প্রতিবেদকও দে'ব।” ক্লোরোফর্ম দেওয়ার ফলে গাছের বুদ্ধি থেমে গেল, প্রতিবেদকের ক্রিয়াতে আবার তা' পুনরুজ্জীবিত হ'ল। বুদ্ধির সময়কার স্পন্দনগুলি বায়োস্কোপের প্লটের চেয়েও আমাকে আনন্দে অভিভূত ক'রে ফেললে। বস্তু মহাশয় (এ ক্ষেত্রে বায়োস্কোপের ভিলনের পার্টে) ফার্ন গাছটার এক অংশের ভিতর একটা তীক্ষ্ণ অস্ত্র প্রবেশ করিয়ে দিলেন। ক্লেশজনিত আক্ষেপের কম্পন দেখা গেল। কাণ্ডের একাংশ দিয়ে যখন তিনি একটা ক্ষুর চালিয়ে দিলেন, ছায়াটা তখন ভয়ানক কাঁপতে লাগল, অবশেষে মরণের কোলে ঢলে পড়ে অস্তিম বিরাম লাভ ক'রে স্থির হ'য়ে গেল।

একটা সতৃপ্ত হাসির সঙ্গে পুনরুজ্জীবনের কৌশল দেখাতে দেখাতে বস্তু মহাশয় বললেন, “একটা প্রকাণ্ড গাছকে ক্লোরোফর্ম দিয়ে আমি সাফল্যের সঙ্গে স্থানান্তরিত ক'রতে পেরেছিলুম। সাধারণতঃ এই রকম বিরাট বনস্পতি সকল স্থানান্তরিত ক'রতে গেলেই অতি শীঘ্র মরে যায়। আমার স্বপ্ন যন্ত্রের রেখাচিত্রগুলো—গাছেদেরও যে রক্ত চলাচলের মত ব্যবস্থা আছে, তা' প্রমাণ করেছে। গাছেদের রসসঞ্চালনক্রিয়া ঠিক প্রাণী দেহের রক্তসঞ্চালনেরই মত। বৃক্ষরসের উর্দ্ধপ্রবাহ, কৈশিক আকর্ষণেরই মত সাধারণ কোন যান্ত্রিক কারণ দিয়ে ব্যাখ্যা করা যায় না। ক্রোস্টোগ্রাফের দ্বারাই এটা সজীব কোষের ক্রিয়া ব'লে এর রহস্যের সমাধান হয়েছে। গাছের তলা অবধি নামান একটা গোলাকৃতি নল হ'তে সর্পিল গতিতে ঢেউগুলো বেরোয় আর এইটাই আসলে জ্বলপিণ্ডের কায করে। যতই আমরা গভীরভাবে চিন্তা করি, ততই এ প্রমাণ অত্যন্ত আশ্চর্য্য ব'লে মনে হয় যে, একটি মূলপরিকল্পনা প্রকৃতির নানা বিচিত্র রূপকে একস্থলে গুঁথে রেখেছে।

বসু মহাশয় আর একটি যন্ত্র দেখিয়ে বল্লেন, “এবার আমি আপনাকে এক টুকরো টিনের ওপর কতকগুলো পরীক্ষা দেখাব। বাইরের উত্তেজনা প্রয়োগে ধাতুর ভিতরের প্রাণশক্তি অল্পকূল অথবা প্রতিকূলভাবে ক্রিয়া করে। কালির দাগেই বিভিন্ন প্রতিক্রিয়ার ফল দেখা যাবে।”

অত্যন্ত কৌতূহলাবিষ্ট হ’য়ে, আমি অণুপরমাণুর গঠনগুলির তরঙ্গ বিশেষের রেখাচিত্রগুলো দেখতে লাগলুম। টিনে যখন বসু মহাশয় ক্লোরোফর্ম প্রয়োগ করলেন, স্পন্দনশীল লিখন তখনই থেমে গেল। ধীরে ধীরে ধাতুটি স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে পেলে, আবার সেগুলি স্তব্ধ হ’ল। বসু মহাশয় খানিকটা বিবাক্ত রাসায়নিক প্রয়োগ করলেন। টিনের স্পন্দনশীল অগ্রভাগের সঙ্গে সঙ্গে সূচীলেখনীরও নাটকীয় ভাবে রেখাচিত্রের ওপর মৃত্যু পরোয়ানা লিখে দিলে।

বসু মহাশয়ের আবিষ্কৃত যন্ত্রগুলিতে প্রমাণিত হয়েছে যে, কাঁচি বা যন্ত্রপাতিতে ব্যবহৃত ইস্পাতও ক্লাস্তির অধীন, আর—কিছু সময় বিশ্রাম পেলে আবার বেশ কার্যক্ষমতা লাভ করে। ধাতুর মধ্যে প্রাণস্পন্দন বৈজ্ঞানিক প্রবাহ বা প্রবল চাপপ্রয়োগে গুরুতরভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়, এমন কি একেবারে থেমে পর্যন্ত যায়।

অক্লান্ত পরিশ্রমের মুখর নিদর্শনস্বরূপ গৃহমধ্যস্থ সেই অগণিত আবিষ্কারের যন্ত্রগুলো আমি চার দিকে চেয়ে চেয়ে দেখতে লাগলুম।

বসু মহাশয়কে বললুম, “ম’শায়, অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে, আপনার অদ্ভুত যন্ত্রপাতির ব্যবহারের পূর্ণ সুযোগ নিয়ে কৃষিকার্যে ব্যাপক উন্নতি আরও দ্রুততর হ’য়ে উঠছে না। গাছের বৃদ্ধির ওপর নানারকম সারের প্রভাব দেখবার জন্তে, এদের মধ্যে কতকগুলোকে ল্যাবরেটরীতে চট্ট ক’রে পরীক্ষা ক’রে দেখবার কাষে লাগান সহজে সম্ভব হ’বে নাকি?”

তিনি বল্লেন, “আপনি ঠিকই বলেছেন। ভবিষ্যতে আমার যন্ত্রগুলো ব্যবহারের অগণিত উপায় বেরিয়ে যাবে। বৈজ্ঞানিকেরা কদাচিৎ সঙ্গে সঙ্গে তা’দের পরিশ্রমের পুরস্কার পায়। সৃষ্টির আনন্দই তা’দের পক্ষে যথেষ্ট।”

অক্লান্তকল্পী নিরলস সেই ঋষিপ্রতিম বৈজ্ঞানিকের প্রতি আমার অল্প

শ্রদ্ধা আর কৃতজ্ঞতা নিবেদন ক'রে আমি বিদায় নিলুম। ভাবলুম, তাঁ'র আশ্চর্য্য প্রতিভার উর্বরতা কখনও কি হ্রাস পে'তে পারে ?

কালের গতির সঙ্গে তা'র কখনও হ্রাস ঘটে নি। রেজোনেন্ট কার্ডিওগ্রাফ্ নামে একটি জটিল যন্ত্র আবিষ্কার ক'রে জগদীশ চন্দ্র বসু মহাশয় নানাজাতীয় ভারতীয় বৃক্ষের বিস্তৃত গবেষণায় প্রবৃত্ত হলেন। প্রয়োজনীয় ঔষধের একটা বিরাট অনাবিস্কৃত ভেষজতালিকা বেরিয়ে পড়ল। কার্ডিওগ্রাফ্ এমনভাবে তৈরী যে, সেকেণ্ডের শতাংশ নিভুলভাবে রেখাচিত্রে অঙ্কিত ক'রতে পারে। বৃক্ষ, প্রাণী এবং মানুষশরীরের গঠনের স্থূক্ষাতিস্থূক্ষ স্পন্দন শব্দচিত্রে আঁকা হয়। সুবিখ্যাত উদ্ভিদতত্ত্ববিদ বসু মহাশয় ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন যে, তাঁ'র আবিষ্কৃত কার্ডিওগ্রাফ্ ব্যবহারে প্রাণীগণের পরিবর্তে বৃক্ষেরও জীবচ্ছেদ পাওয়া যাবে।

তিনি বললেন, “একই সময়ে একটা বৃক্ষ বা একটি প্রাণীকে ওষুধ দেওয়াতে, পাশাপাশি লেখা প্রতিলিপিতে তা'দের ফলের এক আশ্চর্য্য রকম সাদৃশ্য দেখতে পাওয়া যায়। মানুষের মধ্যে যা' কিছু আছে, তা'র সব কিছুই প্রতিচ্ছবি গাছের ভিতরও আছে। উদ্ভিদ জন্মানর উপর পরীক্ষা, মানুষের অনেক অসুবিধা দূর করতে সাহায্য ক'রবে।”

তা'র পর বহু বৎসর বাদে বসু মহাশয়ের বৃক্ষ সম্বন্ধীয় প্রাথমিক আবিষ্কার সকল অগ্রাগ্র বৈজ্ঞানিকদের দ্বারাও সমর্থিত আর স্বীকৃত হয়। ১৯৩৮ সালে কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে পরীক্ষার বিবরণ নিউইয়র্ক টাইমস্‌এ নিয়লিখিত ভাবে প্রকাশিত হয় :—

“গত কয়েক বৎসরের মধ্যে এটা স্থির নির্দ্ধারিত হইয়াছে যে, যখন মানুষ সকল মস্তিষ্ক ও শরীরের অগ্রাগ্র অংশের মধ্যে সংবাদ বহন করে, তখন ক্ষুদ্র বৈদ্যুতিক প্রবাহ উৎপন্ন হয়। এই সকল প্রবাহ স্থূক্ষ গ্যালভানোমিটারে নিরূপিত হইয়াছে—এবং আধুনিক পরিবর্দ্ধনকারী যন্ত্র সাহায্যে লক্ষ লক্ষ গুণ পরিবর্দ্ধিতও হইয়াছে। জীবন্ত প্রাণী অথবা মানব দেহের স্নায়ুতন্ত্রীর মধ্য দিয়া শক্তিপ্রবাহ অনুসন্ধান করিবার জন্ত আজ পর্য্যন্ত কোন সন্তোষজনক প্রণালী উদ্ভাবিত হয় নাই, কারণ এই সকল শক্তিপ্রবাহ অত্যন্ত দ্রুতবেগে গবিত হয়।

ডাক্তার কে, এস, কোল এবং ডাক্তার এইচ, জে কার্টিস রিপোর্ট প্রকাশ করিয়াছেন যে, মিঠাজলের ঝাঁঝ—যাহা সাধারণতঃ লাল মাছের কাঁচের পাত্রে ব্যবহৃত হয়, তাহাদের দীর্ঘ একটি মাত্র কোষ স্নায়ুতন্ত্রীর একটিমাত্র কোষের সহিত কার্যতঃ সমান। উপরন্তু তাঁহারা দেখিলেন যে, ঝাঁঝের তন্তুগুলি উত্তেজিত হইলে বৈদ্যুতিক তরঙ্গ উৎপাদন করে, যাহা একমাত্র গতি ভিন্ন, প্রাণী ও মানব স্নায়ুতন্ত্রের সহিত সর্বতোভাবে সমান। গাছের স্নায়ুর বৈদ্যুতিক প্রবাহ প্রাণীদিগের অপেক্ষা বহু গুণে শ্লথতর। এই আবিষ্কার, কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকগণ, স্নায়ুর বৈদ্যুতিক প্রবাহের ধীরগতিচিহ্ন লইবার উপায় বলিয়া ধরিয়া লইলেন।

জড় ও মনোজগতের সীমারেখার সুরক্ষিত গুপ্তরহস্যের উদ্ঘাটনে এই ঝাঁঝই হয়ত কালে পরশ পাথর হইয়া দাঁড়াইতে পারে।”

কবিসম্রাট রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ভারতের মুখোজ্জলকারী এই বিশ্ববিখ্যাত বৈজ্ঞানিকের অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন। কবি নিম্নলিখিত কয়েকটি ছত্র তাঁর নামে উৎসর্গ করেছেন,—

হে তপস্বী, ডাকো তুমি সামমন্ত্রে জলদগর্জনে,
 “উত্তীর্ণত! নিবোধত!” ডাকো শাস্ত্র অভিমানীজনে
 পাণ্ডিত্যের পণ্ডতর্ক হ’তে। স্রবহুৎ বিশ্বতলে
 ডাকো মূঢ় দান্তিকেরে। ডাক দাও তব শিষ্যদলে—
 একত্রে দাঁড়াক তারা তব হোম-হুতাপ্তি ঘিরিয়া।
 আরবার এ ভারত আপনাতে আশ্রুক ফিরিয়া
 নিষ্ঠায়, শ্রদ্ধায়, ধ্যানে,—বশুক সে অপ্রমত্তচিত্তে
 লোভহীন দ্বন্দ্বহীন শুদ্ধ শাস্ত্র গুরুর বেদীতে।

৯ম পরিচ্ছেদ

মাষ্টার মহাশয়

মাষ্টার ম'শায় বললেন, “খোকাবাবু, ব'স, আমি জগজ্জননীর সঙ্গে এখন কথা বলছি।”

বিরাট শ্রদ্ধার সঙ্গে আমি নীরবে ঘরে প্রবেশ করলুম। মাষ্টার মহাশয়ের দিব্য আকৃতি আমার চোখ যেন রীতিমত বলসে দিলে। শ্বেত চামরের মত শ্মশ্রু আর উজ্জল বৃহৎ চক্ষু দু'টিতে মূর্তিমতী পবিত্রতা যেন আশ্রয় নিয়েছে। তাঁ'র উদ্বোধনিত আনন আর যুক্তকর দেখেই মনে হ'ল যে, আমার প্রথম সন্দর্শনের জন্তে তাঁ'র গৃহমধ্যে প্রবেশ যেন তাঁ'র ধ্যানে কিঞ্চিৎ বাধার সৃষ্টি করেছে।

তাঁ'র সরল আন্তরিক আহ্বান আমার মনের ওপর অননুভূতপূর্ব্ব একটা প্রচণ্ড প্রভাব বিস্তার করলে। মায়ের মৃত্যুর করুণ বিচ্ছেদে মনে করেছিলুম যে, আমার সকল দুঃখের সেটা চরম পরিণতি। এখন কিন্তু জগন্মাতার অদর্শনে আমার মনে এক অবর্ণনীয় যন্ত্রণা বোধ হ'ল। ক্ষুধ-হৃদয়ে মেঝের ওপর ব'সে পড়লুম।

“খোকাবাবু, শান্ত হও।” ব'লে সাধু মহাশয় সহানুভূতিসূচক দুঃখ প্রকাশ ক'রলেন।

শোকসাগরে ভেসে তাঁ'র চরণ দু'টিই আমার উদ্ধারের একমাত্র উপায় ভেবে আঁকড়ে ধ'রে বললুম,—“মহাত্মন, আপনার সাহায্য বিনা আমার আর গতি নাই। মা'কে জিজ্ঞাসা করুন যে, তাঁ'র করুণা পা'ব কি না?”

সহজে এ আশ্বাস পেলুম না। মাষ্টার ম'শায় চুপ ক'রে ব'সেই রইলেন।

নিঃসংশয়ে বিশ্বাস ক'রলুম যে মাষ্টার ম'শায় মা'য়ের সঙ্গে একান্তে কথা ক'ইছেন। ভাবতেও মনে নিজেকে অত্যন্ত হীন ব'লেই বোধ ক'রতে

লাগলুম যে আমার দৃষ্টি তাঁ'র প্রতি অন্ধ, যিনি এই ক্ষণেতেই সাধুটির অমল দৃষ্টির সম্মুখে প্রতিভাত। লজ্জা সরম সব খুইয়ে তাঁ'র পা দু'টি ধ'রে, তাঁ'র মৃদু ভৎসনায় কিছুমাত্র কর্ণপাত না ক'রে, বার বার তাঁ'র করুণা ভিক্ষা ক'রতে লাগলুম।

মাষ্টার মহাশয় মৃদু স্নিগ্ধহাসি হেসে বললেন, “আচ্ছা গো, মা'য়ের কাছে তোমার কথা জানাচ্ছি।” সেই কথা কয়টিতে কি যে ছিল তা' জানিনা, কিন্তু তা'তে আমার মনের প্রবল বাড় শাস্ত হ'ল।

বললুম, “ম'শায়, আপনার প্রতিজ্ঞা স্মরণ থাকে যেন, মা'য়ের আদেশ পা'বার জন্তে ফের শীগগীরই আমি আবার ফিরে আসছি।” দুঃখের উচ্ছ্বাসে অবরুদ্ধ আমার কর্ণস্বর আবার আশার আনন্দধ্বনিতে মুখরিত হ'য়ে উঠল।

লম্বা সিঁড়ি দিয়ে নিচে নামবার সময় বহু কথা মনে প'ড়ল। ৫০নং আমহাষ্ট' ষ্ট্রীটের এই বাড়ী, যা'তে এখন মাষ্টার ম'শায় থাকেন, এক কালে আমাদেরই বসত বাড়ী ছিল। মা'য়ের মৃত্যুর করুণ স্মৃতিবিজড়িত। এইখানে আমার মানবহৃদয় লোকান্তরিত। মাতার জগ্নই ভগ্ন হ'য়েছিল, আর এইস্থানেই আবার জগন্মাতার বিরহে আমার আত্মা যেন ক্রুশবিদ্ধ! পুণঃ স্মৃতিবিজড়িত তাঁ'র সেই বাড়ীটি আমার শোকের দারুণ বেদনা ও তা'র নির্বাপনের নীরব সাক্ষী।

তাড়াতাড়ি গডপার রোডের বাড়ীতে ফিরলুম। সেদিন রাত দশটা অবধি আমার সেই ছোট্ট চিলেকোঠায় আমি ধ্যানে ডুবে ব'সে আছি। নিদ্রা নিশীথের অন্ধকার সহসা এক অদ্ভুত দৃশ্যে উদ্ভাসিত হ'য়ে উঠল।

দিব্য জ্যোতিঃর ছটাবিভূষিতা জগজ্জননী মা আমার সামনে দাঁড়িয়ে মধুর হাসিতে ভরা তাঁ'র মুখখানি স্বর্গীয় স্রবমায় মাথা! স্পষ্ট তাঁ'র বাঁ কাণে এসে প্রবেশ ক'রল, বললেন,—‘তোমায় ত' আমি চিরকালই স্নেহ করি আর সর্বদাই ক'রব।’

স্বরগের সুর তখনও হাওয়ায় ভে'সে বেড়াচ্ছিল,—মা অন্তর্হিতা হ'লেন তাঁ'র পরদিন সূর্য্য তখন সবেমাত্র উ'কি দিতে সুরু ক'রেছে, এমন সময় আমি মাষ্টার ম'শায়ের বাড়ীতে গিয়ে আবার হাজির হ'লুম। বহু দুঃখের নানা স্মৃতি জড়ান সেই বাড়ীর সিঁড়ি দিয়ে আমি চারতলার ঘরে গিয়ে ঢুকলুম। ঘরে

দরজা বন্ধ। বন্ধ দরজার হাতলে একটুকরা ন্যাকড়া জড়ান। বুঝলুম, মাষ্টার ম'শায় এখন কারুর ভিতরে আসা পছন্দ করেন না। কি ক'রব ভেবে না পে'য়ে সিঁড়ির মাথায় দাঁড়াতেই, মাষ্টার ম'শায় দুয়ার খুলে বেরিয়ে এলেন। আমি তাঁ'র পুণ্য পদতলে নতজান্ন হ'য়ে ব'সলুম। মুখের ওপর দিব্য আনন্দ চেপে রেখে একটা ছদ্মগান্ধীৰ্য্যের আবরণ টেনে দিয়ে বললুম,—“মাষ্টার ম'শায়,—খবরটা জানবার জন্তে খুব সকাল সকালই এসে পড়লুম! বা'হোক, না কি আমার জন্তে আপনাকে কিছু বললেন নাকি?”

“তুমি বড় ছুঁছুঁ, খোকাবাবু!” শুধু এইটুকুমাত্র ব'লে আর কিছুই তিনি বলেন না।

আমার রুদ্রিম গান্ধীৰ্য্যে তাঁ'র মনে কোনই রেখাপাত হ'ল না।

মহা মুন্সিলে পড়লুম। চুপ ক'রে ব'সে রয়েছেন দেখে ফের জিজ্ঞাসা ক'রলুম,—“আপনার এত হেঁয়ালিই বা কিসের, আর আমাকে এড়াতে চাচ্ছেনই বা কেন? সাধুসন্ন্যাসীরা কি সোজাসুজি কোন কিছু বলেন না নাকি?” বোধ হয় একটু অধৈর্য্য হ'য়ে পড়েছিলুম।

মাষ্টার ম'শায় যেন আমার মনের গোপন দ্বার চাবিকাঠি দিয়ে খুলে ফেলে বললেন,—“তুমি কি আমার পরীক্ষা ক'রতে চাও, বল?” তাঁ'র শাস্ত নয়নের দৃষ্টি অর্থপূর্ণ! “সেই করুণাময়ী জগজ্জননীর কাছ থেকে কাল রাত দশটা নাগাদ যে আশ্বাস তুমি স্বয়ং পেয়েছ, তা'র ওপর কি আজ এই সকালে আমার আর একটাও কথা বলা চলে, বল?”

পুনরায় তাঁ'র চরণে আমি সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত ক'রলুম। এবার আমার চোখ আর দুঃখে নয়, যেন অসহ্য স্নেহেই অশ্রুপূর্ণ হ'য়ে উঠ'ল।

“তুমি কি মনে কর, তোমার ভক্তি মা'য়ের অসীম করুণা স্পর্শ ক'রতে পারে নি? ঈশ্বরের মাতৃভাব,—বা' তুমি মানবী আর দেবীর আকারে পূজো ক'রে এসেছ, তা' তোমার আকুল ক্রন্দনে সাড়া না দিয়েই পারে না।”

কে এই সরল সাধু, যা'র পরমাত্মার কাছে সামান্য অহুরোধটুকুও মধুর স্বীকৃতি লাভ ক'রেছে? পৃথিবীতে তাঁ'র কর্মজীবন অতি সামান্যই—আমার জানা অতি দীনতম ব্যক্তিরই মত। এই আগহাষ্ট'ষ্ট্রীর বাড়ীতে মাষ্টার ম'শায়* ছোট্ট একটি উচ্চ বিদ্যালয় চালান। ছেলেদের শাসনের জন্তে

* আসল নাম শ্রীমহেন্দ্রনাথ গুপ্ত। রামকৃষ্ণকথায়তে শ্রী ম—নামে পরিচিত।

কোন রকম বকুনিই তাঁ'র মুখ দিয়ে বেরত না। কড়া শাসনের কোন বাধা ধরা নিয়ম কানুন তাঁ'র কাছে ছিল না। এই সব অত্যন্ত সাধারণ ক্লাস ঘরে, সাংসারিক বা পার্থিব নয়, আরও উচ্চতর হিসাবনিকাশের বিদ্যা শিক্ষা দেওয়া হ'ত—আর হ'ত প্রেমের রসায়ন শাস্ত্র, যা কোন ইকুলের বইয়েই নেই। তিনি দুর্কোষ্য উপদেশের বদলে ধর্মভাব বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গেই জ্ঞান দান ক'রতেন। খাঁটি ভক্তির আগুনে পুড়ে তিনি এমন হয়েছিলেন যে, ছোট শিশুর মতই কোন বাহ্যিক সম্মান প্রদর্শন আকাজক্ষা ক'রতেন না।

তিনি ব'লেছিলেন, “আমি তোমার গুরু নই, তিনি কিছুকাল পরে আসবেন। তাঁ'রই পথ প্রদর্শনে আর তোমার প্রেম ও ভক্তির জোরে তোমার যে সব দিব্যানুভূতি আসবে, তা'তেই তোমার অনন্ত জ্ঞান লাভ হবে।”

রোজই বিকালের শেষ দিকে একবার ক'রে আমহাষ্ট ঈশ্টের বাড়ীতে যেতুম। মাষ্টার ম'শায়ের সাধুসঙ্গ আমি প্রত্যহই কামনা ক'রতুম। সে আনন্দের ধারা এতই প্রবল রূপে উৎসারিত হ'ত যে, আমার সকল সত্তাকে পরিপ্লাবিত ক'রে একেবারে যেন ভাসিয়ে নিয়ে যে'ত। এত প্রগাঢ় ভক্তির সঙ্গে আমি কখনও প্রণাম করি নি। মাষ্টার ম'শায় যে ভূমি পবিত্র ক'রেছেন, সেখানে দাঁড়াতে পাওয়াটাই একটা পরম সৌভাগ্য ব'লেই মনে করি।

একদিন সন্ধ্যাবেলা একছড়া চাঁপা ফুলের মালা হাতে ক'রে এনে বল্লুম, “মাষ্টার ম'শায়, আজ এই মালাটি পরুন, আপনার জন্মেই এটি আমি তৈরী ক'রে এনেছি।” কিন্তু তিনি এই সম্মান গ্রহণ ক'রতে বারম্বার অস্বীকার ক'রে সসঙ্কোচে ম'রে গেলেন। তা'রপর আমার দিকে তাকিয়ে মনে আঘাত পে'লুম ভেবে অবশেষে রাজী হ'লেন। বল্লেন, “আচ্ছা বেশ, আমরা দু'জনেই যখন মা'য়ের ভক্ত সন্তান, তখন মা'য়ের আবাস এই দেহ-মন্দিরে তুমি তাঁ'কেই অর্ঘ্য দিতে পা'র, আমাকে কিন্তু নয়।” তাঁ'র নিরহঙ্কার ও উদার প্রকৃতিতে আত্মপ্লাবিত কোন স্থান ছিল না। তা'রপর বল্লেন “চল, কাল আমরা আমার গুরুস্থান পুণ্যতীর্থ—দক্ষিণেশ্বরের মন্দির দেখে আসি।” মাষ্টার ম'শায় ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের শিষ্য ছিলেন।

তা'র পরদিন সকালে নৌকা ক'রে গঙ্গায় আমাদের চার মাইল ভ্রমণ শুরু হ'ল। দক্ষিণেশ্বরের ঘাটে পৌঁছে চাঁদনীর ভিতর দিয়ে আমরা নবচুড়

কালীমন্দিরে গিয়ে প্রবেশ ক'বলুম। মন্দিরের ভিতর জগজ্জননী ভবতারিণী দেবী ও মহাদেব পাণ্ডিত্যকর চমৎকার কারুকার্যশোভিত সহস্রদল কমলের উপর বিরাজ ক'রছেন দেখলুম। মাষ্টার মহাশয় আনন্দে উৎফুল্ল হ'য়ে উঠলেন। তাঁরপর তিনি সেখানে ব'সে মা'য়ের ধ্যানে ডুবে গেলেন। ধ্যানের পর মা'য়ের নামগান যখন শুরু ক'রলেন, আমার আনন্দোচ্ছ্বাসিত হৃদয় তখন যেন সহস্র ধারায় গ'লে পড়তে লাগল।

তাঁরপর আমরা সেই পুণ্যভূমি মন্দির উদ্যানের মধ্যে বেড়াতে বেড়াতে একটা ঝোপের ধারে এসে প'ড়লুম। মাষ্টার ম'শায়ের বিতরিত অমৃতরস স্বর্গেরই অমিয়ধারার মত। তাঁর সেই প্রাণগলান মধুমাখা গান সমান ভাবেই চলতে লাগল। আমি সেই ঝোপের পাশে গোলাপী রঙের চামরের মত একটা ফুল গাছের পাশে ঘাসের ওপর স্থির হ'য়ে সোজা বসেই রইলুম। তখন মনে হ'ল, যেন দেহ থেকে বিযুক্ত হ'য়ে কোন অতীন্দ্রিয় ভাবরাজ্যে গিয়ে প'ড়েছি।

তারপর সেই পুণ্যাত্মা সাধু মাষ্টার মহাশয়ের সঙ্গে বহুবার দক্ষিণেশ্বর বেড়িয়ে এসেছি। তাঁর কাছ থেকেই ঈশ্বরের মাতৃভাবে আরাধনার মাধ্যম উপলব্ধি করি। পিতৃভাবে ভজনা করার মধ্যে তিনি বিশেষ কোন আকর্ষণ অনুভব ক'রতেন না। কঠোর আর খুব খুঁটিনাটিভাবে নিখুঁত হিসাব ক'রে চলা তাঁর শাস্ত প্রকৃতির বিরুদ্ধ ছিল।

একদিন তিনি উপাসনায় বসেছেন দেখে, মনে হ'ল যেন, ইনি স্বর্গের দেব-দূতদের মর্ত্যের প্রতিচ্ছবি। কোন বিচার বিতর্ক বা অভিযোগ অনুযোগ মনে বহন না ক'রে, তিনি এ জগৎকে তাঁর চিরদিনের ক্ষমাসুন্দর চক্ষেই দেখতেন। তাঁর দেহ, মন, কথা, কায—সবই তাঁর অন্তরের সরলতার সঙ্গে একান্ত সহজ ভাবেই সুন্দর আর সুসমঞ্জস। কোন জ্ঞানোপদেশ বিতরণের সময় তিনি প্রায়ই এই কথা ব'লে শেষ ক'রতেন, “আমার গুরুদেব এই কথা ব'লেছেন শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সঙ্গে তাঁর একাত্মবোধ এতদূর প্রবল ছিল যে, মাষ্টার মহাশয় কোন চিন্তা তাঁর নিজের ব'লে ভাবতেই পারতেন না।”

তাঁর স্কুলবাড়ীর একটা অংশে একদিন সন্ধ্যাবেলা আমরা হাত ধরাধরি ক'রে বেড়াচ্ছি। একটি পরিচিত লোক সেখানে এসে উপস্থিত হ'লেন।

লোকটি অত্যন্ত আশ্চর্য্যবৃত্ত। তাঁর আবির্ভাবে আমাদের আনন্দটুকু সব উবে যা'বার যোগাড় হ'ল। ভদ্রলোকটি একবার তর্ক স্তর ক'রলে সহজে আর থামতে চান না।

নিজের বক্তৃতায় নিজেই বিভোর—সেই মহাপ্রভুটির কর্ণগোচর যা'তে না হয়, এমনভাবে মাষ্টার মহাশয় চুপি চুপি আমার বললেন, “দেখছি যে এই লোকটিকে দেখে তুমি খুসী নও। একে এখন সরাতে পারলে বাঁচা যায়, কি বল? বাই হোক মা'য়ের কাছে সব জানাচ্ছি। তিনি আমাদের কঁাসাদ বুঝতে পেরেছেন। দাঁড়াও না, মা কেমন ক'রে ওকে এখান থেকে সরিয়ে দেন এইবার দেখ। মা বললেন, যেই ঐ লোকটি ওধারের ঐ লালবাড়ীটার কাছে পৌঁছবে, অমনি ওর একটা ভয়ানক জরুরী কাষের কথা মনে প'ড়ে যাবে। তাঁরপর স'রে পড়তে আর মুহূর্তমাত্রও দেরী হবে না, দেখো।”

আমার চোখ দু'টি সেই মুক্তিতির্থে আবদ্ধ হ'য়ে রইল। লালবাড়ীটার দরজার কাছে পৌঁছতেই লোকটি বিনা বাক্যব্যয়েই একেবারে প্রস্থান করলে, না শেষ ক'রলে তাঁর কথা, না নিলে বিদায়। ক্ষুদ্র ও রুদ্ধ বায়ু যেন শান্তির আশ্বাসে ভরে উঠল। আর একদিন হাওড়া ষ্টেশনের কাছ দিয়ে একলাই চলেছি। ক্ষণেকের তরে সেখানকার একটা মন্দিরের কাছে একটু দাঁড়িয়ে পড়লুম। চুপচাপ দাঁড়িয়ে দেখছি, একটা ছোট্ট দল, ঢোলক আর করতালের সঙ্গে প্রচণ্ড সুরে একটা গান স্তর ক'রে দিয়েছে।

ভাবলুম, “হায় রে, কি রকম কলের মত এরা ভগবানের নাম আওড়ে চলেছে! ভক্তির নাম গন্ধও নেই!” বিশ্বয়বিমুক্ত নয়নে চেয়ে দেখলুম, মাষ্টার মহাশয় দ্রুতপদে এগিয়ে আসছেন! জিজ্ঞাসা ক'রলুম,—“মাষ্টার ম'শায়, এখানে এলেন কি ক'রে?”

মাষ্টার মহাশয় আমার প্রশ্ন এড়িয়ে গিয়ে আমার যেন চিন্তার প্রত্যুত্তরেই বললেন, “খোকাবাবু, ঠাকুরের নাম কি জানী কি মুখ সকলেরই মুখ থেকে কি শুনতে মধুর লাগে না?” ব'লে সম্মেহে তিনি এক হাত দিয়ে আমার জড়িয়ে ধরলেন। আমার মুখে আর কথাটি ফুটল না—আমি যেন তাঁর স্পর্শে হাওয়ায় ভেসে তাঁর সঙ্গে মা'য়ের দরবারে গিয়ে হাজির হ'লুম।

একদিন বিকালে হঠাৎ তিনি জিজ্ঞাসা ক'রে বসলেন, “একটু বায়োস্কোপ

দেখবে না কি?" প্রশ্নটা বেশ রহস্যময় ব'লেই বোধ হ'ল। কথাটা তখন সবে মাত্র বেরিয়েছে—চলচ্চিত্র বোঝাতে ব্যবহৃত হ'ত। আমিও তখুনি রাজী হ'য়ে গেলুম, যে কোন উপলক্ষ্যে তাঁ'র সঙ্গে থাকতে পাব ব'লে। যাই হোক দু'জনে ত' তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনে গোল-দীঘিতে এসে পৌঁছলুম। মাষ্টার মহাশয় সেখানে একটা বেঞ্চে বসতে ইঙ্গিত ক'রলেন।

মাষ্টার ম'শায় বললেন, "মিনিট কতক এস, এখানেই বসি। গুরুদেব সর্বদাই ব'লতেম--কোন জলাশয় দেখলেই তা'র পাশে ব'সে ধ্যান ক'রবে। এর নিস্তরঙ্গ রূপ, ঈশ্বরের বিরাট শাস্তির ভাব স্মরণ করিয়ে দেয়। সব জিনিষই যেমন জলে প্রতিবিম্বিত হ'তে পারে, তেমনি নিখিল বিশ্বজগৎও বিশ্বেচ্ছিত সাগরে প্রতিকলিত হ'তে পারে। গুরুদেব প্রায়ই এই কথা বল'তেন।"

অল্প কিছুক্ষণ পরেই আমরা ইউনিভার্সিটির হলঘরে প্রবেশ ক'রলুম। সেখানে তখন একটা বক্তৃতা চলছিল। সেটা জঘন্ট, নীরস আর অত্যন্ত একঘেয়ে ব'লেই বোধ হ'ল, যদিও একই রকমের একঘেয়ে লণ্ঠনের ছবি দিয়ে মাঝে মাঝে বক্তৃতার ভিতর বৈচিত্র্য আনবার চেষ্টা করা হচ্ছিল।

তাবলুম, "তা' হ'লে মাষ্টার ম'শায় কি আমায় এই ধরনের বায়স্কোপ দেখাতে চেয়েছিলেন না কি?" যদিও আমি অধীর চিন্তায় ব্যাকুল, তবুও মুখে কোন রকম ক্লাস্তির ভাব এনে মাষ্টার ম'শায়ের সরল মনে কোন আঘাত দিতে আর আমার মন স'বুল না। কিন্তু তিনি সাগ্রহে আমার মুখের দিকে ঝুঁকে প'ড়ে বললেন, "তবে ত' দেখ'ছি, খোকাবাবু, তোমার এই ধরনের বায়স্কোপ আর মনে ধ'রছে না। মা'কে জানালুম, বুঝলে, তিনিও আমাদের দু'জনের জন্তে দুঃখিত। যাই হোক, তিনি আমায় জানিয়ে দিলেন যে, এই হলের ইলেকট্রিক আলোগুলো এক্ষুণি নিভে যাবে আর আমাদের এ হল থেকে বেরিয়ে প'ড়বার সুযোগ না পাওয়া পর্য্যন্ত তা' নিভেই থাকবে আর জন্বে না।"

আশ্চর্য্য! যেই মাত্র তাঁ'র ফিস্ফিসানি শেষ হ'ল, অমনি হলটি একেবারে অন্ধকারে ডুবে গেল। অধ্যাপক মহাশয়ের দারুণ চিৎকার বিন্ময়ে হঠাৎ থেমে গেল। তা'রপর তিনি ব'লে উঠলেন, "হলের ইলেকট্রিক লাইনগুলো

সব একদম খারাপ।” এর মধ্যেই মাষ্টার ম’শায় আর আমি নিরাপদে চৌকাঠ পেরিয়েছি। দালান থেকে পিছন দিকে ফিরে চেয়ে দেখলুম যে, আমাদের “বধ্যভূমি” আবার আলোকিত হয়ে উঠেছে।

“খোকাবাবু, তুমি ঐ রকমের বায়স্কোপ দেখে খুসী হও নি দেখছি। যা’ক, তুমি এবার আর এক ধরনের বায়স্কোপ দেখে নিশ্চয় খুসী হবে বলে মনে হয়।”

ইউনিভার্সিটি বিল্ডিংএর ফুটপাথের সামনে আমরা দাঁড়িয়েছিলুম। তিনি আমার বুকের ওপর হাত দিয়ে মৃদুভাবে আঘাত করলেন।

সঙ্গে সঙ্গে একটা নীরব আর অদ্ভুত পরিবর্তন ঘটে গেল। শব্দমুখর সজীব চলন্ত দৃশ্যপট যেন এক মুহূর্তে নিখর হ’য়ে গেল। শব্দযন্ত্র হঠাৎ বিকল হ’য়ে গেলে আধুনিক “টকি”র কথাবলা ছবিগুলো যেমন এক মুহূর্তে নীরব হ’য়ে যায়, তা’দের হাত পা মুখ ঠোট নাড়া শুধু কেবল ছবিতে দেখতেই পাওয়া যায় আর তা’দের ঠোট নড়লেও যেমন কোন শব্দ শুনতে পাওয়া যায় না, তেমনি ভগবানের হাতে এক অলৌকিক ব্যাপার ঘ’টে জগতের সব শব্দ যেন একেবারে থেমে গেল। পথচারীর দল, চলন্ত ট্রামগাড়ী, মোটর, গরুরগাড়ী, লোহার চাকাওয়ালা কর্ণপটবিদারী “ছ্যাকড়াগাড়ী” সবই যেন নিঃশব্দ গতিতে রাস্তা দিয়ে চলতে লাগল! যেন একটি সর্বদর্শী চক্ষু পেয়ে সামনে যেমনি অত্যন্ত সহজ ভাবে,—হু’ধারে আর পাশেও তেমনি সকল দৃশ্যই বেশ পরিষ্কার ভাবেই দেখতে পেলুম। কলকাতার সেই ক্ষুদ্র অংশে কৰ্ম্মচাঞ্চল্যের সম্পূর্ণ দৃশ্য আমার চক্ষের সন্মুখে পরিপূর্ণ নিঃশব্দতার মধ্যে ঘ’টে যেতে লাগল। মিহি ছাইয়ের তলায় ঢাকা আগুনের মৃদু আলোকছটার মত একটা স্নিগ্ধ আলোর উজ্জ্বলতা সেই সব দৃশ্যাবলীর ওপর যেন ছড়িয়ে পড়েছিল।

আমার নিজের শরীরও সেই সব ছায়ামূর্তিদের চেয়ে আর বেশী কিছু বোধ হ’চ্ছিল না—যদিও সেটা একেবারে নিশ্চল আর গতিহীন আর বাকী-গুলো সব ইতস্ততঃ নিঃশব্দ গতিতে চলা ফেলা ক’রে বেড়াচ্ছে। কতক-গুলো ছেলে,—আমারই সব বন্ধুর দল, কাছে এল আর চলে গেল। আমার ওপর তা’দের নজর যদিও প’ড়ল, কিন্তু তবু তা’রা মোটেই আমার চিন্তে পারলে না।

এই অপূর্ব মৃক দৃশ্য মনে একটা অনির্বচনীয় আনন্দ এনে দিলে। যেন কোন অনাস্বাদিতপূর্ব আনন্দের ধারা গভীরভাবে পান করেছি। হঠাৎ মাষ্টার মহাশয় আমার বুকে আবার সেই রকম গৃহুভাবে আঘাত করলেন। আবার আমার অনিচ্ছুক কর্ণদ্বয়ের মধ্যে রাজ্যের বত সব গোলমাল, হট্টগোল, হুড়মুড় ক'রে এসে ঢুকে পড়ল। হঠাৎ যেন আমার মধুর আর হৃদয় স্বপ্ন-জাল একটা রুট আঘাতে ছিঁড়ে যেতে, জেগে উঠে স্তম্ভিত হ'য়ে গেলুম। সেই অতীন্দ্রিয় মদিরার মোহঘোর কেটে গিয়ে একেবারে পরিষ্কার সাফ হ'য়ে গেল।

“খোকাবাবু, এবার দেখছি যে, দ্বিতীয় বায়স্কোপটি তোমার বেশ ভাল লেগেছে, না?” মাষ্টার মহাশয় হাসছিলেন। কৃতজ্ঞতায় অভিভূত হ'য়ে পায়ের ওপর পড়তে যাচ্ছি দেখে, তাড়াতাড়ি আমায় ধ'রে ফেলে বললেন, “আরে, আরে, কর কি, কর কি—এখন আর তুমি আমায় ওটি ক'রতে পারবে না। তুমি ত' জান যে, ভগবান তোমার মন্দিরেও আছেন। আমি জগজ্জননীকে তোমার হাত দিয়ে ত' আমার পা ছুঁতে দিতে পারিনে।”

সেই জনতাবহুল ফুটপাথ হ'তে সেই বিনয়নয়, সরল মাষ্টার ম'শায় আর আমাকে চ'লে যাবার সময় কেউ যদি লক্ষ্য ক'রত, তা' হলে নিশ্চয়ই তা'র সন্দেহ হ'ত যে আমরা নেশা ক'রে চলেছি। মনে হ'ল, তখন সান্দ্রগগনে সন্ধ্যার স্নিগ্ধ ঘন ছায়া যা' নেমে আসছিল, তা'ও যেন আমাদেরই মত ভগবৎ-প্রেমমদিরা পানে বিহ্বল। রাজির মুচ্ছা থেকে অন্ধকার মুক্তি পাবার পর নবীন প্রভাতে দেখলুম যে, আমার সে আনন্দবিহ্বল ভাব চলে গেছে। কিন্তু স্মৃতির পবিত্র মন্দিরে চিরপ্রতিষ্ঠিত মায়ের ভক্তসন্তান—মাষ্টার মহাশয়, আজও অক্ষুণ্ণ, আজও অম্লান!

তাঁ'র এই প্রসন্ন মধুর উদারতার প্রতি ক্ষীণ ভাবায় স্মবিচারের চেষ্টা ক'রতে গিয়ে আমি এই ভেবে আশ্চর্য্য হ'চ্ছি যে, মাষ্টার মহাশয় আর অত্যাগত গভীর তত্ত্বদর্শী সাধুগণ তাঁ'রা কি জানতে পে'রেছিলেন যে, এর বহু বৎসর বাদে পশ্চিম প্রান্তে বসে আমি তাঁ'দের সব ভক্তজীবনের কাহিনী লিখব। তাঁ'দের ভবিষ্যদৃষ্টির বিষয় ভেবে আজ আর আমি আশ্চর্য্য হই না, আর আশা করি আমার পাঠকবর্গও হ'বেন না, যাঁ'রা আমার এ কাহিনীর সঙ্গে সঙ্গে এতদূর এসে পড়েছেন।

১০ম পরিচ্ছেদ

গুরুর সাক্ষাৎলাভ

(শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজি মহারাজ)

“ঈশ্বরে বিশ্বাস যে কোন রকম অসাধ্য সাধন ঘটাতে পারে বটে কিন্তু একটি মাত্র বিষয় ছাড়া—তা’ হ’চ্ছে না পড়ে পরীক্ষায় পাশ করা।” কথাগুলো পড়ে নিতান্ত বিরক্ত হ’য়েই অলস মুহূর্তে হাতে নেওয়া খোলা বইটা বন্ধ ক’রলুম।

তাবলুম, “এই লিখিয়ার বিপরীত উক্তিতে তাঁ’র বিশ্বাসের একান্ত অভাবই দেখা যায়। বেচারার রাত জেগে পড়া তৈরীর ওপরই বিশেষ ভরসা আছে দেখছি।”

পিতার কাছে প্রতিশ্রুত ছিলাম যে আমি ইংরেজী স্কুলের পড়া শেষ করব। পরিশ্রমী ছিলাম যে তা’ ব’লুতে পারিনে। মাসের পর মাস ক্লাস ঘরের চেয়ে স্নানের ঘাটে কোন নির্জনস্থানেই আমার বেশী দেখা যেত। নিকটস্থ শ্মশানভূমি বিশেষতঃ রাত্রিকালে যা’ বিভীষিকা উৎপাদন করে, যোগীদের কাছে তাইই পরম আকর্ষণীয়। মৃত্যুহীন সভার খোঁজে যা’রা ফেরে, গোটাকতক মড়ার মাথার খুলি বা নরকঙ্কাল দেখে নিশ্চয়ই তা’রা ভীত হয় না। মাহুনের অসম্পূর্ণতা নরকঙ্কালের অন্ধকার আবাসেই প্রকট হয়ে ওঠে। এই ভাবেই পড়ুয়াদের রাতজাগা থেকে আমার রাতজাগা ভিন্ন রকমের ছিল।

হিন্দু হাইস্কুলের শেষ পরীক্ষার সপ্তাহ দ্রুত এগিয়ে আসছিল। পরীক্ষার এই সময়টা শ্মশানভূমির ভয়ের মত একটা বহুপরিচিত ভয়ের সৃষ্টি করে। তা’ সত্ত্বেও আমার মনে একটা শান্তি ছিল। সাহস নিয়ে এই সব ভূত প্রেতের রাজ্যে বিচরণ ক’রে আমি এমন সব জ্ঞান আহরণে রত ছিলাম যা’ লেকচার হলে পাওয়া যায় না। কিন্তু এতে ত’ স্বামী প্রণবানন্দের কৌশল অবলম্বন ক’রতে পারলুম না, যা’তে হ’ জায়গায় একই সময় আবিভূত হ’তে

পারা যায়। যাই হোক পরীক্ষা ত' এগিয়ে আসতে লাগল। মহাসমস্তায় প'ড়ে গেলুম—আর তা' এড়াতে ভগবানের অলৌকিক ব্যাপার ছাড়া আর কোন উপায়ই রইল না। এইই আমার যুক্তি ছিল, হয় ত' এটা অনেকেরই কাছে অযৌক্তিক ব'লে মনে হ'তে পারে, কিন্তু বিপদে পড়লে ভগবান যে ভক্তকে হাজারো রকমের উপায় দিয়ে সাহায্য করেন, তা'র নানা উদাহরণ সকলের অবোধ্য কারণ হ'তেই ভক্তের এই রকম যুক্তিহীনতা দাঁড়ায়। কেন বা কি ক'রে হবে, বা সাধারণতঃ এ যে ঘটতেই পারে না, এ সব যুক্তিভরক তা'র মনে কোথাও ঠাঁই পায় না।

একদিন বিকালে গড়পার রোডের ওপর একটি পরিচিত বন্ধুর সঙ্গে দেখা হ'ল। বন্ধুটি বললে, “ওহে মুকুন্দ, আজকাল যে তোমার দেখা পাওয়াই ভার।”

তা'র প্রীতিকোমল দৃষ্টির সম্মুখে আমার হৃদয়ভার উন্মুক্ত ক'রে বললুম, “হ্যাঁ হে নর্টু, স্কুলে না গিয়ে আমার বড্ডই মুশ্কিলে প'ড়তে হ'য়েছে।”

নর্টু ছিল খুব ভাল ছেলে, শুনে প্রাণ খুলে হাসলে। অবশ্য আমার বিপদে হাসির খোরাক ছিল বই কি! বললে, “তোমার ফাইন্সাল পরীক্ষার জন্তে ত' কিছুমাত্র তৈরী হও নি। পাশ ক'রবে কি ক'রে হে? তা' হ'লে তোমায় কিছু সাহায্য করা দরকার ত'! তা' তুমি আমাদের বাড়ীতে এসো, বুঝলে?”

কথাগুলো খুবই সহজ, কিন্তু তা' আমার কাণে দৈব আশ্বাসবাণীর মতই এসে প্রবেশ ক'রল। কাল বিলম্ব না ক'রে বন্ধুটির বাড়ীতে গিয়ে হাজির হ'লুম। মাষ্টার ম'শায়দের কাছ থেকে যে সব প্রশ্ন পড়তে পারে, তা'র উত্তর গুলো সব মোটামুটি আমায় বুঝিয়ে দিয়ে বন্ধুবর বললে,—“এইসব প্রশ্ন-গুলোই হ'চ্ছে সব টোপ—যা'তে ক'রে সরল বিশ্বাসী ছেলেগুলো সব পরীক্ষার ফাঁদে ধরা প'ড়তে পারে। আমার বাংলানো উত্তরগুলো সব মনে রেখে বুঝলে, তা' হ'লে বিনা হাঙ্গামে এ ফাঁসাদ এড়িয়ে যেতে পারবে।”

বাড়ী ফিরলুম যখন, রাত তখন অনেক দূর এগিয়েছে। অসময়ে পড়া তৈরী ক'রে অন্তরের সঙ্গে প্রার্থনা ক'রতে লাগলুম, যা'তে ক'রে সেই

সাংঘাতিক দিনগুলো পর্যন্ত পড়াগুলো মনে থাকে।

নট্টু আমায় অনেক পাঠ্যবিষয়েই সাহায্য ক'রেছিল, কিন্তু সময়ের অভাবে সংস্কৃতের বিষয়টা একেবারেই ভুলে গিয়েছিল। কি করি, আর উপায় নেই, কাতর প্রাণে আমি ভগবানের কাছে এই মারাত্মক ভুলের কথাটা নিবেদন ক'রে রাখলুম।

যাক, তা'র পরদিন ত' সকাল বেলায় রাস্তায় একটু বেড়াতে বেরিয়ে প'ড়লুম—পায়চারি ক'রতে ক'রতে আমার নবলব্ধ বিদ্যা সব পরিপাক ক'রবার জন্তে। চন্টে চন্টে হঠাৎ নজর প'ড়ল, রাস্তার একটা কোণে কতকগুলো আগাছার ওপর খানকতক ছাপা কাগজ প'ড়ে র'য়েছে। কৌতূহলের বশবর্তী হ'য়ে সেগুলো তুলে নিতেই দেখা গেল, তা'তে সব সংস্কৃত শ্লোক ছাপা রয়েছে। তা'র অর্থ সব বুঝতে না পে'রে, এক সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতের কাছে গিয়ে হাজির হ'লুম। গভীর উদাত্তস্বরে সেই প্রাচীন শ্লোকগুলির স্তম্ভুর আবৃত্তি ও ব্যাখ্যা শেষ ক'রবার পর তিনি সন্দিগ্ধস্বরে বললেন,—“কিন্তু এই বিশেষ শ্লোকগুলো ত' তোমার সংস্কৃত পরীক্ষায় কোন কাষে আসবে বলে ত' মনে হয় না!”

কিন্তু ভগবান বোধ হয় তখন মনে মনে হাসছিলেন। ঐ বিশেষ শ্লোকগুলোর অর্থ ও ব্যাখ্যা বেশ ভাল ভাবে হৃদয়ঙ্গম করা থাকাতো, তা'র পরের দিনে আমার সংস্কৃত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হ'তে বিশেষ সাহায্যই হ'ল। নট্টুর সাক্ষাৎ সাহায্যে অত্যাশ্চর্য বিষয়ে আমি পাস মার্ক পেয়ে গেলুম। ইংরেজী স্কুলের পড়া শেষ ক'রে কথা রেখেছি দেখে বাবা অত্যন্ত খুসী হ'লেন। আমার অন্তরের গভীর কৃতজ্ঞতা ঈশ্বরের চরণে নিবেদন করলুম, একমাত্র যাঁর কৃপাবলে আমি নট্টুর সাক্ষাৎ পেয়েছিলুম, আর জঞ্জালের ওপর ছড়ান সেই সংস্কৃত শ্লোকছাপা কাগজের পাতাগুলো কুড়িয়ে পেয়েছিলুম। লীলাচ্ছলে তিনি ঠিক সময় মত আমায় সাহায্য পাঠালেন, হু'হুবার বিপদ হ'তে উদ্ধার হ'বার জন্তে!

আবার সেই পরিত্যক্ত বইটি খুলে দেখলুম, যা'তে লেখক পরীক্ষার হলেও ভগবৎশক্তির প্রাধান্য অস্বীকারই ক'রে গেছেন। মনে মনে হাসি এই ভেবে যে, যদি লেখক মহাপ্রভুকে বলি যে, শ্মশানে বসে ধ্যানই হচ্ছে স্কুলের

পরীক্ষায় পাস ক'রবার পথ, তা' শুনে ত' বেচারার মাথা একেবারে বিগড়ে যাবে !

বাই হো'ক, এই “নূতন গৌরব” লাভের পর আমি প্রকাশ্যভাবেই বাড়ী ছেড়ে বেরুতে সক্ষম ক'রলুম। আমার একটি যুবক বন্ধু, জিতেজ্ঞনাথ মজুমদারের সঙ্গে কাশীধামের একটি মহামণ্ডলের আশ্রমে যোগদান ক'রে সেখানকার আধ্যাত্মিক শিক্ষাগ্রহণ ক'রতে মনস্থ ক'রলুম।

একদিন সকাল বেলায় বসে বসে ভাবছি। মনে আত্মীয়-স্বজন বিচ্ছেদের ভাবনা এসে উপস্থিত হ'ল। মায়ের মৃত্যুর পর আমার দুই ছোট ভাই সনন্দ আর বিষ্ণুর ওপর আমার স্নেহ আরও গাঢ়তর হ'য়ে উঠেছিল। আমার বহু কঠিন সাধনার স্থল সেই ছোট ঘরটিতে দ্রুত গিয়ে আশ্রয় গ্রহণ করলুম। প্রায় ঘণ্টা দুই অশ্রুবজ্রায় প্লাবিত হ'বার পর মনে হ'ল যেন কোন রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় আমার অন্তর ধুয়ে মুছে পরিষ্কার হ'য়ে গেল। সব আকর্ষণ দূরে চলে গিয়ে একমাত্র ঈশ্বরই সকল বন্ধুর শ্রেষ্ঠ ব'লে অনুসন্ধান করবার প্রবল প্রচেষ্টা। আমার অন্তরে পাথরের মত দৃঢ় হ'য়ে চেপে বসল। ভ্রমণের সব বন্দোবস্ত আমি দ্রুত সব ঠিক ক'রে ফেললুম।

পিতার শেষ আশীর্ব্বাদ গ্রহণ ক'বতে তাঁ'র সামনে গিয়ে দাঁড়াতেই অত্যন্ত মর্মান্বিত হ'য়ে তিনি বললেন,—“আমাব একটি শেষ কথা রেখো, মুকুন্দ ! তুমি আমাকে আর তোমার দুঃখী ভাইবোনদের আর ত্যাগ ক'রে যোয়ো না।”

বললুম, “বাবা, আপনার প্রতি আমার ভক্তির কথা আর আমি কি বলব ? কিন্তু সেই পরম পিতার জন্তে আমার ভক্তি যে তার চেয়েও বেশী— যিনি আপনার মত পিতা আমাকে দিয়েছেন ! আমাকে যেতে দিন বাবা, যা'তে করে একদিন আমি আরও পরিপূর্ণ শুদ্ধজ্ঞান নিয়ে ফিরে আসতে পারি।”

পিতার অনিচ্ছাপ্রদত্ত সম্মতি সংগ্রহ ক'রে আমি জিতেজ্ঞের সঙ্গে যোগদান করতে বেরিয়ে পড়লুম। সে ইতিমধ্যেই কাশীর আশ্রমে গিয়ে উপস্থিত হয়েছিল। আমি উপস্থিত হ'লে আশ্রমের প্রধান অধ্যক্ষ স্বামী দয়ানন্দ আমায় সাদরে গ্রহণ করলেন। দীর্ঘকায়, কৃশ আকৃতি, ভাবপ্রবণ

স্বামীজি মহারাজের প্রতি আমার মনে খুব উচ্চ ধারণারই উদয় হ'ল। তাঁর সুন্দর মুখের ওপর বুদ্ধদেবের জায় একটা ধ্যানস্তিমিত গভীর প্রশান্তির ভাব।

আমার নতুন আবাসেও একটি ছোট ঘর ছিল দেখে ভারি খুসী হলাম। সেখানে আমি সকাল সন্ধ্যায় নিরালায় কাটাবার সুযোগ পেলুম। আশ্রম-বাসীরা সব ধ্যানধারণার বিষয় অল্পই জানত ব'লে ভাব'লে যে, আমি সংগঠন কায়েই আমার সময়টা সব ব্যয় ক'রব, কায়েই তা'দের আফিসের কায়ে আমার বৈকালীন সময়টাও ব্যয় করবার জন্তে আমার উৎসাহিত করলে।

একদিন সকাল সকাল সেই ছোট ঘরটির দিকে চলেছি, একটি সহআশ্রম-বাসীর বিজ্ঞপদিক্ত কণ্ঠস্বর কাণে এসে পৌঁছল,—“ওহে, ভগবানকে এত জলদি পাকড়াতে চেষ্টা কো'রো না।” স্বামী দয়ানন্দের কাছে গেলুম, দেখি যে তিনি গঙ্গার ধারে তাঁর ছোট ঘরটিতে অত্যন্ত কর্মব্যস্ত!

বললুম, “স্বামীজি, আমি এখানে যে কি কায়ে লাগব, তা' বুঝতে পাচ্ছি না। আমি চাই ঈশ্বরের সাক্ষাৎ অনুভূতি লাভ করতে। তাঁকে ছাড়া, কোন সঙ্গ, ধর্মমত বা সদাচরণ কিছুতেই আমি সন্তুষ্ট নই।”

গেরুয়াবসন পরা সদানন্দ সেই সন্ধ্যাসীটি সন্মুখে আমার শুধু একটি মূর্ছ চপেটাঘাত করলেন। হাতের কাছে জনকতক শিষ্যকে পেয়ে তিনি কৃত্রিম ভৎসনার স্বরে বললেন, “মুকুন্দকে তোমরা কেউ বিরক্ত কোরো না, ও আমাদের ধরণধারণ শীগগিরই শিখে নেবে। তা'র জন্তে আর তোমাদের কোন মাথাব্যথার দরকার নেই।”

বিনয়ের আড়ালে আমি আমার সন্দেহ গোপন করলুম। শিষ্যেরা সব ধর ছেড়ে চলে গেল, তিরস্কার লাভ ক'রে বেশী কিছু অপ্রতিভ না হ'য়ে। দয়ানন্দজীর আমাকে আরও কিছু বলবার বাকী ছিল।

বললেন, “মুকুন্দ! দেখছি তোমার বাবা তোমায় বেশ নিয়মিত টাকা পাঠাচ্ছেন। এ তাঁকে ফিরিয়ে দাও, এখানে তা' তোমার কিছুমাত্র দরকার নেই। আর তোমার দ্বিতীয় সংঘমবিধি হচ্ছে, আহার বিষয়ে। ক্ষিদে পেলেও তা' তুমি বো'লো না।”

চোখে আমার ক্ষিধের আগুণ ছিল কি না বলতে পারি না, তবে আমার যে দস্তুর মতন ক্ষিদে পে'য়েছিল তা' তখন ভাল রকমই টের পাচ্ছিলুম।

বেলা বারটা নাগাদ আশ্রমে প্রথম আহার জুটত। নিজের বাড়ীতে কিন্তু বেলা ন'টার মধ্যেই বেশ বড় রকমের একটি প্রাতরাশ খাওয়াই আমার অভ্যাস ছিল।

এই তিন ঘণ্টার কাঁক কিন্তু দিনের পর দিনই আমার অসহ্য হ'য়ে উঠতে লাগল। হায়রে! কলকাতার সে সব দিন চলে গেছে,— যখন দশ মিনিট দেরী হ'য়ে গেলেই রাঁধুনী বামুনকে আমি বকেবকে অনর্থ বাধিয়ে তুলতুম। এখন আর কি করি, উপায় নেই দেখে অগত্যা ক্ষিধে বশ করবার চেষ্টা ক'রতে লাগলুম। একদিন ত' চক্ষিষ ঘণ্টা উপোষ করেই প'ড়ে রইলুম। ফলে এই হ'ল যে, উদরের মধ্যে অগ্নি দ্বিগুণ বেগে প্রজ্জ্বলিত হ'য়ে উঠল আর আমি অধীর আগ্রহে তার পরদিন মধ্যাহ্নের প্রতীক্ষা ক'রতে লাগলুম।

ভগ্নদূত জিতেছে আমার ঘরে এই নিদারুণ সংবাদটি ঘোষণা ক'রে গেল, “দয়ানন্দজীর ট্রেন আজ লেট, তাঁর না আসা পর্যন্ত আমরা আজ আর খেতে বসতে পাচ্ছি নে।” প্রায় দু' সপ্তাহ বাইরে থাকার পর দয়ানন্দজী আজ ফিরে আসছেন, কাষেই সেই উপলক্ষ্যে নানাপ্রকার উপাদেয় ভোজ্যসামগ্রী দিয়ে তাঁ'রে পরিপাট্যরূপে সেবার ব্যবস্থা হয়েছিল। প্রবল ক্রোধের উদ্বেককারী নানাবিধ স্নাত্তের সৌরভে বাতাস পরিপূর্ণ। মনের তখনকার যা' অবস্থা তা' সহজেই অনুমেয়! কিছুই এখন না মিললে, কালকের উপবাসের দণ্ড ছাড়া আর এখন কিই বা নীরবে পরিপাক করা যায়?

মনে মনে ভগবানকে ডাক্তে লাগলুম, “তাড়াতাড়ি ট্রেনটি পৌঁছিয়ে দাও, ঠাকুর!” ভাবলুম, স্বামীজি যে সব বিধিনিষেধ আমার ওপর আরোপ ক'রে আমায় চুপ করিয়ে রেখেছিলেন, তা'তে ত' ঠাকুরের কোন হাত ছিল না! ঠাকুরের মন হয়ত' সে সময় অন্ধ কোথাও ছিল! যাই হোক ঘড়িতে অত্যন্ত মন্থর গতিতেই যেন ঘণ্টার পর ঘণ্টাগুলো কেটে যেতে লাগল। স্বামীজি যখন আশ্রমে এসে প্রবেশ করলেন, সন্ধ্যা তখন নেমে আসছে। অকৃত্রিম আনন্দেই তখন আমি তাঁ'কে অভ্যর্থনা করলুম।

জিতেছে একটা মূর্ত্তিমান দুর্গ'হের মতন উদয় হ'য়ে বললে, “এখনও খাবার সব দেরী আছে হে! দয়ানন্দজী এখন স্নান ক'রবেন, ক'রে ধ্যানে বসবেন, তারপর ধ্যানে থেকে তাঁ'র ওঠ'বার পর আমরা সব খেতে বসব!” আমার ত'

নাড়ী ছেড়ে যা'বার উপক্রম! এ ধরণের ক্লেশে অনভ্যস্ত আমার তরুণ ক্রোধ উদরে দারুণ দংশনযন্ত্রণা দিয়ে অত্যন্ত প্রবল আপত্তি জানাতে লাগল। দুর্ভিক্ষপ্রপীড়িত লোকেদের কঙ্কালসার মূর্তির ছবি সব আমার চোখের সামনে যেন ছায়া মূর্তির মতন ভেসে বেতে লাগল।

ভাবলুম, “কাশীতে অনাহারে আর একটি মৃত্যু এই আশ্রমে এখনই ঘটল ব'লে।” যা'ক, রাত ন'টা নাগাদ আসন্ন সে দণ্ড হ'তে অব্যাহতি পেলুম। আহা! কি অমিয় মধুর সেই আত্মান! স্মৃতিপটে সে রাত্রের ভোজটি জীবনের একটি পরিপূর্ণ মুহূর্তরূপে অঙ্কিত হ'য়ে রয়েছে।

ভোজে গভীর মনোনিবেশ ক'রেও দেখলুম যে, দয়ানন্দজী অগ্রমনস্ক ভাবে আহার ক'রে চলেছেন। বেশ বোঝা গেল যে, তিনি আমার স্থূল আনন্দ ভোগের উপরে!

পরিপূর্ণ ভোজনস্বপ্নের পর অধ্যক্ষ মহাশয়ের পড়বার ঘরে গিয়ে উপস্থিত হ'লুম। সেখানে তিনি একলাই ছিলেন। জিজ্ঞাসা করলুম, “স্বামীজি, আপনার কি আজ ক্ষিধে ছিল না?”

বললেন, “হ্যাঁ নিশ্চয়ই, ছিল বই কি! গেল চার দিন ত' আমার কোন রকম দানাপানি জোটে নি! তা' ছাড়া তুমি ত' জান, ট্রেণে আমি কখনও খাইনে। সেখানকার হাওয়া সংসারী লোকেদের সব নানা কামনা বাসনার কলুষিত। আমাদের সম্প্রদায় বিশেষের সন্ন্যাসীদের জন্তে শাস্ত্রীয় বিধি নিষেধ সব আমি খাঁটিভাবেই মেনে চলি।

“আমাদের আশ্রমের সংগঠন কাযের কতকগুলো জটিল বিষয় মনের ওপর চেপে বসে রয়েছে—তাই আজকের আশ্রমের ভোজে আর মন বসল না। আর তাড়াতাড়িই বা কিসের হে? কালকেই না হয় একটি পরিপাটি রকমের ভোজের ব্যবস্থা করা যাবে, কি বল?” ব'লে উচ্ছ্বসিত হ'য়ে হেসে উঠলেন।

লজ্জায় শ্বাসরুদ্ধ হ'বার উপক্রম হ'ল। কিন্তু কালকের দিনের কষ্টের কথা ত' আর তোলবার নয়, তাই সাহস সঞ্চয় ক'রে বলে ফেললুম, “স্বামীজি, আমি ত' ঠিক বুঝতে পাচ্ছিনে। ধরুন, আপনার উপদেশ পালন করতে গিয়ে খাবার যদি নাই বা চাইলুম, আর কেউ যদি কিছু খেতেই বা না দেয়—

তা' হলে ত' আমি অনাহারে একেবারে মরেই যা'ব।"

"মর তা'হ'লে।" এই নিদারুণ বাক্যে বায়ুমণ্ডল বিদীর্ণ ক'রে স্বামীজি বললেন, "মরতে যদি হয় ত', মর মুকুন্দ! কখনও মনে কোরো না যেন তুমি কেবল খাওয়ার জোরেই বেঁচে আছ,—ঈশ্বরের শক্তিতে নয়! যিনি ক্ষিধে দিয়েছেন, যিনি সকল রকম পুষ্টিরও ব্যবস্থা করেছেন, তিনি নিশ্চয়ই দেখবেন, যা'তে তাঁ'র ভক্তের প্রাণরক্ষা হয়। মনেও কোরো না যে, অন্যই তোমার বাঁচিয়ে রাখে বা টাকাকড়ি অথবা লোকজনই তোমায় প্রতিপালন করে। ভগবান যদি তোমার প্রাণবায়ুটুকু টেনে নেন, তা'হ'লে কি তা'রা আর তোমায় সাহায্য ক'রতে পারত? তা'রা হ'চ্ছে তাঁ'র পরোক্ষভাবে সাহায্য ক'রবার যন্ত্র মাত্র। তোমার উদরে যে অন্ন পরিপাক হয়, তা'তে তোমার নিজের কোন কৃতিত্ব আছে না কি, বল? তোমার যুক্তির তরবারি ধর মুকুন্দ, কর্তৃত্ববুদ্ধির শৃঙ্খল কেটে ফেল, আর সেই পরম কারণকে অনুভব ক'রতে চেষ্টা কর।"

তাঁ'র এই উদ্দীপনাময়ী বাণী আমার মস্তিষ্কে মস্তিষ্কে প্রবেশ ক'রল। বহু কালের ভ্রান্তি, যা'তে ক'রে দেহের দাবী আত্মাকে ছাপিয়ে চলে, তা'র আজ নিরসন ঘটল। সেই মুহূর্তেই আমি আত্মার সর্বব্যাপিত্ব ও পরিপূর্ণতাব উপলব্ধি করলুম। পরবর্তী জীবনে অবিরাম ভ্রমণকালীন কত অপরিচিত সহরে,—কাশীর আশ্রমে প্রাপ্ত এই উপদেশের উপযোগিতা প্রমাণ করতে কত উপলক্ষ্য যে এসে উপস্থিত হ'য়েছিল, তা' আর কি বলব!

কলকাতা থেকে একটিমাত্র সম্পত্তি যা' সঙ্গে এনেছিলুম, তা' হচ্ছে মায়ের দেওয়া সাধুর সেই রূপোর মাছুলিটি! বহু বৎসর এটিকে সযত্নে রক্ষা ক'রে এসেছি, এখন আশ্রমে এসে এটিকে অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে একটি নিরাপদ যায়গায় লুকিয়ে রাখলুম। কবচটির উপকারিতার কথা শ্রবণ ক'রে সেটিকে একটু দেখবার আনন্দলাভের জন্তে একদিন সকাল বেলায় চাবি দিয়ে বাক্সটি খুলে ফেললুম। শীলকরা আধারটি কেউই ছোঁয় নি, কিন্তু কি আশ্চর্য! কবচটি তাঁ'র ভিতর থেকে একেবারে অদৃশ্য হ'য়ে গেছে! নিতান্ত ক্ষুব্ধ হৃদয়ে তাঁ'র খামটা ছিঁড়ে ফেলে দেখলুম,—সত্যিই, তাঁ'র আর কোন ছল নেই! সাধুটির ভবিষ্যদ্বাণী অল্পসারে যে শূন্য থেকে সেটা এসেছিল, সেই

শ্রুতেই সেটা মিলিয়ে গেছে !

দয়ানন্দজীর শিষ্যবর্গের সঙ্গে আমার সম্বন্ধ ক্রমশঃই আরও অপ্রীতিকর হ'য়ে উঠতে লাগল। আমার দৃঢ় নিঃসঙ্গতা দেখে সমস্ত আশ্রম আমার কাছ হ'তে দূরে স'রে গেল। যে আদর্শে উদ্বুদ্ধ হ'য়ে সমস্ত পার্থিব আশা আকাজক্ষা সব দূরে ফেলে রেখে গৃহত্যাগ করে চলে এসেছি, তা'র ধ্যানে আমার গভীর নিষ্ঠা কিন্তু চারদিক থেকে লঘু সমালোচনার সৃষ্টি করলে।

ঈশ্বরলাভ না হওয়ায় দারুণ যন্ত্রণায় অন্তরে ক্ষতবিক্ষত হ'য়ে একদিন সকাল বেলায় সেই ছোট্ট ঘরটিতে প্রবেশ করলুম, প্রার্থনা করবার জন্তে—যতক্ষণ না একটা নিশ্চিত কোন উত্তর মেলে।

কৈদে বললুম,—“করণাময়ী মা আমার, হয় তুমি স্বপ্নে আমায় দেখা দাও, না হয় কোন সদগুরু পাঠিয়ে আমায় দীক্ষা দাও।”

ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেটে যেতে লাগল, অত কৈদে বললুম, তবুও কোন উত্তর মিলল না ! হঠাৎ মনে হ'ল যেন আমি অসীম শ্রুতে ভাসছি !

মহাশ্রু হ'তে যেন স্বর্গীয় বামাকণ্ঠের একটি মধুর বাণী কাণে ভেসে এল, “তোমার গুরু আজই আসছেন।”

এই অতীন্দ্রিয় অনুভূতি, একটা যায়গা থেকে একটা চিৎকার এসে প'ড়ে অত্যন্ত রূঢ়ভাবে একেবারে ছিন্নবিচ্ছিন্ন ক'রে দিলে। নিচের তলায় রান্নাঘর থেকে একটি ছোকরা পূজারী—ডাক নাম তা'র হাবু, আমায় ডাকছিল।

“মুকুন্দ, তোমার খুব ধ্যান হয়েছে, এখন নেমে এস, তোমায় এক যায়গায় এখুনি যেতে হ'বে।”

অতদিন হয়ত, আমার ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটত, আর একটা কড়া গোছের উত্তরও দিতুম। আজ আর কিন্তু সে সব কিছু না ক'রে, অশ্রুপ্লাবিত মুখ মুছে ফেলে অত্যন্ত নিরীহ ভাবে হুকুম তামিল করলুম। হাবুতে আর আমাতে বেরিয়ে পড়লুম—একটু দূরে, কাশীর বাঙ্গালীটোলার ভিতর একটা বাজারের দিকে। বাজারে কেনাকাটা করবার সময় সূর্যের তেজ তখনও মন্দই ছিল, বিশেষ চড়েনি ! আমরা তখন সধবা স্ত্রীলোক, পাণ্ডা, থানপরা বিধবা, ব্রাহ্মণ, আর ধর্ম্মের ষাঁড়ের বিচিত্র সমাবেশের ভিতর দিয়ে পথ ক'রে এগোতে লাগলুম। একটা অজানা গলির মধ্যে ঢুকে প'ড়ে, সেটা ভয়ানক রকম

ছোট দেখে, মাথা ঘুরিয়ে পেছন ফিরে তাকাতে গিয়ে দেখি— পথের শেষ প্রান্তে গেরুয়া কাপড় পরা এক মহাপুরুষ সন্ন্যাসী নিশ্চল ভাবে দাঁড়িয়ে রয়েছেন। দেখামাত্রই মনে হ'ল যেন কত যুগযুগান্তের পরিচয় তাঁ'র সঙ্গে! ক্ষণেকের তরে আমার ক্ষুধিত দৃষ্টি তাঁ'র ওপর আবদ্ধ হ'ল,—তারপর একটা সন্দেহ ক্রমে ক্রমে এসে উপস্থিত হ'ল। মনকে বোঝালুম, “মন, এই পরি-ব্রাজক সন্ন্যাসীটিকে তোমার পরিচিত কোন লোকের সঙ্গে ভুল করছ। ও সব কিছু নয়, স্বপ্নবিলাসি, এগিয়ে চল!”

মিনিট দশেক পরে পা দু'টো ক্রমশঃ ভারী হয়ে প'ড়ে যেন অসাড় হয়ে এল। যেন পাথর হয়ে প'ড়ে তা'রা আর আমাকে এক পা'ও টেনে নিয়ে যেতে পারলে না। অতি কষ্টে আমি ফিরে দাঁড়ালুম, আশ্চর্য্য, অমনি তক্ষণি পা দু'টো স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে পেলে! বিপরীত দিকে মুখ ঘুরিয়ে দাঁড়াতেই, অমনি পা দু'টো আবার অদ্ভুতভাবে ভারী হয়ে এ'ল। সাধুটি আমার কোন সম্মোহনশক্তির বলে আকর্ষণ করছেন, এই ভেবে আমি হাবুর হাতে জিনিষপত্রগুলো সব দিয়ে দিলুম। হাবু দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আমার এলোমেলোভাবে পা ফেলা দেখছিল, এখন হো হো করে হেসে উঠ'ল। জিজ্ঞাসা করলে,—“তোমার কি হয়েছে বল ত' ? মাথা খারাপ হ'ল না কি ?” মনে ভাবের উত্তাল তরঙ্গ, মুখে কোন উত্তর যোগাল না। নিঃশব্দে এগিয়ে চললুম।

সেদিকে ফিবে যেন হাওয়ায় উড়ে সেই সরু গলিটার ভিতর গিয়ে পৌঁছলুম। তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাকাতেই সেই সৌম্যমূর্তি নজরে পড়ল। দেখলুম, তখনও তিনি একদৃষ্টে আমারই দিকে তাকিয়ে আছেন। তাড়াতাড়ি কয়েক এগোতেই তাঁ'র চরণপ্রান্তে এসে পৌঁছলুম।

“গুরুদেব!” সেই মূর্তি আমার হাজার স্বপনের মধ্যে পাওয়া তাঁ'র দিব্যমূর্তি ছাড়া ত' আর কারুর নয়!

ঐ শাস্তস্নিগ্ধ দু'টি চোখ, সিংহের মত উচু মাথা, ছুঁচলো দাড়ি, আর বাবরি চুল—এ ত' প্রায়ই আমার নৈশস্বপ্নের অন্ধকার ভেদ করে উঁকি মারত, আর কি যে ইঙ্গিত ক'রত, তা' পুরোপুরি বুঝে উঠ'তে পারতুম না।

আজ এলেন! এতদিন পরে গুরুদেব আজ আমার কাছে ধরা দিলেন।

আনন্দকম্পিত স্বরে বারবার তিনি বলতে লাগলেন, “আমার কত আপনার তুমি, আজ আমার কাছে এলে। কত বছর ধরে যে আমি তোমার জন্তে অপেক্ষা করছি।”

পরিপূর্ণ নিমন্ত্রণের মধ্যে তখন আমরা দু’জনে দাঁড়িয়ে। কথাবলা যেন তখন নিতান্তই বাহ্যিক মাত্র।

গুরুর অন্তর থেকে শিষ্যের কাছে নীরব ভাষায় যেন বাক্যের স্রোত অবিরাম ভাবেই বয়ে যেতে লাগল। অন্তর্দৃষ্টির বেতারে জানতে পারলুম যে আমার গুরু সিদ্ধপুরুষ, ভগবানকে লাভ করেছেন আর আমাকেও তাঁ’র সন্নিধানে নিয়ে যেতে পারবেন। এ জীবনের অন্ধতমিশ্র প্রাক্জীবনের স্মৃতির মৃদু উবার আলোকে অন্তর্হিত হ’ল। একটা নাটকীয় মুহূর্ত! অতীত, বর্তমান আর ভবিষ্যৎ যেন এর পরস্পরাগত দৃষ্টাবলী! সেই চরণযুগলে যেন এই আমার প্রথম প্রণতি নয়।

সুদৃঢ় স্ফুটিত দেহ তাঁ’র, দৃঢ় পদবিক্ষেপে তিনি অগ্রসর হয়ে চললেন। আমার হাত ধরে তিনি কাশীর রাণামহলে তাঁ’র বাসা বাড়ীতে আমায় নিয়ে গেলেন।

সেই সময় তাঁ’র বয়স প্রায় পঞ্চাশ বৎসর। দীর্ঘ ঋজু স্ঠাম দেহ, বুকের ত্রায় কক্ষত। বড় বড় কালো চোখ দু’টি, গভীর জ্ঞানের জ্যোতিঃতে সমুজ্জল। ঈষৎ কুঞ্চিত কেশ, দৃঢ়তাব্যঞ্জক আননে কোমলতা এনে দিয়েছিল। শক্তির সঙ্গে স্নিগ্ধ পেলবভাবের মৃদু সংমিশ্রণ।

বাড়ীটি গঙ্গার উপরে। দোতলার পাথরের বারান্দায় গিয়ে বসতে, সন্নেহে তিনি আমায় বললেন, “দেখ, আমার আশ্রম আর যা’ কিছু আছে সবই তোমায় দিয়ে দেব, বুঝলে?”

বললুম, “ম’শায়, আমি এসেছি জ্ঞানলাভ আর ঈশ্বর সাক্ষাৎকারের আশায়, আপনার ঐসব ধনরত্নগুলিরই ওপর আমার লোভ, অথ কিছুতে নয়!”

দ্রুত ক্ষীয়মান গোধুলির আলো ক্রমশঃই নিভে এসে আধাঅন্ধকারের ক্ষীণছায়া বিস্তার করছিল। গুরুদেবের নয়নে অতল গভীর কোমলতা। স্নেহমধুর কণ্ঠে তিনি আমায় বললেন, “তোমায় আমার নিঃস্বার্থ ভালবাসা

দিলুম।”

অমিয় মধুর অমূল্য এ বাণী। পঁচিশ বছর পরে আবার তাঁ’র এই রকম স্নেহের বাণী আর একবার শুন্তে পেয়েছিলুম। অধরোষ্ঠে স্নিগ্ধ কোমল ভাব। হৃদয়ে সাগরের অতলস্পর্শী নীরবতা।

শিশুর স্থায় সরল বিশ্বাসে তিনি আমায় জিজ্ঞাসা করলেন,—“তুমি কি আমায় ঐ রকমই ভালবাসা দিতে পারবে—বল।”

বললুম,—“গুরুদেব, চিরকালই কি আমি আপনাকে তত্ত্বি ক’রব?”

নয়মধুর স্বরে তিনি বললেন,—“সাধারণ ভালবাসা স্বার্থময়, কামনা বাসনা পরিভৃষ্টির গাঢ় অন্ধকারের ভিতরই এর মূল দৃঢ় হয়ে থাকে। স্বর্গীয় ভালবাসা প্রতিদান চায় না, সীমাহীন বাধাবন্ধহীন, এর কোন পরিবর্তন নেই। অনাবিল প্রেমের পরশমণির ছোঁয়ায় এর সব আবিলতা চিরতরে দূর হয়ে যায়। আর দেখ, কখনও যদি তুমি আমায় ভগবৎসঙ্গ বিচ্যুত হ’তে দেখ, তা’হ’লে তুমি প্রতিজ্ঞা কর যে, আমার মাথা তোমার কোলে নিয়ে আমাদের প্রেমের ঠাকুরের কাছে ফিরিয়ে আনতে চেষ্টা ক’রবে?”

* * * * *

তারপর সেই ঘনায়মান অন্ধকারের মধ্যে উঠে পড়ে তিনি আমায় ভিতরের একটা ঘরের মধ্যে নিয়ে গেলেন। বাদামের তত্ত্বি, আম প্রভৃতি নানা উপকরণসজ্জিত জলখাবারের আয়োজন করা ছিল। খাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কথাবার্তার ভিতর দিয়ে আমার অজ্ঞাতসারেই তিনি আমার প্রকৃতির গভীর পরিচয় দিয়ে বসুলেন। অন্তরের বিনয়নয়ন ভাবের সঙ্গে তাঁ’র জ্ঞানের বিরাট ঐশ্বর্য্য দেখে বিশ্বয়ে অবাক হয়ে গেলুম।

বললেন,—“কবচের জন্তে দুঃখু কোরো না। তা’র কাষ ফুরিয়ে গেছে, তাই সে চলে গেছে।” আমার সারা জীবনের প্রতিচ্ছবি আমার গুরুদেব যেন তাঁ’র মনের স্বচ্ছ দর্পণে উজ্জ্বল ভাবে প্রতিফলিত দেখতে পেলেন।

“আপনার সাক্ষাৎ দর্শন, গুরুদেব, দেবদর্শনের আনন্দের চেয়েও বেশী।”

“আশ্রমে তুমি এখন খুবই অস্বস্থিতে আছ দেখছি, যাক, এবার এখন তোমার তা’ বদলান দরকার।”

আমার জীবনের কোনো বিষয়ের আমি কোন উল্লেখই করি নি। তা’

এখন নিতান্তই বাহুল্য ব'লে বোধ হ'ল। তাঁর নিতান্ত সহজ সরল আর অত্যন্ত সাধারণ ভাবে বলার ধরণে বুঝলুম যে, ভবিষ্যদ্বাণী শুনিয়া তিনি কাউকে চমক লাগিয়ে দিতে চান না।

তাঁরপর তিনি বল্লেন, “তোমার কলকাতায় ফিরে যাওয়া উচিত। তোমার আত্মীয় স্বজনদেরই বা তোমার বিশ্বপ্রেম হ'তে বঞ্চিত ক'রবে কেন বল?”

তাঁর এই কথাতে আমার মনে কিন্তু ভয় এল! আমার পরিবারবর্গ কলকাতায় ফিরে আসবার জন্তে আমায় অনবরত তাগিদ দিচ্ছিলেন, যদিও চিঠিতে তাঁদের বহুবিধ উপরোধ অহুরোধের আমি এ পর্য্যন্ত কোন উত্তরই দিই নি।

অনন্তদা' টিপ্পনী কেটে লিখেছিলেন, “নতুন পাখী আধ্যাত্মিক আকাশে এখন একটু উড়ুক। এর ভারী হাওয়ায় তার ডানা শীগগিরই ভেরে আসবে। আর আমরাও দেখব যে বাড়ীর দিকে ঝাঁপিয়ে এসে পড়ছে—আর পাখাটি গুটিয়ে আবার সংসারের দাঁড়ে ঠিক এসে বসেছে।”

এই রকম উপমা যা' সব দারুণ ভাবে মন দমিয়ে দিত—তা' আমার মনে বরাবরই জাগ্রত ছিল, তাই কলকাতার দিকে আর ঝাঁপিয়ে প'ড়ব না ব'লে মনে মনে স্থির করেছিলুম।

বল্লুম, “ম'শায়, বাড়ীর দিকে আমি আর ফিরছি না। কিন্তু আপনি যেখানে বলবেন, সেখানেই যা'ব। এখন আপনার নাম ঠিকানাটা একটু দয়া ক'রে আমায় দিন।”

“স্বামী শ্রীবক্তেশ্বর গিরি। প্রধান আশ্রম, শ্রীরামপুর রায়ঘাট লেনে। এখানে দিনকতকের জন্তে মা'কে দেখতে এসেছি।”

ভক্তের সঙ্গে ভগবানের গূঢ়লীলার পরিচয়ে আমি আশ্চর্য্য হয়ে গেলাম। কলকাতা হ'তে শ্রীরামপুর মাত্র বার মাইল,—তবুও ঐ অঞ্চলে আমি আমার গুরুর বিন্দুমাত্র সাক্ষাৎ পাই নি। আমাদের সাক্ষাতের জন্তে লাহিড়ী ম'শায়ের পুণ্যস্মৃতিপূত প্রাচীন কাশীধাম পর্য্যন্ত দৌড়তে হ'ল। অবশ্য এখানকার ভূমিও বুদ্ধ, শঙ্করাচার্য্য ও অত্যাশ্রয় যোগী মহাপুরুষদের পদরজঃপূত!

“তোমায় ঠিক চার হস্তার মধ্যে আমার কাছে আসতে হ'বে, বুঝলে?”

এই প্রথম শ্রীকৃষ্ণের গিরিজীর কণ্ঠস্বরে কাঠিঙ্গ প্রকাশ পেলো। বল্লেন,—
 “আমার অগাধ স্নেহ আর তোমায় পেয়ে আমার কত যে আনন্দ তা’ মুখ
 ফুটে বল্লুম বলেই বুঝি তুমি আমার অহুরোধ উপেক্ষা করছ? সহজে
 কিন্তু তোমায় আমি শিষ্য বলে গ্রহণ করছিলাম! আমার কঠিন শিক্ষার
 কাছে বাধ্যতা স্বীকার করে, তোমায় পরিপূর্ণ ভাবে আমার কাছে আত্মসমর্পণ
 করতে হবে।”

তবুও আমি নিজের গৌ ধরে চুপ করে বসেই রইলুম। গুরুদেব
 অবিশ্রি সহজেই আমার মুষ্কিল বুঝতে পেরে বল্লেন,—

“তোমার বুঝি মনে ভয় হচ্ছে, তোমার আত্মীয়স্বজনরা তোমায় ঠাট্টা
 করবেন।”

“আমি বাড়ী যা’ব না।”

“আজ থেকে ঠিক তিরিশ দিনের মধ্যে তোমায় ফিরতেই হবে।”

“কথ’খনোই না” বলে ভক্তিরে চরণে প্রণাম করে কথাবার্তার ভাব
 নরম না হ’তেই প্রস্থান করলুম। রাত তখন অন্ধক হয়েছিল—অন্ধকার।
 চলতে চলতে ভেবে আশ্চর্য্য হয়ে গেলুম যে, আমাদের এই অদ্ভুত সাক্ষাতের
 কেন এ রকম বিসদৃশ পরিণতি ঘটল! মায়ার তুল্যদণ্ডে স্নেহের সঙ্গে সমান
 ওজনে আসে দুঃখ। আমার কিশোর হৃদয়, এখনও বোধ হয় আমার
 গুরুদেবের হাতে গ’ড়ে তোলবার উপযুক্ত নয়মণীয় হয়ে ওঠেনি!

তার পরদিন সকালেই লক্ষ্য করলুম যে, আশ্রমবাসীদের ব্যবহারে
 একটা বিরুদ্ধভাব বেশ বেড়ে উঠেছে। দিনগুলো ক্রমশঃ অবিরাম
 কর্কশতায় রুগ্ন হ’য়ে উঠতে লাগল। তিন হস্তার ভিতর দয়ানন্দজী
 বোম্বাইয়ে একটা কনফারেন্সে যোগদান করতে চলে গেলেন। আমার মাথার
 ওপর যেন আকাশ ভেঙ্গে পড়ল। কপাল মন্দ, মাথার ওপর নানা দুর্ভিক্ষপাক
 ঘনিয়ে এ’ল।

একদিন কাণে এসে পৌঁছল, “মুকুন্দ আশ্রমে বেশ মজায় আছে, প্রতি-
 দানে কিছু দেবার নামটি পর্য্যন্ত নেই।” শুনে আমি সর্বপ্রথম অহুতপ্ত
 হ’লুম এই ভেবে যে—কেন আমি বাবার কাছে টাকা ফেরৎ দেবার অহুরোধ
 রাখতে গিয়েছিলুম। অত্যন্ত ভারাক্রান্ত হৃদয়ে আমি আশ্রমে একমাত্র বন্ধু

জিতেন্দ্রকে খুঁজে বার ক'রে বল্লুম, “জিতেন্দ্র আমি চল্লুম। দয়ানন্দ ফিরলে তাঁকে ভক্তিপ্রণাম জানিয়ে আমার হয়ে ক্ষমা চেয়ে নিয়ো। আমার এখানে থাকা পোষাবে না।”

“আমিও চলে যাব মুকুন্দ! আমারও এখানে ধ্যানধারণার চেষ্টা স্লযোগ তোমার চেয়ে বেশী কিছু হয় না, জান?” জিতেন্দ্রের স্বর দৃঢ় ব্যঞ্জক!

আমি বল্লুম, “জিতেন্দ্র আমি একটি মহাপুরুষ যোগীর সাক্ষাৎ পেয়েছি। চল, শ্রীরামপুরে তাঁকে দর্শন ক'রে আসি।”

তা'রপর আর কি,—তা'রপর সেই “পাখীটি” কলকাতার সমস্ত সান্নিধ্যে কাঁপিয়ে পড়তে প্রস্তুত হ'ল।

১১শ পরিচ্ছেদ

বৃন্দাবনে দুইটি কপর্দকহীন বালক

“মুকুন্দ ! বাবা যদি তোমায় ত্যজ্যপুত্রুর করতেন, তা’হ’লে ঠিক হ’ত ! কি বোকার মতন তুমি তোমার জীবনটাকে উড়িয়ে দিচ্ছ !” জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার এই স্নমধুর উপদেশ বাণীতে আমার কর্ণকুহর পরিভৃষ্ট হ’ল ।

আগ্রায় তখন ট্রেন থেকে সবেমাত্র নেমেছি,—সর্ব্বাঙ্গ ধূলায় ধূসরিত ! জিতেন্দ্র আর আমি অনন্তদা’র বাড়ীতে এসে উঠলুম । অনন্তদা’ কলকাতা থেকে সম্প্রতি আগ্রায় বদলী হ’য়ে এসেছেন । দাদা তখন বেঙ্গল নাগপুর রেলওয়ের একজন স্পারভাইজিং একাউন্ট্যান্ট ।

“অনন্তদা’ আপনি ত’ ভাল রকম জানেন যে, আমি সেই বিশ্বপিতার কাছ থেকেই আমার উত্তরাধিকার খুঁজে বেড়াচ্ছি, আর কারুর কাছ থেকে নয় !”

“আরে টাকা আগে, টাকা আগে,—তোমার ঈশ্বর টিঙ্কর না হয় পরে আসতে পারেন ! কে জানে বাবা, জীবনটা ত’ খুব লম্বাও হ’তে পারে ?”

“ভগবানই আগে,—টাকা তা’র দাস । কে ব’লতে পারে, জীবনটা ত’ অতি অল্পও হ’তে পারে ?”

আমার উত্তরটা সেই মুহূর্তের প্রয়োজনে এসে যুগিয়ে গেল, কোন ভবিষদৃষ্টির বলে নয় । তবুও কালের লিখন প্রকাশ করলে অনন্তদা’র অকালবিয়োগ । কয়েক বছর পরেই তিনি প্রবেশ করলেন সেই রাজ্যে, যেখানে কি আগে, কি পরে, ব্যাক্তের টাকার আর কোন প্রয়োজনই হয় না !

“মনে হ’চ্ছে, আশ্রমে থেকে তোমার বেশ টনটনে জ্ঞানলাভ হয়েছে ! যা’ক, দেখছি যে শেষ অবধি বনারস ছেড়ে এসেছ !” অনন্তদা’র চোখ দু’টি

বেশ একটা আত্মতৃপ্তির আনন্দে চক্‌চক্‌ ক'রে উঠল। এখনও তিনি আনন্দে
সংসার বন্ধনে বাঁধবার আশা করছিলেন।

“বনারস যাত্রা আমার বুথায় যায় নি। প্রাণ আমার যা' চাইছি
সেখানে তা' সব পেয়েছি। তবে আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন, সেরে
আপনার সেই পণ্ডিত মহারাজ বা তাঁ'র পুত্রের নয়!”

অনন্তদা' পূর্বকথ' স্মরণ ক'রে আমার সঙ্গে হাসলেন। তাঁ'কে স্বীকার
করতে হ'ল যে, কাশীতে যে “ভবিষ্যদ্বক্তা” তিনি যোগাড় করেছিলেন, তাঁ'
ভবিষ্যদ্ব্যপ্তি একেবারেই ছিল না।

“উপস্থিত ভবঘুরে ভায়ার মতলবটা একটু শোনাও দেখি!”

“জিতেনদা' আমার সঙ্গে ক'রে আগ্রায় নিয়ে এলেন। এখানে তাজমহল
দেখে পরে যা'ব শ্রীরামপুরে। নতুন গুরু আমি খুঁজে পেয়েছি। তাঁ'
আশ্রম আছে শ্রীরামপুরে, সেখানে আমরা তাঁ'কে দর্শন করতে যাব।”

অনন্তদা' অবশ্য আমাদের অতিথিজনোচিত সুখস্বাচ্ছন্দ্য বিধানের কোন
ক্রটি করলেন না। সন্ধ্যার সময় বার কতক দেখলুম, তাঁ'র দৃষ্টি আমার উপর
চিস্তিতভাবে নিবদ্ধ। মনে মনে ভাবলুম, “তোমার ও দৃষ্টি আমি খুব চিনি
নিশ্চয়ই একটা কিছু মতলব আঁটা হ'চ্ছে।”

নাটকের শেষ অঙ্কের পরিণতি ঘটল, সকালে প্রাতর্ভোজনের সময়
অনন্তদা' কালকের কথাবার্তার সূত্র ধ'রে শুরু করলেন, “তা'হ'লে তুমি বাপে
বিষয় কিছুই প্রত্যাশা কর না?” দৃষ্টি কিন্তু তাঁ'র অত্যন্ত নিরীহ।

“ভগবানের ওপরই আমার একান্ত নির্ভর, তিনিই আমার একমাত্র ভরসা।

“তোমার বচন তা' ভারি সস্তা হে! জীবনটা এ পর্য্যন্ত যা' হোক এ
রকম ক'রে তা' কাটিয়ে এলে! তোমার খাওয়াপরা'র জন্তে যদি তোমার
সেই ভগবানের অদৃশ্য হস্তের দানের প্রত্যাশায় থাকতে হ'ত, তা'হ'লে
দুর্দশাটাই না আজ হ'ত ব'ল দেখি? শীগ'গিরই তোমায় রাস্তায় রাস্তা
ভিক্তের ঝুলি কাঁধে ক'রে নিয়ে বেড়াতে হ'ত, বুঝলে ভায়া?”

“কথ'খনোই নয়! ভগবান ছাড়া রাস্তার লোকেদের ওপর আমি কখনো
নির্ভর করতুম না। ভিক্তার ঝুলি ছাড়া তাঁ'র ভক্তের জন্তে তিনি হাজার
রকমের উপায় ঠাউরে রেখেছেন, তা'ও জেনে রাখ'বেন।”

“আরে খুব যে কথার বড়াই! ধর, যদি তোমার কথার বড়াইএর দাম এই সংসারের কষ্টপাথরে বাচাই করা যায়—তখন?”

“খুব রাজি, আমি খুব রাজি আছি। আপনি কি মনে করেন যে, ভগবান কেবল মাত্র কল্পলোকেই অবস্থান করছেন, এই কঠিন সংসারে তাঁকে আর পাওয়া যায় না?”

“আচ্ছা দেখা যাবে। এখনই তোমার সুযোগ মিলবে। হয় তোমার, না হয় আমার, কোনটা ঠিক মত, তা’ আজই প্রমাণ হয়ে যাবে।”

অনন্তদা’ যেন একটা নাটকীয় মুহূর্তের জন্তে থামলেন, তা’রপর আবার ধীরে ধীরে গম্ভীরভাবে শুরু করলেন, “শোন, আমি তোমাকে আর তোমার এই সহশিষ্য জিতেজুকে আজ সকালেই এই কাছের বৃন্দাবন সহরে পাঠাচ্ছি। তোমরা সঙ্গে একটি পয়সাও নিতে পারবে না আর খাওয়াদাওয়া বা টাকাকড়ির জন্তেও কারুর কাছ থেকে কিছুই হাত পাততে পা’বে না। তোমাদের দুর্দশার কথাও কাউকে জানাতে পাবে না, না খেয়েও থাকতে পারবে না আর বৃন্দাবনের রাস্তায়ও পড়ে থাকতে পারবে না। যদি আমার পরীক্ষার এই সব সর্ত্তগুলোর একটাও না ভেঙ্গে রাত বারটার আগে আমাদের এই বাংলায় ফিরে আসতে পা’র, তা’হ’লে সত্যিই বুঝবে যে, তোমার কথাই ঠিক!”

“নিচু আপনার চ্যালেঞ্জ!” আমার অন্তরে ও বাইরে কাষে ও কথায় কোথাও বিন্দুমাত্র দ্বিধা ছিল না। তাঁ’র সম্ভ্রুপার সক্রতজ্ঞ স্মৃতি মনের মধ্যে সহসা প্রস্ফুরিত হ’য়ে উঠল। লাহিড়ী মহাশয়ের ছবির কাছে প্রার্থনার ফলে আমায় সাংঘাতিক কলেরা থেকে মুক্তিলাভ; লাহোরে উমা দিদির সঙ্গে ছাতে বেড়ানর সময় লীলাচ্ছলে আমায় দু’টি ঘুঁড়ি প্রদান; আমার গভীর নৈরাশ্রের মধ্যে আশার বাণী বহন ক’রে সেই কবচটির আবির্ভাব; বনারসে সেই পণ্ডিতপ্রভুর বাড়ীর কম্পাউণ্ডের বাইরে সেই অপরিচিত সাধুটির নিভুল পথনির্দেশ; জগন্মাতার আবির্ভাব আর তাঁ’র অমিয় গধুর বাণী; আমার তুচ্ছ বিব্রতভাবে মাষ্টার মহাশয়ের মাধ্যমে তা’র স্বরিত প্রতিকার; শেষ মুহূর্তের সাহায্যে আমার স্কুলের পরীক্ষায় সাফল্যলাভ এবং তাঁ’র চরম দান—সারা জীবনের স্বপ্নকুহেলী ভেদ

ক'রে আমার জীবন্ত সঙ্গুরুলাভ ! নাঃ, আমি কখনই স্বীকার করব না যে, আমার “জীবনাদর্শ” সংসারের কঠিন পরীক্ষার ক্ষেত্রে কোন লড়াইয়েরই উপযুক্ত নয় !

“তোমার এতে আগ্রহ প্রশংসার কথা বটে। তা' বেশ, ভাল কথা, তোমাদের আমি এখনিই টেনে তুলে দিচ্ছি।” ব'লে অনন্তদা' ব্যাদিতবদন জিতেজের দিকে ফিরে বল্লেন, “শোন জিতেজ, সাক্ষী হিসেবে তুমি ওর সঙ্গে সঙ্গে যাবে, আর কি বলব, খুব সম্ভব ওরই মত তোমারও ঠিক একই দুর্দশা ঘটবে।”

আধ ঘণ্টাটাক বাদে জিতেজ' আর আমি, আমাদের এই হঠাৎ ভ্রমণের একখানি করে এক পিঠের টিকিট পেলুম। ষ্টেশনের একটা নির্জন কোণে আমাদের দু'জনকে দেহতল্লাসীতে আলসমর্পণ ক'রতে হ'ল। অনন্তদা' শীগ'গিরই টের পেয়ে নিরস্ত হ'লেন যে, কোন কিছু লুকিয়ে বা বাঁচিয়ে সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছিলে। আমাদের সাদাসিধে ধুতিতে, যা' নিতান্ত দরকার, তা'ছাড়া আর কোন কিছুই লুকোন ছিল না।

অর্থের কঠিন ভূমিতে বিশ্বাস যখন পা দিয়ে দাঁড়াল, আমার বন্ধুটি তখন নিতান্ত আপত্তিসহকারে বল্লেন, “অনন্তদা', দুটো একটা টাকা আমাকে দেবেন, হঠাৎ দরকার হ'লে টেলিগ্রাম করতে ত' পারব ?”

আমি টেঁচিয়ে বকে উঠলুম, “জিতেজ', টাকাকড়িরই ওপর যদি শেষ পর্যন্ত নির্ভর ক'রে বেরুতে চাও, তা'হ'লে আমি এ পরীক্ষায় একদম যা'ব না, তা' ব'লে রাখ'ছি।”

“টাকার মিষ্টি বুলি প্রাণ ঠাণ্ডা করে বোঝ ত' ?”

চোখ পাকিয়ে তাকাতেই জিতেজ' একেবারে চুপ মেয়ে গেল !

“মুকুন্দ, আমি একেবারে হৃদয়হীন নই !” অনন্তদা'র কণ্ঠস্বরে একটু কোমল নম্রতার আভাস ! হয়ত' তাঁ'র বিবেক তাঁ'কে দংশন করছিল, কিম্বা দু'টি নিঃসম্বল বালককে একটা অপরিচিত সহরে পাঠাবার জন্তে, অথবা তাঁ'র নিজের সন্দিক্ধ মনের জন্তে, তা' কে জানে ! তিনি ত' ব'লে বস্লেন, “যদি কোন সুযোগে, বা ধর যদি ভগবানের দয়াতেই তুমি বৃন্দাবনের পরীক্ষায় উৎরে আসতে পা'র, তা' হ'লে আমি তোমার শিষ্য হ'ব।”

এই রকম একটা উপলক্ষের সঙ্গে এই ধরনের প্রতিজ্ঞার কোথায় যেন একটা অসঙ্গতি ছিল। বড় ভাই ছোট ভাইয়ের কাছে ত' কোথাও কখন মাথা নিচু করেন না। পিতার পরই জ্যেষ্ঠভ্রাতার প্রতি সম্মান ও আনুগত্যের স্থান ; কিন্তু আমার আর তখন কোন মন্তব্য প্রকাশের সময় ছিল না, ট্রেনের সময় হ'য়ে গেছে !

*

*

*

*

ট্রেন ক্রোশের পর ক্রোশ অতিক্রম ক'রে ছুটে চলেছে। জিতেজ্জ' দুর্ভেদ্য নীরবতা অবলম্বন করেই বসে রইল। শেষে একটু নড়ে চড়ে বসে আমার ওপর ঝুঁকে প'ড়ে শরীরের এক স্থানে একটি প্রবল চিমটি কেটে বললে, “ভগবান যে এর পর কি ক'রে আমাদের আহাৰ জোটাবেন তা'র কোন হৃদিসূহিত, ঝুঁজে পাচ্ছি নে।”

“চুপ্‌চাপ্‌ বসে থাক, ভগবান আমাদের সঙ্গে সঙ্গেই ফিরছেন, তা' জান ?”

“আচ্ছা চটপট তিনি যা'তে করেন, তা'র কোন ব্যবস্থা করতে পা'র ? এর পর যা' অবস্থা দাঁড়াবে, তা' ভেবেও এরই মধ্যে ক্ষিদেয় আধমরা হয়ে গেছি ! কাশী ছেড়ে বেরিয়েছিলুম মমতাজের কবর দেখতে, নিজের কবরে ঢোকবার জন্তে নয় !”

“আরে ঘাবড়াও কেন জিতেজ্জ ?” পুণ্যধাম বৃন্দাবনের কি চমৎকার দৃশ্য সব আজ আমরা দেখতে পা'ব, ব'ল ত' ? ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পদরজঃপূত লীলাভূমিতে আজ আমাদের বেড়াতে পা'বার সৌভাগ্য হ'বে ব'লে কি যে আমার আনন্দ হচ্ছে, তা'র আর কি বলব !”

*

*

*

*

আমাদের কম্পার্টমেন্টের দ্বার খুলে গেল। দু'টি লোক ভিতরে এসে বসল। পরের স্টেশনেই আমাদের নামতে হবে।

“ওহে ছোকরারা, বৃন্দাবনে তোমাদের কোন বন্ধুটুকু আছে না কি হে ?” ব'লেই ঠিক আমার বিপরীত দিকে উপবিষ্ট অপরিচিত লোকটি আমাদের দিকে এমন ভাবে চাইলেন, যেন কি একটা অদ্ভুত চিহ্ন দেখছেন !

“আপনার তা'তে কি দরকার ম'শাই।” ব'লে রুদ্ধভাবে তাঁ'র দিক হ'তে দৃষ্টি ফেরালুম।

“মনোচোরার বাঁশীর টানে বোধ হয় তোমরা বাড়ী ছেড়ে পালাচ্ছ বুঝি ? আমিও একজন দীন ভক্ত, বুঝলে ? তা’ যা’ক, এই অসহ্য গরমে আজ তোমরা কোথায় থাক কি খাও, তা’ এখন একবার ত’ দেখা দরকার দেখছি !”

“না ম’শায়, আমাদের একলা থাকতে দিন। আপনার দয়া অসীম, কিন্তু বাড়ী ছেড়ে আমরা পালাচ্ছি ভেবে আপনি নিতান্তই ভুল করেছেন।”

কথাবার্তা আর বেশীদূর এগোল না ; গাড়ী দাঁড়িয়ে পড়ল। জিতেছ’ আর আমি প্ল্যাটফর্মে নামতেই আমাদের সেই হঠাৎ পাওয়া সঙ্গীদ্বয়
• আমাদের দুজনের দুটি হাত জড়িয়ে ধ’রে একটা ঘোড়ার গাড়ী ডাকলেন।

চিরহরিৎ বৃক্ষরাজিপর্যবেষ্টিত, স্তবিন্যস্ত ভূমিতে অবস্থিত এক বিশাল আশ্রমের সন্মুখে আমাদের গাড়ী এসে দাঁড়াল। আমরা নেমে পড়লুম। আমাদের উপকারী বন্ধুগণ এখানে বেশ স্পর্শিত ব’লেই বোধ হ’ল। একটি সহাস্যবদন বালক এসে বিনা বাক্যব্যয়ে আমাদের নিয়ে গিয়ে একটি প্রশস্ত বৈঠকখানায় বসালে। অনতিবিলম্বে একটি সৌম্যদর্শন বয়স্ক স্ত্রীলোক আমাদের কাছে এসে উপস্থিত হ’লেন।

ইনিই বোধ হয় আশ্রমকর্ত্রী। তাঁ’কে সম্বোধন ক’রে একটি লোক বললে, “গৌরী মা, রাজকুমারেরা আজ আর আসতে পারলেন না ! শেষ মুহূর্তে তাঁ’দের মতলব সব বদলে গেল ; তা’র জন্তে তাঁ’রা খুব দুঃখ জানিয়েছেন। কিন্তু তা’র যায়গায় আজ আমরা আর দু’জন অতিথি এনেছি। ট্রেনে তা’দের ওপর নজর পড়াতে কৃষ্ণভক্ত বলেই মনে হ’ল।”

দরজার দিকে এগোতে এগোতে আমাদের পরিচিত সেই লোক দু’টি বললেন, “বন্ধুগণ, এখন তবে আসি। গোবিন্দের ইচ্ছায় আবার পরে দেখা হ’বে !”

এই অপ্রত্যাশিত অতিথি দু’টির দিকে তাকিয়ে মায়ের স্নেহকোমল হাসির সঙ্গে গৌরী মা বললেন, “তোমরা এস বাবা, এস, আজকের চেয়ে ভাল দিনে আর কবে তোমরা আসতে পারতে ? আশ্রমের পৃষ্ঠপোষক দু’জন রাজকুমারের আজ আসবার কথা ছিল। তা’ আর হ’ল না। যাই হো’ক, আমার হাতের রান্নার কোন সমঝদার আজ যদি না পাওয়া যে’ত, তা’হ’লে বড্ডই আফশোস থেকে যে’ত যে বাবা।”

অত্যন্ত মুখরোচক এই কথাগুলি জিতেজ্জ'র ওপর মারাত্মক প্রভাব বিস্তার করলে। বেচারা ত' আনন্দে কেঁদেই ফেললে। বৃন্দাবনে যে 'দশা' ঘটবে বলে সে ভয় করছিল, তা' যে আজ এই রকম রাজোচিত সম্বন্ধনায় পরিণত হ'বে, তা' বেচারা স্বপ্নেও কল্পনা ক'রতে পারে নি। হঠাৎ মানসিক ভারকেজ্জ্যুত হ'য়ে পড়াটা তা'র পক্ষে অত্যধিক বলেই বোধ হ'ল। আমাদের গৃহকর্ত্তী তা'কে অত্যন্ত ঔৎস্ক্যের সঙ্গে নিরীক্ষণ ক'রছিলেন, কিন্তু কোন কথা কইলেন না। বোধ হয় তিনি যৌবনমূলভ খামখেয়ালীর সঙ্গে বেশ পরিচিত ছিলেন।

সংবাদ এল, আহাৰ্য্য প্রস্তুত! গৌরী মা পরিপাটি রন্ধনের সৌরভে পরিপূর্ণ এক খাবার দালানে আমাদের বসিয়ে পাশের রান্নাঘরে অদৃশ্য হ'য়ে গেলেন।

এই সুযোগের সন্ধান আমি আগে থেকেই খুঁজছিলাম। জিতেজ্জ'র শরীরে একটি উপযুক্ত স্থান নির্বাচনপূর্ব্বক একটি অল্পমধুর চিম্টি প্রদান ক'রলাম। ট্রেণে জিতেজ্জ'র সেই মোলায়েম চিম্টিটির শোধ তুলে বললাম, "হায়রে অবিশ্বাসি, দেখতে পা'চ্ছ না যে, ভগবানই আজ আমাদের চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন, আর তা' চটপট এবং সঙ্গে সঙ্গেই?" গৌরী মা একটা পাখা হাতে ক'রে আবার ঘরে ঢুকলেন। আমরা দুজনে চমৎকার কাষকরা ছোটো কষলের আসনে বসতে, তিনি আস্তে আস্তে বাতাস করা সুরু করলেন।

আশ্রমের শিষ্যেরা কিছু না হ'ক ত' ত্রিশ রকম আহাৰ্য্যের পদ নিয়ে যাতায়াত সুরু ক'রে দিলে। "খোরাক জোটা"র চেয়ে নিঃসংশয়ে বরং একে "ভুরিভোজন" বলে বর্ণনা করা যেতে পারে। পৃথিবীতে আগমনের পর জীবনে এ পর্য্যন্ত জিতেজ্জ' আর আমি এ রকম উপাদেয় সুখাচ্ছ আর তৃপ্তিকর ভোজ্য আর কখনও আহাৰ্য্য করি নি!

বললাম, "মা ঠাকরণ, এ রাজারাজড়াদের উপযুক্তই ভোজ বটে! এ রকম নেমস্তনে না এসে আপনাদের রাজঅতিথিদের এমন কি বেশী জরুরী কাষ পড়ে গেল, তা' কল্পনাও ক'রতে পারিনে! আপনার এ খাওয়ান আমাদের সারা জীবনের স্মৃতি হ'য়ে রইল!"

অনন্তদার নির্বন্ধাতিশয্যে আমরা নীরব হ'য়ে আর সেই করুণাময়ী মহিলাটির কাছে প্রকাশ ক'রতে পারলুম না যে, আমাদের এই ধত্ত্বাদের দু'টি অর্থ ছিল। অন্ততঃ আমাদের আন্তরিকতা যে স্পষ্ট ছিল, তা'র আর কোন সন্দেহই নেই! আমরা তাঁ'র আশীর্বাদ মস্তকে বহন ক'রে আর পুনরায় আশ্রম দর্শন করবার চিত্তাকর্ষক নিমন্ত্রণ গ্রহণ ক'রে প্রস্থান ক'রলুম।

বাইরে অসহ্য গরম। বন্ধুটি আর আমি আশ্রমের দুয়ারের কাছে একটি বিশাল কদম গাছের তলায় আশ্রয় নেবার জন্তে গেলুম! এখন জিতেনদার চোখা চোখা কথা বেরতে শুরু হ'ল। জিতেনদার আর এক দফা সংস্কার উপস্থিত! বললে, “তুমি আমায় আজ আচ্ছা ফাঁসাদে ফেললে দেখছি! অবিশ্বাসি আমাদের এ ভোজটা ভাগ্যের জোরে হঠাৎ পাওয়া। কিন্তু টা'য়ে একটিও পয়সা না থাকলে, কি ক'রে এই সহরের সব দেখব ব'ল দিকি? আর অনন্তদারই কাছে আমায় তুমি কি ক'রে ফিরিয়ে নিয়ে যাবে, তা'ও ব'ল?”

জবাব দিলুম, “এখন তোমার পেটটি বেশ ভরেছে কি না, তাই ভগবানের সঙ্গে সঙ্গেই ভুলে গিয়েছিলে, বেশ মজা যা' হো'ক!”

আমার কথাগুলো কিন্তু নেহাৎ তিক্ত না হ'লেও অভিযোগপূর্ণ ভগবানের করুণার স্মৃতি মাহুকের মনে কত ক্ষীণ! এমন কোন মানুষ বেঁচে নেই যে, সে ভগবানের কাছে তা'র কোন না কোন প্রার্থনা পূরণ হ'য়ে না দেখেছে।

“তোমার মত বদ্ধপাগলের সঙ্গে বেকরুর মত বোকামি আর আমি জীবন কখনো ভুলছি নে!”

“চুপ কর জিতেন্দ্র,” যিনি আমাদের আজ আহার জুটিয়ে দিলে তিনিই আবার আমাদের বৃন্দাবন দর্শন করিয়ে আগ্রায় পাঠিয়ে দেবে দেখ না কেন?”

দেখা গেল, একটি ক্ষীণকায় প্রিয়দর্শন তরুণ যুবক দ্রুতপদে আমাদের দি এগিয়ে আসছে। গাছের তলায় এসে আমায় প্রণাম ক'রে বললে,—

“মহাশয়, আপনি আর আপনার সঙ্গীটি নিশ্চয়ই আজ এখানেই এসেছেন। আপনাদের অতিথি সেবা করতে আর তীর্থদর্শন করাতে আমি অল্পমতি দিন।”

এক্ষেত্রে সাধারণতঃ হঠাৎ কারুর মুখ শুকিয়ে যায় না, কিন্তু জিতেছে কার মুখ হঠাৎ যেন শুকিয়ে গেল ! আমি কিন্তু সবিনয়ে প্রস্তাবটি প্রত্যাখ্যান করলুম।

“নিশ্চয়ই আপনি আমাকে ভাগিয়ে দিচ্ছেন না, কি বলেন?” বলতে বলতে বেচারার মুখে যে ভয় দেখা গেল, অতীত তা’ নিতান্তই হাস্যকর বলে বোধ হ’ত।

“নয় কেন?”

“আপনি আমার গুরু”, বলে সে নিতান্ত বিশ্বাসভরে আমার দিকে চেয়ে বললে, “আমার ছপূরের ধ্যানের সময় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ স্বপ্নে আবিভূত হ’য়ে আমার দেখিয়ে দিলেন যে, এই গাছটিরই তলায় দু’টি পথহারা পথিক বসে, তা’র মধ্যে একটির মুখ হচ্ছে স্বয়ং আপনার—আমার গুরুদেব, ধ্যানে যা’ আমি প্রায়ই দেখেছি ! আমার এ দীন সেবা গ্রহণ ক’রলে যে কি আনন্দ পাব,—তা’ থেকে আমার আজ আর বঞ্চিত ক’রবেন না !”

বললুম, “আমিও খুব খুসী হয়েছি তুমি আমায় পেয়েছ বলে। দেখছি, কি ভগবান, কি মাল্লব কেউই আমাদের ত্যাগ করে নি !” যদিও তখন আমি নিশ্চল হ’য়ে বসে সেই আগ্রহব্যাকুল মুখের দিকে চেয়ে হাসছিলাম, অন্তরে কিন্তু গভীর রুতজ্ঞতার সঙ্গে ভক্তিতে সেই পরম দেবতার চরণে মাথা নত করলুম।

“ম’শায়রা কি গরীবের বাড়ীতে একটু পায়ের ধুলা দেবেন না?”

“খুবই আপ্যায়িত হ’লুম ! কিন্তু তা’ত আর হয় না, কারণ আমরা যে আশ্রাতে আমার দাদার বাড়ীতে এসে উঠেছি।”

“আমার অদৃষ্ট ! যাক্, অন্ততঃ আপনাদের সঙ্গে বৃন্দাবন ঘুরে বেড়াবার সৌভাগ্যের স্বত্বটিটুকু আমায় রাখতে দিন।”

আমি সানন্দে রাজি হ’য়ে গেলুম। যুবকটি তা’র নাম বললে, প্রতাপ চট্টোপাধ্যায়। একটা ঘোড়ার গাড়ী ডেকে আনলে। আমরা মদনমোহনের মন্দির আর শ্রীকৃষ্ণের অতীত লীলাস্থল দর্শন ক’রে এলুম। মন্দির দর্শন ক’রে বেড়াতে বেড়াতে রাত হ’য়ে এল।

“একটু দাঁড়ান, কিছু মিষ্টি নিয়ে আসি”, বলে প্রতাপ ষ্টেশনের কাছে

একটা মিঠাইয়ের দোকানে ঢুকে পড়ল। এখন অপেক্ষাকৃত একটু ঠাণ্ডা হওয়াতে জিতেঙ্গ আর আমি জনাকীর্ণ প্রশস্ত রাজপথে বেড়াতে বেরোলুম। কিছুক্ষণ অদৃশ্য হ'বার পর আমাদের বন্ধুবর নানাবিধ মিষ্টান্ন নিয়ে এসে হাজির হ'ল।

“অন্ততঃ আমায় এই টুকু পুণ্য সঞ্চয় ক'রতে দিন,” বলে প্রতাপ সাহুন্স হাসিতে একগোছা টাকার নোট আর সদ্যক্রীত দু'টি আঁধার টিকিট আমাদের সামনে প্রসারিত ক'রে ধরলে।

অবশ্য তা'র হাত থেকে সেগুলো গ্রহণের সঙ্গে আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা সেই অদৃশ্য হস্তের প্রতিই সমর্পিত হ'ল। অনন্তদার কাছ হ'তে উপহাসিত হ'লেও কি তাঁ'র অযচ্ছল দান আমাদের প্রয়োজনের চেয়েও অতিরিক্ত হ'য়ে ছাড়িয়ে যায় নি? তা'র হিসেবে এখন কে দেবে?

ষ্টেশনের কাছে একটা নির্জন যায়গা খুঁজে পেয়ে বন্লুম, “প্রতাপ, আজ তোমায় আমি বর্তমান যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ যোগী লাহিড়ী মহাশয়ের ক্রিয়াযোগে দীক্ষিত ক'রব। তাঁ'রই সাধন প্রণালী তোমার গুরু হ'বে।”

আধ ঘণ্টার মধ্যেই দীক্ষা দান শেষ হ'ল। নূতন শিষ্যাটিকে বন্লুম, “ক্রিয়াই তোমার চিন্তামণি। সাধনপ্রণালী তুমি ত' দেখলে,—খুবই সহজ। এতে ক'রে মানুষের আধ্যাত্মিক উন্নতি দ্রুত সাধিত হয়। হিন্দুশাস্ত্র বলে যে, দেহধারী আত্মার মায়ামুক্ত হ'তে দশলক্ষ বৎসর লাগে। ক্রিয়াযোগের দ্বারা এই স্বাভাবিক কাল বহুগুণ কমিয়ে ফেলতে পারা যায়। জগদীশচন্দ্র বসু যেমন দেখিয়েছেন যে, গাছের রন্ধি তা'র স্বাভাবিক হার অপেক্ষা অনেকগুণ বাড়িয়ে দেখান যায়, ঠিক তেমনি মানুষের মানসিক বিবর্তনও অধ্যাত্মবিজ্ঞানে দ্রুততর ক'রে তোলা যেতে পারে। সাধনে তোমার খুব নিষ্ঠা হোক, তুমি সকল গুরুর যিনি গুরু তাঁ'র কাছে নিশ্চয়ই পৌঁছবে।”

প্রতাপ ভাবতে ভাবতে বন্লে, “যোগের এই চাবিকাঠিটির সন্ধান বহুদিন ধরেই ক'রেছি। আজ তা' পেয়ে যে কি পরিমাণ আনন্দ হ'ল, মুখে আর তা' কি বন্ব? আমার ইন্দ্রিয়ের সকল বাঁধন ছিঁড়ে এ আমায় উচ্চস্তরে পৌঁছবার পথে মুক্তি দেবে—এ কি কম সৌভাগ্যের

কথা? আজ শ্রীকৃষ্ণের দর্শনলাভ আমার পক্ষে পরম মঙ্গলের কারণ হ'ল।”

একটা অনাস্বাদিতপূর্ব নীরব অস্থূতিতে আচ্ছন্ন হ'য়ে আমরা কিছুক্ষণ চুপ ক'রে বসে রইলুম; তা'রপর ধীরে ধীরে ষ্টেশনের দিকে এগিয়ে চললুম। ট্রেনে যখন চাপলুম, আমার অন্তর তখন এক অপূর্ব আনন্দে উদ্ভাসিত—কিন্তু জিতেন্দ্র'র আজ কাদবার দিন! প্রতাপের কাছ হ'তে আমার সন্নেহ বিদায় গ্রহণ—আমার দু'টি সঙ্গীরই কাছ হ'তে রুদ্ধ ক্রন্দনের আবেগে মাঝে মাঝে করুণোচ্ছ্বাসিত হ'য়ে উঠ'ছিল। এ যাত্রার জিতেন্দ্র'র দুঃখ আর এক দফা উথ'লে উঠ'ল। এবার আর তা' নিজের জন্তে নয়,—নিজেরই বিরুদ্ধে!

জিতেন্দ্র' বলতে লাগল, “আমার কতটুকুই বা বিশ্বাস? মন যে আমার একেবারে পাথর হ'য়ে গেছে! আর নয়, ভবিষ্যতে আমি আর ভগবানের দয়াতে কখনও সন্দেহ প্রকাশ ক'রব না।”

রাত বেড়ে চলেছিল। দুটি সহায়সম্বলহীন দীন পরিব্রাজককে কপর্দক-হীনভাবে রাস্তায় পাঠানর পর ফের তা'রা অনন্তদা'র শয়নকক্ষে এসে প্রবেশ ক'রলে। আজ আমরা সব সর্ভ পালন ক'রে এখন আবার ফিরে এসেছি! তাঁ'রই প্রতিজ্ঞার ফল,—তাঁ'র মুখটি, তখন দেখবার মত একটি পরম বিশ্বাসের প্রতিচ্ছবি! নীরবে আমি টেবিলের ওপর টাকার বৃষ্টিধারা বর্ষণ করতে শুরু করলুম।

“জিতেন্দ্র, বলি ব্যাপারটা কি হে?” অনন্তদা'র স্বরে বিজ্রপ মাখান ছিল। “এ ছোকরা কোন রাহাজানি টাহাজানি ক'রে আসেনি ত'?”

অমণ কাহিনীটি সবিস্তারে বর্ণনা করা হ'লে, দাদা আমার প্রথমে চুপ ক'রে গিয়ে পরে একেবারে গম্ভীর হ'য়ে গেলেন!

“চাওয়া আর পাওয়ার নিয়মটা দেখছি, যা' ভেবেছিলুম তা'র চেয়েও স্বপ্নতর রাজ্যে গিয়ে পৌঁছয়।” অনন্তদা'র আধ্যাত্মিক উদ্দীপনা এর আগে কখনও দেখা যায় নি। বললেন, “আজ আমি এই প্রথম তোমার টাকার প্রতি আর তুচ্ছ পার্থিব ধনসঞ্চয়ে ঔদাসীত্বের কারণ বুঝলুম।”

রাত আরও গভীর হ'য়ে এল। দাদা তাঁ'র প্রতিজ্ঞার কথা স্মরণ ক'রে ক্রিয়াযোগে দীক্ষা নেবার জন্তে পীড়াপীড়ি শুরু ক'রলেন। “গুরু” মুকুন্দকে একদিনেই দুটি “অযাচিত” শিষ্যের ভার গ্রহণ ক'রতে হ'ল।

তা'র পরের দিনের মধ্যাহ্নভোজন যে মধুর ঐক্য আর গভীর আনন্দের সঙ্গে সম্পন্ন হ'ল, আগের দিনে তা' ছিল না। আমি জিতেনন্দ্র'র দিকে চেয়ে হেসে বল্লুম, “তোমার তাজমহল দেখা ঠক্তে হবে না। চল, শ্রীরামপুর বাবার আগে এটা দেখেই যাই!”

অনন্তদা'র কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আমরা শীঘ্রই আগ্রার গৌরব তাজমহলের কাছে গিয়ে উপস্থিত হ'লুম। সূর্য্যকিরণপ্রোজ্জ্বল স্নসমগ্ধন গঠনের এ যেন একটা শ্বেত মর্ম্মরস্বপ্ন! কৃষ্ণবর্ণ বাউ, চিক্ণ তৃণাস্তৃত ভূমি আর প্রশান্ত জলাশয়ে এর পরিবেশ স্নসম্পূর্ণ। অভ্যন্তরভাগে অর্ধমূল্যবান প্রস্তরখচিত লেসের গ্রায় অপূর্ব কারুশিল্পশোভিত! লতাপাতার পুষ্পস্বক ও মাল্যাকারে হৃদয়কারুকার্য্য বেগুনী ও পীতাম্ব মর্ম্মরোপরি উৎকীর্ণ! গম্বুজ-নিঃসৃত আলো সম্রাট সাজাহান ও তাঁ'র সাম্রাজ্য আর হৃদয়রাজ্যের সম্রাজী মমতাজমহলের সমাধির উপর স্নিগ্ধ মায়া রচনা করেছে!

যাক্, খুব বেড়ান ত' হ'ল। গুরুদেবের জন্তে এখন প্রাণ কাঁদছে। জিতেনন্দ্র' আর আমি শীঘ্রই ট্রেনে চড়ে বাঙ্গালার দিকে রওনা হ'লুম।

জিতেনন্দ্র বললে “মুকুন্দ, কত দিন যে হ'ল, আমি বাড়ীর লোকজনদের মুখ দেখিনি! আমার মতলব এখন বদলেছে। পরে না হয় শ্রীরামপুরে তোমার গুরুদেবকে দর্শন ক'রে আসা যাবে।”

বন্ধুটি,—যা'কে মৃদুভাবে বললে, অস্থিরমতি বলা যায়, কলকাতায় আমার ছেড়ে গেল। কলকাতার মাত্র বার মাইল উত্তরে শ্রীরামপুর; লোকাল ট্রেনে আমি শীগ্গিরই পৌঁছে গেলুম।

কাশীতে গুরুদেবের সঙ্গে সাক্ষাতের পর আটশ দিন কেটে গেছে যখন বুঝতে পারলুম, সর্ব্বশরীরে তখন একটা বিস্ময়ের শিহরণ অনুভব ক'রলুম।

তিনি বলেছিলেন, “চার হস্তার মধ্যেই তোমায় আমার কাছে আবার আসতে হ'বে।” আজ আমি এখানে বিশ্বস্তহৃদয়ে,—শান্ত আর নির্জ্জন রায়ঘাট লেনে, তাঁ'র উঠানের মধ্যে দাঁড়িয়ে। জীবনে সর্ব্বপ্রথম আমি সেই আশ্রমে প্রবেশ ক'রলুম, যেখানে ভারতের শ্রেষ্ঠ জ্ঞানাবতারের সঙ্গে আমার জীবনের পরবর্ত্তী দশবছরের বহুলাংশই কাটাতে হবে।

১২শ পরিচ্ছেদ

গুরুর আশ্রমে বছবৎসর

“যাক, শেষ অবধি তুমি এসেই পড়লে দেখছি।” সামনে বারান্দা, তা’র পেছনে বসবার ঘর, মেঝেতে বাঘছালের আসন পাতা। শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজি বসে আছেন, আমায় সাদর সন্তাষণ জানালেন,—কিন্তু স্বর উত্তাপবিহীন, ভাব আবেগশূন্য।

“আজ্ঞে ইঁা গুরুদেব, আপনার চরণে এখন আশ্রয় নিলুম।” নতজাছু হয়ে তাঁ’র পদধূলি গ্রহণ করলুম।

“তা’ কি করে হয় বল? তুমি তা’ আমার কোন কথাই মান না।”

“আর নয় গুরুজি! আপনার ইচ্ছেই হবে আমার কাছে আদেশ।”

“তবে ভাল! এখন তা’ হ’লে তোমার জীবনের ভার আমি নিতে পারি।”

“গুরুদেব! স্বেচ্ছায় আমি আমার সকল ভার আজ আপনার ওপর অর্পণ করলুম।”

“আচ্ছা, তা’হলে আমার প্রথম কথা হচ্ছে এই যে, তুমি এখন তোমার বাড়ীতে ফিরে যাও। আমি চাই যে, তুমি কলকাতায় গিয়ে কলেজে ভর্তি হয়ে পড়াশুনা করতে থাক।”

“আচ্ছা গুরুদেব, তাই করব।” মানসিক বিপর্যায় অপ্রকাশই রাখলুম। বছরের পর বছর ধরে সেই একঘেয়ে বই নিয়েই দিন কাটাতে হবে? বাবা এলেন আগে, তারপর এলেন এখন শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজি! বেশ তাই হোক। ভেবে আর কি ক’রব?

“একদিন তোমায় হয়ত’ প্রতীচ্যে যেতে হবে। সেখানকার লোকেরা ভারতের অধ্যাত্মজ্ঞানের বিষয় খুবই মন দিয়ে শুনবে, যদি তা’রা দেখে যে, সেই হিন্দু গুরুর কোন ইউনিভার্সিটীর ডিগ্রি আছে, বুঝলে?”

“আপনিই ভাল জানেন গুরুজি, আমি আর কি বলব, বলুন।” মনের মেঘ এখন কেটে গেল। প্রতীচ্যে যাওয়ার উল্লেখ আমার কাছে দুজ্জেশ্য

আর রহস্যময় বলেই বোধ হ'ল। কিন্তু কোন ঔৎসুক্য প্রকাশ না করে সন্ন্যাস গুরুর আজ্ঞা পালন ক'রে তাঁর সম্ভাববিধানই হচ্ছে এখন আমার একমাত্র কায়।

“তুমি ত' কাছে এই কলকাতায়ই থাকবে। তবে আর কি, ফুরসৎ পেলেই এখানে এসো!”

“সম্ভব হ'লে রোজই আসব গুরুদেব! কিন্তু আমার জীবনের ওপর আপনার সর্বময় কর্তৃত্ব আমি রুতজ্ঞ চিত্তে মানতে পারি—কেবল একটি মাত্র সৰ্ত্তে... ..”

“কি, বল?”

“—যে আপনি আমায় ভগবদ্বর্শন লাভ করিয়ে দেবেন. বলুন?”

ঘণ্টাখানেক ধরে বাকবুদ্ধ চলল। গুরুবাক্য মিথ্যা হ'বার নয়, আর তা' লঘুভাবে দেওয়াও যায় না! এরূপ প্রতিশ্রুতি প্রদানের অর্থ হচ্ছে আধ্যাত্মিক পথ উন্মুক্ত করার বিরাট সম্ভাবনা। শিষ্যকে ভগবৎসাক্ষাৎকার লাভ করিয়ে দেবার পূর্বে গুরুরও অবশ্য ঈশ্বরানুভূতি হওয়া চাই। শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজির ঈশ্বর সান্নিধ্যলাভের কথা আমি অন্তরের মধ্যে বুঝতে পেরেছিলুম আর মনে মনে দৃঢ়সঙ্কল্প করেছিলুম যে, তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করে আমায় ঐ সুযোগটি আদায় ক'রে নিতে হ'বে।

বললেন, “তুমি দেখছি নেহাৎই নাছোড়বান্দা!” তা'রপর গুরুদেব শেষ পর্যন্ত সন্নেহ সম্মতিপ্রদানে ব্যাপারটির চরম নিষ্পত্তি ক'রে বললেন,—

“বেশ, তোমার ইচ্ছেই আমার ইচ্ছে!”

জীবনব্যাপী অন্ধকার যবনিকা আমার মন হ'তে অপসৃত হ'ল। ইতস্ততঃ নিরর্থক অনুসন্ধানের আজ শেষ! আজ আমি প্রকৃত সদ্গুরু চরণে চির আশ্রয় লাভ করলুম।

“চল, তোমায় আশ্রম দেখিয়ে নিয়ে আসি।” ব'লে গুরুদেব বাঘছালের আসন থেকে উঠে পড়লেন। চারিদিকে তাকাতে তাকাতে সবিস্ময়ে দেখলুম যে, দেওয়ালে একটি ছবি যুঁইফুলের মালা দিয়ে যত্নে সাজান!

“লাহিড়ী মহাশয়!”

“হ্যাঁ, আমার গুরু দেবতা!” শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজির কণ্ঠস্বর ভক্তিকল্প!

বল্লেন, “আমার সাধন পথে যে সব গুরুদের সাক্ষাৎ পেয়েছি, কি মানুষ আর কি যোগী হিসেবে তাঁদের যে কোন জনের চেয়ে তিনি বড়।”

নীরবে আমি সেই অতিপরিচিত ছবির তলায় গিয়ে ভক্তিভরে মাথা নত করলুম। আমার আত্মার প্রগতি, সেই অদ্বিতীয় গুরুর চরণে গিয়ে পৌঁছল,—যিনি আমার শৈশবে আমায় আশীর্বাদ ক’রে আজকার এই শুভ মুহূর্ত পর্য্যন্ত চালিয়ে নিয়ে এসেছেন।

গুরুদেবের সঙ্গে আমি তাঁ’র বাড়ী আর তা’র সংলগ্ন জমি দেখে এলুম। আশ্রম বাড়ীটি বেশ বড়, প্রাচীন ধরণের আর সুগঠিত। বড় বড় থাম দিয়ে ঘেরা। বাইরের দেওয়ালগুলি শেওলা পড়া। সমতল ছাতের উপর পায়রার দল সব উড়ে বেড়াচ্ছে। আশ্রমের নানা অংশ তা’রা বেশ নিরঙ্কটে দখল করে বাস করেছে। খিড়কির বাগান, আম, কাঁঠাল, কলা প্রভৃতি নানাজাতীয় রসনাভৃগ্নিকর ফলের গাছে সাজান। দোতলা বাড়ীটির তিন দিকের ঘরগুলিই উঠানের সামনে। তা’র বারান্দা রেলিং দিয়ে ঘেরা। বড় বড় থামের উপর খুব উঁচু ছাদওয়ালা ঠাকুর দালান, গুরুদেব বল্লেন, —ভূর্গাপূজা হ’ত। একটি সরু সিঁড়ি, শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজির বসবার ঘর পর্য্যন্ত পৌঁছেচে। ঘরটার বারান্দা রাস্তার ধারে। আশ্রমের সাজসজ্জা সরল ও অনাড়ম্বর। সবই বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন আর খুব প্রয়োজনীয়। কতকগুলো বিলিতি ধরণের টেবিল আর বেঞ্চিও দেখা গেল।

গুরুদেব সে রাতটা আশ্রমে থাকতে বললেন। দুটি বালক ব্রহ্মচারী নিরামিষ তরকারী আর খাবার দিয়ে গেল। ব্রহ্মচারী দুটি আশ্রমে নূতন শিক্ষার্থী।

গুরুদেবের বাঘছালের আসনের কাছে একটা কুশাসনে বসেছিলুম। বল্লুম, “গুরুজি, আপনার জীবনের কথা কিছু বলুন।” মনে হ’চ্ছিল আকাশের তারাগুলো অতি নিকটেই নেমে এসেছে—বারান্দার অদূরেই!

গুরুদেব স্মরু করলেন, “সাংসারিক জীবনে আমার নাম ছিল প্রিয়নাথ কড়ার। এই শ্রীরামপুরেই আমার জন্ম।* পিতা ধনী ব্যবসায়ী ছিলেন। তিনি এই পৈতৃক বাড়ীটি রেখে গেছেন। স্কুলের সাধারণ শিক্ষা আমার খুব

* শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজী ১৮৫৫ সালের ১৮ই মে তারিখে জন্মগ্রহণ করেন।

বেশীদূর এগোয়নি। আমার কাছে এ অত্যন্ত মহুর আর অগভীর বলে মনে হ'ল।
জীবনের গোড়ার দিকেই সংসারের সব দায়িত্ব আমার বাড়ে এসে পড়ল।
একটি মেয়ে আছে, বিয়ে দিয়ে দিয়েছি। মধ্যজীবন,—লাহিড়ী মহাশয়ের
আশীর্বাদপূত। স্ত্রীর মৃত্যুর পর সন্ন্যাস গ্রহণ করাতে, শ্রীযুক্তেশ্বর গির্জা
এই নতুন নাম হ'ল। এই হ'চ্ছে আমার জীবনের সরল ইতিহাস।”

আমার আগ্রহ ব্যাকুল মুখের দিকে চেয়ে গুরুদেব মূহু হাসলেন। সকল
জীবনআলেখ্যের মত, তাঁ'র কথাগুলি কেবল বাইরেরই পরিচয় দিলে
ভিতরের আসল মানুষটি কিন্তু লুকোনই রয়ে গেল।

বল্লুম, “গুরুদেব, আপনার ছেলেবেলাকার কথা কিছু শুনতে ইচ্ছে হয়।
গুরুজি শাসনের ভঙ্গিতে চোখ দুটি তুলে বললেন,—“আচ্ছা, তবে ছ'চারটে ঘটনা
বলি শোন। সবগুলোরই কিন্তু একটা ক'রে নীতি আছে, তা' জেনে রেখো।
প্রথমটা হ'চ্ছে—মা একদিন একটা অন্ধকার ঘরে ভূত আছে ব'লে আমার
ভয় দেখাবার চেষ্টা করেছিলেন। আমি তখনই সেই ঘরে ঢুকে ভূত
দেখতে পেয়ে হতাশ হয়ে ফিরে এলুম। মা এর পর আর আমায় কোনদিন
ভয় দেখান'র চেষ্টা করেন নি। নীতি হচ্ছে—ভয়ের মুখোমুখি হ'য়ে দাঁড়াও।
অমনি সব উৎপাত থেমে যাবে।

“আর একটা ছেলেবেলাকার কথা মনে পড়ছে। একবার আমাদের এক
প্রতিবেশীর একটা অত্যন্ত কুৎসিত কুকুর নিতে ভয়ানক ইচ্ছে হ'ল। সেই
কুকুরটা পে'তে কয়েক হস্তা ধ'রে আমি বাড়ীর লোকেদের একেবারে
উদ্ব্যস্ত ক'রে মেরে ছিলাম। সেটার চেয়ে দেখতে আরও বেশী সুন্দর সুন্দর
কুকুর সব দিতে চাইলেও তা কাণে তুলতুম না। এর নীতি হচ্ছে—মো'র
অন্ধ, এ প্রার্থিত বস্তুটির চারধারে একটা কাল্পনিক আকর্ষণের মায়াজাল
সৃষ্টি করে।

“তৃতীয় গল্পটি আমার কিশোর মনের নমনীয়তার উদাহরণ। মাঝে মাঝে
মা'কে বলতে শুনতুম, ‘কারুর কাছে কেউ চাকরি স্বীকার করলে সে তাঁ'
কীর্তদাসই হয়ে পড়ে!’ ঐ ধারণা আমার মনে এমন বদ্ধমূল হ'য়ে গিয়েছিল
যে, এমন কি আমার বিয়ের পরেও আমি সব কায়কর্মে ছেড়েছুড়ে দিয়েছিলাম
পৈতৃক ধন আমি সব জমি জমাতেই লগ্নী করে খরচপত্র চালাতুম।

নীতি হচ্ছে :—শিশুদের সরল মনে সং আর যথার্থ উপদেশ প্রবেশ করান উচিত ! শিশু বয়সের ধারণা বহুদিন মনে দাগ কেটে বসে থাকে ।”

গুরুদেব শাস্ত নীরবতার মধ্যে ডুবে গেলেন । আর বেশী কিছু কথাবার্তা হ’ল না । রাত একটু বেশী হ’লে একটি সরু খাটির উপর শোবার ব্যবস্থা ক’রে দিলেন । গুরুর আশ্রমে প্রথম রাত্রির নিদ্রা বেশ গাঢ় আর মধুরই হয়েছিল ।

শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজি তা’র পরদিন সকালেই আমার ক্রিয়াযোগে দীক্ষা দেবেন বলে স্থির করলেন । পিতা এবং আমার সংস্কৃত শিক্ষক স্বামী কেবলানন্দজী, এই দুজনেরই কাছে আমি ক্রিয়াযোগের প্রণালী শিক্ষা ক’রে ছিলাম । কিন্তু গুরুদেবের কাছে আমার যেন রূপান্তর সাধিত হ’বার শক্তি অল্পভব করলাম । তাঁ’র স্পর্শমাত্রই যেন আমার সর্ব শরীরে একটা প্রচণ্ড জ্যোতিঃর প্লাবন বাঁপিয়ে এসে পড়ল । যেন কোটি সূর্য একসঙ্গে জলছে ! একটা অফুরন্ত আনন্দের বহ্না আমার অন্তরের অন্তঃস্থল পর্য্যন্ত অভিভূত ক’রে রেখেছিল । সেটা তা’র পরদিন পর্য্যন্ত স্থায়ী হয়েছিল । সেই দিনই বিকালের শেষে আশ্রম হ’তে বিদায় গ্রহণ করলাম ।

কলকাতার বাড়ীতে ফেরবার সময় গুরুদেব যে আমার ত্রিশ দিনের মধ্যে ফেরবার ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন, তা’ মনে পড়ে গেল । “উদ্ভস্ত পাখী”র আবার দাঁড়ে এসে বসবার টিটকারি, যা’ আমি আত্মীয়স্বজনের কাছ থেকে ভয় করেছিলাম, তা’ অবশ্য আর কেউ দেয় নি !

চিলেকোঠায় ঢুকে, যেন তিনি শরীরে বর্তমান ভেবে সেই ছবির দিকে তাকিয়ে বললাম, “ঠাকুর, আপনি ত’ সবই দেখেছেন,—আমার ধ্যানধারণা, সাধনায় বহু বাধাবিপত্তি, বুকে দারুণ ঝড়ের আবির্ভাব আর প্রবল অশ্রুপাত ! আজ আমি প্রকৃত সদগুরুর চরণে আশ্রয় খুঁজে পেলুম ।”

শাস্ত নীরব সন্ধ্যায় পিতার কাছে বসেছিলাম । পিতা বললেন, “বাবা, আজ আমরা দুজনেই সুখী । আমি যেমন দৈবক্রমে আমার গুরু খুঁজে পেয়েছিলাম, আজ তুমিও তেমনি তোমার গুরু খুঁজে পেয়েছ । লাহিড়ী মহাশয়ের পুণ্যহস্তই আমাদের জীবন রক্ষা ক’রে চলেছে । তোমার গুরুদেব হিমালয়ের কোন দুর্লভ সাধু ন’ন,—নিতান্তই কাছের লোক । আজ আমার

প্রার্থনা সফল হয়েছে। তুমি ঈশ্বরের খোঁজে বেরিয়ে আমার চোখের সামনে থেকে চিরতরে আড়াল হ'য়ে যাও।”

পিতা এ ও ভেবে খুসী হ'লেন যে, আমার নিয়মিত পাঠ্যভ্যাস পুনরায় শুরু হ'বে। তিনিও তা'র উপযুক্ত ব্যবস্থা ক'রে দিলেন। তা'র পরদিনই আমি স্কটিশ চার্চ কলেজে ভর্তি হ'লুম।

সময় খুব স্নেহেই কাটতে লাগল। নিঃসন্দেহ আমার পাঠকবর্গ অবাধ অনুমান ক'রে বসেছেন যে, কলেজের ক্লাসে আমার অতি অল্পই দর্শন মিলত। শ্রীরামপুরের আকর্ষণ আমার কাছে দুর্গিবার। গুরুদেব আমার হঠাৎ আবির্ভাবে কোন রকম প্রশ্ন করতেন না। পরম আশ্বাসের কথা যে, তিনি কলেজের কথা কদাচিৎ উত্থাপন ক'রতেন। যদিও সকলে পরিক্ষার জানত যে পণ্ডিত হ'বার জন্তে আমি গঠিত হই নি, তবুও মাঝে মাঝে আমি কিছু অন্ততঃ পাস্ মার্কও রেখে চলতুম।

আশ্রমের দৈনন্দিন জীবনের ধারা বৈচিত্র্যহীন, সহজ ও সরল গতিতেই ব'য়ে চলল। খুব ভোরেই গুরুদেব শয্যাভ্যাগ করতেন। শুয়ে শুয়েই অধন কখনও কখনও বিছানার উপর বসেই তাঁ'র সমাধি হ'য়ে পড়ত। গুরুদেবের সমাধি ভঙ্গ হ'ত কখন তা' জানা অতি সহজ ছিল। তা' হচ্ছে গভীর নাসা গর্জ্জন হঠাৎ থেমে যাওয়া। দু একবার গভীর নিশ্বাস, হয়ত বা একটুখানি শরীরের নড়াচড়া, তা'র পর শ্বাসপ্রশ্বাসহীন নিস্তব্ধতাব, গভীর যোগানন্দে তিনি মগ্ন ছিলেন।

ঘুম ভাঙ্গার সঙ্গে সঙ্গেই প্রাতরাশ জুটত না। প্রথমে খুব খানিকটা গঙ্গার ধারে লম্বা ঘুরে আসতুম। গুরুদেবের সঙ্গে সেই সব প্রাতঃভ্রমণ, আজও মনে কত গভীর ও উজ্জ্বল হয়ে ফুটে আছে। স্বরণমাত্রই মনে পড়ে—তাঁ'র পাশে আমি, উনার অরুণ কিরণ জলে ছড়িয়ে পড়ছে। তাঁ'র কণ্ঠস্বর কাণে এসে বাজছে, মধুর, উদাত্ত, জ্ঞানগন্তীর।

অতঃপর হ'ত স্নান, তা'র পরেই মধ্যাহ্ন ভোজন। গুরুদেবের দৈনন্দিন ব্যবস্থায় আশ্রমের ব্রহ্মচারীদের দ্বারাই এসব সম্বন্ধে তৈরী করার কায ছিল। গুরুদেব ছিলেন নিরামিষাশী। সন্ধ্যাস নেবার আগে অবশ্য মাছ ডিম সব খেয়েছিলেন বটে। কিন্তু শিষ্যদের তিনি উপদেশ দিতেন যে শরীরে যা সব সেই রকম সাদাসিধে জিনিষই খাওয়া উচিত।

গুরুদেব ছিলেন অন্নাহারী। আহার হ'ত প্রায়ই ভাত, একটু হলুদ বা দীটপালমের রস দিয়ে রাঙান, তা'তে একটু ভঁয়সা বা মাখনগালান ঘি! কোন দিন বা মুত্তর ডাল বা একটু ছানার ডালনা আর নিরাগিব তরকারি। তা'রপরে আম কিম্বা কমলালেবুর সঙ্গে একটু পায়ের কিম্বা কাঁঠালের রস।

অভ্যাগতরা বিকালের দিকে আসতেন। কস্মৎচঞ্চল জগতের শ্রোত আশ্রমশান্তির মধ্যে নিরতই প্রবেশ করত। গুরুদেবের কাছে সকলেই সমানভাবে অভ্যর্থিত ও আপ্যায়িত হ'তেন। যে মানুষ নিজেকে আত্মা বলেই জেনেছেন, তাঁ'র কাছে দেহাভিমান বা অহঙ্কার ব'লে কিছু নেই, সব মানুষই তাঁ'র কাছে সমান।

সাধুদিগের ভেদাভেদের মূল হ'চ্ছে আত্মজ্ঞানে। সঙ্গুরুরা মায়া'র অতীত। এর বিজ্ঞা আর অবিজ্ঞার দুই বিপরীত মুখ আর তাঁ'দের উপর কোন প্রভাব বিস্তার ক'রতে পারে না। শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজি, কোন রকম ক্ষমতাক্রান্ত বা বিশিষ্ট গুণসম্পন্ন ব্যক্তিকে কোন বিশেষ আপ্যায়ন প্রদর্শন করতেন না। আবার যা'রা দীন বা মূর্খ তাঁ'দেরও কোন অবহেলা প্রদর্শন করতেন না। সত্যকথা তিনি বালকের মুখ হ'তেও শ্রদ্ধার সঙ্গেই শুনতেন আর আত্মগুরুর পণ্ডিতকেও তিনি প্রকাশে অবহেলা ক'রে চলতে পারতেন।

রাত আটটার সময় সাক্ষ্যভোজনের ব্যবস্থা ছিল। তা'তে কখনও কখনও অপেক্ষমান অতিথিঅভ্যাগতগণও যোগদান ক'রতেন। গুরুদেব কখনও একলা খেতে বসতে পারতেন না। ক্ষুধার্ত বা অতৃপ্ত কেউ তাঁ'র আশ্রম হ'তে ফিরতে পারত না। অপ্রত্যাশিত অতিথিসমাগমে কখনও তিনি বিব্রত বা ভীত হয়ে পড়তেন না। সামান্য উপকরণের আয়োজনই তা' তাঁ'র নিখুঁত ব্যবস্থায় রাজভোগ হয়ে দাঁড়াত। তবুও তিনি মিতব্যয়ী ছিলেন আর তাঁ'র অল্প পুঁজিতেই নানা ব্যবস্থা হয়ে যেত। তিনি প্রায়ই বলতেন, “তোমার যা আছে তা'তেই গুছিয়ে চালাবে। বেশী খরচে নানা অসুবিধার আর হান্সামার সৃষ্টি হয় কেনো।” কি আশ্রমের উৎসবের আয়োজনে খুঁটি-নাটি বিষয়ে, কি বাড়ী ঘরদুয়ার মেরামতের কাষে, কি অল্প কোন করণীয় ব্যাপারে বা কাষে গুরুদেব শ্রষ্ঠার মৌলিকত্ব প্রদর্শন করতে পারতেন।

মিথ্য সন্ধ্যার শাস্ত্র আবেষ্টনীতে গুরুদেবের সঙ্গে বহু আলোচনাই চলত। কালের ক্রোড়ে এ একটা অমূল্য সম্পদ হয়েই রয়েছে। একটা মহান্ গভীর আত্মনির্ভরতা তাঁ'র বলবার ভঙ্গীতে সুপরিষ্কৃত—যা' একেবারে অপূর্ণ! তাঁ'র মতন কথাবলা আমি আর কারুর কাছ থেকে শুনিনি। বাইরে প্রকাশ ক'রে বলবার পূর্বে তিনি সদসংচিন্তার সূক্ষ্মবিচারে তা' স্থির ক'রে নিতেন। সর্বব্যাপী সকল সত্যের সার, এমন কি জড় ও শরীরতত্ত্বের বিচারেও তাঁ'র কাছ হ'তে এক মহান আত্মার স্বর্গীয় সৌরভের মত পরিব্যাপ্ত হ'ত। সর্বদাই আমার মনে হ'ত যে, ভগবানের মূর্ত্ত প্রকাশ আমার সামনে। তাঁ'র দেবত্বের গৌরবভারে আমার মস্তক আপনাআপনিই তাঁ'র সামনে নত হ'য়ে আসত।

যদি অপেক্ষমান অতিথির টের পেতেন যে, শ্রীবুদ্ধেশ্বর গিরিজি সমাধিতে মগ্ন হয়ে পড়ছেন তা' বুঝে তিনি তক্ষুণি তা'দের সঙ্গে আলাপ জুড়ে দিতেন। কোন চমকপ্রদ ভঙ্গী বা ভাবে মগ্ন হয়ে পড়ার বা তাঁ'র আত্মজ্ঞানের গর্বপ্রকাশ তাঁ'র আদৌ ছিল না। সর্বদাই ব্রহ্মানন্দে মগ্ন ব'লে, ধ্যানধারণার কোন বিশেষ সময় তাঁ'র ছিল না। ঈশ্বরোপলব্ধি যা'র হয়েছে সেই গুরুর আর ধ্যানাদির প্রয়োজন হয় না। বলতেন, “ফল হ'লে ফুল আপনিই খসে পড়ে। সাধারণতঃ সাধুসন্তরা কিন্তু শিষ্যদিগের উৎসাহবর্দ্ধনের জন্তে সাধনভজনের বাহ্য অমুষ্ঠানাদিতে লিপ্ত থাকেন।”

রাত গভীর হয়ে এলে গুরুজি সরল শিশুর মত হাই তুলতে সুরু করতেন। বিছানাপত্র করার বিশেষ কোন হাঙ্গামা ছিল না। প্রায়ই তিনি একটা কৌচের উপর, এমন কি বিনা বালিশেই শুয়ে পড়তেন, শুধু তা'র উপর তাঁ'র সেই সর্বদা ব্যবহার্য্য বাঘছালের আসনটি কেবল বিস্তৃত থাকত। সারারাত ধ'রে দার্শনিক তত্ত্বালোচনা তুলত ছিল না,—কোন শিষ্য একটু গভীর আগ্রহ প্রকাশ করলেই তা' সুরু হ'য়ে যেত। আমার তখন কোন প্রকার ক্লান্তি বা ঘুমাবার ইচ্ছাও আসত না। গুরুদেবের জলন্ত বাণীই ছিল যথেষ্ট। সারা রাত আলোচনা চলবার পর কখন হয় ত' হঠাৎ বলে উঠতেন, ‘ওঃ, ভোর হয়ে গেছে হে! চল এরার গঙ্গার ধারে একটু বেড়িয়ে আসা যাক্।’ আর এই রকম বলার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের নৈশ জ্ঞানানুশীলনেরও পরিসমাপ্তি ঘটত।

শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজির সঙ্গে থাকবার সময় গোড়ার দিকে আমার একটি প্রয়োজনীয় শিক্ষালাভ হয়,—“কি করে মশার হাত এড়ান যায়!” বাড়ীতে সকলেই রাত্রিতে সর্বদা মশারি ব্যবহার করত। শ্রীরামপুর আশ্রমে এসে দেখলুম যে, এই সুবিবেচিত প্রথাটি পালন অপেক্ষা লজ্জনেই বেশী সম্মানিত! আমি ত’ সেখানে প্রবল পরাক্রান্ত মশকবাহিনী কর্তৃক আপাদমস্তক আক্রান্ত হ’য়ে ভীত ও জর্জরিত হ’য়ে পড়লুম। গুরুজির দেখে দয়া হ’ল। হেসে বললেন “তোমার জন্মে একটা মশারি কিনে এনো, আর আমার জন্মেও একটা,— কারণ তোমার নিজের জন্মে মাত্র একটা কিনলে, মশাগুলো সব আমাকেই এসে হেঁকে ধরবে!”

কৃতজ্ঞতায় অন্তর উথলে উঠল। মশারি ত’ কেনা হ’ল। শ্রীরামপুরে থাকলে রাত্রিতে গুরুদেব আমার মশারি টাঙিয়ে দিতে বলতেন।

একদিন রাত্রিবেলায় মশকদল ত’ প্রচণ্ড বিক্রমে আক্রমণ শুরু করলে। কিছু দুর্ভাগ্যক্রমে সে রাত্রিতে গুরুদেব আমার মশারি টাঙিয়ে দিতে বলতে ভুলে গিয়েছিলেন। ভীতিকম্পিত হৃদয়ে তা’দের আবির্ভাবসূচক গুণ্ গুণ শব্দ শুন্তে লাগলুম। বিছানায় প্রবেশ ক’রে তা’দের সকলের উদ্দেশ্যে আমার প্রতি প্রসন্ন হ’বার জন্মে কাতর প্রার্থনা নিবেদন করলুম! কিছু কেবা শোনে কা’র কথা! আধঘণ্টাটাক বাদে আর উপায়ান্তর না দেখে গুরুদেবের দৃষ্টি আকর্ষণ করবার উদ্দেশ্যে একবার কাসবার ভাণ করলুম। মনে হ’ল কামড়ের চোটে, বিশেষতঃ এই রকম “রক্তলোলুপ” আক্রমণ চালাবার সময়, তা’দের গুণগুণানিতে আমি তখন পাগলই বা হ’য়ে যাব।

গুরুদেবের কিছু কোন সাড়াশব্দ নেই বা কোন নড়নচড়নও নেই! অতি সন্তর্পণে তাঁ’র কাছে এগোলুম। এখন তাঁ’র আর কোন নিঃশ্বাসই পড়ছে না। তাঁ’কে যোগনিদ্রাভিত্ত অবস্থায় আমার এই প্রথম দর্শন।

এতে কিছু আমি মনে ভয় পোয়ে গেলুম—ভাবলুম, “তাঁ’র নিশ্চয়ই হার্ট ফেল হয়েছে।” নাকের নিচে একটি আরসী ধরলুম,—নিঃশ্বাসের কোন বাষ্প তা’তে লাগল না। আরও সূনিশ্চিত হ’বার জন্মে মিনিট কতক ধ’রে তাঁ’র মুখবিবর আর নাসারন্ধ্র আঙ্গুল দিয়ে বন্ধ ক’রে চেপে ধ’রে রইলুম। শরীর

তাঁ'র একদম ঠাণ্ডা আর অসাড় ! একটা ঘেন ঘোরের মাথায় দরজার দিকে এগিয়ে চললুম,—সাহায্য পা'বার জন্তে কাউকে ডাকতে ।

“ও হরি ! পরীক্ষা ক'রে দেখছিলে বুঝি ? হায়রে, বেচারী আমার নাক !” গুরুজির কণ্ঠস্বর হাশ্বোচ্ছল । বল্লেন, “যাও, বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়গে । আরে, তোমার জন্তে সারা দুনিয়াটা বদলে যাবে না কি ? তুমি আগে নিজেকে বদলাও, মশার কামড়ের ভাবনা একেবারে ছাড় ; বুঝলে ?

শাস্ত্র মেবশাবকটির মত অত্যন্ত নিরীহভাবে বিছানায় ফিরে গেলুম । এবার আর একটা মশাও কাছে বেঁসল না । বুঝলুম, গুরুজি যে এর আগে আমায় মশারি আনতে বলেছিলেন তা' কেবল আমার মনস্তৃষ্টির জন্তে,—তাঁ'র নিজের কোন মশার ভয় ছিল না । তাঁ'র যোগবল এতদূর ছিল যে, হয় তিনি ইচ্ছাশক্তিবলে তা'দের দংশন নিবারণ করতে পারতেন, আর না হয় দংশন যন্ত্রণা অল্পভূতির হাত এড়াতে পারতেন ।

ভাবলুম, “উনি বোধ হয় যোগবল প্রদর্শন করছেন । ঐরকম যোগাবস্থা তা'হ'লে ত' আমায়ও লাভ ক'রতে হ'বে !” যোগিরা এ জগতে সদা বর্তমান বহুবিধ চিন্তাবিক্ষেপকারী অবস্থা অতিক্রম ক'রে সমাধিতে প্রবেশ ক'রতে বা তা'তে অবস্থান ক'রতে অবশ্যই পারেন । কি কীটপতঙ্গের বিরক্তিকর গুঞ্জন, কি দিবালোকের প্রচণ্ড দীপ্তি, ইন্দ্রিয়বোধের এ সব বিচিত্র অল্পভূতি একেবারেই নিবারণ করতে হ'বে । শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধাদির অল্পভূতি তখন আসে বটে, কিন্তু তা' স্বর্গের চেয়েও মনোরম জগতের !*

আশ্রমের প্রাথমিক শিক্ষালাভের মধ্যে হচ্ছে এই একটি, যা' ঐ মশক-কুলের কাছ থেকেই লাভ করেছি । শাস্ত্র গোখলি । গুরুদেব প্রাচীন শাস্ত্রের অপূর্ব ব্যাখ্যায় রত । তাঁ'র চরণতলে আমি পরিপূর্ণ শাস্তিতে উপবিষ্ট । একটা ছুঁই মশা এই শাস্ত্রালাপের মধ্যে ঢুকে প'ড়ে আমার মনকে বিক্ষিপ্ত

* যোগশক্তির সর্বব্যাপিত্ব, যা'তে ক'রে যোগী ইন্দ্রিয় বিনা পঞ্চেন্দ্রিয়ের জ্ঞানানুভূতিতে সমগ্র সৃষ্টি সঙ্গ্রে নিজেকে একীভূত বোধ করে, তা' তৈত্তিরীয় আরণ্যে নিম্নলিখিত ভাবে বর্ণিত হয়েছে :—“অঙ্গাঽমৃতায় ছিদ্র করলে, অঙ্গুলিহীন তা'তে হতা পরালে, গলহীন সেটা গলায় পরলে আর জিহ্বাহীন তা' প্রশংসা করলে !”

করবার চেষ্টা করলে। উরুর উপর তা'র হৃদয় বিবাক্ত হল প্রবেশ করাতেই মারবার জন্তে আমি হাত উঠালুম। ভাগ্য কিন্তু তা'র ভাল। সদ্য প্রাণদণ্ড হ'তে তা'র অব্যাহতি হ'ল, কারণ ঠিক সময়মত পতঞ্জলির একটি যোগাঙ্গের বিষয় মনে পড়ে গেল—তা' হ'চ্ছে অহিংসা!

গুরুদেব জিজ্ঞাসা করলেন, “কি হে, শেষ ক'রে ফেলেন না যে?”

বললুম, “না গুরুদেব, আপনি কি প্রাণিহিংসা করতে বলেন?”

তিনি বললেন, “বলি না বটে, কিন্তু তোমার মনের মধ্যে তা'র আক্রমণ ত' এসে গিয়েছিল।”

“ঠিক বুঝতে পারলুম না।”

শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজি আমার মনের কথা যেন একটা খোলা বইয়ের পাতার মতন পড়ে নিয়ে বললেন, “পতঞ্জলির ব্যাখ্যা হচ্ছে, প্রাণবধের ইচ্ছা অবধি একেবারে দমন ক'রতে হ'বে। পৃথিবীতে অহিংসা অক্ষরে অক্ষরে পালন করার অল্পবিধা অনেক। মানুষ অবশ্য হিংস্রপ্রাণিদের বিনাশ করতে বাধ্য হ'তে পারে। কিন্তু সে রাগ বা হিংসা পোষণ করতে সেরূপ ভাবে বাধ্য নয় জীবনের বিভিন্নরূপে একই মায়ার অভিব্যক্তি। যে সাধুব্যক্তি সৃষ্টিরহস্ত ভেদ করতে সমর্থ, তিনি এর সংখ্যাভীত বিচিত্র প্রকাশের সঙ্গে একাত্মীভূত। যা'রা অন্তরে প্রাণিহিংসা দমন করতে পারেন, তাঁ'রা এর অপূর্ব অনুভূতির আন্বাদন করতে পারেন।”

“গুরুদেব, তা'হলে কি হিংস্রপ্রাণী বধ না ক'রে তা'র মুখে নিজেকে বলি দিতে হ'বে?”

“না; মানুষের দেহ অমূল্য,—কারণ এর মধ্যে অপূর্ব মস্তিষ্ক আর মেরুদণ্ডের কেন্দ্রগুলি থাকায় এর বিবর্তনের সুযোগ সব চেয়ে বেশী। এর দ্বারা যা'রা সাধনপথে বহুদূর অগ্রসর হয়েছেন, সেই যোগিরা ঈশ্বরতত্ত্বের উচ্চতম অবস্থা পরিপূর্ণভাবে হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন, আর তা' প্রকাশও ক'রতে পারেন। নিম্নস্তরের কোন প্রাণীর ত' এ ব্যবস্থা নেই। অবিশ্রি একথা সত্যি যে, কেউ যদি কোন পশু বা প্রাণী হত্যা ক'রতে বাধ্য হয়, তা'হলে তা'কে ছোট খাট পাপের ভাগী হ'তে হয়। কিন্তু বেদ শিক্ষা দেয় যে, মহন্য শরীরের স্বেচ্ছাকৃত নাশ হচ্ছে কর্মবিধির গুরুতর লঙ্ঘন।”

মুক্তির নিঃশ্বাস ফেললুম। সহজাত সংস্কারের সঙ্গে শাস্ত্রমতের অনুমোদন সব সময় পাওয়া যায় না।

অবশ্য গুরুদেবকে বাঘ বা চিতাবাঘের সামনাসামনি হ'তে কখনও নেই। কিন্তু এক কালান্তক কেউটে তাঁ'র সামনে পড়েছিল বটে, কিন্তু সেও তাঁ'র অহিংসার বলে একেবারে বশীভূত হয়ে পড়েছিল। এই জাতের সাপের লোকে দারুণ ভয় করে। একা ভারতবর্ষেই এর কামড়ে প্রতিবৎসর পাঁচছাড়া ক'রে লোক প্রাণ হারায়।

এই বিপজ্জনক পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছিল পুরীতে। এখানে শ্রীযুক্ত গিরিজির আর একটি আশ্রম আছে। জায়গাটি অতি মনোরম বঙ্গোপসাগরের কূলে অবস্থিত। প্রফুল্ল নামে একটি তরুণ শিষ্য সেই গুরুজির কাছে ছিল।

প্রফুল্ল গল্প করলে, “সে দিন আশ্রমের বাইরে এক জায়গায় আর বসে আছি। কাছেই একটা কেউটে সাপ বেরুল, চারফুট লম্বা—সাক্ষাৎ যম! রাগের চোটে ফণা তুলে সেটা তীরের মত আমাদের দিকে ছুঁ এল। গুরুদেব হেসে উঠলেন। যেন একটি ছোট ছেলেকে আদর করে ডাকছেন, তেমনি ক'রে তাঁ'র আসার সঙ্গে সঙ্গে তালে তালে হাততালি দিতে লাগলেন। মূর্ত্তিমান যমের সঙ্গে তাঁ'র খেলা! আমি ত' দারুণ ভয়ে ক' হয়ে দাঁড়িয়ে রইলুম। মনে মনে সভয়ে ইষ্টনাম জপ করছি—সাপটা ত' গুরুদেবের একদম সামনে, কোন নড়ন চড়ন নেই। তাঁ'কে নিয়ে তাঁ'র খেলানর ভাব দেখে মনে হ'লো যেন সাপটা একেবারে মস্তমুগ্ধ! সেই উঁচু ফণা ক্রমশঃ গুটিয়ে গেল,—আর সাপটা গুরুদেবের পায়ের ফাঁক দিয়ে গ' যোপের ভিতর ক্রমশঃ অদৃশ্য হয়ে গেল।

প্রফুল্ল বললে,—“গুরুদেব কেনই বা হাততালি দিলেন, আর সাপটাই তাঁ'কে কামড়াল না কেন, তা' তখন বুঝতে পারি নি। তাঁ'রপর বুঝ পেরেছিলুম যে, আমার গুরুদেবের কোন প্রাণীরই কাছ থেকে কোন রকম হিংসা বা আঘাতের আশঙ্কা ছিল না।”

আশ্রমে থাকার সময় গোড়ার দিকে একদিন বিকালবেলা দেখি শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজি খুব তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে দেখছেন।

বল্লেন, “মুন্সুন্দ, তুমি ত’ ভয়ানক রোগা।” কথাগুলো মনের খুব দুর্বল স্থানে গিয়ে আঘাত করলে। কোটরগত চক্ষু আর ক্ষীণ দেহের জন্তে মনের গহনে যে গভীর দুঃখ লুকান ছিল, তা’র প্রমাণ কলকাতায় আমার ঘরে সারি সারি টনিকের শিশি। কিছুতেই কিছু হচ্ছিল না; পুরাতন ডিসপেন্সিয়া আমার ছেলেবেলা থেকেই আঁকড়ে ধরে রয়েছে! কখন কখন নৈরাশ্য আমার এমন চরমে উঠত যে আমি তখন মনে মনে ভাবতুম যে, এমন একটা স্বাস্থ্যহীন শরীর নিয়ে বেঁচে থাকার কোন সার্থকতা আছে কি?

“ওষুধপত্রেরও একটা সীমা আছে, কিন্তু সঞ্জীবনী প্রাণশক্তির তা’ নেই! তা’তেই বিশ্বাস রেখো, তুমি একেবারে সেরে যাবে আর শরীরও খুব শক্ত হ’বে!”

শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজির কথায় সত্যের ব্যক্তিগত প্রয়োগের উপর আমার দৃঢ় বিশ্বাস দাঁড়াল যা’ আর কোন চিকিৎসক—বদিও আমি অনেককে দেখিয়েছি, আজ পর্যন্ত আমার মনে জন্মাতে পারেন নি!

দিন দিন, কি আশ্চর্য্য,—আমি যেন কূলে উঠতে লাগলুম! গুরুদেবের মৌন আশীর্ব্বাদের হুঁপা দুই পরে দেখি যে, শরীরের ওজন বেড়ে গেছে আর বেশ বলও পেয়েছি যা’ অতীতে আমার একান্ত লোভের বস্তু ছিল। বহু দিনের পুরান পেটের গোলমাল আমার চিরজীবনের মত একেবারে অন্তর্হিত হয়ে গেল। পরে বহুবার আমি গুরুদেবের বহুমূত্র, মৃগী, পক্ষাঘাত, বন্ধা প্রভৃতি সব সাংঘাতিক রোগের হাত থেকে সত্ত্ব সত্ত্ব আরাম ক’রে দেওয়ার দৈবশক্তি প্রত্যক্ষ করেছিলুম। বেঁচে মরে থাকার হাত থেকে হঠাৎ মুক্তি পেয়ে আমার আর কৃতজ্ঞতার সীমা পরিসীমা রইল না।

শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজি বল্লেন, “বহুদিন আগে আমারও মোটা হওয়ার খুব আগ্রহ ছিল। একবার এক ভারি অসুখ থেকে ওঠবার পর, কাশীতে লাহিড়ী মহাশয়ের সঙ্গে দেখা করতে গেলুম।

“বলুন, ‘মশায়, দারুণ অসুখে পড়েছিলুম, আর ভয়ানক রোগা হ’য়ে গিয়েছি।’

“তিনি বল্লেন, ‘তাইত’ দেখছি প্রিয়—তা’ তুমি ত’ নিজেই নিজের রোগ ডেকে এনেছ, আর এখন ভাবছ তুমি বড়ই রোগা!’

“যা’ আশা করেছিলুম, তা’ থেকে দেখছি যে এ উত্তরটা সম্পূর্ণ বিপরীত। যাই হোক, গুরুদেব আমায় একটু আশা দিয়ে বললেন, ‘দেখি কি হয়,—আজ যাক, কাল থেকে তুমি নিশ্চয়ই একটু একটু করে ভাল হ’তে থাকবে।’

“আমার আগ্রহাকুল মনে তাঁ’র কথাগুলি গোপনে নিরাময় হ’বার একটু ইঙ্গিত বলেই বোধ হ’ল, তাই তা’র পরদিন সকালেই বেশ একটু বেশে পেয়ে বিশেষ কিছু আশ্চর্য্য হলুম না। গুরুদেবের কাছে গিয়ে আনন্দ উল্লসিত হয়ে বললুম,—‘আজকে বেশ ভালই বোধ করছি, ম’শায়।’

“‘সত্যি নাকি ? তা’হ’লে দেখছি যে, আজকে তুমি নিজে থেকেই জেগে পয়েছ।’

“‘না গুরুদেব ! এ আপনারই দয়াতে। এই ক’ হস্তার মধ্যে দেখছি যে আজকেই যা’ একটু বল পেলাম !’

“‘হ্যাঁ, তা’ বটে ! অসুখ অবিশ্রি তোমার খুব গুরুতরই হয়েছিল, শরীর তোমার এখনও দুর্বল—তা’ কাল কি রকম হয় তা’ কে বলতে পারে ?’

“আবার দুর্বলতা ফিরে আসার সম্ভাবনার কথা ভেবে, আমার হৃৎকম্প উপস্থিত হ’ল। তা’র পরদিন ব্যাপার দাঁড়াল একেবারে বিপরীত ! অকস্টে নিজেকে ত’ কোন ক্রমে টানতে টানতে নিয়ে গিয়ে লাহিড়ী ম’শায় বাড়ী গিয়ে উপস্থিত হ’লুম।

“মশায়, আবার ত’ রোগে ভুগছি !”

“গুরুদেবের দৃষ্টি রহস্যময়। বললেন, ‘তা’ হলে ফের তুমি নিজে নিজে অসুখ বাধালে দেখছি !’ ধৈর্য্য আমার নিঃশেষিত হয়ে গিয়েছিল ; বরং ফেললুম, ‘গুরুদেব, এখন দেখছি রোজ রোজ আপনি আমায় ঠাট্টাই করে আসছেন ! সত্যিকারের খবরগুলো আপনি আমার বিশ্বাস করেন না কে তা’ ত’ বুঝতে পারি না।’

“গুরুদেব সম্মেহে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন ‘আসল ব্যাপার কি জান ? তোমার চিন্তাই তোমার একবার সবল আর একবার দুর্বল করে ফেলছে। তুমি ত’ দেখেছ যে, তোমার স্বাস্থ্য কেমন তোমার আশঙ্ক্য হ’য়ে দাঁড়ায় ! চিন্তাও হ’চ্ছে একটা শক্তি, ঠিক বিদ্যুৎ অথবা মাধ্যাকর্ষণের মত। মানুষের মন হ’চ্ছে সেই সর্বশক্তিমান ঈশ্বরচৈতন্যের একটা স্ক্রিনি

মাত্র ! আমি তোমায় দেখাতে পারি যে, তোমার শক্তিশালী মন যা কিছু দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করুক, তা'ই সত্ত্ব সত্ত্ব ঘটে যাবে !”

“লাহিড়ী মহাশয় যে বৃথা কিছু বলেন না তা' জেনে আমি সশ্রদ্ধ ও রূতজ্ঞ-চিন্তে তাঁ'কে বল্লুম, ‘গুরুদেব, আচ্ছা ধরুন, আমি যদি ভাবি যে আমি বেশ ভাল আছি আর আগেকার মত গায়ে বেশ বল পেয়েছি, তা' কি নিশ্চয় ক'রে ঘটবে ?’

“গুরুদেব আমার চোখের ওপর দৃষ্টি রেখে গম্ভীরভাবে বল্লেন, ‘নিশ্চয়ই, তা'ইই হ'বে, এই মুহূর্তেই ।’

“আশ্চর্য্য ! সঙ্গে সঙ্গে বোধ করলুম, শরীরে শুধু যে কেবল বল বাড়ল তা' নয়, ওজনও বেড়ে গেল ! লাহিড়ী মহাশয় নীরব হয়ে রইলেন । কিছুক্ষণ তাঁ'র চরণপ্রান্তে অতিবাহিত করবার পর আমি মায়ের কাছে ফিরে এলুম । কাশীতে গেলে আমি সেখানেই থাকতুম ।

“না আমার দেখে বল্লেন, ‘বাছা ! এ তোমার হ'ল কি ? এ'্যা, শোখে ফুলেছ না কি ?’ মা তা' তাঁ'র চোখ দুটোকে বিশ্বাস করতে পারছিলেন না ! শরীর এখন আমার অস্থির আগে যেমন মোটাসোটা ছিল, ঠিক তেমনটিই হয়ে দাঁড়িয়েছে !

“শরীরের ওজন নিয়ে দেখা গেল যে, একদিনেই পঞ্চাশ পাউণ্ড বেড়ে গেছি ! সেটা কিন্তু বরাবরই রয়ে গে'ল । পরিচিতির দল আর বন্ধুরা, যা'রা সব আমার রোগা শরীর দেখেছিল তা'রাও নিশ্চয়ে অবাক হয়ে আমার দিকে চেয়ে রইল । এই অলৌকিক ঘটনার ফলে তা'দের মধ্যে অনেকেই তা'দের জীবনের ধারা বদলে লাহিড়ী মহাশয়ের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিলেন ।

“সদা ব্রহ্মানন্দে মগ্ন, আমার গুরুদেব জেনেছিলেন যে, এ জগৎটা হ'চ্ছে সৃষ্টিকর্তার স্বপ্নের বাস্তবরূপ ছাড়া আর কিছুই নয় । সেই দৈব স্বপ্নবিলাসীর সঙ্গে একাত্মবোধের পূর্ণ জ্ঞানলাভ ক'রে লাহিড়ী মহাশয় এই নিখিল বিশ্বজগৎ-স্বপ্নের মধ্যে রূপদান কিম্বা তার বিলোপসাধন অথবা ইচ্ছামত যে কোন পরিবর্তন আনয়ন করতে পারতেন ।

শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজি বল্লেন, “সৃষ্টিমাত্রই বিধিনিয়মের অধীন । বাইরের জগতে যা'দের প্রকাশ, বিজ্ঞানীদের যা' আবিষ্কারের বিষয়, তা'

প্রাকৃতিক নিয়ম বলে পরিচিত। কিন্তু জ্ঞানরাজ্যে আরও সব স্থগ্ন বিধিনিয়ম প্রচলিত আছে, যা' কেবল যোগেরই অধ্যাত্মবিজ্ঞান দ্বারা জানা যায়। যে সব গুপ্ত আধ্যাত্মিক স্তর আছে সেখানেও প্রাকৃতিক আর বিধিসম্মত সক্রিয় নীতি আছে। জড়ের সত্যিকারের প্রকৃতি,—পরিপূর্ণ আত্মজ্ঞান যা' লাভ হয়েছে সেই গুরুই জানতে পারেন, জড়বিজ্ঞানী নয়। তাই যীশুখৃষ্ট তাঁ'র এক শিষ্য দ্বারা এক চাকরের কাটা কান আবার তৈরী ক'রে দিতে পেরেছিলেন।

শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজীর শাস্ত্রব্যাখ্যা ছিল অপূর্ব। আমার বহু স্মৃতি এই সব শাস্ত্র ব্যাখ্যার সঙ্গে জড়িত। তাঁ'র ভাবরত্নগুলি অমনোযোগিতা বা নিবুদ্ধিতার ভাঙ্গে ছড়ান হ'ত না। আমার শরীরের সামান্যমাত্র অস্থির অঙ্গসঞ্চালন অথবা আমার বিন্দুমাত্র অমনোযোগ দেখতে পেলেই গুরুদেবের শাস্ত্রব্যাখ্যা অমনি হঠাৎ থেমে যেত।

একদিন বিকালবেলা শাস্ত্রালোচনা চলছে, মাঝখানে হঠাৎ ব'লে বসলেন, “তোমার মন কিন্তু এখানে নেই।” কারণ, যথাপূর্ব তিনি কিন্তু আমার মনের গতি অপূর্ব তৎপরতার সঙ্গে অনুসরণ ক'রে চলেছিলেন। তবুও প্রতিবাদ করে বললুম, “গুরুজি! আমি ত' বিন্দুমাত্র নড়িনি, বা আমার চোখের পাতাটি পর্যন্ত কাঁপে নি। আপনি যা' বলেছেন তা'র প্রত্যেক কথাটি আমি আউড়ে দিতে পারি।”

“তা' হ'লেও তোমার মন সম্পূর্ণ আমার কাছে ছিল না। তোমার প্রতিবাদে আমি বলতে বাধ্য হ'লুম যে, তোমার মনের পশ্চাৎপটে তুমি তিনটি প্রতিষ্ঠানের চিন্তাধারার সৃষ্টি করছিলে। একটি হচ্ছে, সমতল ভূমির উপর তপোবনের মত, একটি পাহাড়ের মাথায় আর একটি হচ্ছে সমুদ্রের ধারে।”

ঐ সব অস্পষ্ট ভাবে গড়া চিন্তাগুলো সতিই তখন আমার অবচেতন মনে বর্তমান ছিল। ক্ষমাপ্রার্থার চক্ষে তাঁ'র দিকে তাকালুম। মনে মনে ভাবলুম,—“তাইত, এমন গুরু নিয়ে কি করে চলি, যিনি আমার এলোমেলো চিন্তারাশির মধ্যেও প্রবেশ করতে পারেন।”

গুরুজি বললেন, “তুমিই আমায় সে অধিকার দিয়েছ। যে স্থগ্নতর

আমি ব্যাখ্যা করতে যাচ্ছি, তা' তোমার সম্পূর্ণ মনোযোগ না হ'লে ধারণাই করতে পারবে না। নেহাৎ দরকার না হলে আমি কখনও অপরের মনের গহনে প্রবেশ করি না। মানুষের অবশ্য নিজ মনের চিন্তার ভিতরে গোপনে বিচরণ করবার স্বাভাবিক অধিকার আছে। কিন্তু জান কি যে ভগবানকে না ডাকলে, তিনিও সেখানে প্রবেশ করেন না। আর জেনো যে, দরকার না হ'লে আমিও সেখানে ঢুকতে সাহস করি না।”

“গুরুদেব আপনার ত' সেখানে অব্যবহিতদ্বার, আপনি সেখানে সর্বদাই স্বাগত।”

“বা'ক্, তোমার বাড়ী ঘরদুয়ের স্বপ্ন পরে সফল হবে! এখন তোমার পড়ার সময়।”

এইরূপে প্রসঙ্গক্রমে গুরুদেব আমার জীবনের তিনটি প্রধান ঘটনার বিষয় তাঁ'র নিতান্ত সহজভাবে কথাবার্তার ভিতর দিয়ে প্রকাশ করেন। প্রথম যৌবন হ'তেই তিনটি বাড়ীর রহস্যময় ক্ষীণ আভাস আমার মনের মধ্যে প্রকাশিত হয়েছিল বটে, কিন্তু তিনটিই বিভিন্ন পরিবেষ্টনীর মধ্যে। শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজি যেমন যেমনটি বলেছিলেন, ঠিক তেমনি তেমনিভাবেই পর পর এই স্বপ্নগুলো বাস্তবে পরিণত হয়েছিল।

প্রথমে এল রাঁচির সমতলভূমিতে যোগদা ব্রহ্মচর্য্য বিদ্যালয় স্থাপন। দ্বিতীয় হ'চ্ছে, লস এঞ্জেলিসের পাহাড়ের মাথায় আমার এমেরিকান হেড্ কোয়ার্টার্স, আর সব শেষ হ'চ্ছে, প্রশান্ত মহাসমুদ্রের তীরে দক্ষিণ ক্যালিফোর্নিয়ায় আশ্রম রচনা।

গুরুদেব কখনও দাস্তিকতা প্রদর্শন ক'রে বলতেন না যে, “আমি ভবিষ্যদ্বাণী ক'রে বলছি যে এরকম ঘটনা ঘটবেই!” বরং ইঙ্গিতে বলতেন যে, “তোমার কি মনে হয় না যে এরকম একটা কিছু ঘটতে পারে?” কিন্তু তাঁ'র সরল উক্তির ভিতর যেন বৈদ্যুতিক শক্তি লুকান থাকত। তাঁ'র মুখ নিঃশব্দত বাক্য কখনও প্রত্যাহত হ'ত না; ঈষৎ রহস্যচ্ছাদিত হলেও তাঁ'র কথা কিন্তু কখনও মিথ্যা হ'ত না।

শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজি প্রশান্ত গম্ভীরপ্রকৃতি এবং ব্যবহারেও খুব খাঁটি ছিলেন। তাঁ'র কোন কিছুতে অপ্পষ্টভাব বা স্বপ্নালুতা ছিল না। মৃত্তিকার

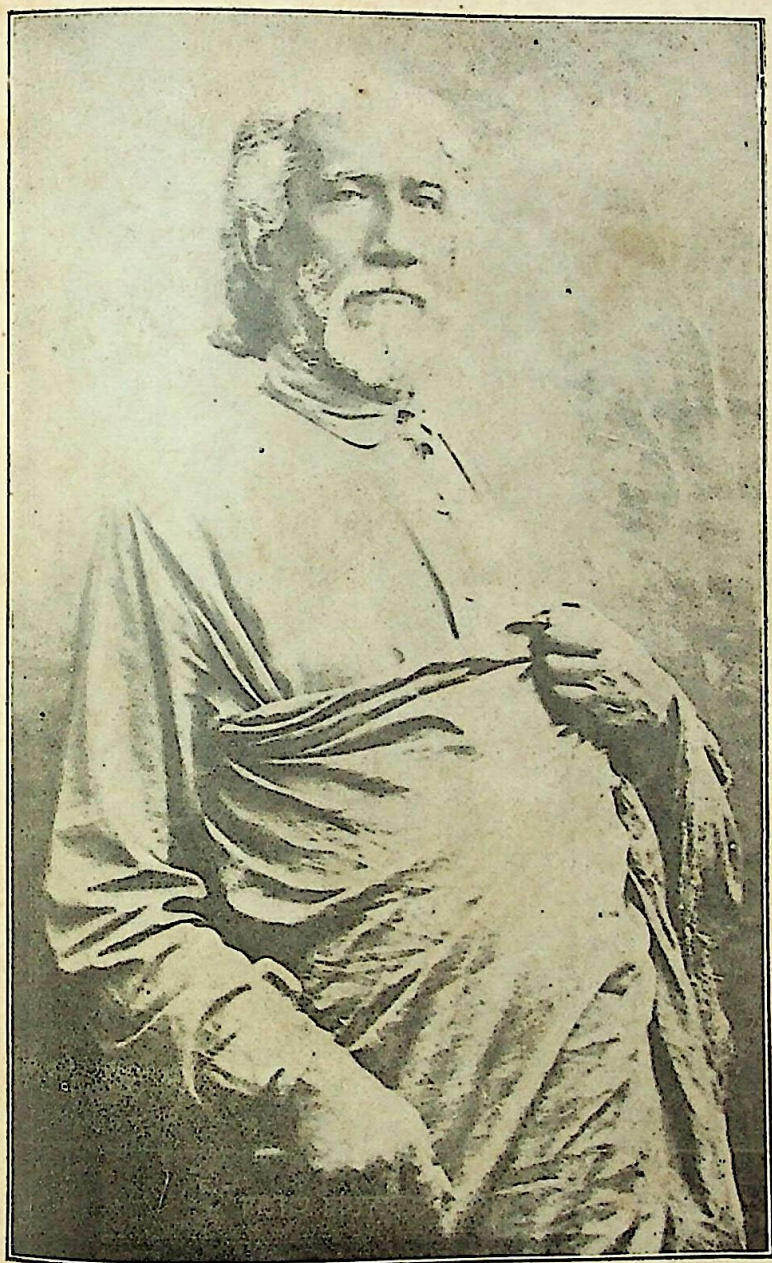
উপর তাঁ'র পদক্ষেপ দৃঢ়, মস্তক যেন স্বর্গের আশ্রয়ে উন্নত। করিৎকর্ণ, লোকদের তিনি প্রশংসাই করতেন। বলতেন, “সাধুগিরি মানে এ নয় যে, বোবা হ'য়ে থাকতে হ'বে। ঈশ্বরানুভূতি হ'লে অকর্মণ্য হ'য়ে থাকতে হয় না! সঙ্গুণাবলীর প্রত্যক্ষ প্রকাশেই তীক্ষ্ণবুদ্ধির বিকাশ হয়।”

গুরুদেবের জীবনে আমি পরিপূর্ণভাবেই আবিষ্কার করতে পেরেছিলুম যে, আধ্যাত্মিক বাস্তবতা আর রহস্যময় অতীন্দ্রিয় ভাবুকতা—যা' এর অপরাংশ বলে মিথ্যাভাবেই চলে যায়, তা'র মধ্যে একটা সংযোগ আছে। গুরুদেব জড়াতীত রাজ্যের বিষয় আলোচনায় অনিচ্ছুক! তাঁ'র একমাত্র অলৌকিক ব্যক্তিত্বের বৈশিষ্ট্য ছিল তাঁ'র অপূর্ব পরিপূর্ণ সরলতা। কথাবার্তার চিত্তচমকপ্রদ ব্যাপারের উল্লেখ তিনি একদম এড়িয়ে যেতেন। কাষে তিনি সম্পূর্ণভাবে স্পষ্ট ছিলেন। অপরে হয়ত' নানা অলৌকিক ব্যাপারের উল্লেখ করতেন, কিন্তু কাষে কিছুই দেখাতে পারতেন না। হৃদয় বিধিনিষেদ সমূহের উল্লেখ শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজি কদাচিৎ করতেন আর ইচ্ছাশক্তিবলে তা' সব গোপনেই সাধিত করতেন।

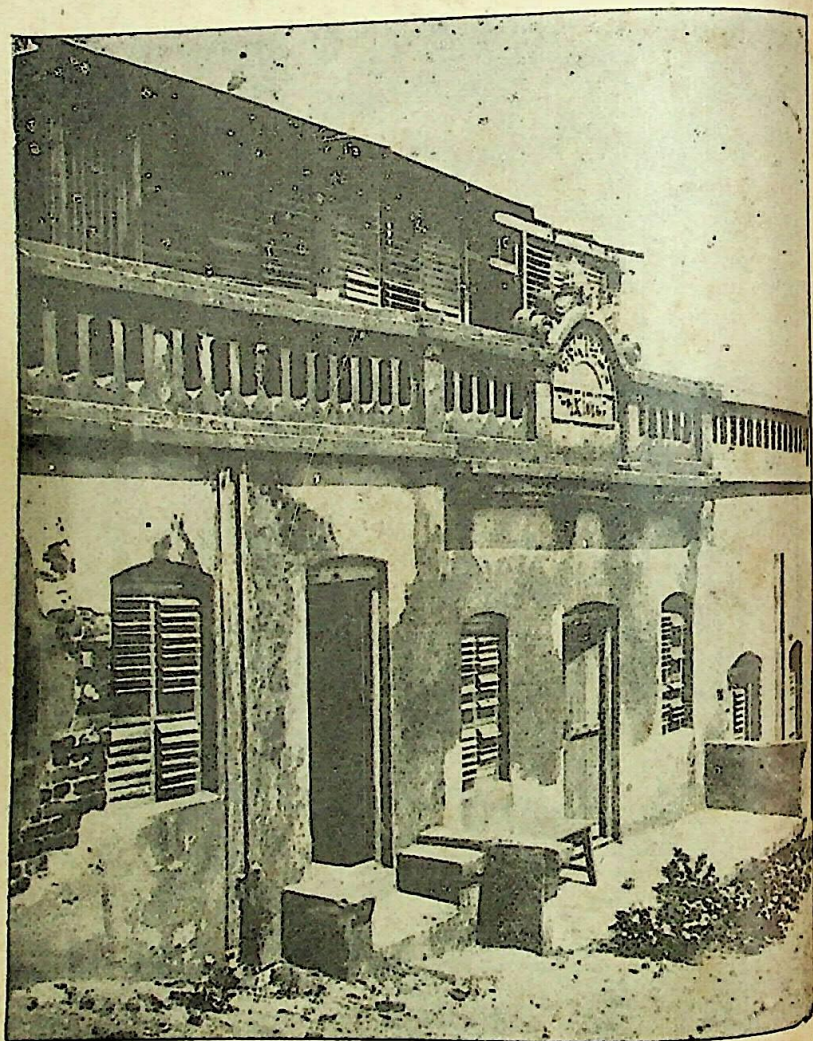
গুরুদেব বুঝালেন, “আত্মজ্ঞান যা'র লাভ হয়েছে, তিনি অলৌকিক কোন কিছু দেখান না—যতক্ষণ না মনের ভিতর থেকে কোন সাড়া না পান। ভগবান তাঁ'র সৃষ্টিরহস্য প্রকাশ করা ইচ্ছা করেন না আর তা'ছাড়া প্রত্যেক মানুষেরই ত' তা'র নিজের স্বাধীন ইচ্ছার উপর অবিসংবাদী অধিকার আছে। কোন প্রকৃত সাধু ব্যক্তি সেই স্বাধীনতার উপর কখনও হস্তক্ষেপ করেন না।

শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজির স্বাভাবিক মৌনভাব তাঁ'র গভীর ঈশ্বরানুভূতিরই ফল। আত্মোপলব্ধিহীন গুরুদের অন্তহীন অলৌকিক ব্যাপার প্রদর্শন,—যা' তাঁ'দের প্রধান অবলম্বন,—তা'র মত তাঁ'র সময় ছিল না। “অগভীর মনের জলে অল্প বিঘার শফরী খুবই ফরফরায়। কিন্তু মহাসাগরের মত মনের অতল গভীরতায় তিমির মত বিরাট অনুভূতিও কদাচিৎ কম্পন জাগায়! হিন্দুশাস্ত্রের এই অপূর্ব বাণীর ভিতর বেশ একটা হৃদয় রসবোধ আছে।

আমার গুরুদেবের নিতান্ত সরল আর অনাড়ম্বর চালচলনের জগৎ তাঁ'র সমসাময়িকদের মধ্যে অতি অল্প লোকই তাঁ'কে অতিমানব ব'লে চিন্তে



মদীর গুরুদেব—শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজা মহারাজ



পুরীতে—গুরুদেবের আশ্রম

পেরেছিল। প্রবাদ আছে যে, “যে তার জ্ঞানের বিষয় লুকোতে পারে না, সে একেবারেই মূর্থ।” এ কথা কিন্তু শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজির বিষয় বলা চলে না। আর সকল মরণশীল লোকেদের মধ্যে জন্মালেও তিনি যেন দেশ আর কালের অধিপতির সঙ্গে একাত্মীভূত হয়ে গিয়েছিলেন। তাঁ’র জীবনে আমি তাঁ’কে ঈশ্বরের সহিত একীভূত হ’য়ে যাওয়ার ভাব লক্ষ্য করেছিলুম। তিনিও মাহুঘের দেবদেউ উপনীত হ’বার পথে কোন দুর্লভ্য বাধা কখন দেখতে পান নি। আমি পরে জানতে পেরেছিলুম যে, আধ্যাত্মিক প্রেরণা বা উৎসাহের অভাব ছাড়া বাস্তবিকই এতে আর কোন বাধা নাই।

শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজির পুণ্যপাদস্পর্শে সর্বদাই আমার এক অপূর্ণ পুলকশিহরণ এসে শরীর রোমাঞ্চিত হয়ে উঠত। যোগিরা বলেন যে, গুরুর সহিত ভক্তিপূতস্পর্শে শিষ্য আধ্যাত্মিক শক্তিতে উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠেন, যেন তাঁ’র সর্বশরীরে একটা সূক্ষ্ম তাড়িতপ্রবাহ জন্মায়। ভক্তের মস্তিষ্কে অনভীপ্সিত অভ্যাসের বস্ত্রগুলি যেন প্রায়ই আগুনে পুড়ে গিয়ে পবিত্র অগ্নিশুদ্ধ হয়ে যায় আর সাংসারিক প্রবৃত্তির যে সব বিচিত্র রেখা থাকে, তা’দের মঙ্গলময় পরিবর্তন সাধিত হয়। অন্ততঃ সাময়িকভাবেও সে দেখতে পায় যে, মায়ার আবরণ অপসারিত হয়ে গেছে আর পরমানন্দের আভাস সে পেয়েছে। গুরুদেবের চরণতলে যখনই গিয়ে পড়তুম তখনই মনে হ’ত যে, আমার সর্বশরীর এক অনাবিল জ্যোতির মুক্তধারায় স্নান ক’রে উঠে এক অপূর্ণ উদ্দীপনায় পূর্ণ হ’য়ে উঠেছে।

গুরুদেব আমায় বলেছিলেন যে, “লাহিড়ী মহাশয় যখন একেবারে চুপ করেই থাকতেন অথবা খাঁটি ধর্মতত্ত্ব ছাড়া অল্প বিষয়েও কথাবার্তা কইতেন, তখনও দেখতুম যে, তিনি আমার মধ্যে এক অব্যক্ত জ্ঞানের সঞ্চার করতেন।”

শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজি আমাকেও ঐরূপ ভাবে অভিভূত করেছিলেন। তাঁ’র আশ্রমে যদি আমি কোন রকম বিব্রত অথবা চিন্তাকুল মনে প্রবেশ করতুম, আমার মনের ভাব আমার অজ্ঞাতে কখন যে বদলে যেত, তা’ টেরই পেতুম না। গুরুদেবের দর্শনমাত্রই মনের উপর একটি আরামদায়ক শান্তির প্রলেপ এসে লাগত। তাঁ’র সঙ্গে থেকে প্রতিদিনই নব নব জ্ঞান, শান্তি

আর বিচিত্র অভিজ্ঞতার স্বাদ পেতুম। তাঁকে আমি কোনপ্রকার লালসা, ভাবাবেগ, ক্রোধ বা সাংসারিক কোন আকর্ষণ বা মোহের বশীভূত হ'তে কখনও দেখি নি।

“মায়ার অন্ধকার নীরবে ঘনিষে আসছে, চল এবার অন্তরের মধ্যে প্রবেশ করা যাক।” এই কথাগুলি ব'লে সন্ধ্যার সময় তিনি শিষ্যদিগকে, তা'দের জিজ্ঞাসা যোগ সাধনের প্রয়োজনীয়তার কথা শ্রবণ করিয়ে দিতেন। মাঝে মাঝে কোন নতুন শিষ্য যোগাভ্যাসে তা'র নিজের যোগ্যতার বিষয়ে কোন সন্দেহ প্রকাশ করলে, শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজি তা'কে আশ্বাস দিয়ে বলতেন, “অতীত কথা একদম ভুলে যাও। সব লোকেরই অতীতজীবন কোন না কোন লক্ষণ বা গ্লানিতে অন্ধকার হয়ে আছে। মাছুষের প্রকৃতি যতক্ষণ পর্যন্ত ভগবানে দৃঢ়মূল হ'তে পারে, ততক্ষণ পর্যন্ত তা' সব সময়েই নির্ভরের এক অযোগ্য, বুঝলে? তুমি যদি এখন থেকেই আধ্যাত্মিক উন্নতির চেষ্টা কর, তা'হ'লে ভবিষ্যতে তোমার সর্ববিষয়েই উন্নতিলাভ হ'বে তা' হ'লে রেখো।”

আশ্রমে সব সময়েই গুরুদেবের ছোট ছোট চেলারা থাকত। তা'দের আধ্যাত্মিক শিক্ষা আর মানসিক উন্নতির বিষয়ে তাঁ'র জীবনব্যাপী আগ্রহ ছিল। এমন কি তাঁ'র তিরোভাবের অল্প কিছুদিন আগে পর্যন্ত তিনি ছ' বছরের আর একটি যোল বছরের ছেলেকে শিক্ষাদানের জন্তে প্রেরণ করেছিলেন। তিনি তা'দের জীবন ও মন এমন সতর্ক নিয়মামুখবর্তিতার পরিচালিত করতেন যে, তা'তে “শিষ্য” অর্থাৎ “যাকে শাসন করা যায়” কথটির ব্যুৎপত্তিগত অর্থ নিহিত থাকত। আশ্রমের বাসিন্দারা প্রায় তা'বেই গুরুদেবকে ভালবাসতেন আর আন্তরিক শ্রদ্ধা করতেন। একটু হাততালির শব্দেই তা'রা শশব্যস্তে এসে গুরুর সামনে দাঁড়াত, তাঁ'র আজ্ঞা সাগ্রহে পালন করত। মন যখন তাঁ'র গম্ভীর বা অগ্ৰমনস্ক থাকত তখন কিন্তু কেউ তাঁ'র সঙ্গে কথা বলতে চেষ্টা বা সাহস ক'রত না; যখন কোন কারণে আনন্দে উল্লসিত হয়ে তিনি হেসে উঠতেন, নিতান্ত দলও তখন তাঁ'কে তা'দের একান্ত আপনার জন ভেবে নির্ভয়ে এগিয়ে এসে সে আনন্দে যোগদান ক'রত।

গুরুদেব কদাচিৎ কাউকে তাঁ'র ব্যক্তিগত কোন কায ক'রে দেবার জগ্রে অমুরোধ করতেন অথবা কোন শিষ্যের কাছ থেকে কোন সাহায্যই নিতেন না, যদি না সেটা তাঁ'র আন্তরিক হ'ত। শিষ্যরা যদি কখনও তাঁ'দের কোন বিশেষ কায, যেমন গুরুদেবের বস্ত্রধোত করা প্রভৃতির বথা ভুলে যেত, তা'হ'লে তিনি নিজ হাতেই সে সব নীরবে ক'রে নিতেন। শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজি সেই চিরন্তন গেরুয়া বসনই পরতেন, আর তাঁ'র ফিতাবিহীন জুতা যোগিদের প্রথানুযায়ী বাঘের বা হরিণের চামড়ার ছিল।

গুরুদেব দ্রুত ইংরেজী, ফরাসী, হিন্দী প্রভৃতি বলতে পারতেন। সংস্কৃতেও তাঁ'র বেশ ব্যুৎপত্তি ছিল। ইংরেজী আর সংস্কৃতে তাঁ'র নিজ উদ্ভাবিত সরল পদ্ধতিতে তিনি তাঁ'র তরুণ শিষ্যদিগকে ধৈর্যের সঙ্গে শিক্ষা দিতেন।

গুরুদেব তাঁ'র শরীর সম্বন্ধে সতর্ক থাকলেও দেহের প্রতি তাঁ'র বিশেষ কোন আকর্ষণ ছিল না। তিনি বলতেন,—ভগবান শারীরিক এবং মানসিক সুস্থতার ভিতর দিয়েই উপযুক্ত ভাবে প্রকাশিত হন। কোন কিছু আতিশয্য তিনি পছন্দ করতেন না। একবার এক শিষ্য খুব লম্বা এক উপবাস সুরু ক'রেছিল। তা'ই না দেখে গুরুদেব হেসে বললেন, “আহা, ওটাকে একমুঠো কেউ খেতে দাও না কেন?”

শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজির স্বাস্থ্য খুব চমৎকার ছিল। আমি তাঁ'কে কখনও অসুস্থ হ'তে দেখি নি।* অবশ্য দরকার হ'লে তিনি শিষ্যদের ডাক্তার ডাকতে দিতেন। তাঁ'র জীবনের উদ্দেশ্য ছিল সাংসারিক বিধি মেনে চলা। তিনি বলতেন, “চিকিৎসকেরা তাঁ'দের রোগ নিরাময়করণ ব্যাপারে ঈশ্বরের প্রাকৃতিক নিয়ম মেনে চলবেন।” কিন্তু তিনি মানসিক শক্তির সাহায্যে রোগ সারানার চেষ্টার শ্রেষ্ঠত্বের প্রশংসা করতেন, আর প্রায়ই বলতেন,— “জানই হচ্ছে শ্রেষ্ঠ শুদ্ধিকারক আর নিরাময়কারী।”

বলতেন, “শরীরটা কি জান? ও হচ্ছে তোমার বিশ্বাসঘাতক বন্ধু! ঠিক যেটুকু দরকার সেইটুকুই দেবে, তা'র একটুও বেশী নয়। সুখদুঃখ ক্ষণস্থায়ী এ সব কিছু একটারই আরেক পিঠ। ধীরভাবে সব সহ ক'রে যাবে, আর সঙ্গে সঙ্গে তা'দের হাত এড়াবার চেষ্টা করবে। কল্পনার দুয়ার দিয়েই রোগ

* কাগ্মীরে তিনি একবার অসুস্থ হ'য়ে পড়েন। সে সময় আমি তাঁ'র কাছে ছিলাম না।

আর তা'র নিরাময় এ দুইই প্রবেশ করে। অসুস্থ হয়ে পড়লেও তোমার কোন অসুস্থই হয়েছে, তা' বিশ্বাস কোরো না, তা'হ'লেই রোগ একেবারে পালাবে।" গুরুদেবের শিষ্যদের মধ্যে ডাক্তার সংখ্যার অনেকগুলি ছিলেন। তিনি তাঁদের বলতেন, "ধা'রা জড়জগতের নিয়মকানুন বার করেছেন, তাঁরা আত্মদর্শনের বিজ্ঞান সহজেই চর্চা করতে পারেন। কারণ শারীরিক গঠনে পিছনে একটি সুস্থ আধ্যাত্মিক যন্ত্র লুকোন আছে।" †

শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য গুণাবলীর আধার হ'বার জন্য শিষ্যদের সর্বদাই উপদেশ দিতেন। বাইরের আচার ব্যবহারে তিনি নিজে একজন সক্রিয় পাশ্চাত্যভাবাপন্ন হ'লেও, অন্তরে তিনি প্রাচ্য অধ্যাত্মবাদী ছিলেন। প্রতীচ্যের প্রগতিশীল, প্রয়োজনীয় আর স্বাভাসম্মত অভ্যাসে তিনি প্রশংসা করতেন, কিন্তু প্রাচ্যের বহু শতাব্দীর গৌরবচ্ছটাগতি জ্ঞানভাস্বর ধর্মের বিকাশই তাঁর জীবনাদর্শ ছিল।

নিয়মানুবর্তিতা অবশ্য আমার কাছে অপরিচিত ছিল না। বাড়ীতে পিতার শাসন ছিল কঠিন, অনন্তদা'ও প্রায়ই কড়া হ'তেন। কিন্তু শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজির শিক্ষা "দারুণ" ছাড়া আর কিছু বলা যায় না। নিখুঁতভাবে আমার গুরুদেব তাঁর শিষ্যদের সম্বন্ধে অতিমাত্রায় সচেতন ছিলেন, তা'র সাময়িক প্রয়োজনে, আর কি আচার ব্যবহারে সুক্ষতা রক্ষা ক'রে চলতে।

† শারীরতত্ত্বে নোবেল প্রাইজ প্রাপ্ত, নির্ভীক চিকিৎসক, চার্লস রবার্ট রিশে লিখেছেন "লোকত: অধ্যাত্মবিদ্যা বিজ্ঞান বলে এখনও পরিচিতি লাভ করতে পারে নি। কিন্তু এ শীঘ্রই হবে। এডিনবারাতে প্রায় একশত শারীরতত্ত্ববিদের সামনে আমি প্রমাণ করতে দা' হয়েছিলুম যে, আমাদের পক্ষেদ্রিয়ই যে জ্ঞানলাভের এক মাত্র উপায় তা' নয়, আর আংশিক দর্শন অন্ত্যন্ত উপায়ে উপলব্ধি করা যায়। কোন সত্য দুঃখিগম্য বলতে এ বোঝায় না যে, দৈব অস্তিত্ব একেবারেই নাই। কোন বিদ্যা কঠিন বলে কি সেটা অগিগত না করাটাই হবে তা একমাত্র যুক্তি? কিমিয়বিদ্যাকে পরশমণির অনুসন্ধানের কারণে নিযুক্ত বলে ভ্রান্তিমূলক আর ভুল বলে উপহাস করার মতন অধ্যাত্মতত্ত্বকে ধা'রা একটা গুপ্তবিদ্যা বলে উপহাস করেন, তাঁদের নাকি হওয়া উচিত। নীতি বিষয়ে সেখানে ল্যাভয়সিয়ে, রুড বার্নার্ড, আর পাস্তুর—সর্বদা এবং সর্বদা আছেন, পরীক্ষামূলকভাবে। মানবচিন্তার ব্যাখ্যার পরিবর্তনকারী এই নূতন বিজ্ঞানকে ধা'র জ্ঞানচিহ্ন।"

কোন উপলক্ষ্য হ'লে, উপযুক্ত ক্ষেত্র পেলেই তিনি বলে বসতেন, “আন্তরিকতা ছাড়া ভদ্র ব্যবহার যেন প্রাণহীন। একটি সুন্দরী স্ত্রী। ভব্যতা ছাড়া সরলতা যেন ডাক্তারের ছুরি আর কি, কাষ দেয় বটে কিন্তু অপ্রীতিকর। ভব্যতার সঙ্গে সরলতা যুক্ত হ'লে তবেই সেটা কাষ দেয়, আর সেইটাই প্রশংসনীয়।”

গুরুদেব আমার আধ্যাত্মিক উন্নতিতে আপাতদৃষ্টিতে সন্তুষ্টই ছিলেন, কারণ কদাচিৎ তিনি সে বিষয়ে উল্লেখ করতেন। অত্যাশ্রিত বিষয়ে কিন্তু তাঁ'র বকুনির হাত থেকে আমার রেহাই ছিল না। আমার প্রধান অপরাধ ছিল অশ্রমশ্রুতা, কখনও কখনও বিষম্ব হয়ে প'ড়া, ভব্যতার কতকগুলো নীতি লঙ্ঘন, আর মাঝে মাঝে অনিয়মিত ভাবে চলা।

উপদেশচ্ছলে একদিন গুরুদেব বললেন, “দেখ, তোমার বাবা ভগবতী-বাবুর কাযকর্ম্মে সব দিকেই কেমন একটা স্মৃশ্খলা আর স্মসমঞ্জস ভাব আছে।” শ্রীরামপুরে বাবার অল্প কয়েকদিন পরেই লাহিড়ী মহাশয়ের এই শিষ্যদ্ব'টির একদিন সাক্ষাৎ হ'ল। পিতা আর শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজি পরস্পর পরস্পরের মহিমাকীর্তনে উল্লসিত। উভয়েরই অন্তর্জীবন কঠিন আর সুদৃঢ় আধ্যাত্মিক শিলাভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত—যা' কোন যুগেই বিলুপ্ত হ'বার নয়।

আমার বাল্যজীবনের স্বল্পকালের শিক্ষকদের কাছ থেকে কতকগুলো ভুলশিক্ষা আমি পেয়েছিলুম। শুনেছিলুম, চেলাদের সাংসারিক কর্তব্য স্তম্ভভাবে সম্পন্ন করার জন্তে প্রাণপণে চেষ্টা করবার কোনই প্রয়োজন নাই। আমার করণীয় কাযগুলো যখন অবহেলা করতুম বা অযত্নে তা' শেষ করতুম, তখন কিন্তু আমি তিরস্কৃত হই নি। মানুষের প্রকৃতি কিন্তু স্বাভাবিক ভাবেই এ রকম ফাঁকি দেওয়া শিক্ষা অতি সহজেই গ্রহণ করে। কিন্তু গুরুদেবের কাছে এসে ফল হ'ল বিপরীত। তাঁ'র অবিরত কঠিন শাসনের ফলে আমি অতি শীঘ্রই আরামদায়ক দায়িত্বহীনতার মোহ থেকে মুক্ত হ'তে পেরেছিলুম।

শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজি বলতেন, “ধা'রা এ জগতের পক্ষে অতিশয় ভাল, তাঁ'রা অল্প কোন জগৎ অলঙ্কৃত করছেন। যতদিন তুমি এ জগতের মুক্ত বায়ুতে বেঁচে আছ, ততদিন পর্য্যন্ত তা'র প্রতিদানে তোমার কর্তব্য অবশ্যই আছে।

যিনি একেবারে বিগতস্বাস হ'তে পেরেছেন, তাঁ'র আর কোন সাংসারিক কর্তব্য নেই। তোমার পূর্ণজ্ঞান লাভ হ'লে তা' আমি বলতে ভুলব না, জেনো।" গুরুদেবকে ভালবাসা দিয়েও অগ্নায়ভাবে বশ করা যেত না। আমার মত স্বেচ্ছায় যা'রা তাঁ'র শিষ্য গ্রহণ করেছিলেন, তাঁ'দের প্রতিও তিনি কোন দুর্বলতাই প্রদর্শন করতেন না। গুরুদেব আর আমি, কি শিষ্যদের দ্বারা, কি অপরিচিত লোকেদের দ্বারা বেষ্টিত, কি একাকী থাকলেও সর্বদা সোজাভাবেই কথাবার্তা বলতেন, আর দরকার হ'লে তীক্ষ্ণভাবে তিরস্কার করেও বসতেন। তুচ্ছ লঘু বা অসংলগ্ন ভাবের কোন কিছু দেখলে তা'ও তাঁ'র বকুনির হাত হতে রেহাই পেত না। এই রকমে সোজা করবার রাস্তা বাস্তবিকই বরদাস্ত করা অত্যন্ত কঠিন ছিল। কিন্তু আমারও দৃঢ় পণ ছিল যে, আমার প্রত্যেক মানসিক বক্রতা শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজির শাসনকঠোর হস্তেই সরল হবে। এই রকমে আমার বিরাট পরিবর্তন সাধন করবার সময় বহু-বারই আমায় তাঁ'র শাসনদণ্ডের তলায় মাথা পেতে দাঁড়িয়ে কম্পান্বিত হ'তে হয়েছিল। গুরুদেব বলতেন, "আমার যদি কোন কথা তোমার পছন্দ না হয়, তবে যে কোন সময় তুমি চলে যেতে পার। তোমার উন্নতি ছাড়া আমি আর কিছু চাইনে,—মনে হয় যদি উপকার হ'চ্ছে, তবে থাকতে পার।"

আমার প্রত্যেক অহমিকা চূর্ণ ক'রে দেবার দারুণ আঘাতের জন্ত তাঁ'র কাছে আমার কৃতজ্ঞতা সত্যিই ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। মাহুঘের অহং-ভাবের কঠিন "আঁটি" দারুণ আঘাত ছাড়া বে'র করে দেওয়া সত্যিই দুঃসাধ্য। এ দূর হ'লে তবেই সব বাধা দূর হয়ে ঈশ্বরবির্ভাবের পথ প্রশস্ত হয়ে পড়ে। ভগবান বৃথাই আত্মাভিমানীর কঠিন প্রস্তরহৃদয়ের মধ্য দিয়ে আসবার পথ খুঁজে মরেন!

শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজির জ্ঞান এত সুদূরপ্রসারী ছিল যে কোন মন্তব্যে কর্ণপাত না ক'রে, তিনি প্রায়ই কারুর না কারুর অনুক্ত ধারণার ঠিক যথাযথ উত্তর দিয়ে দিতেন। তিনি বলতেন, "লোকে শুনে যা মনে করে, আর বক্তা যা' সত্যিই মনে ক'রে বলছে, তা'র মধ্যে আকাশ পাতাল তফাৎ থাকতে পারে। কথাবার্তার পিছনে প্রকৃত ভাব কি আছে, তা' সত্যি ক'রে বোঝবার চেষ্টা কো'রো।"

কিন্তু সংসারের কাণে ঐশ্বরিক অন্তর্দৃষ্টি বা তাঁর জ্ঞানের কথা কটুই লাগে। লব্ধপ্রকৃতি শিষ্যদের কাছে গুরুদেব প্রিয় ছিলেন না। প্রকৃত জ্ঞানী—অবশ্য সংখ্যায় তাঁরা খুব অল্পই ছিলেন, তাঁকে গভীরভাবে শ্রদ্ধা করতেন। আমি মুক্তকণ্ঠে বলতে পারি যে, শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজি ভারতবর্ষের মধ্যে সর্বাপেক্ষা কাঙ্ক্ষিত গুরু হ'তে পারতেন, যদি না তাঁর কথাগুলি এত সোজা আর তিরস্কারমূলক না হ'ত।

তিনি আমার কাছে স্বীকার করেছিলেন,—“আমার কাছে যাঁরা শিক্ষা নিতে আসে তাঁদের ওপর আমি কড়া বটে, কিন্তু এইটাই হ'চ্ছে আমার প্রকৃতি। থাকতে হয় থাক, না হয় পথ দেখ। আমার সঙ্গে কোন আপোষ-রফা নেই। তুমি কিন্তু তোমার শিষ্যদের কাছে খুবই সদয় হবে, কারণ ঐটেই হ'বে তোমার প্রকৃতি। আমি কেবলমাত্র কঠিন শাসনের আশ্রয়ে পুড়িয়ে শুদ্ধ করতে চেষ্টা করি, যা সাধারণের সম্বন্ধে সীমার বাইরে। অবশ্য ভালবাসার মৃদুকোমল আবির্ভাবও পরিবর্তন আনে। কঠিন কোমল দু'রকম প্রণালীতে একই রকম ফল পাওয়া যায়, অবশ্য যদি দ্বিবিচারের সঙ্গে প্রয়োগ করতে পারা যায়। তোমার বিদেশে যেতে হবে, যেখানে আত্মাভিমানের ঘা লাগা কেউই পছন্দ করবে না। কোন গুরুরপক্ষে প্রতীচ্যে ভারতের অমরবাণী প্রচার করা প্রচুর অবিচলিত ধৈর্য্য আর সহনশীলতা ব্যতিরেকে সম্ভবপর নয়।” গুরুদেবের কথাগুলিতে কি পরিমাণ সত্য যে নিহিত ছিল, তা আর এখন বলা অনাবশ্যক!

শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজির অপ্রিয়ভাবের দরুণ যদিও তাঁর জীবিতকালে বহুসংখ্যক শিষ্য হয় নি, কিন্তু তাঁর আত্মার প্রাণবন্ত বিকাশ, ক্রিয়াযোগ সাধন এবং অত্যাশ্চর্য শিক্ষায় তাঁর অল্পরক্ত ভক্তশিষ্যদের মধ্য দিয়েই সারা জগতে প্রচারিত। আলেকজান্ডার মাটির ওপর যা স্বপ্নেও ভাবতে পারেন নি, তাঁর চেয়েও বেশী স্থান, শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজি মাজুঘের অন্তরে অধিকার ক'রেছিলেন।

পিতা একদিন শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজিকে দর্শন করতে এলেন। স্বভাবতঃই তিনি আশা ক'রে এসেছিলেন যে, আমার প্রশংসার কথাই তিনি নিশ্চয় শুনতে পাবেন। কিন্তু ও হরি! যা শুন্লেন, তাতে তাঁর সব আশা একে-

বারে নিশ্চল হ'ল। আমার কর্তব্যচ্যুতির একটি বিরাট তালিকা পেয়ে তিনি ত' দস্তুর মত ভড়কে গেলেন। গুরুদেবের কিন্তু এ অভ্যাস ছিল—নেহাৎ তুচ্ছ, বা' ধর্ভব্যের মধ্যেই নয়, এমন সব সামান্য দুর্বলতা বা নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর ঘটনারও উপর একটা বিরাট গুরুত্ব আরোপ ক'রে তা' বিশদরূপে বর্ণনা করা। পিতা ত' শুনে একেবারে দৌড়ে আমার কাছে এলেন। হাসি-কান্নার মধ্য দিয়ে বললেন, “তোমার গুরুর কথা শুনে ত' ভেবেছিলুম যে, তোমার একেবারে দফারফা হয়ে গেছে!”

সেই সময়ে শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজির আমার প্রতি অসন্তোষের একমাত্র কারণ ছিল যে, তাঁ'র মূহু ইঙ্গিত সত্ত্বেও জৈনিক ব্যক্তিকে আমি আধ্যাত্মিক পথে নিয়ে আসবার চেষ্টা করছিলুম।

রাগের চোটে ত' গুরুদেবের কাছে দৌড়লুম। সামনে গিয়ে দাঁড়াতেই দেখলুম যে, তাঁ'র চোখ দু'টি মাটির দিকে নামান, যেন তিনি নিজ দোষ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সচেতন। এই একটিবার মাত্র সেই বিরাট অধ্যাত্মজগতের সিংহকে আমার সামনে নিতান্ত শাস্ত ও নিরীহভাবে দেখলুম। পরম উপভোগ্য সেই অপূর্ণ ক্ষণ! জিজ্ঞাসা করলুম, “ম'শায়, বাবার সামনে আমার নিশ্চয়ভাবে এমন সব কথা কেন বললেন? এটা কি ঠিক হয়েছে?”

“আচ্ছা, আর কখনও বলব না।” গুরুদেবের স্বর অন্ততপ্ত, যেন ক্ষমা-প্রার্থনাসূচক। তখনই আমার সব অভিমান যুচে গেল। কত শীগ'গির সেই বিরাট মানুষটি তাঁ'র সামান্য দুর্বলতাটুকুও স্বীকার ক'রে নিলেন! যদিও তিনি আর কখনও পিতার মনের শাস্তির লাঘব ঘটান নাই, তবুও তিনি যখনই হো'ক, আর যেখানেই হো'ক আমায় খণ্ড খণ্ড ক'রে নিশ্চয়ভাবে বিশ্লেষণ ক'রে চলতেন; তা' থেকে আর আমার কিছুমাত্র রেহাই ছিল না।

নতুন শিষ্যরা এসে গুরুদেবের সঙ্গে অপরের সম্বন্ধে অব্যবহিত আলোচনা শুরু করতেন। গুরুদেবের মতই সব মহা মহা জ্ঞানী আর কি! ভাবতেন, যেন তাঁ'রা নিজেরা সব নিভুল ভালমন্দবিচারের এক একটি আদর্শ! কিন্তু বা'রা আক্রমণ করেন, তাঁ'দের নিজেদেরও আত্মরক্ষার ক্ষমতা থাকা চাই ত'! তাঁ'রাই আবার গুরুদেবের কাছ থেকে প্রকাশ্যে কঠিন সমালোচনার দু' চারটি চোখা চোখা বাণ খেয়ে একেবারে পিঠটান দিতেন।

“অন্তরের দুর্বলতা হচ্ছে মৃদু স্পর্শে কাতর শরীরের ব্যাধিগ্রস্ত স্থানের মত, সামান্য তিরস্কারের একটু ছোঁয়া লাগলেই একেবারে তা’তে পেছিয়ে যায়।” এই ছিল শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজির পলাতক শিষ্যদিগের প্রতি শ্লেষোক্তি।

অনেক শিষ্য ছিলেন, যাঁরা গুরুকে তাঁ’দের নিজেদেরই প্রতিচ্ছবি ব’লে দেখতে চাইতেন, কাষেই গুরুদেবকে তাঁ’রা বুঝতে পারতেন না ব’লে অভিযোগ করতেন।

আমি একবার বলেছিলুম, “ঈশ্বরপ্রণিধান তোমাদের দ্বারা হ’বার নয়। সাধুসন্ন্যাসীদের জলের মত পরিষ্কার বুঝে নিতে পারলে ত’, তোমরাই তা’ হয়ে গেলে।” লক্ষকোটি রহস্ত্রে আবৃত অবর্ণনীয় ভাব যাঁর প্রতিমূর্ত্তেই, সেই রকম গুরুর গহন প্রকৃতিকে কে এক কথায় বুঝে নিতে পারে ?

কত শিষ্য এল গেল। যাঁরা একটু চাটুর্ভুতির ভাব বা সহজে নাম জাহির করা চাইত, তাঁরা তা’ এ আশ্রমে পেত না। গুরুদেব বহুলোকের জন্ত আশ্রয় ও তাঁ’র অধীনে তা’দের শিক্ষা দান করতেন ; কিন্তু বহুশিষ্যই রূপণের মত তা’দের আত্মতৃপ্তিই খুঁজত। নতিস্বীকার করার চেয়ে জীবনের অসংখ্য দীনতা আর হীনতা বরণ করেই তাঁরা প্রস্থান করত। গুরুদেবের জ্ঞানের অতুল্য আলোকের তেজ তা’দের আধ্যাত্মিক দুর্বলতার পক্ষে নিতান্তই দুর্বিসহ ছিল। তাঁরা খুঁজত অপেক্ষাকৃত আরও সাধারণ গোছের গুরু, যাঁরা মিঠে তোলাজের বুলিতে তা’দেরকে অজ্ঞানের মোহনিদ্রায় ঘুম পাড়িয়ে রাখতে পারতেন।

গুরুদেবের সঙ্গে থাকার সময় আমার প্রথম কয়েকমাস বকুনি খাবার ভয়ে ভয়ে কাটাতে হয়েছিল। শীগগিরই আমি টের পেলাম যে, যে সব শিষ্যরা তাঁ’র কেবল মৌখিক বিশ্লেষণ খুঁজত, তা’ তা’দের জন্তেই তোলা থাকত। কোন যজ্ঞপাক্ষিষ্ট শিষ্য তা’র প্রতিবাদ করলে, শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজি সে জন্তে কিছু মনে করতেন না, শুধু চুপ করে যেতেন। তাঁ’র কথায় কোন ব্যক্তিবিশেষের প্রতি ক্রোধ প্রকাশ পেত না। তাঁ’র সার কথাগুলি সব জ্ঞানগর্ভই হ’ত।

গুরুদেবের গভীরজ্ঞান কোন সাময়িক আগন্তুকের অনিচ্ছুক কর্ণে বিতরিত হ’বার জন্তে প্রকাশ পেত না। অত্যন্ত প্রবল হয়ে দেখা গেলেও,

তিনি কারুর কোন দোষ প্রকাশ্যভাবে দেখিয়ে দিতেন না। কিন্তু শিষ্য তাঁর উপদেশ সশ্রদ্ধভাবে গ্রহণ করতে আসত, তা'দের জন্তে গুরুদারিত্বের ভার গ্রহণ করতেন। একমাত্র সেই গুরুরই অসীম ক্ষমতা যিনি মানবমনের অহংভাবের কাঁচামাটি থেকে তা'কে সর্বাঙ্গীন্দ্র ক'রে গড়ে তুলতে পারেন! খাঁটি সাধুসন্ন্যাসীদের শক্তির পরিচয় হচ্ছে এ জগতের জ্ঞানান্ধদের চক্ষু ফুটিয়ে তোলা।

মনের ভিতরকার খুঁতখুঁতানি ছেড়ে দিতে দেখা গেল যে, আমি বকুনি খাওয়া একদম কমে গেছে। অত্যন্ত সন্তোষে গুরুদেব যেন আমার প্রতি অপেক্ষাকৃত আরও কোমল হ'য়ে উঠলেন। কালে আমি সব রকম তর্কের বেড়া আর আমার অবচেতন মনের গোপন ধারণা সবই ভেঙে সাধারণতঃ যা'র আড়ালে মানুষের ব্যক্তিত্ব বা তা'র আসল রূপটি লুপ্ত থাকে। তা'র পুরস্কার লাভ হ'ল এই যে, গুরুর সঙ্গে আমি যেন এক হয়ে গেলুম। তখন দেখলুম যে তিনি সুবিবেচক, আমার পরম নির্ভরস্থল, আমার প্রতি তাঁর স্নেহের ফলস্বরূপ তাঁর অন্তরের অন্তঃস্থলে একান্ত সন্তোষ বয়ে চলেছে। বাইরে কিন্তু সে স্নেহের কোনরকম প্রবল প্রকাশ বা অন্যর উচ্ছ্বাস নাই।

আমার মনের ধারণা ছিল প্রধানতঃ ভক্তিপ্রবণ। প্রথমতঃ দেখে আমি বুঝতে পারি নি যে যিনি পূর্ণজ্ঞান লাভ করেছেন, তাঁর কেন কোন ভক্তির ছিটেকোঁটাও নাই! কেবল যেন জ্ঞানরাজ্যের গুরু কঠোর নিকাশ দিয়েই তিনি নিজেকে প্রকাশ করেন। তাঁর প্রকৃতির সঙ্গে এক বাঁধা হ'লে দেখতে পেলুম যে, ভক্তিপথে কোথাও বাঁধা নেই—আমি এগিয়ে যাচ্ছি। আত্মজ্ঞানসমাহিত গুরু তাঁর শিষ্যদিগকে তা'দের নিজ বিশিষ্ট প্রকৃতির ঝোঁক অনুযায়ী চালিয়ে নিতে পারেন।

শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজির সঙ্গে আমার সম্বন্ধ যেন কতকটা অস্পষ্টগোছের কিন্তু তবুও তা' ছিল বেশ মুখর। প্রায়ই দেখা যেত যে, আমার চিন্তাধারার তাঁরও ভাববৈশিষ্ট্যের নীরব ছাপ পড়েছে, যা'তে কোন ভাবার দাবী করে না। নীরবে তাঁর পাশে বসে দেখতুম যে, তাঁর অবাচিত দান সহস্রধারায় আমার সকল সত্ত্ব পরিপ্লাবিত ক'রে তুলেছে।

কলেজে ঢোকান প্রথম বছরেই শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজির নিরপেক্ষ বিচারের একটা প্রকৃষ্ট উদাহরণ দেখতে পেয়েছিলুম। একটানা ছুটিটা শ্রীরামপুরে গুরুর চরণতলে কাটিয়ে দেবার স্বযোগ ত্যাগ করতে পারি নি।

আশ্রমে প্রবল আগ্রহ আর উৎসাহ নিয়ে পৌঁছতেই খুসী হয়ে গুরুদেব বললেন, “দেখ আশ্রমের সব ভার তোমার ওপর। তোমার কাষ হবে অতিথিরা এলে তা’দের অভ্যর্থনা করা আর অল্প সব শিষ্যদের কাষের তদারক করা।”

দিন চৌদ্দ পরে পূর্ববঙ্গ থেকে কুমার নামে একটি শিষ্য এল আশ্রমে শিক্ষালাভের জন্ত। অত্যন্ত বুদ্ধিমান ব’লে সে শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজির স্নেহ শীগ্গিরই আকর্ষণ করে নিলে। কোন অজ্ঞেয় কারণে গুরুজি নতুন নাসিন্দাটির প্রতি অত্যন্ত স্নেহপ্রবণ ছিলেন।

মাসখানেক কুমার থাকবার পর গুরুদেব একদিন আমায় হুকুম করলেন, “মুকুন্দ, কুমার তোমার কাষ করুক আর তুমি তোমার নিজের সময়টুকুতে রাঁধাবাড়া আর বাঁটপাট দিও।”

পদোন্নতি হওয়াতে কুমার ত’ আশ্রমের মধ্যে ছোটখাট বেশ একটি মত্যাচারের ঝড় বইয়ে দিলে। নীরব বিদ্রোহে অগ্নাগ্ন শিষ্যেরা সব রোজই কুমার কাছে কি করা যায় তা’র পরামর্শ চাইতে আসত।

হুগা তিনেক বাদে একদিন পাশের ঘর থেকে শুন্তে পেলুম যে কুমার গুরুদেবের কাছে নালিশ করছে, “মুকুন্দকে নিয়ে আর পারা যায় না! আপনি আমায় দেখাশোনার ভার দিলেন, কিন্তু তবুও আর সব শিষ্যেরা কবল তা’রই কাছে যায়, আর তা’র কথাই মানে।”

“সেইজন্মেই ত’ আমি তা’কে হেঁসেলে পাঠিয়েছি, আর তোমায় বৈঠক-নায়।” শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজির আজকের কঠিন স্বর কুমারের কাছে একে-রেই নূতন। “এইতেই ত’ তুমি বুঝতে পেরেছ যে উপযুক্ত দলপতি যে হয়, তা’র কেবল কাষ করতেই ইচ্ছে যায়, কারুর ওপর কর্তৃত্ব করতে নয়। তুমি কুমারের জায়গা চেয়েছিলে কিন্তু নিজের গুণে তা’ রাখতে পারলে না। এখন তা’র রাঁধুনির যোগানদার হয়ে আগেকার কাষে ফিরে যাও।”

এই রকমে তা’কে খাটো ক’রে দেবার পরই কিন্তু কুমারের প্রতি গুরুদেবের আগেকার মত অবাধ প্রশ্ন আর আবার বেড়ে গেল। আকর্ষণের রহস্য

কে ভেদ করতে পারে? কুমারের ভিতর আমাদের গুরুদেব দেখা পেয়েছিলেন একটি মধুর উৎস, সেটা কিন্তু অপর সহশিষ্যদের দিকে উৎসাহ হয়ে উঠত না। নতুন ছেলেটি যদিও শ্রীবুদ্ধেশ্বর গিরিজির খুবই প্রিয় ছিল কিন্তু তা'তে আমার কোন আশঙ্কা হয় নি। গুরুদেরও ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্যে জীবনে নানা গুরু বৈচিত্র্য জাগিয়ে তোলে। আমার জীবনে খুঁটিনাটি কিছু কিছু স্থান পেত না। গুরুদেবের কাছ থেকে আমি আরও দুই জিনিষ লাভের সন্ধানে ছিলাম—বাইরের কোনপ্রকার স্নেহাতিশয়া, প্রশংসা নয়।

বিনা কারণেই কুমার একদিন আমার প্রতি বিবোধগার ক'রে কতকগুলি কথা বললে। মনে বড়ই আঘাত পেলুম।

“তোমার মাথা যা' ফেঁপে উঠেছে এবার তা' ফাটল বলে!” মনে এঁর বাথার্থ্য আর তা'র অবগুণ্ঠ্যাবী পরিণাম বুঝে তা'কে সাবধন ক'রে দেবার জন্তে বললুম—“তোমার চালচলন এবার একটু শোভা বুঝলে হে, তা' না হ'লে একদিন না একদিন তোমায় এ আশ্রম থেকে পাততাড়ি গুটোতে হবে।”

বিজ্ঞপের হাসি হেসে কুমার আমার কথাগুলো সব গুরুজিকে বলে দিলে তখন তিনি ঘরে এসেই ঢুকছিলেন। খুব একচোট বকুনি খাবার ভয়ে ঘরের একটা কোণে গিয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলুম।

গুরুদেব শুধু এই ক'টি কথা বললেন,—“হয়ত' মুকুন্দর কথাই ঠিক। কণ্ঠস্বর তাঁ'র অস্বাভাবিক নীরস। যা'ক, বকুনির হাত থেকে এড়ান গেল।

বছর খানেক পরে কুমার গুরুদেবের নীরব অনিচ্ছা উপেক্ষা করেই গ্রামের বাড়ীতে বেড়াতে গেল। তিনি কখনও শিষ্যদের চলাফেরার উপর কোন অনাবগুণ কণ্ঠস্বর প্রকাশ করতেন না। মাসকতক পরে ছেলেটি শ্রীরামপুরে ফিরে আসতেই একটা অপ্রিয় পরিবর্তন দেখা গেল। অমন রাজোচিত সৌম্যমূর্তি কুমার, তা'র জলজলে মুখ, সব যেন কোঁচলে চলে গেছে। নিতান্ত একটা নগণ্য চাষা যেন আমাদের সামনে দাঁড়ি কোথায় গেল তা'র আগেকার চালচলন আর কোথায় গেল তা'র উন্নত আবার সম্প্রতি কতকগুলো বদ অভ্যাসও জুটিয়ে এনেছে।

গুরুদেব আমাদের ডেকে পাঠিয়ে ভগ্নহৃদয়ে বলতে লাগলেন যে, ছেলেটা আর এখন ব্রহ্মচারীর আশ্রমজীবনের পক্ষে উপযুক্ত নয়।

“মুকুন্দ, কুমারকে কালই আশ্রম থেকে চলে যেতে বলবার জন্তে তোমার ওপরেই ভার দিলুম। আমি এ পারব না।” শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজির চোখে জল, কিন্তু তখনই নিজেকে সামলে নিয়ে বললেন, “ছেলেটা যদি আমার কথা শুনে সব কুসঙ্গীদের সঙ্গে না মিশত, তা’ হ’লে কতখানো তা’র এতদূর গভীরভাবে পতন হ’ত না। আমার আশ্রয় সে প্রত্যাখ্যান করেছে—এইবার কঠিন সংসারই সর্বদা তা’র গুরু হ’বে আর কি।”

কুমার চলে যাওয়াতে যে খুব খুসী হয়েছিলুম তা’ নয়। মনে বড় দুঃখ হ’তে লাগল যে, গুরুদেবের স্নেহ আকর্ষণ করবার যা’র ক্ষমতা হয়েছে, তাঁ’র স্নেহ পেয়ে যে ধাওয়া হয়েছে, সে কি ক’রে এ রকম সস্তা মোহে মুগ্ধ হ’তে পারলে। নারী আর স্ত্রীর প্রলোভন মানুষের মজ্জাগত। তা’র উপযুক্ত সমাদরের জন্তে আর বিশেষ কোনরকম বোঝাবার দরকার করে না। ইন্দ্রিয়ের প্রলোভন বিবরূপেরই মতন—নানাবর্ণের ও নানাস্বাদের স্মৃগন্ধি ফলফুলে ভরা; কিন্তু এর প্রতি অণুপরমাণুই বিবে ভরা। তৃপ্তি আর আরামের স্থান হচ্ছে অন্তরেরই মধ্যে—সুখেতে উজ্জল, যে সুখ লোকে হাজারো রকমের ভুলপথে খুঁজে মরে! *

গুরুদেব একদিন কুমারের ক্ষুরধার বুদ্ধির কথা বলতে গিয়ে বললেন, “তীক্ষ্ণ বুদ্ধির হ’চ্ছে ছু’টো ধার! ছুরির মতন এ’কে অজ্ঞানের বিষফোড়া কাটা আর নিজের গলা কাটা ছ’কায়েই ব্যবহার করা যেতে পারে। মন আধ্যাত্মিক বিধিনিয়মের অলঙ্ঘনীয় বিষয়ে অভ্যস্ত হয়ে পড়লেই তখন বুদ্ধি ঠিক পথেই চলে।”

গুরুদেব স্ত্রীপুরুষনির্বিশেষে তা’দের পুত্রকন্যাজ্ঞানে তাঁ’র সকল শিষ্যদের সঙ্গেই মিশাতেন। তাঁ’দের আত্মা যে এক, দুই নয়, এই ভেবে তা’দের মধ্যে কোন পক্ষপাতিত্ব করতেন না বা কোনই পার্থক্য রাখতেন না।

* শঙ্করাচার্য লিখেছেন,—“জাগ্রত অবস্থায় ইন্দ্রিয়সুখভোগের জন্য মানুষের অন্তরীণ প্রচেষ্টা : নম্র ইন্দ্রিয়গ্রাম রাস্তা হ’য়ে পড়লে, সে আপাতভোগ্য সুখও ভুলে গিয়ে নিদ্রা যায়, তা’র স্ব-ভাব স্বাস্থ্য বিশ্রাম লাভ করবার জন্য। অতীন্দ্রিয় সুখ এইজন্যই অতি সহজ প্রাপ্য, আর তা’ স্থূল ইন্দ্রিয়ভোগের আনন্দ—যা’র গ্লানিতেই সর্বদাই পরিণতি, তা’র অপেক্ষা বহুগুণে শ্রেষ্ঠ।

তিনি বলতেন, “যুমিয়ে পড়লে তুমি কি জানতে পা’র যে, তুমি স্ত্রী কি পুরুষ? পুরুষ যেমন স্ত্রীরূপ ধারণ করলে কখনও সে স্ত্রী হয়ে বায় না, তেমনি আত্মা স্ত্রীপুরুষ উভয়বিধ রূপ ধারণ করলেও তা’র কোন লিঙ্গভেদ নাই। আত্মা হচ্ছে নিরঞ্জন, ঈশ্বরের শাস্তরূপ।

শ্রীবক্তেশ্বর গিরিজি কিন্তু নারীকে নরকের দ্বার বলে ঘৃণা করতেন না। নরও ত’ নারীর প্রলোভনের বস্তু। আমি একবার গুরুদেবকে জিজ্ঞাসা করেছিলুম যে, জনৈক প্রাচীন সাধু নারীকে “নরকের দ্বার” ব’লে গেছেন কেন?

গুরুদেব তিক্তভাবে উত্তর দিলেন, “তা’র প্রথম জীবনে হয়ত’ কোন রমণী তা’র মনের শাস্তির বিদ্বন্মূৰ্ত্তি হয়েছিল, তা’ না হ’লে নারীকে পরিত্যাগ না ক’রে তিনি তা’র আত্মসংযমের ক্রটিগুলিই বর্জন করতেন।”

কোন অভ্যাগত আশ্রমে এসে যদি কোন উপদেশমূলক গল্প বলবার চেষ্টা করতেন, তা’ হ’লে তিনি তখন একেবারে নিরন্তর নীরবতা অবলম্বন ক’রতেন। শিষ্যদের তিনি বলতেন, “সুন্দর মুখকে তোমার মনকে বশ করতে দিও না; ইন্দ্রিয়ের দাস যে, সে জগৎকে উপভোগ করবে কি ক’রে? এর যে সুন্দর রসভাব আর তা’র অল্পভূতি তা’ তা’দের হাত এড়িয়ে যায়, তা’রা যখন স্থূল উপভোগের ক্লেদকর্দম হাতড়ে মরে! সুন্দর ভেদাভেদজ্ঞান স্থূল ইন্দ্রিয়-বোধের দাসেদের কাছে একদম হারিয়ে যায়।”

শিষ্যরা মায়া’র হাত এড়াবার জগ্গে শ্রীবক্তেশ্বর গিরিজির কাছ হ’তে অসীম ধৈর্যের সঙ্গে নানাবিধ সহজবোধ্য আর জ্ঞানগর্ভ উপদেশ গ্রহণ ক’রত।

তিনি বলতেন, “খাওয়ার উদ্দেশ্য যেমন ক্ষিধে মেটান, লালসা মেটান নয়, তেমনি যৌনবোধ হ’চ্ছে স্বাভাবিক নিয়মানুসারে জীবনের ধারা অব্যাহত রাখার জগ্গে, অতৃপ্ত কামনা জাগিয়ে তোলবার জগ্গে নয়। কুঅভিপ্রায় সব এখনই দূর কর, তা’ না হ’লে তা’রা সব এ জড়দেহ হ’তে বিচ্ছিন্ন হ’লেও তোমার সুশ্লদেহের সঙ্গে সঙ্গে যাবে। রক্তমাংসের শরীর তোমার ইন্দ্রিয়ের প্রলোভনের কাছে দুর্বল হ’লেও মন সর্বদা চাক্ষু রাখা চাই। প্রলোভন যদি তোমায় নিষ্ঠুরভাবে আক্রমণ করে, তা’ হ’লে তা’কে নৈর্ব্যক্তিক বিশ্লেষণ আর মনের অদম্য ইচ্ছাশক্তি দ্বারা দাবিয়ে রাখ। যা’ কিছু স্বাভাবিক বাসনাকামনা আছে তা’ সবই দমন করা যেতে পারে।

“শক্তি সঞ্চয় ক’রে যাও। অতল সমুদ্রের মত হও ; ইন্দিয়ালসার নদীপথে বা’ কিছু ভেসে আসছে, সবই তোমার ভিতর একেবারে তলিয়ে যাবে। ছোট ছোট কামনাবাসনা সব তোমার অন্তরের শক্তির আধারের সব এক একটা ছিদ্র। এর ভিতর দিয়ে তোমার নিরাময়ের শান্তিবারি সব জড়বাদের শুষ্ক মরুভূমির বুকে গিয়ে প’ড়ে একেবারে শুকিয়ে যাচ্ছে। কোন কুঅভ্যাসের প্রবল তাড়না হ’চ্ছে মানুষের পক্ষে তা’র শক্তির পরম শত্রু। আত্মসংযমের শক্তিতে সিংহের মত এ জগতে ঘুরে ফিরে বেড়াবে ; দেখে যেন দুর্বলতার ব্যাংগুলো তোমার চারধারে লাকলাফি করে বেড়ায় না।”

ভক্তের শেষ অবধি সকল স্বাভাবিক প্রবৃত্তি থেকে মুক্তিলাভ ঘটে। মানবপ্রেমের প্রতি আকর্ষণ তা’র ভগবৎপ্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষায় পরিণত হয়, আর সেইটাই হ’চ্ছে তা’র একমাত্র খাঁটি প্রেম, কারণ তা’ সর্বব্যাপী।

যেখানে আমার প্রথম গুরুদর্শনলাভ ঘটেছিল, কাশীর সেই রাণামহলেই শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজির মা থাকতেন। স্নেহকোমল আর সদয়প্রকৃতির হ’লেও তবু তিনি বেশ দৃঢ়মতী ছিলেন। একদিন তাঁ’র বাড়ীর বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছি, মাতাপুত্রের মধ্যে কথাবার্তা চলছে শুনতে পেলুম। গুরুদেবকে বোধ হ’ল, তিনি তাঁ’র স্বাভাবিক শাস্ত্রভাবে বক্তিসহকারে তাঁ’র মা’কে কোন কিছু বোঝাবার চেষ্টা করছিলেন। দেখে বোধ হ’ল তিনি নিষ্ফলই হ’লেন, কারণ তাঁ’র মা তখন প্রবলবেগে মাথা নেড়ে বলছেন,—“না, না, বাছা, তুমি এখন যাও। তোমার ও সব উপদেশ টুপদেশ এখন রেখে দাও ; ও সব আমার জ্ঞে নয় ! আমি তোমার শিষ্য নই বাছা, বুঝলে?”

শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজি ত’ বিনা বাক্যব্যয়ে আস্তে আস্তে মায়ের কাছ থেকে সরে এলেন—ছোট ছেলে যেমন বকুনি খেয়ে পালিয়ে আসে ! গ্রাম্য কথা শুনতে না চাইলেও মায়ের প্রতি তাঁ’র অপার ভক্তি দেখে আমি মুগ্ধ হ’য়ে গেলুম। শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজির মা তাঁ’কে তাঁ’র ছোট ছেলেটির মতই দেখতেন। এই তুচ্ছ ঘটনাটার মধ্যেও বেশ একটা মাধুর্য্য ছিল ; এতে গুরুদেবের অন্তরে কোমল আর বাইরে কঠিন ভাবের একটা পরিচয় মিলল।

সন্ন্যাস আশ্রমের বিধিনিয়মানুসারে কোন সন্ন্যাসী একবার সংসার আশ্রম ত্যাগ করলে আর তা’র সঙ্গে কোন সম্বন্ধ রাখতে পারেন না। গৃহস্থের

পক্ষে অবশ্য পালনীয় সাংসারিক বিবিধ সংস্কার সব তাঁ'র পক্ষে পালন করা সম্ভবপব নয়। তবুও প্রাচীন দশনামীসম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা জ্ঞানাবতার শঙ্করাচার্য্য এ সব বিধিনিষেধ অগ্রাহ্যই ক'রে গেছেন। তাঁ'র পরম স্নেহময়ী মাতার মৃত্যুর পর তিনি তাঁ'র স্বর্গের দিকে উত্তোলিত হস্তে অগ্নিশিখা আহ্বান ক'রে তাঁ'র শবদাহ করেছিলেন।

শ্রীবুদ্ধেশ্বর গিরিজিও এ সব বাধাবন্ধ নিতান্তই অনাড়ম্বর ভাবে এড়িয়ে চলতেন। তাঁ'র মাতার পরলোকগমনে তিনি কাশীর গঙ্গার ঘাটেই শ্রাদ্ধ সম্পন্ন ক'রে প্রাচীন প্রথা অনুযায়ী বহু ব্রাহ্মণভোজন করিয়েছিলেন।

শাস্ত্রীয় বিধিনিষেধ সব সন্ন্যাসীদের ক্ষুদ্র আত্মাভিমান রোধের জন্তই রচিত। শঙ্করাচার্য্য ও শ্রীবুদ্ধেশ্বর গিরিজির পূর্ণভাবেই ব্রহ্মলাভ ঘটেছিল। তাঁ'দের উদ্ধারের জন্ত কোন বিধিনিয়ম পালনের কোন আবশ্যকতাই ছিল না। কখনও কখনও গুরুরা ইচ্ছা ক'রেই শাস্ত্রীয়বিধি লঙ্ঘন ক'রে চলেত তাঁ'র অনুষ্ঠানের খোসা ত্যাগ ক'রে, তাঁ'র অন্তর্নিহিত নীতি বা ভাবটুকুর শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করবার জন্তেই, আর কিছু নয়। বীণুখণ্ডিও ঐরকম ক'রে রবিবারে ভুটোর শীন তুলে ছিলেন; আর দারুণ সমালোচকদের তিনি বলেছিলেন, “রবিবার মানুষ্যের জন্তেই সৃষ্টি হয়েছে, মানুষ তাঁ'র জন্তে নয়।”

শাস্ত্রগ্রন্থপাঠের বাইরে অত্র কোন বইয়ে তাঁ'র বিশেষ কিছু আগ্রহ দেখা যেত না। তবুও খুব অধুনাতন আবিষ্কার বা অত্রাণ বিষয়েও তাঁ'র জ্ঞানের পরিধি বিস্তৃত ছিল। চমৎকার আলাপী ছিলেন তিনি। আশ্রমে অভ্যাগতদের সঙ্গে তিনি অসংখ্য বিষয় নিয়ে নানা আলোচনা সুরু ক'রে দিতেন। অপূর্ব রসিকতা আর উজ্জ্বল হাসিতে সব আলোচনাই যেন প্রাণবন্ত আর উজ্জ্বল হয়ে উঠত। প্রায়ই গভীর হ'য়ে থাকলেও, মুখ কখনও অন্ধকার ক'রে থাকতেন না। বলতেন, “ভগবানকে লাভ করতে গেলে কি কারুর মুখ বিহ্বত করার দরকার হয়? মনে রেখো যে, ঈশ্বরকে পেলেই সব দুঃখের অবসান হবে।”

দার্শনিক, অধ্যাপক, ব্যবহারজীবী, বৈজ্ঞানিক প্রভৃতি যাঁ'রা তাঁ'কে দর্শন করতে আসতেন, তাঁ'দের মধ্যে সর্বপ্রথম যাঁ'রা এসে পড়তেন, তাঁ'রা ভাবতেন যে, এসে কেবল নিছক ধর্ম্মতত্ত্বেরই আলোচনা শুধু শুনে

পাবেন। তাঁদের একটু গর্বোদ্ধত হাসি বা কাঁতুকদৃষ্টিতে প্রকাশ পে'ত যে, তাঁরা শ্রীবক্তেশ্বর গিরিজির কাছ হ'তে কতকগুলি ধর্মতত্ত্বের শুষ্ক ব্যাখ্যা ছাড়া আর কিছুই প্রত্যাশা করেন না। কিন্তু তাঁদের স্থানত্যাগের অনিচ্ছা দেখে বেশ স্পষ্ট বোঝা যে'ত যে, তাঁদের নিজ নিজ অধিকারের বিষয়ে আলোচনাতেও গুরুদেবের যথাযথ জ্ঞান বিশেষরূপে প্রতিভাত।

সাধারণতঃ আমার গুরুদেব অতিথি অভ্যাগতদের প্রতি খুব ভদ্র আর অমায়িক ছিলেন; একটা মধুর আন্তরিকতার সঙ্গে তাঁদের আপ্যায়ন করতেন। তবুও দারুণ আত্মস্তরীয়া মাঝে মাঝে তাঁর কাছ থেকে বেশ একটু ভাল রকমেরই আক্কেল পেয়ে যেতেন। গুরুদেবের মাঝে তাঁরা দেখতে পেতেন, একেবারে নীরব ঔদাসীণ্য অথবা কঠিন প্রতিবাদ—বরফ বা লোহা আর কি!

একবার একজন বিখ্যাত রাসায়নিক শ্রীবক্তেশ্বর গিরিজির সঙ্গে একদিন দারুণ তর্কবুদ্ধি শুরু ক'রে দিলেন। আগন্তুক ভদ্রলোকটি ঈশ্বরের অস্তিত্ব কখনও মানতেন না, কারণ বিজ্ঞান তাঁকে পা'বার কোন সোজা রাস্তা বা'র ক'রে দিতে পারে নি।

“তা' হ'লে আপনি টেষ্ট টিউবে সেই অনশ্বজ্ঞিতিকে বিশ্লেষণ ক'রে ফেলতে পারেন নি, কি বলুন?” গুরুদেবের দৃষ্টি কঠিন, বললেন, “আচ্ছা আমি একটা নতুন পরীক্ষার কথা বাত'লে দিচ্ছি। নিরবচ্ছিন্নভাবে চক্ষিণ ঘণ্টা ধরে আপনার চিন্তাগুলো সব একে একে বিশ্লেষণ করুন, তা' হ'লে ভগবানের অস্তিত্বে আর কখনও অবিশ্বাস হবে না।”

একজন বিখ্যাত পণ্ডিত তাঁর আশ্রমে এসে পড়ে ঐ রকম একটি বেশ অল্পমধুর আঘাত তাঁর কাছ থেকে প্রাপ্ত হ'য়েছিলেন। প্রবল উৎসাহে পণ্ডিত-প্রবর ত' তাঁর শাস্ত্রকাহিনীতে উচ্চৈঃস্বরে আশ্রমের কড়ি বরগা ফাটিয়ে তুললেন। মহাভারত, উপনিষদ, শঙ্করভাষ্য প্রভৃতি প্রামাণ্য শাস্ত্রগ্রন্থ সব কিছুই বাদ গেল না, তা' থেকে অনর্গল শ্লোক সব উদ্ধৃত ক'রে চললেন। আপন মনে তিনি ত' বকেই চলেছেন, হঠাৎ নজর পড়ল যে গুরুদেব কিছুই বলছেন না। তাঁর দিকে সপ্রশ্নদৃষ্টিতে চাইতে, গুরুদেব জিজ্ঞাসুকণ্ঠে বললেন, “আমি কেবল আপনার কথাই শোনবার জন্যে অপেক্ষা করছি,

বলবার জ্ঞে নয়।” তখন সব চুপচাপ! পণ্ডিত মহাশয়ের মাথা ত’ একদা গুলিয়ে গেল।

“শ্লোক ত’ আউড়েছেন প্রচুর, কিন্তু আপনার কি মৌলিক ব্যাখ্যা আছেন? আপনার ব্যক্তিগত জীবনের বৈশিষ্ট্য থেকে উদাহরণ দিয়ে দেখান পারেন, তাই আগে বলুন? শাস্ত্রীয় কি ধর্মব্যাখ্যা আপনার জীবন পাঠাতে পেরেছেন বা সেইমত জীবনকে গড়ে তুলতে পেরেছেন? কি উপায়ে এইসব চিরন্তন সত্য সকল আপনার প্রকৃতির পরিবর্তন সাধন করেছে? কেবল দমদেওয়া গ্রামোফোনের মতন অপরের কথা শুনে আউড়ে গিয়েই কি আপনি সন্তুষ্ট?” ভদ্রলোকের কাছ থেকে তখন আর একটু দূরে বসে, কথাগুলো শুনে মনে মনে খুব একচোট হেসে নিলেন পণ্ডিতজি সখেদে বললেন, “না ন’শায়, আমার দ্বারা আর হ’ল না সত্যিই ত’, অন্তরে অনুভূতি ত’ কিছুই পাই নি!” পণ্ডিতজির খেদারি তখন বেশ উপভোগ্যই হয়েছিল।

জীবনে এই প্রথম বোধ হয় তিনি বুঝতে পারলেন যে, শাস্ত্রের চুলচেরা বিচার আর আধ্যাত্মিক অনুভূতি, দু’টো আদবেই এক জিনিস নয়।

ভদ্রলোকটি প্রশ্ন করলে গুরুদেব বললেন, “এইসব নিরুপলব্ধ বিষয় বাগীশেরা কেবল রাত জেগে জেগে বইই পড়েছেন, আর কিছুই পাননি। তা’দের কাছে শাস্ত্রচর্চা কেবল মূঢ় বুদ্ধিবৃত্তিপরিচালনার একটা উপায় মাত্র। তা’দের উচ্চচিন্তার সঙ্গে বাইরের স্থূল কাষ বা আন্তরগুহ্মের কোন রকম সম্বন্ধই নেই!”

নানা উপলক্ষ্যে গুরুদেব কেবলই বলতেন যে শুধু পুঁথিগত বিচারে কোন কাষেই আসে না। তিনি বলতেন, “বিরাত পাণ্ডিত্য আর বিজ্ঞানবোধরূপ দু’টো একজিনিস নয়। শাস্ত্রগ্রন্থ নিজবোধলাভে উদ্দীপনা জাগান পাবে, যদি একটি একটি করে শ্লোকেব অর্থ ধীরে ধীরে পরিপাক করা যায়। পাণ্ডিত্যলাভের জ্ঞে অবিরত অধ্যয়নে বড় জোর একটা মিথ্যা গর্ভ আঁকা পাবে বা অপরিপক্কজ্ঞানের একটা মিথ্যা তৃপ্তি আনতে পারে, তা’হলে আর কিছু হয় না!”

শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজি একবার শাস্ত্রব্যাখ্যার এক অপূর্ণ অভিজ্ঞতার

বলেছিলেন। দৃশ্যটা হচ্ছে পূর্ববঙ্গের একটি তপোবন। এখানে তিনি দবরুবল্লভ নামে এক বিখ্যাত গুরুর শিক্ষাপ্রণালী দেখে এসেছিলেন। তাঁর প্রণালী, প্রাচীন ভারতে যা' ছিল—একাধারে সরল আর কঠিন!

বনের মধ্যে দবরুবল্লভকে নিয়ে তাঁর শিষ্যেরা তাঁকে চারধারে ঘিরে বসে আছে। তা'দের সামনে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা খোলা। আশ্বঘটা ধ'রে একটিমাত্র শ্লোক দেখে দেখে তা'রপর তা'রা চোখ বুঁজ'লে। আরও আশ্বঘটা কেটে গেল। গুরুদেব একটুখানিমাত্র ব্যাখ্যা ক'রে দিলেন। নিথর হয়ে বসে তা'রা আরও ঘণ্টাখানেক ভাবলে। অবশেষে গুরুদেব বল্লেন, “বুঝতে পেরেছ?”

দলের মধ্যে কেবল একটিমাত্র শিষ্য বল্লে, “আজ্ঞে হ্যাঁ, ম'শায়।”

“উঁহঁ না, ঠিক পূরোপুরি নয়। শত শত বৎসর ধরে বা' দিয়ে ভারতের প্রাণশক্তির সঞ্চার হয়েছে, আগে সেই প্রাণশক্তির উৎস খুঁজে বা'র কর।” আরও একঘণ্টা নীরবে কেটে গেল। গুরুদেব শিষ্যদের বিদায় ক'রে দিয়ে শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজির দিকে ফিরে বল্লেন, “ভগবদ্গীতা বুঝেছেন?”

“না ম'শায়, যদিও বহুবার এর পাতার ওপর চোখ আর মন বুলিয়েছি, কিন্তু তবুও ঠিকমত বুঝে উঠতে পারি নি।”

সেই পরম সাধু মহাপুরুষটি গুরুদেবকে সহাস্ত্রে আশীর্বাদ ক'রে বল্লেন, “হাজার জনে কিন্তু আমার ঠিক উল্টো কথাটাই বলেছে। যদি কেউ তা'র শাস্ত্রজ্ঞানের ঐশ্বর্য্য বাইরে দেখাতেই ব্যস্ত থাকে, তা'হ'লে তা'র আর অন্তরের মধ্যে নীরবে ডুব দিয়ে অমূল্য জ্ঞানরত্ন আহরণ করবার আর সময় কোথায় থাকে, বলুন?”

শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজিও ঠিক ঐ রকমই একাগ্রভাবে শাস্ত্রোপলব্ধির বিষয়ে শিষ্যদিগকে শিক্ষা দিতেন। বলতেন, “চোখ দিয়ে জ্ঞানলাভ করা যায় না, যায় তোমার অস্তিত্বের প্রতি অণুপরমাণু দিয়ে। সত্যের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস যখন তোমার শুধু মনেই আবদ্ধ থাকবে না, তোমার সমস্ত সত্তা ব্যোপে হবে, তখন তুমি এর মানে করবার সাহস করতে পার।” আধ্যাত্মিক অহুভূতি লাভ করতে গেলে বই পড়ে জ্ঞানলাভ করা প্রয়োজনীয় উপায় ব'লে শিষ্যদের এ রকম রোঁকের উপর কোন উৎসাহ দিতেন না।

তিনি বলতেন, “ঋষিরা একটি মাত্র শ্লোকের ভিতর বা একটি মাত্র হ্রস্ব মধ্যে যে গূঢ় অর্থ নিহিত ক’রে গেছেন, তা’র ওপর টিকাকারেরা যুগযুগান্তর’রে টিকা করতেই ব্যস্ত। অস্তুহীন বিচার কচক্চি কেবল অগভীর মনেরই জগ্নে।” ‘ঈশ্বর আছেন’, না কেবলমাত্র শুধু ‘ঈশ্বর’ একথাটি ছাড়া যুক্তি দায়িনী সরল চিন্তা আর কি আছে?

মাহুষ কিন্তু সহজে সরল চিন্তায় ফিরে যেতে পারে না। সে শুধু ছোট একটুমাত্র কথা “ঈশ্বর” এতে সম্বৃষ্ট হ’য়ে থাকতে চায় না, তা’র কাছে এর জগ্নে বিচ্যের বাহাদুরী চাই। এই রকম একটা বিচার গরিমা দেখতে পেলে তবে তা’র আশ্রয় তৃপ্তিলাভ হয়।

নিজেদের উচ্চ পদমর্যাদার ষা’দের টনুটনে জ্ঞান ছিল, গুরুদেবের কাছে এসে অগ্নাত বিষয়ে হয়ত’ তাঁ’দের দীনতা স্বীকার ক’রতে হ’ত। একবার পুরীর এক ম্যাজিষ্ট্রেট আশ্রমে তাঁ’র সঙ্গে দেখা ক’রতে এলেন। লোকটী বড়ই রুক্ষপ্রকৃতির। একবার তিনি আপন ক্ষমতাবলে আমাদের আশ্রম থেকে উচ্ছেদ করবার চেষ্টা করেছিলেন। বিপরীত সম্ভাবনা ঘটতে পারে ব’লে গুরুদেবকে আমি আগে থাকতেই সাবধান ক’রে দিয়েছিলুম। গুরুদেব কিন্তু যেখানে বসেছিলেন সেখানেই বসে রইলেন, আদরআপ্যাদ বা অভ্যর্থনার জগ্নে উঠেও দাঁড়ালেন না। একটুখানি সম্বস্ত হ’য়ে আমি তাঁ’র দরজার কাছে বসে পড়লুম। ঘরে ঢুকে ভদ্রলোককে একটা কাঠের বাক্সে উপরেই বসে সম্বৃষ্ট থাকতে হ’ল। গুরুদেব আমাকে একটা চেয়ারও আনতে বন্লেন না। ম্যাজিষ্ট্রেটসাহেব অবশ্য আশা করেছিলেন যে, তাঁ’র মহাশয় অতিথির অভ্যর্থনা খুব ভালভাবেই হবে, কিন্তু তা’ হ’ল না।

অধ্যায়তত্ত্বের আলোচনা সুরু হ’ল। ম্যাজিষ্ট্রেটসাহেব পদে পদে শাস্ত্রের ভুল ব্যাখ্যা ক’রে যেতে লাগলেন। বিষয়ের খেই যেমনি হারাতে লাগলেন, হেরে হেরে তাঁ’র রাগও তেমনি চড়তে লাগল। অবশেষে অসম্মালাতে না পেরে তিনি বলে বসলেন, “জানেন, আমি এম, এ, তে ক’রে হ’য়েছিলুম?” যুক্তি তাঁ’কে একেবারে পরিত্যাগ ক’রে গিয়েছিল, তখনও কিন্তু তিনি চোঁচিয়েই চলেছেন!

গুরুদেব অত্যন্ত শান্তভাবে বন্লেন, “ম্যাজিষ্ট্রেটসাহেব, আপনি কি

ভুলে যাচ্ছেন যে এটা আপনার এজলাস নয়। আপনার ছেলেমানুষী কথায় আমি হয়ত' ভাবতুম যে, আপনার কলেজজীবনে উল্লেখযোগ্য বিশেষ কিছুই ছিল না। একটা ইউনিভার্সিটি ডিগ্রির, এমন কি অতি ক্ষুদ্রভাবেও বৈদিক জ্ঞান উপলব্ধির সঙ্গে কোন সম্বন্ধই নেই। সাধুরা ত' আর বছর বছর ইউনিভার্সিটি থেকে দলে দলে পাশ করে বেরোন না। খাঁটি সাধুরা কি আর গ্রাজুয়েটদের মতন হাজারে হাজারে ইউনিভার্সিটিতে তৈরী হয়, বলুন?" শুধু হয়ে খানিকটা চুপ ক'রে বসে থেকে শেষে তিনি প্রাণখোলা হাসি হেসে বললেন, "আজ আমি এই প্রথম একজন স্বর্গরাজ্যের ম্যাজিষ্ট্রেটের সাক্ষাৎ পেলুম।" পরে অবশ্য তিনি গুরুদেবকে যথাবিহিত অনুরোধ করলেন, তাঁকে তাঁর শিষ্য ক'রে নিতে। কিন্তু তাঁর অনুরোধটার ছিল আইনের কথার ধরণ—যা' তাঁর মজ্জাগত—তাঁকে শিক্ষানবীশ শিষ্যরূপে গ্রহণ করতে।

গুরুদেব তাঁর সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণসংক্রান্ত সমস্ত খুঁটিনাটি ব্যাপার সব নিজেই দেখতেন। অসং লোকেরা বছবার তাঁর সম্পত্তি দখল করবার চেষ্টা করেছিল। খুব শক্ত হ'য়ে এমন কি মোকদ্দমা পর্য্যন্ত রুজু করে তিনি প্রত্যেকটিকে হটিয়ে দিয়েছিলেন। এরকম হাঙ্গামা পোহাবার উদ্দেশ্য হ'চ্ছে যা'তে কারুর গলগ্রহ হ'তে না হয়, এমন কি শিষ্যদেরও উপর নির্ভর না করতে হয়।

তাঁর আর্থিক স্বাধীনতা হচ্ছে একটা কারণ, যা'তে ক'রে আমার দারুণ স্পষ্টবাদী গুরুদেবকে কোন রকম ছলচাতুরীর আশ্রয় গ্রহণ করতে হয় নি। অত্যন্ত গুরুরা যা'রা তাঁদের অনুগামিদের তোবামোদ ক'রেই চলতেন, তাঁদের মতন গুরুদেব, অপরের ঐশ্বর্য্যের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ কোন প্রভাবেরই অধীন ছিলেন না। কোন উপলক্ষ্যেই তাঁকে অর্থের জন্ত প্রার্থনা ক'রতে, এমন কি কোন ইঙ্গিত ক'রতেও আমি শুনি নি। আশ্রমে তাঁর শিক্ষাদান যুক্তহস্তে আর বিনামূল্যে সকল শিষ্যগণের জন্তেই ছিল।

একবার শ্রীরামপুরের আশ্রমে শ্রীবুদ্ধেশ্বর গিরিজির উপর সমনজারি করবার জন্তে আদালতের এক উদ্ধত কর্মচারী এসে হাজির হ'ল। কানাই নামে একটি শিষ্য আর আমি সেখানে উপস্থিত ছিলাম। গুরুদেবের প্রতি

লোকটার ব্যবহার অত্যন্ত আপত্তিজনক ছিল। লোকটা দাঁত বের করে তাম্বুলের সঙ্গে হেসে যখন বললে, “এই আশ্রম ছেড়ে আপনাকে যখন আদালতে হাজির হ’তে হবে, তখন খুব ভাল হবে দেখবেন!” তখন কিন্তু আমি আর সামলাতে পারলুম না। বেশ একটু রীতিমত আক্কেল দেব মনে ক’রে এগিয়ে গিয়ে বললুম, “আর বেশী লম্বাই চওড়াই করেছ কি তোমার মাটীতে লম্বা করে দেব।” কানাইও আমার সঙ্গে সঙ্গে টেঁচিয়ে উঠল, “হতভাগা, তোমার সাহস ত’ ভারি দেখছি, এই পুণ্যস্থান আশ্রমে এসে নিজে জুড়েছ?”

গুরুদেব কিন্তু তাঁর সামনে নিম্নককে আগলে দাঁড়িয়ে বললেন, “ওহে, তোমরা এ সামান্য তুচ্ছব্যাপারে অত উত্তেজিত হ’চ্ছ কেন? এ ত কেবলমাত্র তা’র কর্তব্য পালন করতে এসেছে।”

লোকটা ত’ একেবারে হতভম্ব! এ রকম বিভিন্ন বিপরীত ধরণের ছুঁটে অভ্যর্থনা দেখে হক্চকিয়ে গিয়ে সসন্মানে ক্ষমা প্রার্থনা ক’রে তাড়াতাড়ি সরে পড়ল।

আশ্চর্য্য! এমন যে গুরু বাঁ’র আঙুলের মত তেজ,—তিনি অন্তরের মধ্যে এমন ধীর, এমন অবিচলিত, এমন শাস্ত হ’লেন কি ক’রে? বেদে নরদেহে দেবতার যে বর্ণনা আছে “বজ্রাদপিকঠোরাণি মূহুনি কুসুমাদপি চ।” তা’ তাঁ’র সঙ্গে ঠিক খাপ খায়।

এ জগতে সর্বদা সেই ধরণের লোক দেখা যায় যা’রা, রবার্ট ব্রাউনিং এর কথায়—

“নিজেরা আঁধার কারা,
সহেনা আলোর ধারা।”

মাঝে মাঝে দু’ একজন আগন্তুক আশ্রমে এসে তাঁ’র কাছে তাঁ’দের সব কাল্পনিক দুঃখ জানিয়ে অনুযোগ ক’রতেন। গুরুদেব অবিচলিতচিত্তে ও নম্রভাবে তাঁ’দের সব কথা ধৈর্যের সঙ্গে শুনতেন আর মনে মনে বিচার করে দেখতেন যে, এরূপ অন্ধ দোষারোপের ভিতর প্রকৃতই কোন সত্য নিহিত আছে কি না। এই সব ঘটনাগুলো গুরুদেবের অননুकरणीয় উক্তি স্মরণ করিয়া দেয়—“কতকগুলো লোক পরের মাথা কেটে ফেলে নিজে বড় হ’তে চায়।”

প্রকৃত সাধুদের নিরবচ্ছিন্ন শান্তির ভাব, যে কোন উপদেশের চেয়ে শিক্ষাপ্রদ, আর তা' মনে গভীরভাবে গাঁথা হয়ে যায়। “রাগ যা'র নেরীতে হয় সে মহাবলশালীর চেয়েও মহাবলী, আর যে তা'র আত্মাকে শাসন ক'রতে পারে, সে নগরাধিপতির চেয়েও বড়।”

আমি প্রায়ই ভাবতুম যে আমার স্মমহান্ গুরুদেব খুব সহজেই একজন সম্রাট বা বিশ্ববিজয়ী বড় যোদ্ধা হ'তে পারতেন, যদি তাঁ'র মন খ্যাতি বা এ ভগতে কীর্তিলাভের জগ্রে উন্মুখ হ'ত। তা'র বদলে তিনি অন্তরের মধ্যে আত্মস্তুতি আর রোণের দুর্গপ্রাচীর ভগ্ন ক'রে চূর্ণ ক'রবার ব্রতই নিয়েছিলেন, যা'র পতনেই মান্ববের উন্নতি।

১৩শ পরিচ্ছেদ

বিনিদ্র সাধু রামগোপাল

একদিন সত্যসত্যই গুরুদেবকে আমি অরুতজ্ঞভাবে এই কথাগুলি বলে বসলুম, “ম’শায়, অল্পগ্রহ ক’রে আমার হিমালয়ে যেতে অল্পমতি দিন। সেখানে অথও নীরবতার মধ্যে আমি নিত্য ভগবৎসঙ্গ লাভ করব বলেই মনে করি।” সাধকেরা মাঝে মাঝে যেমন এক এক বার অনিশ্চিত ভবিষ্যতের আশ্বিত্যে প্রলুব্ধ হ’ন, সেই রকম ভাবে বিচলিত হ’য়ে আমি আশ্রমের কর্তব্যে এবং কলেজের পড়াশুনার উপর ক্রমশঃই অধৈর্য্য আর বীতরাগ হয়ে উঠছিলাম। দোষলাঘবের একটা ক্ষীণ যুক্তির কথা এই ছিল যে, প্রস্তাবটা করা হয়েছিল মাত্র ছ’মাস কাল যখন আমি শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজির সঙ্গে ছিলাম, সেই সময়। তখনও পর্য্যন্ত আমি তাঁ’র গগনস্পর্শী উচ্চতার পরিমাপ করতে পারি নি।

গুরুদেব ধীরে ধীরে আর অত্যন্ত সরল ভাবে জবাব দিলেন, “হিমালয়ে ত’ বহু পাহাড়ীরা থাকে, কই তা’দের ত’ ঈশ্বরলাভ হয় না। অচল পাহাড়ের চেয়ে সত্য সত্যই ঈশ্বরোপলব্ধি যা’র হয়েছে, তেমন লোকের কাছে জ্ঞানান্বেষণ করা ভাল নয় কি?”

গুরুদেবের সরল ইঙ্গিত যে পাহাড় পর্বত নয়, তিনিই আমার শিক্ষাদাতা, এ উপেক্ষা ক’রে আমার প্রার্থনার পুনরাবৃত্তি করলুম। শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজি অল্পগ্রহ ক’রে আর কোন উত্তর দিলেন না। আমি তা’র মানে “মৌনং সম্মতিলক্ষণং” বলেই ধ’রে নিলুম, লোকে যেমন অনিশ্চিত মানেটা নিজের সুবিধামতই আগে চট করে ধ’রে নেয়।

কলকাতার বাড়ীতে এসে সেদিন সন্ধ্যাবেলা আমি যা’বার উদ্যোগে ব্যাপৃত হ’লুম। একটা কক্ষের মধ্যে গোটাকতক জিনিষ বাঁধাছাঁদা করবার সময় মনে পড়ল ঐ রকম আর একটা পুঁটুলির কথা, বছরকতক আগে যা চিলে কোঠার জানলা থেকে লুকিয়ে চুরিয়ে নিচে ফেলে দিয়েছিলাম। তাবছিন্ন

যে, এটাও আবার সেবারকার হিমালয়ে পলায়নের মত নিষ্ফল যাত্রা হবে না কি? প্রথমবারে ত' আমার আধ্যাত্মিক উদ্দীপনা খুবই উঁচু হয়ে উঠেছিল। কিন্তু আজকের রাতে আমার গুরুদেবকে পরিত্যাগ ক'রে যাবার চিন্তায় বিবেক দারুণ দংশন করলে। তা'র পরদিন আমি আমাদের স্কটিশ চার্চ কলেজের সংস্কৃতির অধ্যাপক বিহারী পণ্ডিত মহাশয়কে খুঁজে বার করলুম। দেখা হ'তে বললুম, “ম'শায়, আপনি আমায় বলেছিলেন যে লাহিড়ী মহাশয়ের খুব বড় এক শিষ্যের সঙ্গে আপনার বন্ধুত্ব আছে। তাঁ'র ঠিকানাটা একটু দয়া করে দিন না।”

“ওঃ, তুমি রামগোপাল মজুমদারের কথা বলছ? তাঁ'কে আমি বলি ‘বিনিদ্র সাধু,’ সর্বদাই তিনি ব্রহ্মানন্দে মগ্ন। তারকেশ্বরের কাছে রণবাজপুরে তাঁ'র বাড়ী।”

পণ্ডিত মহাশয়কে ধন্যবাদ দিয়ে তাড়াতাড়ি তারকেশ্বরের ট্রেন ধরলুম। নির্জন হিমালয়ে গিয়ে ধ্যানধারণায় নিজেকে নিযুক্ত রাখ'বার বিষয়ে সেই “বিনিদ্র সাধু”টির কাছ থেকে অল্পমোদন লাভ ক'রে আমার সংশয় দূর ক'রব বলে আশা করেছিলুম। শুনেছিলুম যে বিহারী পণ্ডিতের বন্ধুটি নির্জন গুহায় বসে বহু বৎসর ধ'রে ক্রিয়াযোগ সাধন করে শুদ্ধজ্ঞান লাভ করেছিলেন।

তারকেশ্বর বাংলার মধ্যে একটি প্রসিদ্ধ তীর্থ। খৃষ্টান ক্যাথলিকেরা ফ্রান্সের পবিত্র তীর্থস্থান লর্ডসের প্রতি যেমন ভক্তি প্রদর্শন করে, হিন্দুরাও তারকেশ্বরকে তেমনি ভক্তি করে। স্বপ্নাদেশ পেয়ে এখানে যে কত অসংখ্য লোক দৈবরূপায় আবেগ্য হয়েছে, তা'র আর ইয়ত্তা নাই; তা'র মধ্যে আমাদের পরিবারের মধ্যেও একজন ছিলেন।

আমার জ্যাঠাইমা একদিন আমায় বলেছিলেন, “তারকেশ্বরে গিয়ে একবার আমি একহপ্তা ধরে ‘হত্যা’ দিয়ে পড়েছিলুম। নির্জলা উপোষ ক'রে তোমার জ্যাঠাম'শায় সারদাবাবুর একটা পুরোন রোগ সারাবার জন্তে আমি ‘হত্যা’ দিয়েছিলুম। সাত দিনের দিন হাতের মুঠোর ভেতর একটা ওষুধ পেয়ে গেলুম। তা'র পাতা সেদ্ধ ক'রে তোমার জ্যাঠাম'শায়কে খাওয়াতেই রোগ একদম সেরে গেল,—আর কখনও হয় নি।”

পবিত্র তীর্থস্থান তারকেশ্বরে গিয়ে নাম্লুম। মন্দিরের ভিতর গোলাকার প্রস্তরমূর্তি। অনাদিলিঙ্গ মহাদেব অনন্তেরই প্রতীক। দীনাতিদি চাষাভূষাদের মধ্যেও দেবদ্বিজে খুব ভক্তি আছে—পশ্চিমের লোকেদের কাছে বা' উপহাসের বস্তু।

আমার মনের ভাব তখন এমন উগ্র যে পাথরের ঠাকুরের কাছে যে মাথ নোয়াব, তা'র আর ইচ্ছে হ'ল না। ভাবলুম, আশ্রয় মধ্যেই ঈশ্বরের অনুসন্ধান করা উচিত। ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম না করেই মন্দির ত্যাগ ক'রে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়লুম রণবাজপুর গ্রামের দিকে এগোবার জন্তে। রাস্তায় এক পথিককে জিজ্ঞাসা করতে, সে ত' মহা ভাবনায় পড়ে গেল। ঘা'ক, যে পর্যন্ত আন্দাজ ক'রে সে এই বলে একটা হৃদয় বাতলে দিলে,—“দেখ এবার একটা রাস্তার মোড় দেখতে পেলে ডান দিকে বোঁকে, সোজা চলতে থাকবে, তা' হলেই ঠিক গাঁয়ে গিয়ে পৌঁছতে পারবে।”

লোকটার কথামত যে রাস্তা ধ'রে চললুম, সেটা একটা খালের ধার দিয়ে গেছে। অন্ধকার ঘনিয়ে এল, গাঁয়ের ধারে বনেজঙ্গলে জোনাকির মেলা চার ধারে শেয়ালের হুকাহুয়া। ক্ষীণ চাঁদের আলোর মৃত্যুপাণ্ডুর হাফি রাস্তার ঠিক ঠাণ্ডর পাওয়া যায় না। ঘণ্টা দুই ধ'রে হোঁচট খেতে খেতে চললুম।

গরুর গলার ঘণ্টার শব্দ! বারম্বার চিংকার ক'রে ডাকতে একটি রুদ্র পুঙ্গব ত' আমার পাশে এসে উদয় হ'লেন। বললুম “এখানে রামগোপাল বাবু কোথায় থাকেন, জান?”

“এ নামে এ গাঁয়ে কেউ নেই।” জবাবটা রুদ্র আর কিছু চড়া! “আপনি ম'শাই বোধ হয় একটি টিক্‌টিকি, মিছেমিছি ভাঁড়াচ্ছ।”

কি আর করি, তখনকার তা'র স্বদেশী হাজামাসন্নস্ত মনের সন্দেহ করবার আশায় আমার ছুর্ভোগের কথা তা'র কাছে কাতরস্বরে বল করলুম। লোকটার কি দয়া হ'ল, তা'র বাড়ীতে নিয়ে যেতে চাইলে।

যেতে যেতে বললে, “রণবাজপুর এখান থেকে বহুৎ দূর। সেই রাস্তা মোড়ে আপুনি বাঁ ধারে গেলেই পেতে, ডান ধারে নয়।”

হা ভগবান! সংগেদে ভাবতে লাগলুম যে অচেনা পথে চলবার

পথিকদের কাছে লোকটা কি রকম একটা মূর্তিমান ছুগ্রহ আর দারুণ বিপদ ! যাই হোক অবশেষে মোটা চালের ভাত, মুসুরির ডাল আর তা'র সঙ্গে আনু-কাঁচকলার ঝোল দিয়েই পরম পরিতৃপ্তির সঙ্গে রাজ্রির পরিপাটি ভোজন-ক্রিয়াটি স্তম্ভপন্ন ক'রে, উঠানের পাশে একটি ছোট্ট কুঁড়ের মধ্যে ত' শয়ন করা গেল। দূরে গ্রামবাসীরা খোল আর করতালের সঙ্গে উচ্চৈঃস্বরে কীর্তন আলাপ করে চলেছে। সে রাত্রে নিদ্রার কথা আমার কাছে একেবারে তুচ্ছই হ'য়ে রইল। ভগবানের কাছে গভীরভাবে প্রার্থনা করতে লাগলুম, যা'তে ক'রে' গুপ্তযোগী রামগোপাল বাবুর কাছে পৌঁছতে পারি।

রাত্রি প্রভাতে উষার প্রথম আলোর রেখা আমার অন্ধকার ঘরে প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গেই আগি রণবাজপুরের দিকে যাত্রা শুরু করলুম। এবড়ো খেবড়ো ধানের ক্ষেত, কান্ডে দিয়ে কাটা কাঁটাগাছের গোড়া আর শুকনো মাটির চিপির উপর দিয়ে মছরগতিতে অগ্রসর হলুম। মাঝে মাঝে ছ' একটা চাবার সঙ্গে দেখা হয়, আর কতদূর জিজ্ঞাসা করলেই বলে, “এই কোশ-টাক আর আছে, বেশী দূর নয় !” ভোর থেকে হাঁটা শুরু ক'রে মাথার উপর হুঁয় এসে পড়ল, বেলা দুপুর হয়ে গেছে, তবুও সেই “কোশটাক” পথ আর ছুরায় না,—রণবাজপুর বরাবর এককোশ দূরেই রয়ে গেল !

বেলা তিন প্রহর গড়িয়ে গেল, সামনে তবুও সেই অন্তহীন ধানের ক্ষেত ! উন্মুক্ত আকাশ থেকে গ্রীষ্মের দারুণ অগ্নিবর্ষণের হাত এড়াবার উপায় নেই ; আমার ত' ধাত ছেড়ে যাবার উপক্রম ! গদাইলক্ষ্মী চালে একটি লোক এগিয়ে আসছে দেখে আর কতদূর আছে জিজ্ঞাসা করলুম অতি ভয়ে ভয়ে, পাছে লোকটা সেই একঘেয়ে জবাবই দিয়ে বসে, “এই আর কোশ খানেক হ'বে আর কি !”

লোকটা আমার পাশে দাঁড়িয়ে পড়ল। বঁটে আর রোগা গোছের চেহারা, তা'তে দৃষ্টি আকর্ষণ করবার মত বিশেষ কিছুই নাই, কেবল একজোড়া অসাধারণ উজ্জল আর কালো চোখ ছাড়া !

মুখের সামনে হাত নেড়ে নেড়ে বলতে লাগল, “রণবাজপুর ছাড়বার মতলব করছিলুম, কিন্তু দেখলুম যে তোমার উদ্দেশ্য ভাল, তাই তোমার জন্তে অপেক্ষা করছিলুম। তুমি ভারি চালাক, না ? ভেবেছিলে যে, না বলে কয়েই

তুমি এসে আমার পাকড়াবে? বেহারী পণ্ডিতের কি দরকার ছিল তোমার আমার ঠিকানা দেবার?”

সেই পরম সাধুটির সামনে আল্পপরিচয় দেওয়া তখন নিতান্তই বাহুল্য জ্ঞান ক’রে চুপচাপ দাঁড়িয়েই রইলুম আমার অভ্যর্থনার ধরণ দেখে, তাঁর খানিকটা আহত হ’য়ে। তাঁর পরের কথা-হ’ল, “আচ্ছা, আমার বল ত, ভগবান কোথায় আছেন ব’লে তোমার মনে হয়?”

“আজ্ঞে, তিনি আমার ভিতর আর সর্বত্রই ত’ রয়েছেন।” উত্তর দিলাম কিন্তু তখন আমার চেহারাতেও মনের বিহ্বল ভাব প্রকাশ পাচ্ছিল।

“এঁা, সর্বব্যাপী তিনি, বল কি গো, সত্যি না কি?” সাধুটি হেসে বললেন, “তা’ হ’লে বাছ। কালকে তারকেশ্বরের মন্দিরে তুমি সেই সর্বব্যাপী ভগবানের প্রস্তরমূর্ত্তির সামনে মাথা নোয়ালে না কেন হে? তোমার দৃষ্টি দরুণ হ’ল কি জান? রাস্তায় সেই লোকটা, বা’র ডাইনে বাঁয়ে জ্ঞান নেই, তা’র দ্বারা ভুলপথে চালিত হয়ে শাস্তি পেলে। আজকেও তুমি যে খানিকটা ভুগলে দেখছি।”

সর্বাস্তঃকরণে আমিও তা’ই বিশ্বাস করলুম। অত্যন্ত আশ্চর্য্য হ’লুম এ ভাবে যে, এ রকম একটা অত্যন্ত সাধারণগোছের শরীরের ভিতর কি করে এমন সর্বদর্শী চক্ষু লুকিয়ে ছিল। সেই অদ্ভুত যোগীর কাছ থেকে কেমন একটা আশ্চর্য্য প্রাণারাম শক্তি এসে আমার আচ্ছন্ন ক’রে ফেললে। মাঠের মাঝখানে সেই আগুনের হস্তার মধ্যেই আমি সঙ্গে সঙ্গে বেশ কিছু আর স্তম্ভ হ’য়ে উঠলুম।

তিনি বললেন, “সাধক ভাবে যে, সে যে পথ বেছে নিয়েছে সেইটাই হ’চ্ছে ভগবানকে পাবার একমাত্র পথ। যে যোগের দ্বারা অন্তরে ঈশ্বরভাব উদয় হয়, সেই যোগই হ’চ্ছে যে সর্বশ্রেষ্ঠ পথ তা’তে আর কোন সন্দেহ নেই। লাহিড়ী মহাশয়ও সেই কথাই আমাদের বলেছেন। অন্তরে ভগবান পেয়ে বাইরেও কিন্তু তাঁকে আমরা শীগগিরই পেতে পারি। তারকেশ্বর অত্রাত্র তীর্থস্থানে লোকেদের যে এত ভক্তিশ্রদ্ধা তা’ ঠিকই, কারণ স্থানগুলি হ’চ্ছে আধ্যাত্মিক শক্তির কেন্দ্রস্থল।”

সাধুবরের তিরস্কারের ভঙ্গি সঙ্গে সঙ্গেই অস্তহিত হ’ল। চক্ষুতে

কোমল দৃষ্টি; সন্নেহে আমার কাঁধ চাপড়ে দিয়ে বল্লেন, “নবীন যোগি, দেখছি যে তুমি তোমার গুরুদেবের কাছে থেকে পালাচ্ছ। আরে, তোমার বা’ বা’ প্রয়োজন সবই ত’ তাঁ’র কাছেই আছে, তোমার আর ভাবনা কি? তাঁ’র কাছে ফিরে যাও। হিমালয় পর্বত কি গুরু হয় নাকি?” রামগোপাল বাবু ঠিক সেই ভাবেরই পুনরুক্তি করলেন বা’ শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজি আমাদের শেষ সাক্ষাতের সময় ইঙ্গিতে প্রকাশ করেছিলেন।

রামগোপাল বাবু আমার দিকে একটি রহস্যময় দৃষ্টি নিক্ষেপ ক’রে বলতে লাগলেন, “গুরুরা তাঁ’দের অবস্থান বিশ্ববিধানে কোন বিশেষ স্থানে সীমাবদ্ধ ক’রে রাখবার জন্তে বাধ্য ন’ন। ভারত বা তিব্বতের হিমালয়ের যোগি-ঋষিদের ওপর কোন একচেটে অধিকার নেই! এ ছ’ বায়গা ছাড়া ভূভারতে আর কোথাও যে মুনিঋষিদের পাওয়া যায় না, তা’ নয়। অস্তরের মধ্যে যে জিনিস পাবার জন্তে লোকে অস্থির হয় না, তাঁ’র জন্তে চারধাম ঘুরে বেড়ালেও কিছুই দর্শন লাভ হয় না। সাধক আধ্যাত্মিক জ্ঞানলাভের জন্তে যেই পৃথিবীর শেষপ্রান্ত পর্যন্তও যেতে মনস্থ ক’রে, অমনি দেখতে পায় যে, তাঁ’র গুরু তাঁ’র কাছেই এসে হাজির হয়েছেন।”

নীরবে মনে মনে সায় দিলুম। মনে পড়ল কাশীর আশ্রমে আমার প্রার্থনার উত্তরে জনাকীর্ণ গলিপথে শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজির সঙ্গে সাক্ষাৎ।

“একটা ছোটগোছের ঘর যোগাড় ক’রে নিতে পারবে কি, যেখানে দরজা বন্ধ ক’রে তুমি একলা থাকতে পা’র?”

“আজ্ঞে হ্যাঁ।” দেখলুম যে সাধারণ থেকে ব্যক্তিবিশেষের ব্যাপারে সাধুসাহসর অতি দ্রুতবেগে নেমে আসছেন।

“তা’ই হ’বে তোমার গুহা!” ব’লে আমার উপর তিনি যে জ্ঞানালোক-প্রদীপ্ত দৃষ্টিপাত করলেন তা’ আজ পর্যন্তও ভুলি নি। “সেটাই হ’বে তোমার হিমালয় পাহাড় আর সেখানেই ভগবানকে খুঁজে পা’বে, বুঝলে?”

তাঁ’র সরল কথাগুলো তৎক্ষণাৎ আমার হিমালয়ের জন্ত জীবনব্যাপী দৌরল্য একেবারে দূর করে দিলে। চিরতুবারাবৃত পার্শ্বতাব্ধি থেকে আমি বেন সেই আগুনে নানুমান ধানক্ষেতের মাঝে হঠাৎ জেগে উঠলুম।

“বৎস, তোমার ঈশ্বরলাভের আকাঙ্ক্ষা বাস্তবিকই প্রশংসার যোগ্য।

তোমার ওপর আমার প্রগাঢ় স্নেহ জন্মেছে।” ব’লে রামগোপালবাবু আমার হাত ধ’রে একটি কিল্লতকিমাকার কুঁড়ে ঘরের ভিতর নিয়ে গেলেন। মাটির ঘর, নারকেলপাতা দিয়ে ছাওয়া, ঢুকতে দরজায় বাঁপ লাগান।

সাধুপ্রবর তাঁর ছোট্ট কুঁড়েঘরটির ভিতর একটি ছায়াশীতল বাঁশের মাচার উপর নিয়ে গিয়ে আমায় বসালেন। একখণ্ড মিছরি আর খানিকটা লেবুর সরবত্ দিয়ে অতিথিসংকার করবার পর তিনি মাটির রোয়াকে গিয়ে পদ্মাসন ক’রে ধ্যানে বসলেন। আমিও তাঁর কাছে একসঙ্গে ধ্যানে বসলুম। ঘণ্টাচারেক পরে ধ্যানমুদ্রিত নয়ন উন্মুক্ত ক’রে দেখলুম যে, জ্যোৎস্নাস্নাত যোগিবরের দেহ তখনও নিখর নিষ্পন্দ! উদরে তখন ক্ষুধার আগুন জ্বলছে, রক্তচক্ষু প্রদর্শনে উদরকে শাসন করে বোঝাচ্ছি যে, মানুষ কেবল অন্তরেই দাস নয়, হেনকালে রামগোপালবাবু আমার কাছে এগিয়ে এসে বল্লেন, “আহা, দেখছি বড্ড ক্ষিধে পেয়েছে, না? আচ্ছা, শীগ্গিরই খাবার তৈরী হচ্ছে!”

রোয়াকের এককোণে মাটির উলুন জেলে ভাত আর ডাল চটপট সিদ্ধ ক’রে নামিয়ে কলাপাতায় বেড়ে দেওয়া হ’ল। গৃহস্থামী রন্ধন কার্যে আমার সর্ববিধ সহায়তাই সবিনয়ে প্রত্যাখ্যান করলেন। কথায় আছে “অতিথি নারায়ণ”, তাঁর সেবা যে পুণ্যকর্ম, এ নীতি হিন্দুরা স্মরণাতীত কাল হ’তে অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গেই পালন করে। পরবর্তীকালে পৃথিবী ভ্রমণের সময় আমি দেখে চমৎকৃত হয়েছিলুম যে, বহু দেশেরই গ্রামবাসীদের মধ্যে এই রকম অতিথির আদরআপ্যায়ন বা তাঁর প্রতি সম্মান ব্যবহার প্রকাশ পায়। সহরবাসীর অতিথিসেবার উৎসাহ, অপরিচিত আনন্দের আবির্ভাবের আতিশয্যে ক্রমশঃই হ্রাস হয়ে পড়ে।

জঙ্গলের ভিতর ছোট্ট সেই গাঁয়ের একটেরে যখন আমি সেই যোগিবরের কাছে চাপটালি খেয়ে বসেছিলুম, তখন হাটবাজারের শব্দ খুব দূরে বলেই মনে হচ্ছিল। কুঁড়ের ভিতরে সেই ছোট্ট ঘরটি একটি মৃদু স্নিগ্ধকোমল আলোয় যেন অপরূপ রহস্যময়। কতকগুলো ছেঁড়া কঞ্চল পেতে রামগোপালবাবু আমার বিছানা করে দিলেন আর নিজে একটা মাদুরের উপরেই বসলেন। তাঁর আধ্যাত্মিক মোহিনীশক্তির আকর্ষণে অভিভূত হ’য়ে আমি ভরসা করে

এই অহুরোধটি ক'রে বস্‌লুম, “ম’শায়, আমায় সমাধি লাভ করিয়ে দিন না কেন?”

“বাবা, ভগবৎসঙ্গ লাভ করিয়ে দিতে পারলে আমি খুবই খুসী হ’তুম, কিন্তু আমার এ যায়গায় ত’ তা’ করবার নয়।” সাধুপ্রবর তখন অক্টোব্রীলিত-নয়নে আমায় নিরীক্ষণ ক’রে বললেন, “তোমার গুরুদেব সে জ্ঞান তোমায় শীগ্‌গিরই দেবেন। তোমার শরীর এখন পর্য্যন্ত তেমন ভাবে তৈরী হয় নি। ছোট ইলেকট্রিক ডুমে যেমন অতিরিক্ত কারেন্ট চালালে তক্ষুণি তা’ ফেটে যায়, তোমার স্নায়ুগুলোও তেমনি সমাধিলাভের ভিত্তে এখনও উপবৃত্ত ভাবে তৈরী হয় নি। তোমায় যদি আমি এখনই ব্রহ্মানন্দ উপভোগ করাই তা’ হ’লে তুমি এক্ষুণি জ্বলে শেষ হ’য়ে যাবে, মনে হবে যেন তোমার শরীরকোষের প্রতি অণুপরমাণুতে আগুন লেগে গেছে।”

চিন্তিতভাবে যোগিবর বস্তুতে লাগলেন, “তুমি আমার কাছ থেকে ব্রহ্মজ্ঞান চাইছ! কিন্তু আমি ভাবছি, দীনাতিদীন আমি, সামান্য যেটুকু ধ্যানধারণা করতে পেরেছি—তা’ দিয়ে আমি ভগবৎরূপা লাভ করতে পেরেছি কি না, আর শেষ হিসেবনিকেশের দিনে তাঁ’র চোখে আমার কি মূল্য দাঁড়াবে, তা’ও ত’ বুঝে উঠতে পাচ্ছি নে!”

“ম’শায়, আপনি ত’ একান্তহৃদয়ে বহুদিন ধরেই ভগবানকে ডেকে আসছেন। তবে আর ভাবনা কিসের?”

“তা’ বটে, তবে বেশী আর আমি কিছু করতে পারি নি। বেহারী পণ্ডিত বোধ হয় তোমায় আমার জীবনের কথা কিছু ব’লে থাকবে। বিশ বছর ধ’রে একটি নির্জন গুহায় আমি রোজ আঠার ঘণ্টা ক’রে বসে ধ্যান করতুম। তারপর ওখান থেকে চলে গিয়ে আমি আরও একটি দুর্গম গুহায় প্রবেশ ক’রে সেখানে পঁচিশ বছর ধ’রে রোজ প্রায় কুড়ি ঘণ্টা ক’রে যোগাভ্যাস করতুম। আমার ঘুমের দরকার হ’ত না, কারণ আমি নিত্য ভগবৎসঙ্গ লাভ করতুম। সাধারণ অচেতন অবস্থার আংশিক শান্তির চেয়ে সমাধির পরিপূর্ণ শান্তির নব্যেই আমার দেহ পূর্ণবিশ্রাম লাভ ক’রত।

“ঘুমের সময় মাংসপেশীগুলো শিথিল হয়ে পড়ে, কিন্তু হৃদয়, ফুসফুস এবং রক্তচলাচলের কাঁয় ত’ সর্বদাই চলেছে—তা’দের কিছুমাত্র বিশ্রাম নেই।

সমাধিলাভ হ'লে বিশ্বশক্তির বৈজ্ঞানিকপ্রবাহে শরীরের ভিতরের বস্তুটুকু-
গুলোর প্রাণশক্তি যেন স্তম্ভিত অবস্থায় থাকে। এই উপায়েই বছরের
পর বছর ধ'রে আমার ঘুমের দরকার হয় নি।”

“আশ্চর্য্য! আপনি এতদিন ধ'রে ধ্যানধারণা ক'রে এলেন, আর বলেন
কি না ভগবানের রূপালাভ করবেন কি না? তা' হ'লে আমাদের মত
অভাগা অকিঞ্চনদের কি গতি হবে, বলুন দেখি?” ব'লে ত' অবাক হয়ে তাঁ'র
দিকে চেয়ে রইলুম।

“বাবা, এটা বুঝ না কেন যে, ভগবানের অনন্তরূপ। তাঁ'কে মাত্র
পয়তাল্লিশ বছর ধ্যান করেই সব বুঝে ফেলব—এ আশা নিতান্ত ছরাশা।
বাবাজী আমাদের আশ্বাস দিয়েছেন যে, এমন কি সামান্যমাত্র ধ্যানেই দারুণ
মৃত্যুভয় বা পরলোকের ভয় নিবারণ করে। দেখ, তোমার আধ্যাত্মিক আদর্শ
সামান্য একটা ছোট্ট পাহাড়ের মত করে রেখ না। তাঁ'কে একেবারে ভগবৎ-
প্রাপ্তির নক্ষত্রলোকে তুলে ধ'র। কঠোর পরিশ্রম করলে নিশ্চয়ই তুমি
সেখানে পৌঁছুতে পারবে।”

আশায় উন্নীত হ'য়ে তাঁ'র কাছ থেকে আরও সব কথা শুনতে চাইলুম।
তিনি লাহিড়ী মহাশয়ের গুরু, বাবাজী মহারাজের সঙ্গে তাঁ'র প্রথম
সাক্ষাতের অদ্ভুত কাহিনী সব বিবৃত করলেন। মাবারাতের কাছাকাছি
রামগোপাল বাবু মৌনাবলম্বন করলেন, আর আমি কঞ্চলগুলোর ওপর শুয়ে
পড়লুম। চোখ বন্ধ করতে দেখলুম যে, চারধারে যেন অনবরত বিদ্যুৎ
চম্কাচ্ছে, আর আমার ভিতরকার অনন্ত আকাশ যেন একটা উজ্জল
জ্যোতির বতায় প্লাবিত! চোখ মেলে বাইরে চাইলুম—দেখলুম সেই
একই চোখবালুসানো আলো! অস্ত্রচক্ষুতে দেখতে পেলুম, যেন ঘরটা সেই
অনন্ত মহাকাশের একটা অংশ হয়ে গেছে।

“ঘুম আসছে না, না কি?”

“কি করে ঘুমোই বলুন, চোখ বুঁজলেই বা কি আর চাইলেই বা কি।
চোখের সামনে যদি অনবরত বিদ্যুৎ চম্কায়ে, তা' হ'লে ঘুম আসবে কি ক'রে
বলুন?”

রামগোপালবাবু স্নেহে বললেন, “যাক তোমার ভাগ্য ভাল। এ

রকম অনুভূতি, আর এ রকম আধ্যাত্মিক জ্যোতিঃর দর্শন সহজে কারুর হয় না।”

ভোরবেলা উঠতেই রামগোপালবাবু আমার এক টুকরো মিছরি দিয়ে বললেন, “এবার স্বস্থানে প্রস্থান ক’র আর কি!” তাঁর কাছ হ’তে বিদায় নিয়ে আসতে আমার এতদূর অনিচ্ছা হ’ল যে, দুইগাল বেয়ে অশ্রুধারা অজস্রধারে গড়িয়ে পড়তে লাগল।

রামগোপালবাবু তখন অত্যন্ত কোমলস্বরে বললেন, “বাক্, নেহাৎ শুধুহাতে তোমার আজ আর ফেরাব না, একটা কিছু তোমার জন্তে করছি।” ব’লে একটু মৃদু হেসে আমার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলেন। পা দুটো যেন মাটিতে গেঁথে গেল, আর নড়তে চড়তে পারলুম না। দু’টি চক্ষুদ্বার দিয়ে শান্তির বিরাট বজ্রাপ্রবাহ যেন বিশাল জলপ্রপাতের মতন প্রবল উচ্চ্বাসে অন্তরের মধ্যে প্রবেশ করতে লাগল। সঙ্গে সঙ্গে আমার পিঠের একটা বেদনা একদম আরাম হয়ে গেল; বেদনাটা বহুবছর ধরে মাঝে মাঝে আমার কষ্ট দিচ্ছিল। অপক্লপ জ্যোতির্ময় আনন্দমাগরে স্নান ক’রে উঠে যেন নবজন্ম পেলুম—আর কঁাদলুম না! সাধুটির চরণ স্পর্শ ক’রে জঙ্গলের রাস্তা ধরে তারকেশ্বরের দিকে যাত্রা করলুম।

সেই পবিত্র তীর্থস্থানে আবার দ্বিতীয়বার দর্শনের জন্ত গিয়ে হাজির হ’লুম। এবার বাবা তারকেশ্বরের সামনে দণ্ডবৎ হ’য়ে পড়ে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করলুম। অন্তর্দৃষ্টির সামনে দেখতে পেলুম যে, গোলাকার প্রস্তরখণ্ডটি যেন ক্রমশঃই বদ্বিত হয়ে মহাশূণ্ডের নানাস্তরে পরিণত হয়ে দাঁড়িয়েছে। চক্রের মধ্যে চক্র, অঞ্চলের পর অঞ্চল, সবই যেন আধ্যাত্মিক সম্পদে পরিপূর্ণ!

ষট্টিখানেক বাদে কলকাতার ট্রেন ধরলুম। আজ আমার ভ্রমণের শেষ উচ্চ পর্বতমালার মধ্যে নয়, কিন্তু হিমালয়েরই মত মহান উচ্চ আমার গুরুদেবের সাক্ষাতে!

১৪শ পরিচ্ছেদ

সমাধি লাভ

লজ্জায় যেন মাথা কাটা যেতে লাগল, ঘাড় হেঁট ক'রে গিয়ে বল্লুম—“এলুম, গুরুদেব!” মুখ দিয়ে আর কিছু কথা বেরুল না। শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজি বল্লেন, “চল, চল, রান্নাঘরে গিয়ে কিছু খাবার যোগাড় দেখা যাক।” তাঁ'র কথাবার্তা এত সহজ আর স্বাভাবিক, যেন এই মায় কয়েক ঘণ্টা আমাদের দেখা সাক্ষাৎ হয় নি।

“গুরুদেব, আশ্রমের কর্তব্য সব ত্যাগ ক'রে হঠাৎ এখান থেকে ছেড়ে চলে যাওয়াতে আপনি নিশ্চয়ই অসন্তুষ্ট হয়েছেন, ভেবেছিলুম রাগ করবেন।”

“না হে, না, মোটেই নয়। রাগ কোথা থেকে হয়, জান? অবদমিত ইচ্ছা থেকেই রাগের উৎপত্তি। আমি ত' কারুর কাছ থেকে কোন কিছুই প্রত্যাশা করি না, কাবেই তা'দের কোন কাষ আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে হ'তে পারে না। ব্যক্তিগত আমার কোন উদ্দেশ্য সাধনে ত' তোমাকে আমার প্রয়োজন নেই। তুমি যে সত্যিই স্নেহী হয়েছ, তা'তেই আমি স্নেহী।”

“গুরুদেব, অহৈতুকী স্নেহ যে কি, সাধারণ লোকের কাছে সে ধারণা একেবারে অস্পষ্ট। কিন্তু জীবনে আজ এই প্রথম আমি আপনার দেহ শরীরে তা'র খাঁটি উদাহরণ দেখলুম। এ সংসারে ত' সবই জানা আছে। ন বলে কয়ে বাপের কাষকর্ম ফেলে ব্যাটা যদি সরে পড়ে, তা' হলে বাপের কখনও তা'কে সহজে ক্ষমা করতে পারে না। কিন্তু আশ্চর্য্য, আপনার কিছুমাত্র বিরক্তিও এল না, এঁ্যা,—বিশেষতঃ কত সব কাষ অসম্পূর্ণ কাষ রেখে গিয়ে, আপনাকে কত না অসুবিধায় ফেলে গিয়েছিলুম, বলুন ত'?”

দুজনেরই চোখে জল। আনন্দের ঢেউ এসে আমার যেন ভাসিয়ে দিলে আমি বেশ বুঝতে পারছিলুম যে গুরুরূপে ঈশ্বর, আমার হৃদয়ের মত ভালবাসার পরিধি ভগবৎপ্রেমের অসীম ব্যাপ্তির মধ্যে বিস্তৃত ক'রে দিচ্ছেন

দিনকতক বাদে একদিন সকালে আমি গুরুদেবের বসবার ঘর খালি দেখে গিয়ে ঢুকলুম,—মতলব ছিল ধ্যানে বসব। কিন্তু নানা অশান্ত আর অবাধ্য চিন্তা এসে আমার সে সাধুপ্রচেষ্টা ব্যর্থ করে দিলে। ব্যাধের সামনে এক ঝাঁক পাখীর মত তা'রা চার ধারে উড়ে ছড়িয়ে পড়ল। ভিতরকার একটা দূরের বারান্দা হ'তে শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজির কণ্ঠস্বর শোনা গেল, “মুকুন্দ!” মনটা আমার অশান্ত চিন্তাদের মতই বিদ্রোহী হ'য়ে উঠল। মনে মনে বললুম, “গুরুদেব ত' সর্বদা ধ্যান করতে বলেন, আর এ ঘরে এলুম কেন তা'ও ত' জানেন; তখন ত' তাঁ'র আর আমার বিরক্ত করা উচিত নয়।”

আবার ডাক এ'ল, গৌয়ার্ত্তুমি ক'রে চুপ ক'রে বসেই রইলুম। তিন বারের বার ডাকেতে বেশ বকুনির ঝাঁঝ আছে টের পাওয়া গেল। তবুও প্রতিবাদের স্বরে বললুম, “মশাই, ধ্যান করছি।”

গুরুদেব চোঁচিয়ে বললেন, “হ্যাঁ, হ্যাঁ, খুব বুঝেছি, তোমার কি রকম ধ্যান করা হ'চ্ছে! মন ত' বাড়ের মুখে এঁটো পাতা। শীগ'গির নিচে নেমে এস।”

মনের আসল রূপটি ধরা পড়াতে আর তিরস্কৃত হ'য়ে, ক্ষুণ্ণমনে তাঁ'র পাশে এসে দাঁড়ালুম; গুরুদেব অত্যন্ত স্নেহকোমল স্বরে সাঙ্ঘনা দিয়ে বললেন, “বাছা, তুমি যা' চাইছ কুবেরও তা' তোমায় এনে দিতে পারে না।” তাঁ'র দৃষ্টি শান্ত, গভীর, অতলস্পর্শী, বললেন, “তোমার অন্তরের ইচ্ছা পূর্ণ হ'বে!”

শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজি কদাচিৎ হেঁয়ালিতে কথা বলতেন। আমার বুদ্ধি গুলিয়ে গেল। ঠিক বুঝতে পারলুম না তিনি কি বলতে চাইছেন। যাক, তা'রপর তিনি ঠিক বুকের মাঝখানে হাত দিয়ে মৃদু আঘাত করলেন।

আমার সমস্ত শরীর যেন জমে অনড় পাথর হয়ে গেল। ফুসফুস হ'তে কে যেন একটা প্রকাণ্ড চুষক দিয়ে সমস্ত নিঃশ্বাস একেবারে শুঁষে:টেনে বার ক'রে নিয়েছে। আত্মা আর মন জড়দেহের বন্ধন হতে সঙ্গ সঙ্গ মুক্ত হয়ে তরল জ্যোতিঃধারার ত্রায় যেন প্রতি লোমকূপ হ'তে বেরিয়ে চলেছে। শরীর মৃতবৎ, কিন্তু এমন জাগ্রত অবস্থা, এত পরিপূর্ণ জ্ঞান যেন জীবনে আর কখনও পাই নি। আমার আত্মবোধ এখন আর ক্ষুদ্র জড়-

দেহের মধ্যে আবদ্ধ নয়, চতুর্দিকের সকল বস্তুর যেন প্রতি অণুপরমাণু পরিব্যাপ্ত হ'য়ে পড়েছে। দূর রাস্তার লোকগুলো যেন আমারই হৃদয় বিস্তৃতির মধ্যে ধীরে ধীরে সঞ্চরণ ক'রে ফিরছিল। গাছপালা, লতাপাতা, শিকড়গুলো যেন মাটির মৃদু স্বচ্ছতার ভিতর দিয়ে দেখা যাচ্ছিল। গাছের ভিতরকার রসসঞ্চালন অবধি আমি বেশ স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিলুম।

আশে পাশের সব জিনিসই একটা পরিষ্কার দৃশ্যপটের মতন চোখে সামনে স্পষ্ট! আমার সমুখদৃষ্টি পরিবর্তিত হ'য়ে গিয়ে যেন একটা বিরাট মহাবিশ্বব্যাপী দৃষ্টিতে পরিণত হ'ল,—সকল বস্তু সর্বত্র একই সময়ে দৃশ্য হ'চ্ছে! মস্তিষ্কের পিছন দিয়ে দেখতে পেলুম, রায়ঘাট লেন হ'তে বহুদূর পর্যন্ত লোকগুলো হেঁটে চলেছে; আরও দেখা গেল যে, একটা সাদা গরু ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে। আশ্রমের খোলা সদর দরজার সামনের জায়গাটায় এসে দাঁড়াতে, তা'কে আমি এই দেহের চক্ষুটুটি দিয়ে দেখতে লাগলুম। আবার ধীরে ধীরে ইন্টার দেওয়ালের ওপাশে সে গিয়ে পড়লে, তখন তা'কে বেশ স্পষ্টই দেখতে পাচ্ছি।

আমার চোখের সামনে স্তব্ধ দৃশ্যপটের ভিতরকার সমস্ত জিনিস যেন বায়স্কোপের পরদার ছবির মতন কাঁপছিল। আমার শরীর, গুরুদেবের শরীর, থামেঘেরা দালান, আসবাবপত্র, মেঝে, গাছপালা, সূর্য্যাকিরণ, মাঝে মাঝে হঠাৎ ভীষণ আলোড়িত হ'য়ে উঠে এক বিরাট জ্যোতিঃসমুদ্রে ডুবে গ'লে যাচ্ছিল—এক প্লাস জলে চিনির দানা দিয়ে ঝাঁকালে যেমন সেগুন একেবারে গ'লে যায়! সেই জ্যোতিঃসাগরে এক হ'য়ে বিলীন হ'য়ে যা'বার মাঝে মাঝে নানাবিধ সৃষ্টির রূপপরিগ্রহে সেই অপরূপ আলো পরিবর্তন ঘটছিল, আর সেই রূপান্তরগ্রহণের সময় সৃষ্টির কার্য্যকারণ তরঙ্গ আভাসও প্রকাশ পাচ্ছিল।

অতলগভীর নীরব আনন্দসাগরে মন তখন ভাসছে। ঈশ্বরোপলব্ধি অসম্ভব করলুম এক অপার অসীম আনন্দ; তাঁ'র দেহ যেন অগ্নি জ্যোতিঃতন্তু দিয়ে গড়া! আমার ভিতর তাঁ'র অপূর্ণ আবির্ভাবের বিরাট মহিমা যেন ক্রমশঃ দেশ, মহাদেশ, পৃথিবী, সূর্য্যচন্দ্র, গ্রহনক্ষত্র, নীহারিকা মহাশূন্রে ভাসমান জগৎ সকল, সবই যেন ছেয়ে ফেলতে লাগল। আনন্দ অনন্ত সত্তার মধ্যে সমগ্র বিশ্ব যেন রাক্ষিতে দূর থেকে দেখা কোন সহরের

ঈশ্বর আলোকে দীপ্ত ! পৃথিবীমণ্ডলের সুস্পষ্ট রেখা যেন কোন সুদূরে মিলিয়ে গেছে, সেখানে এক অতি মৃদু আর মিষ্ট আলোর অনির্বাক্য জ্যোতিঃ ! এ জ্যোতিঃের মৃদু মিষ্টতা অবর্ণনীয়। সৌরমণ্ডলের গ্রহনক্ষত্রের অজ্ঞাত ছবি সব যেন আরও স্থূল আলোয় গড়া !

যেন এক অনন্ত উৎসমুখ হ'তে স্বর্গীয় আলোর দ্বারা সহস্রধারে উৎসারিত হয়ে নক্ষত্রপুঞ্জরূপে জলে উঠে আবার এক অনির্বাক্যীয় মৃদু জ্যোতির্মণ্ডলে পরিণত হ'য়ে পড়ল। বারবারই দেখতে লাগলুম, যেন সেই সৃজনকারী রশ্মিগুলো গাঢ় সংবদ্ধ হ'য়ে নক্ষত্রপুঞ্জে পরিণত হ'য়ে আবার স্বচ্ছ অগ্নিশিখারূপে পরিণত হ'য়ে যেতে লাগল। “ভাব হ'তে রূপে অবিরাম যাওয়া আসা”—যেন এক সুসম্বদ্ধ ছন্দে আসা যাওয়ার তালে তালে অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ড এক স্বচ্ছ সুনির্মল জ্যোতিঃতে রূপান্তরিত হ'ল ; বিরাট অগ্নিমণ্ডল যেন বিশাল গগনে পরিণত হ'ল।

আমার উপলব্ধি হ'ল যে, সেই উর্দ্ধতম স্বর্গের কেন্দ্রস্থলই হ'চ্ছে আমার মস্তুরের অন্তঃস্থলের সহজাত অল্পভূতির স্থান। বিশ্বপ্রকৃতির সর্বত্রই যেন আমার সত্তা হ'তে এক অপূর্ব জ্যোতিঃের ছটা সহস্রধারে ছড়িয়ে পড়ছে ! “তাহারি অমৃতধারা জগতে যেতেছে বয়ে”। দেহে মনে অমৃতের ধারা বয়ে চলেছে তরলভাবে, তীব্র বেগে, চেউয়ের ওপর চেউ তুলে। নাদব্রহ্মের শব্দরূপ ওঙ্কারধ্বনি, প্রণব বাঙ্কারে গুনতে পেলুম—বিশ্বসৃষ্টির প্রথম স্পন্দন !

হঠাৎ আবার নিশ্বাস ফুসফুসের ভিতর ফিরে এল। কি রকম নৈরাশ্রে যে মন ভরে উঠল, তা' আর বর্ণনা করা যায় না। আমার সে অসীম বিরাট সত্তা একেবারে লোপ পেলে। আবার সেই সামান্য ক্ষুদ্র দেহপিঞ্জরে এসে আবদ্ধ হ'লুম, যা'তে ক'রে আত্মার অতবড় বিরাট ব্যাপ্তিকে ধরে রাখা যায় না। বাইবেলবর্ণিত সেই অমিতব্যয়ী পুত্রের মত আমি আমার বিরাট বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের আবাস পরিত্যাগ ক'রে, এই ক্ষুদ্র দেহভাণ্ডের মধ্যে এসে আবার প্রবেশ করলুম।

গুরুদেব পাশেই নিশ্চলভাবে দাঁড়িয়ে ছিলেন। বহুদিনের বাঞ্ছিত সমাধির অভিজ্ঞতালাভে আমি সক্রতজ্ঞচিন্তে তাঁ'র পদতলে পড়তে যাচ্ছিলুম দেখে, তিনি আমায় সোজা দাঁড় করিয়ে দিয়ে ধীরস্বরে বললেন, “দেখ, এ

আনন্দমধুপানে উন্নত হ'য়ে যেয়ো না ; জগতে তোমায় অনেক কাষ ক'রতে হ'বে। এস, এখন বারান্দা কাঁটপাট দিয়ে তা'রপর একটু গঙ্গার ধারে গিয়ে বেড়ান যা'ক, চল !”

একটা কাঁটা আনলুম। জানতুম যে গুরুদেব আমার সুসম্বন্ধ জীবনযাপনে শিক্ষা দিচ্ছেন। আত্মা বিশ্বসৃষ্টির অসীম রহস্যের সন্ধানে ব্যাপৃত থাকলেও, দেহ কিন্তু তা'র দৈনন্দিন কর্তব্যসকল ঠিক নিয়মিত ক'রে যাবে। খানিক পরে যখন বেড়াতে বেরোলুম, তখনও দেহমন অনির্বচনীয় আনন্দে মগ্ন। দেখলুম, আমাদের দু'টো শরীর যেন দু'টো ছায়াছবি, এক আলোর নদীর ধারের রাস্তা দিয়ে ধীরে ধীরে চলেছে !

গুরুদেব বোঝাতে লাগলেন, “এই বিশ্বজগতে যা' কিছু আছে, তা'র আকৃতিপ্রকৃতি, গতি, শক্তি, সবই কিছু সেই পরমাত্মাই ধারণ ক'রে রয়েছেন, তবুও তিনি এই জগৎকারণের বহিভূত, নিগুণ, নিষ্ক্রিয়রূপেই অবস্থান করছেন। সেই অতীন্দ্রিয়জ্ঞান সহজপ্রাপ্য নয়, তিনি ‘অবাস্তনসগোচর’।* যে সব উচ্চশ্রেণীর সাধকের এই রক্তমাংসের দেহেই ঈশ্বরতাবের আবির্ভাব হয়, তাঁদের এই ধরণের দুইপ্রকার জীবনের অল্পভূতি থাকে। সংসারের কর্তব্য সব বেশ নিষ্ঠার সঙ্গে ক'রে যাচ্ছে, অথচ অন্তরে ব্রহ্মানন্দসাগরে ডুবে আছে। ‘আনন্দাক্ষেপ ঋষিমানি ভূতানি জায়ন্তে’—তাঁর অসীম অপার আনন্দসঙ্গী হতেই ত' সকল প্রাণীর উৎপত্তি। এই ক্ষুদ্র দেহ-পিঞ্জরে তা'রা যতই আবদ্ধ হো'ক না কেন—ভগবান নিশ্চয়ই চান যে, তাঁর প্রতিমূর্তি এই সব জীবাত্মাসকল, পরিশেষে সকল ইন্দ্রিয়বোধ হ'তে মুক্ত হ'য়ে তাঁর সঙ্গে আবার পুনরায় মিলিত হ'বে।”

এই আত্মদর্শনলাভে আমার কতকগুলো বিশেষ শিক্ষা হ'ল। দৈনিক চিন্তা-শ্রোত রুদ্ধ ক'রে মনের যে শান্ত্যাব আসত, তা'তে আমার দেহটা যে রক্ত-

* বাইবেলের সব উক্তি ঈশ্বরের ত্রিমূর্তির নির্দেশক—পিতা পুত্র ও পবিত্রাত্মা (হিন্দুশাস্ত্রে ওঁ তৎ সৎ রূপে বর্ণিত)। ঈশ্বর পিতারূপে কেবল, অব্যক্ত, আর সৃষ্টির অতীত। পুত্ররূপে তিনি খ্রীষ্টচেতন্য, (ব্রহ্মা অথবা কুটস্থচেতন্য) সৃষ্টির অধীন। এই খ্রীষ্টচেতন্য হ'চ্ছে নিষ্ক্রিয় ব্রহ্মের একমাত্র রূপ। এর বহিঃপ্রকাশ অথবা “সাক্ষী” হচ্ছে “পবিত্রাত্মা” অথবা ওঙ্কার, সৃজনকারী অদৃশ্য ভগবৎ শক্তি, যা' স্পন্দনের মধ্য দিয়ে সকল সৃষ্টি গঠন করে। ধ্যানে এই ওঙ্কার বা প্রণববাক্যের স্বর্গীয় আনন্দময় ধ্বনি ভক্তের নিকট পরমতত্ত্বের প্রকাশ করে।

মাংস আর হাড়ের খাঁচা,—এই জড়জগতে ঘুরে বেড়াচ্ছে, সে ভাব থেকে মুক্তি পেতুম। নিশ্বাসপ্রশ্বাস আর অস্থির মন, যেন ঝড়ের মতন একটা জ্যোতিঃ-সাগরের উপর আছড়ে প'ড়ে, তা'র উপর তরঙ্গ তুলে, এই সব জড়পদার্থের সৃষ্টি করছে—আকাশ, পৃথিবী, মানুষ, পশুপক্ষী, প্রাণী, বৃক্ষলতা, কীটপতঙ্গ! যতক্ষণ না এই সব ঝড়কে শাস্ত করা যায়, ততক্ষণ সেই অসীম সত্তাকে এক অথগু জ্যোতিঃরূপে অনুভব করা যায় না। যতবারই আমি ঐ দুটোকে শাস্ত করেছি, দেখেছি যে, সৃষ্টির অসংখ্যরূপ যেন এক অনন্ত জ্যোতিঃসাগরে গ'লে যাচ্ছে, ঠিক যেমন সমুদ্রের উপর ঝড় শাস্ত হয়ে গেলে, সমুদ্র এক অথগু বিস্তৃতিতে পরিণত হয়।

শিষ্য যখন ধ্যানধারণায় মনকে এমনভাবে শক্ত করে গড়ে তোলে, যা'তে করে কোন বিরাট অনুভূতি তা'কে অভিভূত ক'রে ফেলতে পারে না, তখনই গুরু ব্রহ্মানন্দলাভের অনুভূতি তা'কে দান করেন। মনের ঋজুতা বা বুদ্ধিবৃত্তির উৎকর্ষ বা একান্ত ইচ্ছা থাকলেই যে তা' দেওয়া যায়, তা' নয়। অবিরত যোগাভ্যাস সাধনে বিরাট উন্নতি ও শক্তিসঞ্চয় হ'লে এবং গুণা-ভক্তি থাকলে, তবেই মন সর্বব্যাপিস্থের বিরাট অনুভূতির প্রচণ্ড ধাক্কা সহিতে পারে। প্রকৃত ভক্ত যিনি তাঁ'র একটা স্বাভাবিক পরিণতি অতি সহজেই এসে যায়। তাঁ'র ঈশ্বরলাভের প্রচণ্ড আকাঙ্ক্ষা, তাঁ'কে দুর্নিবার বেগে ঈশ্বরের দিকে আকর্ষণ করতে থাকে, আর সর্বদ্রষ্টা, সর্বজ্ঞ, প্রেমময় ভগবানও ভক্তের প্রেমের টানে তাঁ'র অন্তরে এসে বাঁধা পড়েন!

এই বিরাট ভাবের মহিমা উপলব্ধি ক'রে, কিছু দিন পরে আমি “সমাধি” নামে এই কবিতাটি রচনা করেছিলুম—

সমাধি

আলোছায়ার মায়াজাল ছিঁড়ে গেছে আজ,

দুঃখেরও বাষ্পমাত্র নাই,—

ক্ষণস্থায়ী আনন্দের উষা, এবে তা'ও অপগত,

ইন্দ্রিয়ের ক্ষীণ মরীচিকা সেও মিলায়েছে।

প্রেম, ঘৃণা, স্বাস্থ্য, রোগ, জনম, মরণ,
 মায়াপটে প্রকাশিত এ সবার মিথ্যাছায়া পাইয়াছে লয়।
 হাসির তরঙ্গোচ্ছ্বাস, নিচুর ব্যঙ্গের গুপ্তশিলা, বিবাদে ঘৃণাবর্ত্ত,
 মহানন্দপারাবারে মিশিয়াছে এবে।

মায়া প্রবল বাধা,
 গভীর ঈশ্বরানুভূতির বাহুদণ্ড স্পর্শে চিরশান্ত আজ।
 নিখিল জগৎ,—বিস্মৃত স্বপন মোর সব,
 সঞ্চরিয়া ফিরিতেছে অবচেতনার মাঝে,—
 নবজাগ্রত মোর দিব্যস্মৃতি আক্রমণ তরে।

আমার অস্তিত্ব আজ মহাবিশ্বছায়ায় অতীত,
 কিন্তু সেও যেন একেবারে আমা'ছাড়া নয়;
 ধরাপৃষ্ঠে বর্ত্তমান নিস্তরঙ্গ সাগর যেমন,—
 যদিও তরঙ্গদল বাঁচে নাকো সে সাগর বিনা।

জাগ্রৎ, সুষুপ্তি, স্বপ্ন, গভীর তুরীয়ানন্দ ভাব,
 ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান, আর আমা'তরে নয়,
 শুধু আছে শাস্বতিক, সর্বব্যাপী আমি—আমিই সর্বতঃ।

গ্রহনক্ষত্র আর নীহারিকাপুঞ্জ,—এ পৃথিবী,
 মহাপ্রলয়ের অগ্ন্যুদ্গার, আর
 সৃষ্টির জলন্ত চুল্লী,
 শুদ্ধ “এক্সরে”র তুবারশ্রোত, জলন্ত “বিদ্যুতিন্”বজ্রা,
 অতীত, বর্ত্তমান আর অনাগত ভবিষ্যতের
 সবাকার চিন্তাধারা,
 প্রতি তৃণদল, সকল মানবজাতি আর আমি,
 মহাবিশ্বের প্রতি অণুপরমাণু,
 ক্রোধ, লোভ, শুভাশুভ, মুক্তি, কাম,
 আমাতে বিলীন সবে,
 যেন তা'রা একমাত্র মোর অস্তিত্বের,
 সর্বব্যাপী সত্ত্বারূপে পরিণত আজ।

গভীর ধ্যানের মাঝে প্রায়জাত যে আনন্দের জ্যোতিঃ

রোধ করে অশ্রুপূর্ণ আঁখি,—

পরিণত হ'য়ে তা'রা আনন্দের অনির্বাক্য অগ্নিশিখারূপে

গ্রাস করে অশ্রুধারা, দেহমন সব কিছু মোর !

তুমি—আমি, আমি—তুমি,

জ্ঞান, জ্ঞাতা, জ্ঞেয়, আজ—সবি একাকার ।

অথগু পরমানন্দ, আর নিত্য নবশাস্তি চিরবর্তমান ।

সমাধির অনুভূতি, সে আনন্দের রূপ, আশার অতীত আর কল্পনার পার,

এ নয় অজ্ঞান ভাব,

কিন্মা চৈতন্যের অবসাদকারী,—মানসিক ক্লোরোফর্ম,

যা'তে করে স্বইচ্ছায় ফিরিবার সম্ভাবনা নাই ;

এ সমাধি ব্যোপে চলে আমার জ্ঞানের পরিধি,

এ নশ্বর দেহ অতিক্রমি, 'অনন্তের সীমাহীনতায়—

যেখানেতে মহাবিশ্বপারাবার আমি,

দেখিতেছি ক্ষুদ্র “আমি,” আমাতেই ভাসমান আজ ।

ক্ষুদ্রপক্ষী, প্রতি বালুকণা, পড়িতে পারে না কভু মোর দৃষ্টি অতিক্রমি এবে,

মহাবিশ্ব হিমশিলারূপে আজ ভাসে মোর মনের সাগরে ।

বিরাট আধার আমি, সৃষ্টির সকল কিছু, আমাতেই ধৃত হয়ে আছে ।

গভীর, ব্যাকুল, দীর্ঘ, গুরুদত্ত সাধনার বলে,

লাভ হয় এ দিব্য সমাধি ।

*

*

*

*

শোনা যায় অণুদের সচল মর্ম্মরধ্বনি,

অন্ধকার এ পৃথিবী, শৈলমালা, উপত্যকা সব,—হায়, গলিত তরল !

সাগরপ্রবাহ সব নীহারিকাবাপ্পে পরিণত !

ওঙ্কার প্রণবধ্বনি বাঙ্কারিছে সে বাষ্পের 'পর,

মুক্ত করি' অপক্লপ 'গুণ তা'দের,

প্রকাশিছে জ্যোতির্ম্ময় অণুপরমাণুদের বিশাল বারিধি ;

অবশেষে মহাবিশ্বসঙ্গীতের শেষ মূর্ছনায়,
জড়ের আলোকরশ্মি—সর্বব্যাপী মহানন্দের
অনন্ত জ্যোতিঃর মাঝে মিশে যায় ধীরে ।

* * * *

এসেছি আনন্দ হ'তে, আনন্দেতেই বেঁচে র'ব, মিশে যা'ব শেনে,
অনাবিল ভূমানন্দ মাঝে !

আমার মনের সাগরে, সৃষ্টির সকল উন্মি পান করি আমি ।

কঠিন, তরল, বাষ্প, আলোকের ধারা

অবগুণ্ঠন এ চারের খুলে যায় এবে,

সকলেতে ক্ষুদ্র “আমি” প্রবেশিছে,—“বড় আমি” মাঝে ।

ক্ষণস্থায়ী, ক্ষীণরশ্মি মর্ত্যের স্মৃতির ছায়া সব,

মিলায়েছে চিরতরে আজ ।

নিম্নে, উর্দ্ধে আরও উর্দ্ধে তা'র—মনের আকাশ মোর,

অকলঙ্ক ছায়াশেহীন,

হাসির বুদ্ধদ ক্ষুদ্র—আমি, আজ

আনন্দের মহাসাগরেতে পরিণত !

ইচ্ছামাত্র কিরূপে এ অপূর্ণ অনুভূতি লাভ করা যায়, তা' শ্রীযুক্ত
গিরিজি আমায় শিখিয়ে দিয়েছিলেন ; আর শিখিয়েছিলেন, যা'দের ব্রহ্মনা
পরিপুষ্ট হয়েছে, তা'দের উপরেও এ ভাব কি ক'রে সঞ্চারিত করা যায় । মাস
পর মাস ধ'রে যখন আমি ব্রহ্মানন্দে মগ্ন হ'য়ে থাকতুম, তখন বুঝতুম
উপনিষদ তাঁকে “রসো বৈ সঃ,”—রসস্বরূপ বলে বর্ণনা করেছে কেন ।

কিন্তু মনে এক সমস্তা উপস্থিত হ'ল দেখে, আবার গুরুদেবের কা
ছুটলুম জিজ্ঞাসা করতে,—“মশায় বলতে পারেন, ভগবানকে কবে পা'ব ?”

“তুমি ত' তাঁকে পেয়েছ !”

“আজ্ঞে না মশায়, কৈ আমার ত' তা' মনে হয় না !” গুরুদেব
হাসছিলেন,—বল্লেন, “তুমি বোধ হয় ভাবছ যে এক মহিমময় মূর্তি
বা'র মাথায় স্বর্গীয় ছটা, এই বিশ্বমাঝে কোন পুণ্যস্থানে হয় ত' সিংহ
আলোকিত ক'রে বসে রয়েছেন ! বাই হোক, দেখতে পাচ্ছি যে, তুমি
করেছ যে, কিছু সিদ্ধিটিদ্ধি লাভ হলেই ভগবানকে জানা যায়, না ? হায়, হায়

তা' নয় গো, এ তা' নয়। সারা বিশ্বত্রকাণ্ড, তোমার যা'কে বলে হাতের মুঠোয় "করামলকবৎ" আর কি, সেই রকম এসে পড়লেও ভগবান যে স্তূরে সেই স্তূরেই থেকে যান! বাইরে কোন সিদ্ধাইটিকাইএর প্রকাশে এ বোঝায় না যে, তা'র খুব আধ্যাত্মিক উন্নতি হয়েছে,—তা' বোঝায় তা'র ধ্যানানন্দের গভীরতা দেখে, বুঝলে?

“এ আনন্দ কি রকম জান? চিরনূতন আনন্দ, নিত্যানন্দ—কখনও ফুরায় না। বছরের পর বছর ধরে এমনি জপতপ ধ্যানধারণা করে যাও, তিনি তাঁ'র অনন্ত লীলা দিয়ে তোমার সঙ্গে লুকোচুরি খেলে যাবেন। তোমার মতন ভক্তরা, যা'রা এই রকম করে ভগবানকে পেয়েছেন, তাঁ'রা এ আনন্দ, এ সুখ, আর কোনও সুখের বদলে নিতে চাইবেন না, বুঝলে? ধরি ধরি করেও তাঁ'কে ধরা যায় না, এমনই তাঁ'র লুকোচুরি খেলা।

“দেখ, সংসারের সুখ কত শীগগির ফুরিয়ে যায়। এ জগতে বাসনা-কামনার আর অন্ত নেই। যেন রক্তবীজের ঝড়! পার্থিব সুখের আশা যত্নরত। মাহুয কখনও পূর্ণ পরিতৃপ্তি লাভ করতে পারে না; একটা আশা মিটলেই আবার একটার পিছনে ছোটে! মৃগতৃষ্ণিকার পিছনে এ সংসারে সে ছুটেই চলেছে, কিসের আশায় তা' সে নিজেই জানে না। ‘একটা কিছুর জগ’ নিশ্চয়ই, যা'তে সে মনে করে যে সে তৃপ্তি পাবে, শান্তি পাবে,—সেই ‘একটা কিছু’ কি জান? সেই তিনিই, একমাত্র যিনি তা'কে চিরশান্তি দিতে পারেন, বুঝলে?

“বাইরের আকর্ষণ আমাদের অন্তরের স্বর্গ হ'তে নির্বাসিত করে দেয়। তা'রা যে মিথ্যা সুখ আনে, সেটাকেই আমরা আত্মারাম বলে ভুল করি। স্বতঃস্ফূর্ত আবার পুনরুদ্ধার হয় ঈশ্বরের গভীর ধ্যানে। ভগবান হ'চ্ছেন অনাস্বাদিতপূর্ব চিরনূতন আনন্দ! চিরনবীন সে আনন্দ সম্ভোগে কি কখনও ক্লান্তি আসে, কখনও অবসাদ আনে? সেই অপার আনন্দের অনন্তবৈচিত্র্যে কি কখন বিতৃষ্ণা আসে, ব'ল?

“গুরুদেব এখন বুঝলুম, কেন সাধুমহাপুরুষেরা তাঁ'কে অনির্বচনীয় বলে গেছেন। বোধ হয় অনন্ত জীবন পেলেও তাঁ'র পরিমাপ করা যায় না।”

“তা' সত্যি বটে, কিন্তু তা' হ'লেও তিনি অন্তরের অন্তরতম ধন। ক্রিয়া-

যোগ সাধনে মন হ'তে ইন্দ্রিয়বোধের সব বাধাবন্ধ দূর হ'লে, ধ্যানে তাঁর দুই রকমের প্রমাণ পাওয়া যায়। তাঁর আবির্ভাবের চিরনবীন আনন্দ আমাদের প্রতি অণুপরমাণু টের পায় আর ধ্যানে পাওয়া যায় তাঁর সত্ত্ব নির্দেশ, কোন পথ অবলম্বন করে চলব। প্রত্যেক সঙ্কটেই তাঁর উত্তর আসে। তা' থেকে ভ্রাণ করে দেওয়া হ'চ্ছে তাঁর প্রেমের অকুরন্ত দান।”

কৃতজ্ঞহাসিতে মুখ ভরে গেল, বললুম, “গুরুজি, দেখছি যে আপনি আমার সন্দেহ নিরসন করেছেন। আমি এখন বুঝছি যে আমি ঈশ্বরকে পেয়েছি, কারণ যখনই আমার কাযকর্মের সময় ধ্যানের আনন্দ অবচেতন মনে এসে উদয় হয়, তখনই কে যেন আমার অতি সূক্ষ্মভাবে আমার সকল বিষয়ে, সকল খুঁটিনাটি ব্যাপারে, ঠিক খাঁটি পথেই পরিচালিত করেন।”

“মাছুবের জীবন কেবল দুঃখেই ভরা থাকে, যতক্ষণ পর্যন্ত না আত্মকেবল সেই ইচ্ছাময়ের ইচ্ছার কাছে আত্মসমর্পণ করতে পারি। তাঁর ‘সোজাপথ’ অনেক আত্মাভিমাত্রীর কাছেই রহস্যবৃত। ভগবানই বিশ্বসংসারের সকল ভার নিয়ে রয়েছেন, একা তিনিই নিভুল পথ দেখাতে পারেন, আর কেউ নয়।”

১৫শ পরিচ্ছেদ

ফুলকপি চুরি

“গুরুদেব, আপনার জন্তে এই গোটাকতক ফুলকপি এনেছি। ফুলকপিগুলো নিজে হাতে পুঁতেছিলুম, তারপর খুব যত্নটন্ব ক’রে, এতবড় ক’রে জন্মিয়েছি।” ব’লে যথোপযুক্ত ভঙ্গির সঙ্গে হাতের বুড়িটা নাগিয়ে রাখলুম।

গুরুদেব পেয়ে খুব খুসী হ’য়ে বললেন, “বেশ, বেশ, তুমি এগুলোকে তোমার ঘরে নিয়ে গিয়ে রাখ। কালকে একটা বিশেষ ভোজে এগুলো লাগবে।”

কলেজ গ্রীষ্মের ছুটির দরুণ বন্ধ। সমুদ্রতীরে গুরুদেবের পুরীর আশ্রমে ছুটিটা কাটাব বলে ভেবে এসেছি। বাড়ীটি দোতলা, গুরুশিষ্যে মিলে তৈরী করা।

তারপরদিন ভোরবেলা যুম ভাঙ্গল; সমুদ্রের হাওয়া আর স্থানটির দৃশ্য-সৌন্দর্য্যে শরীর তাজা, মন বেশ প্রফুল্ল। শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজির স্মৃষ্টি কণ্ঠস্বর শোনা গেল, আমায় ডাকছেন। ফুলকপিগুলোকে একবার দেখে নিয়ে বিছানার তলায় ভাল ক’রে গুছিয়ে রেখে দিয়ে এলুম।

“চল সমুদ্রের ধারে যাওয়া যাক” ব’লে তিনি এগিয়ে চললেন; কতকগুলি অল্পবয়সী শিষ্য আর আমি এখার ওখার ছড়িয়ে পড়ে তাঁ’র পিছু পিছু চলতে লাগলুম। গুরুজি দেখতে পেয়ে বললেন, “দেখ, সাহেবেরা হাঁটবার সময় হুজনে একসঙ্গে পা ফেলে কেমন হাঁটে দেখেছ? তোমরাও তেমনি হুঁজন হুঁজন ক’রে একসঙ্গে পা ফেলে হাঁটতে শুরু কর।” গুরুজি দেখতে লাগলেন, তাঁ’র কথা মত কেমন করে চলি। তারপর শুরু করলেন, “ছেলেরা সব এগিয়ে চলে, একটি করে ছোট্ট দলে।” গুরুজিও ছোকরা শিষ্যদের সঙ্গে সমান তালে পা ফেলে চলেছেন দেখে মনে মনে প্রশংসা না করে থাকতে পারলুম না।

“আরে থাম, থাম,” গুরুজি আমার চোখের ওপর চোখ রেখে বললেন,
 “মুকুন্দ! আশ্রমের খিড়কিদরজা বন্ধ ক’রে এসেছো কি, মনে পড়ছে?
 “আমার ত’ মনে হয় গুরুজি।”

শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজি মিনিটকতক চুপ ক’রে রইলেন; ঠোটে তাঁ’র চাপা হাসি! তা’রপর শেষে বললেন, “না, তুমি ভুলে গেছ। দেখ, ধ্যানধারণা কর ব’লে সংসারের কাষে অবহেলা করার দরুণ তা’র দোহাই পাড়া চল না। আশ্রমে যা’তে চুরিচামারি না হয় তা’ দেখা ত’ তোমার কর্তব্য ছিল। তা’ যখন অবহেলা করেছে, তখন তোমায় শাস্তি পেতে হ’বে বই কি? তারপর যখন বললেন যে, “তোমার ছ’টা ফুলকপি শীগগিরই পাঁচটা হয়ে দাঁড়াচ্ছে দেখগে।” তখন ভাবলুম যে তিনি হয়ত প্রচ্ছন্নভাবে ঠাট্টাই করছেন। যাই হোক শেষ অবধি আমরা গুরুদেবের আদেশে আবার আশ্রমের দিকে ফিরে চললুম। কাছাকাছি যেই পৌঁছেছি, গুরুদেব অমনি বললেন, “একটু দাঁড়াও দেখি মুকুন্দ। উঠোনের বা’ ধারে ঐ রাস্তার দিকে একটু নজর রাখ, এখনি একটি লোক এসে হাজির হবে, আর ওর জন্মেই তোমায় বকুনি খেতে হবে, বুঝলে?”

এসব হৃর্কোথ্য কথার মানে বুঝতে না পেরে মনের বিরক্তি গোপন করলুম। দেখলুম, একটা লোক রাস্তার মাঝখানে এসে হাজির হ’ল। এসেই সে নানারকম অঙ্গভঙ্গি ক’রে বেতলা হাত পা ছুঁড়ে নাচ’তে শুরু করে দিলে। অবাক হয়ে সেই অদ্ভুত দৃশ্য দেখছি। রাস্তার একটা জায়গায় পৌঁছে যেমনি লোকটা চোখের আড়াল হ’বার উপক্রম হ’ল, অমনি শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজি বললেন, “এইবার দেখ, ও ফিরবে।”

লোকটা সত্যসত্যই তখনই ফিরে আশ্রমের পিছন দিকে চলল। খানিকটা বেলেজমি পার হয়ে খিড়কি দরজা দিয়ে লোকটা বাড়িতে গিয়ে ঢুকল। গুরুদেব যেমন বলেছিলেন—সত্যই দরজায় আমি চাবি দিয়ে ভুলে গিয়েছিলুম।

চাবি দেওয়া ছিল না। লোকটা চট করে বেরিয়ে এল। আর তা’র হাতে তখন আমার একটি সযত্নবর্দ্ধিত সুপুষ্ট ফুলকপি। বিনা বাধা ফুলকপিলাভের গর্বে উচ্ছ্বসিত হয়ে লোকটা এখন বেশ শান্ত আর

ভাবেই এগিয়ে চলল। ব্যাপারটা বুঝতে পেরে আর আচ্ছা ঠকান ঠকেছি দেখে ত' রাগে আমার ব্রহ্মরন্ধ্র পর্য্যন্ত জলে গেল। লোকটার পিছনে পিছনে দৌড়লুম ; অর্ধেক রাস্তায় গিয়েছি এমন সময় গুরুদেব ডাকলেন, দেখি যে তিনি হাসিতে যেন ভেঙ্গে পড়ছেন।

হাসির দমকের মাঝে মাঝে গুরুজি ব্যাপারটা বোঝালেন, “দেখ, ও বেচারার একটি ফুলকপির বিশেষ প্রয়োজন ছিল। আব আমি ভাবলুম যে, অহা তোমার একটি যদি ও পায়, সাবধান টাবধান ক'রে গুছিয়ে ত' রাখনি, তা' হ'লে ভারি মজা হয়।” শুনে ত' চক্ষু কপালে উঠল। ঘরের দিকে দৌড়লুম ! গিয়ে দেখি চোরটার কেবল ফুলকপিটার উপরই নজর ছিল ; যা'ক বেঁচে গেছি—কম্বলের উপর সোনার আংটি, ঘড়ি, টাকা সবই ঠিক রয়েছে, কিছুই হোঁয়নি দেখছি। আর আশ্চর্য্য, এগুলো চোখের সামনে পড়ে রয়েছে দেখেও সে তার একটাও ছুঁলে না, আর তা'র একমাত্র ইচ্ছা হল নিতে কি না একটা ফুলকপি, তা'ও খাটের তলায় লোকের চোখের আড়ালে একদম নুকোন—আর তা' বা'র করতে হয়েছে, খাটের তলায় হেঁট হয়ে মাথা গলিয়ে তা'র ভিতর ঢুকে !

মনে হ'ল এর মধ্যে কিছু রহস্য আছে। শ্রীবুদ্ধেশ্বর গিরিজি মহারাজকে সেদিন সন্ধ্যাবেলা তাই জিজ্ঞাসা করলুম, ব্যাপারটা কি ! তিনি ধীরে ধীরে মাথা নেড়ে বললেন, “একদিন না একদিন এ তুমি বুঝবে। যাক্, তোমাদের বিজ্ঞান এই সব গুপ্তবিধির মধ্যে দু চারটে শীগ্গির আবিষ্কার ক'রে ফেলবে, দেখো।”

তারপর রেডিওর আশ্চর্য্যজনক আবিষ্কার যখন পৃথিবীর মধ্যে ছড়িয়ে পড়ল তখন গিরিজি মহারাজের ভবিষ্যদ্বাণী মনে পড়ল। সময় ও দূরত্বের ব্যবধান আর তার যুগযুগব্যাপী ধারণা সব একেবারেই লোপ পেলে। এখন আর কোন চাবীর কুঁড়েঘর এমন ছোট নেই যে, সেখানে লগুন অথবা কলকাতা মাথা গলাতে পারে না ! একটা বিষয়ে মানুষের সর্বব্যাপিত্বের একাটা প্রমাণ পেয়ে অতি নির্বুদ্ধিরও বুদ্ধির উৎকর্ষ সাধিত হ'ল।

এই “ফুলকপি” নাটকের প্লটটির বিষয় রেডিওর সঙ্গে তুলনা ক'রে দেখলে বেশ স্পষ্টই বোঝা যাবে। শ্রীবুদ্ধেশ্বর গিরিজিকে একটি চমৎকার

মানব-রেডিও যন্ত্র বলা যেতে পারে। চিন্তা সকল কি? তা'রা ঈশ্বরে অতি নূহ কম্পন ছাড়া আর কিছুই নয়। খুব ভাল ক'রে একস্মরে বাঁধা গ্রাহক যন্ত্র যেমন চতুর্দিক হ'তে হাজার হাজার প্রোগ্রামের ভিতর থেকে দিগ্ঘট দরকার সেটি ধ'রে নেয়, তেমনি পৃথিবীতে হাজার হাজার লোকে চিন্তাতরঙ্গের মধ্য হ'তে আমার গুরুদেব ঐ আধপাগলা লোকটার ফুলকপি সংগ্রহের ইচ্ছাটি ধ'রে নিতে পেরেছিলেন।

এখানে আবার তাঁ'র প্রবল ইচ্ছাশক্তির সাহায্যে গুরুদেব তাঁ'র চিন্তা-তরঙ্গও প্রক্ষেপিত করতে পারতেন এবং ঐ শক্তিরই সাহায্যে তিনি ঐ চাবাটিকে মাঝরাস্তা থেকে ঘুরিয়ে এনে একটিমাত্র ফুলকপির জন্তে একটি বিশেষ ঘরের দিকে চালিত করতে পেরেছিলেন।

মানুষের মন যখন ধীর ও শাস্ত থাকে সেই সব মুহূর্তে মানুষের ভিতর স্বাভাবিকভাবে যে সব অল্পভূতির বিকাশ হয়, তা'রাই হ'চ্ছে আত্মার পঞ্চপ্রদর্শক! প্রায় প্রত্যেকেরই অল্পভূতভাবে সঠিক অনুমানের অভিজ্ঞতা আছে অথবা সে অপর কোন লোককে সাফল্যের সঙ্গে তা'র চিন্তাতরঙ্গ পাঠাতে সমর্থ হয়েছে।

মানুষের মন সর্ববিধ অস্থিরতার অশান্তির ঝড় থেকে মুক্ত হ'য়ে যখন একেবারে ধীর, স্থির, শাস্ত হয় তখন সে অত্যন্ত জটিল রেডিওযন্ত্রেরই মত অল্পভূতির সবরকমই কাষ করতে পারে—চিন্তাতরঙ্গ প্রেরণ, গ্রহণ অথবা অবাস্তিত তরঙ্গ পরিবর্তন আর রেডিওর শক্তি যেমন যে পরিমাণ বিদ্যুৎ সে ব্যবহার ক'রতে পারে তা'র ওপর নির্ভর করে, তেমনি মানব-রেডিও ও তা'র ব্যক্তিগত প্রবল ইচ্ছাশক্তির জোরেই শক্তিমান হয়ে ওঠে।

চিন্তার তরঙ্গ কোথাও নষ্ট হয় না—মহাব্যোমে অনন্তকাল ধ'রে তা'র অন্তরগণন চলে। গভীর ধ্যানসংযোগে সদগুরু কি জীবিত কি মৃত, যে কোন ব্যক্তির মনের খবর জানতে পারেন। চিন্তাসকলের মূল ব্যক্তিগত না বিশ্বজনীনতায়। সত্য ত' সৃষ্টি করা যায় না, তা' উপলব্ধি ক'রা হয়। উপলব্ধি করার দোবে অনেক সময় মানুষের চিন্তা ভুল হয়ে দাঁড়ায় যোগবিজ্ঞানের চরম লক্ষ্য হচ্ছে যে, এই মনকে একেবারে শাস্ত করা

যা'তে ক'রে মনের ভিতর এই বিশ্বপ্রকৃতিতে ঈশ্বরের লীলা অবিকৃতভাবে প্রতিফলিত হ'তে পারে।

রেডিও (দূরশ্রবণ) আর টেলিভিসন্ (দূরদর্শন) এরা অতি ক্ষুদ্রের মানুষদের দৃশ্য আর শব্দ মুহূর্তমধ্যে সকলের সামনে এনে হাজির করে। মানুষ যে সর্বব্যাপী আত্মা, এ হয়ত তা'র অতি ক্ষীণ প্রথম বৈজ্ঞানিক ইঙ্গিত। মানুষ কোন দেশে সীমাবদ্ধ স্থানে আবদ্ধ একটা শরীরমাত্র নয়—এ বিরাট আত্মা বা অহংভাব অতি বর্কর উপায়ে সীমাবদ্ধ করার বৃথা চেষ্টা করে মরে!

শারীরতত্ত্বে নোবেলপ্রাইজপ্রাপ্ত চার্লস রবার্ট রিশে বলেছেন,—“অতি আশ্চর্য্য, অতি অদ্ভুত, অলৌকিক, আপাতদৃষ্টিতে অত্যন্ত অসম্ভব ব্যাপারও ঘটতে পারে—আর একবার প্রচলিত হ'য়ে গেলে, বিজ্ঞানের অগ্রাগ্র অদ্ভুত ব্যাপারেরই মত তা' সহজ আর স্বাভাবিক ব'লে মনে হবে আর বিশেষ কোন বিশ্বয়ের ভাব উদ্বেক করবে না। হয়ত' মনে হ'তে পারে যে, যে ব্যাপার দেখে আর চমক লাগে না, তা'রা আর আমাদের আশ্চর্য্য করে না—কারণ তা'দের আমরা বুঝি ব'লে; ব্যাপারটা কিন্তু তা' নয়। তা'রা আর বিশ্বয়ের উদ্বেক করে না এই কারণে নয় যে তা'দের আমরা সব বুঝি, কারণ হচ্ছে তা'রা সব আমাদের অত্যন্ত পরিচিত! কারণ যা' বোঝা যায় না, তা'তে যদি আমাদের আশ্চর্য্য হ'তে হয়, তা'হলে ত' আমাদের সবটাতেই আশ্চর্য্য হওয়া উচিত—আকাশে ঢিল ছুঁড়লে তা' পড়তে দেখে, বাটের বীজ হ'তে বিশাল বনস্পতি হওয়া, বা পারদ উত্তপ্ত হ'লে তা'র আয়তন বর্দ্ধিত হওয়া অথবা চুম্বক কর্তৃক লৌহ আকর্ষণ, ফস্ফরাস ঘসলে তা' থেকে প্রস্ফলিত অগ্নি উৎপাদিত হওয়া ইত্যাদি ইত্যাদি। আজকের বিজ্ঞান ত' এখনও নিতান্ত শিশু! লক্ষ বৎসর বাদে এ নানা বিপ্লব আর বিবর্তনের ভিতর দিয়ে যা' দাঁড়াবে তা' অতি দুঃসাহসিক কল্পনারও বাইরে। বৈজ্ঞানিক সত্যসকল সেই সব চমকপ্রদ, অত্যাশ্চর্য্য, অদৃষ্টপূর্ব্ব সত্য সব, যা' আমাদের উত্তরাধিকারীরা ভবিষ্যতে আবিষ্কার করবে—তা'রা এখনই, এই মুহূর্ত্তেই আমাদের চারদিকে ছড়িয়ে আছে, ব'লতে গেলে আমাদের দিকে সতৃষ্ণ নয়নে তাকিয়ে আছে। আহা কবে আমরা তা'দের অপরিচয়ের হাত থেকে মুক্তি দেব কিন্তু

হায়, তা'দের এখন আমরা দেখতেই পাচ্ছি না! তা'দের দেখতে পাচ্ছি না বললেই যথেষ্ট বলা হ'ল না—তা'দের দেখতে ইচ্ছা করছি না, কারণ যখনই একটা অপরিচিত বা অপ্রত্যাশিত ঘটনা ঘটে তখনই আমরা সেটাকে আমাদের অধিকৃতজ্ঞানের সাধারণ কাঠামোতে আরোপ করবার চেষ্টা করি আর সে বিষয়ে কেউ যদি আরও পরীক্ষা করবার সাহস করে, তা' হ'লে তা'র উপর জুড়ই হই!

কুলকপি চুরি হ'বার দিন কতক পরে একটা খুব মজার ঘটনা ঘটেছিল একটা কেরোসিন ল্যাম্প পাওয়া যাচ্ছিল না। সম্প্রতি গুরুদেবের যোগ-দৃষ্টির ব্যাপার দেখে ভাবলুম যে, এটা খুঁজে ব'লে দেওয়া তাঁ'র পক্ষে নেহাৎ ছেলেখেলাই হবে আর কি!

গুরুদেব আমার মনের কথা বুঝতে পারলেন। অত্যন্ত গম্ভীর হ'য়ে তিনি আশ্রমের প্রত্যেককেই জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন ল্যাম্পটা কোথায় গেল। একটি ছোকরাশিষ্য স্বীকার ক'রে ফেললে যে, থিড়কির দিকে কুয়োর ধারে যেতে সে আলোটা নিয়ে গিয়েছিল। শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজি অত্যন্ত গম্ভীরভাবে উপদেশ দিলেন, “কুয়োর ধারে খোঁজ।”

গেলুম দৌড়ে,—আলো নাই! অত্যন্ত বিমর্ষ হ'য়ে গুরুদেবের কার ফিরে এলুম। আমার আন্তিনিরসনে বিন্দুমাত্র অনুতপ্ত না হ'য়ে উচ্ছ্বসিত হ'য়ে তিনি হাসছেন। বললেন, “হারান ল্যাম্পটার খোঁজ ক'রে দিতে পারলুম না—কি করব বল, আমি ত' আর গণৎকার নই! এমন কি ভালগোছের একটা শার্লক হোমসও নই!”

বুঝতে পারলুম যে, পরীক্ষার জ্ঞা অথবা তুচ্ছ বারণে তিনি কখনও তাঁ'র শক্তি প্রদর্শন করবেন না।

হুগাকতক খুব আনন্দেই কাটল। গুরুদেব একটি নগরসঙ্কীর্তন বাঁজ করবার মতলব করছিলেন। পুরীসহরের ভিতর আর সমুদ্রের ধার দিয়ে সঙ্কীর্তন নিয়ে যা'বার জ্ঞা গুরুদেব আমারই উপর ভার দিলেন। উৎসবে দিন সকালে যা' রোদ উঠ'ল, তা'তে রাস্তায় আ'র পা পাতা যায় না। হুগাকতাবে জিজ্ঞাসা করলুম, “গুরুজি, খালিপায়ে ছেলেদের কি ক'রে আঙুল তাতা বালির উপর দিয়ে নিয়ে যাই, বলুন?”

গুরুদেব বললেন, “শোন, তোমায় চুপি চুপি একটা কথা বলে রাখি— তোমাদের কিচ্ছু ভাবনা নেই জেনো, ঠাকুরই একটা মেঘের ছাতা পাঠিয়ে দেবেন দেখো, তা’র তলায় তোমরা বেশ আরামে হেঁটে যাবে, কোনই কষ্ট হবে না, বুঝলে?”

যাক্, নিশ্চিন্ত হ’য়ে ত’ সঙ্কীর্ণনের ব্যবস্থা শুরু ক’রে দিলুম। আমাদের দল আশ্রম থেকে সংসদের পতাকা নিয়ে বেরুল। মাঝখানে তৃতীয় নেত্রের প্রতীক একটিমাত্র চক্ষু—জ্ঞান-চক্ষু, শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজির পরিকল্পনা।

আশ্রম হতে বেরবাগাত্রই ঠিক মাথার উপরের আকাশ যেন ম্যাজিকে-তেই মেঘে ছেয়ে গেল। চারধার থেকে বিশ্বয়ের অক্ষুটধ্বনি উঠবার সঙ্গে সঙ্গে একটু হান্ধাগোছের বৃষ্টিও হ’য়ে গেল। সহরের রাস্তা, আর আগুনের মত তেতে রয়েছে সমুদ্রের ধারের বালি সব বেশ ঠাণ্ডা হ’য়ে গেল। তা’রপর ঘণ্টা দুই ধ’রে আমাদের সঙ্কীর্ণনের দল নগর পরিভ্রমণ করার সময় পর্য্যন্ত কৌঁটা কৌঁটা ক’রে বৃষ্টি পড়েই চলল। তা’রপর যে মুহূর্তে দলটি আশ্রমের মধ্যে প্রবেশ করল, সেই মুহূর্তেই মেঘ আর বৃষ্টি একেবারে নিশ্চিহ্ন হ’য়ে কোথায় উড়ে গেল!

গুরুদেবের কাছে গিয়ে কৃতজ্ঞতা জানাতেই তিনি বললেন, “দেখ, ভগবান আমাদের জন্তে কত ভাবেন বল দিকি! সকলেরই প্রার্থনার তিনি উত্তর দেন আর সকলেরই জন্তে তিনি খাটেন। তিনি যেমন আমার প্রার্থনামত বৃষ্টি পাঠিয়ে দিলেন, তেমনি তিনি সকল ভক্তেরই আন্তরিক ইচ্ছা পূরণ করেন। ভগবান যে কত রকমে তা’দের প্রার্থনা শোনেন, লোকেরা অতি অল্পই তা’ জানতে বা বুঝতে পারে। তিনি কারুর প্রতি পক্ষপাতী ন’ন, যে কেউ তাঁ’র কাছে বিশ্বস্ত হৃদয়ে এগোয় তা’র কথাই তিনি শোনেন। আমরা সকলেই সেই সর্বব্যাপী বিভূ, সর্বনিয়ন্ত ভগবানের সন্তান। তাঁ’র অপার স্নেহ আর অসীম দয়ার উপর আমাদের সকলেরই অখণ্ড বিশ্বাস থাকা উচিত।”

শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজি চারটি বাৎসরিক উৎসবের প্রবর্তন করেন। মহাবিশুব, জলবিশুব, উত্তরায়ণ ও দক্ষিণায়ণ সংক্রান্তি। এই সময় তাঁ’র শিষ্যবর্গ দেশদেশান্তর হ’তে এসে উপস্থিত হ’ন।

উৎসব শ্রীরামপুরেই পালন করা হ'ত। প্রথমবারে যোগদান করে আমি সেখানেই তাঁর চিরাশীর্বাদ লাভ করেছিলুম।

উৎসব আরম্ভ হ'ত ভোরবেলায় রাস্তায় সঙ্কীৰ্তনের দল বা'র ক'রে ; ধোঁয়া করতাল আর বাঁশীর সঙ্গে মধুর নামগান ক'রে শিষ্যের দল রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে আসত। সঙ্কীৰ্তন শুনে লোকেরা দলের উপর পুষ্পবৃষ্টি ক'রত, সংসারে কায থেকে ক্ষণিকের জন্তেও সরে এসে ভগবানের পুণ্য নামসঙ্কীৰ্ত্তন শ্রবণে আনন্দ পেত। তাঁরপর অনেক রাস্তা ঘুরে সঙ্কীৰ্তনের দল এসে থামত আশ্রমের উঠানে, সেখানে গুরুদেবকে ঘিরে আমাদের খুব নামগান চলত, আর শিষ্যরা উপরের বারান্দা থেকে আমাদের মাথার ওপর গাঁদার বৃষ্টি করত !

নিমন্ত্রিতদের মধ্যে অনেকে উপরে কমলালেবু আর ছানার পাত্রে নিতে চলে গেলেন। একদল গুরুভাই, রান্নার কাষে লেগে গিয়েছিল। তাঁদের কাছে গিয়ে দাঁড়ালুম। এই রকম বড় বড় উপলক্ষ্যে বাইরে উঠে পেতে রান্না করতে হ'ত। প্রকাণ্ড কড়াইতে করে খিচুড়ি চড়েছিল। মাটির উননে কাঁচা কাঠ গুঁজে দেওয়া হয়েছে—ধোঁয়াতে চোখ দিয়ে জল পড়ছিল, তবুও হাসিমুখে আমরা কায ক'রে চলেছিলুম। উৎসবের কাষে কারুরই ক্লান্তি নেই। সকলেই নিজ নিজ ক্ষমতামত চাল, ডাল, তরিতরকারি টাকাকড়ি অথবা সাধ্যমত গতরে খেটে দিয়ে উৎসবটি সৰ্ব্বাঙ্গসুন্দর করতে চেষ্টা করেন।

গুরুদেব শীগ'গিরই এসে পড়ে খাওয়ান দাওয়ানর তদারক করতে শুরু করলেন। মুহূর্তমাত্র তাঁর বিশ্রাম নেই, খুব চটপটে ছোকরাদেরও সঙ্গে সমানতালে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। উপরে দোতলায় হারমোনিয়ম আর বাঁয়াতবলার সঙ্গে সংকীৰ্তন চলছিল। শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজি খুব মন দিয়ে শুনছিলেন। তাঁর তাল, লয়, মান জ্ঞান একেবারে নিখুঁত।

গুরুদেব ব'লে উঠলেন, “এঃ একেবারে বেশরো গাইছে।” ব'লেই রান্নার যায়গা ছেড়ে একেবারে গানের আসরে গিয়ে উপস্থিত হ'লেন। নিচে থেকে আমরা শুনেতে পেলুম গান আবার শুরু হ'ল,—এবার কিন্তু বিরাট সুরতাললয়মানে।

যোগিকথাযুত

২০১

ভারতবর্ষে. সঙ্গীত, চিত্রাঙ্কন, নাটক প্রভৃতি বিদ্যা স্বর্গীয় কলারূপে পরিচিত। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর এই ত্রিমূর্তি, এঁরাই হ'চ্ছেন প্রথম সঙ্গীতকার। শাস্ত্রে বর্ণিত আছে যে, নটরাজ শিব তাঁর চরণঘাতের তালে তালে সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয় আনয়ন করেন আর সেই নৃত্যের তালে তালে ব্রহ্মা বাজান করতাল আর বিষ্ণু মৃদঙ্গ। বিষ্ণুর অবতার শ্রীকৃষ্ণের বাঁশী প্রাণমাতান মধুর স্বরে কেবলই রাখা জীবাত্মাদের ডাকছে মায়াবশে ভ্রমণ পরিত্যাগ ক'রে নিজ আবাসে ফিরে আসবার জন্ত। জ্ঞানের অধিষ্ঠাত্রী দেবী সরস্বতী, বীণাবাদিনী—তাঁর মধুর বাঁশীতে সকল বিদ্যার আবাহন! সঙ্গীতশাস্ত্র সম্বন্ধে সর্বাঙ্গপেক্ষা প্রাচীনতম উল্লেখ আমাদের সামবেদের মধ্যেই পাওয়া যায়।*

হিন্দুসঙ্গীতের মূলভিত্তি হ'ল তা'র রাগরাগিণী। ছয়টি মূলরাগ আর তা' থেকে উৎপন্ন রাগিণী আর তা'দের পুত্রগণক্রমে ১২৬টি শাখাপ্রশাখায় বিস্তৃত হয়েছে। প্রত্যেক রাগের আবার অন্ততঃ পাঁচটি ক'রে বিভাগ আছে, যেমন বাদী অর্থাৎ রাগরাগিণীতে যে স্বরের প্রাধান্য পরিলক্ষিত হয়, তা'র নাম বাদী। বাদীর সহগামী সুরকে বলে সংবাদী আর বাকী সব সুরকে বলে অনুবাদী বা অংশ; আর যে রাগে যে সুর সংযোজিত হ'লে রাগভ্রষ্ট হয় তা'কে বলে বিবাদী। সঙ্গীতরত্নাবলীর মতে রাগের বাদীস্বর হ'চ্ছে রাজা, সংবাদীস্বর মন্ত্রী, অনুবাদীস্বর ভৃত্য আর বিবাদীস্বর বৈরী অর্থাৎ শত্রুর মতন।

প্রত্যেক মূলরাগের আবার বিশিষ্টশক্তিপ্রদায়ক অধিষ্ঠাতৃ দেবতা, ঋতু, দিন বা রাতে গাইবার সময়ের স্বাভাবিক উপযোগিতা আর তা' কোন কোন ভাবের উদ্দীপক তা' নির্ধারণ করা আছে। যেমন,—

| রাগ | ঋতু | সময় | ভাব |
|-------------|--------------|-----------------------|---------------|
| (১) হিন্দোল | বসন্ত | রাত্রি তৃতীয় প্রহর | বিশ্বপ্রেম |
| (২) দীপক | গ্রীষ্ম | রাত্রি দ্বিতীয় প্রহর | অনুকম্পা |
| (৩) মেঘ | বর্ষা | রাত্রি দ্বিতীয় প্রহর | সাহস |
| (৪) ভৈরব | শরৎ | দিবা প্রথম প্রহর | শাস্তি |
| (৫) মালকৌশ | হেমন্ত | রাত্রি দ্বিতীয় প্রহর | শৌর্য্য |
| (৬) ক্রী | শিশির বা শীত | দিবা চতুর্থ প্রহর | নিষ্কাম প্রেম |

* ওমিতি সামানি গায়ন্তি।

প্রাচীন ঋষিরা মানুষ আর প্রকৃতির মধ্যে শব্দের ঐক্যমাত্র আবিষ্কার করেছিলেন। বিশ্বপ্রকৃতি ওঙ্কারধ্বনি বা প্রণববাচ্চারের বস্তুরূপ বাঁধে মানুষ কতকগুলি মন্ত্রের আবৃত্তিবলে প্রকৃতিতে সকল ব্যাপারের উপরেই নিয়ন্ত্রণ করবার ক্ষমতা লাভ করতে পারে। ইতিহাসে প্রমাণ আছে যে, আকবরের সভায় নোড়শ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ সঙ্গীতবিশারদ মিয়া তানসেন অতুত ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন। শোনা যায়, সম্রাট আকবর কর্তৃক আদিষ্ট হ'য়ে মিয়া তানসেন বেলা দ্বিপ্রহরে রাত্রিকালের একটি রাগ গেয়ে রাজপ্রাসাদ অন্ধকারে ঢেকে দিয়েছিলেন।

ভারতীয় সঙ্গীতে সুরসমৃদ্ধ বাইশটি শ্রুতিতে বিভক্ত। শ্রুতি হচ্ছে স্বরগত শ্রবণেন্দ্রিয়গ্রাহ্য সূক্ষ্মবিভাগ মাত্র। পাশ্চাত্য সঙ্গীতের স্বরগ্রাহ্যে মাত্র বারটি শ্রুতির মধ্যে এ রকম সূক্ষ্ম বিস্তার দুপ্রাপ্য। আবার এই সপ্তসুরের প্রত্যেক সুরের একটি ক'রে বর্ণ আর কোন পশু বা পক্ষীর কণ্ঠস্বর হ'লে তা'দের উৎপত্তি, তা' বলা আছে; যেমন, সা—হরিৎবর্ণ, ময়ূরের কেকাধ্বনি; রে—রক্তবর্ণ, ভরতপক্ষী; গা—স্বর্ণবর্ণ, ছাগ; মা—শ্বেতাভ হরিদ্রাবর্ণ, সারস পক্ষী; পা—কৃষ্ণবর্ণ, বুলবুল পক্ষী; ধা—হরিদ্রাবর্ণ, অশ্বের হেবারব আর নি হ'চ্ছে সকল বর্ণের সমন্বয়, এর উৎপত্তি হ'চ্ছে হস্তীর বৃংহতিধ্বনি থেকে।

পাশ্চাত্যসঙ্গীতে মাত্র তিনটি ঠাট প্রচলিত, কিন্তু ভারতীয় সঙ্গীতে ৭২টি ঠাট আছে। এতে সঙ্গীতকার শুদ্ধরাগের মধ্যে সুরসৃষ্টি ও তা'র বিস্তারে অন্তহীন সুযোগ পায়; সে কোন বিনয়ের মধ্যে রূপপ্রদানে তা'র ভাবের উপর চিত্ত নিবিষ্ট ক'রে তা'র চতুর্দিকে সুরের স্বপ্নজাল বুনে নিজের মৌলিকত্ব প্রদর্শন করে। হিন্দুসঙ্গীতের চর্চা শুধু কতকগুলি নির্দিষ্ট স্বরলিপিতেই সীমাবদ্ধ নয়। গানের পদসকল ত্যাগ ক'রে তা'র মধ্যে বিস্তৃত স্বরসমূহকে নানা শব্দ যোগে প্রকাশ করা যায়, তা'কে আলাপ বলে। আলাপে গায়ক বিলম্বিত, মধ্য ও দ্রুত এই তিন প্রকার গতিতে আর আধা, মীড়, কম্পন প্রভৃতি সংযোগে সুরবৈচিত্র্যের সৃষ্টি করে। পাশ্চাত্য সঙ্গীত রচয়িতাদের মধ্যে ব্যাক্ শত শত প্রকারের জটিল উপায়ে সুরের আবৃত্তির সূক্ষ্ম তারতম্যের মধ্যে তা'র প্রভাব ও অপূর্ব সৌন্দর্য উপলব্ধি করেছিলেন।

প্রাচীন সংস্কৃত সঙ্গীতশাস্ত্রে ১২০ প্রকার “তালে”র বিবরণ উল্লিখিত আছে। কথিত আছে যে, আদিসঙ্গীতকার ভরতমুনি ভরতপক্ষীর কণ্ঠধ্বনিতে ৩২ প্রকার তাল পৃথক্ করতে সমর্থ হয়েছিলেন। তালের উৎপত্তির মূল হচ্ছে, মানুষের গতিছন্দে—পদক্ষেপের দ্বিগুণ আর নিদ্রার মধ্যে যখন নিশ্বাস, প্রশ্বাসের দুগুণ হয়ে দাঁড়ায়, সেই নিশ্বাস প্রশ্বাসের তিনগুণ সময়। ভারতবর্ষে মনুষ্যকণ্ঠস্বরই শব্দযন্ত্র মধ্যে সবচেয়ে পূর্ণাঙ্গ বলে পরিচিত। হিন্দুসঙ্গীত তাই প্রধানতঃ কণ্ঠস্বরের তিন সপ্তকের মধ্যেই নিবদ্ধ আর ঐ একই কারণে হিন্দুসঙ্গীতে স্বরসঙ্গতির চেয়ে সূতানেরই বেশী প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে।

প্রাচীন ঋষি-সঙ্গীতকারদের গভীরতর উদ্দেশ্য ছিল, গায়কের বিশ্বতানে মিলিত হয়ে মানবমেরুদণ্ডস্থিত চক্রের অলৌকিক শক্তির জাগরণের সাহায্যে প্রণবরন্ধার শ্রবণ করা। ভারতীয় সঙ্গীত হচ্ছে ভাবময়, আধ্যাত্মিক আর ব্যক্তিগত কলারূপপ্রদর্শন, যা’র লক্ষ্য ঐক্যতানের চরম সৌন্দর্য্য নয়, কিন্তু নাদব্রহ্মের সহিত ব্যক্তিগত মিলনে; তাই সঙ্গীতকারের সংস্কৃত প্রতিশব্দ, “ভাগবত, যিনি ঈশ্বরের মহিমা কীর্তন করেন।” সঙ্গীর্তনও একটি ফলপ্রসূ যৌগিকপ্রথা অথবা আধ্যাত্মিক নিষ্ঠাচার, যা’তে ক’রে চিন্তা আর শব্দবীজের গভীর মনঃসংযোগ প্রয়োজন হয়। মানুষ স্বয়ং নাদব্রহ্মের মূর্ত প্রকাশ বলে, তা’র উপর শব্দের অত্যন্ত শক্তিশালী আর সত্ত্বপ্রভাব বিদ্যমান আর তা’তে ক’রে তা’র দিব্যজনম স্বরণের পথ প্রদর্শন করে।

শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজির দোতলার বসবার ঘর থেকে সঙ্গীর্তনের যে গান ভেসে আসছিল, তা’ নীচে উননশালে দাঁড়িয়ে যা’রা রান্না ক’রছিল, তা’দেরও মাতিয়ে তুলছিল। আমরাও হাততালি দিয়ে গানের ধুরো গাইতে শুরু ক’রে দিলুম।

সন্ধ্যার সময় শত শত অতিথিঅভ্যাগতদের খিচুড়িপ্রসাদ বিতরণ করা হ’ল। সঙ্গে ছিল নিরামিষ তরকারি পায়ের প্রভৃতি। খাওয়াদাওয়ার পর সভার আয়োজন হ’ল। উন্মুক্ত আকাশের নীচে শতরঞ্জি বিছিয়ে যারগা ক’রা হ’ল। শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজির শ্রীমুখনিঃসৃত অমৃতময়ী বাণী সমবেত ব্যক্তিগণ অত্যন্ত মনোযোগের সঙ্গেই নীরবে শুনতে লাগলেন। ক্রিয়াযোগের

প্রয়োজনীয়তাই ছিল বক্তৃতার বিষয়। সে বিষয়ে বিশদভাবে বর্ণনা পর তিনি আদর্শজীবনে আত্মসন্মান, ধীরতা, দৃঢ়সঙ্কল্প, সাদাসিধা আহাৰ এবং দৈনন্দিন ব্যায়ামের উপযোগিতাও বর্ণনা করেন।

এরপর ছোট ছোট ব্রহ্মচারী বালকেরা স্তোত্র পাঠ করবার পর সঙ্কীর্ণ হ'য়ে সভাভঙ্গ হ'ল। দশটা থেকে রাত বারটা অবধি আশ্রমবাসিরা বাসন-মাজা, ধোয়াপোছা প্রভৃতিতে ব্যস্ত রইল। গুরুদেব আমাকে তাঁ'র কাছে ডেকে নিয়ে বল্লেন, “মুকুন্দ, উৎসবের আয়োজনের জন্তে এই সাত দিন ধ'রে, বিশেষতঃ আজকে তুমি সারাদিন ধ'রে হাসিমুখে যে খাটুনি খেটেছ, তা'তে আমি ভারি খুসী হয়েছি। তুমি আমার কাছে থাকবে। আর দেখ, আজ তুমি আমার বিছানায় শুতে পা'র।” এই বিশেষ অনুগ্রহটি আমার কপালে কোনও দিন জুটবে, তা' স্বপ্নেও ভাবতে পারিনি। হু'জনে আমরা কিছুক্ষণ গভীর প্রশান্তির মধ্যে বসে রইলুম। বিছানায় ঢোকবার পর মিনিটদশেক কেটেছে কিনা সন্দেহ, গুরুদেব উঠে পড়ে জামাটামা গায়ে দিতে সুরু করলেন।

গুরুদেবের পাশে শয়নলাভ করার অপ্রত্যাশিত আনন্দে সেটা কতকটা অবিশ্বাস্য ব'লেই যেন তখন বোধ হ'চ্ছিল, জিজ্ঞাসা ক'রলুম, “কি ই'ন গুরুদেব?”

“দেখ, মনে হচ্ছে যেন জনকতক শিষ্য ঠিক সময়মত ট্রেন ধরতে পারে নি; তা'রা হয়ত' এখুনিই এসে পড়বে। চল, তা'দের জন্তে কিছু খাবারদাবারের যোগাড় ক'রে রাখা যা'ক।”

“গুরুজি! রাত একটায় কেউই আজ আর আসছে না, কেন ব্যস্ত হচ্ছেন; আপনি নিশ্চিন্ত হ'য়ে শুয়ে পড়ুন।”

“আচ্ছা, তুমি শুয়ে থাক, সারাদিন ধ'রে খুব খেটেছ খুটেছ; আমিই'ন হয় রান্নাটান্নার ব্যবস্থা দেখিগে।”

গুরুজির কণ্ঠস্বরে দৃঢ়তা দেখে, আমি তড়াক্ ক'রে বিছানা থেকে লাফিয়ে উঠে পড়ে গুরুদেবের সঙ্গে সঙ্গে চললুম সেই তেতলার উপর ভিতরকার বারান্দার ধারে ছোট্ট রান্নাঘরটিতে, যেখানে আমাদের রোজ রান্না হয়।

গুরুদেব স্নিগ্ধমধুর হেসে বল্লেন “আজকের রাতে তুমি ক্লান্তি আর কষ্ট

কাষের ভয়কে জয় করেছে—জীবনে আর তোমার এদের কোন ভয় থাকবে না, দেখো!”

আমার চিরজীবনের এই পরম শুভআশীর্বাদ উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে উঠানে পায়ের শব্দ শোনা গেল। দৌড়ে নীচে নামতেই দেখা গেল, একমল শিষ্য এসে উপস্থিত।

তাঁদের মধ্যে একজন ক্ষমাপ্রার্থনাসূচক ভাবে বললেন, “ভাই, এত রাত্তিরে এসে গুরুদেবকে বিব্রত ক’রতে আমাদের একান্তই ইচ্ছে ছিল না। কিছু কি ক’রব ব’লুন, ট্রেনের সময়ের গোলমাল ক’রে ফেলেছিলুম, তাই এই বিভ্রাট ঘটে গেল। কিছু এসে যখন পড়েছি, তখন একবার গুরুর দর্শনলাভ না ক’রে আর কি ক’রে ফিরে যাই, ব’লুন?”

“তিনি আপনাদের জন্তে অপেক্ষা করছেন, অপেক্ষা করছেন কি— আপনাদের জন্তে একেবারে রান্না চড়িয়েছেন, দেখুন গে।”

গুরুদেবের কর্তৃত্ব শোনা গেল। ডাকছেন; তাঁদের দলবল শুদ্ধ নিয়ে গিয়ে রান্না ঘরে হাজির করলুম।

গুরুদেব এইবার আমার দিকে চোখ মিট্ মিট্ ক’রে তাকিয়ে বললেন, “যাক্, এতক্ষণে ত’ তোমার সন্দেহ ভঞ্জন হ’ল। এবার ত’ বুঝলে যে, এরা সত্যিসত্যিই ট্রেন ফেল ক’রেছিল?”

আধঘণ্টাটাক্ বাদে, তাঁদের খাওয়াদাওয়া শেষ হ’লে, গুরুদেবের পিছন পিছন চললুম; মনে হ’ল, এবার অবশ্য ঠিক আমার ঈশ্বরতুল্য গুরুদেবের পাশে শয়নের সৌভাগ্যলাভ হ’বে। এবার আর তা’তে বাধা পড়বার কোন সম্ভাবনা নাই।

১৬শ পরিচ্ছেদ

গ্রহশাস্তি

“মুকুল, তুমি গ্রহশাস্তির জন্ত একটা তাগা ধারণ ক’র না কেন?”

“ক’রব না কি গুরুদেব? ‘কিন্তু ও সব জ্যোতিষশাস্ত্রে আমার আদে বিশ্বাস হয় না।”

“না, না, এ বিশ্বাসটি বিশ্বাসের কথা নয়। কোন বিষয়ের বৈজ্ঞানিক ধারণা ক’রতে গেলে দেখবে যে, সেটা সত্যি কিনা। নিউটনের আবিষ্কারের পরে যেমন, তেমনি তা’র আগেও ত’ মাধ্যাকর্ষণ বেশ চমৎকারভাবেই কাজ করছিল। মানুষের বিশ্বাসের অভাবে যদি এর আইনকাছন কাঁচ করতে না পারে, তা’ হ’লে ত’ বিশ্বব্রহ্মাণ্ড একেবারে লণ্ডভণ্ড হয়ে যায়।

“যত সব বুজরুকদের দ্বারাই জ্যোতিষশাস্ত্রের এইরকম বর্তমান দুর্দশা দাঁড়িয়েছে। এ বিষয়ে গভীরজ্ঞান না থাকলে, কি গণিতিক,* কি আধ্যাত্মিক, কোন রূপেই কেউ সঠিকভাবে এর ধারণা করতে পারে না—এ এতবড়ই

* প্রাচীন হিন্দুশাস্ত্রের জ্যোতিষিক উল্লেখ পণ্ডিতেরা গ্রন্থরচয়িতাদের সঠিক তারিখ নির্ধারণ করতে সমর্থ হয়েছেন। ঋষিদিগের বৈজ্ঞানিক গবেষণা অতি উচ্চধরনের ছিল। কোষিত্তে ব্রাহ্মণের স্থনির্দিষ্ট জ্যোতিষাংশে আমরা দেখতে পাই যে, ৫০৫০ বৎসর পূর্বে হিন্দুরা জ্যোতিষশাস্ত্র বিশেষ পারদর্শী ছিলেন, যে শাস্ত্রবলে ক্রিয়াকর্ষের শুভলগ্ন নির্ধারণ করা হ’ত। ১৯৩৪ সালের ঈষ্ট-ওয়েষ্ট পত্রিকায় “জ্যোতিষ” সম্বন্ধে নিম্নলিখিত এক সংক্ষিপ্তসার প্রকাশিত হয়,—“এর বৈজ্ঞানিক তথ্যসমূহে জানতে পারা যায় যে, প্রাচীন জাতিসমূহের মধ্যে ভারতবর্ষই সর্বাপেক্ষা অগ্রগী ছিল—আর সেখানে জ্ঞানহরণের জন্ত নানা দেশ হ’তে লোকেরা আসত। সুপ্রাচীন জ্যোতিষশাস্ত্র ব্রহ্মাণ্ডে নিম্নলিখিত বিষয় সব বর্ণা—আমাদের সৌরমণ্ডলে গ্রহাদির মন্দক্ষুট গতি, রবিপরমক্রান্তি, পৃথিবীর গোলাকৃতি, চন্দ্রের পরাবর্তিত আলোক, পৃথিবীর নিজ অক্ষরেখার উপর আক্ষিকগতি, ছায়াপথের স্থিরনক্ষত্রের অবস্থান, মাধ্যাকর্ষণ শক্তি—এবং অত্যাশ্চর্য বৈজ্ঞানিক তথ্যসকল বা, কোপার্নিকাসের নিউটনের আগে প্রাচ্যজগতে কখনও অবিস্কৃত হয় নি।”

একটা বিরাট শাস্ত্র। মূখ্য আনাড়ি যদি শাস্ত্র ঠিকমত না বুঝেই বিশ্লেষণে ফলাতে যায়, তা'হ'লে ফল ত', ঐরকমই হ'বে আর এ জগতে তা' হওয়াও বিচিত্র নয়। তাই ব'লে এই সব “শাস্ত্রজ্ঞ”দের সঙ্গে শাস্ত্রটাও বিসর্জন দেওয়া চলে না।”

গুরুদেব বলতে লাগলেন,—“সৃষ্টির সকল অংশই পরস্পরের সহিত সংযুক্ত আর পরস্পরের উপর প্রভাব বিস্তার করে। বিশ্বপ্রকৃতির সমতাছন্দ এই আদানপ্রদানের ভিতরই লুকিয়ে রয়েছে। মানুষকে তা'র মানব-প্রকৃতি অনুসারে দুই ধরনের শক্তির বিরুদ্ধে লড়াই ক'রে চলতে হয়। প্রথমতঃ তা'র সত্তার ভিতর ‘ক্ষিত্যপতেজঃমরুদ্যোম’ প্রভৃতি পঞ্চভূতের সংমিশ্রণ হ'তে উদ্ভূত বিপ্লব আর দ্বিতীয়তঃ বহিঃপ্রকৃতির ধ্বংসশক্তি। মানুষ যতদিন মরণের সঙ্গে লড়াই ক'রে চলে, ততদিন তা'কে লক্ষকোটি পার্থিব আর অপার্থিব পরিবর্তনের ভিতর দিয়ে চলতে হয়।

“জ্যোতির্বিজ্ঞা হ'চ্ছে, মানুষের জীবনের উপর গ্রহনক্ষত্রের প্রভাবের বিষয় অধ্যয়ন। গ্রহনক্ষত্রেরা ত' নিজবুদ্ধিবলে উপকার বা অপকার করে না, তা'রা কেবলমাত্র ধনাত্মক অথবা ঋণাত্মক জ্যোতিঃ বিকিরণ করে মাত্র। এদের নিজেদের কোন ক্রিয়াশক্তি নেই; এরা মানুষের সোজাসজি কোন উপকার অথবা অপকার করতে পারে না। এরা হচ্ছে, মানুষ অতীতে যা কর্মফল সঞ্চিত ক'রে যে ভারসাম্য চালিত ক'রে এসেছে, বহিজর্গতে তা'র কার্যকারণের ফলপ্রকাশের বৈধ উপায়।

“জাতক জন্মায় ঠিক সেই দিন ক্ষণ মুহূর্ত ধ'রে, যখন সেটা তা'র প্রাক্তন কর্মফল অনুসারে গ্রহনক্ষত্রদের সংস্থানের সঙ্গে সূক্ষ্ম গণিতিক হিসাবে একেবারে হুবহু মিলে যায়। তা'র কোণ্ঠি হ'চ্ছে, তা'র অতীতকর্মের অবিকল প্রতিলিপি, যা' বদলান যায় না, আর তা' ভবিষ্যতেরও সম্ভাব্য ফল

এখন এ সত্য স্প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যে, তথাকথিত আরব সংখ্যা যা'র চিহ্নের অভাবে উচ্চতর গণিতচর্চা কঠিন হয়ে দাঁড়ায়, তা' নবম শতাব্দীতে আরব দেশের মধ্য দিয়ে ইউরোপে এসেছিল ভারতবর্ষ থেকেই, যেখানে অঙ্কলিখনপ্রণালী বহু প্রাচীনকাল হ'তেই বিধিবদ্ধ হয়েছিল। ভারতের নিরুটি জ্ঞানভাণ্ডারের আরও অধিকতর পরিচয় লাভ করতে গেলে ডাক্তার প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের “হিন্দু রসায়নশাস্ত্রের ইতিহাস” আর ডাক্তার ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের “প্রাচীন হিন্দুদের প্রত্যক্ষ বা ঐক্যবিজ্ঞান” উল্লেখ্য।

প্রকাশ করে। কিন্তু জন্মফল কেবল বাদের অনুভূতিজ্ঞান আছে, তা'র সঠিকভাবে প্রকাশ ক'রে বলতে পারে। জন্মমূহুর্তে গ্রহনক্ষত্রের সমাবেশ বোঝায় না যে, তা'র অতীত শুভাশুভ কর্মফলের সমষ্টিতে যে অদৃষ্ট রচি হ'য়েছে, তা' থেকে তা'র উদ্ধারের আর কোনই উপায় নেই। এ সমাবেশ জাতকের চিরজীবনের জন্য অদৃষ্টের দাস হ'তে মুক্তিকামনার চেষ্টার উদ্দেশ্যে করার জন্য সূচনা করে। যা' সে করেছে তা' সে বদলাতে পারে, তা' সে উল্টে দিতে পারে। তা'র বর্তমান জীবনে যে সকল কার্যের সূচনা হয়েছে তা'দের কারণেরও সেই ত' একমাত্র কর্তা—আর কেউ নয়। সে তা'র কোন সংকীর্ণতা দূর করতে পারে, কারণ প্রথমতঃ তা'রই কর্মফলবশত সেটা সৃষ্টি হয়েছে আর তা' ছাড়া তা'র আধ্যাত্মিকশক্তি আছে, যেটা গ্রহনক্ষত্রের প্রভাবাধীন নয়।

“অদৃষ্ট ছাড়া আর কোন পথ নাই, এই যে কুসংস্কার, এই যে ভ্রম এ মানুষকে একেবারে প্রাণহীন যন্ত্রের মতনই করে তোলে; জীতদাসে মতন তা'কে যন্ত্রচালিতের মতনই নির্ভর করে চলতে হয়। জানী যে, তা'র গ্রহনক্ষত্রের শক্তিকে পরাভূত করতে পারে, মানে তা'র প্রাক্তন কর্মফল খণ্ডন করতে পারে—সৃষ্টি থেকে স্রষ্টার প্রতি তা'র ভক্তি আরো ক'রে। যতই সে চৈতন্যের সঙ্গে একীভূত হয়ে যাওয়া উপলব্ধি ক'রে পারে, ততই সে জড়ের প্রভাব হ'ত মুক্ত হয়। আত্মা চিরমুক্ত, চিরনিত্য, শাস্বত—এর মরণ নেই, কারণ এর জন্ম নেই; কাষেই এ কখনও গ্রহনক্ষত্রের প্রভাবাধীন হ'তে পারে না।

“মানব হচ্ছে আত্মা আর তা'র একটি দেহ বর্তমান। যখন সে প্রকৃত সত্যোপলব্ধি করতে পারে, তখন সে আর বাইরের কোন শক্তিরই খেলায় অভিভূত বা বিব্রত হয়ে পড়ে না, সে অকুতোভয়ে সব ত্যাগ করতে পারে; কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত সে সাধারণ আধ্যাত্মিক বাতুলতার বশে বিব্রত হ'য়ে থাকে, ততক্ষণ পর্যন্ত তা'কে সমস্ত পারিপার্শ্বিক অবস্থার বিধিনিয়ম সূক্ষ্মশৃঙ্খলে আবদ্ধ হ'য়ে থাকতে হয়।

“ভগবানের সঙ্গে ভুক্ত এক হ'য়ে গেলে তা'র ত' আর কোন কাষেই হ'বার আশঙ্কা নেই, তা'র কার্যকলাপ সব স্বাভাবিক আর সঠিকভাবে

জ্যোতিষশাস্ত্রের নিয়মানুযায়ী সম্পাদিত হয়, কোন বিরুদ্ধফল উৎপন্ন হয় না। গভীর ধ্যান আর প্রার্থনার বলে সে সেই বিশ্বচৈতন্যের সঙ্গে এক হয়ে যায়—অন্তরের মধ্যে রক্ষা করতে তা'র চেয়ে বড় ত' আর কোন শক্তিই নেই।”

“তা' হ'লে গুরুদেব, আপনি আবার আমাকে তাগা ধারণ ক'রতে বলছেন কেন?” প্রশ্ন করলাম যদিও, কিন্তু বেশ কিছুক্ষণ পরে। এর মধ্যে আমাকে শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজির এই জ্ঞানগর্ভ ব্যাখ্যা খানিকটা পরিপাক করবার চেষ্টা করতে হয়েছিল।

“মানোটা কি জান? পরিত্রাজক গম্ভব্য স্থানে পৌঁছে তবে ত' ম্যাপ ফেলে দেয়। পথ চলতে ত' তা'কে সুবিধাজনক আর সোজা রাস্তা খুঁজে বা'র ক'রে নিতে হয়। প্রাচীন ঋষিরা আমাদের এ পৃথিবীর মায়াতে নির্দাসনের কালটা কন্দিয়ে ফেলবার জন্তে নানা রকম উপায় আবিষ্কার ক'রে গেছেন। অবিদ্রিষ্ট কর্মফলভোগের কতকগুলো বাঁধাধরা নিয়মকানুন আছে বইকি। কিন্তু তা'ও জ্ঞানবলে সুবিধাজনক ব্যবস্থা ক'রে নেওয়া যায়, নিতান্ত গতানুগতিকভাবে ভোগ ক'রে যেতে হয় না।

“মামুনের বা কিছু দুঃখকষ্ট অমঙ্গল তা' কোন না কোন প্রকার প্রাকৃতিক নিয়মলঙ্ঘন থেকেই উৎপন্ন হয়। শাস্ত্রবিধি এই নির্দেশ দেয় যে, ঈশ্বরের সর্বশক্তিমত্তা অস্বীকার না ক'রে, সব প্রাকৃতিক নিয়ম মেনে চলা। তা'র কি বলা উচিত জান? তা'র এই প্রার্থনা করা উচিত যে,—‘প্রভু, একমাত্র তোমাকেই ত' আমি ভক্তি করি, আর জানি যে তুমিই আমার সাহায্য করবে। কিন্তু আমিও আমার রত অন্ডায় বা ভুল কাযের জন্তে বা তা'র জন্তে যদি কোন মন্দ ফলের উৎপত্তি হয় তা' সংশোধনের জন্তে প্রাণপণে চেষ্টা ক'রব।’ বহুবিধ উপায়ে—এই ধর না কেন, প্রার্থনার দ্বারা, ইচ্ছাশক্তির দ্বারা, যোগসাধন, গভীর ধ্যানধারণা বা সাধুসন্তদের উপদেশ, আশীর্বাদ বা অন্য কোনপ্রকার ব্যবস্থার দ্বারা অথবা উপযুক্ত তাগা প্রতি ধারণ ক'রে, অতীতজীবনের কর্মফলের গুরুত্ব হ্রাস করান অথবা তা' এড়ান যেতে পারে।

“বাজপাড়ার হাত থেকে এড়ানর জন্তে বাড়ীর মাথার ওপর তামাব শিক দেওয়া থাকে দেখেছ ত', তেমনি এই শরীরমন্দিরও নানাবিধ উপায়ে

রক্ষা করা যেতে পারে। যুগযুগান্ত পূর্বে আমাদের মুনিঋষিরা আবিষ্কার করে গেছেন যে, খাঁটি ধাতু থেকে এক রকম আধ্যাত্মিকশক্তিবিশিষ্ট হুঙ্গ রশ্মি বিনির্গত হয় আর তা'র গ্রহনক্ষত্রদের ধণাত্মক আকর্ষণের (ক্ষতিক প্রভাব) বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়ার খুব প্রচণ্ডশক্তি আছে। সারা বিশ্বপ্রকৃতিতে অতি হুঙ্গ বৈদ্যুতিক আর চৌম্বক শক্তি প্রতিনিয়তই খেলা ক'রে বেড়াচ্ছে যখন কারুর শরীরের সংস্পর্শে এসে তা'র উপকার করে, তখন সে বেদ জানতে পারে না, তেমনিভাবে তা'র অপকার ক'রলেও সে ঐ রকম একেবারেই অজ্ঞ থাকে। সে কি এর কোন কিছু বিহিত করতে পারে ব'ল ?

“এই সমস্তটা আমাদের প্রাচীন মুনিঋষিদের মনোযোগ আকর্ষণ করেছিল। তাঁ'রা দেখলেন যে, কেবলমাত্র শুধু কতকগুলো ধাতুর সংমিশ্রণে এ বিষয়ে খুব কার্যকরী তা' নয়, বৃক্ষলতাগুল্মাদির মূলও—আর সবচেয়ে ফলপ্রসূ হচ্ছে, বেদাগ আর নিখুঁত রত্ন—তা' অন্ততঃ দু' রকম হওয়া চাই। গ্রহশক্তির বিষয় নিয়ে ভারতবর্ষের বাইরে গুরুতরভাবে আলোচনা হয়েছে কি না সন্দেহ। আসল কথাটা কি জান, প্রশস্ত ধাতু, রত্ন, বা মূল ধারণ সব বৃথাই হ'য়ে যায়, যদি না সে সব ঠিক উপযুক্ত পরিমাণের ওজনের দেওয়া হয় অথবা ঠিক অঙ্গস্পর্শ করিয়ে না ধারণ করা হয়।

“গুরুদেব, তা' হ'লে ত' গ্রহশক্তির ব্যবস্থা করা দরকার। নিশ্চয়ই আমি আপনার পরামর্শ মত তাগা ধারণ করব।”

“সাধারণভাবে ব্যবহারের উদ্দেশ্যে তোমার সোনা, রূপো আর তাম্র তাগা ব্যবহার করলেই চলবে, আর বিশেষ ফললাভের জন্তে তোমার রূপো আর সীসের তাগা ব্যবহার করা উচিত,” ব'লে শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজি এ বিষয়ে সব খুঁটিনাটি উপদেশ দিয়ে দিলেন।

জিজ্ঞাসা করলুম,—“আচ্ছা গুরুজি, এই 'বিশেষরূপে ফললাভ'টার মানে কি ? কি উদ্দেশ্যে ব্যবহার ক'রতে হ'বে, বলুন ত' ?”

“মুকুন্দ, শীগ'গিরই তোমার দারুণ গ্রহপীড়া ঘটবে—ভয় পেয়ো না রক্ষা পেয়ে যাবে। মাসখানেকের মধ্যেই তোমার লিভারের দোষ দাঁড়িয়ে

গিয়ে তোমায় খুবই ভোগাবে। এ ভোগ তোমার ছ' মাসকাল পর্যন্ত চলবে ; কিন্তু তাগা ধারণ ক'রলে, ভোগকালটা কমে গিয়ে মাত্র চব্বিশ দিনে এসে দাঁড়াবে।”

তা'র পরদিনই একটা স্যাকরা ডাকিয়ে গুরুজির কথামত তাগা তৈরী করিয়ে নিয়ে ধারণ করলুম। স্বাস্থ্য তখন আমার খুবই ভাল ছিল ; গুরুজির ভবিষ্যদ্বাণী একেবারে ভুলে গেলুম, আর কিছুই মনে রইল না। তিনি শ্রীরামপুর থেকে কাশী চলে গেলেন। আমাদের কথাবার্তার দিন ত্রিশেক পরে আমার লিভারের জায়গায় একটা দারুণ বেদনা উঠল। তা'র পরের ক'হণ্ডা যে কি ক'রে কেটেছিল, তা' ভগবানই জানেন। কি যে দারুণ যন্ত্রণা আর কষ্ট, আর তা'র কি একটু মাত্রও রেহাই ছিল না! মনে মনে ভাবলুম যে গুরুদেবকে এ নিয়ে আর বিব্রত করব না, একাই এ নিদারুণ কষ্ট নীরবে সহ ক'রে যাব।

কিন্তু তেইশ দিন দারুণ ভোগবার পর আর সহ্যে না পেরে, সে সম্ভ্রম আর বজায় রাখতে পারলুম না ; কাশীর ট্রেনে চেপে বসলুম। বাড়ীতে গিয়ে পৌঁছতে গুরুজি অবশ্য আমার খুবই আদর যত্ন ক'রলেন। দর্শনের জন্ত বহু ভক্তশিষ্যেরা সেদিন গুরুজির কাছে এসে হাজির। আমার যে কি দারুণ কষ্ট তা' আর তাঁ'কে আড়ালে ডেকে বলবার কুরসং পাই না, আর কেউ ডেকে জিজ্ঞাসাও করবে না। কি বিপদ! মন থিঁচড়ে গেল, একা একা একটা কোণে চুপ ক'রে বসে রইলুম। রাত্রে সব খাওয়াদাওয়া চুকে গেলে তবে সবাই চলে গেল, তখন গুরুদেব আমাকে তাঁ'দের বাড়ীর সেই অষ্টকোণ বারান্দাটিতে ডেকে পাঠালেন।

শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজি চাঁদের আলোয় পায়চারি করছিলেন, মাঝে মাঝে তাঁ'র ছায়া এসে পড়ছিল ; আমার দিকে তাঁ'র চোখ না ফিরিয়ে তিনি পায়চারি করতে করতেই বললেন, “তোমার লিভারের যন্ত্রণার জন্তে এসেছ, ওঃ ; যাচ্ছা দেখি, তুমি কদিন ভুগ্ছ—দিন চব্বিশেক হ'বে, না ?”

“আজ্ঞে হ্যাঁ, গুরুদেব।”

“তা' হ'লে তোমায় যে পেটের ব্যায়ামটা শিখিয়ে ছিলুম, সেটা ক'র না কেন ?

হাস্য না কান্দন বুঝতে পারলুম না, তবুও তাঁ'র আজ্ঞা পালনের ক্ষীণ প্রচেষ্টায় বললুম, “গুরুদেব, কি দারুণ যন্ত্রণায় যে ভুগছি, তা' যদি জানতেন, তা'হ'লে ও কথা আর মুখে আনতে পারতেন না। এই যন্ত্রণার ওপর ব্যাখ্যা করব, কি যে বলেন!”

“তুমি বলছ যে তোমার যন্ত্রণা আছে, এ্যা,—আর আমি বলছি যে তোমার কিছুমাত্র যন্ত্রণা নেই, এ দুটো বিপরীত কাণ্ড কি ক'রে একসঙ্গে হ'ব'ল দেখি?” ব'লে গুরুদেবের আমার দিকে সপ্রশ্নদৃষ্টিতে চাইলেন!

শুনে আমি ত' একেবারে স্তম্ভিত আর সঙ্গে সঙ্গে মূর্তির আনন্দে একেবারে উন্মত্ত হয়ে উঠলুম। এই চব্বিশদিন ধ'রে যে অসহ্য যন্ত্রণা অবিরত ভোগ করে এসেছি, যা'তে ক'রে রাত্রে বিন্দুমাত্রও ঘুম হ'ত না, তা' ত' আর কিছুমাত্র টের পাচ্ছি না। শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজির কথায় সে দারুণ যন্ত্রণা একেবারে বেমানম উড়ে গেল, যেন কোনও কালে কখনও কিছু হয় নি, কি আশ্চর্য্য!

কৃতজ্ঞতার ভারে ছুয়ে পড়ে পদতলে গিয়ে পড়তে গেলুম, তাড়াতাড়ি তিনি আমায় ধরে ফেললেন। তা'রপর যেন কিছুই হয়নি, এমনি ভাবে বললেন, “আরে ছেলেমানুষী কোরো না, ওঠো, ওঠো; গঙ্গায় কেমন টাঁদের আনন্দ পড়েছে, দেখ দেখি!” নীরবে তাঁ'র পাশে দাঁড়িয়ে দেখলুম, তাঁ'র চোখদুটি আনন্দে উজ্জ্বল। তাঁ'র এ রকম ব্যবহারে ভাবলুম যে, তিনি আমাকে এই বিশ্বাস করাতে চাইছেন যে তিনি ন'ন, ভগবানই হচ্ছেন আমার আরোগ্য-কর্ত্তা। চিরপোষিত, স্তূদুর অতীতের স্মৃতিচিহ্ন, আজও আমি সেই রূপে আর সীসের ভারি তাগা পরে রয়েছি। তখন আবার আমি নতুন ক'রে বুঝতে পারলুম যে সত্যিই আমি এক মহামানবের সঙ্গে বাস করছি। পরবর্ত্তী জীবনে আমি অনেক বন্ধুদের শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজির কাছে ভাল হ'বার ভাবে নিয়ে গিয়েছিলুম। তিনি তাগা কি রত্ন আর তা'রা কোন্ গ্রহশাস্তিতে প্রশস্ত আর তা'দের ব্যবহার কিরূপ সব বুঝিয়ে দিয়ে ধারণ করবার উপদেশ দিয়ে তা'দের ভাল ক'রে দিতেন।

ছেলেবেলা থেকেই জ্যোতিষশাস্ত্রের প্রতি আমার একটা অশ্রদ্ধা আর অবিশ্বাসের ভাব ছিল খানিকটা এই কারণে যে, অনেকেই এর প্রতি অন্ধ আনুগত্য প্রদর্শন করে, তা'দের কোন যুক্তি বিচার নাই আর খানিকটা এই

কারণে যে, আমাদের বাড়ীর জ্যোতিষী মহাশয় বলেছিলেন যে, “তোমার ছ’
ছ’বার পত্নীবিরোগ হ’বে আর তিনটে বিয়ে হবে।” এই তিনটে বিয়ের কথা
শুনে ত’ বলিদানের পাঁঠার মত আমার সমস্ত শরীরে কাঁপুনি ধ’রে গেল !
দারুণ চিন্তায় পড়ে গেলুম।

অনন্তদা’ পরম নিশ্চিতভাবে বলেছিলেন, “এ ত’ তোমার কপালে ঘটবেই।
কারণ তোমার কুষ্ঠিতে ত’ লেখা ছিল যে, ছেলেবেলায় বাড়ী থেকে হিমালয়ের
দিকে পালাবে আর জোর ক’রে তোমায় ধরে আনা হ’বে, তা’ যখন সব ঠিক
ঠিক ফলে গেছে, তখন তোমার এ বিয়ের কথাও ফলে যেতে বাধ্য।” যুক্তিটা
একেবারে অকাটা। কিন্তু একরাতে অত্যন্ত স্পষ্টভাবে অনুভব করলুম যে,
এই ভবিষ্যদ্বাণী একেবারেই মিথ্যা। কোষ্ঠি আগুনে পুড়িয়ে একটা কাগজের
খামে তা র ছাইগুলো পুরে তা’র উপর লিখে দিলুম, “জ্ঞানের আগুনে পুড়লে
প্রাক্তন কর্মের বীজ আর কখনও ফুটে পারে না।” চট্ ক’রে নজরে পড়ে,
এমন জায়গায় খামটা রেখে দিলুম। অনন্তদা’ তখুনি দেখতে পেয়ে আমাকে
হেসে ঠাট্টা ক’রে বললেন, “যা সত্যি জীবনে ঘটবে, তা’ ওড়ান কি কুষ্ঠি
পোড়ানর মত এতই সোজা?”

তবে একথা সত্য যে, বয়স হ’বার আগেই বাস্তবিক তিন তিনবার
আমার বিবাহের সম্বন্ধ করার চেষ্টা হয়েছিল, কিন্তু তিন তিনবারই আমি সে
কান্দ এড়াতে পেরেছিলুম এই ভেবে যে, সংসারের আকর্ষণের চেয়ে ঈশ্বরের
প্রতি আমার আকর্ষণ ঢের ঢের বেশী প্রবল।

“মানুষের যত গভীর আত্মোপলব্ধি হয়, ততই সে সারা বিশ্বপ্রকৃতিকে
তা’র হৃদয় আধ্যাত্মিক শক্তির স্পন্দনে প্রভাবিত করতে পারে, আর ততই সে
নিজেও তা’র নৈসর্গিক প্রভাব হ’তে মুক্ত হ’তে পারে।” গুরুদেবের
এই কথাগুলো প্রায়ই মনের মাঝে উদয় হয়ে খুব উৎসাহের সঞ্চার ক’রত।

মাঝে মাঝে আমি জ্যোতিষীদের জিজ্ঞাসা করতুম, আমার সবচেয়ে
খারাপ সময় কবে পড়বে বলুন দেখি, আর সেই সময়টাই বেছে নিয়ে যে
কাষে লেগে থাকতুম তাইই ক’রে যেতুম। এও অবশ্য সত্য যে, এ রকম
হঃসময়ে দারুণ কষ্টের ভিতর দিয়ে তবে কতকটা কৃতকার্য হ’তে পারা গেছে।
কিন্তু আমার যা’ বিশ্বাস ছিল, তা’ শেষ অবধি একেবারে খাঁটি ব’লেই

প্রতিপন্ন হয়েছে। সেটা হচ্ছে এই যে, ভগবানই একমাত্র রক্ষাকর্তা এই বিশ্ব আর মানুষের ভগবৎপ্রদত্ত ইচ্ছার উপযুক্ত সন্যাসহার—এ দুটোর এত বড় শক্তি যে, সারা সৌরজগতের এমনতর ক্ষমতা নাই যে তা' ওঁটাতে পারে। তা'তে স্বর্ঘ্য চন্দ্র গ্রহনক্ষত্রের কোন দশাই মানুষের বিন্দুমান দুর্দশা আনতে পারে না।

পরে জানলুম যে জাতকের জন্মকালীন রাশিচক্রের অবস্থান এ বোঝা না যে সে প্রাক্তন কর্মফলের দাস। এর লিখন বাস্তবিকই অতি আশ্চর্য। এরা মানুষকে সর্ববিধ সংকীর্ণতা হ'তে মুক্ত হ'বার জগৎ দৃশ্যসঙ্কল জাগিয়ে তোলে। ভগবান প্রত্যেক মানুষকেই জীবাত্মারূপে সৃষ্টি ক'রে তা'কে ব্যক্তিত্ব দান করেছেন, কাষেই তা'রা এই বিশ্বসৃষ্টির একটা অপরিহার্য অংশ—তা' সে ক্ষুদ্র বৃহৎ বাইই হো'ক না কেন। তা'র মূল্য সত্য ও চরম অবস্থা সে যদি তা' একান্ত কামনা করে—আর তা'র জগৎ বাইরে কোন শক্তিকে জয় করা দরকার করে না, অন্তরে বিজয়লাভ করাই তা'র প্রয়োজন।

শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজি আমাদের বর্তমান যুগে ২৪,০০০ বর্ষব্যাপী সাদর বৃত্তের বা চক্রের গাণিতিক প্রয়োগ আবিষ্কার ক'রেছিলেন। এই কালচক্র অধিরোহী বা অবরোহী ভেদে দুটি চাপ বা বৃত্তাংশে বিভক্ত, প্রত্যেকেই ব্যাপ্তি ১২,০০০ বৎসর। প্রত্যেক বৃত্তাংশের মধ্যে আবার কলি, দ্বাপর, ত্রেতা ও সত্য এই চারটি ক'রে যুগ পড়ে। গ্রীকদের মতে এরা লৌহ, ব্রোঞ্জ, রৌপ্য ও স্বর্ণযুগ নামে অভিহিত।

আমার গুরুদেব নানাবিধ গণনায় স্থির করেছিলেন যে, অধিরোহী বৃত্তাংশের শেষ কলি বা লৌহযুগ প্রায় ৫০০ খৃষ্টাব্দে শুরু হয়েছিল। এই কলিযুগের স্থিতিকাল হচ্ছে ১২০০ বৎসর, আর এটা ছিল জড়ের যুগ। এ যুগ শেষ হয় প্রায় ১৭০০ খৃষ্টাব্দে। ঐ বৎসর হ'তেই ২৪০০ বর্ষব্যাপী দ্বাপর যুগের সূচনা। এই যুগে বৈদ্যাতিক ও আণবিক শক্তির নানাবিধ উন্নতি; টেলিগ্রাফ, রেডিও, বিমানাদি আর নানাবিধ দূরত্ববিলোপকারী যন্ত্রাদির আবির্ভাব।

ত্রেতাযুগের আরম্ভ হ'বে ৪১০০ খৃষ্টাব্দে; স্থিতিকাল, ৩৬০০ বৎসর। এ যুগের লক্ষণ হ'বে টেলিপ্যাথি বা পরচিত্তজ্ঞান, আর কালবিলোপকারী

অন্তান্ত বিষয়, তা'তে সকলেরই সাধারণজ্ঞান থাকবে। তা'রপর অধিরোহী বৃত্তাংশের শেষ সত্যযুগের আবির্ভাব ঘটবে। এর স্থিতিকাল হ'বে ৪৮০০ বৎসর। এ যুগে মানুষের বুদ্ধিবৃত্তি চরম উৎকর্ষ আর পূর্ণ পরিণতি লাভ করবে, তখন সে দৈবসম্বন্ধের সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা ক'রে কর্ম সকল সম্পাদন করবে।

তা'রপর আসবে অবরোহী বৃত্তাংশের ১২,০০০ বৎসর। এর সূচনায় পৃথিবীতে ৪৮০০ বর্ষব্যাপী অবরোহী সত্যযুগের আবির্ভাব হ'বে।* মানব-জাতি তখন ক্রমশঃ অজ্ঞান তমসাচ্ছন্ন হ'য়ে পড়বে। এই সব কালচক্র হ'চ্ছে মানুষের অনাগন্ত আবর্তন—প্রাতিভাসিক জগতের বৈপরীত্য আর আপেক্ষিকতার ক্রিয়া। বিশ্বস্রষ্টার সঙ্গে যখন তার অচ্ছেদ্য দৈব ঐক্যিকতার সংজ্ঞান বা কল্যাণবুদ্ধি জাগরিত হয়, তখনই মানুষ একে একে এই সৃষ্টি-মায়াকারাগার হ'তে মুক্তিলাভ করে।

গুরুদেব শুধু যে জ্যোতিষ সম্বন্ধে তা' নয়, পৃথিবীর নানা শাস্ত্রসম্বন্ধেও আমার জ্ঞানবৃদ্ধির সহায়তা করেছেন। নানা শাস্ত্রগ্রন্থের উপদেশ তিনি তাঁর নিষ্কল মনের উপলব্ধিজাত জ্ঞানের বিচারে বিশ্লেষণ ক'রে আর মহাপুরুষ-দিগের আদিপ্রচারিত বাণী হ'তে টিকাকারগণ রূত ভ্রমপ্রমাদ বা প্রক্ষিপ্ত অংশ বাদ দিয়ে তা' হ'তে সারসত্য উদ্ধৃত ক'রে দেখাতে পারতেন।

ভগবদ্গীতার ষষ্ঠ অধ্যায়ের ত্রয়োদশ শ্লোকে “সংপ্ৰেক্ষ্য নাসিকাগ্রং”এর ভুল ব্যাখ্যা প্রাচ্য পণ্ডিত এবং পাশ্চাত্য অনুবাদকেরা বহুল পরিমাণে গ্রহণ করাতে গুরুদেব সকৌতুকে সমালোচনা ক'রে বলতেন, “একে ত' যোগীদের পথ অদ্ভুত, তা'র উপর আবার তা'দের টারা হ'বার উপদেশ দেওয়া, কেন বল ? ‘নাসিকাগ্রং’এর আসল মানে হচ্ছে ‘নাসামূল’, নাসিকার শেষভাগ নয়। আর নাসিকার আরম্ভ হচ্ছে দুই ক্রর মধ্যস্থল,—আধ্যাত্মিক দৃষ্টির স্থান।

সাংখ্যের সূত্রে “ঈশ্বরাসিদ্ধে” এই সিদ্ধান্তে ঈশ্বরাসিদ্ধের প্রমাণ হয় না ক'রে নিয়ে বহুপণ্ডিত দর্শনশাস্ত্রকে একেবারে নিরীশ্বরবাদী বলেন।

শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজি বুঝিয়ে বলেন, “এ সূত্রে নাস্তিকতা আনে না। অশিক্ষিত লোকেরা, যা'রা কেবলমাত্র ইঞ্জিয়বোধেরই উপর নির্ভর ক'রে

* ১২,৫০০ ঋতুসন্ধে।

চরম সিদ্ধান্তে উপনীত হয়, তা'দের পক্ষে ঈশ্বরের প্রমাণ অজ্ঞাতই থেকে যায়, কাৰ্যেই তা'র অস্তিত্বও প্রমাণসিদ্ধ হয় না। খাঁটি সাংখ্যমতাবলম্বীরা তা'দের অবিচলিত ধ্যানলব্ধ অন্তর্দৃষ্টিবলে বুঝতে পারেন যে, ঈশ্বর আছে এবং তিনি জেয়।

খৃষ্টীয় বাইবেলও গুরুদেব অতি চমৎকার আর অতি স্পষ্ট ভাবে ব্যাখ্যা করতে পারতেন। আমার এই অখণ্ডান হিন্দুগুরুর কাছ থেকেই আমি বাইবেলের অমর সত্তা আর খৃষ্টধর্মের সারসত্য উপলব্ধি করতে শিক্ষা করে ছিলাম, যা'তে ক'রে যীশুখৃষ্ট বলেছিলেন, “স্বর্গ মর্ত্য লোপ পেতে পারে কিন্তু আমার বাণী কখনও লোপ পাবে না।”

যীশুখৃষ্ট যে সকল ঈশ্বরাদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন, সেই সব একই প্রকার উচ্চ আদর্শে ভারতবর্ষের মহাপুরুষগণ আপনাদের জীবন গঠন করেন। এঁরা তাঁ'র সমাগোষ্ঠি। খৃষ্ট বলেছেন, “যে কোন লোক আমার স্বর্গস্থ পিতার ইচ্ছা পালন ক'রবে, সে হবে আমার ভাই, ভগ্নী, মাতা।” যীশুখৃষ্ট বুঝিয়েছেন যে “যদি তোমরা আমার বাক্য অনুসরণ কর, তা' হ'লে তোমরা আমার প্রকৃত শিষ্য হ'তে পারবে এবং সত্য উপলব্ধি ক'রতে পারবে এবং এই সত্যজ্ঞানেই তোমাদের মুক্তি!” যা'রা সব নিজেদের সেই একমাত্র পদে পিতারই সন্তান ব'লে জ্ঞানলাভ করেছেন, তাঁ'রা সব স্বাধীন মুক্তপুরুষ। ভারতীয় যোগীশ্রমিগণ সেই অমর, অতৃসংজ্ঞেরই একাংশ।

বাইবেলে বর্ণিত আদিপিতা ও আদিমাতা আদম ও ইভের রূপক বোঝবার প্রথম প্রথম চেষ্টায় একদিন অধৈর্য হ'য়ে কিঞ্চিৎ উগ্রার সঙ্গে মন্তব্য প্রকাশ ক'রে ফেললাম, “আদম ও ইভের গল্প আমার কাছে একেবারেই অবোধ্য! ঈশ্বর শুধু দোষীদম্পতিকে শাস্তি দিয়ে ক্ষান্ত না হ'য়ে, তাঁ'দের নিরীহ অজ্ঞাত সন্তানসন্ততিদেরও শাস্তি দিলেন কেন?”

গুরুদেব আমার অজ্ঞতার চেয়ে উগ্রাপ্রকাশের ধরণ দেখে মনে মনে হেসে বললেন, “সৃষ্টিপ্রকরণ হ'চ্ছে গভীরভাবে রূপক আর তা' সোজাসুজি ব্যাখ্যায় বোঝা যায় না। ‘জীবনতরু’ হচ্ছে আমাদের এই মানবদেহ। এর মেরুদণ্ড হচ্ছে যেন একটা উন্টান গাছ, তা'র শিকড় হচ্ছে মাছুনের মাথা। চুল আর তা'র জ্ঞানবাহী ও ক্রিয়াবাহী স্নায়ুসকল হচ্ছে তা'র শাখাপ্রশাখা। স্নায়ুগুলীর তরুতে নানারকম উপভোগ্য ফল ফলে—রূপ, রস, শব্দ, স্পর্শ।”

গন্ধ, এদের বিচিত্র ইন্দ্রিয়ানুভূতি। এতে অবিশ্রি মানুষের একটু আদটু প্রশয় দেওয়া চলে, কিন্তু শরীরউত্থানের মাঝখানে আপেলফলরূপে বর্ণিত যে ইন্দ্রিয়স্বপ্নের স্থান, তা'র জ্ঞানাহরণ তা'র পক্ষে সম্পূর্ণ নিবিদ্ধ ছিল।”

‘সপ’ হচ্ছে মেরুদণ্ডবাহিনী কুণ্ডলিনী (?) শক্তি যা ইন্দ্রিয়মায় উত্তেজিত করে। ‘আদম’ হচ্ছে যুক্তি আর ‘ইভ’ হচ্ছে অনুভূতি বা ভাব। যখন কোন মানুষের ভিতর ইন্দ্রিয়ের তাড়না তা'র মানসিক ভাবকে পরাভূত করে, তখন সে যুক্তিকে হারায় অর্থাৎ আদমের মৃত্যু ঘটে।

“ঈশ্বর” তাঁ'র ইচ্ছাশক্তিবলে নরনারীর দেহে রূপদান ক'রে মনুষ্য-জাতির সৃষ্টি করেছেন। তিনি ঐ নবসৃষ্ট জাতিকে ঐরূপ একই উপায়ে বংশবৃদ্ধির ক্ষমতা অর্পণ করলেন। পূর্ণ বিচারক্ষমতার সম্ভাবনাবিহীন আর সংস্কারচালিত প্রাণিদেহে ঈশ্বরের জীবাত্মারূপে প্রথম প্রকাশ সীমাবদ্ধ থাকার দরুণ ঈশ্বর প্রথম সৃষ্টি করলেন বিচারবুদ্ধি সম্পন্ন মনুষ্যশরীর আর তা'দের আদম ও ইভ এই রূপক নাম দিলেন। এদের ক্রমোন্নতি-দৃঢ়ক বিবর্তনের জন্ত দুই শরীরে দুইটি প্রাণীর আত্মা প্রেরণ করলেন। আদম অর্থাৎ নরের ভিতর যুক্তিই প্রবল আর ইভ অর্থাৎ নারীর মধ্যে ভাব। তাই এই জগৎসংসারের ভিতর এই দ্বৈতভাবেরই প্রকাশ। সপ-রূপ ইন্দ্রিয়বৃত্তির প্রবলশক্তির দ্বারা যতক্ষণ পর্য্যন্ত না মানুষের মন প্রলুদ্ধ হয়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত যুক্তি আর ভাব মিলিত আনন্দের স্বর্গেই বাস করে।

“তা'হলে তোমার গিয়ে এই দাঁড়াচ্ছে যে, মনুষ্যশরীর কোন জন্তুশরীরের ক্রমবিবর্তনের একমাত্র ফল নয়, এ জাত হয়েছে ঈশ্বরের বিশেষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য নিয়েই। পশুশরীর পূর্ণ দৈব বা ঐশ্বরিক ভাববিকাশের পক্ষে অত্যন্ত স্থূল। মনুষ্যশরীরে তাঁ'র অপূর্ণ দান হচ্ছে বিরাট মননশক্তির আধার—মস্তিষ্কের ‘সহস্রদল পদ্ম’ আর তা' ছাড়া মেরুদণ্ডে বটচক্র। প্রথম-সৃষ্ট নরনারী যুগলের ভিতর ঈশ্বরতত্ত্ব বা পরমজ্ঞান তা'দের এই উপদেশই দিয়েছিল যে, সকল রকমই ইন্দ্রিয়ানুভূতি ভোগ করতে পার, কিন্তু সাবধান, স্পর্শে ইন্দ্রিয়ানুভূতির উপর কোন প্রকার মনোনিবেশ যেন না হয়। এদের উপর এত ক'রে নিষিদ্ধনিষেধ আরোপ করা হয়েছিল এই জন্ত যে, যৌন-চিহ্ন যেন কোন প্রকারে পরিস্ফুট না হয়ে ওঠে, যা'তে ক'রে মনুষ্যজাতিকে

নিম্নস্তরের জন্তুদের মতনই বংশবৃদ্ধির প্রক্রিয়ার জালে আবদ্ধ ক'রে ফেলে। মানুষের অবচেতন মনে অবস্থিত পাশবিকবৃত্তির স্বাতি যার্তে পুনরাব জাগরিত না হয়, তা'র জন্ত যে এই সতর্কতা, তা' কেউ গ্রাহ্যই করলে না। পাশবিকসৃষ্টির পথ বেছে নিয়ে আদম আর ইভ স্বর্গচ্যুত হ'ল যা আদি আর পূর্ণ মানবের স্বাভাবিক বাসস্থান ছিল।

“সদস্য জ্ঞান জগৎমায়া'র দৈতভাব সূচিত ক'রে। বৃত্তি আর ভাবের অপব্যবহারের দরুণ মায়া'জালে জড়িত হ'য়ে পড়ে মানুষ তা'র পূর্ণ আত্ম-জ্ঞানের স্বর্গোচ্চানে প্রবেশ করবার অধিকার হারিয়ে ফেলেছে। প্রত্যেক মানুষেরই ব্যক্তিগত দায়িত্ব হ'চ্ছে তা'র আদি পিতামাতা অর্থাৎ দ্বিমূর্তি প্রকৃতিকে আবিষ্কার ক'রে আবার সেই পরিপূর্ণ ঐক্য অর্থাৎ স্বর্গে প্রতি-লাভ করা।”

শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজির ব্যাখ্যা শেষ হ'লে আগার নবলরুজ্ঞানে বাইবেল বর্ণিত সৃষ্টিপ্রকরণের প্রতি আবার নতুন শ্রদ্ধার উদয় হল।

বল্লুগ, “গুরুদেব, আজ আমি এই প্রথম আমাদের আদি পিতামাতা আদম ও ইভের প্রতি আমার কর্তব্যের আহ্বান অনুভব করছি।”

১৭শ পরিচ্ছেদ

শশী ও তিনটি নীলা

ডাক্তার নারায়ণ চন্দ্র রায় একদিন আমায় বললেন, “ওহে, শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজি সম্বন্ধে তোমার আর আমার ছেলেরও খুব উচ্চ ধারণা শুনতে পাই— তা’ চল, একদিন না হয় দর্শনলাভ ক’রেই আসা যাক, কি বল?” ডাক্তার-বাবুর কণ্ঠস্বরে বোঝা গেল যে, তিনি যেন দুটো আধপাগলার খেয়াল পরিতৃপ্তির জন্য একটু তোয়াজ ক’রেই কথাগুলো বললেন। অতি কষ্টে ক্রোধ সংবরণ করলুম।

ডাক্তারবাবু ছিলেন পশুচিকিৎসক, আর একজন দারুণ নাস্তিক। তাঁ’র ছোট ছেলে সন্তোষ তাঁ’র বাপের বিষয়ে আমার একটু নজর রাখতে বলত। কিন্তু এ পর্য্যন্ত আমার অমূল্য সাহায্যের চেষ্টা বাইরে কিছু বিশেষ প্রকাশ পায় নি।

যাক, তাঁ’রপরদিন ত’ ডাক্তার রায় আমার সঙ্গে শ্রীরামপুরের আশ্রমে গেলেন। গুরুদেবের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ হ’ল। রইলেন অল্পক্ষণই, কিন্তু যতটুকু সময় সেখানে রইলেন, তাঁ’র অধিকাংশ সময় চুপচাপ করেই কেটে গেল। তাঁ’রপর হঠাৎ উঠে প্রস্থান করলেন।

ডাক্তারবাবু চলে যাবার পর দরজা বন্ধ হ’তেই তিনি আমার দিকে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে চেয়ে বললেন, “আশ্রমে তুমি মরা মানুষ আন কেন বল ত’?”

“বলেন কি ম’শায়! ডাক্তারবাবুর মত অমন জলজ্যান্ত আর কেউ আছে না কি?”

“কিন্তু শীগ্গীরই বেচারী মারা যাবে যে, তা’ জান?” শুনে ত’ হাত পা হিম হয়ে এল, বললুম, “গুরুদেব, ছেলেটা ত’ তা’ হ’লে দারুণ আঘাত পাবে। অহা বেচারী! সন্তোষ এখনও আশা ক’রে যে, তাঁ’র বাপের নাস্তিকত্ব বুঝাবার সময় আছে। আপনার পায়ে পড়ি গুরুদেব, বেচারাকে বাঁচান!”

“আচ্ছা বেশ, তোমার জন্তেই কেবল আমি চেষ্টা করে দেখব।” গুরুদেবের মুখ ভাবলেশহীন। বললেন, “দেখ, তোমার ঘোড়ারডাক্তারটি বহু রোগে ভুগে ভুগে ভিতরে ভিতরে অনেক দূর এগিয়ে পড়েছে, তা’ ও বেচারি জানে না। এই দেখ না, দিন পনেরোর ভিতরই বিছানায় পড়ল ব’লে। ডাক্তারেরা একদিনেই হাল ছেড়ে দিয়ে বসবেন দেখো। তাঁ’র স্বাভাবিক আয়ু আজ হ’তে আর বড়জোর মাসদেড়েক। কিন্তু তোমার আগ্রহে যাঁ হোক, ঐদিনেই সে ভাল হয়ে উঠবে। আর দেখ, একটা কথা আছে, তোমায় ডাক্তারবাবুকে একটি তাগা ধারণ করাতে হ’বে—তবেই সে সুস্থ থাকবে; কিন্তু দেখো অপারেশন করার সময় ঘোড়ার লাথিছোঁড়ার মতন সে তা’তে দারুণ আপত্তিই করবে, তোমার কথা কিছুতেই মানবে না।” ব’লেই উচ্চহাস্ত শুরু করে দিলেন।

কিছুক্ষণ চুপচাপ করেই কেটে গেল। ভাবতে লাগলুম কি ক’রে সম্ভব আর আমি এই বিদ্রোহী নাস্তিকটিকে বুঝিয়েসুঝিয়ে কাষ হাসিল করতে পারি, তখন শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজি আবার বলতে শুরু করলেন, “দেখ, তোমার ডাক্তারবাবু আরাম হ’য়ে গেলেই বোলো যেন কিছুতেই আর মাংসটাংস না খান, তা’ হলেই বিপদ ঘটবে জেনো! সে অবিশিষ্ট একথা কানেই তুলবে না দেখো, আর এখন যেমন সে ভাবছে যে তা’র স্বাস্থ্য খুব ভালই আছে, তা’হ’লেও দেখো মাসদুয়ের ভিতরই সে ঠিক মারা পড়বে। আর এই যে ছ’মাস আয়ু বাড়ল, তা’ কেবল তোমার অনুরোধউপরোধেরই জন্তে।”

তা’রপরদিন সম্ভাবকে ব’লে এক সাঁকরাকে দিয়ে একটা তাগা তৈরী করার ব্যবস্থা হ’ল। হুপ্তাখানেকের ভিতরই তা’ তৈরী হয়ে গেল বটে, কিন্তু ডাক্তার রায় সেটা পরতে রাজি হলেন না। বললেন “না, না, আমার স্বাস্থ্য এখন খুবই ভাল। তোমার ও জ্যোতিবীটোতিবীদের বুজরুকি সব এখানে আর চলবে না, বুঝলে হে!” ব’লেই আমার প্রতি একটি ক্রুদ্ধ দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন।

সকৌতুকে স্মরণ করলুম, গুরুদেব ঘোড়ার সঙ্গে ডাক্তারবাবুর কি রকম অবিকল তুলনা করেছিলেন। যা’ক আরও দিনসাতেক তা’ কাটল:

তা'রপর ডাক্তারবাবু হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়লেন। কি আর করেন, নিতান্ত নিরীহভাবে তিনি আমাদের কাছে আত্মসমর্পণ করলেন তাগা ধারণ করতে। আরও হপ্তা দুই কাটল, ডাক্তার এবার একেবারে জবাব দিয়ে গেল, বাঁচবার আর কোন আশা নাই! তিনি আমাদের বললেন “ডায়াবিটিসে নারাণ বাবুর শরীরে এত ক্ষতি করেছে যে, এ যাত্রা তাঁ'র আর রক্ষে নেই।” ব'লে বহুমূত্ররোগের দারুণ উপসর্গসকল আমার কাছে সবিস্তারে বর্ণনা করলেন। আমি মাথা নেড়ে বললুম, “উহু, আমার গুরুদেব বলেছেন যে, মাসখানেক ভোগবার পর ডাক্তার রায় ঠিক ভাল হয়ে উঠবেন, দেখবেন।”

ডাক্তারবাবু ত' নিতান্ত অবিশ্বাসের সঙ্গে আমার দিকে ফ্যাল ফ্যাল ক'রে চেয়ে রইলেন।

হপ্তা দুই বাদে একদিন সেই ডাক্তারবাবু আমার সঙ্গে দেখা ক'রে যেন ক্রমপ্রার্থনামূচক ভাবেই বললেন, “কি আশ্চর্য্য, নারাণবাবু একেবারে সম্পূর্ণ নির্দোষভাবে আরাম হ'য়ে গেছেন। আমার অভিজ্ঞতায় ত' এমন অদ্ভুত রোগমুক্তি একটা অলৌকিক ব্যাপার। যমের মুখ থেকে এ রকম আশ্চর্য্য ভাবে ফিরে আসা আমি জীবনে কখনও দেখিনি। তোমার গুরুদেবের রোগ নিরাময়ের অদ্ভুত দৈবশক্তি আছে দেখছি।”

এরপর নারাণবাবুর সঙ্গে একটিবার মাত্র সাক্ষাৎ হয়েছিল এবং তখনই শ্রীকৃষ্ণের গিরিজির সাবধানবাণী তাঁ'কে শুনিয়া সতর্ক ক'রে দিয়ে এসেছিলুম যে, জীবনে তিনি যেন আর কখনও মাংস ব্যবহার না করেন। তা'রপর আর মাসছয়েকের মধ্যে তাঁ'র সঙ্গে আমার আর কোন দেখাসাক্ষাৎ হয় নি।

তা'রপর একদিন সন্ধ্যায় আমি গড়পার রোডের আমাদের বাড়ীর বারান্দায় বসে আছি। ডাক্তার নারাণ রায় আমায় দেখে দাঁড়িয়ে পড়লেন, কথায় কথায় তিনি বললেন, “দেখ, তোমার গুরুদেবকে বোলো যে, প্রায়ই মাংস ব্যবহার ক'রে আমি পূর্ণ স্বাস্থ্য ফিরে পেয়েছি। মাংস ছাড়ার পরামর্শ দিয়ে তিনি আমায় টলাতে পারেন নি।” সত্যই তখন ডাক্তার রায়কে পূর্ণস্বাস্থ্যের একটি জীবন্ত প্রতিচ্ছবি বলেই দেখাচ্ছিল!

কিন্তু তা'র পরদিনই সন্তোষ আমার কাছে ছুটে এল। পাশেই তা'দের

বাড়ী। বল্লে, “এই সকালবেলা বাবা মারা গেলেন।” গুরুদেবের না অলৌকিক ঘটনাবলী আমি যা’ সব দেখেছি, তা’র মধ্যে এটাও সবচেয়ে আশ্চর্য ব্যাপার! সেই বিদ্রোহী ঘোড়ারডাক্তারটিকে গুরুদেব তাঁ’র দারুণ অবিশ্বাস সত্ত্বেও আরাম ক’রে তুললেন, আর ছ’মাস তাঁ’র আয়ুধ বাড়িয়ে দিলেন, কেবলমাত্র আমার কাকুতিমিনতির জন্ত। ভক্তের ব্যাক্ত প্রার্থনা পূরণ করতে শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজির দয়া ছিল অসীম!

আমার কলেজের বন্ধুদের গুরুজিকে দর্শন করান আমার একটা সর্দ-পেক্ষা গর্কের বস্তু ছিল। অন্ততঃ আশ্রমে পৌছেও তা’দের অনেকেই সনেহবাদীর পাণ্ডিত্যভিমানের মুখোস খসে পড়ত।

আমার একটি বন্ধু শশী প্রায়ই হস্তার শেষে শ্রীরামপুরের আশ্রমে এ-থেকে যেত। গুরুদেব ছেলেটিকে খুব ভালবেসে ফেললেন, কিন্তু দুঃ-করতেন যে, ছেলেটির নিভৃতজীবন একটু উচ্ছৃঙ্খল আর অসংযত।

একদিন গুরুদেব একটু সম্মেহবিরক্তির সম্মেই বললেন, “দেখ শশী তুমি যদি এখন থেকে না শোধরাও, তা’হলে ঠিক এক বছর বাদেই তুমি সাংঘাতিকভাবে অসুখে পড়বে, তা’ জেনে রেখো! মুকুন্দ সান্দী রইল। পরে যেন আমার আর দোষ দিয়ো না যে, সময় থাকতে আমি তোমার সাবধান করে দিই নি।”

শশী হেসে বল্লে, “গুরুদেব, আমার পোড়াকপালে ভগবানের দ-জোটাতে যা’ কিছু করবার ভার তা’ আপনার ওপরেই দিলুম, যা’ ক’রবার ক’রবেন, আমি আর কি বলব, বলুন? আমার আত্মা ইচ্ছুক বটে, কিন্তু মন যে বড় দুর্বল। পৃথিবীতে যদি কেউ আমার বাঁচাতে পারে তা’ আপনি, এ ছাড়া আমি আর কিছু বিশ্বাস করিনে।”

“অন্ততঃ দু’ রতির একটা নীলা ধারণ কোরো, এতেও অনেকটা কা-হ’তে পারে।”

“ও সব আমি যোগাড়যন্ত্র করতে পারব না। যাই হোক, গুরুদেব বিপদ যদি একান্তই আসে, তা’ হ’লে আপনিই আমার রক্ষা করবেন। বিশ্বাস আমার পুরোমাত্রায় আছে।”

শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজি একটু রহস্যজনকভাবে উত্তর দিলেন, “দেখ, আমি

দেখতে পাচ্ছি যে এই বছরখানেকের মধ্যেই তোমায় এখানে তিন তিনটি নীলা আনতে হ'বে। কিন্তু তখন আর তা'দের কোন দরকারই থাকবে না, তা' জেনে রেখো।”

এই প্রসঙ্গে নানাবিধ আলোচনা নিয়মিত ভাবেই চলত। কখনও বা শশী কৃত্রিম হতাশ্বাসের সঙ্গে বলত, “আমি আর বদলাতে পারলুম না দেখছি। যাক্ গুরুদেব, আমি ব'লে রাখছি ও সব রত্নটন্ত্র চেয়ে আপনার ওপর আমার যে বিশ্বাস, তা'র দাম ঢের ঢের বেশী।”

বছরখানেক বাদে শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজির এক শিষ্য নরেনবাবুর কলকাতার বাড়ীতে গুরুদর্শন করতে গিয়েছি। তেতলার বৈঠকখানায় শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজি আর আমি চুপচাপ বসে আছি, বেলা তখন দশটা। সামনের দরজা খোলার শব্দ শোনা গেল। গুরুদেব বেশ শক্ত আর সোজা হ'য়ে বসলেন। তা'রপর অত্যন্ত গম্ভীরভাবে বললেন, “বছর এখন শেষ হয়েছে, ওর দুটো কুসকুসই একেবারে গেছে। আমার কথা ত' শুনলে না। ওকে বলে দাও যে, আমি ওর সঙ্গে আর দেখা করতে চাই না।”

শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজির রূঢ়তায় অবাক হ'য়ে গিয়ে সিঁড়ি দিয়ে দৌড়ে नीচে নামতে গিয়ে দেখি যে, শশী তখন উপরে উঠছে।

“ওহে মুকুন্দ, গুরুদেব এখানে আছেন বুঝি, আমার মনে হচ্ছে তিনি নিশ্চয়ই এখানে হ'বেন।”

“হ্যাঁ, কিন্তু কেউ তাঁকে বিরক্ত করে, তা' তিনি ইচ্ছে করেন না।” শুনে ত' শশী একেবারে কঁদেই ফেললে, তা'রপর দৌড়ে উপরে উঠে গেল। গুরুদেবের চরণতলে প্রণাম ক'রে সেখানে তিনটি অতি সুন্দর নীলা রেখে বললে, “সর্বদর্শী গুরুদেব, ডাক্তারেরা ত' বলছেন যে, আমার রাজবন্দী দাড়িয়েছে, আর বড়জোর মাস তিনেক। গুরুদেব আপনার চরণতলে আশ্রয় নিলুম। আমি নিশ্চয় জানি যে, একমাত্র আপনিই আমার বাঁচিয়ে তুলতে পারবেন।”

“এই আজ এখন তোমার মরাবাঁচার ভাবনা এসে জুটোছে বুঝি, না? এখন বেজায় দেৱী হয়ে গেছে শশী। যাক্, ভেবে আর কি করবে বল, তা' ও তোমার রত্নটন্ত্র সব এখান থেকে নিয়ে যাও, ওদের দ্বারা আর কিছু ফল

পাওয়া যাবে না, ওদের কাষ সব ফুরিয়েছে।” শশীর উচ্ছ্বাসিত ক্রন্দন জড়িত দয়াভিক্ষার মাঝে গুরুদেব নিষ্করণ নীরবতার ভিতর পাথরের মৃতি মতই অনড় হ’য়ে বসে রইলেন।

হঠাৎ আমার মনে কেমন একটা দৃঢ় বিশ্বাস এল যে, শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজি দৈবশক্তিতে রোগ আরামের বিষয়ে শশীর বিশ্বাসের গভীরতা পরীক্ষা করছেন। কিছু আর বল্লুম না। চুপচাপ ক’রে বসেই রইলুম। দল উৎকণ্ঠায় ঘণ্টাখানেক কাটবার পর গুরুদেব ভূমিষ্ঠ শশীর উপর সম্মুখি বুলিয়ে নিয়ে বল্লেন, “ওঠ, ওঠ, শশী, পরের বাড়ীতে এসে তুমি কি না হাপানো শুরু ক’রেছ, বল দেখি? তোমার ও সব নীলাটীলা স্যাকরাসে সব ফেরৎ দিয়ে দাও; এখন আর ওতে বাজে খরচ করে কোন লাভ নেই। কিন্তু তুমি একটা তাগা তৈরী করিয়ে সেইটাই এখন ধারণ ক’র, বুঝলে? তোমার কোন ভয় নেই; হু’ এক হপ্তার মধ্যেই তুমি আরাম হ’য়ে যাবে।”

হঠাৎ কালো মেঘ সরে গেলে, উজ্জ্বল সূর্য্যকিরণে যেমন বৃষ্টিতে ভেজা চারিদিকের প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলী সব আলোয় বল্লমল ক’রে ওঠে, তেমন শশীর অশ্রুকলঙ্কিত মুখে একটি পরম নির্ভরতার গভীর আনন্দসূচক হাসি দেখা দিলে। তা’রপর জিজ্ঞাসা করলে, “গুরুদেব, ডাক্তারের ওর খাব কি?”

শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজির দৃষ্টি বিরক্তিসূচক, বল্লেন, “তোমার যা’ ইচ্ছে করে যাও; খাও, ফেলে দাও, তা’তে কিছু এসে যায় না। চন্দ্রসূর্য্য তা’দের জায় বদলাতে পারে, কিন্তু বন্দ্যায় আর তোমার কিছুতেই মৃত্যু হ’বে না। নিশ্চয় জেনে রেখো।” তা’রপর হঠাৎ বল্লেন, “পালাও, পালাও, এখনই পালাও, নইলে আবার আমার মন বদলে যেতে পারে!”

টিপ্ ক’রে একটা প্রণাম করেই শশী তাড়াতাড়ি পালাল। তা’র ক’হপ্তা ধ’রে আমি শশীকে দেখতে গিয়েছিলুম, কিন্তু দেখলুম যে, তা’র অবস্থা ক্রমশঃই গুরুতর হ’য়ে আসছে।

শশীর আজ আর রাত কাটবে না—একথা ডাক্তারের কাছে শুনে তা’র সেই একেবারে কঙ্কালসার দেহ দেখে আর থাকতে পারলুম না। পড়ি ক’রে দৌড়লুম শ্রীরামপুরে। কান্দতে কান্দতে সব খবর

গুরুদেবকে। নিতান্ত নিস্পৃহভাবেই তিনি সব শুনে গেলেন। তা'রপর তিনি বললেন, “তুমি আমার এখানে বিরক্ত করতে এসেছ কেন বল ত? শশী আরাম হয়ে উঠবে, আমি ত' কথা দিয়েছি; তবে আবার ফের এখানে আসা কেন, এঁ্যাঃ?”

সত্যে প্রণাম ক'রে তাড়াতাড়ি আমি দরজার দিকে এগোলুম। যা'বার সময় শ্রীবৃক্ষেশ্বর গিরিজি একটা কথাও বললেন না; অকোন্মীলিতমননে অশ্লীল দৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন, দৃষ্টি তাঁ'র ওপারের দিকে প্রসারিত!

কলকাতায় শশীর বাড়ীতে ফিরলুম তখনই। ঢুকে দেখলুম যে, শশী বিছানার ওপর বসে—ছুখ খাচ্ছে! আমাকে দেখেই ব'লে উঠল, “আরে শোন শোন মুকুন্দ! কি আশ্চর্য্য ব্যাপার বল দিখি। এই ঘণ্টাচারেক হ'ল দেখি যে গুরুজি আমাদের এই ঘরে সশরীরে এসে আকিভূত হ'য়েছেন। তাঁ'কে দেখেই আমার যা কিছু যন্ত্রণাকষ্ট সব যেন এক নিমেষে দূর হ'য়ে গেল। এখন আমি বেশ বুঝতে পাচ্ছি যে, তাঁ'র অসীম দয়াতেই আমি আজ সম্পূর্ণ সুস্থ হ'য়ে উঠেছি।”

কয়েক হপ্তার ভিতরেই শশী বেশ সুস্থ আর মোটাসোটা হ'য়ে উঠল।* আর তা'র স্বাস্থ্যও আগেকার চেয়ে খুব ভাল হ'য়ে গেল। কিন্তু তা'র আরোগ্যলাভের পর একটি মাত্র প্রতিক্রিয়া দেখা গেল, যা'তে একটু অরুতজ্ঞতার হোঁয়াচ ছিল! সেটা হ'চ্ছে তা'রপর সে আর বড় একটা শ্রীবৃক্ষেশ্বর গিরিজির কাছে যেত না। শশী একদিন আমার বললে যে, তা'র পূর্ব-জীবনের ধারার জ্ঞান সে এতদূর দুঃখিত যে, গুরুজির সামনে মুখ তুলে দাঁড়াতে তা'র বড়ই লজ্জা ক'রে!

আমি শুধু ভাবলুম যে, দারুণ রোগভোগের পর শশীর মন বড় শক্ত হ'য়ে গেছে আর তা'র চালচলনেরও পরিবর্তন ঘটেছে।

স্কটিশ চার্চ কলেজে প্রথম দু' বছর কেটে এল। ক্লাসে হাজিরা মাঝে মাঝে হঠাৎ হ'ত, কিন্তু তা'র কিছু ঠিক ছিল না। যেটুকু পড়াশোনা করতুম, তা' বাড়ীর লোকেদের ঠাণ্ডা রাখবার জ্ঞানই। আমার দু'জন গৃহ-শিক্ষক বাড়ীতে নিয়মিতভাবে হাজিরা দিতেন; আর আমিও নিয়মিতভাবে

* ১৯৩৬ সালেও জনৈক বন্ধুর কাছ হ'তে সংবাদ পাই যে, শশীর স্বাস্থ্য তখনও বেশ চমৎকার।

অন্তর্ধান করতুম ! যাই হোক পাঠ্যাবস্থায় দেখি যে, এই একটিনাত্র বিষয়ে আমার ঠিক নিয়মানুবর্তিতা ছিল।

দু'বছর কলেজে পড়ে পাশ ক'রবার পর আই, এ, তা'রপর আরও দু'বছর কলেজে পড়া শেষ ক'রে তবে বি, এ, ডিগ্রি। আই, এ, পরীক্ষার দিন ঘনিষে আসতে লাগল। পুরীতে পালানুম, গুরুদেব সেখানে করেব হস্তা কাটাবার জন্তে গিয়েছিলেন। আশা অবশ্যই রুখা, তবুও মনে মনে ভাবলুম যে, পরীক্ষা না দেওয়া হয়ত' তিনি অনুমোদন করবেন, তাই পরীক্ষার জন্তে তৈরী হ'তে পারিনি ব'লে আমার যে দু'বছর দাঁড়িয়েছে তা সবিস্তারে তাঁ'কে নিবেদন করলুম।

গুরুদেব কিন্তু হেসে সাঙ্ঘনা দিয়ে বল্লেন, "তুমি ত' অন্তরের সত্য আধ্যাত্মিক কর্তব্যসকল পালন ক'রেছ, তা'তে ক'রে অবিশ্রি তোমার কলেজের পড়া শুনা অবহেলা না ক'রে পারা যায় নি। সামনে হস্তা থেকে ধর্ম মন দিয়ে পড়াশুনা আরম্ভ ক'রে দাও, তাইতেই তুমি পরীক্ষায় ঠিক পাস ক'রে যাবে, দেখো।"

কলকাতায় ফিরলুম। মনের মধ্যে অবশ্য দু'একটা অস্বাভাবিক সন্দেহ উঁকি দিয়ে ভয় আনে নি তা' নয়, কিন্তু তা'দের মনের মধ্যেই চোপ ফেললুম। টেবিলের উপর বইয়ের পাহাড় দেখে মনে হ'ল, যেন এক দুর্গম গহন বনের মধ্যে পথ হারিয়ে ফেলেছি, কি ক'রে পার হ'ব তা' ভেবে পেলুম না। বহুক্ষণ ভাববার পর একটা খাটুনি বাঁচাবার মতন মতলব মাথায় এল। প্রত্যেক বইটা একবার খুলে ফেলে যে জায়গাটা বেরিয়ে পড়বে কেবল সেই জায়গাটুকুই তৈরী ক'রে যাব, তা'তে যা' হয় হবে। এমনি ক'রে হস্তাখানেক ধ'রে দিনে আঠারঘণ্টা খেটে ভাবলুম যে, এইবার বোধ হয় ছেলেদের বলতে পারি যে, কি ক'রে খাটুনি বাঁচিয়ে অল্প পরিশ্রমে গুরু মুখস্ত করেই পাস করা যায়।

তা'রপর কয়েকদিন পরীক্ষা দেবার পর মনে হ'ল যে, আমার ঐ রকম প্রণালীই যেন অনেকটা ঠিক। সব পরীক্ষাপ্রলোভেই পাস হ'লুম বটে কিন্তু একেবারে কান ঘেঁসে। বন্ধুবান্ধব আর বাড়ীর লোকেরা অবশ্য দুর্গম আনন্দ প্রকাশ করলেন, কিন্তু আশ্চর্য্যও তাঁ'রা কিছু কম হ'ন নি।

পুরী থেকে ফিরে এসে শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজি আমায় যা' বললেন, তা'তে ক'রে আনন্দে বিশ্বাসে অবাক হয়ে রইলুম। তিনি বললেন, “তোমার কলকাতার পড়া এখন শেষ হ'ল। এবার তুমি শ্রীরামপুরে এখান থেকেই বাকী দু'বছর কলেজে পড়বে।”

কিন্তু তবুও আমার মাথা গুলিয়ে গেল, কারণ শ্রীরামপুর কলেজে এক আই, এ, পড়া ছাড়া বি, এ, পড়ার কোন ব্যবস্থা ছিল না। তবুও জিজ্ঞাসা করলুম, “ম'শায়, কলেজে ত' বি, এ, পড়ার কোন ব্যবস্থা নেই, কি ক'রে এখান থেকে পড়ব?”

গুরুজি একটু ছুঁটহাসি হেসে বললেন, “আমার এ বুড়বয়সে লোকেদের কাছ থেকে টাকা আদায় ক'রে তোমার জন্তে বি, এ, পড়ার কলেজ ত' আর তৈরী ক'রে দিতে পারি নে। মনে হয়, কাউকে দিয়ে তোমার জন্তে ব্যবস্থাটা ক'রে ফেলতে পারব।”

মাসদুই পরে, শ্রীরামপুর কলেজের প্রিন্সিপ্যাল অধ্যাপক হাওয়েলস্ সাহেব প্রকাশ্যে ঘোষণা করলেন যে, শ্রীরামপুর কলেজে বি, এ, পড়বার ক্লাস খোলবার জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণ অর্থ সংগ্রহ করতে পেরেছেন। ইউনিভার্সিটি থেকে শ্রীরামপুর কলেজ বি, এ, ক্লাস খোলবার অনুমতি পেলে। সে ক্লাসে পড়বার প্রথম ছাত্রদের মধ্যে ছিলুম আমি একজন।

উচ্ছ্বসিত রুতজ্জতাভরে বললুম, “গুরুজি, আমার ওপর আপনার কি অসীম দয়া! কতদিন থেকে ভাবছি যে, কলকাতা ছেড়ে কবে আপনার কাছে দিনরাত ধ'রে থাকতে পারব! আর প্রফেসর হাওয়েলস্ হয়ত' স্বপ্নেও জানেন না যে, আপনার নীরবদানের কাছে কতটা তিনি ঋণী!”

শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজি কৃত্রিমগাঙ্গীর্যের সঙ্গে আমার প্রতি দৃষ্টিনির্দেশ ক'রে বললেন, “যাক, এখন তোমায় টেনে যাতায়াতে আর এতটা ক'রে সমস্যা নষ্ট করতে হ'বে না, তা'তে তুমি মনোযোগ দিয়ে ভাল ক'রে লেখাপড়া করতে পারবে, আর শেষ মুহূর্তে বইয়ের গোটাকতক পাতা উন্টে মুখস্থ ক'রে পাস করার চেয়ে ভাল ছাত্রই হ'তে পারবে, কি বল?” কিন্তু যাই হোক, স্বরে তাঁ'র কিঞ্চিৎ সন্দেহের আভাস ছিল!

১৮শ পরিচ্ছেদ

মুসলমান বাত্বকর

শ্রী রামপুর কলেজে প্রবেশ ক'রেই আমি কাছাকাছি একটা বোর্ডিং হাউসে একটা ঘর নিয়েছিলুম। গঙ্গার ধারে পুরান ধরণের পাকাবাড়ী, নাম ছিল "পাস্তি"। আমার নূতন আবাসে যে দিন শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজি বেড়াতে এলেন, সেদিন তিনি আমার ঘরে প্রবেশ ক'রেই বল্লেন, "দেখ, অনেক বছর আগে ঠিক এই ঘরেরই ভেতর আমার সামনে একটি মুসলমান বাত্বকর চারটি ভোজবাজির মত অদ্ভুত ব্যাপার দেখিয়েছিল।" শুনে ঘরের চারদিকে তাকিয়ে বল্লুম, "কি আশ্চর্য্য! এ ঘরেরও কোন অদ্ভুত ইতিহাস আছে না কি?"

গুরুজি হেসে বল্লেন, "আছে বই কি! সে অনেক কথা। মুসলমানটি ছিলেন একজন ফকির, নাম আফজল খাঁ। একটি হিন্দু যোগীর হঠাৎ সাক্ষাৎ পেয়ে গিয়ে সে তাঁর কাছ থেকে ঐ রকম অদ্ভুত ক্ষমতা লাভ করে।

"আফজলের বাড়ী ছিল পূর্ববঙ্গের এক গ্রামে। ছেলেবেলায় সে একদিন দেখে যে, ধুলায় ধূসরিত এক সন্ন্যাসী তা'দের গাঁয়ে এসে উপস্থিত। কৌতুহলের বশবর্তী হ'য়ে কাছে গিয়ে দাঁড়াতেই সন্ন্যাসীটি বল্লেন, 'বাবা বড়ই তেষ্ঠা পেয়েছে, একটু জল এনে দিতে পার?'

"আফজল বল্লে, 'সাধুজি, আমি মুসলমান, আপনি হিন্দু হ'য়ে আমার হাত থেকে জল খাবেন কি ক'রে?"

"সন্ন্যাসী বল্লেন, 'বাছা তোমার সত্যি কথায় ভারি খুসী হ'লুম। আমি ও সব অশাস্ত্রীয় জাতিভেদের ছোঁয়াছুঁ'য়ের নিয়ম মানি না। যাও চট্ ক'রে আমার জল এনে দাও।'

"আফজলের ভক্তিপূর্ণ ব্যবহারে যোগীটি তা'র প্রতি সন্মত দৃষ্টিপাত

ক'রে গম্ভীরভাবে বললেন, 'তোমার পূর্বজীবনের কর্মফল খুবই ভাল।' আমি তোমায় গুটিকতক যোগের কৌশল শিখিয়ে দিয়ে যাচ্ছি। এতে ক'রে তোমার অসাধ্যসাধন করবার ক্ষমতা জন্মাবে, তা' কেবল উপযুক্ত ক্ষেত্রেই ব্যবহার করবে, কিন্তু খবরদার! তোমার স্বার্থসিদ্ধির জন্তে তা' কখনো ব্যবহার কো'রো না যেন। কিন্তু হায়! দেখতে পাচ্ছি যে, পূর্ব-জন্মের কতকগুলো সর্বনাশা কুকর্মের বীজও তুমি সঙ্গে সঙ্গে বহন ক'রে এনেছ। দেখো যেন, আবার নতুন কুকর্ম ক'রে আর সেগুলো ফুটিয়ে তুলো না। তোমার পূর্বজীবনের কর্মফল এত জটিল যে, এ জন্মে তোমায় যোগাভ্যাসের সঙ্গে সঙ্গে সংসারের মঙ্গল সাধন করেই তা' কাটাতে হ'বে।'

"তারপর সেই হতভম্ব ছেলেটিকে কতকগুলি জটিল প্রক্রিয়া শিখিয়ে দিয়ে যোগীটি অদৃশ্য হ'লেন।

"আফজল বিশবৎসর ধ'রে সেই যৌগিক প্রক্রিয়াগুলি অভ্যাস করেছিল। তা'র অদ্বুত কাণ্ডকারখানা বহু দেশদেশান্তরের লোকদের আকৃষ্ট ক'রতে শুরু করলে। মনে হয় এক অদৃশ্য আত্মা, যা'কে সে হজরত বলে ডাকত, সে সর্বদাই তা'র সঙ্গে সঙ্গে ফিরত। ফকিরের ক্ষুদ্রতম ইচ্ছাও সে তৎক্ষণাৎ পূরণ ক'রে দিত।

"তা'র গুরুর সাবধানবাণী অগ্রাহ্য ক'রে আফজল ক্রমশঃ তা'র ক্ষমতার অপব্যবহার করতে শুরু করলে। যে কোন জিনিষ সে কেবল একবার মাত্র ছুঁয়েই আবার রেখে দিলে, সঙ্গে সঙ্গে সেটা একেবারে বেমালাম অদৃশ্য হয়ে যেত। এই রকম হাতসাফাইএর ব্যাপার দেখে, লোকে কেউ বড় একটা তা'কে আর আমল দিতে চাইত না।

"মাঝে মাঝে সে কলকাতার কোন জুয়েলারীর দোকানে গিয়ে ঢুকত। দোকানদার ভাবত, বুঝি বড়দের কোন খদ্দের এল। এটা ওটা দেখাত। আফজল তা'দের নেড়ে চেড়ে রেখে দিয়ে দোকান থেকে বেরুবার পরই সে সব একেবারে অদৃশ্য হয়ে যেত!

"শত শত ছাত্র তা'কে প্রায়ই ঘিরে থাকত, তা'র কেরামতি শিখে নেবার আশায় আকৃষ্ট হ'য়ে। সঙ্গে বেড়াতে যা'বার জন্ত আফজল মাঝে মাঝে তা'দের ডাকত। ষ্টেশনে গিয়ে একগোছা টিকিট নিয়ে দেখেগুনে তা' আবার ফিরিয়ে দিয়ে বলত, 'নাঃ, আমাদের আজ আর যাওয়া হ'ল না,

এখন আর টিকিট কিনব না।' ব'লে টিকিটগুলো ফেরত দিয়ে দাম চেয়ে নিয়ে সটান রেলে গিয়ে চেপে বসত। তখন দেখা যেত যে, টিকিট টিকিটগুলোই আবার তা'র হাতে এসে পৌছে গেছে।*

“এইরকম লোকঠকান জবরদস্তি আর জুলুমবাজি দেখে লোকে রেবে আশ্বস্ত হয়ে উঠল। বাঙ্গালী জুয়েলাররা আর ষ্টেশনে টিকিটবেচা কেরাণী দল ত' ভয়ে কাঁটা। কখন ফাঁসিয়ে দেয় কে জানে! পুলিশও তা'র গ্রেপ্তার ক'রতে গিয়ে নিরুপায় হ'য়ে পড়ে। অপরাধের বিন্দুমাত্র চিহ্ন ধরতে পারা যেত না। আফজলের কেবল একবারমাত্র বললেই হ'ল, 'হজরত এসব হাটাও।' ব্যস, সঙ্গে সঙ্গে সব সাফ!”

শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজি উঠে পড়ে গঙ্গার ধারে বারান্দায় দিয়ে দাঁড়ালে আমিও সঙ্গে সঙ্গে গেলুম, উদ্দেশ্য—আফজলের এইসব আশ্চর্য কাণ্ডকারখানার আরও কিছু ব্যাপার সব শুনতে পা'ব।

গুরুজি শুরু করলেন, “এই 'পাস্তি'র বাড়ীটি পূর্বে আমার এক বন্ধুর ছিল আফজলের সঙ্গে আলাপ হ'তে সে একদিন তা'কে এখানে আনাতে। বন্ধু আরও জনকুড়িক পাড়াপ্রতিবাসীদেরও ডাকলে; তা'র মধ্যে আমিও ছিলাম আমার তখন যুবা বয়স আর এই দুর্দান্ত ফকিরের ভোজবাজির খেলা দেখবার জন্যে মনে তখন জলন্ত আগ্রহ।” গুরুদেব হেসে বললেন, “এখানে কি ঠিক হ'সিয়ার ছিলুম! দামী কোন কিছুর প'রে যাই নি। আফজল আমার আপাদমস্তক বেশ ভালভাবে নিরীক্ষণ ক'রে নিয়ে তা'রপর বলল 'দেখছি তোমার হাত দুটি খুব মজবুত। আচ্ছা নীচে বাগানে চলে যাও গিয়ে একটা বেশ চক্চকে পাথর নিয়ে তা'র ওপর তোমার নাম লিখে গঙ্গা জলে যতদূর পার জোরে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে এস।’

“হুকুম ত' তামিল ক'রে এলুম। যখন গঙ্গার জলের ভিতর পাথর টুপ ক'রে পড়ে ডুবে গেল, ফকির সাহেব তখন বললে, 'একটা পাত্রে গঙ্গা জল ভ'রে এই বাড়ীর সামনে এনে রাখ।' পাত্রটি জল ভ'রে এনে রাখলে ফকির সাহেব চিৎকার ক'রে ব'লে উঠল, 'হজরত এই পাত্রের ভিতর পাথরটি এনে রাখ।’

* আমার পিতা পরে আমায় বলেছিলেন যে, তাঁদের বেঙ্গল নাগপুর রেলওয়ে কোম্পানি আফজলের হাতে এমনভাবে ঠকেছিল।

“তখুনি পাথরটি তা’র ভিতর এসে গেল। হাত ঢুকিয়ে পাথরটি বা’ব ক’রে নিয়ে দেখলুম যে, আমার সেইটি বেশ পরিষ্কারই রয়েছে, ঠিক যেমনটি করেছিলুম !

“—বাবু* আমার একজন বন্ধু, সেই ঘরে উপস্থিত ছিলেন। একটি ভারী সোনার ঘড়ি আর ঘড়ির চেন পরেছিলেন। ফকিরসাহেব তা’দের হাত দিয়ে নেড়েচেড়ে দেখে খুব তারিফ করলে। সঙ্গে সঙ্গেই সে দুটি হাওয়া আর কি !

“—বাবু ত’ প্রায় কৈদেই ফেললেন। কাকুতিমিনতি ক’রে বলতে লাগলেন, ‘আফজল, ও আমার সব দামী পৈতৃকসম্পত্তি, দয়া ক’রে আমার ফিরিয়ে দাও, ও গেলে আমার সর্বনাশ হ’বে।’ ফকিরসাহেব নিতান্ত অনাসক্তভাবে কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে রইল, তা’রপর বললে, ‘দেখ, তোমার লোহার সিন্ধুকে পাঁচশ টাকা আছে সেগুলো নিয়ে এসো দেখি, তবে ব’লে দেব কোথায় তোমার ঘড়ি ঘড়িরচেন আছে।’

“উদ্ভ্রান্ত —বাবু ত’ তখুনি দে ডল বাড়ীর দিকে। শীগ্গিরই ফিরে এল; এসে নগদ করুকরে পাঁচশ’টি টাকা গুণে আফজলের হাতে তুলে দিলে।

“ফকির সাহেব তখন যেন নিতান্ত অল্পকম্পাবশতঃই —বাবুকে বললে, তোমার বাড়ীর কাছেই যে ছোট্ট পোলটা আছে সেখানে যাও আর দেখ যেতে যেতে হজরতকে ডেকে তোমার ঘড়ি ঘড়িরচেন ফেরত দিয়ে দিতে, তা’হ’লেই তুমি জিনিষ ফেরত পাবে।’

“—বাবু ত’ পড়ি কি মরি করে দৌড়লেন। ফিরলেন কিছুক্ষণ বাদে। মুখে নিশ্চিন্ত হাসি, কিন্তু সঙ্গে ঘড়িটড়ি কিছুই নেই !

“—বাবু বললেন, ‘ফকির সাহেবের কথামত যেমনি হজরতকে ডেকেছি এমনি যেন শূন্য থেকে ঘড়িটড়ি সব আমার ডান হাতের ওপর ঝুপ্ ক’রে এসে পড়ল। বাবাঃ, আর এখানে তা’ নিয়ে আসি ! সোজা বাড়ীতে গিয়ে একেবারে সিন্ধুকে তা’দের বন্ধ ক’রে রেখে তবে তোমাদের এখানে আসি।’

* শ্রীমন্তেশ্বর গিরিজির সেই বন্ধুটির নাম আমার ঠিক মনে নেই ব’লে শুধু “—বাবু” বলেই সম্বোধন করলুম।

“ঘড়ির মুক্তিপণ আদায়ের এই বিরোগমিলনাস্ত্র নাটকের সাক্ষী, — বাবু বকুরা সব অত্যন্ত ক্ষোভের সঙ্গে আফজলের দিকে তাকালে। ফকিরসাহেব তখন যেন সান্দ্রনা দেবার মতলবেই আবার আরম্ভ করলে, ‘আচ্ছা তোন কি পানীয় চাও ব’ল! হজরত এখুনি তা’ এনে দেবে!’

“জনকতক দুধ চাইলে, কেউ কেউ আবার ফলের রস খেতে চাইলে, কিন্তু আমাদের খুব শক্ত — বাবু খেতে চাইলেন হইন্সি! যদিও তাঁরা আমি খুব বেশী আশ্চর্য্য হই নি! ফকির সাহেব হুকুম করলে। অল্পস্বাদ হজরত মুখবন্ধ পানীয়ের পাত্রগুলো সব যেন শূণ্য থেকে ছুঁড়ে ছুঁড়ে দিতে লাগল আর তা’ সব ঠকাস্ ঠকাস্ ক’রে মেঝের উপর এসে পড়তে লাগল। তা’দের ফরমাসী জিনিসগুলো একে একে সবাই পেলে।

“তা’র পর চার নম্বরের ব্যাপারটি হচ্ছে আরও অদ্ভুত!

“আফজল বললে যে সে এখানে বসে বসেই সবাইকে এক বিরাট ভোজ খাওয়াতে পারে। কেউ পরীক্ষা করে দেখতে চায় কি? প্রস্তাবটি আমাদের গৃহস্বামীর কাছে অতিশয় মনোরম ও তৃপ্তিপ্রদ বলেই বোধ হ’ল।

“—বাবুর যা তখনও শুকোয় নি, মনে তখনও দারুণ জালা ছিল মুখটা হাঁড়ি ক’রে বললেন, ‘আমার পাঁচশ টাকা ত’ গেছে, তা’ দাদু তা’র বদলে আমি রাজারাজড়াদের মতন একটি বিরাট ভোজ চাই বা’কিছু পরিবেশন করা হবে, তা’ সব সোনার পাত্রে হওয়া চাই সবাই তা’তে যখন সায় দিলে ফকিরসাহেব তখন হজরতকে হুকুম করলে। সঙ্গে সঙ্গে বাসনপত্রের একটা বান্বানানির শব্দ উঠল, আর সোনার থালার উপর গরম লুচি, আর নানারকমের অতি উপাদেয় আর সুস্বাদু তরকারি, ব্যঞ্জন প্রভৃতি নানাবিধ রসনাতৃপ্তিকর সুখাদ্য বহুপ্রকারের অসময়ের ফল সব যেন শূণ্য থেকেই আবিভূত হ’য়ে আমাদের পায়ের কাছে এসে পড়তে লাগল। খাবার দাবার সব অতি চমৎকার ছিল। ঘণ্টাখানেক ধরে খাওয়া দাওয়া শেষ করে আমরা ঘর ছেড়ে বের হ’য়ে গেলাম। একটা দারুণ শব্দ—বাসনপত্রের বান্বানানির মত, মনে হ’ল কে যেন থালাবাটি সব গুছোচ্ছে, শুনে পিছন ফিরে তাকিয়ে দেখি বাকুর সোনার বাসনকোসনের, এমন কি খাওয়াদাওয়ার পর ভূঁয়ে পড়ে থাকা এঁটোকাঁটার কোন চিহ্নমাত্রও নাই!” জিজ্ঞাসা করলাম, “গুরুজি, আফজল

যদি এমনভাবে সোনার বাসনকোসন আমদানি করতে পারে, তবে তা'র আর পরের ধনে লোভ করা কেন ?”

শ্রীহৃক্তেশ্বর গিরিজি বঝিয়ে দিলেন, “দেখ, তোমার ঐ আফজল ফকিরের কিছু আধ্যাত্মিক উন্নতি খুব বেশী দূর হয় নি। তা'র কতকগুলো যোগের প্রক্রিয়ার উপর দখল থাকতে সে এমন একটা প্রেতলোকের স্তরে প্রবেশ করতে পারত, যেখান থেকে সে তা'র যে কোন ইচ্ছা কার্যে পরিণত করতে পারত, হজরত নামে জৈনক অশরীরীর সাহায্যে, ফকির সাহেব তা'র প্রবল ইচ্ছাশক্তির বলে যে কোন ঈশ্বিত বস্তুর অণুপরমাণু নিয়ে ইপার বা ব্যোমশক্তি দিয়ে সেই জিনিসটি তৈরী ক'রে নিতে পারত। কিন্তু এ রকম ভৌতিকপ্রক্রিয়ায় তৈরী জিনিস বেশীক্ষণ স্থায়ী হয় না। কাষেই আফজলকে এই পৃথিবীরই ধনরত্ন আহরণ করবার চেষ্টায় থাকতে হ'ত, যা' চট্ ক'রে না উবে যায়, যদিও তা'র জন্মে তা'র নানা কষ্ট আর হান্সামা পোহাতে হ'ত।” আমি হেসে বল্লুম, “কিন্তু তা'ও ত' কখন কখন একেবারে বিনা কারণেই উড়ে যায়, ধ'রে রাখতে পারা যায় না।”

গুরুজি বলতে লাগলেন, “আফজলের কোনরকম ঈশ্বরানুভূতি বা ভগবদজ্ঞান ছিল না। স্থায়ী আর মঙ্গলজনক কোন অলৌকিকক্রিয়া কেবল খাঁটি সাধুসন্তরাই দেখাতে পারেন, কারণ তাঁ'রা সর্বশক্তিমান জগৎ-স্রষ্টার সঙ্গে একসূত্রে বাঁধা। আফজল ছিল নেহাৎই সাধারণ ধরনের লোক, কেবল তা'র এইটুকু অদ্ভুত ক্ষমতা ছিল যে, সে এমন এক সূক্ষ্মস্তরে প্রবেশ লাভ করতে পারত, যেখানে সাধারণতঃ কোন মরজগতের লোক মৃত্যু না হ'লে প্রবেশ করতে পারে না।”

“এখন বুঝলুম সব, গুরুদেব! তা' হ'লে পরজগতেও বেশ লোভের আর আকর্ষণের জিনিস আছে দেখছি।”

গুরুদেব বললেন, “তা' আছে বই কি। কিন্তু সে দিনের পর থেকে আমি আফজলকে আর কখনও দেখিনি। বছর কতক পরে —বাবু, আমায় বাড়ীতে এসে একটা খবরের কাগজ খুলে দেখালেন যে, সেই মুসলমান যাহকরটির প্রকাশ্য স্বীকারোক্তি সেখানে বেরিয়েছে। তা'ই থেকেই আমি তোমায় এইমাত্র যা' বল্লুম সেই আফজলের ছেলেবেলার এক হিন্দুগুরুর কাছে দীক্ষা নেওয়ার কথা জানতে পারি।”

খবরের কাগজে আফজলের যে স্বীকারোক্তি বেরিয়েছিল, তা'র শেষ অংশের সারটুকু শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজির যা স্বরণে ছিল, তা' মোটামুটি হ'চ্ছে এই,—“আমি আফজল খাঁ, আমার প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ আর যা'রা অলৌকিক ক্ষমতা হস্তগত করতে চায় তা'দের সাবধান ক'রে দেবার জন্যে এই কথাগুলো লিখছি। ভগবৎরূপায় আর গুরুদত্ত ক্ষমতাবলে আমি যে অদ্ভুতশক্তি হস্তগত করেছিলুম, বছরের পর বছর ধরে তা'র অপব্যবহার ক'রে এসেছি। আত্মগরিমায় পূর্ণ হ'য়ে ভেবেছিলুম যে আমি সুনীতিহীনীতির সাধারণ নিয়ম কাছনের অনেক উপরে। আমার শেষবিচারের দিন অবশেষে ঘনিয়ে এল।

“সম্প্রতি কলকাতার বাইরে একটি বুদ্ধলোকের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়। লোকটি অতিকণ্ঠে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলছিল; হাতে ছিল একটি চক্চকে জিনিস, দেখতে সোনারই মত। মনে দারুণ লোভ হ'ল। লোকটিকে ডেকে বললুম, ‘দেখ, আমি একজন বড় দরের ফকির, না? আফজল খাঁ। তোমার হাতে ওটা কি বল দেখি?’

“এটি একটি সোনার তাল; সংসারে এইই আমার সর্বস্ব! তা'এতে আর আপনার মতন ফকির মাহুকের কি দরকার বলুন? যাই হোক মশার আপনাকে মিনতি করি, আমার খুঁড়িয়ে চলাটা এখন সারিয়ে দিন।’

“আমি সোনার তালটি ছুঁয়ে কোন কথাবার্তা না ব'লেই চলতে শুরু করে দিলুম। বৃড়মাহুটি আমার পিছন পিছন খোঁড়াতে খোঁড়াতে আসতে লাগল। সঙ্গে সঙ্গে এক চিৎকার, ‘সোনা, কৈ আমার সোনা কোথায় গেল, এঁয়া?’

“তা'র দিকে দৃকপাতমাত্র না ক'রে এগোতেই লোকটি বজ্রনির্ঘোষস্বরে বলে উঠল, ‘কি আমার চিন্তে পাচ্ছ না, নাকি?’ ঐরকম ডিগ্‌ডিগ শরীর থেকে অমন প্রচণ্ড গলার আওয়াজ বেরতে পারে তা' ধারণাই করতে পারি নি।

“ফিরে তাকিয়ে দেখেই আমার বাকশক্তি একেবারে লোপ পেলে। ভয়ে একেবারে কাঁট হয়ে গেলুম। দেখি যে সেই নেহাৎ সাধারণগোষ্ঠের বৃদ্ধ গজব্যক্তিটি আর কেউ ন'ন—সেই সাধুশ্রেষ্ঠ স্বয়ং, যিনি বহু বহুদিন পূর্বে আমায় যোগসাধনে দীক্ষিত করেছিলেন। তিনি সোজা হ'য়ে দাঁড়ালেন। সঙ্গে সঙ্গে শরীরও দেখতে দেখতে বেশ যোয়ান আর শক্ত হয়ে গেল।

“গুরুদেবের চোখে তখন আগুন ঝলসাজ্জিল, বল্লেন, ‘বটে, তোমার এই কীর্তি? আজ আমি নিজের চোখে দেখলুম যে তুমি দীনহুঃখীদের উপকারের জন্তে না ক’রে, একটা সাধারণ চোরের মত তুমি তোমার ক্ষমতার অপব্যবহার করছ! বাক, আজ থেকে আর তোমার কোনই ক্ষমতা থাকবে না, সব আমি কেড়ে নিলুম। হজরত এখন তোমার কাছ থেকে ছাড়ান পেলেন, আর ও তোমার কথায় কোন ফরমাসই খাটবে না। বাংলা দেশে কেউই আর তোমায় এখন ভয় করবে না।’

“উদ্বেগাকুল কণ্ঠে হজরতকে ডাকলুম; এই প্রথম আমি টের পেলুম যে মস্তুরে আব তা’র সাড়া পাওয়া গেল না। কিছু হঠাৎ যেন চোখের ওপর থেকে একটা কাল পর্দা সরে গেল; আমার যুগ্য অপবিত্রজীবনের ছবি আজ আমি স্পষ্টরূপে দেখতে পেলুম।

“‘গুরুজি, আপনি আমার জীবনের সুদীর্ঘ ভ্রান্তি দূর ক’রে দিতে এসেছেন ব’লে আমি আপনার কাছে চির কৃতজ্ঞ, ব’লে তাঁ’র পা জড়িয়ে ধরে কাদতে কাদতে বললুম, ‘গুরুদেব, আমি প্রতিজ্ঞা করছি যে, সংসারের সাধআহ্লাদ, বাসনাকামনা আমার যা’ কিছু সব আজ থেকে ত্যাগ করলুম। এবার আমি পাহাড়ে চলে গিয়ে নির্জনে ভগবচ্ছিত্তায় কাল কাটা’ব, মনে হয় তা’তে আমার পাপজীবনের প্রায়শ্চিত্ত হবে।’

“আমার গুরু নীরব অন্তরুকম্পায় আমার প্রতি দৃষ্টিপাত ক’রে অবশেষে বল্লেন, ‘তোমার আন্তরিকতা আছে বুঝতে পাচ্ছি। যাই হোক তোমার ছেলেবেলায় গুরুআজ্ঞাপালন আর বর্তমান অকৃত্যপ দেখে তোমায় আমি একটিমাত্র বর দিয়ে যাব। যদিও তোমার আর সব ক্ষমতা এখন চলে গেছে তবুও কিছু যখনই তোমার কেবলমাত্র অন্তরবল্লের অভাব হবে, হজরতকে ডাকলে তা’ এনে দেবার জন্তে তখনই তা’র সাড়া পাবে। যাও, এখন কোন নির্জন পাহাড়ে গিয়ে ভগবৎজ্ঞান লাভ করবার জন্তে মনপ্রাণ উৎসর্গ কর গিয়ে।’

“আমার গুরুদেব কথাবলার সঙ্গে সঙ্গেই অদৃশ্য হ’য়ে গেলেন। সম্বল রহিল কেবল শুধু চোখেরজল আর ভাবনা। আজ আমি সেই পরমদয়াল পরমপিতার ক্ষমালাভের আশায়ই এখন যাত্রা শুরু করলুম। বিদায়! এ সংসার, চিরতরে বিদায়!

১৯শ পরিচ্ছেদ

কলিকাতাস্থ গুরুদেবের শ্রীরামপুরে সশরীরে আবির্ভাব

“পাণ্ডি” ছাত্রাবাসে আমার ঘরে আর একজন সঙ্গী থাকতেন। নাম তাঁর দ্বিজেন বাবু ! দ্বিজেন বাবুকে আমার গুরুদর্শনের জন্তে আহ্বান করাতে তিনি একদিন বলে ফেললেন, “দেখুন, ভগবানের অস্তিত্বে আমি প্রায়ই সন্দেহ হয়। তবুও মাঝে মাঝে চিন্তাবিক্ষোভকারী একটা অশ্রুমান গোছের মনকে বড়ই উতলা ক’রে তোলে ; আঙ্গিক ব্যাপারের অনেক কিছু সম্ভাবনা অনাবিস্কৃত থাকতে পারে না কি ? মানুষ যদি সে সব খুঁজে বাঁ করতে না পারে, তা’হ’লে তা’র সে আসল ভাগ্যই যে হারিয়ে ফেলছে।”

আমি বললুম, “শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজি আপনাকে ক্রিয়াযোগে দীক্ষিত করবেন, তা’তেই আপনার অন্তরে দৃঢ় ধারণা বা ঈশ্বরে বিশ্বাস এনে দিতে মনের সব দ্বিধাদ্বন্দ্ব ঘুচিয়ে দেবে, দেখবেন।”

সেইদিনই সন্ধ্যাবেলা দ্বিজেনবাবু আমার সঙ্গে আশ্রমে গেলেন। গুরুদেবের সামনে এসে বন্ধুবর মনে এমন এক অপূর্ব গভীর আধ্যাত্মিক শাস্তি লাভ করলেন যে, শীগ্গিরই তিনি নিয়মিত যাতায়াত শুরু ক’রে দিলেন দৈনন্দিন জীবনের তুচ্ছ কর্মপ্রচেষ্টা মানুষের পক্ষে যথেষ্ট নয় ; জ্ঞানলাভে আকাঙ্ক্ষাও তা’ সহজাত প্রবৃত্তি। শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজির কথায় দ্বিজেনবাবু তাঁর এই নব জীবনে, যেখানে পরমতত্ত্বের কচিৎ পূর্ণ পরিচয় মেলে, সেই ক্ষুদ্র ‘আমি’র জায়গায় তাঁর বৃকের ভিতর তাঁর আলম্বনরূপকে ধরে বাঁধা করার চেষ্টায় প্রচণ্ড উৎসাহ পেলেন। প্রথম প্রথম একটু কষ্টকর হ’লেও পরে তা’ অত্যন্ত সরল আর অনায়াসসাধ্য হয়ে গিয়েছিল।

দ্বিজেনবাবু ও আমি একসঙ্গে শ্রীরামপুর কলেজে বি, এ, ক্লাসে পড়তুম। ক্লাস শেষ হ’লেই বেড়াতে বেড়াতে দুজনে আশ্রমে গিয়ে হাজির হ’তুম প্রায়ই দেখতে পেতুম যে, দোতলার বারান্দায় শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজি আমাদের আসতে দেখে হাসিমুখে দাঁড়িয়ে আছেন।

একদিন বৈকালে দেখি যে কানাই নামে এক বালব্রহ্মচারী দ্বিজেনবাবু আর আমাকে দরজায় ঢুকতে দেখেই খবর দিলে, “গুরুদেব এখানে নাই ; কি একটা জরুরি খবর পেয়ে তিনি কলকাতায় চলে গেছেন।”

তা’র পরদিনই গুরুদেবের কাছ থেকে একটি পোষ্টকার্ড পেলুম। তিনি লিখেছেন, “বুধবার সকালে কলকাতা থেকে যা’ব। তুমি আর দ্বিজেন শ্রীরামপুর স্টেশনে ন’টার ট্রেনটা দেখো।”

বুধবার সকালে প্রায় সাড়ে আটটার সময় অনবরত মনে হ’তে লাগল, যেন শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজির কাছ হ’তে টেলিপ্যাথিযোগে একটা সংবাদ আসছে—তা’ হ’চ্ছে এই, “আমি আটকে পড়ে গেছি। ন’টার গাড়ী আর দেখো না।”

টাটকা খবরটা দ্বিজেনবাবুকে যখন দিলুম, স্টেশনে যা’বার জন্তে তখন তা’র জামাকাপড় পরা একেবারে সারা।

বন্ধুবর বিক্রপের স্বরে বল্লেন, “রাখুন আপনার ও সব মনের ভিতরকার অমুভূতি ! আমি গুরুদেবের লেখা কথাই বেশী বিশ্বাস করি।”

কি আর করি, একটু নড়ে চড়ে চুপচাপ বসেই রইলুম। রাগে গজ্জ করতে করতে ত’ দ্বিজেনবাবু দড়াম্ ক’রে দরজা বন্ধ ক’রে রাস্তায় বেরিয়ে পড়লেন।

ঘরটা কিছু অন্ধকার ব’লে আমি রাস্তার ধারের জানুলাটার কাছে গিয়ে দাঁড়ালুম। ক্ষীণ সূর্যালোক হঠাৎ যেন এক অত্যাশ্চর্য জ্যোতিঃতে ঝলসে উঠল, তা’তে লোহার গরাদে দেওয়া জানলা একেবারে অদৃশ্য হ’য়ে গেল। এই আলোকের পটভূমিতে পরিষ্কার দেখতে পেলুম, শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজি রক্তমাংসের দেহ ধারণ ক’রে সেখানে আবিভূত !

এই অত্যাশ্চর্য ব্যাপারের হঠাৎ ধাক্কাতে বিভ্রান্ত হ’য়ে তাড়াতাড়ি চেয়ার ছেড়ে উঠে তাঁ’র পায়ের কাছে গিয়ে নতজান্ন হ’য়ে বসলুম। চিরাভ্যস্তভাবে তাঁ’র পাছুকাবুগল স্পর্শ ক’রে ভক্তিপূর্ণ প্রণাম করলুম। গেরুয়ারঙের দড়ির সোলদেওয়া ক্যান্ডিসের তাঁ’র সেই পাছুকাবুগল আমার চিরপরিচিত। তাঁ’র গেরুয়া বসন হাওয়ায় উড়ে আমার গাত্রস্পর্শ করছিল। পরিধেয় বসন শুধু নয়, তাঁ’র সেই ধুলোবালিমাখা জুতোজোড়া আর তা’র ভিতরে চেপেবসা তাঁ’র পায়ের আঙুলগুলোও বেশ স্পষ্টই অমুভব

করলুম। বিষয়ে অবাক হ'য়ে দাঁড়িয়ে উঠে কেবল তাঁর দিকে সপ্রাণ দৃষ্টিতে চেয়েই রইলুম।

“তুমি যে আমার মনের কথা জানতে পেরেছ, তা'তে আমি খুব দুঃখ হ'য়েছি।” গুরুদেবের স্বর শান্ত, আর সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। “আমার কলকাতার কায এবার শেষ হয়েছে। দশটার গাড়ীতে শ্রীরামপুর আসছি।”

হতবাক হ'য়ে তখনও ফ্যান্ফ্যান্স ক'রে তাকিয়ে থাকতে দেখে শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজি বলতে লাগলেন, “এ আমার 'ভূত' নয়, আমার রক্তমাংসেরই শরীর ঈশ্বরের আজ্ঞায় তোমায় এ অভিজ্ঞতা দিলুম, পৃথিবীতে যা' লাভ করা নিতান্ত দুর্লভ। ষ্টেশনে এসো, তুমি আর দ্বিজন আমায় এই বেশেই তোমাদের দিকে আসছি দেখতে পাবে! আর সেই সঙ্গে আমার আগে আগে একটি ছোট ছেলে একটা রূপোর জগ নিয়ে আসছে দেখতে পাবে।”

মাথার উপর দুটি হাত রেখে গুরুদেব অক্ষুট স্বরে আমার আশীর্বাদ করলেন। তা'রপর “তবে আসি” এই দুটি কথা ব'লে যেই শেষ করলেন, অমনি একটা অদ্ভুত ঘড়ঘড়ানি শব্দ শোনা গেল।*

সেই চোখবন্সান আলোর মধ্যেই তাঁর শরীর যেন ধীরে ধীরে গ'লে যেতে লাগল। প্রথমতঃ তাঁর পায়ের দুটি পাতা আর পা দুটি অদৃশ্য হয়ে গেল। তা'রপর তাঁর দেহের মধ্যভাগ আর মস্তক, যেন একটা ছবি গুটিয়ে যাচ্ছে! শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত আমি স্পষ্টই অনুভব করতে পারছিলুম যে, তাঁর আঙুলগুলি আলতোভাবে আমার চুল ছুঁয়ে রয়েছে। সেই অতৃষ্ণ জ্যোতিঃও সঙ্গে সঙ্গে অদৃশ্য হয়ে গেল। গরাদদেওয়া জানলার ভিতর দিয়ে আসা স্নান সূর্য্যের আলো ছাড়া আমার সামনে আর কিছুই রইল না।

বিত্রাস্ত হ'য়ে বসে রইলুম; মনে মনে ভাবতে লাগলুম, ছায়াবাক্তি দেখলুম না কি? ভগ্নমনোরথ দ্বিজনবাবু তখন ঘরের মধ্যে এসে প্রবেশ করলেন।

বন্ধুর খানিকটা অমৃতপু স্বরেই বললেন, “গুরুদেব ন'টার গাড়ীতে এলেন না, সাড়ে ন'টারচাঁতেও নয়।”

“তাই না কি? আমি কিছু ঠিক জানি যে তিনি দশটার গাড়ীতেই

* শরীরকোষের অণুপরমাণু বিলিষ্ট হওয়ার শব্দবৈশিষ্ট্য।

আসছেন। “আসুন, আসুন,” ব’লেই তাঁ’র আপত্তিতে কর্ণপাত না ক’রে তাঁ’র হাত ধ’রে টানতে টানতে ষ্টেশনের দিকে ছুটলুম। মিনিটদশেকের ভিতরেই ষ্টেশনে পৌছলুম, ট্রেন এর মধ্যেই পৌছে গিয়ে ধোঁয়া ছাড়ছে।

আনন্দ চিৎকার ক’রে ব’লে উঠলুম, “দেখুন, দেখুন, সারা ট্রেনটা গুরুদেবের ছটাতে পূর্ণ হয়ে গেছে। ঐ তিনি ওখানে।”

দ্বিজেনবাবু ঠাট্টা ক’রে হেসে বললেন, “স্বপ্ন দেখছেন না কি?”

বললুম, “আসুন, এখানে দাঁড়ান যাক।” তা’রপর কি রকম ক’রে গুরুভি আমাদের কাছে আসবেন তা’ বন্ধুবরের কাছে সবিস্তারে বর্ণনা করলুম। বলা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজিকে দেখা গেল—সেই একই জামাকাপড় পরা যা’ এই মাত্র একটু আগে দেখেছিলুম। ধীরে ধীরে তিনি আসছিলেন, সামনে একটি ছোট ছেলেও আসছিল রূপোর জগ্-হাতে ক’রে!

আমার এই অদ্ভুত আর অবিশ্বাস্য অভিজ্ঞতা শ্রবণ ক’রে মনের মধ্যে একটা ভয়ের শীতল শিহরণ বয়ে গেল। মনে হ’ল, এই বিংশ শতাব্দীর জড়বুগে আমাদের এই বর্তমান জগৎ যেন ধীরে ধীরে মিলিয়ে যাচ্ছে; আমি কি সেই প্রাচীন যুগে ফিরে গেছি, যখন বীশুখৃষ্ট সমুদ্রের উপর দিয়ে হেঁটে গিয়ে পিটারের সামনে আবির্ভূত হ’য়েছিলেন?

বর্তমান যুগের মহাযোগী শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজি ধীরে ধীরে এসে দাঁড়ালেন, যেখানে দ্বিজেনবাবু আর আমি নির্ঝাঁক হ’য়ে পাথরের মত দাঁড়িয়েছিলুম। বন্ধুর দিকে চেয়ে মূহু হেসে গুরুদেব বললেন, “তোমায়ও ত’ আমি খবর পাঠিয়েছিলুম, তুমি ধরতে পারলে না ত’ আমি কি ক’রব, ব’ল? দ্বিজেনবাবু নীরবই ছিলেন, কিন্তু সন্দিক্তভাবে আমার দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করছিলেন। গুরুদেবকে আশ্রমে পৌছে দিয়ে দ্বিজেনবাবু আর আমি শ্রীরামপুর কলেজের দিকে এগোলুম। রাস্তার মাঝে দাঁড়িয়ে পড়ে দ্বিজেনবাবু বললেন, “ওঃ, তাই! গুরুদেব আমায় খবর পাঠিয়ে ছিলেন আর তা’ আপনি চেপে রেখেছেন! এর কি কৈফিয়ৎ আপনার আছে ব’লুন?” রাগে তা’র সর্বশরীর জ্বলে যাচ্ছিল। আমি উত্তর দিলুম, “আপনার মনের আয়না যদি এতই মস্তুর হয়ে পড়ে যে তা’তে গুরুদেবের উপদেশের কোন ছাপ পড়তে পার না, তা’ হ’লে আর আমি কি করব, ব’লুন?”

দ্বিজেনবাবুর আনন হ'তে ক্রোধের ছায়া অন্তর্হিত হ'ল। তিনি অন্ততপূর্বক বললেন, “এখন আমি আপনার কথার মানে বুঝতে পাচ্ছি। আচ্ছা, রূপের জগৎ নিয়ে ঐ ছেলেটার আসার কথা কি ক'রে জানতে পারলেন, বলুন ত'?”

সেইদিন সকালে আমাদের ছাত্রাবাসে গুরুজির আনির্ভাবের অলৌকিক কাহিনী যখন শোন করলুম তখন আমরা কলেজে পৌঁছে গেছি। সব শুনে দ্বিজেনবাবু শুধু বললেন, “গুরুদেবের অলৌকিক ক্ষমতার কথা যা' এইমাত্র আপনার মুখ থেকে শুনলুম, তা'তে মনে হয় যে, পৃথিবীর যে কোন বিশ্ববিদ্যালয় এ সবার কাছে একটা শিশুপাঠশালা ছাড়া আর কিছু নয়!”

২০শ পরিচ্ছেদ

কাশ্মীর ভ্রমণে বাধা

পিতার কাছে গিয়ে একদিন বল্লুম, “বাবা, গ্রীষ্মের ছুটিতে গুরুদেব আর জনচারেক বন্ধুকে নিয়ে হিমালয়ের দিকে একটু বেড়িয়ে আসব বলে মনে করছি। কাশ্মীরের ভ্রমণে পানছয়েক পাস্ আর বেড়ানার খরচের ভ্রমণে কিছু টাকা পা’ব কি?”

যা’ মনে করেছিলুম তাই, বাবা ত’ হো হো ক’রে হেসে উঠে বল্লেন, “এইবার নিয়ে তিনবার হ’ল তোমার ও সব গাঁজাখুরি মতলব শোনাচ্ছ। গেল বছর গ্রীষ্মের ছুটির সময়, আর তা’র আগের বছরেও কি ও রকম কথা শোনাওনি? শেষ অবধি শ্রীযুক্তেশ্বরগিরিজি বেকে বসবেন আর তাঁ’র আর বাওয়াও হবে না।”

“সত্যি বাবা, গুরুদেব যে কেন কাশ্মীরে যাবার পাকা কথা দেন না, তা’ জানি না। কিন্তু যদি আমি এবার বলি যে কাশ্মীরে যাবার ভ্রমণে আপনার কাছ থেকে এর মধ্যেই পাস নিয়ে রেখেছি, তা’হলে মনে হয় যে, কোন না কোন রকমে বেড়াতে যাবার ভ্রমণে এবার তাঁ’কে রাজি করাতে পারব।”

অবশ্য সে সময় বাবার কোন কিছুই বিশ্বাস হ’ল না। তা’র পরদিন সকালে বাবা আমার হাতে খানকতক দশটাকার নোট দিয়ে একটু চিপ্‌টিনি কেটে বল্লেন, ‘দেখ, তোমার ওরকম ফাঁকা মতলবে এমন সব নিরেট জিনিসের মার প্রয়োজন কেন, তা’ও ত’ বুঝতে পাচ্ছি না। বাই হোক, এগুলো এখন তোমার কাছেই রাখ।’

সেই দিন বিকালবেলা শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজিকে আমার যোগাড়যন্ত্রের সব ব্যবস্থা দেখালুম। আমার উৎসাহ দেখে যদিও তিনি হাসলেন কিন্তু কিছু পাকা কথা দিলেন না, শুধু বল্লেন, “যেতে ত’ ইচ্ছে, দেখা যাক কি হয়।”

আশ্রমের শিষ্য কানাউয়ের আমাদের সঙ্গে বাওয়ার কথাতে কোন মন্তবাই

প্রকাশ করলেন না। আরও তিনটি বন্ধুকে যাবার জন্তে বল্লুম—রাজেন্দ্রনাথ মিত্র, যতীন আচ্য আর একটি ছেলে। তাঁর পরদিন সোমবার আমাদের যাওয়ার দিন স্থির হ'ল।

শনি রবি এ দুদিন কলকাতায়ই রইলুম। আমাদের বাড়ীতে আমার এক খুড়তুতো ভাইয়ের তখন বিয়ে লেগেছে। সোমবার সকালেই মালপত্র নিয়ে শ্রীরামপুর পৌঁছলুম। আশ্রমের দরজায় রাজেন্দ্রের সঙ্গে দেখা হ'ল বললে, “গুরুদেব বেরিয়েছেন, বেড়াতে। তিনি যাবেন না বলে দিয়েছেন।”

ক্ষোভ যেমনি হ'ল, জেদও তেমনি চাপল। বল্লুম, “কাশ্মীর যাওয়া কঁাকা কথা ব'লে বাবাকে ঠাট্টা করতে আর এবার তিন বারের ব্যস্তযোগ দিচ্চিনে। চল, বাকী আমরা সব যেমন করেই হোক এবার যা'ব।”

রাজেন্দ্র রাজি হয়ে গেল; আমি আশ্রম ছেড়ে বেরোলুম একটা চাকর খুঁজে বের করবার জন্তে। আমি জানতুম কানাই গুরুদেবকে ছেড়ে কোথাও বেরবে না। আর মালপত্র প্রভৃতি দেখবার শোনবার জন্তে একজন লোকও ত' চাই। বেহারীর কথা মনে এল, আগে আমাদের বাড়ীতে ছিল এখন শ্রীরামপুরে এক স্কুলের মাষ্টারের কাছে রয়েছে। তাড়াতাড়ি এগোতে গিয়ে শ্রীরামপুরের কাছারির কাছে গির্জার সামনে শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজির সঙ্গে দেখা হয়ে গেল।

জিজ্ঞাসা করলেন, “কোথায় চলেছ?” শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজির আনন্দ হান্তলেশশূন্য! বল্লুম, “মশায়, শুনলুম যে আপনি আর কানাই আমাদের সঙ্গে যাচ্ছেন না। এখন বেহারীকে খুঁজছি। আপনার বোধ হয় মনে আছে যে গেলবারে সে কাশ্মীর যাবার জন্তে এতদূর আগ্রহ দেখিয়েছিল যে আমাদের সঙ্গে সে বিনা মাইনেতেও যেতে রাজি ছিল।”

“মনে আছে। যাই হোক, বেহারীর এবার যে যাবার ইচ্ছে বলেও বোধ হয় না।”

আমি বিরক্ত হ'য়ে বল্লুম, “সে যাবার জন্তে এবার পা বাড়িয়ে আছে, দেখবেন!”

গুরুজি নীরবে আবার হাঁটা শুরু করলেন। শীগ্গিরই সেই স্কুল মাষ্টারের বাড়ী পৌঁছলুম। বেহারী তখন উঠানে কি করছিল, আমাদের

দেখেই একগাল হেসে কাছে এসে দাঁড়াল, কিন্তু কাশ্মীর বাওয়ার নাম শুনেই তা'র সব হাসি উড়ে গেল। কিছু যেন মনে না করি ব'লে লোকটা তা'র মনিবের বাড়ীর ভিতর ঢুকে গেল। আধঘণ্টা ধ'রে দাঁড়িয়ে, মনে মনে ভাবছি যে বেহারীর দেবী হচ্ছে যাবার জন্তে বাধাছাঁদা গোছগাছ করেছে বুঝি। শেনে আর থাকতে না পেরে সদর দরজায় ঘা দিলুম। একটা লোক বেরিয়ে এসে বললে যে, বেহারী প্রায় আধঘণ্টা আগে খিড়কী দরজা দিয়ে সরে পড়েছে। একটু মুচকি হাসিও তা'র ঠোঁটে দেখা গেল।

কি করি, নিতান্ত ক্ষুব্ধমনে প্রস্থান করলুম। ভাবলুম যে তা'কে নিয়ে যেতে চাওয়াটা কি জবরদস্তি হ'য়েছে অথবা গুরুজির অদৃশ্য প্রভাব এখানেও কাষ করেছে। গির্জা পেরিয়ে দেখি যে গুরুদেব আস্তে আস্তে আমার দিকেই আসছেন। খবর শোনবার অপেক্ষা না ক'রেই তিনি চৌকি ব'লে উঠলেন, "তা'হ'লে বেহারী আর যাচ্ছে না। যাক্, এখন তোমাদের মতলব কি?"

রাশভারি বাপের কথাও যে অমাত্র করে, তেমনি একগুঁয়ে ছেলের মতন আমি জবাব দিলুম, "মশায়, এখন খুড়োমশায়ের কাছে একবার দেখি, তাঁ'র চাকর লালধারীকে পাওয়া যায় কি না!"

একটু হেসে শ্রীযুক্তেশ্বরজি বললেন, "দেখতে চাও, দেখ। কিন্তু মনে হয় না গিয়ে কিছু ফল হ'বে!"

ভয় হ'ল, তবু বিদ্রোহ ক'রেই গুরুদেবকে ছেড়ে শ্রীরামপুরের কাছারি বাড়ীতে গিয়ে ঢুকলুম। খুড়োমশায়, শ্রীসারদাপ্রসাদ ঘোষ, ওখানকার সরকারী উকিল, আমার সম্মুখে অভ্যর্থনা করলেন।

তা'কে বললুম, "গুটিকতক বন্ধুবান্ধব নিয়ে আজ আমি কাশ্মীর যাচ্ছি। অনেকদিন ধ'রেই এই হিমালয়ের বেড়ানোর একটু ইচ্ছে আছে।"

"তাই না কি, যুকুন্দ, শুনে খুসী হ'লুম; তা' যাক্ তোমাদের বেড়ানটুকু যা'তে বেশ আরামে হয় তা'র জন্তে আমি কি করতে পারি ব'ল?"

এই স্নেহমধুর সন্তানগণে বৃকে অনেকটা সাহস এল। ব'লে ফেললুম, "ন'কাকা, আপনার লালধারীকে আমাদের সঙ্গে একবার ছেড়ে দিন না, একবার ঘুরে আসি।"

বাস, আর যান্ কোথা। একেবারে ভূমিকম্প আর অগ্ন্যুৎপাত এক-সঙ্গে বটে গেল! খুল্লতাতমহাশয় এরূপ প্রবলভাবে একটি লক্ষপ্রদান

করলেন যে তাঁ'র চেয়ার উল্টে গিয়ে ডেক্সের উপরকার কাগজপত্র চারদিকে ছড়িয়ে গিয়ে, হাত থেকে হাঁকো মাটির উপর ঠকাস্ ক'রে পড়ে এক তুমুল কাণ্ড বেধে গেল।

রাগে কাঁপ্তে কাঁপ্তে চিৎকার ক'রে বল্লেন, “তুগিত’ ভারি স্বার্থপর ছোকরা হে! কি আব্দার দেখ, তোমরা সব ক্ষুণ্ণি ক'রতে চলেছ আমার চাকরটি নিয়ে, আর আমায় কে দেখবে হে, তা’ ব’ল?”

বিশ্বয় মনের মধ্যে লুকোচুম এই ভেবে যে আমার অমায়িক খুল্লতা মহাশয়ের সহসা প্রকৃতির বিপর্যয় নিশ্চয়ই আর একটা রহস্য যা’তে ক’রে আজকের সারা দিবসটাই পরিপূর্ণ। কাছারিবাড়ী হ’তে আমার প্রত্যাবর্তন সম্মানজনক পশ্চাদপসরণের চেয়ে অধিকতর তৎপরই হ’ল।

আশ্রমে ফিরলুম। বন্ধুরা সব সাগ্রহে সমবেত হয়েছে। মনে মনে এই বিশ্বাস দাঁড়িয়েছিল যে, হয়ত গুরুদেবের ব্যবহারের পিছনে যদিও অত্যন্ত গুঢ় তবুও যথেষ্ট কোন উদ্দেশ্য লুক্কায়িত আছে। মনে অনুতাপ এল গুরুদেবের ইচ্ছা লজ্বনের চেষ্টা করছি ব’লে।

গুরুদেব জিজ্ঞাসা করলেন, “মুকুন্দ, আমার সঙ্গে আরও কিছুক্ষণ থাক না কেন? রাজেন্দ্র আর সব এখন এগিয়ে গিয়ে কলকাতায় তোমার জন্মে অপেক্ষা করতে পারে। কলকাতায় গিয়ে কাশ্মীরের রাত্রের শেষ ট্রেন ধরবার এখনও চের সময় আছে।”

ক্ষণ হ’য়ে বল্লুম, “মশায়, আপনাকে ছেড়ে যেতে আমার মোটেই ইচ্ছে নেই!”

বন্ধুগণ আমার কথায় বিন্দুমাত্রও কর্ণপাত করলে না। তা’রা একটা ভাড়াটে গাড়ী ডাকিয়ে মালপত্র তুলে নিয়ে তখনই রওনা হয়ে গেল। কানাই আর আমি গুরুদেবের চরণপ্রান্তে নীরবে বসে রইলুম। আশ্বষণ্টা গভীর নিশ্চরতার পর, গুরুদেব উঠে পড়ে দোতলায় খাবার বারান্দার দিকে এগিয়ে যেতে যেতে বল্লেন, “কানাই, মুকুন্দের খাবার দাও। তা’র গাড়ী ছাড়বার সময় হয়েছে।”

কম্বলের আসন ছেড়ে উঠতেই হঠাৎ একটা বমির ভাব এসে হাত প যেন এলিয়ে গেল আর সঙ্গে সঙ্গে পেট গুলিয়ে গিয়ে পাকস্থলীর ভিতর নোচড় দিয়ে ভীষণ যজ্ঞা শুরু হ’ল। পেটের ভিতর কে যেন ছুরি দিয়ে

চিরে ফেল্ছে। যন্ত্রণা এত গভীর মনে হ'ল, যেন আমার কেউ নিদারুণ যন্ত্রণাদায়ক নরককুণ্ডে ছুঁড়ে ফেলে দিলে। গুরুদেবের দিকে অন্ধভাবে হাতড়ে হাতড়ে গিয়ে তাঁর পায়ের তলায় বড়াস্ করে পড়ে গেলুম—সাম্প্রতিক এসিয়াটিক কলারার সব লক্ষণই তখন প্রকাশ পেয়েছে।

যন্ত্রণায় গড়াগড়ি দিতে দিতে টেঁচিয়ে বন্লুম, “গুরুদেব, আপনার হাতে আমার প্রাণ তুলে দিলুম,—যা করবার হয় করুন”, কারণ তখন মনে স্থির বিশ্বাস হ'ল যে প্রাণ অতি দ্রুতভাবেই আমার শরীর ছেড়ে বেরিয়ে যাচ্ছে।

শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজি তাঁর কোলে আমার মাথাটি তুলে নিয়ে সম্মুখে অতি স্নেহমূল্যে কপালে হাত বুলাতে বুলাতে বন্লেন, “দেখত’, ষ্টেশনে যদি এখন তোমার বন্ধুদের সঙ্গে থাকতে, তা'হ'লে ব্যাপারটা কি হ'ত, ব'ল দেখি। আমাকেই ত' তোমায় এইরকম অবস্থায় দেখতে হ'ত—কারণ তুমি ত' আমার বিচার ক'রে দেখায় সন্দেহ ক'রেছিলে যে এসময় বেড়াতে বেরোন তোমার উচিত নয়।”

শেষে সবই বুঝতে পারলুম। যেহেতু মহাগুরুগণ প্রকাশে তাঁদের ক্ষমতা প্রদর্শন করতে কদাচিৎ ইচ্ছা প্রকাশ ক'রে থাকেন, সেই হেতু তৎকালীন একজন দর্শক সে দিনের ঘটনাগুলো দেখলে নিশ্চয়ই অস্বাভাবিক করত যে তাঁদের পরপর ঘটে যাওয়া অত্যন্ত স্বাভাবিক। গুরুদেবের আমাকে নিবারণের প্রচেষ্টা এত সূক্ষ্ম যে, তা' ধরতেই পারা যায় না। তাঁর ইচ্ছা বেহারী, খুড়োমশায়, রাজেন্দ্র, আর অপরাপরদের মধ্যে এমন গুঢ়ভাবে কাষ করছিল যে, বোধ হয় আমি ছাড়া আর সকলেই ভেবেছিল যে, ঘটনা পরস্পর বা' ঘটে যাচ্ছে তা' একান্তই স্বাভাবিক।

সাংসারিক কর্তব্যও শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজির কাছে উপেক্ষিত হ'ত না বলে তিনি কানাইকে ডাক্তার ডাক্তারে পাঠিয়ে দিয়ে খুড়োমশায়কে খবর দিতে বন্লেন।

আমি প্রতিবাদ ক'রে বন্লুম, “গুরুদেব, একমাত্র আপনিই কেবল আমার আরাম করতে পারেন, এখন আমি ডাক্তারের নাগালের বাইরে।”

“বাছা, ঈশ্বরের রূপাই তোমায় রক্ষা ক'রছে। ডাক্তারের বিষয় আর ভেবো না। এসে তাঁকে আর তোমায় এই অবস্থায় দেখতে হ'বে না। তুমি একদম আরাম হ'য়ে গেছ, বুঝলে?”

গুরুদেবের কথার সঙ্গে সঙ্গে দারুণ মোচড়ানি আর যন্ত্রণা একেবারে মিলিয়ে গেল। অতি কষ্টে উঠে বসলুম। একজন ডাক্তার তখন শীগগির এসে পড়লেন, এসে আমাকে অতি যত্নের সঙ্গেই দেখলেন। দেখে বললেন, “মনে হ’চ্ছে তুমি দারুণ মারাত্মক অবস্থাটা কাটিয়ে উঠেছ। বা’ক, আমি পরীক্ষার জন্তে তোমার এসব বমি আর মলের কিছু কিছু নমুনা নিয়ে যাচ্ছি। কালকে এর ফল জানতে পারবে।”

তা’র পরদিন সকালবেলা ডাক্তারবাবু একরকম উদ্ধ্বাসেই ছুটে এলেন। আমি তখন বসে আছি, মন খুব হাল্কা।

অত্যন্ত স্নেহের সঙ্গে আমার হাতের উপর হাত বুলোতে বুলোতে ডাক্তারবাবু বললেন, “বাঃ, বাঃ, এখন ত’ বসে বসে খুব হাসি গল্প হ’চ্ছে, না যে ছুঁয়ে চলে গেল—তা’র খবর রাখ কি? নমুনা পরীক্ষায় তোমার এসিমাটিক কলেরা দেখে তুমি যে বেঁচে উঠবে, তা’ কখন ভাবতেও পারি নি। রোগ আরামের এমন দৈবশক্তিসম্পন্ন গুরু পেয়েছ ছোকরা, তুমিত’ খুব ভাগ্যবান্ হে! এতে আমার এখন দারুণ বিশ্বাস হয়ে গেছে, বুঝলে!”

আমিও অন্তরের সঙ্গে সায় দিলুম। ডাক্তার বাবু উঠবার উদ্যোগ করছেন, এমন সময় রাজেন্দ্র আর আড়িৎ এসে হাজির হ’ল। ডাক্তার আর আমার রুগ্ন চেহারা দেখে তা’দের ক্রোধ করুণায় পরিবর্তিত হ’ল।

রাজেন্দ্র বললে, “দেখলুম যখন কথামত কলকাতায় ট্রেন ধরবার সময় তুমি হাজির হ’লে না, তখন মনে বড়ই রাগ হয়েছিল। বা’ক, অল্প হয়েছিল দেখছি!”

বললুম, “হ্যাঁ”। আর যখন দেখলুম যে বন্ধুরা কালকে যে কোণ থেকে মালপত্র নিয়ে গিয়েছিল আবার সেই কোণেই ফিরিয়ে গিয়ে রাখছে, তখন আর হাসি চাপতে পারলুম না।

গুরুদেব ঘরে ঢুকলেন। রোগীর আবদারে তাঁ’র হাত সসম্মুখে ধরে বললুম, “গুরুজি, বারবছর বয়স থেকে আমি হিমালয়ে বা’বার নিষ্ফল চেষ্টা করে মরছি। এখন আমার খুব বিশ্বাস হয়েছে যে, আপনার আশীর্বাদ ছাড়া পার্শ্বতী আর আমার ডাক দেবে না দেখছি!”

২১শ পৰিচ্ছেদ

এবার কাশ্মীর যাত্রা

এসিয়াটিক কলেজের ছাত্র থেকে অলৌকিক উপায়ে রক্ষা পাবার পর দিন দুই পরে শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজি বললেন, “এখন তুমি বেড়াতে যাবার মত বেশ বল পেয়েছ দেখছি। এবার আমি তোমার সঙ্গে কাশ্মীর যাব।”

সেই দিন রাত্রে আমরা জন ছয়েক মিলে কাশ্মীর যাবার জন্তে ট্রেন ধরলুম। প্রথমে নামলুম গিয়ে সিমলা সহরে। সিমলা হচ্ছে হিমালয় পাহাড়ের মধ্যে সহরের রাণী। চতুর্দিকের বিরাট সৌন্দর্য আর অপূর্ণ দৃশ্য দেখতে দেখতে আমরা খাড়া রাস্তা দিয়ে হাঁটতে লাগলুম।

একটা খোলা জায়গায় বাজার বসেছে। জায়গাটি চমৎকার, ছবির মত। একটি বৃদ্ধা স্ত্রীলোক হাঁকছে, “বিলিতি ষ্ট্রবেরী চাই।”

অদ্ভুত লাল লাল ফলগুলি দেখে গুরুদেবের কৌতুহল উদ্ভিক্ত হ'ল। কানাই আর আমি কাছেই দাঁড়িয়েছিলুম। গুরুদেব এক বুড়ি ফল কিনে আমাদের খেতে দিলেন। আমি একটাতে কামড় দিয়েই থু থু করে ফেলে দিলুম।

“কি ভীষণ টক মশাই! ও ষ্ট্রবেরী আমার কোন কালেই ভাল লাগে না।” গুরুদেব হাসতে হাসতে বললেন, “আচ্ছা, আমেরিকায় গিয়ে সেখানে তোমার ভাল লাগবে দেখো! সেখানে এক ডিনারে বাড়ীর গিনি যখন সর আর চিনি দিয়ে ষ্ট্রবেরী তোমায় খেতে দেবে, তখন কাঁটা দিয়ে তুলে খেতে খেতে বলবে, ‘কি চমৎকার ষ্ট্রবেরী!’ তখন তোমার সিমলার এই অভ্যর্থকের দিনের কথা মনে পড়বে, দেখো!”

শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজির ভবিষ্যদ্বাণী মন থেকে তখন অন্তর্হিত হ'ল বটে, কিন্তু বহুদিন বাদে আবার জেগে উঠল, যখন আমেরিকায় যাবার অল্প কিছুদিন বাদেই ম্যাসাচুসেট্‌স প্রদেশে ওয়েস্ট সমারভিলির গিসেস্

এলিস টি, হেসির (বর্তমান নাম ভগিনী যোগমাতা) ডিনারে নিমন্ত্রিত হ'লুম। টেবিলে ফলটল দেওয়ার সময় আমাদের গৃহকর্ত্রী কাঁটা দিয়ে আমাদের চিনির সঙ্গে ষ্ট্রবেরীগুলো মেখে আমায় খেতে দিয়ে বল্লেন, “ফলগুলো কিছু টক হ'বে। কিন্তু আমার মনে হয়, এই রকম ক'রে তৈরী ক'রে দিলে আপনার খেতে ভাল লাগবে।”

একমুখ পূরে দিয়েই ব'লে উঠলুম, “কি চমৎকার ষ্ট্রবেরী!” সঙ্গে সঙ্গে স্মৃতির অতল গভীর হতে সিমলায় সেই গুরুদেবের ভবিষ্যদ্বাণী বেরিয়ে এল। বহুদিন পূর্বেই শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজির ভগবদ্ভাবিত মনে ভবিষ্যতের গুরু নিহিত কৰ্ম্মপ্রসূত ঘটনাবলীর তালিকা যে বরা পড়েছিল, তা' ভাবতেও মাথায় ঘুরে যায়।

আমাদের দলটি শীগ'গিরই সিমলা ছেড়ে রাওয়ালপিণ্ডির গাড়ীতে চড়ে বসল। সেখানে একটা ল্যাণ্ডোজুড়ি ভাড়া ক'রে আমরা কাশ্মীরের রাজধানী শ্রীনগরে যাত্রা করলুম। দিন সাতেক লাগল। আমাদের উত্তরাপথ ভ্রমণের দ্বিতীয় দিনে প্রকৃত হিমালয়ের বিরাট দৃশ্য চোখের সামনে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। অত্যন্ত গরম পাথরের রাস্তা দিয়ে গাড়ীর লোহার চাকা ঘড়'ঘড়' শব্দ তুলে চলতে লাগল। পার্করতা সৌন্দর্য্যের মুহুমূর্ত্ত: পরিবর্তনের সম্ভাবনায় আমাদের মন আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠল।

আড্ডি গুরুদেবকে বললে, “মশায়, আপনার সংসঙ্গে এমন বিরাট দৃশ্য দেখতে পেয়ে যে কি আনন্দ হ'চ্ছে, তা' আর কি বলব!”

ভ্রমণের ব্যবস্থা আমারই করা, কাষেই আড্ডির প্রশংসা শুনে মনটা আনন্দে ফুলে উঠল। শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজি আমার মনের কথা জানতে পেয়ে আমার দিকে ফিরে ফিস্ ফিস্ ব'রে বল্লেন, “শুনে ফুলে উঠো না। আমাদের খানিকক্ষণ ছেড়ে একটান সিগারেট খাবার আশায় বতটা উৎসাহ ও সব দৃশ্যট'শ্য দেখে ততটা নয়, বুঝলে?”

আমি ত' সন্তুষ্ট হয়ে গেলুম। চাপাগলায় বললুম, “মশায়, দয়া ক'রে আর এ কড়া কথাগুলো শুনিয়ে আমাদের দল ভাঙাবেন না। আমি যে মোটেও বিশ্বাস করতে পারছি নে যে আড্ডির সিগারেট খাবার তেষ্ঠা জোগেছে। গুরুদেব সহজে হট্টনার পাত্র নন—সভয়ে তাঁর দিকে তাকালুম।

গুরুদেব মৃদু হেসে বললেন, “আচ্ছা বেশ, আড্ডিকে আর আমি কিছু বলব না। কিন্তু তুমি শীগ্গিরই দেখো, যে ল্যাণ্ডো থামলেই আড্ডি এ সুরোগটি নেবে।”

একটা ছোট সরাইএর কাছে এসে গাড়ী থামল। ঘোড়াহুটোকে জল খাওয়াতে নিয়ে যেতেই আড্ডি বললে, “মশায়, গাড়োয়ানের সঙ্গে একটু ঘোড়ায় চড়ে বেড়িয়ে আসি। গাড়ীর ভেতর বড় গরম। বাইরের একটু টাটকা হাওয়া খাওয়া যাবে।”

শ্রীবুদ্ধেশ্বর গিরিজি অনুমতি দিলেন, কিন্তু আমায় বললেন, “আড্ডির চাই, টাটকা হাওয়া নয়, টাটকা ধোঁয়া।”

আবার ধলিজর্জরিত রাস্তার উপর দিয়ে আমাদের ল্যাণ্ডো চলতে শুরু করলে। গুরুদেবের চোখ হাসিতে মিট মিট করছিল; তিনি আমায় উপদেশ দিলেন, “গাড়ীর দরজা দিয়ে গলা বাড়িয়ে দেখ ত’ আড্ডি হাওয়া নিয়ে কি ক’চ্ছে?”

উপদেশ পালন করতে গিয়ে অবাক হয়ে দেখি যে আড্ডি মুখ দিয়ে সিগারেটের ধোঁয়ার কুণ্ডলী পাকিয়ে ছাড়ছে! ক্ষণপ্রার্থনাসূচক দৃষ্টিতে শ্রীবুদ্ধেশ্বর গিরিজির দিকে তাকিয়ে বললুম, “মশায়, বরাবরই দেখছি যে আপনার কথাই ঠিক! আড্ডি এখন চারধারের দৃশ্য দেখতে দেখতে বেশ ধোঁয়া ছাড়ছে!” অনুমান করলুম যে আড্ডি গাড়োয়ানের কাছ থেকে সিগারেটটি বাগিয়েছে; কেননা আমি জানতুম যে, কলকাতা থেকে আড্ডি কোন সিগারেট কি কিছু সঙ্গে করে আনে নি।

পাহাড়ের উপর রাস্তা সাপের মত এঁকে বঁকে চলে গেছে। চার ধারের দৃশ্য কি অপূর্ব আর সুন্দর! নদী, উপত্যকা, গভীর খাদ, পাহাড়ের পর পাহাড়ের উচ্চশৃঙ্গ! প্রত্যহ রাত্রে আমরা পথের ধারে কোন গ্রাম্য সরাইয়ে উপস্থিত হ’তুম; সেখানে আমরা নিজেদের খাবার নিজেরাই তৈরী ক’রে নিতুম। শ্রীবুদ্ধেশ্বর গিরিজি আমার পথের ভার নিজে নিয়েছিলেন, আর দেখতেন যে প্রত্যেকবার খাবার সময় আমায় যেন লেবুর রস দেওয়া হয়। তখনও আমি বেশ দুর্বল কিন্তু রোজই একটু একটু ক’রে উন্নতিলাভ করতে লাগলুম। হ’লে কি হবে, গাড়ীর বাড়-ঝড়ানিতে হাড় পাঁজরা সব একেবারে চিলে হ’য়ে আসত।

কাশ্মীরের মধ্যভাগে যতই অগ্রসর হতে লাগলুম, ততই আমার হৃদয় আশায় আনন্দে উদ্বেলিত হয়ে উঠতে লাগল। হিমালয়ের বিরাট গান্ধীরোম মধ্যে প্রকৃতি—পদ্মহৃদ, ভাসমান উগান, সুসজ্জিত শিকারা (হাউসবোট), বহুসেতুশোভিত ক্বিলামনদী আর কুলে কুলে ভরা সবুজ তৃণাচ্ছাদিত বনভূমিতে এখানে ভূস্বর্গ রচনা ক'রে রেখেছে। শ্রীনগরে প্রবেশের পথ দুইদিকে সুদীর্ঘ গাছের সারি দিয়ে ঘেরা, আমাদের সাদর আহ্বানের জন্তই যেন দাঁড়িয়ে রয়েছে। একটি দ্বিতল সরাইয়ে আমরা ঘর নিলুম। সামনে উত্ত্বঙ্গ শৈলমালা—গর্কোন্নত মস্তক উত্তোলন ক'রে আপনার বিরাট মহিমার দণ্ডায়মান! কাছাকাছি কোথাও স্রোতের জল পাওয়া যেত না, নিকটবর্তী একটা কূয়া হ'তেই আমাদের জল আসত। গ্রীষ্মঋতু এখানে অত্যন্ত আরামদায়ক, দিনে গরম বটে কিন্তু রাতে একটু ঠাণ্ডা।

শ্রীনগরে শঙ্করাচার্যের প্রাচীন মন্দির একদিন দর্শন করতে যাওয়া গেল। নীল আকাশে উন্নতশির পর্বতশিখরস্থ সেই প্রাচীন মন্দির দর্শন করতে করতে তজ্জ্বার মতন একটি মধুর আবেশের মধ্যে ডুবে গেলাম, দূর বিদেশভূমিতে পাহাড়ের উপর একটি অট্টালিকার দৃশ্য চোখের সামনে যেন ভেসে উঠল। সেই সুউচ্চ শঙ্করাচার্যের আশ্রম তখন পরিবর্তিত হয়ে গিয়ে সেই স্থানটিতে পরিণত হ'ল, যেখানে আমি বছবৎসর বাদে আমেরিকার সেন্ট রিয়ারাইজেশন ফেলোশিপের প্রধানকেন্দ্র স্থাপন ক'রে ছিলাম। যদি আমি লস এঞ্জেলিসে গিয়ে মাউন্ট ওয়াশিংটনের চূড়ায় প্রকাণ্ড বাড়ী দেখলুম তখনই আমি চিন্তে পারলুম যে কাশ্মীর আর অল্পত্র আমার স্বপ্ন দেখা এই সেই বাড়ী।

কাশ্মীরে কিছু দিন কাটিয়ে তা'রপর আরও ছয়হাজার ফুট উঁচুতে গুলমার্গে গেলুম। সেখানেই গিয়ে আমি প্রথম বড় ঘোড়ার উপর চড়ে রাজেন্দ্র একটি ছোট টাটুঘোড়ার উপর চডলে।

ঘোড়াটা খুব তেজী আর দৌড়বার জন্তে একেবারে অস্থির। মতলব করণে খিলানমার্গে যেতে হবে। জায়গাটা খুব খাড়াই আর রাস্তাটা গভীর জঙ্গল মধ্য দিয়ে গিয়েছে; প্রচুর “ব্যাণ্ডের ছাতা” গাছে পরিপূর্ণ আর কুয়াশায় যেন সেই পথ চলাও অত্যন্ত বিপদসঙ্কুল। রাজেন্দ্রের ছোট টাটুঘোড়াটি কি আমার বৃহদায়তন অশ্ববরকে মুহূর্তেকের ত'রেও বিশ্রাম দিত না, ছুটেছে

ছুটেই চলেছে, এমন বিপজ্জনক বাকের মুখেও তা'র গ্রাস নেই ! রাজেশ্বরের ঘোড়া বাজি মারবার জন্তে ছুটেছে, দৌড়, দৌড়, তা'কে থামান দায় আর কি !

খোড়দৌড়ের বাজির শেষে যা পুরস্কার পেলুম তা' দেখে আনন্দে বিশ্বয়ে নিঃশ্বাস স্তব্ধ হ'য়ে এল । তুমারমৌলি হিমালয়ের উপর দাঁড়িয়ে চারদিকে তাকালুম, দেখি শৃঙ্গের পর শৃঙ্গের বিরাট রজতস্তূপ অথবা নীল আকাশের কোলে যেন ঝেঁত দিজলী নিখর হ'য়ে দাঁড়িয়ে আছে । কি মহান, গম্ভীর দৃশ্য ! সূর্য্যাকিরণোজ্জ্বল সুনীল আকাশের গায়ে হিমাবৃত গিরিশৃঙ্গের সেই অনন্ত বিস্তার, অপূর্ব আনন্দে স্তব্ধ হয়ে যেন হুই চক্ষু দিয়ে পান করতে লাগলুম !

সকলেরই গায়ে ওভারকোট ছিল । বরফে ঢাকা উজ্জল ষ্বেতবর্ণের সেই ঢালু জমির উপর স্মৃতি করে গড়াগড়ি খাওয়া গেল । ফিরবার পথে দূরে দেখা গেল, যেন কে একথানা হলুদে রঙের কার্পেট বিছিয়ে রেখেছে, তা'তে উলঙ্গ পর্কতগাত্রের রূপ একেবারেই বদলে গেছে ।

তা'রপরের যাত্রা হ'ল, শালিমার আর নিশাতবাগে সম্রাট জাহাঙ্গীরের বিখ্যাত বাজপ্রমোদউদ্যান । নিশাতবাগের রাজপ্রাসাদ একটা স্বাভাবিক জলপ্রপাতের ঠিক উপরেই তৈরী । পাহাড় হ'তে বেগে নেমে আসবার সময় জলের গতিকে নানা উপায়ে আর অতি স্নকৌশলে এমন ভাবে নিয়ন্ত্রিত করা হয়েছে যে, তা'রা রঙবেরঙের বাপের উপর দিয়ে ব'য়ে গিয়ে নানাবর্ণোজ্জ্বল পুষ্পকুঞ্জের মাঝখানে ফোয়ারা দিয়ে উচ্ছ্বসিত হ'য়ে পড়েছে । স্রোতটি রাজপ্রাসাদের গুটিকতক ঘরের ভিতর দিয়ে ব'য়ে গিয়ে শেনে পরীস্থানের মত নিচেকার হ্রদে গিয়ে ছড়িয়ে পড়েছে । বিশাল উদ্যানে রঙের সে কি বিচিত্র সমারোহ—রঙের আগুন লেগেছে না হোলি খেলা চলেছে কে বলবে ? নানাবর্ণের গোলাপ, স্ন্যপড্রাগন, ল্যাভেণ্ডার, প্যাপ্পি, পপি কত কি ! সমআরতনের চিনার, সাইপ্রেস, চেরী প্রমত্তি গাছ দিয়ে ঘেরা, যেন পাড়ে পান্না বসান । দূরে হিমালয়ের অলংলিহ স্তম্ভ গিরিশিখর গর্ভোদ্ধত মস্তকে দণ্ডায়মান ।

কলকাতায় কাশ্মীরি আঙুর একটা বড়দরের মেওয়া । রাজেশ্বর মনে মনে ভেবেছিল কাশ্মীরে পৌছে কি আঙুরটাই না থাকবে ।—গিয়ে দেখলে যে সিথানে বড়গোছের কোন আঙুরক্ষেত নাই । তা'র এই ভুল ধারণার জন্তে এখন তখন আমি তা'কে খোঁটা দিয়ে ঠাট্টা করতুম ।

মাবে মাবে বলতুম,—“ওঃ, আঙুর খেয়ে পেট আমার এমন ঢাক হ’তে গেছে যে আর চলতে পারি না। অদৃশ্য আঙুরের রস পেটে জমছে। পরে শুনেছিলুম যে কাশ্মীরের পশ্চিমে কাবুল প্রদেশে প্রচুর আঙুর জন্মায়। আঙুর তেমন পাওয়া গেল না, কি আর করি পেস্তাদেওয়া রাবড়ির মালাই খেয়েই ঠাণ্ডা থাকতে হ’ল।

ডাল হুদে লাল সামিয়ানা ঢাকা শিকারা বা হাউসবোটে ক’রে বার কতক খুব বেড়ান গেল, জলপথ এমন নানা শাখাপ্রশাখায় বিস্তৃত যে মনে হয় একটা প্রকাণ্ড জলের মাকড়সা। তা’র চারদিকে নানা ভাসমান উদ্ভান, কাঠের উপর নাটি ফেলে তৈরী। জলের মাঝখানে শাকসব্জী আর তরমুজ জন্মাচ্ছে। মাবে মাবে দেখা যায় যে এক একজন চাবী তা’র “ফেঁতটি” লগি দিয়ে ঠেলে নিয়ে এক জায়গা থেকে আর একটা নতুন জায়গায় সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছে।

এই বহুতলবিশিষ্ট উপত্যকায় পৃথিবীর সকল সৌন্দর্যের এক সমাবেশ। কাশ্মীরসম্রাজীর মস্তকে শৈলমুকুট, কণ্ঠে হুদের বলয়, পুষ্পভর সজ্জিত। পরে যখন আমি বিভিন্ন দেশ পরিভ্রমণ করে ফিরলুম তখন আমি বুঝলুম যে কেন কাশ্মীরকে পৃথিবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ সৌন্দর্যের স্থান বল হয়। এখানে আছে সুইস্‌ আল্প্‌সের, স্কটল্যান্ডের লমণ্ড হুদের আর ইংলণ্ডের হুদগুলির সৌন্দর্যের সারসংগ্রহ। কাশ্মীরে আমেরিকান ভ্রমণকারীকে আলাস্কা প্রদেশের পার্কত্যসৌন্দর্য আর ডেনভারের পাইক্‌স্‌ পীকের কণ্ঠস্বর শ্রবণ করিয়ে দেয়।

প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যদৃশ্যপ্রতিযোগিতায় আমি প্রথম পুরস্কার দিই—ফ্রান্সের মেক্সিকোর জকি গিল্‌কোকে—যেখানে পর্বত, আকাশ আর পপলার গাছের হাজারো দিকের জলধারার মাঝে যেখানে মাছেরা খেলা করছে তা’র উপর তা’দের ছায়া ফেলেছে, আর না হয় কাশ্মীরের রত্নসদৃশ হুদগুলিকে—কেন নবোদ্ভিন্নযৌবনা সুন্দরী, হিমালয়ের কঠিন প্রহরার মধ্যে সুরক্ষিত। পৃথিবীর এই দুটি স্থানই সর্বাপেক্ষা সুন্দর ব’লে আমার স্মৃতিতে বর্তমান।

তবুও যখন আমি ইয়েলোস্টোন ন্যাশন্যালপার্ক আর কলোরাডো প্রদেশের আলাস্কার বিরাট খাদ প্রথম দর্শন করি তখন বিশ্বয়ে স্তম্ভিত হয়ে পড়ি। ইয়েলোস্টোন পার্ক বোধ হয় একমাত্র স্থান যেখানে অসংখ্য উষ্ণপ্রস্রব

প্রচণ্ডবেগে জল উদ্গীরণ করছে—বছরের পর বছর ধরে নিয়মিত, ঠিক সময়ে, ধড়ির কাঁটার মত। এখানকার রামধনু রঙের আর গাঢ় নীল জলাশয়, গন্ধকজলের উষ্ণ প্রস্রবণ, এখানকার ভল্লুক আর বজ্রজন্তুসকল দেখে মনে হয় যে, প্রকৃতি তা'র আদিম সৃষ্টির খানিকটা অংশ এখানে ফেলে রেখেছে।

উয়োগিং থেকে “ডেভিল্‌স্ পেণ্টপট”এর রাস্তার মোটরে যেতে যেখানে গরম কাদা ফুটছে, বারণা উথলে ব'য়ে চলেছে, ফোয়ারা থেকে বাষ্প বেরুচ্ছে, চতুর্দিকে অসংখ্য উষ্ণজলের প্রস্রবণ দেখে আমি বলতে বাধ্য যে, ইয়েলো-ষ্টোনও একটি বিশেষ পুরস্কার পেতে পারে।

যোশেমাইটের প্রাচীন বিরাটবনস্পতি রেডউড্‌সকল তা'দের বিশাল স্তম্ভ অনন্ত আকাশের দিকে উত্তোলিত করে দণ্ডায়মান—যেন দেবতাদের গড়া হরিৎবর্ণের প্রকৃতির মন্দির। প্রাচ্যে বহু আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য জলপ্রপাত থাকলেও কানাডার সীমান্তে ন্যায়াগ্রাপ্রপাতের বিরাটসৌন্দর্য্যের কাছে কেউ লাগে না। কেন্টাকির বিরাট গুহা আর নিউমেক্সিকোর কার্লসবাদ গুঁফার ভিতরকার রঙীন বরফঝুরি দেখলে পরীরাজ্য ব'লেই ভ্রম হয়। গুহার ছাদ হতে ষ্ট্যালাক্টাইটের লম্বা ঝালর ঝুলে পড়েছে আর তাদের ছায়া নিচের জলে প্রতিফলিত হয়ে দেখাচ্ছে যেন স্বপ্নজগতের একটি মপক্লপ দৃশ্য।

কাশ্মীরের অধিকাংশ হিন্দুই দেখতে অতি সুন্দর। দেহসৌন্দর্য্যের জগত তা'রা জগদ্বিখ্যাত। ইউরোপীয়দের মত তা'রা শ্বেতবর্ণ, আর দেহসৌষ্ঠবও তরুণ। অনেকেরই চোখ নীল আর সুন্দর সোনালী চুল। সাহেবী পোষাকে তা'দের আমেরিকানদের মতই দেখায়। হিমালয়ের শৈত্য তা'দের উত্তম সূর্য্যাকিরণ হ'তে রক্ষা ক'রে, তা'তে তা'দের দেহবর্ণও রক্ষা পায়! দক্ষিণের দিকে নামতে থাকলে দেখতে পাওয়া যায় যে সেখানকার অধিবাসীদের গায়ের রঙ ক্রমশঃ ঘোর হতে ঘোরতর হয়ে বদলে আসছে।

কয়েক হপ্তা কাশ্মীরে ভ্রমণস্বখে অতিবাহিত করবার পর বাঙ্গলাদেশে ফিরতে বাধ্য হ'লুম। গ্রীষ্মের ছুটির পর কলেজ খুলবে। কানাই আর মাজির সঙ্গে শ্রীবুদ্ধেশ্বর গিরিজি কাশ্মীরে র'য়ে গেলেন। যাবার আগে গুরুদেব একদিন আভাসে জানানেন যে, কাশ্মীরে তাঁ'র অসুখ দাঁড়াতে পারে।

আমি প্রতিবাদের স্তরে বল্লুম, “মশায়, আপনি ত’ নিটোল স্বাক্ষরে একটি পরিপূর্ণ ছবি, আপনার চিত্রা কিসের?”

“আরে এমন সম্ভাবনাও এখন আছে যে আমার এ সংসার ত্যাগ করে যেতে হ’তে পারে।

শুনে দারুণ বিচলিত হ’য়ে তাঁ’র পদতলে পড়ে অতুন্নয় ক’রে বল্লুম, “গুরুজি, আপনি প্রতিজ্ঞা করুন যে এখন দেহরক্ষা করবেন না। আপনি ছাড়া যে আমি একপা’ও চলতে পারব না।”

শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজি নীরব হয়ে রইলেন, কিন্তু আমার দিকে চেয়ে এমন নিঃশব্দ হাঙ্গামা হাঙ্গামে, যে, তা’তে আমি কতকটা আশ্বস্ত হলাম। নিতান্ত অনিচ্ছার সঙ্গেই তাঁ’কে ছেড়ে চলে আসতে হ’ল।

শ্রীরামপুরে ফেরবার অল্প কিছুদিন পরেই আড়ির কাছ থেকে টেলিগ্রাম এল, “গুরুজি সাংঘাতিকরূপে পীড়িত।”

উন্নতের মত তার পাঠালুম, “মশায়, আপনি প্রতিজ্ঞা করেছেন যে আমার ছেড়ে যাবেন না। দেহ রক্ষা করুন নইলে আমি ত’ আর বাঁচব না।”

কাশ্মীর হ’তে শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজির উত্তর এল, “তোমার যা’ ইচ্ছে তাই হোক।”

দিনকতকের মধ্যেই আড়ির কাছ থেকে চিঠি এল গুরুদেব আরোগ্য লাভ করেছেন। তা’রপরে পক্ষকাল মধ্যে গুরুদেব শ্রীরামপুরে ফিরলেন। দেখে দুঃখ হ’ল যে, তাঁ’র শরীর একেবারে আধখানা হয়ে গেছে।

শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজি তাঁ’র শিষ্যদের নিতান্ত সৌভাগ্যক্রমে কাশ্মীরে তাঁ’র দারুণ জরভোগের সঙ্গে সঙ্গে তা’দের বহু পাপ পুড়িয়ে ধ্বংস ক’রে দিয়ে ছিলেন। আধ্যাত্মিক উপায়ে অপরের শরীর থেকে নিজের শরীরে রোগ নিয়ে তা’ ভোগ ক’রে শেষ করা উচ্চস্তরের যোগীদের জন্য আছে। শক্তিমান লোক দুর্বলের গুরুভার নিজশরীরে বহন ক’রে তা’কে সাহায্য করতে পারে; আধ্যাত্মিক জগতের অতিমানবও তেমনি তাঁ’র শিষ্যদের

* ২২শ পরিচ্ছেদে ধেরসা নিউম্যানের কাহিনী দ্রষ্টব্য।

রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব একবার এই রকমে রাণী রাসমণির উদরাময় নিজ শরীরে গ্রহণ ক’রে হা’ মাস কাল ভুগে তা’র ভোগকাল খণ্ডন করেছিলেন।

দ্বান্বয় দৈহিক বা মানসিক গুরুভার বহন ক'রে তা'দের প্রাক্তন কর্মের ফল খণ্ডন ক'রে দিতে পারেন। ঋণে জর্জরিত অমিতব্যয়ী পুত্রের বিরাট ঋণের বোঝা নাগিয়ে দিতে ধনী পিতা যেমন কিছু অর্থদণ্ড দেয়, যা'তে ক'রে সে বেচারী তা'র রূতকর্মের ভীষণ পরিণাম হ'তে বেঁচে যায়—তেমনি সঙ্গুরুরা তাঁদের শিষ্যদের দুঃখমোচন করবার জন্তে তাঁদের স্বাস্থ্য-গৌরবের কতক অংশ স্বেচ্ছায় বিসর্জন করেন।

গৃহ উপায়ে যোগীরা তাঁদের মন, আর আধ্যাত্মিক সংবাহনশক্তি দীড়িত ব্যক্তির সঙ্গে সংযুক্ত করেন—তা'তে ক'রে সেই রোগ সাধুর দেহে সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে সঞ্চারিত হয়। জড়জগতে ভগবানকে লাভ ক'রে সঙ্গুরু গ্রাহ্যই করেন না যে, তাঁ'র জড়শরীরের কি দশা ঘটবে। যদিও তিনি অপরকে মুক্তি দেবার জন্তে নিজ শরীরে তা'র রোগ স্বেচ্ছায় গ্রহণ করেন, তা'হ'লেও কিন্তু তা'তে তাঁ'র মন অভিভূত হয় না; আর এ রকম সাহায্য করতে পারাকে তাঁ'রা সৌভাগ্য ব'লেই মনে করেন।

ভক্ত যখন দেখে যে তা'র আত্মা পরমাত্মায় বিলীন হয়েছে, তখন সে বোঝে যে এ শরীর তা'র উদ্দেশ্য সম্পূর্ণরূপে সাধিত করেছে। এ জগতে তা'র একমাত্র কর্ম হচ্ছে মানবজাতির দুঃখমোচন—তা' আধ্যাত্মিক উপায়েই হোক আর জ্ঞানোপদেশ বা ইচ্ছাশক্তিবলে বা শারীরিক রোগপরিচালনা করেই হোক। ইচ্ছামাত্র ব্রহ্মানন্দে যগ্ন হ'য়ে সঙ্গুরুরা শারীরিক যন্ত্রণা ভুলে থাকতে পারেন। কখনও কখনও একান্ত নীরবে শারীরিক ক্লেশ বহন করতে চান—শিষ্যদিগকে উদাহরণস্বরূপ শিক্ষা দেবার জন্ত। যোগীরা অজ্ঞাতদের ভোগ নিজ শরীরে গ্রহণ ক'রে, তা'দের হ'য়ে কর্মফলের ভোগ গণ্ডন করতে পারেন। এ বিধি দুর্লভ্য চুলচেরা, অন্ধের হিসেবে ঠিক যন্ত্রের মতন এ কায ক'রে যাবে কেউ তা' এড়াতে পারে না। ভগবদ্ভজ্ঞান যা'দের লাভ হয়েছে, তাঁ'রাই বৈজ্ঞানিকভাবে এর ফলের তারতম্য করতে পারেন।

কোন সঙ্গুরু যখন অপরের রোগনিরাময়ের ভার গ্রহণ করেন তখন আধ্যাত্মিকবিধানে তাঁ'কে যে পীড়া ভোগ করতেই হ'বে, এমন নয়। সাধুসন্তদের সত্ত্ব সত্ত্ব রোগনিরাময়ের সাধারণতঃ নানা উপায় জানা আছে, তা'তে করেই রোগ আরাম হয় আর তা'তে আধ্যাত্মিকশক্তিসম্পন্ন গুরু কোনই ক্ষতি হয় না। কেবল বিশেষ উপলক্ষ্যে গুরু যদি ইচ্ছা করেন

যে, তাঁ'র শিষ্যের অতি দ্রুত উন্নতি সাধিত করা প্রয়োজন তখনই কেবল তিনি নিজশরীরে তা'র প্রচুর অশুভ কর্মফল একসঙ্গে গ্রহণ ক'রে ভোগাদে সে সব খণ্ডন করেন।

যীশুখৃষ্টও এমনি করে বহুলোকের পাপের মুক্তিপণ হয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন। তাঁ'র দৈবশক্তিপ্রভাবে তাঁ'র শরীর কুশল হ'য়েও কখন মৃত্যুমুখে পতিত হ'ত না যদি না, তিনি কার্যকারণের ক্ষুদ্র দৈববিধি পালিত হ'তে স্বেচ্ছায় না সাহায্য করতেন! তিনি এই রকম ক'রে অপরের কর্মফল নিজশরীরে গ্রহণ করেছিলেন, বিশেষতঃ তাঁ'র শিষ্যদের। এই প্রকারে তা'রা বিশেষভাবে পরিশুদ্ধ হ'য়ে পরিশেষে ভগবদজ্ঞানলাভের উপযুক্ত হ'য়ে ওঠে।

আত্মজ্ঞানসম্পন্ন সঙ্গুরুই কেবল তাঁ'র প্রাণশক্তি সঞ্চারিত করতে পারেন অথবা অপরের রোগ নিজশরীরে গ্রহণ করতে পারেন। সাধারণ লোকে কেউ অবশ্য একপ রোগ নিরাময়ের যৌগিকপ্রণালী প্রয়োগ করতে পারে না, আর তা'র এসব করতে যাওয়াও উচিত নয়; কারণ অপর শরীর ঈশ্বরপ্রণিধানের পক্ষে বাধাস্বরূপ। শাস্ত্রে বলে, “শরীরমাংস ধর্ম ধর্ম সাধনম্”, আগে স্বাস্থ্য ভাল করতে হ'বে তা'রপর ধর্মসাধন, তা'ন হ'লে ভগবদচিন্তায় মন নিবিষ্ট ক'রে রাখা অত্যন্ত দুষ্কর।

খুব দৃঢ়মন কিন্তু সমস্ত শারীরিক বাধাবন্ধ সব অতিক্রম ক'রে ঈশ্বরোপলব্ধি করতে পারে। বহু সাধুসন্ত বোগশোক অতিক্রম ক'রে ঈশ্বরানুসন্ধান সফলকাম হয়েছেন। আসিসির সেন্টফ্রান্সিস গুরুতররোগে পীড়িত হয়েও অপরকে আরাম করেছেন—এমন কি মৃত্যু পুনর্জীবনও দান করেছেন।

আমার একটি ভারতীয় সাধুর কথা জানা ছিল। তাঁ'র অর্ধেক শরীর ক্ষতে পরিপূর্ণ। তা'র উপর তাঁ'র বহুমূত্ররোগ এত প্রবল যে, সাধারণ অবস্থায় পনরমিনিটের বেশী তিনি এক জায়গায় স্থির হ'য়ে বসে থাকতে পারতেন না। কিন্তু তাঁ'র ঈশ্বরলাভের আকাঙ্ক্ষা ছিল অদম্য। করযোড়ে তিনি এই ব'লে প্রার্থনা করতেন যে, “প্রভু তুমি কি আমার এই ভাঙ্গা মন্দির আসবে?” অবিরাম ইচ্ছাশক্তির পরিচালনায় সাধুটি ক্রমশঃ প্রত্যহই ব্রহ্মানন্দ মগ্ন থেকে একাদিক্রমে আঠার ঘণ্টা পদ্মাসনে বসে থাকতে সমর্থ হলেন।

তিনি আমাকে বলেছিলেন, “তা’রপর তিনবছর বাদে আমার এই ভাঙ্গা ঘরে সেই অনন্ত জ্যোতিঃের প্রকাশ হ’ল। সেই জ্যোতিঃসাগরে ডুবে গিয়ে আনন্দে আমার শরীরের কথা আর মনেই রইল না। শেষে দেখা গেল যে ভগবৎপায় আমার শরীর সম্পূর্ণরূপে সেরে গেছে।”

মোগলসাহাজার স্থাপত্য সন্ধান বাবরের কথা সকলেই জানেন। পুত্র হুমায়ুন সাংঘাতিকরূপে পীড়িত। পিতা অধীরআগ্রহে প্রার্থনা করতে লাগলেন যে তাঁকে রোগ দিয়ে তাঁর পুত্রটি যেন বেঁচে যায়। চিকিৎসকেরা সব আশা ছেড়ে দবার পরও হুমায়ুন বেঁচে উঠলেন। বাবর কিছু সঙ্গে সঙ্গে পুত্রের রোগে পড়ে মারা গেলেন। হুমায়ুন বেঁচে উঠে বাবরের পর হিন্দুস্থানের সম্রাট হয়েছিলেন।

অনেকেই মনে করেন যে আধ্যাত্মিক গুরুদের স্যাণ্ডোর মত গায়ের জোর বা স্বাস্থ্য আছে বা থাকা উচিত। এ অদ্ভুতমান একেবারেই অমূলক। জন্মাবধি পবিত্রপুণ্যস্থান যেমন ঈশ্বরজ্ঞান লাভের দ্ব্যর্থক নয়, তেমনি চিরকল্প শরীরও এ সূচনা করে না যে, গুরু আরো ভগবৎশক্তির সংস্পর্শে আসেন নি। অল্প কথায় বলা যেতে পারে যে, শারীরিক অবস্থা দেখে প্রকৃত গুরুর পরীক্ষা করা চলে না। তাঁর বৈশিষ্ট্যের পরিচয় তাঁর নিজ আধ্যাত্মিকক্ষেত্রেই মেলে।

পশ্চিমের বহু বিদ্রাস্ত তত্ত্বাবধানী ভুল ধারণা করেন যে, দর্শনশাস্ত্রের বিখ্যাত বাগ্মী বা সুপরিচিত লেখকরা নিশ্চয়ই সঙ্গুরু হ’বেন। ঋদিরা বলে গেছেন যে গুরুর পরীক্ষা হ’চ্ছে, সেই ব্যক্তির ইচ্ছামাত্র বিগতস্বাস হ’তে পারা আর অথগু নির্দ্বিগ্ন সমাধিতে মগ্ন থাকা। কেবল এই স্বতিয়ের বলেই মাদুঘ প্রমাণ করতে পারে যে সে মায়ী অতিক্রম করতে পেরেছে। তাঁর অস্তরের গভীর অদ্ভুতুতি থেকে একমাত্র তিনিই বলতে পারেন, “একম নং”—“কেবল একজন মাত্রই আছেন।”

অবৈতবাদী শঙ্কর লিখে গেছেন, “বেদে উল্লিখিত আছে যে, জীবাত্মা পরমাত্মায় বিন্দুমাত্র ভেদজ্ঞানে সন্থষ্ট যে অজ্ঞানী, তা’র বিপদের পথ উন্মুক্ত। অজ্ঞানজাত যে বৈতভাব, তা’তে পরমাত্মা হ’তে সকল জিনিসেই ভেদজ্ঞান জন্মে। যেখানে সর্বভূতে আত্মজ্ঞান জন্মে, সেখানে আত্মা ছাড়া একটা পরমাণুও নাই

“স্বপ্ন থেকে জেগে উঠলে যেমন স্বপ্নদৃষ্ট ঘটনার কোনই মূল্য থাকে না, তেমনি আত্মজ্ঞান লাভ হ’লে শরীরের নশ্বরতা হেতু আর প্রাপ্তজন কর্মফল ভোগ করতে হয় না।”

মহাপুরুষগণই কেবল শিষ্যদের কর্মফল গ্রহণ করতে পারেন। শ্রীকৃষ্ণের গিরিজি কাম্বীরে কখনই রোগভোগ করতেন না, যদি না তিনি ঐ রকম অদ্ভুত উপায়ে শিষ্যদের উপকারের জন্ত অস্তরে ঈশ্বরের আদেশ না পেতেন।

ভগবৎপরায়ণ আমার গুরুদেব ব্যতীত অতি অল্প সাধুরাই ঈশ্বরাদেশ পালনের উপযুক্ত হৃদয়জ্ঞান লাভ করতে পেরেছিলেন।

তাঁর জীর্ণশীর্ণ শরীরে দেখে সহানুভূতিসূচক দু’ একটা কথা বলতে যেতেই গুরুদেব হেসে ব’লে উঠলেন, “দেখ, এরও একটা লাভের দিক আছে। কতকগুলো গেঞ্জি ছোট হ’য়ে গেছে, অনেকবছর ধরে সব পড়ে আছে; এবার সেগুলো পরতে পা’রব।”

গুরুদেবের উচ্ছ্বসিত হাসি শুনে সেণ্ট ফ্রান্সিস্ ড় সেন্সের কথাগুলো শ্রবণ হ’ল, “যে সাধু নিরানন্দ তাঁর জীবনই বৃথা।”

২২শ পরিচ্ছেদ

পাষণ দেবতার হৃদয়

আমার জ্যেষ্ঠাভগিনী রমাদিদি গিরিশ বিদ্যারত্ন লেনে থাকত। অল্প কিছুদিনের ভেত্রে আমি তা'দের বাড়ীতে বেড়াতে গিয়েছিলুম। রমাদিদি এক দিন বল্লে, “দেখ, পতিব্রতা স্ত্রী হিসেবে অনিশ্চয় স্বামীর বিরুদ্ধে আমার কোন নালিশ করা উচিত নয়, কিন্তু দেখি যে, ঠাকুর দেবতায় তাঁ'র একেবারে হতিগতি নেই; আমার একান্ত ইচ্ছে যে সে পথ থেকে তিনি ফিরুন। আমার পূজার ঘরে সাধুসংগীতের ছবিটাবিগুলোকে তাঁ'র উপহাস ক'রে ভারি মজা! ভাইটি আমার, তুমিই তা'তে সাহায্য করতে পারবে এ বিশ্বাস আমার বৈই আছে, কবে কি ভাই?” তাঁ'র এ কাতর অশ্রুনে আমার অন্তর গলে গেল, কারণ আমার বালাভীবনের উপর রমাদিদি একটা খুব আধ্যাত্মিক প্রভাব বিস্তার করেছিল তার মায়ের মৃত্যুর পর সে শূন্যস্থান মেহতালবাসা দিয়ে পূরণ করবার তা'র চেষ্টার আর অবধি ছিল না।

আমি হেসে বল্লুম, “মি.মি, বতদূর পারি আমি তা' ক'রব বই কি, নিশ্চয়ই করব।” আমারও মনে একান্ত আগ্রহ যে শাস্ত, নিরীহ, সদাহাস্যময়ী দিদিটির মুখ হ'তে চিরঅন্ধকার যা'তে হুচাতে পারি।

অন্তরে নির্দেশ পাবার ভেত্রে রমাদিদি তার আমি নীরবে প্রার্থনা করলুম। বছরখানেক আগে রমাদিদি আমায় তা'কে ক্রিয়াযোগে দীক্ষিত করতে বলেছিল, আর তা'তে তাঁ'র উদ্ভৃতিও বেশ হ'ছিল।

মনে একটা প্রেরণা এল। বল্লুম, “দেখ, কালকেই আমি দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরে যাচ্ছি। তুমি আমার সঙ্গে এস, আর জামাইদাবুকেও সঙ্গে আনবার চেষ্টা কো'রো। আমি অন্তরে বেশ টের পাচ্ছি যে, সেই পুণ্যদীঠের পবিত্র প্রভাবেই মা কালী তাঁ'র মন গলিয়ে দেবেন। সঙ্গে আনবার সময় আমাদের উদ্দেশ্য যে কি তা' তাঁ'কে বো'লো না কি, বুঝলে?”

দিদিও আশাবিত্তা হ'য়ে তখনই রাজি হ'য়ে গেল। তা'র পরদিন খুব ভোরে উঠে দেখলুম যে, রমাদিদি আর জামাইবাবু যাবার জন্তে তৈরী। ছাক্‌রাগাড়ী আপার সারকুলার রাস্তা দিয়ে দক্ষিণেশ্বরের দিকে এগোতে লাগল। ভগিনীপতি সতীশচন্দ্র বসু মহাশয় অতীত, বর্তমান আর ভবিষ্যতের আধ্যাত্মিক গুরুদের নিয়ে ঠাট্টা শুরু ক'রে মজা করতে লাগলেন। দেখলুম, রমাদিদি গাড়ীর এক কোণে বসে নীরবে অশ্রুপাত করে চলেছে।

কাণে কাণে বললুম, “দিদি, কিছু ভেব না; জামাইবাবুকে জানুতৈ দিয়ে না যে, তাঁ'র হাঠিঠাট্টা বা রংতামাসা আমরা সত্যিসত্যিই সব বিশ্বাস করছি।”

সতীশবাবু তখন বলছেন, “মুকুন্দ, আরে তোমরা এই সব অপদার্থ বুজুরুকদের কি ক'রে যে ভক্তিতত্ত্ব ক'র, তা' ভেবেই পাই নে। সাধুদের সব চেহারা দেখলেই মুখ ঘুরিয়ে গি'তে হয়। হয় সে পাঁকাটির মত রোগা হবে নইলে একেবারে হাতীর মত মোটা।” বলেই নিজের রসিকতায় নিজেই হো হো করে হেসে উঠে একেবারে হাসিতে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন।

আমিও তেমনি সশব্দে হেসে উঠলুম। আমার ভালমানুষীর প্রতিক্রিয়া হ'ল সতীশবাবুর কাছে অত্যন্ত বিরক্তিকর। তিনি গুম্ হয়ে চুপ ক'রে বসেই রইলেন। আর একটি কথাও বললেন না। দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরপ্রাঙ্গণে গাড়ী প্রবেশ করবার সময় তিনি দত্তবিকশিত ক'রে উপহাসের সঙ্গে বললেন, “তোমাদের দক্ষিণেশ্বর ভ্রমণের উদ্দেশ্য বোধ হয় আমায় সংশোধন করার মতলব, কি বল?”

কোন কথা না বলে যেমনি ফিরে চলেছি, অমনি থপ্ ক'রে হাতটি ধ'রে তিনি বললেন, “ওহে নবীন সন্ন্যাসি, ছপু'রে খাওয়াদাওয়ার ঠিক ব্যবস্থা ক'রে রাখ'বার জন্তে মন্দিরের লোকজনেদের সঙ্গে বন্দোবস্ত করতে ভুলে না যেন।”

তীক্ষ্ণস্বরে উত্তর দিলুম, “এখন আমি ধ্যানে বসতে যাচ্ছি। আপনার খাওয়াদাওয়ার বিষয় আর ভাবতে হ'বে না, মা কালীই সব দেখবেন।”

সতীশবাবু শাসিয়ে বললেন, “তোমার ও মা কালী আমার জন্তে এক চুলও যে কিছু করবেন তা' আমি বিশ্বাস করি না। আমার খাওয়াদাওয়ার ব্যবস্থার জন্তে তুমিই দায়ী, বুঝলে হে ভায়া?”

আমি কালীমন্দিরের নাটমন্দিরের দিকে একলাই চল্লুম। একটা থামের কাছে একটু আড়ালগোছের জায়গা বেছে নিয়ে পদ্মাসনে বসলুম। বেলা যদিও তখন সাতটা। কিন্তু রোদ উঠে পড়লে গরম অসহ্য হ'য়ে উঠবে।

গভীর ধ্যানে মগ্ন হ'য়ে যেতে সারা পৃথিবী যেন আমার মন থেকে মুছে গেল। মনে মনে ভবতারিণীদেবীর ধ্যান করতে লাগলুম। হুগাবতার ক্রীষ্টীরামদ্বন্দ্ব পরমহংসদেব এঁর মূর্তি পূজা আর ধ্যান ক'রেই সিদ্ধিলাভ ক'রে গেছেন। তাঁ'র বুকেরাটা কান্নাতেই মন্দিরের এই পাথরের মূর্তিই জীবন্ত হ'য়ে তাঁ'র সঙ্গে প্রায়ই কথা বলতেন। প্রার্থনা শুরু করলুম, “মাগো, তুমি ত' পাষণ্ডদয়া মা, কথাটি অবধি বল না। কিন্তু তুমিই ত' মা, তোমার প্রিয়ভক্ত রামদ্বন্দ্বদেবের আকুল আহ্বানে জীবন্ত হ'য়ে উঠেছিলে, তবে কেন মা তোমার এই দীনসন্তানের ব্যাকুল ক্রন্দনে কর্ণপাত করছ না?”

আমার গভীরসাধনা উত্তরোত্তর বাড়তে লাগল, সঙ্গে সঙ্গে এল মনে একটা গভীর প্রশান্তি! তবু পাঁচঘণ্টা কেটে গেলেও এবং মা'কে অন্তরে দর্শন করলেও কোনই উত্তর পেলুম না, একটু হতাশ হলুম। প্রার্থনা পূরণ করতে বিলম্ব ক'রে ঈশ্বর মাঝে মাঝে ভক্তকে পরীক্ষা করেন। কিন্তু তিনি শেষ পর্যন্ত তাঁ'র দৃঢ় একনিষ্ঠ ভক্তের কাছে তা'র ইষ্টমূর্তিতেই দেখা দেন। ষ্টানভক্ত দীপ্তখুঁষ্টের মূর্তি দর্শন ক'রে, হিন্দু তা'র আরাধ্যদেবতা শ্রীকৃষ্ণ অথবা মা কালীর দর্শন পায় অথবা কোন মূর্তির আরাধনা না করলে তা'র ক্রমবিকাশমান বিরাটজ্যোতির দর্শনলাভ ঘটে।

অনিচ্ছায় চক্ষুদুটি উন্মুক্ত করলুম, দেখি যে মন্দিরদ্বার একজন পূজারী গালাচাষি দিয়ে বন্ধ করছে, ছুপুয়ে বারবন্ধ করবার সময় এখন। নাট-মন্দিরের সেই নির্জনস্থান হ'তে বেরিয়ে উঠানে গিয়ে দাঁড়ালুম। পাথরের মেঝে মধ্যাহ্ন সূর্যের প্রচণ্ড রৌদ্রকিরণে অগ্নির ত্রায় উত্তপ্ত। খালি পা যেন পুড়ে যেতে লাগল।

মনে মনে নীরব অভিমানে বল্লুম, “জগজ্জননি, তুমি ত' মা আমার দর্শন দিলে না আর এখন ত' তুমি মন্দিরের বন্ধ দরজার পিছনেই লুকিয়ে রয়েলে। ভগ্নীপতির জন্তে যে মা তোমার কাছে বিশেষ প্রার্থনা জানাতে এসেছিলুম। তা' তুমি মা আর শুনলে কই?”

সঙ্গে সঙ্গে আমার অন্তরের প্রার্থনার উত্তর পেয়ে গেলুম। প্রথমতঃ একটি মধুর শীতল শিহরণ আমার পৃষ্ঠদেশের উপর িয়ে ব'য়ে গিয়ে পাল তলা পর্যন্ত পৌঁছল। তা'রপর কি আশ্চর্য্য! মন্দিরটি বিরাট আ-ধারণ করলে আর তা'র দ্বার ধীরে ধীরে উন্মুক্ত হয়ে যা ভবতারিণীর পান-মুক্তি প্রকাশিত হ'ল। ধীরে ধীরে তা' পরিবর্তিত হয়ে একটি জীবন্তমূর্ত্তি পরিণত হ'ল, যুখে কি অপূরণ মধুর হাসি। মাথা নেড়ে যেন আম-ডাকছেন, কি অপরিমিত রোগাক্রান্তী সে আনন্দ! তা' বর্ণনা করবার কোন ভাষা নাই। যেন কোন অশ্রু পিচকারি দিয়ে আমার সমস্ত স্ব-দুঃস্থ হ'তে কে টেনে বার ক'রে নিয়েছে; শরীর একেবারে স্থির হি তা'তে জড়ন নেই।

ব্রহ্মানন্দের তদ্ব্যুৎপত্তি এ'ল। বাঁধারে গঙ্গার উপর িয়ে কয়েক মাইল ধ'রে সব জিনিস স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি, এবং মন্দির ছাড়িয়ে দক্ষিণেশ্বরের চারদিকে সব ভাট। বাড়ীঘরগুলোর দেয়াল সব যেন স্বচ্ছভাবে আলোকিত, তা' ভিতর দিয়ে দেখ'ছি দূরে লোকজনেরা সব চলাফেরা করছে।

যদিও আমার স্বাসপ্রশ্বাস নেই আর শরীরও এমন অদ্ভুত স্থির, তব'ও আগি হাত পা অবলীলাক্রমে নাড়তে পারছিলাম। মিনিট বতক ধ'রে অ-চোখ একবার খুলে আর বুঁজে পরীক্ষা ক'রে দেখলাম। চোখ খোলাই বা আর বন্ধই বা কি, সমানভাবে আমি সারা দক্ষিণেশ্বর গ্রামের সমস্ত দৃশ্য স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি।

আধ্যাত্মিক দৃষ্টি, এতবে'র মতন সব জড়পদার্থেরই ভিতর ভেদ ক'রে যেতে পারে। দিব্যদৃষ্টির কেন্দ্র সর্বত্রই, তা'র পরিধি কোথাও নাই।

সেই রৌদ্রদগ্ধ বিরাট প্রাপনের মধ্যে দাঁড়িয়ে আ-নার নূতনভাবে উপলব্ধি হ'ল যে বৃহদের মতই অহুঃসারশূন্য এই জড়জগতের স্বপ্ন টুটে গিয়ে মা-যখন নিজেকে অমৃতের পুত্র ব'লে তদ্ব্যব করতে পারে তখন আবার সে তা' অনন্তরাজ্য ফিরে পায়। যদি 'মুক্তিই' ক্ষুদ্র ব্যক্তির আদর্শ নাহুয়ের এক-কাম্য হয় তবে কোন মোক্ষই কি সর্বব্যাপিত্বের গৌরবের সঙ্গে উপলব্ধি হ'তে পারে?

দক্ষিণেশ্বরে আমার যে ব্রাহ্মীস্থিতি লাভ হয়েছিল তা'তে দেখ'ছি অসাধারণভাবে বর্দ্ধিত একমাত্র বিরাট বস্তু সব হচ্ছে মন্দির আর তা'

ভিতরকার দেবীমূর্তি। আর সবেই স্বাভাবিক আকৃতি কিন্তু প্রত্যেক জিনিসটি বেন একটা মুহূর্ত আর স্নিগ্ধ আলোরছটা দিয়ে ঘেরা—সাদা, নীল আর বিচিত্র বর্ণের রানধু রঙের। শরীরটা মনে হ'ল বেন বারবীর পদার্থে গড়া। এখনিই হাওয়ায় ভেসে উঠ'বে। আশপাশের সবকিছু যে জড়-পদার্থে তৈরী, তা'র পরিপূর্ণ জ্ঞানও তখন আছে। চারদিকে তাকালুম, আর সে আনন্দস্বপ্ন ভেঙ্গে না দিয়ে ছু এক পা এগোতেও লাগলুম।

মন্দিরের দেওয়ালের পিছনে সহসা দেখা গেল, ভগ্নীপতি একটি বেলগাছ তলায় বসে আছেন। তা'র চিন্তাধারা কোন দিকে বইছে তা' নি না আসেসেই দেখতে পেলুম। দক্ষিণেশ্বরের পুণ্যপ্রভাবে যদিও মন কিছুটা উঁচু হ'য়ে উঠেছিল কিন্তু তবুও আমার প্রতি মনে মনে তা'র বিরাগই সঞ্চিত ছিল। বরাভয়দায়িনী প্রসন্নহাস্তময়ী মা ভবতারিণীর মূর্তির দিকে চেয়ে প্রা না জানালুম, “মা জগজ্জননি। তুমি কি আমার ভগ্নীপতির মতিগতি ফিরিয়ে দেবে না মা?”

সেই অপরাপঙ্কজের দেবীমূর্তি, যা এতাব্যকাল পর্যন্ত নীরবই ছিলেন, অবশেষে কথা বললেন, “তোমার ইচ্ছা পূর্ণই হ'বে।”

অত্যন্ত ভূপ্তি ও সন্তোষের সঙ্গে ভগ্নীপতি সতীশবাবুর দিকে দৃষ্টিপাত করলুম। কোন আধ্যাত্মিকশক্তি তা'র ভিতর কাষ ক'রছে, অস্তরের মধ্যে মহা এই ভাবের উদয় হওয়াতে তিনি অত্যন্ত বিরক্তির সহিত ভূমিআসন ত্যাগ ক'রে উঠে পড়লেন। দেখলুম মন্দিরের পিছনদিক দিয়ে তিনি দৌড়ে আসছেন; ঘুঁসি বাগাতে বাগাতে তিনি আমার দিকে এগিয়ে এলেন।

বিশ্বব্যাপী স্বপ্নদ্রষ্টা বেন কোন মায়াবলে অস্তহিত হ'ল। সেই মহিমময়ী দেবীমূর্তি দৃষ্টিপথে আর রইল না, বির্যাটগগনমুখী মন্দির তা'র স্বাভাবিক আকৃতি ধারণ করলে, সঙ্গে সঙ্গে তা'র স্বচ্ছতাও অস্তহিত হ'ল। আবার পরিশরীর প্রথর রৌদ্রকিরণে বেন দন্ধ হ'তে লাগল। দৌড়ে নাটমন্দিরে গাফিয়ে উঠে পড়লুম। সতীশবাবুও রাগের চোটে সেখানে গিয়ে উপস্থিত হলেন। ঘড়িতে দেখলুম বেলা তখন একটা। দেবীদর্শন একঘণ্টাটাক স্থায়ী ছিল।

ভগ্নীপতি রাগে চিৎকার ক'রে বললেন, “বোকা কোথাকার, ছ'ঘণ্টা ধ'রে ঘুমি চাপটালি খেয়ে আর চোখ কপালে তুলে এখানে ঠায় বসে রয়েছে।

তোমার খোঁজে বার বার এখানে এসেছি আর গেছি! আমাদের খাওয়া কোথায়? এখন ত' মন্দির বন্ধ হ'য়ে গেল আর তুমিও মন্দিরের লোকদের ব'লে রাখ নি, এখন আর খাওয়াদাওয়া জুটবে কি ক'রে?"

দেবীমূর্তির আবির্ভাবে যে পরম আনন্দ পেয়েছিলুম, তা' অন্তরে তখন বর্তমান। পরম নির্ভরতার সঙ্গেই জবাব দিলুম, "না কালীই আমাদের খাওয়াবেন।"

সতীশবাবু ত' ক্রোধে অন্ধ হয়ে চিংকার ক'রে বললেন, "আচ্ছা যে আমি দেবি একবার তোমার মা কালী আগে বন্দোবস্ত না থাকলে কেন ক'রে আমাদের আজ এখানে খাওয়ান!"

তা'র কথা শেষ হ'তে না হ'তে মন্দিরের একজন পূজারী উঠান পেয়ে এসে আমাদের কাছে এসে দাঁড়ালেন।

আমায় ডেকে বললেন, "বাবা, তোমার ধ্যানের সময় দেখলুম তোমার মুখ এক স্বর্গীয় জ্যোতিঃতে উদ্ভাসিত। তোমাদের দল আজ সন্ধ্যা এখানে এসেছে, তা'ও দেখেছি। আর তা' দেখে তোমাদের খাওয়াদাওয়া জন্তে প্রচুর খাবারও গুছিয়ে রেখেছি। অবিশ্রি আগে থাকতে ব'লে রাখলে মন্দিরের নিয়ম অচ্যুতায়ী কাউকে খেতে দেওয়া হয় না, কিন্তু আমরা কাছে তোমাদের কথা আলাদা।"

আমি তাঁকে ধন্যবাদ দিয়ে সোজাসুজি সতীশবাবুর চোখের দিকে তাকালুম। ভাবাবেগে উত্তেজিত হয়ে, নীরব ভ্রূতাপে তিনি নীচের দিকে চোখ নামিয়ে নিলেন। যখন একটি বেশ বিরাটগোছের ভোজ বন্দোবস্ত হ'ল—এমন কি তা'র মধ্যে অসময়ের আম অবধিও ছিল। তখন দেখা গেল যে ভগ্নীপতিমহাশয়ের ক্ষুধা অতি অল্প, প্রায় সব উড়ে গেছে। তাঁর চিত্ত তখন উদ্ভ্রান্ত, চিন্তাসমুদ্রে ডুবে গেছেন। কলকাতায় ফিরে পথে সতীশবাবু অত্যন্ত কোমলভাবে মিনতিসূচক দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে মাঝে তাকাচ্ছিলেন। সতীশবাবুর স্পর্শাঙ্কালনের সাক্ষাৎ উত্তর হিসাবে যখন সেই পূজারীঠাকুর এসে আমাদের খেতে ডাকলেন, সেই মুহূর্তে তিনি আর একটি কথাও বলেন নি।

তা'র পরেরদিন বৈকালে দিদির বাড়ী গেলুম। দিদি সম্মুখে এসে ডেকে উপরে নিয়ে গেল। দিদি কেন্দে ফেলে বললে, "ভাই মুকুন্দ!"

আশ্চর্য্য ব্যাপার জান ? কাল সন্ধ্যাবেলা তোমার ভগ্নীপতি আমার সামনে বসে বসে কাঁদছিলেন ।

“তিনি কি বললেন জান, ‘দেবি তুমি ! আমার এই মতিগতি বদলাবার তোমার ভাইয়ের মতলবে আমি যে কি পর্য্যন্ত সুখী হয়েছি, তা’ আর মুখে ব’লে শেষ করা যায় না । তোমার ওপর যা কিছু আমি অজ্ঞার অবিচার করেছি, তা’র সব আজ আমি প্রায়শ্চিত্ত করব । আজ রাত থেকে আমাদের বড় শোবার ঘরটা পূজোর ঘর বলেই ব্যবহার করব আর তোমার ছোট্ট পূজোর ঘরটি আমাদের শোবার ঘর ক’রে নে’ব । যে নিরঞ্জ ব্যবহার আমি করেছি তা’তে আমি নিজেকে এই শাস্তি দেব যে যতদিন না সাধন-পথে আমি বেশ অগ্রসর হ’তে পারব ততদিন আর আমি মুকুন্দের সঙ্গে কথা বলব না । আজ থেকে মায়ের কাছে গভীরভাবে ধ্যান করব । কোন না কোন দিন নিশ্চয়ই আমি তাঁ’র দর্শন পাব বই কি ।”

বহুবছরবাদে দিল্লীতে ভগ্নীপতির সঙ্গে আমার দেখা হ’য়েছিল । দেখে যতন্তু আনন্দ হ’ল যে, তাঁ’র খুব উচ্চ আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধিত হয়েছে । শুধু তাই নয়, মা’র মূর্তির দর্শনলাভও তাঁ’র ভাগ্যে ঘটেছিল । তাঁ’র সঙ্গে অবস্থানকালে, আমি দেখেছিলুম যে যদিও তিনি তখন একটা গুরুতর অসুখে ভুগছিলেন আর দিনের বেলায় তাঁ’কে অফিসের কাজে থাকতে হ’ত তবুও সতীশবাবু প্রত্যহই রাত্রে অধিকাংশ সময়ই গুপ্তভাবে ধ্যানধারণাতেই যতিবাহিত করতেন ।

মনে কেমন একটা যেন ধারণা এল যে, ভগ্নীপতি আর বেশী দিন ন’ন । দিদি আমার মনের কথা বুঝতে পেরেছিল । বললে, “ভাই, আমি ত’ বেশ ভাল আছি কিন্তু তোমার ভগ্নীপতির যে অসুখ । তুমি জেনে রেখো যে, আমি সতীশ্বী, মরণ আমারই আগে হ’বে । আমার আর বেশীদিন নয়, জেনো ।”

তা’র এই অমঙ্গলসূচক কথায় আমি হতভম্ব হয়ে গেলেও তা’র মধ্যে সত্যের কাঠিন্দ্র অস্বত্ব করলুম । তা’র ভবিষ্যদ্বাণীর প্রায় বছরখানেক বাদে আমার দিদি যখন মারা যায় তখন আমি আমেরিকায় । আমার ছোটভাই কিছু তা’র বিস্মৃত সংবাদ দিয়েছিল ।

বিষ্ণু লিখেছিল, “মরবার সময় রমাদিদি আর সতীশবাবু কলকাতা ছিলেন। যেদিন মারা যান, সেদিন সকালে দিদি সাজলেন যেন বিয়ে কনে। সতীশবাবু জিজ্ঞাসা করলেন, ‘এত সাজগোজ কিসের?’ দিদি বললেন, ‘পৃথিবীতে তোমার চরণসেবার আজ আমার শেষ দিন।’ কিছুক্ষণ বাদেই তাঁ’র বুকধড়ফড়ানি শুরু হ’ল। তাঁ’র ছেলে যখন ডাক্তার ডাকবার জন্তে ছুটে বেরিয়ে যাচ্ছিল, দিদি তা’কে বারণ ক’রে বললেন, ‘বাবা, আমার ছেড়ে কোথাও যেও না। ডাক্তার আর এখন দরকার নেই; তোমার ডাক্তার আসার আগেই আমি চলে যাব।’ মিনিটদশেক বাতাস্বামীর চরণে মাথা রেখে, পরিপূর্ণ শান্তিতে, আর কোন কষ্ট না পেরে রমাদিদি সজ্জানে দেহত্যাগ করেন।”

বিষ্ণু বলেছিল, “দিদি মারা যাবার পর সতীশবাবু একলা থাকতে ভালবাসতেন। একদিন তাঁ’তে আর আমাতে দিদির একটা বড় ফটোগ্রাফ দেখছি, দিদির হাসিমাখা মুখ। দিদি যেন সামনে দাঁড়িয়ে, সতীশবাবু চোঁচিয়ে ব’লে উঠলেন, ‘হাসছ কেন ব’লত? মনে ভেবেছ যে আমার আগে পালিয়ে গেছ ব’লে তুমি বড় চালাক, না? সেটি হ’বে না তা’ জেনে রেখো, দেখিয়ে দেব যে তুমি বেশীদিন আর আমার কাছ থেকে পালিয়ে থাকতে পারবে না। শীগ্গিরই তোমার কাছে যাচ্ছি।”

“যদিও এই সময়ে সতীশবাবুর সম্পূর্ণ রোগমুক্তি ঘটেছিল আর তাঁ’র স্বাস্থ্যও অতি চমৎকার ছিল—কিন্তু সেই ফটোগ্রাফের সামনে তাঁ’র সেই অদ্ভুত উজ্জির অল্প কিছুকাল পরেই তিনি মারা গেলেন। তাঁ’র কোন রোগ ধরা গেল না।”

এমনি ক’রেই দুটি প্রাণ নিঃশেষিত হয়েছিল, একটি আমার সর্ব্বপেক্ষা প্রিয় বড়দিদি রমা আর ভগ্নীপতি সতীশবাবু—দক্ষিণেশ্বরে তাঁ’র পরিবর্তন ঘটেছিল একজন নিতান্ত সাধারণ সংসারীলোক থেকে একটি নীরস সাধুতে।

২৩শ পরিচ্ছেদ

ইউনিভার্সিটির ডিগ্রীলাভ

শ্রীরামপুর কলেজে প্রফেসর ডি, সি, ঘোষাল খুব কড়া লোক ছিলেন। একদিন তিনি বললেন, “দেখ, তোমার ফিলজফির পড়ার বই সব না পড়ে অবহেলা করছ। বোধ হয় মনে করছ যে বিনা পরিশ্রমে তোমার যত্নভূতির জোরেই পরীক্ষায় পাস ক’রে যাবে। কিন্তু বাবু মনে রেখো খেটেখুটে যদি না পড় তুমি, তা’হ’লে তোমার বি, এ, পাস করা কি ক’রে হয় তা’ আমি দেখব।”

ব্যাপার দাঁড়াল এই যে তাঁ’র ক্লাসের টেষ্ট পরীক্ষায় যদি আমি ফেলু করি, তা’ হ’লে আমার ইউনিভার্সিটি পরীক্ষা দেওয়া দায় হবে।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফ্যাকাল্টি দ্বারা এ সব বিধিবদ্ধ। শ্রীরামপুর কলেজ এর এক সংশ্লিষ্ট শাখা। বি, এ পরীক্ষায় একটা বিষয়ে ফেলু করলে পরের বছরে আবার সব বিষয়ে পরীক্ষা দিতে হয়।

শ্রীরামপুর কলেজে আমার প্রফেসররা আমাকে কতকটা দয়া করেই বরদাস্ত ক’রে রেহাই দিয়ে চলতেন। বলতেন, “মুকুন্দ খুব ধর্ম্মিষ্ঠি হয়ে পড়েছে দেখছি।” এই এককথায় আগায় শেব ক’রে দিয়ে আর ক্লাসে কোন পড়ার প্রশ্ন ক’রে আর আমায় বিরত করতেন না। তাঁ’রা ভেবে রেখেছিলেন যে, টেষ্ট পরীক্ষাতেই আমার দফা শেব হয়ে যাবে, আর ইউনিভার্সিটিতে আমায় মার পাঠান হবে না। আমার সহপাঠীরাও আমার উপর তা’দের রায় বার করলে “পাগলা সন্ন্যাসী” এই ডাকনাম আমায় দিয়ে!

দর্শনশাস্ত্রে যা’তে প্রফেসর ঘোষাল আমায় ফেলু না করতে পারেন, তা’র ভেত্রে একটা চালাকি ক’রে রেখেছিলুম। টেষ্ট পরীক্ষার ফল বের হবে এমনি সময় একদিন আমাদের ক্লাসের একটি ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে প্রফেসরের ঘরে গিয়ে ঢুকলুম। যেতে যেতে তা’কে বললুম, “আজকে প্রফেসর

সাহেবকে কি ঠকানটাই না ঠকাই দেখ; তোমাকে সাক্ষী রাখবার জন্তে সবে নিচ্ছি, এসো।”

ঘরে ঢুকে জিজ্ঞাসা করলুম আমার পরীক্ষার খাতায় কত নম্বর উঠেছে। তিনি মাথা নেড়ে বিজয়গর্বে বললেন “তুমি পাস্টাস্ করনি হে বাবু, বুঝলে?” বলেই ডেস্কের উপর একগাদা পরীক্ষার খাতা হাঁটুকাতে ফুট করলেন। খানিক পরেই বললেন, “তোমার খাতা এখানে নাই দেখছি; যা’ক, তুমি নির্ঘাত ফেল্ই করেছ বুঝতে পাচ্ছি—অন্ততঃ পরীক্ষায় হাজির না হয়ে!”

আমি হেসে বললুম “শ্রাব, পরীক্ষা আমি নিশ্চয়ই দিয়েছি, তা’তে আর কোন ভুল নেই; খাতার বাঙালটা আমি একবার দেখতে পারি কি?”

বিক্রান্ত হয়ে পড়ে প্রফেসার মহাশয় ত’ আমায় অনুমতি দিলেন। আমি তখুনিই খাতাটি টেনে বের ক’রে দেখলুম, তা’তে শুধু আমার রোলনম্বর ছাড়া আর কিছু দেওয়া ছিল না। আমার নামের “ধ্বজা” সেখানে দেখতে না পেয়ে প্রফেসর মহাশয় আমার খাতায় খুব ভাল নম্বরই দিয়েছিলেন, যদিও আমার লেখাতে পাঠ্যপুস্তক থেকে কোন “কোটেশন” ছিল না। *

আমার চালাকি টের পেয়ে তিনি গর্জে উঠে বললেন, “ওঃ, তোমার কি কপাল!” তা’রপর কি আর করেন, উপায় নাই দেখে শেষপরীক্ষার কথা মনে পড়াতে পরম নির্ভরতার সঙ্গে বললেন, “ইউনিভার্সিটির পরীক্ষায় তুমি নিশ্চয় ফেল্ মারবে দেখো!”

টেস্টের সময় অগ্নাগ্র বিষয়ে আমি কিছু “কোচিং” পেয়েছিলুম বিশেষতঃ আমার প্রিয়বন্ধু আর খুড়তুতোভাই, খুড়োমশায় সারদাবাবুর ছেলে প্রভাসচন্দ্র ঘোষের কাছ থেকে। তা’তে টেস্টের সব পরীক্ষাগুলোতেই পাস্ করতে পেরেছিলুম—যদিও অতিকষ্টে কোন রকমে পাস্‌মার্ক রেখে।

তা’র পর ত’ বি, এ, পরীক্ষা এগিয়ে এল। পরীক্ষার্থীদের তালিকা নামও বেরুল, কিন্তু হ’লে কি হবে, সেখানে গিয়ে যে পাস্ করব এ আশা

* অবশ্য এ কথা খাঁকার না করলে প্রোফেসার ঘোষালের প্রতি নিতান্তই অবিচার করা হ’বে যে আমাদের মধ্যে যে অপ্রীতিকর সংঘর্ষ ছিল তা’ তা’র দোষ নয়, তা’ হ’চ্ছে আমার ক্লাস থেকে অনুপস্থিতি আর তা’তে অমনোযোগ। প্রফেসর ঘোষাল ছিলেন একজন খাতনামা বাগ্মী আর লক্ষ্য শাস্ত্রে তাঁর পাণ্ডিত্যও ছিল অসাধারণ। পরে অবশ্য আমাদের মধ্যে হৃদয়তার সৃষ্টি হয়েছিল।

মোটাই ছিল না। ইউনিভার্সিটি পরীক্ষার তুলনায় শ্রীরামপুর কলেজের টেষ্টপরীক্ষা ছেলেখেলা। প্রত্যহ শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজির কাছে যাওয়াআসা করতে ত' ক্লাসে ঢোকবার আর বিশেষ সময় পাইনি। ক্লাসে আমার অন্তর্ধানের চেয়ে আবির্ভাবই ছেলেদের মধ্যে বেশী বিশ্বয়ের উদ্রেক করত!

আমার দৈনন্দিন প্রথা ছিল, সকালে সাড়ে ন'টার সময় বাইসাইকেলে চড়ে বেরিয়ে পড়া। একহাতে থাকত গুরুদেবের জন্তে কোন কিছু শ্রদ্ধার্থ্য— হয়ত' বা আমাদের “পাস্তি” ছাত্রাবাসের বাগানের গুটিকতক ফুল। মধুর সন্তোষে আপ্যায়িত ক'রে গুরুজি দুপুরে খেতে আমায় ডাকতেন। সেদিনের কলেজের চিন্তা উড়িয়ে দিয়ে সানন্দে তৎক্ষণাৎ তা' গ্রহণ করতুম। ঘটীর পর ঘটী ধ'রে শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজির সঙ্গে থেকে তাঁ'র অননুক্রমণীয় জ্ঞানোপদেশ শ্রবণ ক'রে বা আশ্রমকর্তব্যসকল পালনে কিছু সাহায্য ক'রে মাঝরাতের কাছাকাছি নিতান্তই অনিচ্ছুক মনে “পাস্তি”র দিকে ফিরে চলতুম। মাঝে মাঝে হয়ত' বা সারারাতই কেটে গেছে গুরুসঙ্গলাভে। কথাবার্তার আনন্দে চিত্ত এত গভীর নিবিষ্ট হ'ত যে, রাত্রের অন্ধকার কেটে গিয়ে কখন যে ভোরের আলো ফুটে উঠেছে তা' টেরই পেতুম না।

একদিন রাত তখন এগারটা, ছাত্রাবাসে ফেরবার উद्यোগে জুতো পরছি, গুরুদেব গভীরভাবে জিজ্ঞাসা করলেন, “তোমার পরীক্ষা কবে শুরু হ'বে?”

“পাঁচদিন পরে, মশায়।”

“সব তৈরী হ'য়েছে ত'?”

ভয়ে কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলুম—হাতের জুতো একহাতে ধরাই রইল। অভিমানগ্ৰস্ত হৃদয়ে বললুম, “মশায়, আপনি ত' জানেন যে প্রফেসরদের চেয়ে আপনারই সঙ্গে আমার পড়ার দিনগুলো কেমন ভাবে কেটেছে। এরকম শক্ত পরীক্ষা দিতে গিয়ে একটা ফাস' ক'রে আর কি হ'বে বলুন?”

শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজির অন্তর্ভেদী দৃষ্টি আমায় বিদ্ধ করলে। কঠিন দৃশ্যেরে তিনি বললেন, “দেখ, আশ্রমজীবনের উপর তোমার টানের জন্তে তোমার বাবা বা তোমার আত্মীয়স্বজনদের কারুর সমালোচনা করবার কোন কারণ ঘটতে আমরা দো'ব না। শুধু প্রতিজ্ঞা কর যে তুমি পরীক্ষায় হাজির হবে। বতটুকু, যা' ভাল পার, তা'ই উত্তর দেবে, কেমন?”

অশ্রুধারা আর বারণ মানলে না, সারা মুখ পরিপ্লাবিত ক'রে দিলে। বুঝলুম যে গুরুদেবের আজ্ঞা অযৌক্তিক আর তাঁ'র আগ্রহে, আর বাই হোক, নিতাস্তই বিলম্ব হয়ে গেছে।

কান্নার ভিতর দিয়ে কোনমতে উত্তর দিলুম, “আপনার যদি ইচ্ছে হয় তবে অবশ্যই পরীক্ষা দেব, কিন্তু ঠিকমত তৈরী হ'বার ত' আর সময় নেই, গুরুদেব।” মনে মনে বললুম, “কি আর ক'রব, খাতাগুলোর পাতা সব কেবল আপনার উপদেশ লিখেই ভরাব।”

তা'র পরদিন যথাকালে আশ্রমে প্রবেশ ক'রে অভ্যস্ত দুঃখার্জুদয়ে আর গভীরভাবে যখন ফুলের তোড়াটি উপহার দিলুম, শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজি আমার শোকাকুলআকৃতি দর্শনে হাস্য ক'রে বললেন, “মুকুন্দ, ভগবান্ কি তোমার কোথাও সাহায্য ক'রতে ভুলে গেছেন, পরীক্ষা কি অথ কোথাও?”

উৎসাহিত হ'য়ে উত্তর দিলুম, “না মশায়।” কৃতজ্ঞস্বৃতির বস্ত্রার প্লাবন এসে পড়ে মনকে পুনরুজ্জীবিত ক'রে তুললে।

গুরুদেব স্নেহকোমল স্বরে বললেন, “দেখ তোমার আলস্য নয়, তোমার ঈশ্বরলাভের জলন্ত আগ্রহই কলেজে সাফল্যলাভের পথে তোমার বাধা হ'য়ে দাঁড়িয়েছে।”

কিছুক্ষণ চুপ ক'রে থেকে বাইবেল থেকে একটা কথা উদ্ধৃত ক'রে গুরুদেব বললেন, “প্রথমে ভগবানের রাজ্যের সন্ধান কর আর তাঁ'র জ্ঞানপরায়ণতার উপর বিশ্বাস রাখ, তা'হ'লে এ সব জিনিসই তোমার এসে যাবে।”

হাজারবারের বার, গুরুদেবের সামনে আমার মনের গুরুভার সঙ্গে সঙ্গে অন্তর্হিত হ'ল। সকাল সকাল খাওয়াদাওয়া শেষ হ'লে তিনি আমার “পাস্তি”তে ফিরে যেতে ব'লে জিজ্ঞাসা করলেন, “তোমার বন্ধু রমেশ চর দত্ত কি এখনও তোমাদের ছাত্রাবাসে থাকে?”

“আজ্ঞে হ্যাঁ।”

“তা'র কাছেই যাও; তোমায় পরীক্ষাতে সাহায্য ক'রবার জন্তে ঠাকুরই তা'র মনে প্রেরণা জাগিয়ে দেবেন, তোমার কোন ভাবনা নেই।”

“আচ্ছা বেশ, গুরুজি; কিন্তু রমেশ বড় ব্যস্ত। বি, এ, তে অন্য' নিয়েছে, বইও আমাদের চেয়ে পড়তে হয় চের বেশী।

গুরুদেব আমার আপত্তিতে কর্ণপাত না ক'রে বললেন, “তোমার জন্তে রমেশের ঠিক সময় হবে দেখো। এখন যাও দিকিন।”

বাইসাইকেলে “পাস্তি”তে ফিরলুম। ছাত্রাবাসে ঢুকে প্রথমেই নজরে পড়ল আমাদের ক্লাসের ভালছেলে রমেশ। আমার অত্যন্ত কুণ্ঠিত অনুরোধ সে খুব খুসী হয়েই রাখবে বললে,—যেন তা'র দিনগুলো একেবারে খালি, হাতে কোন কাযকর্ম নেই! বললে, “নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই, তোমার কায ক'রে দো'ব বই কি।”

সেইদিন বিকাল হ'তেই আর তা'রপর দিনকতক ধ'রে কয়েক ঘণ্টা ক'রে আমার নানাবিষয়ে সে আমার পরীক্ষার জন্তে প্রস্তুত হ'তে সাহায্য ক'রে যেতে লাগল।

রমেশ বললে, “আমার মনে হয় যে, ইংরেজিসাহিত্যে চাইল্ড্‌ হারল্ডের ভ্রমণপথের বর্ণনা থেকে প্রশ্ন আসতে পারে। আমাদের ত' এখুনি একটা মানচিত্র চাই।”

তাড়াতাড়ি খুড়োমশায় সারদাবাবুর বাড়ীতে গিয়ে একটা ম্যাপের বই সংগ্রহ ক'রে আনলুম। বায়রণের পরিভ্রমণকারী যে যে পথ দিয়ে গিয়েছিল, রমেশ ইউরোপের ম্যাপে পথের সেই সেই জায়গা সব দাগ দিয়ে দিলে।

রমেশের “কোচিং” শোনবার সময় জনকতক ছেলে সেখানে জড় হ'য়েছিল। সেশনের শেষে তা'দের মধ্যে একজন বললে, “রমেশ তোমায় ভুল খবর বাত'লাচ্ছে! সাধারণতঃ পঞ্চাশ নম্বর বই থেকে থাকে আর বাকী পঞ্চাশ লেখকদের জীবনী থেকে।”

তা'র পরদিন যখন ইংরেজী সাহিত্যের পরীক্ষা দিতে বসলুম, প্রশ্নগুলোর উপর আমার প্রথম দৃষ্টিপাতেই রুতজ্ঞাশ্রু ঝ'রে পড়ে পরীক্ষার খাতা ভিজিয়ে দিতে লাগল। গার্ড আমার টেবিলের কাছে এসে দাঁড়িয়ে সহানুভূতির সহিত কারণ কি জিজ্ঞাসা করতে বললুম, “আমার গুরুদেব বলেছিলেন যে রমেশ আমায় পরীক্ষায় খুব সাহায্য করবে। দেখুন, রমেশ আমায় যে সব প্রশ্নগুলো ব'লে দিয়েছিল, ঠিক সেই সবগুলোই আজ এসে গেছে। আমার বরাতজোরে ইংরেজিসাহিত্যের লেখকদের সম্বন্ধে প্রশ্ন এ বছরে অতি অল্পই এসেছে; আর তা'দের জীবনী, অন্ততঃ আমার কাছে তা' একেবারে অজানা।”

পরীক্ষা দিয়ে যখন ফিরলুম, ছাত্রাবাসে তখন একটা যেন হুল্লোড় পড়ে গেল। যে ছেলেগুলো রমেশের “কোচিং” নিয়ে ঠাট্টা ক’রছিল, তা’রা আমার দিকে একটু সম্মানের সঙ্গেই চাইলে। তা’দের সোল্লাস অভিনন্দনে কাণে তাল লাগবার জোগাড়! পরীক্ষার সপ্তাহে রমেশের সঙ্গে বহুঘণ্টা কাটাতে হ’ত আর সেই সময় সে পরীক্ষকদের কাছ থেকে যে সব প্রশ্ন পড়বার সম্ভাবনা সেই সব সে বাতলে দিত। দিনের পর দিন রমেশ যে ধরনের প্রশ্ন বাতলে দিত, সেই একই ধরনের প্রশ্ন পরীক্ষায় আসছে দেখা যেত!

কলেজে একটা হৈট প’ড়ে গেল যে, অলৌকিকগোছের একটা কিছু ব্যাপার ঘটছে, আর এই উদাসী “পাগলা সন্ন্যাসীর” জন্তে সফলতার সম্ভাবনা খুবই। আমি অবশ্য এ ঘটনার কোন বিষয় গোপন রাখবার কিছু চেষ্টা করিনি। ইউনিভার্সিটি থেকে প্রশ্নপত্র এসেছে, কাষেই স্থানীয় প্রফেসররা তা বদলাতে একেবারেই অক্ষম।

ইংরেজি সাহিত্যে পরীক্ষার বিষয়ে, তাবতে গিয়ে একদিন সকালে টেবিলে পেলুম যে আমি একটা অত্যন্ত গুরুতর ভুল ক’রে এসেছি। প্রশ্নপত্রের একটা অংশ দুইভাগে বিভক্ত করা ছিল, এ কিছা বি, আর সি কিছা ডি। প্রত্যেক গ্রুপ থেকে একটা ক’রে প্রশ্নের উত্তর না লিখে ভুল ক’রে একই গ্রুপের এক সঙ্গে দুটো প্রশ্নেরই উত্তর লিখে দিয়ে এসেছি। এখন উপায়! আর উপায়!

সেই খাতায় খুব জোর বেশী নম্বর পেতে পারি ত’ ৩৩,—কিন্তু পাসমার্ক হচ্ছে ৩৬। তিন নম্বর কম পড়ছে। দৌড়লুম গুরুদেবের কাছে আমার দুঃখের কাহিনী তাঁ’র কাছে নিবেদন করতে! বললুম, “মশায়, আমার ত’ দেখছি পরীক্ষায় এক অমার্জ্জনীয় অপরাধ ঘটে গেছে। রমেশের ভিতর দিয়ে ভগবানের করুণা পাবার আমি অধিকারী নই। দেখছি যে আমি একান্তই অল্পপণ্ডিত।

“কিছু ভেবো না, মুকুন্দ!” শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজির কণ্ঠস্বর একেবারে লঘু আর নিরুদ্বেগ। তিনি নীল আকাশের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে দেখিয়ে দিয়ে বললেন, “আকাশে চন্দ্রস্বর্য্য তা’দের স্থান পরিবর্তন করতে পারে কিন্তু পরীক্ষায় তোমায় কেউ ফেলু করাতে পারবে না, তা’ দেখে রেখো।”

হিসেবেতে হাদিস পাওয়া যায় না যে আমি কি করে পাস করব, তবু আমি

অপেক্ষারত শান্তমনে আশ্রম ত্যাগ করলুম। সভ্যদৃষ্টিতে আকাশের দিকে দু'একবার তাকালুম; দিনমণি তাঁ'র স্বস্থানে স্পষ্টভাবে আসীন, স্থান পরিবর্তনের কোনই লক্ষণ নাই।

“পাস্টি”তে পৌঁছতে ক্লাসের একটি ছেলের মস্তব্য কাণে গেল, “এই মাত্র শুনলুম যে এবছরে এই প্রথম ইংরেজির পাসমার্ক কমিয়ে দেওয়া হয়েছে।” রুডের মত সেই ছেলেটির ঘরে প্রবেশ করতে ছেলেটি ত' ভয় পেয়ে আমার দিকে তাকালে। সাগ্রহে সবকথা তা'কে জিজ্ঞাসা করলুম।

হেসে বললে “ওহে জটাবারি সন্ন্যাসি, তোমার আবার এসব লেখাপড়ার খবরের ঠাঁও কি দরকার পড়ল? আর এখন কেঁদে কি ফল, বল? তবে একথা সত্যি যে পাস মার্ক ৩৩শে নামিয়ে দেওয়া হয়েছে।”

আনন্দে লাফাতে লাফাতে আমার ঘরে ফিরে এসে নতজানু হ'য়ে সেই পরম করুণাময়কে অন্তরের অন্তস্থল হ'তে উচ্ছসিত রুতজ্ঞতাভরে ভক্তিতে প্রণাম জানালুম।

প্রত্যাহই যে রমেশের ভিতর দিয়ে একটা আধ্যাত্মিক শক্তি কাষ করছে তা' অতি পরিষ্কারভাবে বুঝতে পেরে আমি পুলকে রোমাঞ্চিত হয়ে উঠতুম। বাঙ্গলা পরীক্ষার বিষয়ে কিন্তু একটা অপূর্ব ব্যাপার ঘটেছিল। রমেশ বাঙ্গলাটা খুব অল্পই নাড়াচাড়া করেছিল।

একদিন সকালে বোর্ডিং হাউস ছেড়ে বেরিয়েছি পরীক্ষা হলের দিকে, রমেশ আমাকে পিছন থেকে ডাকলে।

ক্লাসের একটি ছেলে আমায় বললে, “ঐ দেখ, রমেশ তোমায় ডাকছে। আর ফিরে কাষ নেই, হলে পৌঁছতে দেরী হয়ে যাবে।” তা'র পরামর্শ উপেক্ষা ক'রে আবার বাড়ীর দিকে ছুটলুম। রমেশ বললে, “বাঙ্গালী ছেলেদের অবশ্য বাঙ্গলাটা পাস করা সাধারণতঃ খুব সহজ। কিন্তু আমার মনে হচ্ছে কি জান? এবছর পরীক্ষকেরা মতলব করেছেন যে প্রাচীন সাহিত্য থেকে প্রশ্ন দিয়ে ছেলেদের একেবারে ফাঁসিয়ে দেবেন। বন্ধুবর তা'রপর দয়ার সাগর বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জীবনী থেকে দুটি গল্প সংক্ষেপে বিবৃত করলে।

রমেশকে ধন্যবাদ দিয়ে তাড়াতাড়ি বাইসাইকেলে চেপে কলেজ হলের দিকে দৌড়লুম। বাঙ্গলা পরীক্ষার প্রশ্নপত্রে দুটো অংশ ছিল। প্রথম

প্রশ্ন ছিল, “বিদ্যাসাগর মহাশয়ের দয়ার দুইটি উদাহরণ লিখ।” সবেমাত্র শোনা গল্প দুটি লিখতে লিখতে মনে মনে অসংখ্য ধন্যবাদ দিলুম যে রমেশের শেষ মুহূর্তের ডাক শুনে যে কি ভালই না করেছি! বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মানবজাতির প্রতি করুণার (শেষ পর্য্যন্ত আমিও এর অন্তর্গত) বিষয় যদি না জানতুম, তা’ হ’লে বাঙ্গলায় আমার পাস্ করাই দুর্ঘট হ’ত! একটা বিষয়ে ফেল্ ক’রে ত’ আবার পরের বছরে আমায় সব বিষয়েই পরীক্ষা দিতে হ’ত। এ অতি নিন্দার ব্যাপার।

দ্বিতীয় প্রশ্ন ছিল, “যে ব্যক্তি তোমায় সব চেয়ে বেশী অল্পপ্রাণিত করেছেন তাঁ’র বিষয় একটি রচনা লিখ।” ভদ্র পাঠক, রচনার বিষয়ে ক’র না নির্বাচন ক’রেছিলুম তা’ বোধ হয় আর এখন ব’লে দিতে হ’বে না। পাতার পর পাতা যখন আমি গুরুর প্রতি শ্রদ্ধানিবেদনে ভরিয়ে তুলছিলাম তখন আমি মনে মনে এই ভেবে হাসলুম যে, আমার এই স্বগতঃ ভবিষ্যদ্বাণী ফলে যাচ্ছে যে, “পরীক্ষার খাতার পাতা সব আপনার শিক্ষার উপদেশেই ভরিয়ে তুলব।”

ফিলজফির বিষয়ে আর রমেশকে বিশেষ কোন প্রশ্ন করি নি।

শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজির অধীনে দীর্ঘকাল শিক্ষালাভ ক’রে আমি পাঠ্যপুস্তকের ব্যাখ্যা নিরাপদেই পরিত্যাগ করেছিলুম। সবচেয়ে বেশী নয় যদি কোথাও পেয়ে থাকি ত’, ফিলজফিতে। আর আর বিষয়ে অতিক্রম কেবল মাত্র পাসমার্ক রাখতে পেরেছিলুম।

আজ অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গেই জানাচ্ছি যে আমার নিঃস্বার্থ বন্ধু রমেশ তাঁ’র ডিগ্রি খুব উচ্চ প্রশংসার সঙ্গেই লাভ করেছিল।

গ্রাজুয়েট হ’তে পিতার মুখ হাসিতে উৎফুল্ল হয়ে উঠল। এই ব’লে তিনি স্বীকার করেছিলেন “মুকুন্দ, তুমি তোমার গুরুর সঙ্গে এত সময় কাটাও যে, তুমি যে আদৌ পাস্ করতে পারবে, তা’ মোটেই ভাবতে পারি নি।” গুরুদেব কিঞ্চিৎ পিতার নীরব মনোভাব ঠিকই ধরতে পেরেছিলেন।

বহুবছর ধ’রে আমার মনে একটা অনিশ্চয়তা ছিল যে, আমার নামের পিছনে বি, এ, অক্ষর দু’টি কখনও দেখতে পা’ব কি না। অক্ষর দু’টি বসাতে গিয়ে আমি সর্বদাই ভাবি যে এ ভগবানের দান, কি কারণে তিনি আমার

দিগ্বেছেন তা' জানি না। মাঝে মাঝে আমি কলেজের ছেলেদের কাছ থেকে শুনি যে, গ্রাজুয়েট হ'বার পর তা'দের মুখস্থবিদ্যা অতি অল্পই অবশিষ্ট আছে। আমার লেখাপড়ার অসম্পূর্ণতায় অবশ্য এই স্বীকারোক্তি কতকটা আমার সাক্ষ্য দেয়।

ইউনিভার্সিটি হ'তে যে দিন ডিগ্রি নিয়ে এলুম সেদিন তাঁ'র জীবন হ'তে অজস্র আশীষধারা আমার জীবনের উপর ঝরে পড়ছে ব'লে তাঁ'র চরণে নতজাহ্নু হয়ে প্রণাম জানিয়ে এলুম। তিনি পরিতুষ্ট হ'য়ে বললেন, "ওঠ, ওঠ, মুকুন্দ, ঠাকুর দেখলেন যে, চক্ষুস্বর্ঘ্যের গতি বদলানর হাঙ্গামার চেয়ে তোমার গ্রাজুয়েট বানিয়ে দেওয়াই ঢের সহজ, তা'ই তোমায় গ্রাজুয়েটই ক'রে দিলেন!"

২৪শ পরিচ্ছেদ

সন্ন্যাস গ্রহণ

বহু দিনের আশা হৃদয়ে বহন ক'রে একদিন গিয়ে বল্লুম, “গুরুদেব, বাবার একান্ত ইচ্ছে যে বেঙ্গল নাগপুর রেলওয়েতে একটি এক্সিকিউটিভ পোষ্ট আমি নিই। কিন্তু আমি তা' একেবারে প্রত্যাখ্যান ক'রে এসেছি, আপনি আমার সন্ন্যাস দিন,” ব'লে অত্যন্ত কাতরনয়নে তাঁ'র দিকে চেয়ে রইলুম। আগে আগে বরাবরই তিনি আমার এ অনুরোধ এড়িয়ে এসেছেন, আমার মনের দৃঢ়তা পরীক্ষা করবার জন্তে। আজকে কিন্তু তিনি প্রসন্নহাসি হাসলেন।

শাস্ত্র স্নিগ্ধস্বরে সহাস্ত্রে তিনি বল্লেন, “আচ্ছা, কালই তোমায় সন্ন্যাস দে'ব। সন্ন্যাস নেবার ইচ্ছে যে তোমার অটুট আছে তা'তে আমি খুব খুসী হয়েছি। লাহিড়ীমশায় প্রায়ই বলতেন, ‘জীবনের বসন্তে যদি তুমি ভগবানকে ডেকে না আন, তবে শীতে তিনি আসবেন কেন ব'ল ?’”

“শ্রদ্ধেয় গুরুদেব, আপনি সন্ন্যাস নিতে যেমন বিন্দুমাত্র বিচলিত হ'ন নি, আমিও তেমনি কখনও হই নি,” ব'লে অপরিসীম ভক্তি ও শ্রদ্ধাঘিত স্বলয়ে তাঁ'র দিকে চেয়ে হাসলুম।

বাইবেলে আছে, “অবিবাহিত লোকে ঈশ্বরসম্পর্কিত বিষয়েরই চিন্তা ক'রে, কি ক'রে সে ভগবানকে সন্তুষ্ট করবে; আর বিবাহিত লোকের সাংসারিক বিষয়েরই চিন্তা করে, কি ক'রে সে স্ত্রীকে সন্তুষ্ট ক'রতে পারবে।” আমার বহু বন্ধুর জীবন পর্যালোচনা ক'রে দেখেছি, যা'রা আধ্যাত্মিক শিক্ষা ও জীবনের মধ্য দিয়ে গিয়ে শেষ পর্য্যন্ত বিয়েই ক'রে ফেললে তা'রপর সংসারের বোঝা ঘাড়ে পড়তে তা'দের গভীর ধ্যানধারণার প্রতিভা সব তা'রা একেবারে ভুলে গেল।

জীবনে ঈশ্বর গোণ বা অপ্রধান স্থান অধিকার ক'রে থাকবেন, এ চিন্তা

আমার কাছে একেবারে অসহ্য। যদিও তিনি নিখিল ভুবনের অধিপতি, যদিও জন্মজন্মান্তরের মধ্য দিয়ে তাঁ'র অবাচিত করুণার ধারা আমাদের জীবনের উপর বর্ষিত হ'য়ে তা'কে পরিপূর্ণ সার্থকতার পথে এগিয়ে নিয়ে চলেছে, তবুও একটা জিনিস আছে যা' তাঁ'র অধিকারে নাই আর যা' দান করা বা না করার অধিকার প্রত্যেক মানুষের আছে—সেটা হচ্ছে মানবপ্রেম। সৃষ্টির প্রতি অণুপরমাণুতে তাঁ'র অস্তিত্ব রহস্তাবৃত করবার উদ্দেশ্যে স্রষ্টা কি অসীম যত্নই না নিয়েছেন—তা'তে তা'র একমাত্র অভিপ্রায় ছিল, তা' একটা সংবেদন-শীল ইচ্ছা বা'তে ক'রে মানুষ তা'র স্বাধীন ইচ্ছা দিয়েই তাঁ'র সন্ধান করবে। তাঁ'র সর্বশক্তিমন্তর বজ্রসৃষ্টি প্রত্যেক জিনিসের সহজসাধ্যতাবের কি কুসুম-পেলবতায়ই না ঢেকে রেখেছেন।

তা'র পরেরদিন হচ্ছে আমার জীবনের একটি সবচেয়ে অরণীয় দিন। সেদিনের কথা আজও আমার মনে আছে। কলেজ থেকে বেরুবার কয়েক হপ্তা পরেই—সেদিন ১৯১৪ সালের জুলাই মাসের এক বৃহস্পতিবার, সূর্য্য-করোজ্জল দিবস। শ্রীরামপুরের আশ্রমের তিতরকার বারান্দায় গুরুদেব একখণ্ড সাদাসিদ্ধ গৈরিকবর্ণে রঞ্জিত করলেন—সন্ন্যাসীর গৈরিক বসন। শুকিয়ে গেলে গুরুদেব তা' দিয়ে আমার সর্বাঙ্গ আচ্ছাদিত ক'রে দিয়ে বললেন, “একদিন তোমায় পশ্চিমে যেতে হ'বে যেখানে সিদ্ধই লোকে বেশী পছন্দ ক'রে। প্রচলিত স্তোত্রের কাপড়ের বদলে নিদর্শনস্বরূপ তোমার জন্তে আমি এই সিদ্ধই বেছে নিয়েছি।”

অবশ্য ভারতবর্ষে যেখানে ভিক্ষাই সন্ন্যাসীর উপজীবিকা, সেখানে রেশম-বস্ত্রাবৃত সন্ন্যাসী একটা অসাধারণ দৃশ্য বটে। অনেক যোগীই কিন্তু সিদ্ধের আচ্ছাদন পরিধান করেন, তা'তে ক'রে তুলোর চেয়ে বেশী তা'দের শরীরের স্পন্দশক্তিপ্রবাহ রক্ষা করে।

শ্রীযুক্তেশ্বরগিরিজি বললেন, “আমি ওসব অনুষ্ঠানটুছুষ্ঠান পছন্দ করি না। আমি তোমায় বিদ্যুৎ উপায়ে (বিনা অনুষ্ঠানে) সন্ন্যাস দেব।”

‘বিবিদিবা’ অর্থাৎ সানুষ্ঠানিক দীক্ষাতে হোম প্রভৃতি করতে হয়, তা'র মধ্যে প্রতীক শ্রাদ্ধও শেষ করতে হয়। এতে ক'রে শিষ্যের জড়দেহ মৃত বলেই গণ্য ক'রা হয়—জ্ঞানায়িতে দক্ষ! নবদীক্ষিত সন্ন্যাসী পরে একটি মন্তোচ্চারণ করেন, যথা,—“অন্নমাত্মা ব্রহ্ম” অথবা “তত্ত্বমসি” কিম্বা “সোহং”।

শ্রীযুক্তেশ্বরগিরিজি কিন্তু সরল অনাড়ম্বরভাবে, সব লৌকিকবিধি পরিহার ক'রে কেবলমাত্র আমায় একটি নূতন নাম নির্বাচন ক'রে নিতে বল্লেন।

তিনি হেসে বল্লেন, “তুমি নিজে নিজেই নাম বেছে নেবে এ বিশেষ অধিকার আমি তোমায় দিচ্ছি।”

মুহূর্তমাত্র চিন্তা ক'রে আমি বল্লুম, “যোগানন্দ”।

“তাই হোক! আজ থেকে তুমি সাংসারিক জীবনের নাম মুকুন্দলাল ঘোষ পরিত্যাগ ক'রে স্বামী সম্প্রদায়ের গিরি উপাধি নিয়ে যোগানন্দনামে অভিহিত হ'বে।”

নতজানু হ'য়ে শ্রীযুক্তেশ্বরগিরিজির পদতলে প্রণাম করতে, সর্বপ্রথম তাঁর মুখ থেকে আমার নূতন নাম শুনে, আমার সর্ব্বশরীর ক্লান্ততার উচ্ছ্বাসিত হয়ে উঠল। কত স্নেহের সঙ্গে কত অক্লান্তভাবে তিনি পরিত্রা ক'রে এসেছেন. যা'তে ক'রে বালক মুকুন্দ কোন দিন সন্ন্যাসী যোগানন্দতে পরিণত হ'তে পারে। আনন্দে আমি শঙ্করাচার্য্যের স্তোত্র হ'তে কবের ছত্র আবৃত্তি করলুম :—

“ওঁ মনোবুদ্ধ্যহঙ্কারচিত্তানি নাহং ।

ন চ শ্রোত্র ন জিহ্বে ন চ শ্রাণনেত্রে ॥

ন চ ব্যোম ভূমিন' তেজো ন বায়ুঃ ।

চিদানন্দরূপঃ শিবোহহং শিবোহহম্ ॥১॥

অহং শ্রাণসংজ্ঞো ন বৈ পঞ্চবায়ু— ।

ন' বা সপ্তধাতু ন' বা পঞ্চ কোষাঃ ॥

ন বাক্পাণি পাদং নচোপস্থপায়ু— ।

শ্চিদানন্দরূপঃ শিবোহহং শিবোহহম্ ॥২॥

ন পুণ্যং ন পাপং ন সৌখ্যং ন দুঃখম্ ।

ন মন্ত্রো ন তীর্থং ন বেদা ন যজ্ঞাঃ ॥

অহং ভোজনং নৈব ভোজ্যং ন ভোক্তা ।

চিদানন্দরূপঃ শিবোহহং শিবোহহম্ ॥৩॥

ন মে দ্বেষরাগৌ ন মে লোভমোহৌ ।

মদো নৈব মে নৈব মাৎসর্য্যভাবঃ ॥

ন ধন্যো ন চার্থো ন কামো ন মোক্ষ— ।
 শিচদানন্দরূপঃ শিবোহহং শিবোহহম্ ॥৪॥
 ন মৃত্যু ন শঙ্কা ন মে জাতিভেদঃ ।
 পিতা নৈব মে নৈব মাতা ন জন্ম ॥
 ন বন্ধু ন মিত্রং গুরুনৈব শিষ্য— ।
 শিচদানন্দরূপঃ শিবোহহং শিবোহহম্ ॥৫॥
 অহং নির্বিকল্পো নিরাকাররূপো ।
 বিভুত্বাচ্চ সর্বত্র সর্বেন্দ্রিয়াণাম্ ॥
 ন বা বন্ধনং নৈব মুক্তি ন ভীতি— ।
 শিচদানন্দরূপঃ শিবোহহং শিবোহহম্ ॥৬॥

স্বামী উপাধিধারী প্রত্যেক সন্ন্যাসীই শঙ্করাচার্য্য প্রতিষ্ঠিত অদ্বৈতবাদী প্রাচীন দশনামী সম্প্রদায়ের একজন। যেহেতু প্রচলিত প্রথানুযায়ী উক্ত সঙ্ঘবদ্ধ সম্প্রদায়ের মধ্যে সাধুসন্তদিগের প্রতিনিধিস্বরূপ সক্রিয় পরিচালকদের ধারা অব্যাহত, সেইহেতু কোন ব্যক্তি নিজেকে নিজে স্বামী উপাধি দিতে পারেন না। তিনি কেবল অপর কোন স্বামীউপাধিধারী সাধুর নিকট হ'তে স্বাধিকার-বলে উক্ত উপাধি লাভ ক'রতে পারেন। এই রকমে সব সন্ন্যাসী তাঁ'দের আধ্যাত্মিক ধারা একমাত্র সাধারণ গুরু শঙ্করাচার্য্য দেব হ'তে অল্পসরণ করেন। দারিদ্র্য-বরণ, সাধুজীবনযাপন এবং দীক্ষাগুরুর প্রতি আনুগত্যে অনেক ক্যাথলিক খৃষ্টান দের মধ্যেও স্বামীসম্প্রদায়ের আদর্শের সঙ্গে অনেক সামঞ্জস্য দেখতে পাওয়া যায়।

সাধারণতঃ “আনন্দ”ান্ত নূতন নাম গ্রহণ ক'রে স্বামীজি দশনামী সম্প্রদায়ের একটি উপাধি গ্রহণ ক'রেন, যা'তে ক'রে বোঝায় যে উক্ত সম্প্রদায়ের সঙ্গে তাঁ'র লৌকিক সম্বন্ধ আছে। দশনামীদের ভিতর, “গিরি”উপাধি শ্রীযুক্তেশ্বর-জির ছিল, স্মরণ্য আমারও তা'ই। অপরাপর শাখার নাম সাগর, ভারতী, অরণ্য, পুরী, তীর্থ, সরস্বতী প্রভৃতি।

কোন “স্বামী”র নূতন নাম গ্রহণের মধ্যে দুটি মানে আছে—কোন ঐশী ভাব বা দৈবাবস্থার মধ্য দিয়ে যথা, প্রেম, জ্ঞান, ভক্তি, কর্মযোগ এবং প্রকৃতির অনন্তবিস্তার যেমন সাগর, পর্বত বা আকাশের বিরাটস্থের সঙ্গে সামঞ্জস্যবোধে তাঁ'র আনন্দলাভের অবস্থা বোঝায়।

নিখিল মানবজাতির প্রতি নিঃস্বার্থ সেবা এবং ব্যক্তিগত আশাআকাঙ্ক্ষার বন্ধনপরিহারের আদর্শ স্বামীসম্প্রদায়ের অধিকাংশকে ভারতবর্ষে মানব-হিতৈষণা এবং শিক্ষাবিষয়ককার্যে সক্রিয়ভাবে লিপ্ত রাখে, কখনও কখনও ভারতের বাইরেও এঁদের বহু কার্যকলাপের প্রকৃষ্ট পরিচয় মেলে। জাতি-ধর্মবর্ণনির্বিশেষে ইঁহারা বিশ্বমানবভ্রাতৃত্বের আদর্শ অমূল্যস্বরূপ ক'রে চলেন। তাঁ'র চরমলক্ষ্য নির্বাণমোক্ষ। শয়নে স্বপনে ভ্রমণে “সোহং” এই জ্ঞানে উদ্ভূত হ'য়ে তিনি এই সংসারেই চলাফেরা করেন বটে কিন্তু এ সংসারে কেউ হ'য়ে নয়। এইরূপে তিনি “স্ব” অর্থাৎ আত্মার সহিত একীভূত হ'য়ে নামের সার্থকতা সম্পাদন করেন। অবশ্য বলাই বাহুল্য যে, সকল “স্বামী” উপাধিধারী ব্যক্তিরাই তাঁ'দের চরম লক্ষ্যস্থলে পৌঁছতে পারেন যে তা' নয়।

শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজি, সন্ন্যাসী এবং যোগী উভয়ই ছিলেন। সন্ন্যাসী হ'লেই যে যোগী হ'য় তা' নয়—ঈশ্বরসঙ্গলাভের জন্য যেকোন ব্যক্তি বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ায় সাধন ক'রে যোগী হ'তে পারে, হোক না কেন সে বিবাহিত কি অবিবাহিত বা কোন বিশিষ্টধর্মসম্প্রদায়ভুক্ত। সন্ন্যাসীর পথ গুরুজ্ঞান, নিম্পৃহ কঠিন ত্যাগের পথ; কিন্তু যোগী সুনির্দিষ্ট পন্থা অবলম্বন ক'রে ক্রমপ্রচেষ্টায় সাধনপথে অগ্রসর হ'তে থাকেন, যা'তে ক'রে তাঁ'র দেহ মন সুনিয়ন্ত্রিত ও সুশিক্ষিত হ'বার পর আত্মারও মোক্ষসাধন হয়। যোগীরা ভাবাবেগে পরিচালিত বা কোন বিশ্বাসের বশবর্তী হ'য়ে কোন স্থিরসিদ্ধান্তে উপনীত না হ'য়ে প্রাচীন ঋষিপরিকল্পিত সুপরীক্ষিত প্রণালীসমূহ অবলম্বনে যোগপ্রক্রিয়া সাধন ক'রেন। এই যোগসাধনেই ভারতবর্ষে যুগে যুগে বহু সাধুসন্ন্যাসী যোগাবতার রূপে প্রসিদ্ধিলাভ করেছেন।

বিজ্ঞানের মত যোগও দেশকালপাত্রের আবদ্ধ নয়। কতকগুলি অজ্ঞ লেখকদের ধারণা যে, “প্রতীচ্যের লোকেদের পক্ষে যোগ একেবারেই অসুপোযোগী” তা' একেবারেই ভুল, আর এ ধারণা প্রচার ক'রে প্রতীচ্যের আগ্রহশীল, শ্রদ্ধাবান, সমুৎসুক শিক্ষার্থীদের এর বহুবিধ শুভফল পাবার পক্ষে যে কি শোচনীয় প্রতিবন্ধক হ'য়েছে তা' আর বলা যায় না। সকল দেশের সকল জাতির মানুষের মনে যে উচ্ছৃঙ্খল চিন্তাধারা, যা' তাঁ'র আপন স্বরূপের পরিচয় নিতে গেলে, সমানভাবে সকলেরই জন্য প্রতিবন্ধকরূপে উপস্থিত হয়—সেই উচ্ছৃঙ্খল চিন্তারাশিকে সংযত করার, সুনিয়ন্ত্রিত করার বিধি

নিবিদ্ধ প্রণালীই হ'চ্ছে যোগ। স্বর্ষ্যের যেমন নিরপেক্ষ অবাধ আলোর পূর্ব-পশ্চিমের কোন ভেদ নাই, যোগেরও তেমনি দেশকালপাত্রের কোন ভেদাভেদ নাই। মানুষের মনে যতদিন অসংযত উচ্ছৃঙ্খল চিন্তার ধারা প্রবাহিত থাকবে, পৃথিবীতে যোগের বা সংঘেরও ততদিন প্রয়োজন থাকবে।

পতঞ্জলি ব'লে গেছেন, “যোগশ্চিন্তাবৃত্তিনিরোধঃ”। হিন্দু বড়দর্শনের মধ্যে তাঁ'র সংক্ষিপ্ত অথচ গভীর পাণ্ডিত্যপূর্ণ রচনা ব্যাখ্যা টিকা “যোগহৃত্র” হচ্ছে একটি। প্রতীচ্য দর্শনশাস্ত্রের সহিত তুলনামূলক সমালোচনায় দেখা যায় যে, হিন্দুর বড়দর্শনে শুধু উপপত্তিক বিবয়ের আলোচনা যে আছে তা' নয়—তা'র সাধনের কার্যকরী প্রণালীও প্রদর্শিত হয়েছে। দার্শনিক তত্ত্ববিজ্ঞার সর্ববিধ প্রশ্নের সঙ্গে ছয়টি দর্শনে ছয় প্রকার স্থনির্দিষ্ট বিধি প্রদর্শিত হয়েছে, যা'দের উদ্দেশ্য হচ্ছে, হৃৎথের চিরতরে নিবৃত্তি আর পরমানন্দলাভ।

এই ছয়টি দর্শনশাস্ত্রের একমাত্র সাধারণ যোগহৃত্র হ'চ্ছে যে, তাঁ'রা সকলেই একবাক্যে ব'লে গেছেন যে আত্মজ্ঞান লাভ না হ'লে প্রকৃত মুক্তি লাভ হয় না। পরবর্তী উপনিষদসমূহ এই মতই পোষণ করে যে, বড়দর্শনের মধ্যে “যোগহৃত্র”ই হ'চ্ছে পরমসত্যের উপলব্ধির জন্ত সর্বাপেক্ষা ফলপ্রদ আর কার্যকর উপায়। যোগপ্রণালীর সক্রিয়সাধনে মানুষ নিষ্ফল অহুমানের ক্ষেত্র পরিহার ক'রে সেই পরমতত্ত্বের প্রত্যক্ষ অহুভূতিলাভ করতে পারে।

পতঞ্জলি অষ্টাঙ্গযোগের বিষয় বর্ণনা ক'রে গেছেন—“যমনিয়মাসন-প্রাণায়ামপ্রত্যাহারধারণাধ্যানসমাধয়োহষ্টবঙ্গানি”; তা'র মধ্যে অহিংসা, সত্য, অস্তেয় (অচোর্য), ব্রহ্মচর্য, অপরিগ্রহ এই ক'টি যম আর শৌচ, সন্তোষ, তপঃ, স্বাধ্যায় আর আর ঈশ্বরপ্রণিধান এই ক'টি নিয়ম।

তা'রপর আসন। স্থিরস্থখমাসনম্—মেরুদণ্ড সরল আর শরীর দৃঢ় ও স্থিরভাবে রেখে নিশ্চল আর আরামে উপবেশনই আসন। এর আবার নানাবিধ প্রকার আছে। তা'রপরে প্রাণায়াম। আসন সিদ্ধ হ'লে শ্বাস-প্রশ্বাসের গতিবিচ্ছেদে প্রাণায়াম। প্রাণায়ামের পর প্রত্যাহার অর্থাৎ ইঞ্জিরগ্রাহ বিষয় হ'তে মনকে ফিরিয়ে এনে আধ্যাত্মিকদেশে নিবদ্ধ রাখা। তা'র পরের চারটি অঙ্গই হচ্ছে প্রকৃত যোগের অঙ্গ, যথা :— ধারণা অর্থাৎ কোন দেশে যথা নাভিচক্র, হৃদপদ্ম অথবা নাসিকাগ্রে চিত্তবদ্ধ করার নাম ধারণা; তা' আবার দু'রকম—(১) তত্ত্বজ্ঞানময় আর (২) বৈষয়িক। মনকে

একমুখী চিন্তায় নিবিষ্ট করার নামই ধারণা। তা'রপর ধ্যান, চিন্তাহৈম্যের গাঢ়তা এলে তবে প্রকৃত ধ্যানের অবস্থা জন্মে; তারপর সমাধি। ধ্যান করতে করতে আত্মসন্ধাকে ভুলে গিয়ে ধ্যেয় বস্তু ছাড়া যখন আর কোনই জ্ঞান থাকে না তখনই সমাধি হয়। এই অষ্টাঙ্গ যোগসাধনের পর “কৈবল্য-প্রাপ্তি” হয়।

কেউ কেউ হয়ত জিজ্ঞাসা করতে পারেন, “আচ্ছা সন্ন্যাসী বড় না যোগী বড়?” বলাবাহুল্য কৈবল্যপ্রাপ্তি ঘটলে বা আত্মসাক্ষাৎকার লাভ হ'লে আর পথের বিভিন্নতার কোনই প্রয়োজন থাকে না, সবই তখন অদৃশ্য হয়। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় কিন্তু বর্ণিত হয়েছে যে, যোগসাধনের উদ্দেশ্য সর্বতো-মুখী কারণ এর সাধনপ্রণালী যে কেবল কতকগুলি বিশেষ শ্রেণী বা মনোভাবের যথা, সন্ন্যাসী, সাধুসন্ত প্রভৃতি লোকেদের জন্মেই উপযোগী তা নয়, এ সকলেরই পক্ষে উপযোগী। যোগবিজ্ঞান একটা সার্বজনীন অভাব পূরণে প্রয়োজন ব'লে এ স্বাভাবিকভাবেই সর্বথা প্রযোজ্য।

প্রকৃত যোগী সংসারে নির্লিপ্ত থেকে আপনার কর্তব্য সম্পাদন ক'রে যেতে পারেন—জলে যেমন মাখন ভাসে আর কি। সাংসারিক কর্তব্য সাধনও উচ্চধর্ম, অবশ্য যোগী যদি আপনার কামনাবাসনায় জড়িত না হ'য়ে পড়ে ঈশ্বরের হস্তে চালিত যন্ত্রের ত্রায় কর্তব্য ক'রে যান।

পৃথিবীতে বহু মহাপুরুষেরা আছেন, তাঁ'রা আজ আমেরিকা, ইউরোপ অথবা অস্ট্রােলিয়ার অহিন্দুদেহের মধ্যে অবস্থিতি করেছেন, তাঁ'রা হয়ত যোগী কি সন্ন্যাসী একথাগুলো জন্মেও কখনো শোনে নি। কিন্তু তাঁ'রাই হচ্ছেন ঐ সব সংজ্ঞার আদর্শ উদাহরণ। মানবজাতির প্রতি নিকামসেবা কিম্বা প্রবল রিপুদমন অথবা চিন্তাসংযমের অদ্ভুত ক্ষমতা অথবা তাঁ'দের একনিষ্ঠ ঈশ্বরপ্রেম বা গভীর ধ্যানশক্তির জন্ম এক হিসাবে তাঁ'রা প্রকৃতই যোগী; তাঁ'রা নিজেসব নিজেদের লক্ষ্যস্থল বেছে নিয়েছেন, যোগ বা আত্মসংযম। যদি সুনির্দিষ্ট পন্থায় যোগশাস্ত্র সম্বন্ধে এদের উত্তমরূপে শিক্ষিত ক'রা যায়, যা'তে ক'রে তাঁ'দের জীবন ও মন অধিকতর জ্ঞানের পথে পরিচালিত করা সম্ভব হয়, তা' হ'লে এঁরা আরও উচ্চতর স্তরে আরোহণ করতে পারেন।

প্রতীচ্যের বহুলেখক যোগসম্বন্ধে অতি অল্পধারণাবশতঃ খুবই ভুল

বুঝেছেন, কারণ যাঁরা এর সমালোচনা করেন তাঁঁরা কোনকালে এর সাধনের কোন চেষ্টাই করেন নি। যোগ সম্বন্ধে স্ফুটিত প্রবন্ধ যাঁরা লিখেছেন, তাঁঁদের মধ্যে সুইস্ মনস্তাত্ত্বিক ডাঃ সি. জি. জাং বলেছেন :—

“যখন কোন ধর্মসাধনপ্রণালী ‘বিজ্ঞান সম্মত’ বলে অভিহিত হয়, তখন সেটা প্রতীচ্যোও সাধারণের গ্রহণযোগ্য বলে ধরে নিতে পারা যায়। যোগসম্বন্ধেও এ আশা নিশ্চয়ই করা যেতে পারে। নূতনত্বের আকর্ষণ আর অর্ধশিক্ষিতদের মোহ ছাড়াও এ পথ অবলম্বন করবার যথেষ্ট কারণ আছে। এতে সংযম ভূয়োদর্শনের সম্ভাবনা থাকে এবং তা’তেই তথ্য-লাভের বৈজ্ঞানিক প্রয়োজনও মিটে। তা’ ছাড়া, এর বহুব্যাপকতা ও গভীরতা এর স্প্রাচীনত্ব, এর গত ও পথ, যা’ জীবনের সকল স্তরের উপর বিস্তৃত, তা’তে ক’রে এর স্বপ্রাণীত সম্ভাবনা আছে।

“ধর্মই হোক আর আধ্যাত্মিক সাধনাই হোক, সকলেরই মধ্যে একটা মনস্তাত্ত্বিক নিয়মালু বর্তিত আছে। তা’র মানে তা’ মানসিকস্বাস্থ্য গঠনে সাহায্য ক’রে। কেবলমাত্র বিবিধ শারীরিক যোগকৌশলও শরীরস্বাস্থ্য সৃচনা ক’রে, যা সাধারণতঃ জিম্জ্যাষ্টিকজাতীয় শরীরকীড়াকৌশল এবং শ্বাসপ্রশ্বাসের সংযমসাধনপ্রণালীর চেয়েও উন্নততর, যেহেতু এ শুধু কেবলমাত্র শারীরবাস্তবিক বা বৈজ্ঞানিক নয়—এর মধ্যে আধ্যাত্মিক ভাবও আছে। শরীরের অংশবিশেষের সাধনায় এর আত্মার সঙ্গে সামঞ্জস্যবিধানের চেষ্টাও আছে, এর পরিষ্কার উদাহরণ পাওয়া যায় প্রাণায়ামে। প্রাণায়ামসাধনে শুধু যে শ্বাসপ্রশ্বাসের গতিনিয়ন্ত্রণ ক’রে প্রাণশক্তির সংযম তা’ নয়, শ্বাসের সঙ্গে যে প্রাণ বিশ্বপ্রাণের সঙ্গে জড়িত, তা’রও সাধনা।

“ইহসংসারে কোন ব্যক্তিকর্তৃক সাধিত কোন কর্ম যখন বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের কর্মপ্রবাহেরই একটা অংশ এবং তা’র পরিণাম শরীরে অনুভূত হ’য়ে বিশ্ব-চৈত্বের সঙ্গে মিলিত হয়ে এমন একটা জীবন্ত যোগ সৃষ্টি করে যে, কোন প্রক্রিয়া, তা’ সে যতই বৈজ্ঞানিক হোক না কেন, তা’ সৃষ্টি ক’রতে পারে না। যোগ যে মূলভাবের উপর প্রতিষ্ঠিত তা’র অনুসরণ বিনা যোগসাধন কল্পনাই ক’রা যায় না আর তা’ করাও নিরর্থক। যোগে শারীরিক আর আধ্যাত্মিক-ভাব অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত হয়ে এক অপূর্ব সুসামঞ্জস্য আনয়ন ক’রে।

“প্রাচ্যে যেখানে এই সব ভাবধারা আর প্রক্রিয়ার উৎকর্ষসাধন হয়েছে

আর যেখানে সহস্র সহস্র বৎসরের প্রচলিত অথও প্রথায় প্রয়োজনীয় আধ্যাত্মিক ভিত্তি গঠিত হয়েছে, সেখানে আমার বিশ্বাস করতে বিন্দুমাত্র বাধা নেই যে যোগই হচ্ছে সম্পূর্ণ ও বিধিসঙ্গত প্রণালী যা'তে ক'রে শরীর আর মনের এমন একটা ঐক্য সাধিত হ'য়, যা'র উপর আর কোন প্রশ্নই ক'রা চলে না। এই ঐক্য এমন একটা মনস্তাত্ত্বিক অবস্থার সৃষ্টি ক'রে, যা'তে ক'রে অতীন্দ্রিয় অনুভূতীলাভের সম্ভাবনা আসে।”

পশ্চিমের সেদিন আগত ঐ, যখন আল্পসংযমের অন্তর্বিজ্ঞান বহিঃপ্রকৃতিতে জয় করার বৈজ্ঞানিকপ্রচেষ্টারই মত একান্ত আবশ্যক হ'য়ে উঠবে। এই নূতন আগবিকষুগে দেখা যাবে যে, জড়পদার্থ যে আসলে ঘনীভূত শক্তি এই বৈজ্ঞানিক অবিসম্বাদিত সত্যে মানুষের মন আরও স্থির প্রশান্ত আরও প্রশস্ত আর বিস্তৃত হবে। মানবমনের সূক্ষ্মশক্তি সব প্রস্তর বা ধাতুর মধ্যে যে সব আগবিকশক্তি নিহিত আছে তা'র চেয়েও প্রবলতর শক্তির সৃষ্টি করতে পারে এবং তা' করবেও, পাছে অধুনাসৃষ্ট নবজাত জড় আগবিকশক্তির দানব সারা পৃথিবীর উপর তা'র মনোভাবহীন যান্ত্রিকধ্বংসের তাণ্ডবলীলা শুরু ক'রে।

২৫শ পরিচ্ছেদ

ভাতা অনন্ত ও ভগিনী নলিনী

একদিন সকালে গভীর ধ্যানে বসে আছি—হঠাৎ যেন এই সাংঘাতিক কথাগুলো মনে এসে আঘাত করতে লাগল, “অনন্তদা’ আর বেশীদিন ন’ন, তাঁ’র আয়ু ফুরিয়ে এসেছে।”

সন্ধ্যাসংগ্রহণের অল্প কিছুকাল পরেই আমি আমার জন্মস্থান গোরখপুরে জ্যেষ্ঠভাতা অনন্তদা’র বাড়ীতে গিয়ে উঠেছিলাম। হঠাৎ অসুখ হয়ে পড়াতে অনন্তদা’ শয্যাগত হয়ে পড়লেন; প্রাণপণে তখন তাঁ’র সেবা করতে লাগলাম।

মনের মধ্যে এই গুরুতর কথার আবির্ভাবে অন্তর শোকে পরিপূর্ণ হয়ে উঠল। ভাবলাম যে, আমার অসহায় দৃষ্টির সামনে থেকে দাদাকে তুলে সরিয়ে নিয়ে যাবে এদৃশ্য আমার একেবারে অসহ্য হ’বে, কায়েই গোরখপুরে আর বেশী দিন থাকা বরদাস্ত করতে পারব না। আত্মীয়স্বজনদের হৃদয়হীন আর তীক্ষ্ণ সমালোচনার মধ্য দিয়ে প্রথম জাহাজেই ভারতবর্ষ ত্যাগ করলাম। বর্ষা হ’য়ে চীনসমুদ্র দিয়ে জাহাজ জাপানের দিকে চলল। জাপানে কোবে সহরে নামলাম—মাত্র কয়েকদিনের জন্ত। সহর বেড়িয়ে দেখবার মতন তখন ঠিক মনের অবস্থা ছিল না।

ভারতবর্ষে ফেরবার পথে জাহাজ সাংহাইয়ে থামল। সেখানে জাহাজের চিকিৎসক ডাক্তার মিশ্র আমাকে নানা সৌখীন জিনিসের দোকানগুলো ঘুরে দেখিয়ে নিয়ে বেড়াতে লাগলেন। শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজি, আমার পরিবার আর বন্ধুবান্ধবদের জন্ত, সেখান হ’তে কিছু কিছু পছন্দসই উপহার কিনলাম। অনন্তদা’র জন্ত খুব চমৎকার কাঁচকা বাঁশের তৈরী এক টি জিনিসও কিনলাম। চীনে দোকানদারটি আমার হাতে জিনিসটি তুলে দিতেই ঘোড়ার উপর সেটাকে ফেলে দিয়েই চোঁচিয়ে ব’লে উঠলাম, “হায় হায়, কা’র জন্তে এখন এ জিনিস কিনছি, দাদা ত’ মারা গেছেন।”

একটা বেশ সুস্পষ্ট অনুভূতি এল যে, দেহ হ'তে অনন্তদার'র আত্মা উৎক্রমণ এখন শুরু হয়েছে! স্মৃতিচিহ্নটি হাত থেকে প'ড়ে গিয়ে কেউ টুকরো টুকরো হয়ে গেল—একটা দারুণ অমঙ্গলের চিহ্ন! ক্রন্দনোচ্ছলিত হৃদয়ে সেই বংশধরের উপরিভাগে লিখলুম, “আমার প্রিয় অনন্তদার'র জন্ম, কিন্তু এক্ষণে তিনি পরলোকে!”

আমার সঙ্গী সেই ডাক্তারবাবুটি কিন্তু এসবই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছিলেন মুখে বিজ্রপের হাসি।

তিনি বললেন, “আপনার কান্না এখন থামান দেখি, মিছামিছি কান্না কেন বলুন ত' ? যতক্ষণ না নিশ্চিত হচ্ছেন যে সত্যিই তিনি মারা গেছেন, ততক্ষণ আর বৃথা চোখের জল ফেলার কি দরকার ?”

কলকাতায় এসে জাহাজ ভিড়ল, ডাক্তার মিশ্রও সঙ্গে এলেন। আবার ছোটভাই বিষ্ণু ডকে আমার অভ্যর্থনা করবার জন্য উপস্থিত। কোন কথার বলবার আগেই আমি বিষ্ণুকে বললুম, “আমি জানি যে অনন্তদার' চলে গেছেন। আচ্ছা, আমার আর এই ডাক্তার বাবুকে বলত' কখন তিনি মারা গেলেন।”

বিষ্ণু একটা তারিখের উল্লেখ করলে, তারিখটা হচ্ছে সাংহাইএ যে দিন সেই বাঁশের জিনিসটা কিনেছিলুম, ঠিক সেইদিন!

ডাক্তারবাবু ব'লে উঠলেন, “যাক, এ নিয়ে আর বেশী কথা ব'লে কাজ নেই। ডাক্তারীশাস্ত্র ত' এমনিই বিরাট, তা'র ওপর আবার টেলিপ্যাট্রি নিয়ে পড়লে ত' কুল পাওয়া ভার।”

গড়পার রোডের বাড়ীতে প্রবেশ করতে বাবা সন্মুখে আমায় আলিঙ্গন করলেন। স্নেহকোমল স্বরে শুধু দুটি কথা বললেন, “তুমি এলে।” দুটি বড় বড় অশ্রুবিন্দু তাঁ'র চোখ দিয়ে গড়িয়ে পড়ল। সাধারণতঃ তিনি ভাবাবেগবিহীন, কিন্তু আমার প্রতি তাঁ'র স্নেহের এমন আতিশয্য তিনি আর কখনও দেখান নি। বাইরে কঠিন গম্ভীরপ্রকৃতির পিতা, অন্তরে তাঁ'র মায়ের কোমল স্নেহবিগলিত হৃদয়। পরিবারের সকলের সঙ্গে ব্যবহারে তাঁ'র এই অপূর্বসুন্দর দ্বৈত পিতৃমাতৃভাবের প্রকাশ দেখতে পাওয়া যেত!

অনন্তদার'র মৃত্যুর অতি অল্পকাল পরেই আমার কনিষ্ঠা ভগিনী নন্দিনী দৈবশক্তিবলে মরণের দ্বার হ'তে ফিরে এসেছিল। ঘটনাটা বলবার পূর্বে তাঁ'র বাল্যজীবনের কতকগুলি বিষয়ের উল্লেখ করা প্রয়োজন।

শৈশবে নলিনী আর আমার মধ্যে খুব মধুর সম্বন্ধ ছিল না। আমি ছিলাম অত্যন্ত ক্ষীণদেহ, তা'র দেহ ছিল ততোধিক ক্ষীণ। মনোবিকারবশতঃ—মনোবিকলনবিদেরা যা' সহজেই আবিষ্কার করতে পারবেন,—আমি প্রায়ই তা'র অস্থিচর্শ্মসার দেহ নিয়ে উপহাস করতুম। তা'রও ছেলেমানুষী চাঁচাছোলা সোজা উত্তর আসত। কখনও কখনও মা, বয়সে বড় ব'লে আমারই কাণে একটি মুহু মুষ্ঠ্যাঘাত দিয়ে আমাদের ছেলেমানুষী ঝগড়া খামিয়ে দিতেন।

বয়স বাড়তে লাগল; পঞ্চানন বসু নামে কলকাতার একটি ছোকরা ডাক্তারের সঙ্গে নলিনীর বিবাহের কথাবার্তা ঠিক হ'ল। বাবা তাকে বহুটাকা বরপণ দিয়েছিলেন, বোধ হয় (যা' আমি নলিনীর কাছে ব'লে ছিলাম) একটা বাঁশের কঞ্চির সঙ্গে বিয়ে হবার দরুণ ভাবী বরের ছুরদণ্ডের ক্ষতিপূরণের জন্তে।

যথাকালে বিবাহের বিরাট আয়োজন শুরু হ'ল। বিবাহ হ'ল আমাদের কলকাতার বাড়ীতেই। বাসরঘরে একদল আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে গিয়ে উঠলাম। সোনালীজরির কাষকরা প্রকাণ্ড এক তাকিয়ার ওপর ভর দিয়ে বর বসে—পাশে নলিনী। হায়, হায়, খুব দামী জরির কাষকরা নীল সিল্কের সাড়ীটাও তা'র অস্থিচর্শ্মসার শুষ্ক দেহে একটুও লালিত্য আনতে পারে নি। নতুন ভগ্নীপতির তাকিয়ার পিছনে গিয়ে বসে তা'র দিকে চেয়ে হাসতে লাগলাম। বর বেচারী বিয়ের আগে নলিনীকে কখনও দেখে নি, সেই রাত্রেই টের পেলে যে বিয়ের লটারীতে তা'র ভাগ্যে কি উঠেছে।

আমার সহানুভূতি পেয়ে ডাক্তার বসু ইঙ্গিতে নলিনীকে দেখিয়ে দিয়ে কাণে কাণে চুপিচুপি বললে, “আচ্ছা বলত' এ কি এ, এঁ্যা!”

আমি বললাম, “কেন ডাক্তারবাবু, একটি কঙ্কাল পেলে, তোমার এনাটমি মনে রাখবার ত' খুব সুবিধে হ'বে।”

ভগ্নীপতি আর আমি হাসিতে এত উচ্ছ্বসিত হ'য়ে উঠলাম যে, উপস্থিত আত্মীয়কুটুম্বদের সামনে আমাদের ভদ্রতা বজায় রাখা একান্ত কঠিন হয়ে পড়ল।

বহুর কাটতে লাগল। ডাক্তার বসু বাড়ীর সকলেরই প্রিয়পাত্র হয়ে উঠেছে, বাড়ীতে অসুখ হলেই তা'র ডাক পড়ে। ডাক্তারের সঙ্গে আমার

বন্ধুত্ব খুব প্রগাঢ় হয়ে উঠল। প্রায়ই ঠাট্টাতামাসা চলত আর তা' সাধারণতঃ নলিনীকে নিয়েই।

একদিন ভগ্নীপতি বললে, “দেখ, তোমার বোনটি হ'চ্ছে ডাক্তার শাস্ত্রের এক গবেষণার বিষয়! তোমার ঐ রোগা বোনটির ওপর আমি সব কিছুই খাটাবার চেষ্টা করেছি—কডলিভার তেল, মাখন, মণ্ট্, মধু, নারিং, মাংস, ডিম, টনিক কি না কি ব'ল! কিন্তু তবুও এক ইঞ্চির শতাব্দে একাংশও বাড়ল না।” দুজনেই হেসে উঠলুম।

দিনকতক পরে ভগ্নীপতির বাড়ী গেলুম একটা কাষে, মিনিট কতকেক্স। তাড়াতাড়ি বেরিয়ে আসছি, মনে হ'ল নলিনী দেখতে পারিনি। সদর দরজার কাছে পৌছতেই কিন্তু তা'র গলা শোনা গেল,—স্বর গভীর কিন্তু দৃঢ়।

“দাদা শোন, এবারে কিন্তু আর পালাতে পারবে না, তা' বলে দিছি তোমার সঙ্গে দুটো কথা আছে।”

আবার সিঁড়ি বেয়ে তা'র ঘরের দিকে চললুম। দেখলুম তা'র চোখ জল, অবাক হয়ে গেলুম।

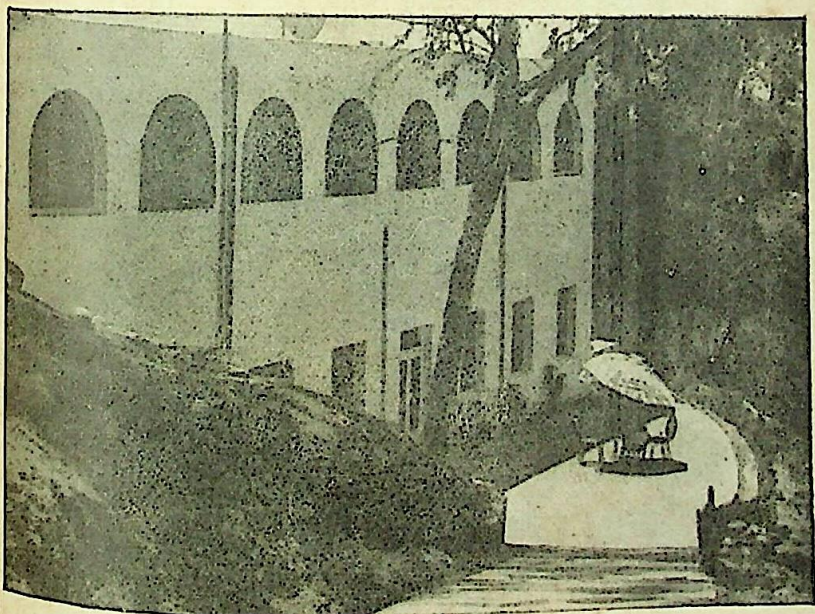
নলিনী বললে, “দাদা আমাদের পুরোন কথা সব এখন একদম ভুলে যাচ্ছ। বুঝলে। যাক, দেখছি যে আজকাল তুমি সাধনপথে খুব এগিয়েছ। আমি ঐসব বিষয়ে তোমার মতনই হ'তে চাই!” তা'রপর সাশ্রমে আশাবিত্ত হ'ল। বললে, “তুমি ত' বেশ মোটা মোটা হয়েছ, আমি কি ক'রে হ'ব, ব'ল না স্বামী কাছে আসেন না, তবুও তাঁকে আমি এত ভালবাসি! কিন্তু হুঁই আর রোগা হ'য়ে থাকলেও আমি ঈশ্বরলাভের পথে উন্নতি করতে চাই। তুমি কি আমায় এখন সাহায্য করবে?”

তা'র এ সকাতির অহুরোধে আমার মন বিগলিত হ'ল। আমার নতুন বন্ধুত্ব ধীরে ধীরে বাড়তে লাগল। একদিন সে আমার শিক্ষা হ'তে চাইলে।

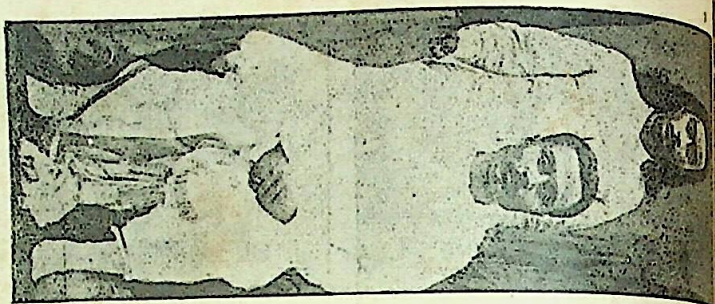
“যেমন ভাবে তোমার ইচ্ছে তেমনি ভাবে তুমি আমাকে গড়ে নাও। তোমার ও সব ওষুধট্যুধের উপর আমার বিশেষ ভরসা নেই, আর ভগবানের উপরেই বেশী বিশ্বাস।” ব'লে একগাদা ওষুধের শিশি সজ্জা ক'রে এনে সব ছাতের নর্দমা দিয়ে ফেলে দিলে। তা'র বিশ্বাসের গভীরতা



(বামে) জেষ্ঠা ভগিনী রমা ও দক্ষিণে বলিনোসহ আমি।
(দক্ষিণে) ভগিনী উমা বালিকা বয়সে।



ক্যালিফোর্নিয়ার স্যান ডিয়েগোতে সেলফ রিয়্যালাইজেশন্
চার্চ অফ অল রিলিজিওন্স্



জ্যেষ্ঠ ভাতা
অনন্ত ও আমি ।



১৯৩৫ সালে শ্রীরামপুর আশ্রমে শেষ উত্তরাধ্বন সংক্রান্তি উৎসব ।
মধ্যে শ্রীমুক্তেশ্বর গিরিজী উপবিষ্ট ।

পরীক্ষা ক'রবার জন্য আমি প্রথমেই তা'র খাওয়া থেকে নাছ, নাংস, ডিম প্রভৃতি সব বাদ দিতে বললুম।

মাস কতক পরে—এর মধ্যে নলিনী আমার নির্দিষ্ট নানারকম ব্যবস্থা খুব নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করেছে আর নানা অসুবিধার মধ্যেও নিরামিষ আহার বজায় রেখে এসেছে—আমি একদিন তা'র সঙ্গে দেখা করতে গেলুম।

একটু ছুঁই হাসি হেসে বললুম, “বোন, তুমি অবশ্য বিধিনিয়মগুলো খুব নিষ্ঠার সঙ্গেই পালন করে এসেছ দেখছি, যা'ক, তোমার পুরস্কার এবার এসে পড়ল ব'লে। কি রকম মোটা হ'তে চাও ব'ল, আমাদের খুড়ীমার মত সোজা হ'য়ে দাঁড়ালে পায়ে নজর পড়ে না সেই রকম নাকি. এ'া ?”

“না! তোমার মতন বেশ শক্তসমর্থ আর কি।”

আমি গভীরভাবে উত্তর দিলুম, “ভগবানের দয়ায় আমি যেমন সর্বদা সত্য কথা বলে এসেছি, এখন সেই রকম সত্য ক'রেই ব'লছি, ঈশ্বরের আশীর্বাদে আজ থেকে তোমার শরীর নিশ্চয়ই বদলাতে শুরু ক'রবে। একমাসের মধ্যে আমার মতনই তোমার সমান ওজন হ'বে, দেখে নিও।”

অস্তরের অন্তঃস্থল থেকে উচ্চারিত এই কথাগুলি আমার আশা পূর্ণ করেছিল। ত্রিশদিনের মধ্যে নলিনীর ওজন আমার সমান হ'ল। একটা নূতন স্নগোল স্নডোল ভাব এসে তা'র সৌন্দর্য আরও বাড়িয়ে দিলে, স্বামীর ভালবাসা আরও গভীরভাবে পেলো। তা'দের নিবাহ অপ্রীতিকরভাবে শুরু হ'লেও এখন তা'রা আদর্শ স্ত্রী দম্পতী।

জাপান থেকে ফিরে এসে শুনলুম যে আমার অস্থিপস্থিতির সময় নলিনী টাইফয়েড জরে আক্রান্ত হয়েছিল। গেলুম দৌড়ে তা'র বাড়ীতে, গিয়ে দেখে আমি একেবারে হতভম্ব। একেবারে কঙ্কালসার হয়ে গেছে, ঘোর অসুস্থ অবস্থায় পড়ে আছে।

ভয়ীপতি বললে, “অসুখে তা'র মাথার গোলমাল শুরু হ'বার আগে সে প্রায়ই ব'লত, ‘মুকুন্দদা যদি এখানে থাকত, তা'হ'লে আমার এ দশা আর হ'ত না।’” তা'রপর হতাশাকরণস্বরে বললে, “ডাক্তারেরা আর আমিও কোন আশা দেখতে পাচ্ছি না। টাইফয়েডের সঙ্গে এতদিন যোঝ'বার পর এখন রক্তমাশয় দেখা দিয়েছে!”

গভীরপ্রার্থনা দিয়ে স্বর্গমর্ত্য তোলপাড় করা শুরু ক'রে দিলুম। একটা

ফিরিঙ্গী নাস' রাখলুম, সে আমায় সর্বদা সাহায্য ক'রত। রোগনিরাময়ের
বিবিধ যৌগিকপ্রণালী ভগ্নীর উপর প্রয়োগ ক'রতে লাগলুম। রক্তমাংস
সেরে গেল।

কিন্তু ডাক্তার বন্সু সখেদে মাথা নেড়ে বললে, “যতই ক'র না কেন, কিষ্ক
ওর শরীরে ত' আর এক ফোঁটা রক্ত নেই, কি ক'রে সেরে উঠবে
সেইটাই ত' মহা ভাবনা।”

আমি জোর ক'রে বললুম “নিশ্চয়ই ভাল হ'য়ে যাবে, কোন ভাবনা
নেই—সাত দিনেই জ্বর ছেড়ে যাবে দেখবে।”

এক হপ্তা কেটে গেল। দেখে ভারি আনন্দ হ'ল নলিনী চোখ চাইছে—
আর আমার দিকে স্নেহে তাকিয়ে আছে। চিন্তে পুরলে। সেইদিন
থেকে তা'র আরোগ্যলাভ দ্রুতগতিতে অগ্রসর হ'তে লাগল। কিন্তু তা'র
স্বাভাবিক স্বাস্থ্য ফিরে পেলেও তা'র প্রায় মারাত্মক অস্ত্রের একটা
সাংঘাতিক চিহ্ন কিন্তু রয়েই গেল—তা'র পা দুটি পক্ষাবাতগ্রস্ত হ'য়ে রইল।
দেশী বিলাতী সব ডাক্তারেরা ব'লে গেল যে চিরজন্ম খোঁড়া হয়েই তা'কে
থাকতে হ'বে, সারবার আর কোন আশা নাই।

তা'র প্রাণ বাঁচাবার জন্ত জীবনমরণ বুদ্ধ যা' আমি প্রার্থনার বলে স্তব্ধ
করেছিলাম, তা'তে আমায় একেবারে ক্লান্ত আর শক্তিহীন ক'রে তুলেছিল।
শ্রীরামপুরে শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজির কাছে গেলুম তাঁ'র সাহায্য প্রার্থনা করতে।
আমার কাছ থেকে নলিনীর দশার কথা শুনে তাঁ'র স্নেহকোমল চক্ষু দুটি
করণায় সজল হ'য়ে উঠল।

শুনে তিনি বললেন, “তোমার ভগ্নীর পা দু'টি একমাসের ভিতরেই
স্বাভাবিক হ'য়ে যাবে। আর দেখ, আংটা দিয়ে আটকান একটা দু'রতি
মুক্তো, ছাঁদা যেন না হয়, তাগায় বসিয়ে পরতে বো'লো—যেন গায়ে
লেগে থাকে।”

আনন্দে একটা মুক্তির নিশ্বাস ফেলে আমি গুরুর চরণে সাষ্টাঙ্গ
প্রণিপাত করলুম। বললুম, “মশায়, আপনি সদগুরু, আপনার কথাই যথেষ্ট
কিন্তু আপনি যদি অবিগ্রহী জোর ক'রে ব'লেন, তা'হ'লে আমি তা'কে এখন
একটা মুক্তো পরিয়ে দেব বই কি।”

গুরুদেব ঘাড় নেড়ে বললেন, “হ্যাঁ, তা'ই কো'রো।” তা'রপর তিনি

নলিনীর শারীরিক আর মানসিক বৈশিষ্ট্যসকল সঠিকভাবে বর্ণনা ক'রতে লাগলেন। যদিও জীবনে তিনি তা'কে কখনও দেখেন নি।

আমি জিজ্ঞাসা করলুম, “মশায়, এটা কি রকম জ্যোতির্বিজ্ঞা? আপনি ত' তা'র জন্মক্ষণ বা তারিখ কিছুই জানেন না।”

শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজি হেসে বললেন, “দেখ, এ হচ্ছে এক রকমের গুপ্ত জ্যোতির্বিজ্ঞা। এতে তোমাদের দিনক্ষণ পাঁজিপুঁথি কিছুই লাগে না। প্রত্যেক মানুষই সৃষ্টিকর্তার অথবা বিশ্বমানবের এক একটি অংশ তা'র একটা জুড় আর একটা দৈব বা সূক্ষ্মশরীর আছে। বাইরের চোখ তা'র জুড়শরীরটাকেই দেখে কিছু অস্বচ্ছন্দ আরও গভীরতর প্রদেশে প্রবেশ করতে পারে, এমন কি এই বিশ্বলীলার মধ্যেও—যা'তে প্রত্যেক মানুষই হ'চ্ছে তা'র একটা স্বতন্ত্র আর অবিচ্ছেদ্য অংশ।”

কলকাতায় ফিরে এসে আমি নলিনীর জন্ম একটা মুক্তা কিনলুম। একমাস পরেই তা'র পা দু'টি সম্পূর্ণভাবে আরাম হ'য়ে গেল।

ভগিনী আমাকে তা'র অন্তরের গভীর রুতজ্ঞতা গুরুদেবকে জানাতে বললে। নলিনীর সব কথা তিনি নীরবে শুনলেন। উঠে আসছি যখন, তখন তিনি একটি কথা বললেন যা' খুবই অর্থপূর্ণ। তিনি বললেন, “ডাক্তারেরা ত' সব বলে গেছে যে তোমার ভগ্নীর কোন ছেলেপুলে হ'বে না। তা'কে নিশ্চিত থাকতে বো'লো; বছর কয়েকের মধ্যেই তা'র দু'টি কণ্ঠারত্ন লাভ হ'বে।”

বছর কতকপরে নলিনীর একটি কণ্ঠা হ'ল,—তা'রপর আরও বছর কয়েক বাদে আর একটি কণ্ঠা পেল।

ভগিনী বললে, “দাদা, তোমার গুরু আমাদের সংসার, আমাদের সারা পরিবার তাঁ'র আশীর্বাদ দিয়ে ধন্য করেছেন। এ রকম লোকের আবির্ভাবে সারা ভারতই পবিত্র হ'য়ে গেছে। দাদাভাই—শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজিকে বোলো যে, তোমারই হাতে গড়া, আমি তাঁ'র ক্রিয়াযোগের একজন দীন শিষ্যা ব'লেই আমাকে মনে করি।”

— — —

২৬শ পরিচ্ছেদ

“ক্রিয়াযোগ” বিজ্ঞান

“ক্রিয়াযোগ” বিজ্ঞান, যা’ এখানে বারবার উল্লিখিত হয়েছে, তা’ আমার গুরু গুরু লাহিড়ী মহাশয়ের রূতিছেই সমগ্র ভারতে বিস্তৃতি লাভ করেছে। ক্রিয়াশব্দ সংস্কৃত “ক্ৰ”ধাতু হ’তে উৎপন্ন—মানে কোন কিছু করা, এবং তা’র প্রতিক্রিয়াও বোঝায়; কার্যকারণের স্বাভাবিকবিধি “কর্ম্ম”শব্দও “ক্ৰ”ধাতু হ’তে এসেছে। সুতরাং “ক্রিয়াযোগ” মানে প্রক্রিয়া বা অস্থিষ্ঠানবিশেষ দ্বারা পরমাত্মার সঙ্গে সংযোগস্থাপন বা যোগ। কোন যোগী খুব নিষ্ঠাসহকারে এর প্রণালী অবলম্বন ক’রে প্রক্রিয়াসাধনে যত্ন করলে ক্রমশঃ “কর্ম্মফল” থেকে মুক্ত হয়।

কতকগুলি প্রাচীন যৌগিক বিধিনিবেদবশতঃ সাধারণের জ্ঞান এখানে ক্রিয়াযোগের পূর্ণব্যাখ্যা দেওয়া সম্ভবপর নয়। প্রকৃত প্রণালী “ক্রিয়াবান্” বা “ক্রিয়াযোগী”র কাছ থেকেই শিক্ষা করতে হয়। এখানে একটা মোটা-মুটি বিবরণ দিলেই যথেষ্ট হ’বে।

“ক্রিয়াযোগ” একটি শারীরমনস্তাত্ত্বিকপ্রণালী, যা’তে ক’রে মানবদেহের রক্ত কার্বনশূন্য হ’য়ে অম্লজান দ্বারা পরিপূরিত হয়। এই অতিরিক্ত অম্লজানের পরমাণু প্রাণধারার সঙ্গে মিলিত হ’য়ে মস্তিষ্ক আর মেরুদণ্ডের কেন্দ্রগুলিকে সঞ্জীবিত করে। কালো দূষিত রক্তসঞ্চয়ন বন্ধ ক’রে যোগী শরীরের তত্ত্বক্ষয় হ্রাস বা নিবারণ ক’রতে পারেন। যিনি আরও কিছু দূর অগ্রসর হ’য়েছেন, তিনি শরীরকোষগুলি পূর্ণশক্তিতে রূপান্তরিত করতে পারেন। ইলাইজা,

* ১২৪০ সালে এমেরিকান এসোসিয়েশন ফর্ দি এডভান্সমেন্ট অফ সায়েন্সের এক সভার রেভল্যাণ্ডের ডাঃ জর্জ ডব্লিউ ক্রাইল কতকগুলি পরীক্ষার ফল ব্যাখ্যা ক’রে প্রমাণ করেছিলেন যে সমস্ত শরীরতত্ত্বগুলি ঋণাত্মক বৈদ্যুতিকশক্তিবিশিষ্ট, কেবল মস্তিষ্ক আর স্নায়ুচক্র ছাড়া : এদেরই কেবল ধনাত্মক শক্তি আছে, কারণ এরা পুনরুজ্জীবনকারী অম্লজান অত্যন্ত দ্রুতভাবেই শোষণ করে।

বীণ্ডুখুষ্ট, কবীর এবং অন্নাথ মহাপুরুষগণ এই “ক্রিয়াযোগ” বা অমুরূপ কোন প্রক্রিয়াসাধনে সিদ্ধহস্ত ছিলেন, যা’তে ক’রে তাঁ’রা ইচ্ছামাত্র শরীর অদৃশ্য ক’রে ফেলতে পারতেন।

“ক্রিয়াযোগ” একটি সুপ্রাচীন বিজ্ঞান। লাহিড়ীমহাশয় তাঁ’র গুরু বাবাজীমহারাজের কাছ থেকে এ বস্তুটি পেয়েছিলেন। বাবাজীই “ক্রিয়া-যোগ”কে বহুবুগের বিশ্ব্বতির অতলগহ্বর থেকে পুনরুদ্ধার ক’রে এর প্রণালীর বিস্তৃততা সম্পাদন ক’রে ক্রিয়াযোগের পুনঃপ্রবর্তন করেন।

বাবাজী লাহিড়ীমহাশয়কে বলেছিলেন, “আজকে এই উনবিংশ শতাব্দীতে তোমার হাত দিয়ে আমি জগৎকে যে ‘ক্রিয়াযোগ’ দান করছি, তা’ হচ্ছে সেই একই বিজ্ঞানের পুনরুজ্জীবন, যা’ শ্রীকৃষ্ণ হাজার হাজার বছর আগে অর্জুনকে দিয়েছিলেন এবং যা, পতঞ্জলি এবং বীণ্ডুখুষ্ট ও সেন্ট-জেন, সেন্টপল প্রভৃতি তাঁ’র অন্নাথ শিষ্যেরাও পরে অবগত হ’ন।”

শ্রীকৃষ্ণ শ্রীমদ্ভাগবদগীতার চতুর্থ অধ্যায়ে উনত্রিংশ শ্লোকে এই ক্রিয়া-যোগের বিবরণ উল্লেখ ক’রে গেছেন। যথা :—

“অপানে জুহ্বতি প্রাণং প্রাণেহপানং তথাহপরে।

প্রাণাপানগতী রুজ্জা প্রাণায়ামপরায়ণাঃ ॥”

অর্থাৎ অন্নাথ যোগীগণ অপানবায়ুতে প্রাণের আহুতিপ্রদান করেন, অপর কেহ কেহ প্রাণে অপানের হোম করেন এবং অন্নাথ কোন কোন সংযতাহারী যোগী প্রাণ ও অপানের গতি রোধপূর্বক প্রাণায়ামপরায়ণ হইয়া প্রাণে জানেন্দ্রিয় ও কর্মেন্দ্রিয়কে আহুতি দিয়া থাকেন।

এর ব্যাখ্যা হচ্ছে, “যোগী শরীরে প্রাণশক্তি সংযোগ ক’রে তা’র ধ্বংস আর শরীরস্থ অপানবায়ু দ্বারা তা’র বৃদ্ধির পরিবর্তনও নিবারণ করেন। এতে ক’রে অন্তঃকরণ স্থির ক’রে ধ্বংস ও বৃদ্ধির সাম্য আনয়নে যোগী প্রাণ-সংযমন শিক্ষা করেন।”

শ্রীকৃষ্ণও ব’লে গেছেন যে, তিনি তাঁ’র এক পূর্বতন অবতারকালে এই অমর যোগসাধনপ্রণালী প্রাচীন পরমজ্ঞানী বিবস্বতকে দিয়েছিলেন, বিবস্বত মন্থকে দান করেন ; মন্থ আবার তা’ সূর্য্যবংশোদ্ভব ইক্ষ্বাকুকে দান করেন।* এমনি ক’রে লোকপরম্পরাক্রমে রাজযোগ ঋষিদের দ্বারা সংরক্ষিত হ’য়ে

* শ্রীমদ্ভাগবদগীতা—চতুর্থ অধ্যায়, ১-২ শ্লোক।

এসেছে এই জড়যুগ পর্য্যন্ত !* তা'রপর ব্রাহ্মণদের মন্থগুপ্তি আর নাহলে উদাসীনতার দরুণ এই পরমপবিত্র জ্ঞান ক্রমশঃ দুর্লভই হ'য়ে দাঁড়ায়।

প্রাচীনধর্মি যোগের সর্বপ্রধান ব্যাখ্যাতা যোগাচার্য্য পতঞ্জলি “ক্রিয়াযোগে”র বিষয় দুইবার উল্লেখ ক'রে গেছেন। তিনি লিখেছেন, “ক্রিয়াযোগ হ'চ্ছে শরীরনিষ্ঠা, মানসিক সংযম আর প্রণবধ্যান”† পতঞ্জলি ব্রহ্মকে নানা রূপে বর্ণনা ক'রে গেছেন, ধ্যানে যা প্রণবধ্বনি বা ওঙ্কাররূপে শোনা যায় : এই ওঙ্কারধ্বনিই সৃষ্টির আদিমূল, আর এর বাক্যই হচ্ছে শক্তিকোষের স্পন্দনধ্বনি ! এমন কি নতুন যা'রা যোগসাধন শুরু করেছেন তা'রাও অদ্বৈত এই অদ্বৈত প্রণববাক্যের শুনতে পান। এইরূপ একটা স্বর্গীয় আনন্দের আধ্যাত্মিক প্রেরণা লাভ ক'রে যোগীর হির বিশ্বাস হয় যে, তিনি প্রত্যই স্বর্গরাজ্যের সম্পর্শে এসেছেন।

পতঞ্জলি প্রাণসংযম বা “ক্রিয়াযোগের” বিষয় দ্বিতীয়বার এই বলে উল্লেখ ক'রেছেন যে, “শ্বাস প্রশ্বাসের গতিবিচ্ছেদ ক'রে যে প্রাণায়াম সাধিত হয়, তা'তেই মুক্তিলাভ ঘটে।”**

সেটপলও “ক্রিয়াযোগ” বা এর নিকটতম কোন প্রণালী জানতেন, যা'তে ক'রে তিনি ইজ্রিয়সমূহ হ'তে প্রাণশক্তিপ্রবাহকে রোধ কবতে পা'রতেন। এতে ক'রে তিনি একথা বলতে প'রেন যে, “যীশুখৃষ্টে যে পরমানন্দ আদি লাভ করি, তা'তে আমি নিশ্চয় ক'রে বলছি যে প্রত্যহই আমার মৃত্যু ঘটে।”

* হিন্দুশাস্ত্রানুসারে জড়যুগের আরম্ভ ৩১০৭ খৃঃ পূর্বাব্দে। অধিরোহী স্বাপরযুগের তখন দশ (পৃঃ ২১৪ দ্রষ্টব্য)। আধুনিক পণ্ডিতেরা ১০,০০০ বৎসর পূর্বের মানবজাতি যে এক বর্ষের প্রায়-যুগের অন্ধ তমিস্রায় আচ্ছন্ন ছিল এই কথা পরম পুলকিতচিত্তে বিশ্বাস ক'রে, ভারতবর্ষ, মিস্র চীন ও অত্যাশ্চর্য দেশের সুপ্রাচীন সভ্যতার দলিলপত্রাদি ও ঐতিহ্যাদি সমস্তই “কাল্পনিক” বলে হেসে উড়িয়ে দেন।

† তপঃসাধ্যায়েশ্বরপ্রণিধানানি ক্রিয়াযোগঃ। (পাতঞ্জলদর্শনম্ সাধনপাদঃ—১ শ্লোক।)

“ক্রিয়াযোগ” শব্দের ব্যবহারে পতঞ্জলি হয় বাবাজীপ্রদত্ত সুনির্দিষ্ট প্রণালীর বিষয় উল্লেখ ক'রেছেন, নয়ত এর নিকটতম কোন প্রক্রিয়া। প্রাণসংযমনের যে এ একটা নির্দিষ্ট প্রণালী তা'র প্রমাণ পাতঞ্জলদর্শনে সাধনপাদের ৪২ শ্লোকেই পাওয়া যায়।

‡ তত্ত্ব বাচকঃ প্রণবঃ। (পাতঞ্জলদর্শনম্ সাধনপাদঃ—২৭ শ্লোক।)

** তন্মিহ সতি শ্বাসপ্রশ্বাসযোগ্যগতিবিচ্ছেদঃ প্রাণায়ামঃ। (পাতঞ্জলদর্শনম্ সাধনপাদঃ—৪২ শ্লোক।)

অর্থাৎ প্রত্যহ শরীরের প্রাণশক্তিকে প্রত্যাহার ক'রে নিয়ে তিনি যোগের দ্বারা ঋষ্টচৈতন্যে অর্থাৎ সমাধির পরমানন্দে নিমগ্ন হ'ন। সেই পরমানন্দময় অবস্থা প্রাপ্ত হ'য়ে তিনি সজ্ঞানে বুঝতে পারতেন যে, এই ইন্দ্రిয়গ্রাহ্য মায়িক জগতে তিনি বাহ্যতঃ একেবারে মৃত।

সবিকল্পসমাধির প্রাথমিক অবস্থায় ভক্তের চৈতন্য পরমাত্মার মধ্যে ডুবে যায়—শরীর হ'তে প্রাণশক্তি আকৃষ্ট হ'য়ে শরীরকে নিশ্চল, কঠিন বা মৃতবৎ দেখায়। যোগী তাঁর শরীরের স্থিতি প্রাণশক্তিসম্বন্ধে সম্পূর্ণ সচেতন থাকেন। নির্বিকল্পসমাধির অবস্থা প্রাপ্ত হ'লে, শরীর স্থির না ক'রেও আর সম্পূর্ণ জাগ্রত অবস্থায় এমন কি সাংসারিক কর্তব্য সম্পাদন করবার মধ্যেও যোগী পরমাত্মার সঙ্গে মিলিত হ'তে পারেন।

শ্রীযুক্তেশ্বরগিরিজি তাঁর শিষ্যবর্গকে উপদেশ দিতেন, “ক্রিয়াযোগ” হ'চ্ছে এমন একটি উপায় যা'র দ্বারা মানবজাতির বিবর্তন খুব দ্রুত সাধিত হ'তে পারে। প্রাচীন যোগীরা আবিষ্কার করেছিলেন যে, ব্রহ্মজ্ঞানলাভের রহস্য স্বাসপ্রশ্বাসনিয়ন্ত্রণের সঙ্গে খুব ঘনিষ্ঠভাবে বিজড়িত। বিশ্বের জ্ঞানভাণ্ডারে এ হ'চ্ছে ভারতবর্ষের অপূর্ব আর অমর দান। প্রাণশক্তি যা' সাধারণতঃ হৃৎপিণ্ডপরিচালনায় ব্যয়িত হয়, তা' অবিরাম স্বাসপ্রশ্বাসের গতি স্থির করবার প্রণালী-দ্বারা উচ্চতর সাধনের জন্ত মুক্ত ক'রা আবশ্যক।”

ক্রিয়াযোগী মানসিকপ্রক্রিয়ায় প্রাণশক্তিকে তাঁর মেরুদণ্ডের ছয়টি চক্রের মধ্য দিয়ে আরোহণ অবরোহণ করান। এই ছয়টি চক্র দ্বাদশটি রাশির সমান। মাহুঘের অনুভূতিসম্পন্ন মেরুদণ্ডের মধ্য দিয়ে আধমিনিট এইরূপ প্রক্রিয়াতে তা'র বিবর্তনের হৃদয় উন্নতি সাধিত হয়। আধমিনিট এরূপ ক্রিয়া একবৎসরের স্বাভাবিক আধ্যাত্মিক উন্নতিসাধনের সমান।

সর্বদর্শী তৃতীয় নেত্ররূপ সূর্য্যের চতুর্দিকে ঘূর্ণায়মান ছয়টি নক্ষত্রমণ্ডল-সমেত মানবের আতিবাহিক দেহের সৌরমণ্ডলস্থিত সূর্য্য ও দ্বাদশরাশির সঙ্গে একটা অন্তর্নিগূঢ় সম্বন্ধ আছে। তা'ই সকল মাহুঘই অন্তরের আর বাইরের বিশ্বজগতের দ্বারা প্রভাবিত হয়। প্রাচীন ঋষিরা আবিষ্কার ক'রেছিলেন যে, মাহুঘের পার্থিব আর দিব্য অবচার বা প্রতিবেশ প্রতি বারবৎসরের আবর্তনে তা'কে স্বাভাবিক পথে অগ্রসর করে। শাস্ত্র অবিসংবাদিতরূপে এ সত্য নির্দ্বারিত ক'রে গেছে যে, মানবমস্তিষ্কে ব্রহ্মজ্ঞানলাভের জন্য

যথোচিতভাবে উপযোগী ক'রে তুলতে গেলে মানবের দশলক্ষ বৎসরে স্বাভাবিক আর নীরোগ বিবর্তনের প্রয়োজন। দিনে আটঘণ্টার এক হাজারবার “ক্রিয়া”যোগের অভ্যাস করলে যোগীর একহাজার বছরে স্বাভাবিক বিবর্তনের সমান উন্নতি সাধিত হয়; তা' হ'লে এক বৎসরে ৩,৬৫,০০০ হাজার বৎসরের বিবর্তন আর দশলক্ষবৎসরে প্রকৃতি মানবসত্তা যে বিবর্তন সাধিত করে, “ক্রিয়া”যোগী তিনবৎসরে স্তূনিয়ন্ত্রিত আত্মপ্রচেষ্টা সাহায্যে সেই একই ফল অনায়াসে লাভ করতে পারেন। অবশ্য খুব উচ্চ স্তরের যোগীরা “ক্রিয়া”সাধনের আরও দ্রুততর আর সুগম পন্থা অবলম্বন করতে পারেন। উপযুক্ত গুরু সাহায্যে এরূপ বহু যোগীরা গভীর সাধনায় তাঁদের শরীর আর মস্তিষ্কে সেই অপরিমেয় শক্তিদারণের উপযোগী ক'রে সযত্নে গড়ে তুলেছেন।

“ক্রিয়াযোগ” সাধনের প্রথম অবস্থায় সাধক, দৈনিক দুইবার চৌদ্দ ঘণ্টা আটশবার সাধনের অভ্যাস করেন। কতকগুলি যোগীর ছয়, বার, চক্ষি অথবা আটচল্লিশ বৎসরের মধ্যেই মুক্তিলাভ ঘটে। পূর্ণজ্ঞানলাভের পূর্বে যে যোগীর মৃত্যু ঘটে, তাঁর “ক্রিয়াযোগ”সাধনজনিত শুভ কর্মফল তাঁর সঙ্গেই যায়। আর তা' তাঁর নূতন জন্মলাভে সেই অনন্তের লক্ষ্যপথে তাঁর দ্রুত উন্নতিলাভে সুসমঞ্জসভাবে সাহায্য করে।

সাধারণ মানবদেহ একটা পঞ্চাশওয়াট ইলেকট্রিক্বাতির মত, কায়েই তা “ক্রিয়াযোগ”সাধনজনিত দশকোটিওয়াটের মত অত্যধিক শক্তিদারণক্ষম হ'তে পারে না। “ক্রিয়াযোগে”র নিভুল সহজসাধনপ্রণালীর দ্বারা মনুষ্যশরীরে দিনে আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধিত হয়; অবশেষে পরব্রহ্মের সপ্তম প্রকাশ অর্থাৎ বিশ্বশক্তির আধার হ'বার উপযুক্ত হ'য়ে উঠে।

কতকগুলি ব্রাহ্ম “হাতুড়ে”গোছের লোকেদের দ্বারা প্রদত্ত অবৈজ্ঞানিক স্বাসপ্রশ্বাসবন্ধের প্রণালীর সঙ্গে “ক্রিয়াযোগে”র কোনই সামঞ্জস্য নাই। তা'দের জোর ক'রে ফুসফুসের মধ্যে বায়ু পূরে রাখবার চেষ্টা হ'লে যে অস্বাভাবিক তা' নয়, অত্যন্ত অস্বস্তিকরও; কিন্তু “ক্রিয়া”সাধনের প্রথম অবস্থা থেকেই সাধকের মনে একটা অভূতপূর্ব শান্তি আর মেরুদণ্ডে যেন একটা নবশক্তিসঞ্চারজনিত ফললাভের মত একটা অত্যন্ত আরামভর অনুভূতি জন্মে। এই প্রাচীন যৌগিকপ্রক্রিয়া স্বাসপ্রশ্বাসকে মনে রাখা

স্মরিত করে। আধ্যাত্মিক উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে যোগী শ্বাসপ্রশ্বাসকে মনেরই ক্রিয়া বলে জানতে পারেন—যেন স্বপ্নের শ্বাসপ্রশ্বাস।

মানুষের শ্বাসপ্রশ্বাসের গতি আর তা'র বাহ্যজ্ঞানের অবস্থার তারতম্যে যে একটা গণিতিক সম্বন্ধ আছে তা'র বহু উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। কোন মানুষের প্রগাঢ় মনঃসংযোগের সময়, যেমন কোন কূটবিদ্যের গভীর-পাণ্ডিত্যপূর্ণ আলোচনা শোনবার সময় অথবা কোন কঠিন বা বিপজ্জনক শারীরিক ব্যায়ামকৌশল প্রদর্শনের সময়, তা'র শ্বাসপ্রশ্বাস আপনাই অতি ধীরে চলে। মনঃসংযোগের প্রগাঢ়ত্ব ধীর শ্বাসপ্রশ্বাসের উপর নির্ভর করে। খুব দ্রুত আর অসমান নিশ্বাসপ্রশ্বাস ভয়, কাম, ক্রোধ প্রভৃতি ক্ষতিকর ভাবাবেগ হ্রচনা করে। অস্থির বানরের শ্বাসপ্রশ্বাসের গতি মিনিটে ৩২ বার আর মানুষের সাধারণতঃ ১৮ বার। হাতী, কচ্ছপ, সাপ প্রভৃতি যা'দের আয়ু খুব দীর্ঘ তা'দের শ্বাসপ্রশ্বাস মানুষের চেয়েও কম। মহাকর্ষ্ম, যা'রা ৩০০ বৎসর পর্য্যন্ত বাঁচতে পারে, মিনিটে কেবলমাত্র ৪ বার নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস ত্যাগ করে।

নিদ্রার যে সঞ্জীবনীশক্তি আছে, তা' সারাদিনের ক্লান্তি দূর করে, তা'র কারণ মানুষ সাময়িকভাবে তা'র শরীর আর শ্বাসপ্রশ্বাসের কথা ভুলে যায়। যমস্ত মানুষ একজন যোগীই হয়ে যায় ; প্রতিরাত্রেই অজ্ঞাতসারে সে নিজেকে শরীরবোধ হ'তে মুক্ত করবার যোগিকপ্রক্রিয়া সাধন করে আর তা'র প্রাণশক্তিপ্রবাহকে মস্তিষ্কের প্রধানস্থল আর মেরুদণ্ডের ছয়টি চক্রস্থিত শক্তির সঙ্গে মিলিত করে। নিদ্রিতমানব এই প্রকারে নিজের অজ্ঞাতসারে বিশ্ব-শক্তির উৎস মধ্যে ডুবে যায়, যা সকল জীবন বাঁচিয়ে রাখার আশ্রয়স্থল।

সাধনেচ্ছু যোগী মন্দগতি নিদ্রিত মানবের মত অজ্ঞাতসারে নয়, জ্ঞাত-সারেই একটি সহজ স্বাভাবিক প্রক্রিয়া সাধন করে। “ক্রিয়া”যোগী তা'র শরীরকোষগুলি অমর প্রাণের আলোকে পূর্ণ ক'রে, তা'দের চুষকশক্তি-বিশিষ্ট অবস্থায় রাখে। নিদ্রার তন্দ্রাবস্থা বা অজ্ঞানাবস্থা উৎপাদন না ক'রেও সে বৈজ্ঞানিক উপায়ে শ্বাসপ্রশ্বাসের ক্রিয়া বিদূরিত ক'রতে পারে।

“ক্রিয়া” দ্বারা ক্ষয়িষ্ণু জীবনীশক্তির ক্ষয় নিবারণ হয় আর ইঞ্জিয়ারের বিষয়-গ্রহণজনিত অপচয় বন্ধ হ'য়ে মেরুদণ্ডস্থিত সূক্ষ্ম প্রাণশক্তির সহিত পুনর্নির্মিত হয়। প্রাণশক্তির একরূপ স্ফূর্তীকরণে যোগীর দেহ এবং মস্তিষ্কের কোন-

গুলি আধ্যাত্মিক অমৃতের বৈদ্যুতিক শক্তিতে সঞ্জীবিত হ'য়ে উঠে। এইরূপে সে প্রাকৃতিকনিয়মের শৃঙ্খলিত অধীনতা থেকে নিজেকে মুক্ত করতে পারে—যে নিয়মের বশবর্তী হ'য়ে থাকলে উপযুক্ত আহার, সূর্যালোক, সুসমৃদ্ধ চিন্তা প্রভৃতির যুরপথে দশলক্ষ বৎসরের গন্তব্যস্থলে পৌছান যেতে পারে। মস্তিষ্কের গঠনের দ্বিৎ পরিবর্তনও সাধিত ক'রতে হ'লে অন্ততঃ দ্বাদশ বৎসরের স্বাভাবিক স্বাস্থ্যময় জীবনযাপন আবশ্যক আর ব্রহ্মজ্ঞানপ্রকাশের জন্ত মস্তিষ্কের স্থান যথোপযুক্তরূপে পরিষ্কার ক'রে নিতে গেলে অন্ততঃ দশলক্ষ বৎসর একান্ত আবশ্যক।

শরীরের সঙ্গে আত্মার বন্ধনের স্বাসগ্রহিচ্ছেদ ক'রে “ক্রিয়া” জীবনকে সুদীর্ঘ আর জ্ঞানকে অনন্তের দিকে প্রসারিত করে। যোগপ্রণালী মন আর জড়-সংবদ্ধ ইঞ্জিয়দের মধ্যে টানাটানি থামিয়ে দিয়ে সাধককে তাঁর অনন্তসাম্রাজ্য ফিরে পাবার জন্তে মুক্তি এনে দেয়। সে জানে যে তাঁর স্বরূপ মরজগতের বায়ুর দাসত্বের প্রতীক স্বাসপ্রশ্বাস বা জড়শরীরে আবদ্ধ নয়।

“অন্তরাবলোকন বা প্রত্যগ্‌দৃষ্টি” প্রাণশক্তিতে আবদ্ধ মন ও ইঞ্জিয়দের সজোরে পৃথক করার এক অবৈজ্ঞানিক উপায়। চিন্তাশীল মন, ঈশ্বরকে ফিরে যাবার প্রচেষ্টায় এই প্রাণশক্তি দ্বারাই ইঞ্জিয়গ্রাহ্য বিষয়ে বারম্বার আকৃষ্ট হয়। প্রাণশক্তির মধ্য দিয়ে মনকে প্রত্যক্ষভাবে সংযত করবার জন্ত “ক্রিয়া”ই হচ্ছে আত্মজ্ঞানলাভের সর্বাপেক্ষা সহজ, প্রত্যক্ষফলপ্রদ এবং সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক উপায়। ঈশ্বরানুসন্ধানের পথে মন্থরগতি, অনিশ্চিত, গরুরগাড়ীর মত চলার ব্যবস্থার জায়গায় “ক্রিয়া”কে ঠিকমত বলা যেতে পারে এরোপ্লেনের গতি।

যোগবিজ্ঞান সর্বপ্রকার মনঃসংযোগ আর ধ্যানধারণার ভূয়োদর্শনের ফলের উপর প্রতিষ্ঠিত। যোগের দ্বারা সাধক ইচ্ছামাত্র পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় হ'তে প্রাণশক্তি প্রত্যাহার বা সংযোগ করতে পারেন। ইঞ্জিয়বোধ হ'তে বিচ্ছিন্ন হ'বার এই শক্তি পেয়ে যোগী ইচ্ছামাত্র তাঁর মনকে ঈশ্বরভাবে অথবা সাংসারিকভাবে আবদ্ধ করতে পারেন। আর তাঁকে তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে প্রাণশক্তির দ্বারা আকৃষ্ট হ'য়ে উচ্ছৃঙ্খল চিন্তা আর উন্মত্ত ইঞ্জিয়গ্রাহ্য ব্যাপারবিশিষ্ট এ পার্থিব জগতে আর ফিরে আসতে হয় না। শরীর ও মনের অধীশ্বর হয়ে “ক্রিয়া”যোগী অবশেষে তাঁর “অস্তিম শত্রু” মৃত্যুর উপর জয়ী হয়।

“মরণের ‘পর জয়ী হ’বে তুমি, মানুষে যে করে জয়,
‘মরণ’ একবার মরিলে তখন, র’বে না মরণভয়।”

(সেঙ্গুপিয়ার—১৪৬ সনেট)

“ক্রিয়া” যোগীর জীবন,—তাঁ’র প্রাক্তন কর্মফলের দ্বারা নয়,—কেবল তাঁ’র আত্মার নির্দেশ দ্বারাই পরিচালিত বা প্রভাবান্বিত হয়। সাধক এই প্রকারে সাধারণজীবনের সদস্য আত্মপ্রধান কর্মের কুটিল ও শব্দকগতির বিবর্তন দ্বারা এড়িয়ে যেতে পারেন।

এইরূপ আধ্যাত্মিক জীবনযাপনপ্রণালী দ্বারা যোগী তাঁ’র দেহাত্ম-বোধের কারা থেকে মুক্ত হ’য়ে সর্বব্যাপিস্থের গভীর মুক্তবায়ুর আশ্বাদ গ্রহণ করেন। এর তুলনায় প্রাকৃতিক জীবনযাপন যেন দাসত্বে আবদ্ধ হওয়া, আর তা’র গতিও অত্যন্ত মন্থর। বিবর্তনের দ্বারার সাথে জীবন বেঁধে মানুষ প্রকৃতির কাছ থেকে কোন সুবিধাজনক ক্রতোন্নতি আদায় ক’রে নিতে পারে না বটে, তবে তা’র শারীরিক ও মানসিক গুণাবলীর কোন বৈলক্ষণ্য না ঘটিয়ে পরামুক্তিলাভের জন্ত তবুও তা’কে দশলক্ষবৎসর ধ’রে জীবনমরণের মিছিলে নানাবিধ রূপ ধ’রে চলতে হয়।

তা’ই যা’রা এই লক্ষলক্ষ বৎসরের বিবর্তনের দ্বারার মধ্য দিয়ে অতিদীর্ঘ অনিশ্চিত সাধনার পথের দিকে ক্লাস্তি, ভয় আর অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে তাকায়, তা’দের জন্ত আত্মোৎকর্ষসাধনের পক্ষে জীবনভাব বা দেহাত্মবোধের হাত হ’তে মুক্ত করবার যোগীদের এই অতিক্রান্ত ফলপ্রসূ প্রণালী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আর কোন পন্থা নাই। সাধারণ মানুষ, যা’র আত্মার কথা দূরে থাক, কেবলমাত্র প্রকৃতির সঙ্গেও সামঞ্জস্য বা যোগ রেখে যে চলতে পারে না,—প্রকৃতির শাস্ত ও স্নিগ্ধ সাম্যভাব অবহেলা ক’রে তা’র পরিবর্তে অস্বাভাবিক চিত্তবৈকল্যই অমুসরণ ক’রে চলে, তা’র পক্ষে এর সংখ্যার পরিধি খুবই বর্ধিত হয়। তা’র জন্ত দশলক্ষবৎসরের দ্বিগুণও মুক্তিলাভের পক্ষে যথেষ্ট হ’বে কি না সন্দেহ।

‘জড়বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ হয়ত’ বা একেবারেই বুঝতে পারে না যে, তা’র দেহ একটি সাম্রাজ্য বিশেষ আর তা’ সম্রাট পরমাত্মারই অধীন এবং মেরুদণ্ডে অবস্থিত ছয়টি চক্র অথবা জ্ঞানকেন্দ্রে প্রতিষ্ঠিত রাজপ্রতিনিধিদল নিয়ে ব্রহ্মরন্ধ্রের সিংহাসনে বসে তিনি তা’ শাসন করছেন। এই ঈশ্বরতত্ত্ব এক

বিরাট অল্পগত প্রজামণ্ডলীর উপর বিস্তৃত। তা'র মধ্যে ২৭ লক্ষ কোটি কোষ—অনিশ্চিত আর সহজবুদ্ধিতে প্রদীপ্ত, যা'তে ক'রে তা'র শরীরের বৃদ্ধি, পরিবর্তন এবং তা'র ক্ষয় এ সব কর্তব্যই পালন করে আর মানুষের গড়পড়তা আয়ু ষাটবছরের জীবনে পাঁচকোটি অবচেতন স্তরের চিন্তা, ভাবাবেগ এবং তা'র জ্ঞানরাজ্যের বিভিন্ন অবস্থা নিয়ন্ত্রণ করে। পরমাত্মাসম্রাটের বিরুদ্ধে কোন আপাতদৃষ্ট শরীর বা মস্তিষ্ককোণের বিদ্রোহ যা' রোগ বা মানসিক বিশৃঙ্খলারূপে প্রকাশিত হয়,—তা' ঐসব অল্পগত প্রজাদের সম্রাটের প্রতি কোন বিরুদ্ধাচরণ নয়,—তা' কেবল মানুষের স্বাধীন ইচ্ছা বা ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের অতীত বা বর্তমান অপব্যবহার জনিত—যে স্বাধীনতা বা স্বাতন্ত্র্য ভগবান তা'র আত্মার সঙ্গে সঙ্গেই দিয়েছেন আর তা' কখনও ফিরিয়ে নেবার কলনাও করেন নি!

একটা সঙ্গীর্ণ অহংভাবে মত্ত হ'য়ে মানুষ ভাবে যে, একমাত্র সেই কেবল চিন্তা করে, ইচ্ছাপ্রকাশ করে, অল্পভব করে, অন্ন পরিপাক করে, নিজের চেষ্টাতেই প্রাণ বজায় রাখে—আর কখনও চিন্তা ক'রে (সামগ্র্যমাত্র হলেই যথেষ্ট হয়!) স্বীকার করে না যে তা'র সাধারণজীবনে সে কেবলমাত্র তা'র প্রাক্তন কর্ম্ম আর প্রকৃতি বা পারিপার্শ্বিক অবস্থার দাস—তা'দের হাতে কাষ্ঠপুত্তলিকামাত্র! প্রত্যেক মানুষের বুদ্ধিবৃত্তির ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া, অল্পভূতি, ভাবধারা, মানসিকগতি আর অভ্যাস সবই অতীত কারণে বেষ্টিত—তা' সে এজন্মেরই হো'ক বা পরজন্মেরই হো'ক। এসব প্রভাবের বহু বহু উর্দ্ধে অবস্থিত তা'র রাজোচিত আত্মা! নন্দনসত্য আর স্বাধীনতা বিসর্জন দিয়ে “ক্রিয়া”যোগী সকল মায়ামোহ পরিহার ক'রে মুক্তাত্মায় পরিণত হন। সকল শাস্ত্রেই বলে যে মানুষ ক্ষণভঙ্গুর দেহমাত্র যে তা' নয়, সে জীবন্ত প্রাণবন্ত আত্মা; আর এই “ক্রিয়া”সাধনেই সে শাস্ত্রীয় সত্য প্রমাণ ক'রে দেয়।

শঙ্করাচার্য্য তাঁ'র সুবিখ্যাত “বিবেকচূড়ামণিতে” লিখে গেছেন, জীবাত্মা পরমাত্মা ও এই উভয়ের অভেদজ্ঞান না জন্মিলে “বাহ্য অল্পষ্ঠান অজ্ঞান নাপ করতে পারে না কেবল আত্মোপলব্ধিজাত জ্ঞানই অজ্ঞানান্ধকার দূর করতে পারে। পরিপ্রশ্ন ব্যতীত জ্ঞান উৎপন্ন হয় না। ‘আমি কে? সৃষ্টির কারণ কি? কে সৃষ্টিকর্তা? এর আধিতৌতিক কারণ কি?’ এইগুলিই হ'চ্ছে প্রশ্নোন্মিত বিষয়।” শুধু বুদ্ধিতে একরূপ সব প্রশ্নের কোন উত্তর মিলে না—তা'ই

যোগিকথামৃত

৩০১

ধ্বনিরা আধ্যাত্মিক প্রশংসামধানের উপায়ের জগৎ যোগ উদ্ভাবন করে গেছেন।

ভগবৎগীতাতে যে “অগ্নিযজ্ঞের” কথা প্রায়ই উল্লিখিত হয়েছে, “ক্রিয়া-যোগ”ই হচ্ছে সেই আসল “অগ্নিযজ্ঞ”। যোগের পরিশুদ্ধকারী অগ্নিই অনন্ত জ্ঞানের আলোক এনে দেয়, আর তা’ই শাস্ত্রীয় হোম আর যজ্ঞের বাহ্য অনুষ্ঠান থেকে এর পার্থক্য খুব বেশী। যেখানে ধূপধনার সঙ্গে উচ্চারিত শুধু মন্ত্রের কাছে সত্যের উপলব্ধিরও প্রায়ই দাহক্রিয়া সাধিত হয়।

উচ্চস্তরের যোগীরা তা’দের সকল প্রকার মনন, ইচ্ছা আর দেহকামনা-জাত সকল প্রকার অন্তর্ভূতির সঙ্গে মিথ্যা একাত্মবোধ সম্বন্ধে পরিহার করে মেরুদণ্ডস্থিত চক্রসমূহের অতীন্দ্রিয়জ্ঞানশক্তির সহিত মনকে সংযুক্ত করে ঈশ্বরকল্পিত এ জগতে বাস করেন, অতীতের কোন প্রেরণাবশতঃও নয় বা মানব প্রবৃত্তিজাত নূতন কোন প্রজাহীনতার জন্তও নয়! একরূপ যোগীরাই সেই অসীম অনন্ত ব্রহ্মানন্দ লাভ করে তাঁ’দের চরম আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করেন।

যোগী এইরূপে সেই “একমেবাদ্বিতীয়ম্” পরমেশ্বরের উদ্দেশ্যে অল্পস্থিত অবৈতবাদের অগ্নিযজ্ঞে তাঁ’র যা কিছু জটিল পার্থিব বাসনাকামনা সব আহুতি দান করেন। এই হচ্ছে আসল যোগিক “অগ্নিযজ্ঞ”, যা’তে করে অতীত ও বর্তমান বাসনাকামনা সব ঈশ্বরীয় প্রেমের আগুনে যজ্ঞোপকরণরূপে অগ্নিতে আহুতি প্রদান করা হয়। সেই চিরউজ্জ্বল, অনির্ব্বাণ অনন্ত জ্ঞানাগ্নিশিখা মানবের সকল প্রকার ভ্রান্তিপ্রমাদের আহুতি গ্রহণ করে তা’কে সর্বপ্রকার ক্লেশ থেকে মুক্ত করে। তা’র কর্মের কঙ্কালান্বিতসকল কামনাবাসনার মেদমাংস মুক্ত হ’য়ে জ্ঞানহৃদয়ের পরিশুদ্ধকারী কিরণের তেজে শুচিশুভ্র হয়, অবশেষে পরিপূর্ণভাবে বিশুদ্ধ হ’লে মানব বা স্রষ্টা কারুর কাছেই আর তাঁর কোন পাপের লেশমাত্র চিহ্ন থাকে না।

সুসম্বন্ধ প্রশংসাতে যোগসাধনের নিশ্চিত ফললাভের বিষয়ে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ শ্রীমদ্ভাগবতগীতার ষষ্ঠ অধ্যায়ে ৪৬ শ্লোকে নির্ভাবান্ যোগীর বিষয় নিম্নলিখিতভাবে উল্লেখ করে গেছেন :—

“তপস্বিভ্যোহধিকো যোগী জ্ঞানিভ্যোহপি মতোহধিকঃ।

কর্মিভ্যশ্চাধিকো যোগী তন্মাদ্ যোগী ভবাজ্জুনঃ॥

তত্ত্ববেত্তা যোগী তপস্বিগণ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ, পরোক্ষজ্ঞানিগণ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ এবং কর্মিগণ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ। অতএব হে অর্জুন! তুমি যোগী হও।”

২৭শ পৰিচ্ছেদ

রাঁচিতে যোগবিদ্যালয় স্থাপন

গুরুদেব একদিন হঠাৎ প্রশ্ন ক’রে বসলেন, “সংগঠন কাষে তোমার বিরাগ কেন?” শুনে চমকে উঠলুম। সত্যিই সে সময়ে আমার ব্যক্তিগত বিশ্বাস ছিল যে প্রতিষ্ঠানগুলো যেন “ভীমরুলের চাক।”

উত্তর দিলুম, “এসব কাষে কোন লাভ নেই। নেতারা যা’ই করুক আর না করুক কেন—তা’র সমালোচনা হবেই!”

কঠিনদৃষ্টির সঙ্গে গুরুদেব উত্তর করলেন, “স্বর্গের সূখা কি তুমি সবাই একলাই খেতে চাও নাকি? যদি না দয়ার অবতার সদগুরুগণ অপরকে তাঁদের জ্ঞান বিতরণ করতে ইচ্ছুক না হ’তেন, তুমি বা আর কেউ কখন কি যোগের দ্বারা ভগবৎসঙ্গ লাভ করতে পারতে?” তা’রপর তিনি বললেন “ভগবান হ’চ্ছেন মধু, আর প্রতিষ্ঠানগুলো হচ্ছে সব মধুচক্র; তা’হলে দু’টোরই প্রয়োজন আছে। অবশ্য পরমাত্মার সংস্পর্শবিহীন বাহ্যিক কোন আকার নিরর্থক, কিন্তু তুমিই বা অধ্যাত্মঅমৃতপূর্ণ কস্ম্মমুখর মধুচক্র সৃষ্টি করার উদ্যোগ করবে না কেন?”

তা’র উপদেশ আমার মনকে গভীরভাবে আলোড়িত ক’রে তুলল। বাইরে কোন উত্তর না দিলেও আমার মনে এক দৃঢ়সঙ্কল্পের উদয় হ’ল। গুরুপদতলে বসে যে মুক্তসত্যের শিক্ষালাভ করেছি—তা’ আমার ক্ষমতায় যতদূর সম্ভব, আমার সহকর্মীদের সঙ্গে সমানভাবে ভাগ ক’রে নিয়ে উপলব্ধি ক’রব। প্রার্থনা করলুম, “ভগবান্, আমার ভক্তিভীর্ষে তোমারই প্রেম যেন চিরউজ্জ্বল থাকে আর আমি যেন সেই প্রেম অপরের অন্তরে জাগিয়ে তুলতে পারি।”

সন্ধ্যাস গ্রহণ করবার পূর্বে কোন এক উপলক্ষ্যে শ্রীবুদ্ধেশ্বর গির্জার একটি অপ্রত্যাশিত মন্তব্য করেছিলেন।

তিনি বলেছিলেন, “দেখ তোমার বুড়বয়সে একটি জীব সাহচর্যের প্রয়োজন কত বেশী বোধ করতে হবে, তা’ জান ? আচ্ছা, তোমার কি মনে হয় না যে, গৃহস্থব্যক্তি জীপুত্রের ভরণপোষণরূপ কর্তব্যে নিরত থেকে ভগবানের চক্ষে কোনই পুণ্য কাষ করে না ?”

সভয়ে আমি প্রতিবাদের সুরে ব’লে উঠলুম, “ম’শায়, আপনি জানেন যে এ জীবনে আমার একমাত্র আকাঙ্ক্ষা সেই পরমাত্মার সঙ্গে মিলিত হওয়া। বিয়েটিয়ে করা নয়।”

গুরুদেব এত উচ্ছ্বসিত হ’য়ে হেসে উঠলেন যে তখন আমি বুঝতে পারলুম যে তিনি আমার বিশ্বাসের গভীরতা পরীক্ষা করবার জন্তেই মন্তব্যটি করেছেন, আর কিছু নয়।

তা’রপর তিনি ধীরে ধীরে বললেন, “স্মরণ রেখো যে, কেউ যদি তা’র সাংসারিক কর্তব্য পরিহার করে, তা’হ’লে তা’কে আরও বৃহত্তর পরিবারের কোন রকম দায়িত্ব নেবার জন্তে উপযুক্ত হ’তে হয়।”

বালকদের জ্ঞাত সর্বতোমুখী শিক্ষার আদর্শ আমার মনে সর্বদাই জাগ্রত ছিল। সাধারণ শিক্ষা, যা’র লক্ষ্য কেবল শরীর আর বুদ্ধিবৃত্তির উৎকর্ষসাধন, তা’র বিষময় ফল আমি স্পষ্টই দেখেছিলুম। গতানুগতিক শিক্ষাপদ্ধতিতে, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক মূল্য, যা’র অভাবে কোন লোকই প্রকৃত সুখের কাছে ঘেঁষতে পারে না, তা’র প্রয়োজন এখনও রয়েছে। মনে মনে স্থির করলুম যে এমন একটি বিদ্যালয় স্থাপন ক’রব, যা’তে স্কুলমারমতি বালকগণ পূর্ণ মানবত্বের আদর্শে গঠিত হ’তে পারবে। সেই দিকে আমার প্রথম প্রচেষ্টা হ’ল বাদলার এক ক্ষুদ্র পল্লীগ্রামে, ডিহিকায় সাতটিমাত্র ছেলে নিয়ে কাষ আরম্ভ।

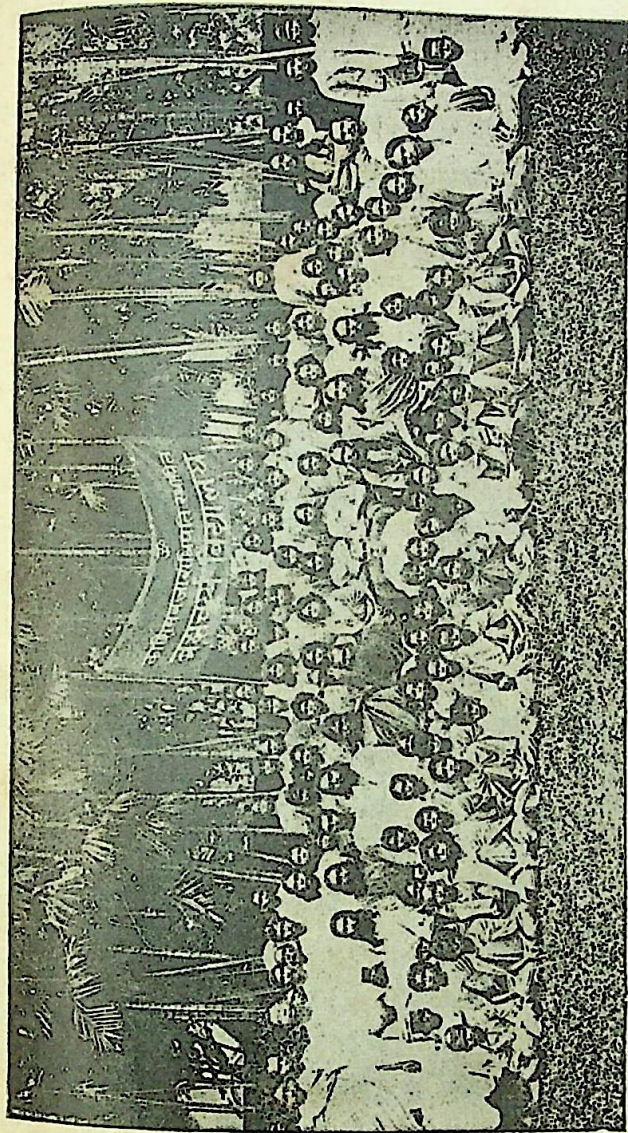
বহরখানেক পরে, ১৯১৮ সালে, কাশীমবাজারের মহারাজা স্থার মণীন্দ্র চন্দ্র নন্দী মহাশয়ের বদান্ধতায় আমার দ্রুতবর্দ্ধনশীল ছাত্রদলটিকে রাঁচিতে স্থানান্তরিত করা হ’ল। কলকাতা হ’তে দু’শএকান্ন মাইল দূরে বিহারের এই সহরটি অত্যন্ত স্বাস্থ্যপূর্ণ আবহাওয়ার জ্ঞাত বিখ্যাত। রাঁচিতে কাশীমবাজারের রাজপ্রাসাদ নূতন বিদ্যালয়ের প্রধানকেন্দ্রে পরিণত ক’রে নাম দিলুম, “ব্রহ্মচর্য্য বিদ্যালয়,” প্রাচীন-মুনিঋষিদের বিদ্যাদানের আদর্শ অনুসারে। ভারতবর্ষের বিদ্যার্থী যুবামণ্ডলীর সাংসারিক আর আধ্যাত্মিক শিক্ষাদানের স্থান ছিল প্রাচীন মুনিঋষিদের অরণ্যআশ্রম।

রাঁচিতে প্রাথমিক আর উচ্চ বিদ্যালয় এই উভয়বিধ দ্বারা অল্পবয়সী শিক্ষাদানের প্রণালীর প্রবর্তন করা হ'ল। এতে রুবি, শিল্প, শ্রম ও বিদ্যালয়ের বিষয় সমূহের পঠনপাঠনের ব্যবস্থা আছে, আর আছে ছাত্রদের যোগে সাহায্য মনঃসংযোগ, ধ্যান, আর “যোগদা” শারীরিক উৎকর্ষসাধনের অপূর্ব প্রণালী, যা'র নীতিসকল আমি ১৯১৬ সালে আবিষ্কার করেছিলুম।

মানুষের শরীর ইলেকট্রিক ব্যাটারির মতন বুঝতে পেরে, মনে মনে বৃত্তিবলে স্থির করলুম যে, এতে মানুষের ইচ্ছাশক্তির প্রত্যক্ষ মাধ্যমে শক্তি পুনঃসঞ্চারিত করা যেতে পারে। ইচ্ছা ব্যতীত ক্ষুদ্র বৃহৎ কোন কার্যই বন্ধ সম্ভবপর নয়, তখন মানুষ এই “আদ্যাশক্তি” ইচ্ছার সাহায্য নিয়ে, হাঙ্গামাজনক যন্ত্রপাতি বা কোন রকম যান্ত্রিকব্যায়ামের সাহায্য ব্যতিরেকেই শরীর-তত্ত্বগুলি আবার পুনর্গঠিত ক'রে নিতে পারে। তাই আমি রাঁচির ছাত্রদিগকে আমার সহজ সরল “যোগদা” প্রণালী শিক্ষা দিলুম, যা'তে ক'রে মানুষের মস্তিষ্কে কেন্দ্রে অবস্থিত প্রাণশক্তির দ্বারা সেই মহাশক্তির অকরূপ আধার থেকে সজ্ঞানে এবং অতিসহজ পুনঃ শক্তি সঞ্চারিত ক'রে নেওয়া যেতে পারে। এই শিক্ষায় ছেলেদের ফল হ'ল অদ্ভুত! তা'রা প্রাণশক্তিকে শরীরের একস্থান হ'তে অপরস্থানে চালিত করবার আর অত্যন্ত কঠিন আসনে সম্পূর্ণ ধীরস্থির হ'য়ে বসে থাকবার অসাধারণ ক্ষমতা লাভ করলেন। সহজুগ আর শক্তিপ্রদর্শনের নানাবিধ কৌশল তা'রা যা' দেখিয়েছিল, তা' অনেক শক্তিমান বয়স্কব্যক্তিরও দেখাতে পারেন কি না সন্দেহ। আমার কনিষ্ঠভ্রাতা শ্রীমান্ বিষ্ণুচরণ ঘোষ রাঁচি বিদ্যালয়ে যোগ দেয়; পরে সে বাঙ্গালার একজন প্রথিতযশা শরীরচর্চাতত্ত্ববিদ হ'য়ে দাঁড়ায়। সে আর তা'র একজন ছাত্র নিউইয়র্কের কলম্বিয়া ইউনিভার্সিটি এবং ইউরোপ ও আমেরিকার অগ্রাগ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষের সম্মুখে শক্তি ও কৌশলের অপূর্ব পারদর্শিতা দেখিয়ে সকলকে চমৎকৃত করেছিল।

রাঁচিতে প্রথম বৎসরের শেষে প্রবেশলাভের জন্তে প্রায় দু'হাজার আবেদনপত্র এসেছিল। কিন্তু বিদ্যালয়ে সে সময় কেবলমাত্র আবার

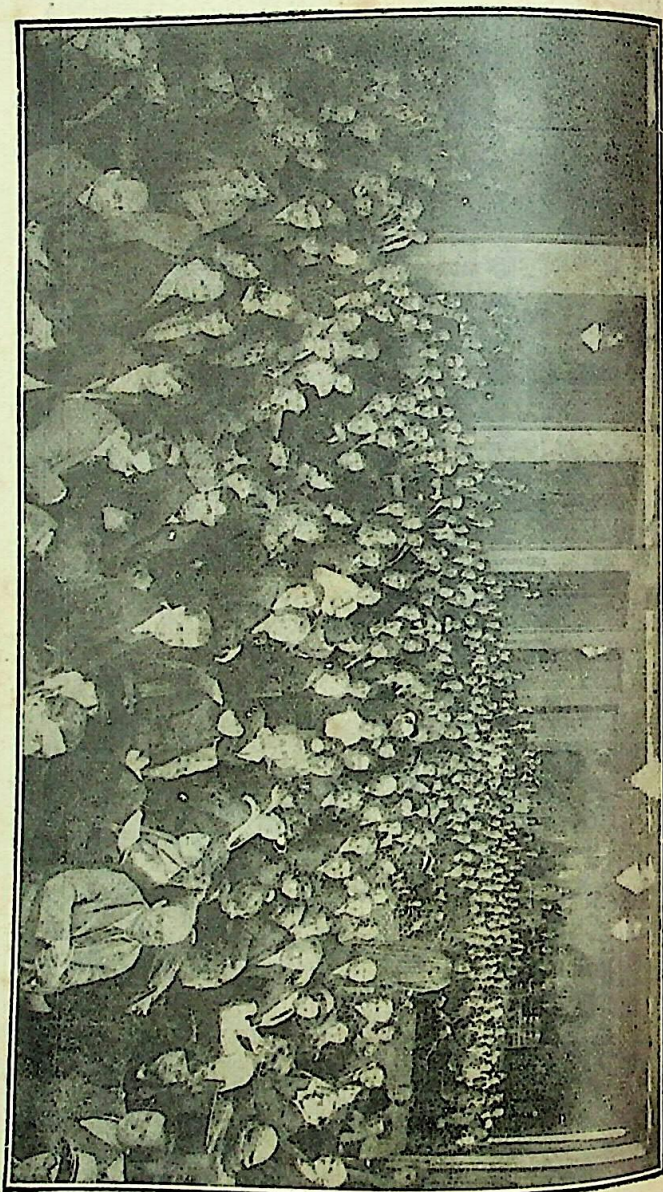
* আমেরিকার কয়েকটি শিশুও নানাবিধ আসনে সিদ্ধিলাভ করেছে। এর মধ্যে আর্নাল্ড কোল—লস এঞ্জেলিসে এস, আর, এফ'এর উপদেষ্টা।



(বামে উপরে) ই, ই, ডিকিন্সন-রূপার কাপ্ লাডকারী। (বামে নীচে) গুরুদেব ও আর্মি।
(দক্ষিণে) কাশীমবাজারের মহারাজাসহ নীচি ব্রহ্মচারী বিদ্যালয়ের ছাত্রবৃন্দ।



আমেরিকার ওয়াশিংটন সহরে আমার যোগের ক্রাস।



ছাত্রদের জন্ম বন্দোবস্ত থাকায় একশতের বেশী আসন ছিল না। দিবা-বিভাগ শীঘ্রই খোলা হ'ল।

বিদ্যালয়ের শিশুদের জন্ম আশায় পিতামাতা উভয়েরই স্থান গ্রহণ করতে হ'ত, আর সংগঠনকাষের অনেক হাঙ্গামাও পোহাতে হ'ত। বীণুশুষ্ঠের সেই কথাগুলি আমি প্রায়ই স্মরণ করতুম, “আমি নিশ্চয় ক'রে বলছি, আমার জন্মে এবং বাইবেলের সত্যের জন্মে এমন কোন লোক নেই যে বাড়ীঘরদুয়ার, ভ্রাতাভগিনী, পিতামাতা, অথবা স্নিপুত্র বা জমিজমা ছেড়েছে—সে কিন্তু অত্যাচার সহ্য করলে এবার ভাইভগিনী মাতাপুত্র জমিজমা শতগুণ ফিরে পাবে; আর ভবিষ্যৎজীবনে অনন্ত জীবন পাবে।” শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজি কথাগুলির এইরকম ব্যাখ্যা করেন, “যে ভক্ত বিবাহ আর সংসারে প্রবেশলাভের অভিজ্ঞতা ত্যাগ ক'রে কুদ্রসংসার আর সন্ধীর্ণ কর্মক্ষেত্রের পরিবর্তে সাধারণভাবে সমাজসেবার বৃত্তের দায়িত্ব গ্রহণ করে, তা'তে ক'রে সে এমন একটা কর্মভার গ্রহণ ক'রে, যা'তে অবশ্য সংসারের অত্যাচার জড়িত থাকে বটে কিন্তু তবু তা'তে তা'র অন্তরে একটা স্বর্গীয় আনন্দ আর সন্তোষের আনির্ভাব হয় বই কি।”

বেঙ্গল নাগপুর রেলওয়েতে চাকরী গ্রহণ না করার দরুণ পিতা মনে আঘাত পেয়েছিলেন ব'লে অনেক দিন তাঁ'র সাক্ষাৎ পাইনি। একদিন তিনি রাঁচিতে এলেন স্নেহাশীর্ষদ দান করবার জন্মে বললেন, “বাবা, জীবনে তুমি যে পথ বেছে নিয়েছ, তা' আমি মেনে নিয়েছি। এই সব আনন্দচঞ্চল স্বর্গের শিশুদলের মধ্যে তোমায় দেখে আমি ভারি আনন্দিত। রেলের শুরু, প্রাণহীন টাইমটেবল্ আর হিসাবপত্রের মধ্যে ডুবে থাকার চেয়ে এখানেই তোমায় বেশী মানায়; এইই হ'চ্ছে তোমার আসল উপযুক্ত স্থান।” উজনখানেক ছোট ছোট শিশুরদল, পিছনে পিছনে ঘরে বেড়াচ্ছিল, তা'দের দেখিয়ে পিতা হেসে বললেন, “আমার আটটি ছিল, কিন্তু তোমার—বাক, আমি বেশ টের পাচ্ছি।”

প্রায় সত্তর বছার বিরাত উর্কর ফলের বাগান আমাদের হাতে। ছাত্র, শিক্ষকগণ ও আমি সকলে মিলে এই আদর্শস্থানে বহুসময় আনন্দে কত রকমের যে কায করেছি। আমাদের অনেকগুলি প্রিয় পোষা জীবজন্তু ছিল, তা'র মধ্যে মধ্যে ছিল একটি হরিণ, ছেলেদের চোখের মণি! হরিণশিশুটিকে

আমিও এত ভাল বাসতুম যে সেটিকে আমার ঘরেই রাখে ঘুমোতে দিতুম।
ভোরের আলো ফুটে ওঠবার সঙ্গে সঙ্গে হরিণশিশুটি আমার বিছানার
কাছে টুকটুক করে আসত, একটু আদর পাবার লোভে !

একদিন আমি বাচ্ছাটিকে একটু সকাল সকালই খাইয়ে দিলুম—একটু
তাড়াতাড়ি ছিল রাঁচিসহরে একটা কাষে যেতে হবে। যা'বার আগে কিছু
ছেলেদের সাবধান করে দিয়ে গেলুম যে হরিণশিশুটিকে কেউ যেন আর কোন
কিছু না খাওয়ায়। একটা ছেলে ছিল অত্যন্ত অবাধ্য, বাচ্ছাটাকে খুব
খানিকটা দুধ খাইয়ে দিয়েছে। সন্ধ্যাবেলা ফিরে গুনলুম অত্যন্ত দুঃসংবাদ—
অতিরিক্ত খাওয়ানর ফলে হরিণশিশুটি মরমর।

চোখের জলে ভাসতে ভাসতে প্রায় জীবন্মৃত হরিণশিশুটিকে সবচেয়ে
কোলে তুলে নিলুম—অবোলা জীব, মুখ ফুটে কিছু বলতে পারে না, নিঃশ্বাস
মেরে পড়ে রয়েছে দেখে বুক ফেটে যেতে লাগল। ভগবানের কাছে
সকাতরে প্রার্থনা জানাতে লাগলুম অসহায় জীবটির প্রাণরক্ষার জন্য।
ঘণ্টাকতক বাদে, বাচ্ছাটি চোখ খুললে, তা'রপর দাঁড়িয়ে উঠে অত্যন্ত দুর্বল-
ভাবে চলাফেরা করতে আরম্ভ করলে। সারা বিছালয় আনন্দে উল্লসিত
হয়ে উঠল।

কিন্তু সেই রাতে এল এক দারুণ শিক্ষা—যা' আমি জীবনে আর কখনও
ভুলতে পারব না। রাত ছোটো অবধি হরিণশিশুটিকে নিয়ে বসে, তারপর
ঘুমিয়ে পড়লুম। স্বপ্নে দেখি হরিণশিশুটি আমার বলছে,—

“তুমি আমার ধরে রেখেছ কেন? দয়া করে আমার ছেড়ে দাও, আমার
যেতে দাও!”

স্বপ্নেই উত্তর দিলুম, “আচ্ছা বেশ।”

তখুনি ভেগে উঠেই চোঁচিয়ে উঠলুম, “ওরে ছেলেরা, হরিণবাচ্ছাটি যে
রে মারা গেল!” ছেলের দল দৌড়ে আমার কাছে ছুটে এল।

ঘরের কোণের দিকে তাড়াতাড়ি গেলুম, সেখানেই হরিণশিশুটিকে গুইয়ে
রেখেছিলুম। আমার দিকে তাকিয়ে একবার ওঠবার শেষ চেষ্টা করলে;
তা'রপর মুখ খুবড়ে আমার পায়ের কাছে পড়ল, তা'রপরই সব শেষ।

কর্মফল যা' প্রাণিদের ভাগ্য নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত করে সেই অমৃতসারে
হরিণশিশুটির জীবন অতীত হয়েছে এবং সে আরও উচ্চতর আকার

পরিগ্রহের জ্ঞান প্রস্তুত। কিন্তু আমার গভীর আকর্ষণ, পরে অবশ্য জানতে পেরেছিলুম যে তা' নিঃস্বার্থ নয় আর আমার ঐকান্তিক প্রার্থনাই তা'কে এই হরিণশিশুর দেহে আবদ্ধ রেখেছিল—যা' থেকে সে মুক্তি পা'বার জন্তে ছটফট করছিল। হরিণশিশুটির আত্মা স্বপ্নে আমার তা'কে মুক্তি দেবার জন্তে অল্পনয়বিনয় করছিল, কারণ ভালবেসে অনুমতি না দিলে, হয় এ যাবে না বা যেতে পারবে না। যেইমাত্র রাজি হলুম অগ্নি সে চলে গেল।

সব শোকদুঃখ দূর হ'ল : নতুন করে জানলুম যে, ঈশ্বর তাঁ'র সন্তানদের কাছে এই চান যে তা'রা যা' কিছু সব তাঁ'রই অংশ ব'লে ভালবাসে আর ভ্রান্তিবশতঃ যেন মনে না করে যে মরণেই সব শেন। অজ্ঞলোকেরা ভাবে যে মৃত্যুতেই তা'দের প্রিয় পরিজনবর্গ যেন চিরকালের জন্তে একেবারে হারিয়ে যায়। কিন্তু অনাসক্ত সংসারবিরাগী, যে অপরকে ভগবানেরই প্রকাশ ব'লে ভালবাসে, সে জানে যে মৃত্যুতে প্রিয় আত্মীয়স্বজনবর্গ সেই পরমানন্দে মগ্ন হবার জন্তেই ফিরে গেছে।

কৃদ্র এবং সামান্য সূচনা হ'তে ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হ'য়ে এখন রাঁচি বিদ্যালয় এমন একটা প্রতিষ্ঠান হ'য়ে দাঁড়িয়েছে, যা' ভারতবর্ষে এখন খুবই সুপরিচিত। প্রাচীন মুনিঋষিদের আদর্শে শিক্ষাপ্রদান প্রচলিত রাখায় যা'দের আগ্রহ, তাঁ'দের স্বেচ্ছাপ্রদত্ত অর্থসাহায্যেই বিদ্যালয়ের বহু বিভিন্নবিভাগের ব্যয়নির্বাহ হয়। “যোগদা সংস্কৃত” এই সাধারণ নামে মেদিনীপুর, লক্ষ্মণপুর, পুরী প্রভৃতি স্থানে উন্নতিশীল শাখাবিদ্যালয়সকল স্থাপিত হয়েছে।

রাঁচি প্রধানকেন্দ্রে একটি চিকিৎসা বিভাগ আছে যেখানে ঔষধ আর ডাক্তারদের সাহায্য স্থানীয় দরিদ্রব্যক্তিদের বিনামূল্যে দেওয়া হয়। চিকিৎসিত ব্যক্তিদের গড়পড়তা সংখ্যা বাৎসরিক ১৮,০০০ হাজারেরও বেশী। বিদ্যালয় খেলাধুলার ক্ষেত্রেও বেশ সন্মান অর্জন করেছে, আর শিক্ষাক্ষেত্রেও এর বহুছাত্র পরে বিশ্ববিদ্যালয়জীবনে প্রভূত যশের অধিকারী হয়েছে।

বহুবিধ কর্মপ্রচেষ্টার কেন্দ্রে এই বিদ্যালয়টির এক্ষণে ত্রিশবৎসর পূর্ণ হ'য়েছে। প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের বহু মনীষী বিদ্যালয়টি পরিদর্শন ক'রে একে সম্মানিত করেছেন। বিদ্যালয়ের প্রথম বৎসরে পরিদর্শনকারী ব্যক্তিবর্গের মধ্যে সর্বপ্রথম ছিলেন স্বামী প্রণবানন্দ, কাশীর সেই দুইদেহধারী সাধু। উন্মুক্ত আকাশের নীচে বৃক্ষতলে ছাত্রদের শিক্ষাদান এবং সন্ধ্যাকালে

যোগসাধনাকালীন ধ্যানের পর ঘণ্টা নিশ্চলভাবে ছোট ছোট ছেলেদের বসে থাকতে দেখে মহাশয় প্রণবানন্দজীর অন্তর গভীরভাবে আলোড়িত হয়ে উঠেছিল।

তিনি বলেছিলেন, “দেখে ভারি আনন্দ হচ্ছে যে, বালকদের উপযুক্ত শিক্ষা দেবার জন্তে লাহিড়ী মহাশয়ের আদর্শ এই বিদ্যালয়ে অচুম্বত হচ্ছে। আমার গুরুর আশীর্বাদ এর উপর চিরকাল ধরে বর্ষিত হোক।”

একটি ছোট ছেলে আমার পাশেই বসেছিল, ভরসা করে যোগিবাবুকে একটা প্রশ্নই করে বসলে। বললে,—

“মশায়,—আমি কি সন্ন্যাসী হ’ব? ভগবানের জন্তই কি আমার জীবন উৎসর্গ করা?”

স্বামী প্রণবানন্দজী যদিও হাসছিলেন, তবু তাঁর দৃষ্টি স্তব্ধ হয়ে নিবদ্ধ, যেন কোন কিছু রহস্যভেদ করবার চেষ্টা করছিলেন। তিনি উত্তর দিলেন, “বাহ! তুমি যখন বড় হ’বে, তখন তোমার একটি টুকটুকে বউ হ’বে, দেখো!” ছেলেটি বহুবছর ধরে সন্ন্যাসী হ’বার মতলব ক’রবার পর শেষ অবধি বিয়েই ক’রে ফেললে।

স্বামী প্রণবানন্দ রাঁচি থেকে ফিরলে আমি পিতার সঙ্গে কলকাতায় বাড়ীতে গেলুম। স্বামীজি সেখানে কিছুদিনের জন্ত ছিলেন। কয়েক বছর আগেকার স্বামী প্রণবানন্দজীর ভবিষ্যদ্বাণী মনে পড়ল, “পরে তোমার বাবা আর তোমার সঙ্গে দেখা করব।”

পিতা স্বামীজির ঘরে প্রবেশ করতেই তিনি দাঁড়িয়ে উঠে সসম্মানে পিতাকে আলিঙ্গন করলেন। তিনি বললেন, “ভগবতীবাবু, আপনি নিজে কি কচ্ছেন? দেখছেন না আপনার ছেলে ভগবানকে পাবার জন্তে কি রকম দ্রুত উন্নতি করছে?” পিতার সামনে প্রশংসার কথা শুনে লজ্জায় লাল হয়ে উঠলুম। স্বামীজি বলতে লাগলেন, “আপনার মনে আছে ত’, আমাদের পূজনীয় গুরুদেব কিরকম প্রায়ই বলতেন, ‘বনত, বনত, বনু যায়।’ তাই ‘ক্রিয়া’সাধন অবিরাম ক’রে যান, যা’তে ক’রে শীগগিরই ঈশ্বরসাক্ষাৎকারের লক্ষ্যস্থলে পৌঁছুতে পারবেন।”

প্রণবানন্দজীর দেহ আমার প্রথম কাশীদর্শনের সময় যা’ স্বাস্থ্যবান আর

দৃঢ় দেখেছিলুম তা' এখন স্পষ্টভাবে জরাগ্রস্ত, যদিও তাঁ'র শরীর এখনও চমৎকার ঋজু, দৃঢ় ও সবল।

আমি জিজ্ঞাসা করলুম, “স্বামীজি, আচ্ছা সত্যি ক'রে বলুন ত' আপনি শরীরে বার্কিকোর আবির্ভাব বুঝতে পারছেন না? শরীর দুর্বল হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কি আপনার ঈশ্বরানুভূতিও হ্রাস পাচ্ছে না?”

অতি মধুর হেসে তিনি বললেন, “আহা, প্রাণের ঠাকুর যে আমার কাছে আরও এগিয়ে এসেছেন, এখন তাঁ'কে আমি প্রাণে প্রাণে অনুভব করি!” তাঁ'র পরিপূর্ণ বিশ্বাস আমার মনপ্রাণ অভিভূত ক'রে ফেললে। তাঁ'রপর তিনি বলতে লাগলেন, “আমি এখন দুটি পেমন্ ভোগ করছি; একটি এখানকার ভগবতীবাবুর দরুণ আর একটি স্বর্গরাজ্যের!” ব'লে আকাশের দিকে অনুলিনির্দেশ ক'রে এক গভীর আনন্দে মগ্ন হ'য়ে পড়লেন, মুখমণ্ডল এক অপূর্বদীপ্তিতে উদ্ভাসিত,—আমার প্রশ্নের অভাবনীয় উত্তর!

প্রণবানন্দজীর ঘরে নানাজাতীয় গাছ আর বীজের প্যাকেট দেখে আমি তাঁ'দের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে কৌতূহলী হ'য়ে ওঠাতে তিনি বললেন, “কাশী আমি চিরকালের জন্তে পরিত্যাগ করে এসেছি। এখন আমি হিমালয়ের পথে পা বাড়িয়ে। সেখানে শিষ্যদের জন্তে আমি একটি আশ্রম খুলব। বীজগুলো থেকে শাকপাতা আর গোটাকতক তরিতরকারী হ'বে। আমার প্রিয়শিষ্যেরা খুব সহজ সরল ভাবেই জীবন যাপন করবে—ঈশ্বরসঙ্গলাভেই তাঁ'দের সময় কাটবে; ব্যস, আর কি চাই, ব'ল?”

পিতা তাঁ'র গুরুভাইকে জিজ্ঞাসা করলেন কবে তিনি কলকাতায় ফিরবেন। সাধুপ্রবর উত্তর দিলেন, “আর কখনও নয়। লাহিড়ীমহাশয় আমায় বলেছিলেন যে এই বছরই আমি আমার প্রিয় কাশী চিরকালের জন্তে পরিত্যাগ ক'রে হিমালয়ে যা'ব, সেখানেই দেহত্যাগ করবার জন্তে!”

তাঁ'র কথা শুনে আমার চক্ষুদু'টি অশ্রুপূর্ণ হ'য়ে এল, কিন্তু স্বামীজি অতি প্রশান্ত মধুরহাসি হাসলেন। তাঁ'কে দেখে মনে হ'ল যেন একটি স্বরগের শিশু জগজ্জননীর অভয়কোড়ে পরম নির্ভরতার আশ্রয়ে নিশ্চিন্তে বসে আছে। শ্রেষ্ঠ আধ্যাত্মিকশক্তিতে পূর্ণশক্তিমান যোগীবরের দেহে বার্কিক্যভাবের কোন রেখাপাতই হয় নি। তিনি অবশ্য শরীরকে ইচ্ছামাত্র নবভাবে গঠিত ক'রে তুলতে পারেন, কিন্তু তিনি কখন কখনও জরার আক্রমণ প্রতিহত করার

চেষ্টা করা গ্রাহ্যই করেন না, বরং এই জড়ভূমিতে কর্মক্ষম হ'তে দিগন্তে চলেন। শরীরটা তিনি এমনভাবে ব্যবহার করেন, যেন তাঁ'র এই জরাজীর্ণ দেহেই সব কর্মক্ষম হয়ে যায়, যা'তে ক'রে নবজন্মে আর তাঁ'কে দেহে কোর কর্মফল ভোগ করতে না হয়।

মাসকতক বাদে একটি পুরাতন বন্ধুর সঙ্গে দেখা হ'ল, নাম সনন্দন—প্রণবানন্দজীর প্রিয়শিষ্য।

উচ্ছসিত ক্রন্দনের মাঝে সনন্দন বলতে শুরু করলে, “আমার পৃষ্ঠভী গুরুদেব আর নাই, তিনি দেহরক্ষা করেছেন। হ্রদীকেশের কাছে একটি আশ্রম প্রতিষ্ঠা ক'রে আমাদের সমস্ত শিক্ষা দিচ্ছিলেন। যখন আমরা ভাল ক'রে শুদ্ধিয়ে বসে তাঁ'র সম্মুখভে বেশ দ্রুত আধ্যাত্মিক উন্নতিলাভ করছি, তখন তিনি একদিন প্রস্তাব করলেন যে হ্রদীকেশের একটি বড় দলকে খাওয়ানো হ'বে। জিজ্ঞাসা করলুম—এতবড় দলকে খাওয়ান কেন? বললেন, ‘এই আমার শেষ উৎসবপালন।’ তাঁ'র কথার সম্পূর্ণ অর্থ তখন হৃদয়ঙ্গম করতে পারি নি।

“প্রণবানন্দজী বিরাট রন্ধনব্যাপারের সব আয়োজনে স্বহস্তেই সাহায্য করেছিলেন। প্রায় দুইহাজার লোককে খাওয়ান হয়েছিল। ভাণ্ডারার পর তিনি একটা উঁচু পাটাতনের উপর বসে পরমাত্মাসম্মুখে একটি অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী আর ভাবপূর্ণ উপদেশ দিলেন। সেই উঁচু পাটাতনের উপর তখন আমি তাঁ'র পাশেই বসেছিলুম। বলা শেষ হ'লে তিনি হাজার হাজার লোকের সামনে আমার দিকে ফিরে অস্বাভাবিক জোরের সঙ্গে বললেন, ‘সনন্দন প্রস্তুত হও,—আমি দেহত্যাগ করতে যাচ্ছি।’

“বাকশক্তি লোপ পেয়ে কিছুক্ষণ নীরব হ'য়ে থাকবার পর আমি চিৎকার ক'রে ব'লে উঠলুম, ‘গুরুদেব, করবেন না, করবেন না, দোহাই আপনার—আপনি এ করবেন না।’ সমবেত জনতা ভয়ে, বিস্ময়ে হতবাক, সাপ্তাহে আমাদের মুখের দিকে তাকিয়ে। গুরুদেব আমার দিকে চেয়ে শুধু একটু হাসলেন মাত্র, কিন্তু দৃষ্টি তাঁ'র অনন্তের দিকে নিবদ্ধ।

“তিনি বললেন, ‘দেখ, স্বার্থপর হয়ো না আর আমার জন্তে দুঃখও কো'রো না। তোমাদের সকলেরই জন্তে ত’ এতদিন ধ'রে হাসিমুখে খাটলুম, এখন আনন্দ কর; আমাকে হাসিমুখে বিদায় দাও, আমি সেই পরমানন্দময়

প্রিয়তমের শাস্তিময় ক্রোড়ে বা'তে গিয়ে আশ্রয় পাই।' তা'রপর অর্দ্ধক্ষুট-
স্বরে বলতে লাগলেন, 'শীগ'গিরই আবার আমি জন্ম নিচ্ছি। অল্প কিছুকাল
পরমানন্দ ভোগ ক'রে আবার পৃথিবীতে ফিরে আসছি, বাবাজীর* সঙ্গে
মিলিত হ'তে। কবে আর কোথায় নতুনদেহে আমার আত্মা এসে জন্মগ্রহণ
করছে তা' তোমরা শীগ'গিরই জানতে পারবে।'

"আবার তিনি চিৎকার ক'রে বললেন, 'সনন্দন, এই দেখ, দ্বিতীয়
ক্রিয়াবলে † আমি এ নশ্বরদেহ ত্যাগ করলুম।'

"তিনি আমাদের সম্মুখে জনসমুদ্রের মুখের দিকে একবার তাকালেন,
তা'রপর সকলকে আশীর্বাদ করলেন। তা'রপর কূটস্থে দৃষ্টিসংলগ্ন ক'রে
তিনি স্থির নিশ্চল হয়ে পড়লেন। বিন্মিত জনতা যখন ভাবছিল যে তিনি
সমাধিতে মগ্ন হয়েছেন, তখন কিছু তাঁ'র আত্মা ইতিমধ্যেই এই রক্তমাংসের
দেহ পরিত্যাগ ক'রে পরমাত্মার ক্রোড়ে ঝাঁপ দিয়েছে! পদ্মাসনে উপবিষ্ট
তাঁ'র জড়দেহ শিষ্যেরা স্পর্শ ক'রে দেখলে যে তা'তে আর শরীরের
উত্তাপ নাই। মরণের অকরণ স্পর্শে কেবল একটি হিমশীতল দেহ সেখানে
পড়ে রয়েছে।"

আমি জিজ্ঞাসা করলুম, "প্রণবানন্দজী আবার কোথায় জন্ম নেবেন?"

সনন্দন উত্তর করলে, "সে একটা গোপনীয় কথা, বলা বারণ; তা'
আমি বলতে পারব না। আপনি বোধ হয় অল্প কোন উপায়ে তা'
জানতে পারেন।"

বহুবৎসর পরে আমি স্বামী কেশবানন্দজী মহারাজের কাছ থেকে জানতে
পেরেছিলুম যে, প্রণবানন্দজী তাঁ'র নবকলেবরে জন্মগ্রহণ ক'রবার পর
হিমালয়ে বজ্রীনারায়ণে গিয়ে মহাযোগী বাবাজীর সাধুসন্তদিগের দলে
যোগদান করেছিলেন।

*লাহিড়ী মহাশয়ের গুরু এখনও তিনি জীবিত আছেন। (৩৩শ পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।)

† লাহিড়ী মহাশয় কর্তৃক উপদিষ্ট দ্বিতীয় ক্রিয়া যে সাধক সম্পূর্ণভাবে আয়ত্ত করতে পেরেছেন,
তিনি যে কোন সময়ে সজ্ঞানে শরীর পরিত্যাগ ক'রে আবার তা'তে ফিরে আসতে পারেন। উচ্চ-
স্তরের যোগীরা অন্তিম মুহূর্ত্তে দ্বিতীয় ক্রিয়া প্রণালী অবলম্বন করেন—আর এ সময়ের আবির্ভাব
প্রায় নিতুলভাবেই জানতে পারেন।

২৮শ পৰিচ্ছেদ

কাশীর পুনর্জন্ম ও পুনরাবিষ্কার

তখন আমি রাঁচিতে। মাঝে মাঝে ছেলেদের নিয়ে এখান ওখানে প্রমোদভ্রমণে বেরুন হয়। সেদিন মাইল আষ্টেক দূরে এক পাহাড়ে বেড়াতে গেছি, ছেলেদের দল সঙ্গে। সামনে পুকুরের জলটি টনটন করছে দেখে ভারি লোভ হয়, কিন্তু আমার মনে কি রকম একটা বিড়ম্বনা এল। আমি বান্ধি ক'রে জল তুলে তাইতে স্নান করতে লাগলাম। ছেলেদের সাবধান ক'রে দিলাম, “দেখ, তোমরা কেউ জলে নেম না, বান্ধি ক'রে জল তুলে তাইতে সবাই স্নান কর।”

আমার কাছাকাছি যে দলটা ছিল তা'রা আমার দেখাদেখি বান্ধি ক'রেই জল তুলে স্নান করা আরম্ভ ক'রে দিলে; কতকগুলো ছেলে কিন্তু ঠাণ্ডা জলের লোভ আর সামলাতে পারলে না। জলে গিয়ে পড়ল। জলে পড়িতে না দিতেই বড় বড় জলটোড়া সাপ সব তা'দের চারধারে কিন্ধি ক'রে বেড়াতে লাগল। ছেলেগুলো ত' ভয়েই অস্তির। যে রকম ভাবে হড়মুড় ক'রে জল ছেড়ে ছুটে পালিয়ে আসতে লাগল, তা' দেখে হাড়ি সামলান দায়।

জায়গাটায় পৌঁছে আমাদের চড়িভাতির আয়োজন হয়েছিল। খাওয়া দাওয়া শেষ হ'লে আমি একটি গাছতলায় বসলাম, ছেলেরা চারদিকে ঘিরে। আমার একটু ভাবাবেশগোছের দেখে তা'রা প্রশ্নের উপর প্রশ্ন করতে লাগল।

একটি ছেলে জিজ্ঞাসা করলে, “স্বামীজি, বলুন না, আমি এই সম্মান্য পথে বরাবরই ত' আপনার সঙ্গে থাকতে পা'রব?” উত্তর দিলাম, “উই না, তোমায় জোর ক'রে বাড়ীতে ধ'রে নিয়ে যাবে, তা'রপরে তোমার বিয়েও হ'বে।”

কিছুতেই তা'র বিশ্বাস হ'ল না। দারুণ আপত্তি জানিয়ে বল্লে, “মরি যদি তবেই আমায় বাড়ী নিয়ে যেতে পারবে, তা'র আগে আর নয়!” কিন্তু মাসকয়েকের ভিতরেই তা'র পিতামাতা এসে তা'র অশ্রুসজল আপত্তিতে কোন কর্ণপাত না ক'রেই তা'কে বাড়ীতে টেনে নিয়ে গেল আর বছরকতক বাদে তা'র বিয়েও হ'ল।

এইরকম নানাপ্রশ্নের উত্তর দিতে দিতে কাশী ব'লে একটি ছেলে আমায় প্রশ্ন ক'রে বসল। ছেলেটির বয়স বছর বার, ভারি বুদ্ধিমান ছাত্র আর সবাই তা'কে ভালবাসে।

জিজ্ঞাসা করলে, “ম'শায়, আমার কি হ'বে?”

কে যেন জোর ক'রেই উত্তরটা আমার মুখ থেকে বা'র করালে, “তোমার শীগ'গিরই মৃত্যু ঘটবে।”

এই হঠাৎ আর অপ্রত্যাশিত উত্তরে আমার আর উপস্থিত সকলেরই মনে গভীর আঘাত আর দুঃখ উপস্থিত হ'ল। মনেমনে নিজেকে ঠোঁটকাটা ব'লে তিরস্কার ক'রে নীরব হয়ে রইলুম আর কারও উত্তর দেব না স্থির করলুম।

বিদ্যালয়ে ফিরে কাশী আমার ঘরে দেখা করতে এল। ক্রন্দনবিজড়িত-স্বরে বল্লে, “যদি আমি মরি তা' চ'লে বলুন স্বামীজি যে, আমার পুনর্জন্ম চ'লে আপনি আমায় খুঁজে বা'র করবেন আর আবার আমায় আধ্যাত্মিক পথ নিয়ে আসবেন?”

এই কটিন গৃঢ় ভবিষ্যৎ দায়িত্বভার গ্রহণ অস্বীকার করতেও কিছু মনে কষ্ট হ'ল। তা'রপর কয়েকহপ্তা ধ'রে কাশী আমায় অনবরতই পীড়াপীড়ি ক'রতে লাগল। তা'র অত্যন্ত ভয়ত্রস্ত ভাব দেখে শেষ পর্য্যন্ত আর কি করি, তা'কে আমায় আশ্বাসই দিতে হ'ল। বললুম, “আচ্ছা, আমি প্রতিজ্ঞা করছি যে, যদি করুণাময় পরমপিতা তাঁ'র সাহায্য দেন, তা'হ'লে অবশ্যই তোমায় খুঁজে বা'র ক'রবার চেষ্টা ক'রব।”

গ্রীষ্মের ছুটিতে অল্প কিছুদিনের জগ্ন বেরিয়ে পড়লুম। কাশীকে সঙ্গে নিতে পারব না দেখে যাবার আগে আমি তা'কে আমার ঘরে ডাকিয়ে বিশেষ ক'রে উপদেশ দিলুম যে যতই পীড়াপীড়ি হোক না কেন, সে যেন বিদ্যালয়ের আধ্যাত্মিক আবহাওয়ার ভিতরেই থাকে, বাইরে কোথাও যেন না

যায়। কেন জানি না মনে হ'ল যে, যদি সে বাড়ীতে না যায়, তা'হ'লে সে হয়ত' আসন্ন বিপদের হাত এড়াতে পারে।

আমি চলে আসতে না আসতেই কাশীর বাবা রাঁচিতে গিয়ে হাজির হ'লেন। পনরদিন ধ'রে তাঁ'র চেষ্টা চলল কাশীর মন ভাঙ্গাতে। কেবলই বোঝাতে লাগলেন যে, কাশী যদি মাত্র দিনচারেকের জন্তে তা'র না'কে একবার দেখতে কলকাতায় যায়, বাস্—তা'হ'লেই সে ফিরে আসতে পারবে আর সেখানে তা'কে থাকতে হ'বে না।

কাশীও দৃঢ়ভাবে সব অস্বীকার ক'রে যেতে লাগল, কিছুতেই আর রাজি হয় না। আর কোন উপায় না দেখে কাশীর বাবা শেষে বললেন যে তিনি পুলিশ দিয়ে ছেলেকে ধরিয়ে নিয়ে যা'বেন। এই রকম ভয় দেখানতে কাশী অত্যন্ত বিব্রত হ'য়ে পড়ল। এই ভেবে সে ভয় পেলে যে হয়ত' এই রকম ব্যাপারে বিদ্যালয়ের কোন রকম দুর্গাম হ'বে আর একটা অবস্থা অন্ময় হৈ হৈ স্কুর হ'য়ে যাবে, যা হ'তে দিতে সে একান্ত অনিচ্ছুক। কাষেই যাওয়া ছাড়া তা'র আর কোন উপায়ই রইল না।

দিনকতক বাদেই ফিরলুম রাঁচিতে। যখন শুনলুম যে কাশীকে কি ভাবে টেনে নিয়ে যাওয়া হয়েছে, তখনই ছুটলুম কলকাতার ট্রেন ধরতে। কলকাতায় নেমে একটা ঘোড়ারগাড়ী ভাড়া করলুম। গাড়ী যখন হাওড়ার পোলের উপর তখন দেখি যে, কাশীর বাবা আর তা'র অন্ময় আত্মীয়েরা অশৌচ ধারণ ক'রে চলেছেন। গাড়োয়ানকে চিৎকার ক'রে গাড়ী থামাতে ব'লে তাড়াতাড়ি গাড়ী থেকে নেমে পড়লুম। হতভাগ্য পিতার দিকে শুধু ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়েই রইলুম খানিকক্ষণ। তা'রপর কতকটা যেন অসঙ্গতভাবেই ব'লে উঠলুম, “খুনী ম'শায়, আমার বাছাকে আপনিই খুন ক'রে ফেলেছেন, আর কেউ নয়।”

কাশীকে জোর ক'রে কলকাতায় নিয়ে আসাতে যে কি পরিমাণ অন্ময় করেছেন তা' তা'র পিতা ইতিমধ্যে বেশ দারুণই উপলব্ধি ক'রতে পেরেছেন। যে সামান্য কয়দিন কাশী সেখানে ছিল, তা'রই মধ্যে কাশী দূষিত খাদ্য গ্রহণ ক'রে কলেরায় আক্রান্ত হয়, তা'রপরেই তা'র সব শেষ!

কাশীর উপর আমার যে ভালবাসার টান ছিল আর তা'র মৃত্যুর পর তা'কে খুঁজে বা'র ক'রবার যে আমার প্রতিশ্রুতি ছিল, তা' দিবারাত্র মনকে



(বামে) পুনর্জাত কাশো । (দক্ষিণে) আমার ছোট ভাই বিষ্ণু;
শ্রীমতিলাল মুখোপাধ্যায়, চাত্রা, শ্রীরামপুর; আমার পিতা;
মিষ্টার রাইট; আমি; শ্রীতুলসী নারায়ণ বসু ও স্বামী সত্যানন্দ ।



বোষ্টনে আন্তর্জাতিক ধর্মমহাসভায় (১৯২০) উপস্থিত প্রতিনিধিবৃন্দ ।

আমেরিকার এইখানেই আমার প্রথম বক্তৃতা-প্রদান ।

(বাম হইতে দক্ষিণে) রেভাঃ ব্লে ম্যাককলি, রেভাঃ টি, রঞ্জা উইলিয়ামস,
থোঃ এস, উশোগাসাকি, রেভাঃ জাবেজ, টি, সঞ্জারল্যাণ্ড, আমি, রেভাঃ চাল সস,
ডব্লিউ ওয়েন্ড, রেভাঃ স্যামুয়েল এ, ইলিয়ট, রেভাঃ বেসিল মার্টিন, রেভাঃ
ক্রাইস্টোফার জে, ট্রীট, রেভাঃ স্যামুয়েল, এম, ক্রোথাস ।



গঙ্গাসাগরতীরে পরমহংস যোগানন্দ ।

ভোলপাড় ক'রতে লাগল। যেখানেই যাই না কেন তা'র মুখটি চোখের সামনে ভাসতে থাকে। আমার পরলোকগতা জননীর জন্তে যে রকম খোঁজাখুঁজি শুরু করেছিলুম সেই রকমই খোঁজাখুঁজি শুরু করলুম কাশীর জন্তে; এও একটা খুব স্মরণীয় ব্যাপার।

মনে মনে ভাবলুম যে ভগবান আমায় যে বিচারশক্তি দিয়েছেন, তা'ই আমি এখন কাষে লাগাব আর আমার বা' কিছু শক্তি আছে তা'র চূড়ান্ত প্রয়োগ ক'রব সেই সব হুম্ম বিধিনিয়ম আবিষ্কার করতে, যা'তে ক'রে আমি জানতে পারি যে সে তা'র হুম্মদেহে কোথায় অবস্থান করছে। আমি জানতে পেরেছিলুম যে তা'র আত্মা এখনও অনন্ত বাসনাকামনায় জড়িত, এখনও তা'র পূর্ণ মুক্তিলভ ঘটেনি। কোথায় কোন হুম্মস্তবে লক্ষকোটি জ্যোতিষ্মান আঙ্গিকদের মধ্যে একটা জ্যোতিঃপিণ্ডের মত সে আজ ভেসে বেড়াচ্ছে। ভাবতে লাগলুম কি ক'রে এত অসংখ্য আঙ্গিক জ্যোতিষ্মণ্ডলের মাঝখান থেকে তা'কে খুঁজে বা'র ক'রে তা'র সঙ্গে সংযোগস্থাপন ক'রব।

একটি গুপ্ত বৌগিকপ্রক্রিয়া অবলম্বন ক'রে আমি দুই ভ্রমশূন্য কূটস্থের ভিতর দিয়ে কাশীর আত্মাব কাছে আমার ভালবাসার আহ্বান প্রেরণ করতে লাগলুম। আকাশে টাঙান বেতারের তারের মত দুটো হাত আর আঙুলগুলো আকাশের দিকে তুলে আমি প্রায়ই চারিদিকে ঘুরে ঘুরে দেখতুম যে কোন্ দিকে সে গর্ভস্থ ভ্রূণের মধ্যে পুনরায় জন্মগ্রহণ করেছে সে দিক নির্ণয় করা যায় কি না। আশা হ'ল যে অন্তরের রেডিওর ভিতর গভীর মনঃসংযোগবলে আমি তা'র কাছ থেকে প্রত্যুত্তর পা'ব। *

অন্তরে টের পেয়েছিলুম যে কাশী শীগ্গিরই এ পৃথিবীতে ফিরে আসবে আর আমি যদি অবিরত আমার আহ্বান তা'র কাছে পাঠাই তা'হ'লে তা'র

* বৌগীরা অবগত আছেন যে ইচ্ছাশক্তি, দুই ভ্র'র মধ্যস্থিত বিন্দু হ'তে প্রক্ষেপিত হ'লে চিন্তাতরঙ্গনিষ্ক্ষেপক যন্ত্রই হ'য়ে দাঁড়ায়। হৃদয়ে যখন কোন ভাব বীরে ধীরে ঘনীভূত হয় তখন সে একটা মানসিক রেডিও যন্ত্রেরই মতন কাষ করে আর দূর বা নিকট হ'তে সংবাদও গ্রহণ করতে পারে। তেলিপ্যাথি বা পরচিন্তাজ্ঞানে মানুষের মনের চিন্তাধারার হুম্ম স্পন্দনগুলি প্রথমতঃ মহাকাশের ঈশ্বরের হুম্ম স্পন্দন দ্বারা তা'রপর তা'রা সব আরও স্থূল পার্থিব ঈশ্বরের মধ্য দিয়ে বৈদ্যুত রূপে পরিচালিত হয়, সেগুলি আবার অপরের মানসপটে চিন্তাতরঙ্গরূপে পরিণত হয়।

আম্মা শীগগিরই তা'র উত্তর দেবেই। আমি জানতুম যে কাশীর দ্বারা প্রেরিত সামান্ত্রতম স্পন্দনও আমার আঙুল, হাত, মেরুদণ্ড আর স্নায়ুশৃঙ্খল দ্বারা নিশ্চয়ই অনুভূত হবে।

কাশীর মৃত্যুর পর অদম্য উৎসাহে আমি সেই যৌগিকপ্রক্রিয়া মাসছয়েক ধরে অধ্যবসায়ের সঙ্গে অভ্যাস করে যেতে লাগলুম। জনকতক বন্ধুবান্ধব নিয়ে বৌবাজারে রাস্তার ভিড়ের মধ্য দিয়ে চলতে চলতে অভ্যাসমত একবার হাত তুললুম। এই প্রথমবার তা'র উত্তর পেলুম। ঠিক যেন একটা বৈদ্যুতিক তরঙ্গ আমার আঙুল আর হাতের তালু বেয়ে নেমে আসছে টের পেয়ে শরীর রোমাঞ্চিত হ'য়ে উঠল। এই তরঙ্গগুলো যেন গাঢ় সংবদ্ধ হ'য়ে আমার জ্ঞানের গভীরতম প্রদেশে প্রবেশ করে কেবলমাত্র একটা প্রবল চিন্তারূপেই আমার অন্তরের মধ্যে অবিরত ধ্বনিত হ'তে লাগল, “আমি কাশী, আমি কাশী, আমার কাছে আসুন!”

আমার হৃদয়ের রেডিওতে মনঃসংযোগ করাতে ঐ চিন্তাটি যেন তখন স্পষ্টরূপেই শোনা যেতে লাগল। বারম্বার আমি কাশীর ডাক শুন্তে পেলুম, অদ্ভুত তা'র সেই ঈষৎ ভাঙ্গাগলায় * চুপিচুপি স্বরে। নাঃ, এ কাশীই ত' বটে! আমার সঙ্গী প্রকাশ দাসের † হাত টেনে ধরে আনন্দে হেসে উঠে বললুম, “মনে হচ্ছে যেন এবার কাশীর খোঁজ পেয়েছি।”

আমি আবার সেই রকম করে হাত তুলে ধরে চারিদিকে ঘুরতে আরম্ভ করলুম। আমার বন্ধুদের আর পথচারী পথিকদের তা' দেখে ত' বড়ই মজা লাগল। তা'রা ভাবলে, এ আবার কি ব্যাপার? আমি এখানে ঘুরেই চলেছি। মজা হচ্ছে এই যে, যেই মাত্র আমি কাছেই একটা গলি “সার্পেন্টাইন লেনের” দিকে মুখ করি, অমনি সেই বিদ্যুৎস্রোত আমার আঙুল দিয়ে বইতে আরম্ভ করে, আর অতদিকে মুখ ফিরলেই সেই সূক্ষ্মতরঙ্গ একেবারে অন্তর্হিত হয়!

* জীবাক্সা মাত্রেরি শুদ্ধ অবস্থায় সর্বদর্শী। কাশীর আত্মা, কাশীর পূর্বজন্মের বালকাবস্থার সর্বপ্রকার বৈশিষ্ট্যই স্মরণপথে রেখেছিল আর সেই জন্তই আমার পরিচয় জ্ঞাপন করবার জন্য তার তারিগলার স্বরের অনুকরণ করা সম্ভবপর হয়েছিল।

† বর্তমানে ব্রহ্মচারী শ্রীপ্রকাশ—দক্ষিণেশ্বর যোগদা মঠের অধ্যক্ষ।

তখন আমি ব'লে উঠলুম, “ওহে, এই গলির ভিতরেই একটা বাড়ীতে কোন মায়ের পেটে কাশীর আত্মা এসে বাস ক'রছে, এস ত' দেখি!”

সঙ্গীরা আর আমি ত' মার্শেপোর্টাইন লেনের দিকে এগোতে লাগলুম। সঙ্গে সঙ্গে আমার উত্তোলিত হস্তে বৈদ্যুতিকতরঙ্গের আঘাতও প্রস্ফুটতর হ'তে লাগল। চলতে চলতে বোধ হ'ল যেন একটা চুম্বক আমার রাস্তার ডানধারে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। সেইধারের একটা বাড়ীর দরজার কাছে এসে আমার পা গেল আটকে! অবাক হ'য়ে গেলুম। দারুণ উত্তেজনায় নিঃশ্বাস বন্ধ, দরজায় ধাক্কা দিতে লাগলুম। বুঝলুম যে আমার এই স্মদীর্ঘ, আর অত্যন্ত সন্ধানের জন্ত পরিশ্রম করা আজ সার্থক আর তা'র শেবও আজ হয়েছে!

একটা ঝি এসে দরজা খুলে দিলে। জিজ্ঞাসা করতে বললে যে, মনিব তা'র বাড়ীতেই আছেন। তিনি তেতলা থেকে সিঁড়ি দিয়ে নেমে এসে হাসিমুখে জিজ্ঞাসা করলেন কি চাই? মুকিলে পড়ে গেলুম; কি বলি তা' ভেবে পাইনে, আমার প্রশ্ন যে একাধারে সঙ্গত আর অসঙ্গত দুইই!

যাক, ভরসা ক'রে ব'লেই ফেললুম, “ম'শায়, কিছু যদি না মনে করেন তবে একটা কথা জিজ্ঞাসা করি—আপনারা কি একটি সন্তান আশা করছেন, এই ধরুন মাস ছয়েক হ'ল, এ'্যা?” *

* জড়দেহ বিযুক্ত হ'য়ে বহু লোকের আত্মা যদিও ৫০০ হ'তে ১০০০ বৎসর পর্যন্ত সূক্ষ্মরূপে স্থবল্য করে, তবুও দেহ হ'তে দেহান্তরগ্রহণের মধ্যবর্তীকালের দীর্ঘতার কোন অপরিবর্তনীয় বা নির্দিষ্ট নিয়ম নাই। (৪৩ পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)। কাশী এই পৃথিবীতে অবিলম্বেই প্রত্যাবর্তনের ইচ্ছা প্রকাশ করেছিল তাই আমি অন্তরে এই আশ্বাস লাভ করেছিলুম যে তা'র ইচ্ছা পূর্ণই হ'বে। সুতরাং বলা বা নিয়মেরই প্রতীক—এইজন্তই সাধারণ ভাষায় তা'কে যম বলে। মৃত্যু আর নিদ্রা বা প্রকৃতপক্ষে বলতে গেলে সাময়িক মৃত্যু ছাড়া আর কিছু নয়, তা'র রূপগতে অবশ্যস্তাবী আর তা' অজ্ঞানচ্ছন্ন মানবকে ইন্দ্রিয়বোধের মায়াজাল হ'তে সাময়িকভাবে মুক্ত করে। মানুষের পরম সন্তা আত্মা বলে সে নিদ্রা বা মহানিদ্রা অর্থাৎ মৃত্যুতে তা'র অশরীরাত্মের কতকগুলি সঙ্গবানী স্মারকচিহ্ন পায়।

কাশীর অকালমৃত্যু হচ্ছে কর্মবিধির অবশ্যস্তাবী ফল। হিন্দুশাস্ত্রের বর্ণনা অনুসারে কর্মসূত্রের নার্কজনীন নিয়ম হচ্ছে, ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া, কার্য ও কারণ, আবাদ ও ফসল। স্বাভাবিক পুণ্য-জীবনে মানুষ তা'র চিন্তা আর কার্যের দ্বারা তা'র নিজের ভাগ্য নিজেই রচনা করে। যেকোন শক্তিই সে সঞ্চালিত করুক না কেন তা'দের ক্রিয়াফলপ্রসূ হিসেবে সে-সবই তা'র কাছে ফিরে আসে। মানুষের জীবনের মধ্যে বসে কিছু অসামঞ্জস্য আছে তা'র মধ্যে কর্মবিধিকে স্থায়ের বিধান ব'লে জানতে পারলে মানুষের মন ঈশ্বর আর মানুষের প্রতি অমর্ষ বা ক্ষোভ হ'তে মুক্ত হয়।

ভারতের বিভিন্ন মহাপুরুষগণ “তীর্থকর” ব'লে অভিহিত হয়েছেন, কারণ তাঁ'রা পথভ্রান্ত মানব-জাতিকে ঋদ্ধাঙ্কবিনুদ্ধ সংসারসমুদ্র পার হ'বার জন্ত পথ প্রদর্শন করেন। সংসার বা জগৎপ্রবাহ মানুষকে সবচেয়ে নিষ্কণ্ঠ পথই অবলম্বন ক'রতে প্রলুব্ধ করে। বাইবেলে তাই বর্ণিত হয়েছে যে,

গেরুয়াপরা একজন সন্ন্যাসীকে দ্বারপ্রান্তে উপনীত দেখে ভদ্রলোক সবিনয়ে উত্তর দিলেন, “আজ্ঞে হ্যাঁ, তাই বটে! কিন্তু দয়া করে বলুন ত’ আপনি আমার বাড়ীৰ খবর সব জানলেন কি ক’রে?”

তা’রপর যখন কাশীর ব্যাপার আর আমার প্রতিজ্ঞার কথা সব শুনলেন, তখন বিষয়ে স্তম্ভিত ভদ্রলোক সমস্ত কথাই বিশ্বাস করলেন।

আমি তাঁকে বললুম, “আপনার একটি ছেলেই হ’বে। গৌরবর্ণ, চওড়া মুখ, কপালে দাগ—ধর্ম্যভাব তা’র খুবই প্রবল হ’বে।” মনে মনে তখন স্থিরনিশ্চয় হ’য়েছিলুম যে, ছেলেটি ভূগিষ্ঠ হ’লে কাশীর এইসব লক্ষণের সঙ্গে তা’র সৌসাদৃশ্য থাকবেই।

পরে আবার ছেলেটিকে দেখতে গিয়েছিলুম। বাপ মা তা’র পূর্ব জন্মের সেই পুরান নাম কাশীই বেখেছিলেন। আমার প্রিয়শিষ্য কাশীর সঙ্গে অতি শৈশবেও তা’র আশ্চর্য্যরকম সৌসাদৃশ্য ছিল। শিশুটি আমার দেখেই অত্যন্ত আকৃষ্ট হ’য়ে পড়ত। পূর্বজন্মের বা’ আকর্ষণ ছিল, তা’ এবার দ্বিগুণ জোরের সঙ্গে ফিরে এসেছে।

বহুরকয়েক বাদে, আমি আমেরিকায় থাকতে সে আমায় চিঠি লিখেছিল। তখন সে কিশোর বালক। সন্ন্যাসগ্রহণে তা’র গভীর আগ্রহের কথা সে আমায় জানিয়েছিল। আমি তা’কে হিমালয়ের এক গুরুর সন্ধান দিই। তিনি আজ পর্য্যন্ত পুনর্জাত কাশীকে এই পথেই পরিচালিত ক’রে নিয়ে চলেছেন।

“অতএব যে কেউ সংসারের বন্ধু হ’বে, সে ভগবানের শত্রু।” ভগবানের বন্ধু হ’তে গেলে মানুষকে তা’র নিজ কর্ম্মফলের অন্তত প্রভাবের হাত এড়িয়ে অবশ্যই চলতে হ’বে, কারণ তা’র এই সব কর্ম্মফল তা’কে সংসারের মায়ায় প্রলুব্ধ হ’তে অসহায় আর নীরব সম্মতিদানে বাধ্য করে। কর্ম্মফলের লোহবিধির জ্ঞান নতানুসন্ধিৎসুকে কর্ম্মবন্ধ হ’তে চরম মুক্তি পাবার পথ খুঁজে বা’র করবার উদ্দেশ্য প্রদান করে। মানুষের কর্ম্মবন্ধনের দামত্বের মূল হ’চ্ছে তা’র অজ্ঞান তমসাচ্ছন্ন মনের গহনগহন লুক্কায়িত কামনাবাসনার ভিতরে, কাষেই যোগীর সর্বপ্রথম আর সর্বপ্রধান কর্তব্য হ’চ্ছে মনসংযম বা চিন্তাবৃত্তিনিরোধ। একে একে মানুষের অজ্ঞানাবরণ সব খসে পড়তে থাকলে, মুক্ত, শুদ্ধ, অপাপবিদ্ধ হয়ে মানুষের আত্মদর্শন লাভ হয়।

২৯শ পরিচ্ছেদ

রবীন্দ্রনাথ ও আমার মতবাদের আলোচনা

রাঁচি বিদ্যালয়ে ভোলানাথ নামে একটি ভারি বুদ্ধিমান বছর চৌদ্দর ছেলে ছিল,—অতি চমৎকার সে গাইতে পারত। একদিন সকালে সে রবীন্দ্রনাথের একটি গান গাইছিল। শুনে ভারি খুসি হ'য়ে তা'কে প্রশংসা করতে ভোলানাথ বল্লে, “রবিঠাকুরের গান পাখীর কলকণ্ঠে আনন্দধ্বনির মত; গাইলে প্রাণের উচ্ছ্বাস আপনা আপনি স্বাভাবিকভাবে বেরিয়ে পড়ে, এত মিষ্টি লাগবেই!” আবার সে গান আরম্ভ ক'রে সুরের স্রোতে আকাশ বাতাস ছেয়ে ফেল্লে। ছেলেটি বোলপুরের শান্তিনিকেতনে কিছুদিন ছিল।

ভোলানাথকে বল্লুম, “ছেলেবেলা থেকে আমিও রবীন্দ্রনাথের গান গেয়ে আসছি। সারা বাংলা, এমন কি অশিক্ষিত চাষাভূষোরাও তাঁ'র উচ্চভাবের সঙ্গীতে ভারি আনন্দ পায়।”

ভোলাতে আমাতে গোটাকতক রবিবাবুর গান এক সঙ্গে গাইলুম। তিনি প্রাচীন কবিতা এবং তাঁ'র নিজের শত শত মৌলিক কবিতা-রচনাতেও সুরসংযোজনা করেছেন। এসব এক একটি অপূর্ব জিনিষ, এদের তুলনা মেলা ভার।

গানের শেষে আমি বল্লুম, “রবিঠাকুর নোবেল প্রাইজ পাবার পরই তাঁ'র সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়েছিল। তাঁ'কে দেখতে গিয়েছিলুম কেন জান? কারণ তাঁ'র সাহিত্যিক সমালোচকদের আক্কেল দেবার জন্তে তাঁ'র সরল নাসোক্তি আমার শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেছিল ব'লে”, ব'লেই হেসে উঠলুম।”

ঘটনাটা শোন্বার জন্তে ভোলার কৌতুহল উদ্দীপ্ত হ'য়ে উঠল।

আমি শুরু করলুম, “বাংলা কবিতায় নতুন ধারা প্রবর্তন করতে সাহিত্যসেবীর প্রচণ্ড সমালোচনা জুড়ে দিয়ে তাঁ'কে যাচ্ছেতাই আরম্ভ

করলে। তাঁ'র অপরাধ যে তিনি ব্যাকরণনির্দিষ্ট লোহার বাঁধন ভেঙে দিয়ে তিনি লেখা আর কথা ভাষার সংমিশ্রণ ঘটিয়েছিলেন। প্রচলিত সাহিত্যের গতানুগতিক ধারা লঙ্ঘন ক'রলেও তাঁ'র গানে গভীর দার্শনিকতত্ত্ব আর দি গভীর ভাবময় আবেগ রয়েছে ব'ল দেখি ?

“একজন হৃদয়হীন নির্দুর সমালোচক রবীন্দ্রনাথের কবিতাকে ‘পায়রা কনির বকবকানি, তা'ও ছাপালি পগ হ'ল—নগদ মূলা একটাকা’ ব'লে উল্লেখ ক'রেছিলেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের প্রতিশোধের স্বেযোগও তাঁ'রপরে এসে গেল; গীতাঞ্জলির ইংরেজি অনুবাদ বা'র হওয়ামাত্রই সারা প্রতীচ-জগৎ তাঁ'র পদতলে এসে তাঁ'কে শ্রদ্ধাৰ্থা নিবেদন করলে। দেখে শুনে দূর সাহিত্যিক ধুরন্ধরের দল,—তাঁ'দের মধ্যে তাঁ'র পূর্বেকার সমালোচক-প্রভুরাও ছিলেন, ট্রেন বোকাই হয়ে ত' শাস্তিনিকেতনে তাঁ'কে অভিনন্দন দিতে ছুটলেন।

“রবীন্দ্রনাথ একটু ইচ্ছা ক'রেই নিলম্ব ক'রে তাঁ'দের সঙ্গে সাক্ষাৎ ক'রতে এলেন। তা'রপর দারুণ গভীর নীরবতার মধ্যে তাঁ'দের প্রশংসানাদ দূর শুনে অবশেষে তিনি তাঁ'দেরই সমালোচনায় ব্যবহৃত আক্রমণাত্মক তাঁ'দের ফিরিয়ে দিয়ে বললেন, ‘ভদ্রমহোদয়গণ, আজ এখানে আমার কাছে যে সম্মানের সৌরভ বিতরণ ক'রতে এসেছেন তাঁ'র সঙ্গে কিন্তু আপনাদের অতীতের ঘৃণার পৃতিগন্ধ অত্যন্ত বিসদৃশভাবেই মিশে রয়েছে। আমার নোবেল প্রাইজ পাওয়ার সঙ্গে আপনাদের এই হঠাৎ আপ্যায়নের প্রবল ইচ্ছা উদয়ের সম্ভবতঃ কোন সংযোগ আছে না কি ? বাংলার কাব্যসরস্বতী চরণতলে যখন আমি আমার প্রথম দীন উপচার শ্রদ্ধাকুসুম নিবেদন ক'রে আপনাদের বিরাগভাজন হয়েছিলুম, এখনও ত' আমি সেই কবিই রয়েছি।’

“খবরের কাগজে রবীন্দ্রনাথের এই দারুণ তিরস্কার খুব বড় বড় ক'রেই ছাপা হ'ল। চাট্টবাদের মোহমুক্ত ভদ্রলোকের এই স্পষ্টোক্তিই আমি অত্যন্ত খুসি হয়েছিলুম। কলকাতায় তাঁ'র সেক্রেটারী মিঃ সি, এফ, এণ্ডুজ্জ্ দ্বারা তাঁ'র সঙ্গে আমি প্রথম পরিচিত হই। এণ্ডুজ্জ্ সাহেবের পরিধানে সাদাসিধে ধুতি। রবীন্দ্রনাথকে এণ্ডুজ্জ্ সাহেব সশ্রদ্ধভাবে ‘গুরুদেব’ বা'র সম্বোধন করতেন।

“রবীন্দ্রনাথ আমায় সাদরে গ্রহণ করলেন। তাঁ'র মধ্য থেকে যেন একটি

রুষ্টি, সৌজন্য আর শাস্তিময় মাধুর্যের ছটা বেরিয়ে এসে তাঁ'র ব্যক্তিত্বকে একটা অপূর্ণশ্রীমণ্ডিত করেছিল। রবীন্দ্রনাথ আমার কাছে উল্লেখ করেছিলেন যে, আমাদের প্রাচীন ধর্ম মহাকাব্য ছাড়া তাঁ'র কবিতাদ্বারার মূলউৎস ছিল বিজ্ঞাপতি।”

মন যখন এই সব স্মৃতির সোঁরতে ভরপুর, আমি তখন গাইতে শুরু করলুম, রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক রূপান্তরিত একটি পুরান বাংলা গান, “আমার এ ধরে, আপনার করে, গৃহ-দীপখানি জ্বালো।।”

বিজ্ঞানপ্রাঙ্গণে ভ্রমণের সময় আবার উৎকল্লহদয়ে শুরু করলুম ভোলাতে আর আমাতে রবীন্দ্রনাথের গান গাইতে।

রাঁচিবিদ্যালয় স্থাপনের প্রায় বছরছই বাদে আমি রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে নিমন্ত্রণ পেলাম শাস্তিনিকেতনে যেতে, আমাদের উভয়ের শিক্ষার আদর্শ সম্বন্ধে আলোচনা করতে। খুব খুসি হয়েই গেলুম। আমি যখন প্রবেশ করি, কবি তখন তাঁ'র পাঠ্যগৃহে বসেছিলেন। আমাদের প্রথম সাক্ষাতের সময় যেমন মনে হয়েছিল, এবারও তেমনি মনে হ'ল যে—সামনে বসে রয়েছে শ্রেষ্ঠ মানবত্বের এক অপূর্ণ সুন্দর আদর্শ যা' যে কোন চিত্রকরের একান্ত কাম্যবস্তু। দীর্ঘকেশ আর আবক্ষবিলম্বিত শ্মশ্রুজালে শোভিত সুগঠিত প্রশান্ত সৌম্য আনন, দীর্ঘ আয়ত চক্ষু'টিতে স্বপ্নময় স্নিগ্ধকোমল দৃষ্টি, মুখে স্বর্গীয়হাসি; কর্ণধর বাঁশীর মত, সত্যিই যেন প্রাণ কেড়ে নেয়! সুদীর্ঘ, ঋজু সৌম্যদেহে যেন রমণীর কোমলতার সঙ্গে শিশুর আনন্দচঞ্চলতা মিশ্রিত। কোনও কবির আদর্শভাব এই প্রিয়দর্শন প্রশান্তমূর্ত্তির চেয়ে অধিকতর উপযুক্ত রূপপরিগ্রহ করতে পারে না।

রবীন্দ্রনাথ ও আমি আমাদের উভয়ের মতবাদের তুলনামূলক সমালোচনায় শীঘ্রই গভীর ভাবে নিমগ্ন হ'য়ে পড়লুম। উভয়েই মত গতানুগতিক দ্বারার বাইরে। অবশ্য উভয়মতের মধ্যে সাদৃশ্যও ছিল যথেষ্ট—যেমন মুক্ত আকাশ-তলে শিক্ষাদান, অনাড়ম্বর সরল জীবনযাপন, শিশুদের স্বজনীশক্তির উন্মেষণে প্রচুর অবকাশ। রবীন্দ্রনাথ কিন্তু সাহিত্য ও কবিতার উপরেই বেশী বোঁক দিলেন আর দিলেন গীতিবাদ্যের মধ্য দিয়ে আত্মবিকাশ, যা' আমি ভোলার ক্ষেত্রে ইতিমধ্যেই লক্ষ্য করেছি। শাস্তিনিকেতনের ছাত্রেরা সাময়িকভাবে

মৌনব্রত পালন ক'রত রটে, কিন্তু কোন বিশেষ যোগশিক্ষা তা'দের দেওয়া হ'ত না।

“যোগদা” প্রণালীর অভ্যাস এবং যৌগিক উপায়ে মনঃসংযোগের প্রক্রিয়াগুলি যা' রাঁচিবিদ্যালয়ের সব ছাত্রদেরই শিক্ষা দেওয়া হয়, তা'র বর্ণনা কবি অভ্যন্ত মনোযোগসহকারেই শুনলেন।

তা'রপর রবীন্দ্রনাথ তাঁ'র বাল্যকালে বিদ্যাল্যভের কাহিনী বর্ণনা করতে আরম্ভ ক'রে হেসে বললেন, “ফিফ্‌থ্‌ ক্লাস থেকেই স্কুলে ইস্তফা দিয়ে পলায়ন করেছিলুম।” আমি তখনই বুঝলুম যে, তাঁ'র কবিমন বিদ্যালয়ের গুরু নিয়মালুপত স্বাসরোবী বদ্ধবায়ু পরিত্যাগ ক'রে কেন মুক্তপক্ষ বিহঙ্গমের মত কাব্যগগনে কল্পনার পাখা বিস্তার ক'রে উড়তে চেয়েছিল।

“এই জন্মেই আমি শান্তিনিকেতন প্রতিষ্ঠা করলুম, ছায়াঘন তরুতলে আকাশের উদার সৌন্দর্য্যবিস্তারের নীচে”, ব'লেই তিনি সুন্দর একটি উপবনতলে শিক্ষারত ছোট্ট একটি শিশুর দলের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ ক'রলেন। তা'রপর তিনি বলতে লাগলেন, “শিশুর স্বাভাবিক পরিবেশ হ'চ্ছে কুল আর পাখীর গানের মধ্যে। এর ভিতর দিয়েই সে তা'র স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য, তা'র অন্তরের গুপ্ত ঐশ্বর্য্যসম্ভার পরিপূর্ণভাবে প্রকাশ ক'রতে পারে। সত্যিকারের শিক্ষা ত' বাইরে থেকে কখনও মগজে ঠেসে ঢুকিয়ে দেওয়া যায় না; বরং এ এমন হওয়া উচিত যে ভিতরের অসীম জ্ঞানরাশিকে বাইরে ফুটিয়ে তুলতে এ স্বতঃই সাহায্য করতে পারবে।”

আমি সায় দিয়ে বললুম, “সাল তারিখ আর হিসাবনিকাশের একঘেয়ে পথে ছেলেদের বীরপূজার প্রেরণা আর কল্পনার আদর্শ যেন একেবারে শুকিয়ে যাচ্ছে।”

শান্তিনিকেতন প্রতিষ্ঠার সূরু হয় মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের উৎসাহে; কবি তা'ই পিতার বিষয় সমস্তমে উল্লেখ ক'রে বললেন, “বাবাম'শায়ই আমার এই উর্ধ্বরাজমিটুকু দান করেন; এখানে অতিথিশালা আর মন্দির ইতিমধ্যেই তিনি তৈরী ক'রে দিয়েছিলেন। আমি এখানে শিক্ষাদানের পরীক্ষা সূরু করি ১৯০১ সালে দশটি মাত্র ছেলেকে নিয়ে। নোবেল প্রাইজের সওয়ালফ টাকাটার সবটাই বিদ্যালয়ের সংরক্ষণের জন্তে ব্যয় করা হয়।

দেশবিখ্যাত মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় যে একজন অসাধারণ ব্যক্তি

ছিলেন তা', তাঁ'র আত্মজীবনী পাঠেই জানা যায়। যৌবনে তিনি দুই বৎসর হিমালয়ে ধ্যানে অতিবাহিত ক'রেন। মহর্ষির পিতা দ্বারকানাথ ঠাকুর সারা বাংলার মধ্যে তাঁ'র অপূর্ব বদাঙ্গতার জ্ঞাত শুধু বিখ্যাত নয়, "প্রিন্স" ব'লে অভিহিত হ'তেন। এই বিশিষ্ট সম্ভ্রান্তবংশ হ'তে বহু প্রতিভাবান ব্যক্তির এক বৃহৎ গোষ্ঠী গড়ে উঠেছে। শুধু রবীন্দ্রনাথ ন'ন,—তাঁ'র পরিবারের প্রায় সকলেই কোন না কোন বিষয়ে নিজের বৈশিষ্ট্য, কৃতিত্ব বা যশঃস্থাপনা ক'রতে সমর্থ হয়েছেন। তাঁ'র দুই ভ্রাতৃপুত্র গগনেজ ও অবনীজ ভারতবর্ষে চিত্র-শিল্পীদের মধ্যে সর্বাগ্রগণ্য।* কল্পনাবৈচিত্র্যে, রঙের খেলায়, ভাবসম্পদে এঁদের চিত্রাঙ্কণে এমন একটা নিজস্ব আর অপূর্ব বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে, যা' অল্পসরণ ক'রে চিত্রাঙ্কণকারিগণ বাংলায় একটা নূতন পদ্ধতির প্রবর্তন করেছেন। জ্যেষ্ঠভ্রাতা দ্বিজেন্দ্রনাথ গভীরতত্ত্বদর্শী দার্শনিক। সৌম্যমূর্তি, শাস্ত সমাহিতচিত্ত, দীর্ঘ স্থির দ্বিজেন্দ্রনাথ। স্নগভীর প্রশান্তির এক অপূর্ব মহিমা তাঁ'কে সর্বদা ঘিরে রয়েছে। তাঁ'র মন এতদূর অহিংস আর প্রেমে ও করুণায় পূর্ণ ছিল যে, বনের পশুপক্ষীরাও তাঁ'র কাছে নিঃসঙ্কোচে আসত, বিন্দুমাত্র ভয় পেত না।

রবীন্দ্রনাথ আমায় অতিথিশালায় রাজিয়াপনের নিমন্ত্রণ করলেন। সন্ধ্যায় বারান্দাতে আলোছায়ায় বোনা মায়াজালে ঘেরা একটি স্নিগ্ধ মধুর পরিবেশের মধ্যে ছোট্ট একটি দলে বেষ্টিত রবীন্দ্রনাথ উপবিষ্ট—সে এক নয়নাভিরাম দৃশ্য! কাল যেন বহু দূর পিছিয়ে গেছে। সমুদ্রের দৃশ্যটি যেন কোন প্রাচীন আশ্রমের—আনন্দগীতিরসিক প্রেমিক গায়কের চতুর্দিকে ভক্তদল ঘিরে বসে; সবারই মুখ স্বর্গীয় প্রেমের ছটায় উদ্ভাসিত। একটা পরিপূর্ণ সামঞ্জস্য, ঐক্য ও সঙ্গতির সুষমা স্থানটিতে এনে তিনি তা' পরম রমণীয় আর লোভনীয় ক'রে তুলেছেন। আপনাকে প্রতিষ্ঠা ক'রতে গিয়ে নয়, একটা স্নিগ্ধপেলব মধুরপরশ দিয়ে তাঁ'র ব্যক্তিত্বের দুর্গিবার চৌম্বক আকর্ষণে রবীন্দ্রনাথ আমার হৃদয় যেন জোর ক'রে কেড়ে নিলেন। ভগবৎপ্রেমের উত্তানে দুর্লভ কবিতাপ্রহন প্রস্ফুটিত-স্বভাবমধুর গন্ধে চারিদিকে সবাইকে আকৃষ্ট ক'রে তুলেছেন, সৌরভে সব পাগল।

* রবীন্দ্রনাথও তাঁ'র প্রায় ষাটবছর বয়সে ছবি আঁকা শুরু করেন। তাঁ'র 'ফিউচারিস্টিক' পদ্ধতিতে আঁকা ছবিগুলি কয়েকবছর পূর্বে ইউরোপের রাজধানীসমূহ এবং নিউইয়র্কেও প্রদর্শিত হয়।

সঙ্গীতের স্বাক্ষরের মতন তাঁ'র কণ্ঠস্বর। রবীন্দ্রনাথ তাঁ'র গুটিকতক সদ্য-
রচিত অপূর্ব কবিতা আমাদের সামনে পাঠ ক'রে শোনালেন। ছাত্রদের
আনন্দপরিবেশনের জন্য লেখা তাঁ'র কবিতা আর নাটকের অধিকাংশই
শান্তিনিকেতনে রচিত হয়েছে। আমার কাছে তাঁ'র লেখার সৌন্দর্য্য হচ্ছে,
প্রায় প্রতি ছন্দতে ভগবানের অবতারণা করা আছে কিন্তু কদাচিৎ সেই
পূণ্যনামের উল্লেখ সেখানে পাওয়া যায়। এক জায়গায় তিনি লিখেছেন,

“স্বরের ঘোরে আপনাকে যাই ভুলে,

বন্ধু ব'লে ডাকি মোর প্রভুকে।”

তা'র পরদিন আহাঙ্গাদির পর নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও আমি বিদায়
নিলাম। সেই ছোট্ট স্কুলটি আজ জগদ্বিখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয় “বিশ্বভারতী”তে
পরিণত—সকল দেশেরই ছেলেদের আদর্শ শিক্ষায়তন। দেখে ভারি আনন্দ
লাভ ক'রলুম।

— — — — —

৩০শ পরিচ্ছেদ

অলৌকিক ঘটনার নিয়ম

সুবিখ্যাত ঔপন্যাসিক লিও টলষ্টয় “তিন সন্ন্যাসী” নামে একটি চমৎকার গল্প লিখে গেছেন। তাঁ’র বন্ধু সুবিখ্যাত রুশিল্লী ও দার্শনিক নিকোলাস রোরিক নিম্নলিখিতভাবে গল্পটি সংক্ষেপিত ক’রে প্রকাশ করেন,—

“একটি দ্বীপের উপর তিনটি প্রাচীন সন্ন্যাসী বাস করতেন। তাঁ’রা এতদূর সরল ছিলেন যে তাঁ’রা প্রার্থনাকালে শুধু এই ক’টি কথাই বলতেন, ‘আমরা তিনজন, আপনিও ত্রিগুণ্ডিত, আমাদের ওপর দয়া করুন’, এই অত্যন্ত সরল নিরলঙ্কার প্রাণের আকৃতিতে কিন্তু বড় বড় অলৌকিক ব্যাপার সব প্রকাশ পেতে লাগল।

“স্থানীয় বিশপ* এই তিনটি সন্ন্যাসী আর তাঁ’দের অপূরণীয় প্রার্থনার কথা শুনতে পেয়ে ভাবলেন যে তাঁ’দের সঙ্গে দেখা ক’রে শাস্ত্রানুযায়ী কৈতাদোরস্ত প্রার্থনা তাঁ’দের শিক্ষা দেওয়া নিতান্তই প্রয়োজন। এলেন দ্বীপেতে; সন্ন্যাসীদের বললেন যে তাঁ’দের প্রার্থনা ঠিক যথোপযুক্তভাবে হচ্ছে না আর নানারকম শাস্ত্রবিশিষ্ট প্রার্থনা করতে তাঁ’দের শিক্ষা আর উপদেশও দিলেন। যা’ক্, একটি দারুণ কর্তব্য অশৃঙ্খলভাবে সম্পাদন করেছেন ভেবে আত্মতৃপ্তিতে হৃষ্টচিত্ত বিশপ মহোদয় ত’ একটি নৌকা ক’রে স্থানত্যাগ করলেন। যেতে যেতে দেখলেন যে, একটা উজ্জল জ্যোতির্শৃঙ্খল নৌকার পিছন পিছন ছুটে আসছে। কাছে এসে পৌছতেই তিনি দেখলেন যে, সেই তিনটি সন্ন্যাসী হাত ধরাধরি ক’রে ঢেউয়ের উপর দিয়ে ছুটে আসছেন নৌকাটি ধরবার জন্তে!

* গল্পটির মধ্যে ঐতিহাসিক উপাদান আছে। সম্পাদকীয় মন্তব্যে জানা যায় যে বিশপ মহোদয় যখন আর্কেন্সেল থেকে স্লোভেট্‌স্কি মঠে বাচ্ছিলেন, তখন বিনা নদীর মোহানায় তিনটি সন্ন্যাসীর দাক্ষিণ্য পান।

“বিশপের কাছে পৌঁছতেই তাঁ’রা চেষ্টায়ে ব’লে উঠলেন, ‘আপনি যে প্রার্থনা বলতে শিখিয়েছিলেন তা’ আমরা ভুলে গেছি, তাঁ’ই তাড়াতাড়ি আপনাকে জিজ্ঞাসা ক’রতে এসেছি, সেগুলো আর একবার আউড়ে দিন।’ দেখে শুনে ত’ বিশপপ্রভু একেবারে অবাক। ভয়ে ভয়ে মাথা নেড়ে সবিনয়ে বললেন, ‘সাধু মহোদয়গণ, আপনারা পুরান প্রার্থনাই বলতে থাকুন; নূতন কিছুব আর দরকার নাই।’

আচ্ছা, তা’হ’লে মনে ত’ এই সব প্রশ্নই স্বাভাবিকভাবে আসে যে, সাধুভক্তের উপর দিয়ে হেঁটে এলেন কি ক’রে ?

যীশুখৃষ্টের ক্রুশবিদ্ধ হ’বার পর পুনরুত্থান হ’ল কি ক’রে ?

লাহিড়ীমহাশয় আর শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজি অলৌকিক ব্যাপার প্রদর্শন ক’রতেন কি ক’রে ?

আধুনিক বিজ্ঞানে আজ পর্যন্তও এর কোন সহজতর মেলে নি যদিও আণবিক বোমা আর রেডারের আশ্চর্য্যক্রিয়াতে জগতের লোকেদের মন হঠাৎ প্রসারিত লাভ করেছে। বিজ্ঞানের অভিধানে “অসম্ভব” কথাটা ক্রমশঃই অপ্রধান হয়ে আসছে আর তাঁ’র অর্থের গুরুত্বও হারাচ্ছে।

প্রাচীন বৈদিক শাস্ত্রে বলে যে এই জড়জগৎ দ্বৈতবাদ আর সাপেক্ষতার বা আপেক্ষিকবাদ বা’র উপর প্রতিষ্ঠিত সেই একটিমাত্র মূলবিধি মায়াবাদের দ্বারাই পরিচালিত হয়। সকল প্রাণের প্রাণ পরমান্বা হচ্ছেন ভেদাভেদবিহীন এক অখণ্ড ঐক্য; তিনি একটা মিথ্যা বা অসত্য আবরণ ব্যতীত সৃষ্টির মধ্যে স্বতন্ত্র ও বিভিন্নরূপে প্রকাশ পেতে পারেন না। এই মিথ্যা আবরণই হচ্ছে মায়া। আধুনিক কালের প্রত্যেক বড় বড় বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারই ঋষিদিগের এই সরল সত্য উক্তি আরও দৃঢ়তর ক’বে তুলেছে।

নিউটনের গতিনিয়মও হচ্ছে মায়ার বিধি। “প্রত্যেক ক্রিয়ার সমান সর্বদাই একটা সমান আর বিপরীত প্রতিক্রিয়া থাকে; যে কোন দুইটি বস্তু পারস্পরিক ক্রিয়া সর্বদাই সমান আর বিপরীতভাবে প্রতিক্রিয়াশীল। কাষেই ক্রিয়া আর প্রতিক্রিয়া অবিকল সমান। “একমুখী শক্তি তাঁ’ অসম্ভব; সেই জন্তে সর্বদাই দুইটি ক’রে শক্তি থাকবে, সমান আর বিপরীত।”

তা'ই সকল মৌলিক স্বাভাবিক ক্রিয়াশীলতা থেকেই মায়িক উৎপত্তি প্রকাশ পায়। উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে যে বিদ্যুতের ক্রিয়া হচ্ছে আকর্ষণ আর বিকর্ষণ, এর ইলেক্ট্রন (বিদ্যুতিন্) আর প্রোটন (প্রতীন্) দুই বিপরীত বিদ্যুৎধর্মী। আরেকটা উদাহরণ; পরমাণু অর্থাৎ চরম জড়কণা হচ্ছে একটি পৃথিবীরই মতন, যেন একটি চুম্বক বা'র ধনাত্মক আর ঋণাত্মক দুইটি মেরু আছে। সমগ্র প্রাতিভাসিক জগৎ অথবা জগৎপ্রপঞ্চ হচ্ছে চৌম্বক আকর্ষণের অদ্বা প্রভাবের অধীন; দেখা গেছে যে পদার্থবিজ্ঞা, রসায়নশাস্ত্র অথবা অন্য যে কোন বিজ্ঞানই হো'ক না কেন, তা'দের কোন নিয়ম সহজাত বিরুদ্ধ বা বিপরীত নীতিশূন্য নয়।

পদার্থবিজ্ঞান তা'ই মায়ার অতীত কোন নিয়ম রচনা করতে পারেনা— বিশ্বস্থিতি বা' ওতঃপ্রোতঃ ভাবে বিজড়িত। প্রকৃতি নিজেই হচ্ছে মায়ী, কাষেই প্রাকৃতবিজ্ঞানকে অবশ্যই তা'র অপরিহার্য সারাংশকে নিয়েই কাষ চালাতে হ'বে। প্রকৃতি তা'র নিজরাজ্যে অকুরন্ত আর অনন্তরূপিণী। ভবিষ্যৎ বিজ্ঞানীরা তা'র অনন্তবৈচিত্র্যের একরূপ থেকে অগুরূপের মধ্যে বা আর এক রহস্যের মধ্যে প্রবেশ করা ছাড়া আর বেশী কিছু করতে পারেন না। বিজ্ঞান তা'ই অনন্ত রহস্যশ্রোতে ভেসে চলেছে—অন্ত আর খুঁজে পাচ্ছে না। যদ্য পূর্ব হ'তে বর্তমান আর ক্রিয়াশীল বিশ্বের নিয়ম বিধিবদ্ধ করবার পক্ষে তা' বথেষ্ট বটে কিন্তু সেই বিধির “বিধি” আর তা'র একমাত্র যিনি নিয়ন্তা, তাঁকে খুঁজে বা'র করতে তা' একেবারেই শক্তিহীন। মহাকর্ষ আর বিদ্যুতের শক্তির অপূর্ব আর বিরাট ক্রিয়া সব জানা গেছে বটে কিন্তু মহাকর্ষ আর বিদ্যুতের শক্তিটা আসলে যে কি জিনিষ, তা' কোন মানুষই আজ পর্যন্ত সেটা জানতে পারে নি।*

প্রাচীন মুনিঋষিরা এই মায়ী অতিক্রম কববার ভার মানবজাতির হাতেই সমর্পণ ক'রে গেছেন। বিশ্বস্থিতির মধ্যে এই মায়ী অতিক্রম ক'রে স্রষ্টার সহিত একাত্মবোধই হচ্ছে মানবজীবনের চরম লক্ষ্য। মায়ীবদ্ধ জীবেরা,

* জগদ্বিখ্যাত আবিষ্কারক মার্কনি চরমভক্তের সম্মুখে বিজ্ঞানের অপ্রতুলতার কথা স্বীকার করে বলেছেন যে, “জীবনরহস্য ভেদ করা একেবারেই বিজ্ঞানের ক্ষমতার অতীত। বিশ্বাস যিনিট না থাকলে সত্যই এ অতি ভয়াবহ ব্যাপার হ'ত। মানবের চিন্তাধারার সম্মুখে জীবনরহস্য হচ্ছে এক চিরস্থায়ী সমস্যা।”

জোয়ারভাঁটা, দিবারাত্র, স্নুহঃখ, ভালমন্দ, উত্থানপতন, জন্মমৃত্যু এই সব মেরুপ্রবণতার দ্বৈতভাবের মূলবিধি মান্তে বাধ্য। হাজার হাজার জন্মজন্মান্তরের মধ্য দিয়ে এই চক্রে ঘুরে এসে মানুষ শ্রান্ত আর ক্লান্ত হ'য়ে মায়াভীত কোন বস্তুর সন্ধানে উৎসুক আগ্রহে আশাপূর্ণ হৃদয়ে চেয়ে থাকে।

এখন এই মায়ার হাত এড়ানর উপায় কি? মায়ার অবগুষ্ঠন উন্মোচন করার মানেই হ'চ্ছে সৃষ্টিরহস্ত ভেদ করা। যে যোগী এইভাবে বিশ্ব-প্রকৃতির রহস্ত ভেদ করতে পারেন তিনিই প্রকৃত অদ্বৈতবাদী, আর সব শুধু প্রাণহীন মূর্তিপূজা ক'রেই ক্ষান্ত। মানুষ যতদিন প্রকৃতির এই দ্বৈতভাবের অধীন হ'য়ে থাকবে, ততদিন এই দ্বিমুখিনী মায়াই তা'র উপায়দেবী। সে আর একমাত্র সত্যস্বরূপ ঈশ্বরকে জানতে পারে না।

বিশ্বপ্রকৃতির মায়ার মানুষের মনের ভিতর ক্রিয়াশীল হ'লে তা'কে বাঁচাবিদ্ধা, মানে “অ-জ্ঞান,” ভ্রান্তি বা মোহ। মায়ার বা অবিদ্যার বুদ্ধিবৃত্তির উৎকর্ষসাধন বা বিশ্লেষণ দ্বারা কখনও দূর করা যায় না, তা' কেবল যায়, নির্মিতক-সমাধিলব্ধ অন্তরের অল্পভূতিতে। সকল দেশের সকল যুগেরই সাধুসন্তরা সেই অল্পভূতিলব্ধ অবস্থা থেকেই তা' বলে গেছেন। বাইবেলে এজেকিয়ের বলছেন, “তা'রপর সে আমাকে একটি দ্বারপ্রান্তে উপনীত করলে, দ্বারটি পূর্বমুখী; তা'রপর পূর্বদিকের পথ হ'তে দেখা গেল ইস্রায়েলের প্রভু দৈবমহিমা আর শোনা গেল তাঁ'র স্বর দূরাগত সমুদ্রগর্জনের মত আর সারাজগত তাঁ'র গৌরবে উদ্ভাসিত হ'য়ে উঠ'ল।” যোগী ললাটের (পূর্বদিক) তৃতীয় নেত্রের ভিতর দিয়ে তাঁ'র জ্ঞান সর্বব্যাপিত্বের দিকে প্রসারিত করেন আর ওঙ্কারধ্বনি শ্রবণ করতে পান—এই হচ্ছে “সমুদ্রগর্জন” অথবা স্পন্দনধ্বনি যা' হচ্ছে সৃষ্টির একমাত্র বাস্তবতা।

বিশ্বজগতের লক্ষকোটি রহস্তের মধ্যে সর্বাপেক্ষা আশ্চর্য্য জিনিষ হচ্ছে আলো। শব্দতরঙ্গ পরিচালিত হয় বায়ুস্তর বা অল্প কোন জড় মাধ্যমের ভিতর দিয়ে কিন্তু আলোকতরঙ্গ তারামধ্যাবকাশ বা মহাশূন্তের ভিতর দিয়ে অব্যাহতভাবে চলে যেতে পারে, কোন বাধা পায় না। এমন কি অল্পমান-সিদ্ধ ঈশ্বর, যা তরঙ্গসিদ্ধান্তে আলোকের গ্রহ হ'তে গ্রহাস্তবে বিচ্ছুরিত হ'বার মাধ্যম বলে স্বীকৃত, তা'ও আইনষ্টাইনের এই মতামতসারে পরিত্যক্ত হ'তে পারে যে অবকাশ, আকাশ বা শূন্তের জ্যামিতিক গুণামতসারে ঈশ্বর

মতবাদ অনাবশ্যক। যা'ই হোক উভয় মতবাদেই আলো হচ্ছে অতি সূক্ষ্ম পদার্থ বা তন্মাত্র আর স্বাভাবিকভাবে প্রকাশকালে তা' কোন জড়পদার্থের উপর আদৌ নির্ভর করে না।

আইনষ্টাইনের বিরাট কল্পনায়, সেকেন্ডে ১,৮৬,৩০০ মাইল এই যে আলোর গতি, তা' সারা আপেক্ষিকবাদকে * প্রভাবিত করে। তিনি গাণিতিক হিসাবে প্রমাণ করেন যে, মাছুনের সীমাবদ্ধ মন যতটুকু, সেই হিসাবে, আলোই হচ্ছে এই অনিত্য জগৎপ্রবাহের মধ্যে একমাত্র ধ্রুবরাশি। একমাত্র আলোকগতির অনন্তসাপেক্ষতার উপরই মানবজগতের দেশ ও কালের মান নির্ভর করে। দেশ আর কাল, যা' আজ পর্য্যন্ত নিরবচ্ছিন্নভাবে অনন্ত বলেই বিবেচিত হ'য়ে এসেছে, তা'রা আসলে তা' নয়, তা'রাও হচ্ছে আপেক্ষিক আর সসীম অংশ আর তা'দের পরিমাণের বৈধতা নির্দিষ্ট হয় কেবলমাত্র আলোর গতির মানদণ্ডে।

পরমাকাশকে আপেক্ষিকবাদের মাত্রা বা আয়তনরূপে বর্ণনা করতে গেলে সময়ের যে বহুপ্রাচীনমতসিদ্ধ অপরিবর্তনীয় মান তা' পরিত্যজ্য হয়েছে। এর প্রকৃতরূপ এখন বেরিয়ে পড়েছে—একটি দ্ব্যর্থ মৌলিকপ্রকৃতির সহজ সার আর কি! কলম দিয়ে গোটাকতক সমীকরণের অঙ্কের আঁচড় কেটে আইনষ্টাইন বিশ্বজগৎ থেকে এক আলো ছাড়া আর সব ধ্রুবসত্যের বিষয় দূর করে দিয়েছেন।

তা'রপরে আরও উন্নতি সাধিত হ'ল তাঁ'র সমক্ষেত্র মতবাদে। পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ পদার্থতত্ত্ববিদ একটি মাত্র অঙ্কসূত্রে মাধ্যাকর্ষণ আর বৈদ্যুত চুম্বকতত্ত্ব গৌণে ফেলেছেন। বিশ্বসৃষ্টিকে একটিমাত্র নিয়নের বৈচিত্র্যে পরিণত ক'রে আইনষ্টাইন বৃগবৃগাস্তর পার হ'য়ে গিয়ে প্রাচীন ঋষিদের কাছে গিয়ে এখন পৌঁছেছেন, যা'রা সৃষ্টির বুননে যে একমাত্র বহুরূপিনী মায়া, তা' বহুপূর্বেই ঘোষণা ক'রে গিয়েছেন।

* আইনষ্টাইনের প্রতিভা যে কোন মুখী তা'র ইঙ্গিত এই তথ্যে পাওয়া যায় যে তিনি জগদ্বিখ্যাত দার্শনিক স্পাইনোজা, যা'র শ্রেষ্ঠ রচনা হ'চ্ছে জ্যানিতিক পদ্ধতিতে প্রদর্শিত নীতিশাস্ত্র, তাঁ'র জীবনব্যাপী শ্রদ্ধা ছিলেন। “জীবন্ত দর্শনে” আইনষ্টাইন লিখেছেন যে, “এ সকল প্রকৃত কলা ও বিজ্ঞানের উৎস। যা'র কাছে এ ভাব অপরিচিত, আর যে একটু খেমে বিশ্বয়ে ও শ্রদ্ধায় অভিভূত হ'তে পারে না, সে কত বলেই গণ্য?”

এই যুগান্তকারী আপেক্ষিকমতবাদে চরম অথবা “পরম” অণুর তত্ত্ব-সন্ধানের গাণিতিক সম্ভাবনার উদয় হয়েছে। বড় বড় বিজ্ঞানীরা এখন সদর্পে ঘোষণা করছেন যে, পরমাণুকে শুধু জড়ের চেয়ে বরং শক্তিই যে বলা যায় তা’ নয়, পরমাণবিক শক্তি বস্তুতঃ হ’চ্ছে চিন্ময়-পদার্থ।

“দি নেচার অফ্ দি ফিজিক্যাল ওয়ার্ল্ডে” শ্রার আর্থার ষ্ট্যান্‌লি এডিংটন লিখছেন, “পদার্থবিজ্ঞান যে ছায়ার জগৎএর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট এই সরল উপলব্ধি একটা বিশেষ উল্লেখযোগ্য উন্নতি। জড়জগতে আমরা পরিচিত জীবনের নাটক যেন ছায়াবাজির অভিনয়ের ভিতর দিয়েই দেখি। ছায়া কাগজের উপর যখন ছায়া কালির দাগ টেনে চলেছি তখন আমার ছায়া কল্পই ছায়া টেবিলের উপর রয়েছে। এ সবই প্রতিকল্পক এবং পদার্থবিদ্যাবিৎ এদের প্রতীকরূপেই ভেবে ক্ষান্ত হ’ন। তা’রপর আসেন রাসায়নিক মন, যিনি এই সব নিদর্শনদের রূপান্তর সাধন করেন মোটামুটিভাবে ব’লতে গেলে বলা যায় যে, এই জগৎ-পদার্থ আসলে হচ্ছে চিন্ময়-পদার্থ.....প্রাচীন জড়বাদের বাস্তব জড় আর বল ক্ষেত্রসমূহ এখন একেবারে অপ্রাসঙ্গিক, অবশ্য মন যতটুকু তা’র নিজের মালমসলা দিয়ে যে সব কল্পনা সৃষ্টি করেছে, কেবল সেইটুকু ছাড়া তা’হলে বহির্জগৎ এখন দাঁড়াচ্ছে একটা ছায়াজগৎ।”

ইলেক্ট্রন অনুবীক্ষণের অধুনাতন আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে পরমাণুতত্ত্বের সার যে আলো আর প্রকৃতির অপরিহার্য যে দ্বৈতভাব তা’র অকাটা প্রমাণ পাওয়া গেল। নিউ ইয়র্ক টাইম্‌স্ ১৯৩৭ সালে আমেরিকার এসোসিয়েশন ফর দি এডভান্সমেন্ট অফ সায়েন্সের এক সভায় ইলেক্ট্রন মাইক্রোস্কোপ প্রদর্শনের নিম্নলিখিত বিবরণী প্রকাশ করেন, “তুঙ্গশূন্য অথবা টাংষ্টেনের কেলাসিক গঠন যা কেবল র‍্যাণ্ট্‌গেন রশ্মি (এক্স-রে) দ্বারাই এ যাবৎ পরোক্ষভাবে পরিচিত ছিল, তা’র রেখাচিত্র একটা প্রতিপ্রভ পর্দার উপর খুব সুস্পষ্টভাবে ফুটে উঠল; তা’তে দেখা গেল যে, নয়টি পরমাণু ঘন আয়তনের মত স্থানে জালের আকারে ঠিক তা’দের নিজ নিজ জায়গায় রয়েছে—প্রত্যেক কোণে একটি ক’রে আর মধ্যস্থলে একটি। টাংষ্টেনের এই যে কেলাস (দানা) গঠনের জালের মধ্যে পরমাণুগুলি, তা’ প্রতিপ্রভ পর্দার উপর জ্যামিতিক আকৃতিতে সাজান আলোকবিন্দুর মতই প্রতিভাত হ’ল। আর আলোর এই কেলাসের ঘন আয়তনের উপর অবিরাম আঘাত-

শীল বায়ুর পরমাণুসকল নৃত্যশীল আলোকবিন্দুর মতন দেখা যাচ্ছে—টিক যেমন সূর্যের উজ্জ্বল কিরণগুলি জলের চেউয়ের মাথার উপর নাচে

ইলেক্ট্রন মাইক্রোস্কোপের মতবাদ প্রথম আবিষ্কৃত হয় ১৯২৭ সালে, নিউইয়র্ক সহরের বেল টেলিফোন ল্যাবরেটরীর ডাক্তার ক্লিফটন জে. ডেভিসন আর ডাক্তার লেস্টার এইচ. জারমান, এঁদের দ্বারা। এঁরা দেখতে পেলেন ইলেক্ট্রন (বিদ্যুতিন) এর দ্বৈত অভিব্যক্তি—একটি কণা আর একটি তরঙ্গ* এই উভয়ভাবেই বৈশিষ্ট্য গ্রহণ করেছে। এই তরঙ্গের গুণই ইলেক্ট্রনকে আলোকের বিশেষত্ব প্রদান করেছে এবং তা'রপর গবেষণা সুরু হ'ল প্রতিফলক কাচের দ্বারা আলোকে যেমন কেন্দ্রীভূত ক'রে স্থানবিশেষে ফেলা যায়, তেমনি ক'রে ইলেক্ট্রনকেও কেন্দ্রীভূত ক'রে কোন স্থানবিশেষে ফেলবার কোন উপায় বা'র করা যায় কি না।

পদার্থবিদ্যায় নোবেলপ্রাইজপ্রাপ্ত ড. ব্রোগলি দেখিয়েছেন যে সারা জড়ের রাজত্বে একটা দ্বৈতভাব বর্তমান আর ১৯২৪ সালে তিনি যে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন তা' সমর্থিত হ'ল ডাঃ ডেভিসনের ইলেকট্রনের দ্বৈতগুণের আবিষ্কারে। ইনিও পদার্থবিদ্যায় নোবেল প্রাইজ প্রাপ্ত হন।

সার জেমস্ জিন্স তাঁ'র “বিশ্বরহস্ত্রে” লিখ'ছেন, “জ্ঞানের স্রোত ক্রমশঃই যন্ত্রবিশীন সত্যের দিকে এগোচ্ছে : বিশ্বপ্রকৃতিটাকে এখন একটা বিরাট যন্ত্রের চেয়ে একটা বিরাট চিন্তা ব'লেই বোধ হ'তে আরম্ভ হয়েছে।” তা' হ'লে ব্যাপারটা দাঁড়াচ্ছে এই যে, আজকের বিংশশতাব্দীর বিজ্ঞান যেন প্রাচীন বেদের ভিতরকারই একটি পৃষ্ঠা আর কি !

বিজ্ঞান থেকে—যদি অবশ্য তা'ই হয়, তা'হ'লে মানুষ এই দার্শনিক সত্যই শিখা করুক যে জড়জগৎ ব'লে কিছুই নেই ; এর টানা পোড়েন হ'চ্ছে গায়া, অবিদ্যা বা ভ্রান্তি। এর বাস্তবতার মরীচিকা সবই বিশ্লেষণের মুখে একদম মিলিয়ে যায়। মানুষের কাছে যখন জড়বিশ্বের পাকা খুঁটিগুলি একে একে খসে পড়তে থাকে, তখন সে তা'র মূর্তির উপর নির্ভরতা, তা'র অতীতে ঈশ্বরাদেশ অমাত্যের কথা ক্ষীণভাবে উপলব্ধি করতে পারে—যেখানে ঈশ্বর বলেছেন, “আমি ছাড়া তোমার আর কোন ঈশ্বর নাই।”

আইনষ্টাইন তাঁ'র বিখ্যাত সমীকরণে, যেখানে তিনি জড়মান আর

* অর্থাৎ জড় এবং শক্তি উভয়ই।

শক্তির ভারসাম্য প্রদর্শন করেছেন, সেখানে তিনি প্রমাণ করেছেন যে, কোন জড়কণার মধ্যস্থিত শক্তি হচ্ছে তা'র ভার আলোকগতির বর্গফলের দ্বারা গুণিত হওয়ার সমান। জড়কণার বিনাশেই আণবিক শক্তির মুক্তি। জড়ের “মৃত্যু”তেই আজ আণবিক যুগের “জন্ম”।

আলোর গতি গণিতশাস্ত্রের যে একটা মান, তা'র কারণ এই নয় যে তা'র ১৮৬৩০০ মাইলের একটা স্থিররাশি আছে। তা'র কারণ হচ্ছে যে, কোন জড়দেহ বা'র বস্তুমান তা'র গতির সঙ্গে সঙ্গে বাড়ে সে কখনও আলোর সমান গতি লাভ করতে পারে না। আর একভাবে বলতে গেলে বলা যায় যে কেবলমাত্র সেই জড়দেহ বা'র বস্তুমান অসীম সেই আলোর গতি পেতে পারে।

এই ধারণা থেকেই আমরা অলৌকিক ঘটনার নিয়মে পৌছতে পারি।

যে সব সিদ্ধপুরুষেরা তাঁ'দের শরীর অথবা অস্থি যে কোন পদার্থ বা বস্তুকে ইচ্ছানুসারে রূপদান অথবা শূন্যে বিলীন করতে পারেন বা আলোর গতির বেগে চলতে পারেন অথবা মৃজনকারী আলোকরশ্মিকে ব্যবহার করে যে কোন জড় পদার্থের বাহ্যরূপের প্রকাশকে সদ্য সদ্য পরিদৃশ্যমান করে তুলতে পারেন, তাঁ'রাই আইনষ্টাইনের এই অতি প্রয়োজনীয় সূত্রটি পূরণ করতে পারেন যে, তাঁ'দের বস্তুমান হচ্ছে অসীম।

সিদ্ধযোগীর সংবিৎ বা জ্ঞান দিনা আয়াসেই তাঁ'র সঙ্কীর্ণ দেহের সঙ্গে নয়, একেবারে নিখিল বিশ্বরচনার সঙ্গে যুক্ত হ'তে পারে। মাধ্যাকর্ষণ তা' সে নিউটনের “বল”ই হো'ক অথবা আইনষ্টাইনের “জড়ত্বের প্রকাশ”ই হো'ক, সকল জড়পদার্থের মাধ্যাকর্ষণের পরিচয় যে গুরুত্ব বা “ভার,” তা'র গুণপ্রকাশে কোন সিদ্ধযোগীকে বাধ্য করতে অপারগ। যিনি নিজেকে জানতে পেরেছেন যে তিনি সর্বব্যাপী পরমাত্মা, তিনি দেশ আর কালের অধীন কোন দেহের সঙ্কীর্ণতায় আর সীমাবদ্ধ ন'ন। তাঁ'র সব সসীম বাধ্যত্ব দূর হয়ে গিয়ে দাঁড়ায় তাঁ'র চরম অবস্থা, আমিই তিনি—“সোহং”।

বাইবেলে আছে “আলো হো'ক ! তা'রপরেই আলোর উৎপত্তি হ'ল”। ঈশ্বর তাঁ'র সুরচিত বিশ্বসৃষ্টির উপর প্রথম আদেশ প্রচার করাতে একমাত্র আণবিক বাস্তবতা প্রকাশিত হ'ল, আলোক। এই জড়বিহীন মাধ্যমের রশ্মির ভিতর দিয়েই সমস্ত অতিপ্রাকৃত দৈবঘটনা প্রকাশিত হয়। সকল যুগের

ভক্তসাধুরা ঈশ্বরের আনির্ভাব অগ্নিশিখা বা আলোর রূপে এই কথাই প্রমাণ করেন। বাইবেলে বর্ণিত আছে—“রাজার রাজা, প্রভুর প্রভু, একমাত্র ঐশ্বরই কেবল অমরত্ব আছে, তিনি আলোকেতেই অধিষ্ঠিত, মরজগতের কেউ যেখানে পৌছতে পারে না।” সেন্ট জন ভগবদ্বর্ননের বিষয় বর্ণনা করে বলেছেন যে, “তঁার চক্ষুদ্বয় অগ্নিশিখার মতন ... আর তঁার অবয়ব প্রখর সূর্যের তেজের মত উজ্জ্বল।”

কোন যোগী যিনি গভীর ধ্যানের দ্বারা তঁার চৈতন্যকে স্রষ্টার মধ্যে বিলীন করতে পেরেছেন তিনিই উপলব্ধি করতে পারেন যে, বিশ্বজগতের দার হচ্ছে আলো; তঁার কাছে জল আর মৃত্তিকা সৃজনকারী দুই বিভিন্ন আলোবরশির মধ্যে কোনই পার্থক্য নাই।

জড়জ্ঞানশূন্য, আর দেশ বা আকাশের তিনটি মাত্রা আর কালের চতুর্থ মাত্রা শূন্য হ'য়ে সিদ্ধযোগী ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ ইত্যাদির ভৌতিক আলোক রশ্মির উপর দিয়ে তঁার আলোর শরীর অতি সহজেই পরিচালিত করতে পারেন।

জড়তামূল্যপ্রদায়ক তৃতীয় নেত্রে বহুদিনের অভ্যাসসম্প্রদায় গভীর আর প্রগাঢ় মনঃসংযোগবলে যোগী জড়তাপ্রসূত সকল প্রকার ভ্রান্তি আর তা'র মাধ্যাকর্ষণের ভার বিনষ্ট করতে পারেন; তখন থেকেই তিনি দেখেন যে নিখিলবিশ্ব আসলে হচ্ছে এক নির্বিশেষ আলোকপিণ্ড।

হার্ভার্ডের ডাক্তার এন্. টি. ট্রোল্যান্ড আমাদের বলেছেন, “চক্ষুতে প্রতিবিম্বিত ছবি সব সাধারণ হার্টোন এন্থ্রেভিংএর মতন একই প্রকার উপায়ে আমাদের চক্ষুর উপর প্রতিকলিত হয়; অর্থাৎ তা'রা অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিন্দুর দ্বারা তৈরী—এত ক্ষুদ্র যে চোখের দ্বারা ধরাই যায় না ... চিত্রপত্র বা অফিপটের স্পর্শপ্রবণতা এতদূর বেশী যে অপেক্ষাকৃত অতি অল্পপরিমাণের আলোও দর্শনানুভূতি জাগিয়ে তোলে।”

সিদ্ধযোগী, আলোকাভিব্যক্তির দৈবজ্ঞানবলে, সর্বব্যাপী আলোক রশ্মিকণগুলিকে সংযোজিত করে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যরূপে তৎক্ষণাৎ প্রতিকলিত করতে পারেন। আর এইরূপ প্রতিকলিত করার প্রকৃতরূপ তা'সে কোন গাছ বা ওষুধ বা রাজপ্রাসাদ বা মনুষ্যশরীরই হোক, যোগীর ইচ্ছাশক্তি আর তা'র প্রত্যক্ষীভূত করে তোলবার ক্ষমতার উপর নির্ভর করে।

মানুষের স্বপ্নজ্ঞানে যখন ঘুমের মধ্যে সে তা'র দৈনন্দিন দেহাত্মবোধ
 লুপ্ত করে দেয়, তখন তা'র মনের সর্বশক্তিমত্তার নৈশপ্রদর্শন শুরু হয়।
 কি দেখা যায় সেখানে? সেখানে স্বপ্নে দেখা যায় বহুকালমৃত বহুবিশৃত
 প্রিয় বন্ধুবান্ধবদের মুখ, দূরতম প্রদেশ, বিশ্বতির অতলগহ্বর হ'তে পুনরুত্থিত
 শৈশবের নানা ঘটনাবলী। সকল মানুষেরই স্বপ্নব্যাপারের মধ্যে লুক্ক
 এই মুক্ত অপরিচ্ছিন্ন জ্ঞানের দ্বারাই ঈশ্বরভাবিত যোগী এক অবিচ্ছিন্ন
 সংযোগ রক্ষা করেছেন। স্বার্থগন্ধলেশশূন্য হ'য়ে আর অষ্টাঙ্গপ্রদত্ত সৃজনী ইচ্ছা-
 শক্তির সাহায্যে যোগী ভক্তের আন্তরিক প্রার্থনা পূরণ করতে বিশ্বপ্রকৃতির
 আলোকরশ্মির পুনঃসংযোজন করতে পারেন। মানুষ আর সৃষ্টি এই
 উদ্দেশ্যেই তৈরী—যা'তে ক'রে বিশ্বের উপর তা'র আধিপত্য রয়েছে জেনে
 সে মায়া'র অতীত হয়ে উঠতে পারবে।

বাইবেলেও এই কথা বলা আছে, “তা'রপর ঈশ্বর বললেন, আমাদেরই
 স্বরূপ। আর প্রতিমূর্ত্তির মতন মানুষকে সৃজন করা যাক। তা'রা, সমুদ্রের মৎস্য,
 আকাশের পক্ষী, পশু, এবং পৃথিবীতে সকল প্রাণীর উপর আধিপত্য করবে।”

সন্ন্যাসগ্রহণের অল্প কিছুকাল পরেই ১৯১৫ সালে আমার একবার দারুণ
 আর বিবম বৈচিত্র্যপূর্ণ এক অলৌকিক স্বপ্নদর্শন ঘটেছিল। এতে মানবজ্ঞানের
 আপেক্ষিকতা খুব স্পষ্টভাবেই প্রমাণিত হয়েছিল; তা'তে আমি দুঃখক্লেশজনক
 মায়া'র দৈতভাবের পিছনে সেই অনন্ত আলোকের অখণ্ড উপলব্ধি ক'রতে
 পেরেছিলুম। স্বপ্নদর্শনটি ঘটেছিল পিতার গড়পার রোডের বাটিতে এক
 সকাল বেলায়, যখন আমি আমার ছোট্ট ঘরটিতে বসেছিলুম। ইউরোপে
 তখন প্রথম মহাযুদ্ধ মাসকতক ধ'রে চলেছে, অত্যন্ত বিষম্বুদ্ধদয়ে তখন ঐ
 মহাযুদ্ধে মানবজীবনের বিরাট মরণাহতির কথা ভাবছিলুম।

চক্ষু মুদ্রিত ক'রে গভীর ধ্যানে বসে আছি, হঠাৎ আমার সংবিৎ যেন এক
 যুদ্ধজাহাজপরিচালনকারী কাপ্তেনের দেহের মধ্যে পরিচালিত হ'ল।
 জাহাজ আর তীরের উপর থেকে কামানের গোলাগুলি বর্ষণের বজ্রনির্ঘোষ
 বায়ুমণ্ডল বিদীর্ণ ক'রতে লাগল। একটা প্রকাণ্ড শেল প'ড়ে জাহাজের বারুদ-
 ঘরে আগুন ধরিয়ে দিয়ে জাহাজটাকে টুকরো টুকরো ক'রে উড়িয়ে দিলে।
 পড়লুম জলে লাফিয়ে, সঙ্গে ছিল গুলিকতক নাবিক, বিস্ফোরণের হাত থেকে
 যা'রা বেঁচে গিয়েছিল।

বুক তখন টিপ্ টিপ্ করছে, বাই হোক তীরে ত' নিরাপদে পৌছলুম। কিন্তু হায়! একটা বন্দুকের জলস্ত গুলি এসে বিধ্বল আমার বুক। যন্ত্রণায় গৌঁ গৌঁ করতে করতে মাটির উপর পড়লুম। সমস্ত শরীরটা একেবারে অসাড় হ'য়ে গেছে, তবুও দেহটা রয়েছে এটা বেশ টের পাচ্ছি, যেমন একটা পাপকাষাতগ্রস্ত হ'লে লোকে বোধ করে।

ভাবলুম, “শেষ অবধি বুঝি মরণই আমার ধ'রে ফেল্লে।” একটা অস্তিম শ্বাস ছেড়ে অজ্ঞানের অন্ধকারে ডুবে যেতে গিয়েই দেখলুম যে—আরে বাঃ, আমি যে গড়পার রোডের বাড়ীতে পদ্মাসনে বসে আছি।

তা'রপর উল্লাসে অশ্রুধারা গড়িয়ে পড়তে লাগল যখন আমি নিঃশঙ্ক আনন্দে টিপেটুপে চিম্টি কেটে দেখতে লাগলুম যে, বাঃ, শরীরটা ঠিক গোটাই ফেরৎ পেয়েছি, কই বুক ত' কোন গুলিটুলি ঢুকে ছাঁদা করেনি। এধার ওধার নড়ে চড়ে হেলে ছলে, নিঃশ্বাসপ্রশ্বাস টেনে ফেলে নিশ্চিত হ'লুম যে হ্যাঁ, সত্যিই ত', আমি পরিপূর্ণভাবেই বেঁচে রয়েছি। মনে মনে যখন এই রকম আয়ত্ত্বাধা অনুভব করছি, তখন দেখলুম যে হঠাৎ আমার জ্ঞান আবার সেই রক্তপ্রাবিত তীরে শায়িত কাণ্ডেণের মৃতদেহে ফিরে গেছে। মনে এল একটা বিরাট বিশৃঙ্খলা।

প্রার্থনা ক'রে জানালুম, “বল প্রভু, আমি বেঁচে আছি কি মরে গেছি?” সমগ্র দিক্চক্রবাল এক অত্যাঙ্কল জ্যোতিঃর বিকাশে উদ্ভাসিত হ'য়ে উঠল। একটা মৃদু স্পন্দনের মর্মরধ্বনি বাণীতে রূপান্তরিত হ'ল, “জ্যোতিঃর সঙ্গে জীবনমরণের কি সম্বন্ধ জান? আমার জ্যোতিঃর প্রতিমূর্তিতে তোমার গড়েছি। জীবনমৃত্যুর আপেক্ষিকসম্বন্ধ কেবল জগৎস্বপ্নের। তোমার ত্বরীয় অবস্থা দেখ! জাগ, বৎস জাগ!”

মানুষের এই রকম জাগরণের উপায়ে, ঈশ্বর বৈজ্ঞানিকদিগকে তাঁর সৃষ্টি-রহস্য উপবৃত্ত স্থান ও কালে, আবিষ্কার করতে অনুপ্রাণিত করেন। বহু আধুনিক আবিষ্কারে মানুষের মনে সংশয় উপস্থিত হয়েছে যে এই যে বিশ্বজগৎ, তা' হ'চ্ছে একটি মাত্র শক্তির বিভিন্ন আর বিচিত্র প্রকাশ—আলোক, ঐশ্বরিক জ্ঞানের দ্বারা পরিচালিত। চলচ্চিত্র, রেডিও, টেলিভিশন, রেডার, বা কটোইলেকট্রিক সেল—যা হ'চ্ছে সর্বদর্শী বৈদ্যুতিক চক্ষু, আণবিক শক্তি, এ সবের আশ্চর্য্য ক্রিয়াকলাপ হচ্ছে আলোরই বৈদ্যুতচৌম্বক প্রকাশ।

চলচ্চিত্রকলা যে কোন আশ্চর্য্য ব্যাপার প্রদর্শন করতে পারে। দর্শনশ্রদ্ধা বিষয়ের দিক দিয়ে দেখতে গেলে ফটোগ্রাফির কৌশলের কাছে কোন অলৌকিক ব্যাপারেরই প্রদর্শন আর হুঁসাধ্য থাকে না। দেখা বাবে নে, মানুষের জড়দেহ হ'তে মুক্ত হ'য়ে তা'র স্বচ্ছ হৃদয়দেহ বেরিয়ে আসছে, দেখা বাবে, জলে উপর সে হাঁটতে পারে, মৃতকে পুনরুজ্জীবিত করতে পারে, স্বাভাবিক ঘটনার ধারা উল্টে দিতে পারে, দেশ ও কাল নিয়ে একেবারে ওলটপালট ক'রে দিতে পারে। এই আলোর প্রতিমূর্ত্তিগুলি তা'র ইচ্ছামত সাজিয়ে ফটোগ্রাফার বা' চোখে আশ্চর্য্যব্যাপার দেখাতে পারে, তা' একজন সিদ্ধপুরুষ প্রকৃত আলোকরশ্মিদ্বারা সবই সংসাধিত করতে পারেন।

চলচ্চিত্রের জীবন্ত ছবিতে বিশ্বস্থষ্টির বিষয়ে অনেক সত্যেরই উদাহরণ মেলে। বিশ্বরঙ্গমঞ্চের নটরাজ তাঁ'র নিজের নাটক নিজেই রচনা করেছেন আর শতাব্দীর পর শতাব্দী ধ'রে প্রদর্শনের জন্ত অভিনেতা অভিনেত্রীরা বিরাট সমাবেশ করেছেন। অনন্তের গভীর তমসাময় যন্ত্রণা হ'তে পরম্পরাগত যুগসমূহের ফিল্মের মধ্য দিয়ে তিনি তাঁ'র সৃজনকারী আলোকরশ্মি প্রের করেন আর এই মহাকাশের চিত্রপটে ছবির পর ছবি সব জীবন্তরূপে প্রতিফলিত হ'য়ে ওঠে। চলচ্চিত্রের ছবি যেমন প্রকৃত ব'লেই প্রতীয়মান হয়, কিন্তু আসলে তা'রা কেবলমাত্র আলোছায়ায় সংমিশ্রণ ছাড়া আর কিছুই নয়, তেমনি এই বিশ্বপ্রকৃতির বৈচিত্র্যে একটা আপাতপ্রতীয়মান সত্যভাবের উদয় হয়। অসীম প্রাণিবৈচিত্র্যে অনন্ত জীবনধারায় পরিপূর্ণ গ্রহজগৎ বিশ্বচলচ্চিত্রের ছবি ছাড়া আর কিছুই নয়; কেবল যখন সেই অসীম সৃজনীরশ্মি দ্বারা মানুষের জ্ঞানের পটভূমিতে দৃশ্যসকল প্রতিফলিত হয় তখন কেবল পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়ে স্রণিকের জন্ত তা' সত্য ব'লে প্রতিভাত হয়।

সিনেমা দর্শকবৃন্দ উপর দিকে তাকালেই দেখতে পায় যেন পদার উপর প্রতিফলিত ছবিগুলো একটিমাত্র আকারহীন আলোকরশ্মির খেলায় আর্জিত ধারণ করে। ঠিক সেইরকম রূপ রস আর রঙে সজীবিত এই বিশ্বনাট্য মহাব্যোম উৎস হ'তে নির্গত একটি মাত্র স্বেত আলোকরশ্মি থেকেই বেরিয়ে আসছে। ভগবান তাঁ'র এই সব গ্রহনক্ষত্রের বিশ্বনাট্যশালায় তাঁ'র মানবসন্তানদের আনন্দবিধানের জন্ত তা'দের একসঙ্গে অভিনেতা আর দর্শক ক'রে কি অভাবনীয় কৌশলেই না নাট্যলীলা ক'রে চলেছেন!

এই বিশ্বনাট্যলীলার স্বরূপ বর্ণনা করতে গিয়ে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ক্রীমদ্ভগবদ্গীতার ৪র্থ অধ্যায়ে ৬ষ্ঠ শ্লোকে বলেছেন ;—

“অজোহপি সন্নব্যয়ান্না ভূতানামীশ্বরোহপি সন্।

প্রকৃতিম্ স্বামধিষ্ঠায় সন্তবাম্যন্নমায়স্মা ॥

জেন মোর জন্মমৃত্যু কভু নাহি হয়,

অজ অব্যয়ান্না তাই মোর পরিচয়।

দেবনর সকলের আমিই ঈশ্বর,

তথাপি যে করি নিজ প্রকৃতিকে ভব।

নিজ প্রকৃতিতে আমি অধিষ্ঠান করি,

মায়াবশে নিত্য আমি নানারূপ ধরি ॥” *

একদিন আমি একটি চলচ্চিত্রশালায় প্রবেশ করলুম, ইউরোপের যুদ্ধক্ষেত্রের সংবাদচিত্র দর্শনের জন্ত। প্রথম মহাবুদ্ধ তখন পশ্চিমে পূর্ণবেগে চলেছে। সংবাদচিত্রে যুদ্ধক্ষেত্রের হত্যাকাণ্ড এত বাস্তবরূপে প্রদর্শিত হয়েছিল যে তা’ দেখে অত্যন্ত ব্যথিতহৃদয়ে আমি প্রেক্ষাগৃহ পরিত্যাগ ক’রে চলে এলুম।

সে দিন প্রার্থনা করলুম, “ভগবান্, কেন তুমি এত দুঃখক্লেশ ঘটতে দিচ্ছ?”

অত্যন্ত আশ্চর্য্য হয়ে দেখলুম যে, আমার প্রার্থনারই যেন সত্ত্বসত্ত্ব উত্তর হিসাবে ইউরোপের যুদ্ধক্ষেত্রের একটি বাস্তবচিত্র আমার নয়ন সম্মুখে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। মৃত আর মুমূর্ষুতে পরিপূর্ণ সেই যুদ্ধক্ষেত্রের বিভীষিকা আর বীভৎসতা সংবাদচিত্রের প্রদর্শনীর্ চেয়ে চের চের বেশী!

আমার অন্তর্জ্ঞানের মধ্যে একটি অতিমৃদু শাস্ত্রস্বর যেন কথা ক’য়ে উঠল, “খুব ভাল করে মন দিয়ে দেখ! দেখতে পাবে যে ফ্রান্সে এখন এই যে সব দৃশ্য অভিনীত হ’চ্ছে, তা’ আলোছায়ার একটা সাদা আর কালো রঙে আঁকা ছবি ছাড়া আর কিছুই নয়। তা’রা হচ্ছে বিশ্বচলচ্চিত্র, এখুনি যে সংবাদচিত্র দেখে এলে সেইরকম একাধারে সত্য আর অসত্য দুইই—নাটকের ভিতর নাটক আর কি!”

অন্তর আমার তবুও শাস্ত হ’ল না। সেই দৈববাণী পুনরায় শোনা গেল, “যদি হ’চ্ছে আলোছায়া দু’য়েরই সমন্বয়, তা’ না হ’লে কোন ছবিই সম্ভবপর

* এই প্রসঙ্গে গীতার সপ্তম অধ্যায়ের ৬—১৪ শ্লোক দ্রষ্টব্য।

হয় না। মায়া'র সদস্য গুণ বরাবরই একটার চেয়ে অপরটা এক একবার প্রবল হ'য়ে উঠবে। ইহলোকে আনন্দ যদি অবিরাম আর অন্তহীনই হো'ত তা'হ'লে কি মানুষ আর অল্প কোন লোক চাইত? দুঃখক্লেশ ভোগ বিনা সে কদাচিৎ স্বরণ করত যে সে তা'র অমৃতধাম পরিত্যাগ ক'রে এখানে এসেছে। দুঃখকষ্টই হচ্ছে তা' স্বরণ করবার অনুশাখাত! এড়ানর উপায় হ'চ্ছে জ্ঞানের দ্বারা! মরণের দুর্ঘটনা হ'চ্ছে একেবারেই অসত্য। য'রা এতে ভয়ে কেঁপে মরে, তা'রা হচ্ছে সেই রকম আনাড়ি অভিনেতা যা'রা থিয়েটারের ষ্টেজে একটা ফাঁকা গুলির আওয়াজে সত্যিসত্যিই ভয়ে মরে যায়! আমার সন্তানেরা আলোকের সন্তান—তা'রা ত' আর মায়া'র আবদ্ধ হ'য়ে চিরকাল মোহনিদ্রায় ঘুগে না।”

শাস্ত্রে যদিও আমি মায়া'র বিষয় আর তা'র নানা ব্যাখ্যা পড়েছিলাম, কিন্তু সে সব আমার এই প্রত্যক্ষদর্শন আর তা'র সাথে এই সাস্ত্রনাবাণীর সঙ্গে পাওয়া গভীর অন্তর্দৃষ্টি এমনভাবে দিতে পারে নি! মানুষের মূল্য গভীরভাবেই পরিবর্তিত হয় যখন তা'র মনে এই পরিপূর্ণ বিশ্বাস দৃঢ় আর বদ্ধমূল হয়ে দাঁড়ায় যে এই সৃষ্টি একটা বিরাট চলচ্চিত্র ছাড়া আর কিছুই নয়, আর এতে নয়, এর ওপারেই আছে তা'র আসল স্বরূপ!

এই অধ্যায় লেখা শেষ ক'রে আমি বিছানার উপর পদ্মাসনে বসলাম। দুটি ঘেরাটোপ দেওয়া আলোতে ঘরটি মৃদু আলোকিত। দৃষ্টি উত্তোলন ক'রে দেখলাম যে ঘরের ছাদ অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সরিষাবর্ণের আলোকবিন্দুর দ্বারা আচ্ছাদিত, রেডিয়মের জ্যোতিঃর মত স্পন্দিত হচ্ছে, ঝকঝক করছে। লক্ষ-কোটি আলোকরেখা বৃষ্টির ধারার মত একটি স্বচ্ছ আলোকদণ্ডে পরিণত হ'য়ে আমার উপর এসে নিঃশব্দে ঝরে পড়ছে।

সঙ্গে সঙ্গে আমার এ ভৌতিক দেহের জড়ত্ব নষ্ট হ'য়ে গিয়ে তা' অতি সূক্ষ্ম আর লঘু দেহে পরিণত হ'ল। মনে হ'ল যেন হাওয়ার উপর ভাসছি। বিছানা নামমাত্র ছুঁয়ে ভারশূন্য শরীরটা একবার এদিক একবার ওদিক পর্যায়ক্রমে ঈষৎ হুলতে লাগল। ঘরের চারদিকে তাকিয়ে দেখলাম—দেওয়াল আসবাবপত্র সবই ঠিক রয়েছে কিন্তু সেই স্বপ্ন আলোকপিণ্ডই এতদূর বর্ধিত হয়েছে যে ঘরের ছাদ একেবারে অদৃশ্য হ'য়ে গেছে, বিস্ময়ে স্তম্ভিত হ'য়ে গেলুম।

“এই হচ্ছে বিশ্বচলচ্চিত্রের কলকল্প,” আলোর ভিতর থেকেই যেন স্বরটা বেরিয়ে এল। “তোমার বিছানার শাদা চাদরের উপর এর আলোক-রশ্মিপাতে এ তোমার শরীরের ছবি কুটিয়ে তুলছে! এইবার দেখ, তোমার অরুতি আলো ছাড়া আর কিছুই নয়।”

আমি হাতছোটোর দিকে তাকালুম, সামনে পিছনে একবার তুলিয়ে দেখলুম, কিন্তু তা’দের কোন ভার আছে ব’লে বোধ হ’ল না। একটা অদ্ভুত আনন্দ আমায় অভিভূত ক’রে ফেললে। এই মহাব্যোমের আলোকসুত্ত আমায় শরীররূপে পরিণত হ’য়ে দেখাচ্ছে যেন কোন সিনেমার যন্ত্রগৃহ হ’তে প্রক্ষেপিত আলোকরশ্মিপ্রবাহে নিম্নিত একটি দৈবপ্রতিলিপি আর তা’ পর্দার উপর প্রতিফলিত একটি চিত্রের মতই প্রকাশ পাচ্ছে।

ঈদং আলোকিত আমার নিজেরই শয়নগৃহের রঙ্গমঞ্চে আমার শরীরের চলচ্চিত্র বহুক্ষণ ধ’রেই উপভোগ করলুম। বহু অপ্রাকৃত ঘটনাদর্শন ভাগ্যে ঘটেছে, কিন্তু এমন অপূর্ব ব্যাপার কখনও ঘটেনি। আমার জড়দেহের ভ্রান্তি যখন সম্পূর্ণরূপেই ঘটে গেল আর সকল পদার্থের সার যে আলোক তা’র যখন পূর্ণ উপলব্ধি ঘটল, আমি তখন উপরের দিকের স্পন্দনশীল “প্রাণকণিকা” স্রোতের দিকে তাকিয়ে মিনতিস্থচক স্বরে বললুম, “হে স্বর্গের আলো, দয়া করে আমার এই তুচ্ছ দেহপট আপনার মধ্যেই মিলিয়ে দিন—বাইবেলের ইলাইজা যেমন অগ্নিশিখার ঘূর্ণাবর্তের দ্বারা স্বর্গে আরুণ্ঠ হ’য়েছিলেন।”

প্রার্থনাটি অবশ্য নিতান্তই চমকপ্রদ, কাবেই আলোকরশ্মি তৎক্ষণাৎ অদৃশ্য হ’য়ে গেল। আমার শরীর আবার পূর্বেরকার মত ভারসংযুক্ত হ’য়ে বিছানার উপর এলিয়ে পড়ল; ছাদের উজ্জ্বল আলোকের ঝাঁক মিট মিট ক’রে ক্রমশঃ অদৃশ্য হ’য়ে গেল। দেখলুম যে এই পৃথিবী ত্যাগের সময় আমার এখনও আসে নি।

একটা দার্শনিক চিন্তাও তখন মনের মধ্যে উদয় হ’ল, “আর তা’ছাড়া ইলাইজা হয়ত’ আমার এ ধৃষ্টতায় অসন্তুষ্টও ত’ হ’তে পারেন!”

৩১শ পরিচ্ছেদ

পুণ্যশীলা মাতা কাশীমণি দেবীর সহিত সাক্ষাৎ

“লাহিড়ী মহাশয়ের জীবনসঙ্গিনী শ্রীমতী কাশীমণি মাতার সঙ্গে সাক্ষাতের বাসনা বহুদিন হ’তেই মনের মধ্যে স্তব্ধ ছিল। অল্প কিছুদিনের ভ্রম কাশীতে গিয়ে আমার সে বাসনা পূর্ণ করবার সুযোগ পেয়ে গেলুম। গুরুদেবের মহানায় লাহিড়ী মহাশয়ের বাড়ীতে গিয়ে তাঁ’র সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে তিনি আমায় সমাদরে গ্রহণ করলেন। বার্কিকাসত্বেও তাঁ’র আকৃতি যেন একটি পূর্ণপ্রস্ফুটিত পদ্মের মত, অদৃশ্যভাবে আধ্যাত্মিক সৌরভ তা’ থেকে নির্গত হ’চ্ছে। মধ্যমাকৃতি, ক্ষীণ গ্রীবা, গাত্রবর্ণ উজ্জ্বল। বৃহৎ উজ্জ্বল চকু দুটিতে মাতৃস্বর্গের মাহিমাবিত আননকে স্নিগ্ধকোমল ক’রে তুলেছে।

প্রণাম ক’রে বললুম, “পূজনীয়া মা, আপনার মহাপুরুষ স্বামীর কাছে আমি শৈশবেই দীক্ষিত হ’য়েছিলুম। তিনি আমার পিতামাতা আর আমার নিজগুরু শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজিরও গুরু ছিলেন। তা’ হ’লে আপনার পুণ্য-জীবনের কাহিনী শোনবার সুযোগ আমি নিশ্চয়ই পেতে পারি, কি ব’লেন?”

তিনি আমাকে স্নেহভরে ডেকে বললেন, “এস বাবা এস—ওপরে চল!”

কাশীমণি মাতা পথ দেখিয়ে নিয়ে চললেন একটি অতি ক্ষুদ্র ঘরে যেখানে কিছুদিন তিনি স্বামীর সঙ্গে বাস করেছিলেন। এই সেই পবিত্র তীর্থ যেখানে সেই অদ্বিতীয় মহাগুরু মানবজীবনের বিবাহনাটক অভিনয় করবার দীনতা স্বীকার করেছিলেন, তা’ দর্শন ক’রে কৃতার্থ বোধ করলুম। সেই মহিমাময়ী নারী তাঁ’র পাশের একটি গদির উপর আমায় বসতে ইঙ্গিত করলেন।

তাঁ’রপর তিনি বলতে শুরু করলেন, “স্বামীর দৈবপ্রকৃতি জানতে আমার অনেক দিনই লেগেছিল। এক রাত্রে, এই ঘরেতেই একটা পরিষ্কার স্বপ্ন দেখলুম—আমার মাথার উপর স্বর্গদূতেরা কল্পনাভীত মনোরমভাবে ভেঙে

বেড়াছেন। দৃশুটা এতদূর বাস্তুব ব'লে বোধ হ'ল যে তখুনিই আমি জেগে উঠলুম, ঘরটি তখনও উজ্জ্বল আলোয় অদ্ভুতভাবে ছেয়ে রয়েছে।

“আমার স্বামী পদ্মাসনে ব'সে, ঘরের মাঝখানে তাঁর দেহ শূন্যে ভাসছে আর স্বর্গদূতেরা সব করযোড়ে স্তবস্তুতি ক'রছেন। এতদূর আশ্চর্য্য হ'য়ে গেছি যে, আমার বিশ্বাস হ'ল যে আমি স্বপ্নই দেখছি।

“লাহিড়ী মহাশয় বললেন, ‘নারি এ তোমার স্বপ্ন নয়! তোমার মোহনিদ্রা পরিত্যাগ ক'র, চিরকালের জ্ঞান! তা'রপর ধীরে ধীরে যখন তিনি মাটিতে নেমে এলেন, তখন আমি তাঁর পায়ে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করলুম।

“বললুম, ‘গুরু, বার বার আমি আপনাকে প্রণাম করি। আপনাকে স্বামী ব'লে ভাবতে আমার যে অপরাধ হয়েছে তা' ক্ষমা ক'রবেন কি? লজ্জায় মরে যাই এ কথা ভেবে যে যিনি সাক্ষাৎ দেবতা, আমি কিনা তাঁরই পাশে অজ্ঞানে আচ্ছন্ন হয়ে এতদিন মোহঘোরে ঘুমিয়ে কাটিয়েছি। আজ রাত থেকে আর আপনি আমার স্বামী ন'ন, আমার গুরু। এই দীনাতীনা নারীকে আপনার শিষ্যা ব'লে গ্রহণ ক'রবেন কি?’

“গুরুদেব আমায় মৃদুস্পর্শ ক'রে বললেন, ‘পবিত্র আত্মা, ওঠ, তোমায় গ্রহণ করলুম।’ তা'রপর তিনি দেবদূতদের দেখিয়ে দিয়ে বললেন, ‘এইসব পুণ্যাত্মা সাধুসন্তদের একে একে সব প্রণাম ক'র।’

“যখন আমি নতজানু হ'য়ে সবাইকে প্রণাম করা শেষ ক'রলুম তখন সেই স্বর্গীয় কণ্ঠস্বর সব একসঙ্গে ধ্বনিত হ'য়ে উঠল—যেন কোন প্রাচীন শাস্ত্র হ'তে উদাত্ত গম্ভীরস্বরে সমবেতকণ্ঠে স্তোত্রপাঠ হচ্ছে।

“‘দেবতার সঙ্গিনি, আপনি পুণ্যবতী, আপনাকে আমরা প্রণাম করি।’ ব'লে তাঁরা সব আমার পদতলে প্রণাম ক'রলে, আর আশ্চর্য্য;—সঙ্গে সঙ্গে সেই সব জ্যোতির্ময় মূর্তিও সকল একেবারে অদৃশ্য হয়ে গেল। ঘর অন্ধকার।

“আমার গুরু ক্রিয়াযোগে আমায় দীক্ষা নিতে বললেন। আমি বললুম, ‘নিশ্চয়ই নো'ব। হায়রে, আমার কি পোড়াকপাল যে ক্রিয়াযোগের আশীর্বাদ কেন এতদিন আগে পাইনি।’

“লাহিড়ী মহাশয় সান্ত্বনার হাসি হেসে বললেন, ‘তখনও সময় হয় নি তা'ই, বুঝলে? তোমার অনেক কর্মফল আমি নীরবে খণ্ডে দিয়েছি, এখন তুমি তৈরী হয়েছ ব'লেই তোমার ইচ্ছা হয়েছে।’

“তা’রপর তিনি আমার কপাল স্পর্শ করলেন। একটা ঘূর্ণায়মান জ্যোতিঃপিণ্ড দেখা দিলে। সেই জ্যোতিঃপ্রভা ক্রমশঃ ওপেলের মত নীল আধ্যাত্মিক চক্রেতে পরিণত হ’ল—সোনার বেড়দেওয়া মাঝখানে একটি পঞ্চকোণ তারকা।

“‘তোমার জ্ঞান ঐ তারা ভেদ ক’রে অনন্তরাজ্যের দিকে প্রসারিত কর’, আমার গুরুদেবের কণ্ঠে নতুন স্বর, দূর হ’তে ভেসে আসা গানের মত নূর ও কোমল।

“স্বপ্নের পর স্বপ্ন সমুদ্রের ঢেউয়ের মত আমার আত্মার তটপ্রান্তে এসে আছড়ে পড়তে লাগল, তা’রপর চতুর্দিককার পরিদৃশ্যমান জগৎ অবশেষে গলে গিয়ে আনন্দসমুদ্রে পরিণত হ’ল। সেই আনন্দসাগরের তরঙ্গে ডুবে গিয়ে একেবারে আত্মহারা হ’য়ে গেলুম। ষষ্ঠীকতক পরে যখন আমার এ জগতের বাহ্যজ্ঞান ফিরে এল, গুরুদেব তখন আমার ক্রিয়াযোগের প্রণালী শিক্ষা দিলেন।

“সেই রাত থেকেই লাহিড়ী মহাশয়, আমার ঘরে আর কখনও শোন নি। তিনি তাঁ’র শিষ্যদের নিয়ে নিচেকার সামনে ঘরেই দিবারাত্র থাকতেন।”

এই কথাগুলি ব’লে তিনি চুপ করলেন। সেই মহান যোগীর সঙ্গে তাঁ’র অপূর্ণ সখ্যক উপলব্ধি ক’রে আমি তাঁ’র জীবনের আরও গুটিকতক কথা তখন শোন্বার ইচ্ছা প্রকাশ করলুম।

“বাবা, তোমার লোভ বড় বেড়ে গেছে দেখছি। যাক্, বেশী কিছু আর বন্ব না, আর একটিমাত্র ঘটনা তোমায় বন্ব।” ব’লে একটুখানি সলজ্জ হাসি হেসে আবার শুরু করলেন, “আমার গুরু স্বামীর কাছে যে একটি পাপ করেছিলুম তা’ আজ স্বীকার ক’রব। আমার দীক্ষার মাসকতক পরে আমি নিজেকে তাঁ’র কাছে পরিত্যক্ত আর অবহেলিত ব’লে বোধ করতে আরম্ভ করলুম। একদিন লাহিড়ী মহাশয় এই ছোট্ট ঘরটিতে একটি জিনিষ নিতে চুকলেন, আমিও তাড়াতাড়ি তাঁ’র পিছন পিছন এলুম। দারুণ মোহঘোরে বিভ্রান্ত হ’য়ে তাঁ’কে খোঁটা দিয়ে বন্লুম, ‘আপনার সব সময়টাই শিষ্যদের নিয়ে কাটে। আপনার স্ত্রীপুত্রের জন্ম কি কর্তব্য করছেন? সংসার চালাবার জন্ম আরো যে টাকার দরকার তা’ যোগাবার আপনার গরজ নেই, এ বড় ছুঃখের কথা।’

“গুরুদেব একটিবার আমার দিকে দৃষ্টিপাত ক’রলেন, তা’রপরেই ব্যস, একেবারে অদৃশ্য! ভয়ে কাঁঠ হ’য়ে গিয়ে শুন্‌লুম একটি মাত্র কণ্ঠস্বর ঘরের চতুর্দিক থেকে ধ্বনিত হ’চ্ছে, ‘দেখছ না, এ একেবারে শূন্য! আমার মত একটা শূন্য পদার্থ তোমার জন্ত টাকা আনবে কি ক’রে, ব’ল?’

“আমি টেঁচিয়ে ব’লে উঠলুম, ‘গুরুদেব, আমি কোটি কোটিবার আপনার কাছ থেকে মাপ চাইছি। আমার পাপচক্ষু আপনাকে ত’ আর দেখতে পা’চ্ছে না। দয়া ক’রে আপনি আপনার পুণ্যদেহে আবার ফিরে আসুন!’

“মাথার উপর শূন্য থেকে উত্তর ভেসে এল, ‘এই যে আমি এখানে,’ মাথা তুলে দেখি শূন্যে গুরুদেবের দেহ, মস্তক ঘরের ছাদ স্পর্শ ক’রে রয়েছে। চকু দু’টি যেন জ্বলন্ত অগ্নিশিখা! নিঃশব্দে তিনি নেবোর উপর নেমে এলে ভয়ে জ্ঞানশূন্য হ’য়ে গিয়ে তাঁ’র পায়ের উপর পড়ে হুঁপিয়ে কঁপিয়ে কাদতে লাগলুম।

“তিনি বলতে লাগলেন, ‘নারি, সেই পরমধনকে খোঁজ, এ সংসারের তুচ্ছ টাকাকড়ি নয়। অন্তরে ঐশ্বর্য্য সঞ্চয় করলে দেখতে পাবে যে, বাইরের সাহায্য সর্ব্বদাই আসছে।’ তা’রপর আশ্বাস দিয়ে তিনি আমার বল্লেন, ‘আমার একটি অধ্যাত্মপুত্র তোমায় সাহায্য করবে দেখো, কিছু ভাবনা নাই!’

“গুরুজির কথা সত্যি সত্যিই ফলে গেল; একটি শিষ্য আমাদের সংসারের জন্তে অনেক টাকা দিয়ে গিয়েছিল।”

তাঁ’র সব অপূর্ব্ব অভিজ্ঞতার বিষয় শ্রবণ ক’রে আমি তাঁ’কে আন্তরিক ধন্যবাদ দিলুম! * তা’রপরদিন পুনরায় তাঁ’দের বাড়ীতে গেলুম। দেখা হ’ল তাঁ’দের দুই ছেলের সঙ্গে—তিনকড়ি আর দুকড়ি লাহিড়ী। দু’জনেরই শাক্তি দীর্ঘ, গৌরবর্ণ, বলিষ্ঠ, ঘন শ্মশ্রুবিশিষ্ট, কণ্ঠস্বর কোমল আর বনিয়াদী ব্যবহারে স্বভাবসিদ্ধ মাধুর্য্য! ঘণ্টাকতক ধ’রে তাঁ’দের সঙ্গে ধর্ম্মালোচনা চলল। ভারতের শ্রেষ্ঠ গৃহস্থযোগীর এই সাধুপ্রকৃতি পুত্রদ্বয় তাঁ’র আদর্শ অতি নিবিড়ভাবেই অনুসরণ ক’রে চলতেন।

তাঁ’র জীই যে লাহিড়ী মহাশয়ের একমাত্র শিষ্য ছিলেন তা’ নয়, আরও শত শত শিষ্য ছিলেন, আমার মা হচ্ছেন তাঁ’দের মধ্যে একজন। একটি

* পরমারাধ্যা কাশীমণিমাতা ১৯৩০ সালে বারাণসীতে পরলোকগমন করেন।

মহিলাশিষ্যা সেই মহাপুরুষ কাছ থেকে একবার তাঁ’র একটি ফটোগ্রাফ চাইলেন। তিনি তাঁ’র হাতে ছবিখানি দিয়ে বললেন, “তুমি যদি এটা রক্ষাকবচ ব’লে মনে কর, তবে এ তাইই হ’বে ; আর তা’ না হ’লে এ শুধু কেবল ছবি হয়েই থাকবে !”

দিনকতক পরে উক্ত স্ত্রীলোকটি আর লাহিড়ী মহাশয়ের পুত্রবধু একদিন একটা টেবিলের উপর গীতা রেখে পড়ছিলেন ! টেবিলটার পিছনেই সেই ফটোগ্রাফটি টাঙান ছিল, হঠাৎ তখন দারুণ জল ঝড় বজ্রপাত শুরু হ’ল।

ভয়ে স্ত্রীলোকটি ছবির সামনে প্রণাম ক’রে করযোড়ে বলতে লাগলেন, ‘লাহিড়ী মহাশয়, আমাদের রক্ষা করুন, আমাদের রক্ষা করুন’। দৈবক্রমে হঠাৎ একটা বাজ এসে পড়ল তাঁ’রা যে বই পড়ছিলেন তা’র উপর, কিন্তু ভক্তদুটি অক্ষত দেহে রক্ষা পেয়ে গেলেন। সেই শিষ্যাটি পরে বলেছিলেন, ‘আমার মনে হ’ল যেন একটা বরফের চাঁই আগায় চারধারে ঘিরে রেখেছিল, বাজের আগুনে ঝলসে যাবার হাত থেকে বাঁচাবার জন্তে।’

অভয়া নামে এক আর একটি শিষ্যার বেলায়ও লাহিড়ী মহাশয়কে দুটি অলৌকিক ব্যাপার প্রদর্শন করতে হয়েছিল। অভয়া আর তা’র স্বামী, কলকাতার একজন উকীল, গুরুদর্শনের জন্ত একদিন কাশী যাত্রা করলেন। রাস্তার খুব ভিড় থাকাতে ভাড়াটে গাড়ীর হয়ে গেল দেরী। স্টেশনে ঢুকতে ঢুকতেই শুনতে পেলেন, কাশীর গাড়ী বাঁশী বাজিয়ে ছেড়ে যাচ্ছে।

এখন উপায় ? সে দিন কাশীর আর কোন গাড়ীই নাই ; আবার তা’র পরের দিনে গাড়ী। এখন আবার গাড়ী করে বাড়ী ফিরে যেতে হয়। উকীল মহাশয় ত’ এই রকম সাতপাঁচ ভেবেই খুন।

এখানে অভয়া টিকিট ঘরের কাছে চুপচাপ দাঁড়িয়ে। মনে মনে নীরবে তা’র গভীর প্রার্থনা চলেছে, “লাহিড়ী মহাশয়, আপনার পায়ে পড়ি, গাড়ীটা থামিয়ে দিন, থামিয়ে দিন ! আপনার দর্শনলাভে আরও একদিন বিলম্ব হ’বে, এ যে আমি কিছুতেই সহিতে পারব না।”

ব্যস ! এখানে কিন্তু ট্রেনের চাকা ঘর্ষ ক’রে ঘুরেই চলেছে কিন্তু গাড়ী এক পা’ও আর এগোচ্ছে না। গাড়ীর ইঞ্জিনচালক, আরোহীরা সবাই প্ল্যাটফর্মে নেমে পড়ল এই অদ্ভুতব্যাপার সন্দর্শনের জন্ত। একটা সাহেব গার্ড অভয়া আর তাঁ’র স্বামীর কাছে এসে দাঁড়াল, আর যা’ কখনও

করে না তাই সে ক'রে বসল—বল্লে, “বাবু, আমার টাকা দিন, আমি আপনাদের টিকিট কিনে এনে দিচ্ছি আর আপনারা ততক্ষণ গাড়ীতে উঠে বসুন।”

স্বামীজী দুজনে যেমনি গাড়ীতে উঠে বসল আর টিকিটও পেয়ে গেল, ট্রেনও অমনি ধীরগতিতে অগ্রসর হ'তে লাগল। ইঞ্জিনড্রাইভার, প্যাসেঞ্জারেরা ত' সব ভয়েময়ে একেবারে হুড়মুড় করে গাড়ীতে ঢুকে পড়ল—জানতেও পারলে না, কি ক'রেই বা প্রথমে ট্রেনের গতি বন্ধ হ'বেছিল আর কি ক'রেই বা তা' ফের আবার চলতে শুরু করলে।

কাশীতে লাহিড়ী মহাশয়ের বাড়ীতে পৌছে অভয়া ত' নীরবে গুরুর সামনে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম ক'রে পায়ের ধূলা নিলে। লাহিড়ী মহাশয় বল্লেন, “একটু স্থির হও অভয়া, একটু ঠাণ্ডা হও; তুমি আমার কি জ্বালাতনটাই না ক'র দেখি! তুমি যেন এর পরের ট্রেনটার আর এখানে আসতে পারতে না! কি যে তোমার খেয়াল, তা'র আর তোমায় কি বলব।”

আর একটি ব্যাপারে লাহিড়ী মহাশয়ের কাছে উক্ত শিষ্য গিয়ে ধ'রে পড়েছিল, সেটিও একটি অস্বাভাবিক ঘটনা। এবার গুরুদেবের কাছে অভয়ার সাহায্যপ্রার্থনা আর ট্রেনের জ্ঞান নয়, এবার তা'র সন্তানের জ্ঞান।

অভয়া ত' যথারীতি গুরুদেবের পাদবন্দনা শেষ ক'রে তা'রপর তা'র অন্তরের বাসনা জানালে, “গুরুদেব, এবার আমার নবম সন্তানটি যেন জন্মে বেঁচে থাকে। আট আটটি আমার সন্তান হ'ল; কিন্তু সব ক'টি জন্মাবার পরই মারা গেছে, একটিও আর বেঁচে নেই।”

করণবিগলিত মধুর হাসিতে প্রসন্নবদন গুরুদেব বল্লেন, “এবার তোমার সন্তানটি নিশ্চয়ই বাঁচবে, দেখো। আমার উপদেশগুলো কিন্তু বেশ ক'রে মন দিয়ে শোনো। এবার হ'বে তোমার একটি কন্যাসন্তান, রাক্ষসেই ভূমিষ্ঠ হ'বে। শুধু এইটুকু নজর রেখো যে তোমাদের পিঙ্গীমটা যেন ভোর অবধি জ্বলতে থাকে, কিছুতেই না যেন নিভে যায়। ষুমিয়ে পোড়ো না যেন, তা'হলেই পিঙ্গীমটা নিভে যাবে।”

অভয়ার সন্তানটি হ'ল কন্যা, রাত্রেই ভূমিষ্ঠ হ'ল—সর্বদর্শী গুরু যেমনটি বলে দিয়েছিলেন ঠিক তেমনটি। প্রসূতি বাইকে পিঙ্গীমটা তেলে ভর্তি ক'রে রাখতে ব'লেছিলেন। স্ত্রীলোক দু'টি সারারাত জেগে শেষরাত

অবশি পাহারা দিলে বটে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তা'রা ঘুমিয়েই পড়ল। এখানে আলোর পিদ্দীমের তেল প্রায় ফুরিয়ে এসেছে; আলোটা ক্ষীণ হয়ে গিয়ে “খাবি” খাচ্ছে!

আঁতুড় ঘরের দরজার খিলটা ষটাং ক'রে খুলে গিয়ে দরজার পাল্লা দুটো বন্বান্ ক'রে হু'ধারে খুলে গেল। জ্বীলোকহু'টি ধড়মড়িয়ে জেগে উঠে আশ্চর্য হ'য়ে দেখে যে লাহিড়ী মহাশয় সামনে দাঁড়িয়ে; পিদ্দীমটা দেখিয়ে দিয়ে লাহিড়ী মহাশয় বল্লেন, “অভয়া, দেখদিখি আলোটা এবার নিভল যো।” ধাইটা দৌড়ে তেল এনে ভর্তি ক'রে দিলে। আবার যেই আলোটা উজ্জ্বল হ'য়ে উঠল, অমনি গুরুদেব অদৃশ্য হয়ে গেলেন। দরজা বন্ধ হয়ে গেল আর খিলও পড়ে গেল, কিন্তু কে যে দিয়ে দিলে তা' চোখে দেখা গেল না।

অভয়ার নবম সন্তানটি বেঁচে গেল; ১৯৩৫ সালে আমি খবর নিয়েছিলুম যে তখনও সেটি জীবিত।

লাহিড়ী মহাশয়ের অপর একটি শিষ্য, শ্রদ্ধেয় কালীকুমার রায় গুরুর সহিত তাঁর জীবনযাপনের বহু কৌতুহলোদ্দীপক মনোরম কাহিনী আমার বলেছিলেন।

কালীবাবু বল্লেন, “কাশীর বাড়ীতে আমি প্রায়ই কয়েক হণ্টা ধ'রে তাঁর অতিথি হয়ে থাকতুম। দেখতুম যে বহু সাধুসন্ত দণ্ডীস্বামীরা* রাত্রির নিশ্চরতার মধ্যে তাঁর চরণতলে এসে সমবেত হ'তেন। কখনও কখনও ধ্যানধারণা বা দার্শনিকতত্ত্ব সম্বন্ধেও আলোচনা হ'ত। উষার আগমনের সঙ্গে সঙ্গেই মহামাত্র অতিথিবর্গ সব একে একে প্রস্থান করতেন। আমার থাকবার সময় দেখেছিলুম যে লাহিড়ী মহাশয় ঘুমোবার জন্তে একবারও গুতেন না বা চোখের পাতা বুঁজোতেন না।

কালীবাবু বলতে লাগলেন “গুরুদেবের সঙ্গে প্রথম প্রথম সঙ্গ করবার সময় আমার মনিবের কাছ থেকে বিস্তর বাধাবিপত্তি সহ্য ক'রতে হ'য়েছিল। তিনি ও সব ধর্ম্মটর্শ্বের কোন ধার ধারতেন না। টিটকারি দিয়ে প্লেষ পূর্ণস্বরে বলতেন, “আমার কর্ম্মচারীদের ভেতর ধর্ম্ম ধর্ম্ম ক'রে পাগল কোন লোক চাই না—আর আমি যদি তোমার সেই বুজবুজ গুরুটিকে একবার দেখতে পাই

* দণ্ডীরা মানবসম্বন্ধের প্রতীক দণ্ড, এই আশ্রমচিহ্ন ধারণ ক'রে চলেন।

ত', তা' হ'লে তাঁ'কে এমন গুটিকতক কথা শুনিয়া দে'ব যে, বহুদিন তাঁ'র তা' মনে থাকবে।"

"কিন্তু এই রকম ক'রে ভয় দেখানতেও আমার রোজকার যাওয়াআসা কিছুমাত্র কমল না। প্রায় প্রতিসন্ধ্যাই আমি গুরুর সাক্ষাতে কাটাতুম। একদিন সন্ধ্যায় আমার মনিবটি আমায় অনুসরণ ক'রে এসে লাহিড়ী মহাশয়ের বৈঠকখানায় উদ্ধতভাবে সবেগে ঢুকে পড়লেন। মনে মনে এঁ'কে রেখেছিলেন যে, একবার দেখা হ'লে হয়, তা' হ'লে যেমনটি ব'লেছিলেন তেমনি দাক্ষণ বচন শোনাবেন। ঘরে তখন গুটি বার শিষ্য বসে। বাক্, প্রভু যেমনি ঘরের মধ্যে গুছিয়েটুছিয়ে বেশ কায়েমি হয়ে বসলেন, তেমনি লাহিড়ী মহাশয়ও স্নরু করলেন তাঁ'র শিষ্যদের ডেকে, 'দেখ, তোমরা একটা ছবি দেখতে চাও না কি, ত' ব'ল ?"

"আমরা যখন সায় দিয়ে ঘাড় নাড়লুম, তখন তিনি ঘরটি অন্ধকার করতে ব'লে বললেন, 'আচ্ছা, তোমরা একজনের পিছনে একজন এমনি ক'রে চক্রাকারে গোল হ'য়ে বস, আর প্রত্যেকেই তা'র সামনের লোকের চোখের উপর হাত দিয়ে টিপে বন্ধ ক'রে ধর।'

"আশ্চর্য্য, কিন্তু আমার মনিবটিও, যদিও ঈবৎ অনিচ্ছাক্রমে, তবুও গুরুদেবের উপদেশ পালন ক'রে গেলেন। মিনিটকতকের মধ্যেই লাহিড়ী মহাশয় জিজ্ঞাসা করলেন, আমরা কি দেখছি তা' তাঁ'কে বলতে।

"আমি বললুম, 'ম'শায়, একটি অতি সুন্দরী স্ত্রীলোক দেখা যাচ্ছে, পরণে তা'র লালপেড়ে সাড়ী, একটা কচুগাছের কাছে দাঁড়িয়ে।' অত্যাশ্চর্য্য শিষ্যরাও সব একই বর্ণনা দিলে। গুরুদেব আমার মনিবের দিকে ফিরে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা ক'রলেন, 'স্ত্রীলোকটিকে চেন না কি ?'

"লোকটির মনে তখন এক অদ্ভুত ভাবের ঝড় উঠেছে। সামলাতে পারছেন না; শেষ অবধি ব'লেই ফেললেন, "আজ্ঞে হ্যাঁ, চিনি বইকি, কি বলব বলুন; ঘরে সুন্দরী সাক্ষরী স্ত্রী থাকতেও আমি স্ত্রীলোকটির পিছনে বোকার মত টাকা ঢালছি। যে মতলব ক'রে আমি এখানে এসেছিলাম, তা'র জন্তে মনে মনে আমি বাস্তবিক বড়ই লজ্জিত; আপনি আমায় ক্ষমা ক'রে আপনার শিষ্য ক'রবেন কি ?"

"যদি তুমি অন্ততঃ মাসছয়েক খুব সৎভাবে জীবন যাপন ক'রতে পার,

তবেই তোমায় আমি গ্রহণ করব, তা'রপর যেন একটু হেঁয়ালিতেই বললেন, 'তা' না হ'লে তোমায় দীক্ষা দেবার কোন প্রয়োজনই হ'বে না।'

“মাস তিনেক ধ'রে ত' আমার মনিবটি লোভ সংবরণ ক'রে রইলেন, কিন্তু তা'রপরই আবার সেই স্ত্রীলোকটির সঙ্গে তা'র পূর্ব সম্বন্ধ স্থাপিত হ'ল। মাসদুই পরেই তিনি মারা গেলেন। এইবার বুঝতে পারলুম যে আমার মনিবের দীক্ষার অসম্ভাব্যতার বিষয়ে কেন গুরুদেব হেঁয়ালিতে ভবিষ্যদ্বাণী ক'রেছিলেন।

লাহিড়ী মহাশয়ের একটি বরণ্য বন্ধু ছিলেন—তিনি হচ্ছেন ত্রৈলঙ্গ স্বামী। বয়স লোকে বলে তিনশ' বছরেরও উপর। মহাবোগিদ্বয় প্রায়ই একত্র ধ্যানে বসতেন। ত্রৈলঙ্গ স্বামী এত বেশী সুপরিচিত আর তাঁ'র যশ এত সুদূরবিস্তৃত ছিল যে, তাঁ'র অলৌকিক ঘটনার সত্যতা সম্বন্ধে কেউ কোন প্রশ্নই উত্থাপন করে না। আজকে বীণ্ডুখুষ্ট পৃথিবীতে অবতীর্ণ হ'য়ে নিউইয়র্ক সহরের রাস্তা দিয়ে হেঁটে চলতে গিয়ে তাঁ'র দৈবশক্তি প্রদর্শনে যে উত্তেজনার সৃষ্টি করতেন, ত্রৈলঙ্গ স্বামী বছবৎসর পূর্বে কাশীর গলি দিয়ে হেঁটে যেতে সেই রকমই উত্তেজনার সৃষ্টি করেছিলেন। তিনি ছিলেন সেই সব সিদ্ধপুরুষদিগের মধ্যে একজন, যা'রা ভারতবর্ষকে কালের গ্রাস হ'তে রক্ষা ক'রে এসেছেন।*

* আধুনিক পণ্ডিতেরা ভারতীয় সভ্যতার প্রাচীনত্ব মানবজাতিতত্ত্বের দিক দিয়ে একটা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বিষয় বলেই উপলব্ধি করেছেন।

বেদের নির্দেশানুযায়ী ভারতবর্ষই (সিন্ধু ও হিমাচল প্রদেশ) আৰ্য্যজাতির প্রকৃত বাসভূমি ছিল। প্রাচীন আৰ্য্যগণ যে এশিয়া ও ইউরোপের কোন অংশ থেকে এসে ভারত আক্রমণ করেছিলেন, আধুনিক এই মতবাদ হিন্দুসাহিত্য বা কিম্বদন্তি কোন কিছুতেই সমর্থিত হয় না। মানবজাতিতত্ত্বের বিচারে বেদসমূহের মধ্যে যে সব আভ্যন্তরীণ সাক্ষ্যপ্রমাণ আছে, সে সব ১৯২১ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত শ্রীঅবিনাশচন্দ্র দাস মহোদয় লিখিত একটি অপূর্ব আর যৌক্তিক স্মৃতিপাঠ্য গ্রন্থ “ঋগ্বেদের যুগে ভারত” নামক পুস্তকে তা' অতি স্পষ্টভাবে প্রদর্শিত হ'য়েছে।

অধ্যাপক দাস মহাশয় বলেন যে, ভারতবর্ষ থেকেই বহুলোক ইউরোপ আর এশিয়ার নানা অংশে গিয়ে উপনিবেশ স্থাপন করেন এবং সেখানে আৰ্য্যভাষা আর লোকসাহিত্য প্রচার করেন। উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে যে, লিথুয়ানিয়ানরা যা'দের রীতিমত সাহিত্য ব'লতে উল্লেখযোগ্য বড় একটা কিছু নাই, তা'দের ভাষা এতদূর সংস্কৃতযেবা আর তা'র সঙ্গে এতদূর সাদৃশ্য আছে যে, পণ্ডিতেরা সংস্কৃতে আলাপ করলে, তা' তা'রা বুঝতে পারে। লক্ষপ্রতিষ্ঠ দার্শনিক কান্ট, যিনি সংস্কৃত একেবারে

বহু উপলক্ষ্যেই ত্রৈলোক্য স্বামীকে দেখা যেত যে, কালকূট বিষ তিনি পান করেছেন, তবু তা'র কোনই কুফল হয় নি। হাজার হাজার লোক, তা'দের মধ্যে জনকতক এখনও বেঁচে—গঙ্গার জলের উপর ত্রৈলোক্য স্বামীকে ভাসতে দেখেছেন। দিনের পর দিন তিনি জলের উপর ব'সে অথবা জলের তলায় বহুক্ষণ ধরে লুকিয়ে পড়ে থাকতেন। কাশীর স্নানের ঘাটে প্রচণ্ড সূর্য্যকিরণে উত্তপ্ত প্রস্তরখণ্ডের উপর ত্রৈলোক্য স্বামী নিষ্পন্দভাবে পড়ে রয়েছেন—এ একটা অতি সাধারণ দৃশ্য ছিল। এই সকল অলৌকিক ক্রিয়াকলাপে তিনি মানুষকে এই বলেই শিক্ষা দিতে চাইতেন যে, যোগীর জীবন শুধু অক্লিঞ্জন আর সাধারণ অবস্থা বা কোনপ্রকার সাবধানতার উপর নির্ভর করে না। জলের উপরেই হোক আর নিচেই হোক, কি দারুণ উত্তপ্ত প্রস্তরখণ্ডের উপর তাঁ'র নিষ্পন্দ উলঙ্গদেহ পড়ে থাকুক, ত্রৈলোক্য স্বামী প্রমাণ করেছিলেন যে তিনি ঈশ্বর-চৈতন্যের মধ্যেই সঞ্জীবিত, মৃত্যু তাঁ'কে স্পর্শও ক'রতে পারে না।

যোগিবর যে শুধু আধ্যাত্মিকতায়ই বিরটি ছিলেন তা' নয়, দেহটিও ছিল বিপুল। ওজন ছিল তিনশত পাউণ্ড অর্থাৎ আয়ুর প্রত্যেক বছরের দরুণ এক পাউণ্ড হিসাবে আর কি! আহার ছিল অতি অল্পই, কাষেই দেহ কেমন ক'রে এগুপ বিশাল হ'ল, তা' বাস্তবিকই রহস্যজনক। সিদ্ধযোগীরা স্বাস্থ্যের সাধারণ নিয়মকানুন সব উপেক্ষা ক'রে চলতে পারেন, যখন তাঁ'র কোন বিশেষ কারণে—আর তা' প্রায়ই অতি গূঢ়, কেবল তিনিই স্বয়ং জানেন—তা' করার দরকার হয়। বড় বড় সাধুসন্তরা, যা'দের মায়াস্বপ্ন টুটে গেছে আর এই বিশ্ব-জগৎকে ঈশ্বরের মনের একটা পরিকল্পনা বলেই বোধ হয়েছে, তাঁ'রা শরীরকে নিয়ে যা' ইচ্ছে তা'ই করতে পারেন। তাঁ'রা জানেন যে এ আর কিছু নয়, বনীভূত শক্তির একটা কার্যসাধক আকার আর কি। যদিও পদার্থবিজ্ঞানীরা আজকাল বুঝতে আরম্ভ করেছেন যে, জড় আসলে বনীভূত শক্তি ছাড়া আর কিছুই নয়, পূর্ণজ্ঞানী যোগীরা কিন্তু জড়নিয়ন্ত্রণব্যাপারে বহুদিন আগে থেকেই শুধু কল্পনার ক্ষেত্র থেকে অভ্যাসের পারদর্শিতায় পৌঁছেছেন।

কিছুই জানতেন না, তিনি লিথুয়ানিয়ান ভাষার বৈজ্ঞানিক গঠনপ্রণালী দেখে অত্যন্ত চমৎকৃত হ'ন। তিনি বলেছিলেন, “এর কাছে এমন একটি চাবি আছে যা'র দ্বারা শুধু ভাষাতত্ত্বের নয়, ইতিহাসেরও রহস্যপূর্ণ গুপ্তদ্বার উন্মুক্ত হ'তে পারে।”

ত্রেলঙ্গ স্বামী সর্বদাই সম্পূর্ণ উলঙ্গ অবস্থায় থাকতেন আর কাশীর পুলিশকেও তাঁ'কে নিয়ে এক দারুণ সমস্যার পড়ে অত্যন্ত বিব্রত থাকতে হ'ত। স্বামীজি ইডেন উদ্যানে আদিনর আদমের মত তাঁ'র উলঙ্গ অবস্থা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন ছিলেন। পুলিশ কিন্তু এবিষয়ে অত্যন্ত সচেতন ছিল আর এ নিয়ে খুবই হাঙ্গামা বাধাত। একদিন জেলেই পুরে দিলে। চারধারে গোলমাল সুরু হ'ল। কিছুক্ষণ বাদেই দেখা গেল যে বিরাটবপু ত্রেলঙ্গ স্বামী কারাগারের ছাতের উপর পাইচারি ক'রে বেড়াচ্ছেন। তাঁ'র কুঠুরিতে তখনও মজবুত তালাচাবি বুলুছে। কি ক'রে যে বেরুলেন, তা' কেউই বলতে পারে না।

হতাশ হ'য়ে গিয়ে আবার পুলিশের লোকেরা তাঁ'কে কুঠুরিতে ঢোকালে এবার কিন্তু দরজার কাছে একজন প্রহরী রাখা হ'ল। কিন্তু হ'লে কি হ'বে? দৈবশক্তির কাছে আইন আবার হেরে গেল। আবার দেখা গেল যে ত্রেলঙ্গ স্বামী পরম ঔদাসীন্দের সহিত ছাতের উপর পাদচারণা ক'রে বেড়াচ্ছেন—কোন ক্রক্ষেপই নাই। বিচারের দেবতা অন্ধ, বিভ্রান্ত পুলিশের লোকেরা তা'কেই অনুসরণ করতে চেয়েছিল।

ত্রেলঙ্গ স্বামী সর্বদা মৌনব্রত অবলম্বন ক'রে থাকতেন।* তাঁ'র ভ্রূগোল মুখ আর বিরাট পিপার মতন উদর থাকা সত্ত্বেও স্বামীজি অতি অল্পই আহার ক'রতেন। হয়ত' হপ্তা কয়েক ধ'রে উপবাসে কাটাবার পর তাঁ'র ভক্তদের আনা কিছু ঘোল খেয়ে উপবাস ভঙ্গ করলেন। জটনক অবিশ্বাসী ব্যক্তি একবার মনে করলে যে ত্রেলঙ্গ স্বামীকে একটা ভণ্ড বা বুজবুজ ব'লে প্রমাণ ক'রে দেবে। এই না মতলব ক'রে সে করলে কি, একটা বড় বালুতি ক'রে একবালুতি কলিচূণ গোলা এনে স্বামীজির সামনে রেখে বুললে, "প্রভু আপনার জন্তে এই একটু ঘোল এনেছি, দয়া করে পান করুন।"

ত্রেলঙ্গ স্বামী কিছুমাত্র ইতস্ততঃ না করেই শেষবিন্দুটি অবধি পান ক'রে ফেললেন। সঙ্গে সঙ্গে সেই ছুঁটলোকটি মাটিতে পড়ে গিয়ে যন্ত্রণায় গড়াগড়ি

* তিনি ছিলেন বুনি অর্থাৎ মৌনব্রতধারী সন্ন্যাসী। বুনি শব্দের সংস্কৃত ধাতুর সঙ্গে গ্রীক 'মন' শব্দের সাদৃশ্য আছে, নানে একাকী, নিঃসঙ্গ—যা থেকে ইংরেজি শব্দ 'মঙ্ক', অর্থাৎ সন্ন্যাসী, বা 'মনিষ্ট' অর্থাৎ একেশ্বরবাদ প্রভৃতি শব্দ গঠিত হয়েছে। ত্রেলঙ্গ স্বামী ছিলেন 'দিগম্বর', কাবেই সর্বদা উলঙ্গ থাকতেন। দিগম্বরেরা হ'চ্ছেন শৈব।

দিতে লাগল আর টেঁচাতে লাগল, “বাঁচান, স্বামীজি, বাঁচান! আগুনে জ্বলে গেলুম, জ্বলে গেলুম! ভেতর সব পুড়ে যাচ্ছে, এ দুষ্ট পরীক্ষা ক’রে বড় অত্যাচার করেছি, মাপ করুন, স্বামীজি, এবারকার মত মাপ করুন।”

ত্রৈলোক্য স্বামী তাঁ’র মৌনব্রত ভঙ্গ ক’রে তখন বললেন, “ঠাট্টা করতে এসেছ, বোঝানি ত’ যে, যখন তুমি আমার বিষ খেতে দিলে তখন তোমার জীবন আর আমার জীবন এক সঙ্গে বাঁধা।* দেখ, যদি না আমার এ জ্ঞানটুকু থাকত যে, যেমন সৃষ্টির প্রতি অণুপরমাণুতে ঈশ্বর আছেন, তেমনি আমার উদরের মধ্যেও আছেন, এ চুণগোলা জল ত’ আমার একেবারে সাবাড় ক’রে দিত। এখন ত’ ভগবানের স্বাক্ষরবিচারের সম্বন্ধে তোমার কিছু ধারণা হ’ল, আবার যেন আর কারুর সঙ্গে কোন রকম চালাকি ক’রতে যেও না।”

ত্রৈলোক্য স্বামীর সহৃদয় পদে চৈতন্যোৎপাদন হ’তে লোকটা আন্তে আন্তে চুপি চুপি সরে পড়ল।

এই যে যন্ত্রণাভোগের স্থানপরিবর্তন, কোথায় ত্রৈলোক্য স্বামী চুণগোলা জল খেয়ে জ্বলে পুড়ে মরে যাবেন—না সে জায়গায় যে দুষ্টলোকটা তাঁ’কে খেতে দিয়েছিল সে উল্টে জ্বলেপুড়ে যেতে লাগল, এটা স্বামীজির কোন প্রকার ইচ্ছাপ্রসূত যে তা’ নয়, এ হ’চ্ছে ভগবানের ত্রায়দণ্ড পরিচালনায় অমোঘ বিচার, যা’তে ক’রে সৃষ্টির সুদূরতম গ্রহও পরিচালিত হয়। ত্রৈলোক্য স্বামীর মত যাঁদের আত্মজ্ঞান লাভ হয়েছে, তাঁ’রা ঈশ্বরের বিধি অবিলম্বে কার্যে পরিণত হ’তে দেন। তাঁ’রা তাঁ’দের সাধনপথের প্রতিবন্ধক যে অহংভাব, তা’ বহুদিন আগেই দূর করতে পেরেছেন।

এই যে স্বয়ংক্রিয় ত্রায়ের বিধান, তা’র প্রতিফল কোন ধার দিয়ে আর কি ভাবে যে আসে তা’ কেউ বলতে পারে না, যেমন এই ত্রৈলোক্যস্বামী আর তাঁ’র প্রাণনাশের চেষ্টাকারী সেই দুষ্ট লোকটার বেলা ঘটল, তা’ মানুষের

* “উপলব্ধত বেলাভূমি হ’তে শব্দ তুলিয়া আনি,
ওষ্ঠেতে তা’র কাণ পেতে শোন, কহিছে কিসের কথা,
শোন না কি সেথা—একই কামনা, একই মায়াবারতা,
প্রতিধ্বনিছে সারা সাগরের হিয়ার মন্দ্র-বাণী?
তেমনি সকল মানবজাতির সুপ্ত হৃদয়মাঝে,
গুঞ্জরি ওঠে যে গোপন বাণী, মুঞ্জরিত যে ভাষা;
তোমা ছাড়া আর কিছু নয় সে, তোমারি মনের আশা,
নিখিল জগৎ, সিন্ধু, মানব, সবারই ভিতর রাজে।”—রসেটি

অন্যায় অবিচারের প্রতি আমাদের সত্ত্ব সত্ত্ব ক্রোধের কতকটা উপশম করে বই কি ! যীশুখৃষ্ট বলেছিলেন, “প্রতিহিংসা আমার ; আমিই প্রতিফল দেব” ।* মানুষের ক্ষুদ্র ক্ষমতা আর সামান্য উপায়ের আর প্রয়োজন কিসের ! জগৎসংসারই ঠিক এর হিসেবনিকেশ করে তা’র নিশ্চয় প্রতিফল দেবে । শ্রাস্তমনে, ভগবানের বিচার, প্রেম, সর্বদর্শিতা, অমরত্ব এ সবার সম্ভাবনা কোন কথারই উদয় হয় না । “মনে হয় শাস্ত্রের ও সব ফাঁকা আওয়াজ, অমূল্য কল্পনা ।” এত বড় বিশ্বপ্রকৃতির বিরাট ব্যাপারেও বা’দের মনে কোন ভয়ের সঞ্চার করে না, আর ঐ রকম নেহাৎ অবिवেচকের মতো বা’দের ধারণা তা’দের কাছে ঘটনাপরম্পরা এমন ফল দেখায় যে, তা’তে করেই অবশেষে তা’দের চৈতন্য উৎপাদিত হয় ।

জেরুসালেমে যীশুখৃষ্টের বিজয় অভিযানের সময় ভগবৎবিধির সর্বদর্শিতার বিনয় উল্লিখিত হয়েছে । তাঁ’র শিষ্যবর্গ আর বিরাট জনতা যখন আনন্দে চিৎকার করে বলছিল, “স্বর্গে শান্তি প্রতিষ্ঠিত, ভগবানের মহিমা অপার” কতকগুলি ফারিসী তখন এই অগৌরবের দৃশ্যের প্রতিবাদ করলে । তা’রা আপত্তি করে বললে, “প্রভু, আপনার শিষ্যদের তিরস্কার করুন ।”

যীশুখৃষ্ট উত্তর দিলেন, “তোমাদের বলছি যে শেষে যদি এরা শাস্ত হ’লে চূপ করে, তা’হলে পাথরেরাও তখুনি চিৎকার করে উঠবে ।”

ফারিসীদের প্রতি এইরূপ তিরস্কারে যীশুখৃষ্ট এই দেখাতে চেয়েছিলেন যে ভগবানের বিচার একটা রূপক কল্পনামাত্র নয়, আর শাস্ত সংস্বতাবে লোক, যদি তা’র জিত উপড়েও ফেলা যায়, তা’হলেও সে এই বিশ্ববিদ্যানে মূল, সৃষ্টির আদিশক্তি থেকে সে তা’র বাকশক্তি আর আশ্বর্য্যকার শক্তি ফিরে পাবে, তা’ কেউ রুখতে পারবে না ।

যীশুখৃষ্ট বলতে লাগলেন, “ভগবৎপরায়ণ লোকদের তোমরা চূপ করিয়ে দিতে চাও ? তা’হলে তোমরা ত’ ঈশ্বরের বাণীরও কর্তরোধ করতে পারবে না । বা’র মহিমা, বা’র সর্বব্যাপিত্ব, বৃক্ষলতা, মৃত্তিকা, প্রস্তুত, জলবায়ু, সৃষ্টির প্রতি

* “পৃথিবীটাকে বোধ হয় যেন একটা গণিতশাস্ত্রের সমীকরণ, বা, ‘যে ধারেই ইচ্ছা ফিরাও কেন, নিজের ভারসাম্য বজায় রাখবেই । যত গোপন রহস্যই থাকুক না কেন, তা’ প্রকাশিত হবে । প্রত্যেক পাপের শাস্তি, প্রতিটি পুণ্যকর্মের পুরস্কার আর প্রত্যেক অন্যায়ে প্রতিকার হ’বে—ইহা আর স্থনিশ্চিত ভাবে ।” ইমার্সনের ‘কম্পেন্সেশন’ ।

অপূর্ণমাণু কীৰ্ত্তন ক'রে চলেছে ! তোমরা কি চাও যে স্বর্গের শাস্তি প্রতিষ্ঠার সম্বন্ধে লোকে উৎসব করবে না আর লক্ষ লক্ষ লোক মিলে কেবল তা'রা পৃথিবীতে বুদ্ধ আনার জন্তে চিৎকার করবে ? তা'হ'লে ওহে কারিসীগণ, তোমরা পৃথিবীর ভিত উল্টে ফেলার জন্তে সব ব্যবস্থা কর। কারণ কি জান ? এই সব সাধুস্বভাব লোকেরাই শুধু নয়, তাঁ'র এই জগৎব্যবস্থার নাক্ষত্ররূপ প্রস্তর, মৃত্তিকা, জল, বায়ু, অগ্নি, সবই তোমাদের বিরুদ্ধে দাঁড়াবে।”

ত্রৈলোক্য স্বামীর অসীম রূপা একবার আমার সেজমানার উপর বর্ণিত হয়েছিল। সেজমানা একদিন দেখলেন যে স্বামীজি কাশীর গঙ্গার ঘাটে বসে আছেন, ভক্তেরা চারধারে ঘিরে। তিনি কোন রকমে পাশ কাটিয়ে ত্রৈলোক্যস্বামীর পদপ্রান্তে গিয়ে পড়ে, ভক্তিভরে পাদস্পর্শ ক'রে প্রণাম করলেন ! প্রণাম ক'রে উঠতেই দেখলেন যে, তাঁ'র বহুদিনের এক পুরাতন ব্যাধি একদম সেরে গেছে !*

জানা গেছে যে ত্রৈলোক্য স্বামীর এখন একমাত্র জীবিতা শিষ্যা হ'চ্ছেন শঙ্করীমারীজিউ ! ইনি তাঁ'র একজন শিষ্যের কণ্ঠা, শৈশব হ'তেই স্বামীজির কাছ থেকে শিক্ষা পান ! হিমালয়প্রদেশে বদরীনাথ, কেদারনাথ, অমরনাথ পশুপতিনাথ প্রভৃতি স্থানের বিভিন্ন গুহায় প্রায় চল্লিশ বৎসর অতিবাহিত করেন। ব্রহ্মচারিণী শঙ্করীমারী ১৮২৬ সালে জন্মগ্রহণ করেন। এখন তাঁ'র বয়স ১২৪ বৎসর। আকৃতিতে বার্ককোর বিশেষ কোন লক্ষণ দেখা যায় নি, চুল কাল, দাঁতগুলি বক্বাকৈ পরিষ্কার আর অদম্য শক্তি ও উৎসাহ এখনও তাঁ'র বজায় আছে। এখন তিনি কুস্তমেলা বা এ জাতীয় কোন ধর্মোৎসবের জন্তেই মাঝে মাঝে তাঁ'র নির্জনবাস হ'তে বেরিয়ে আসেন।†

* ত্রৈলোক্য স্বামী এবং অন্যান্য মহাপুরুষগণের জীবনকথায় যৌগুণ্ডের বাণী স্মরণ হয়, “বিশ্বাসীরাই এই সব নিদর্শন দেখতে পাবে : আমার নামে (অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হ'লে) তা'রা নয়তানকে বুর করতে পারবে (অর্থাৎ পাপ হ'তে মুক্ত হ'তে পারবে) : তা'দের মুখে আসবে নূতন বাণী, তা'রা পাপকে (প্রলোভন) জয় করতে পারবে। আর তা'রা যদি কোন কালকূটও পান করে, তা'হ'লেও তা'রা কালকূট তা'দের কিছুই ক্ষতি করতে পারবে না। তা'রা ব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তির উপর হস্তার্পণ করলেই তা'রা আরোগ্য লাভ করবে।

† শঙ্করীমারী জিউ ইনি সম্প্রতি ১৯৫০ সালের ২৮শে ফেব্রুয়ারী তারিখে দেহত্যাগ করেছেন।

শঙ্করী মায়ীজিউ লাহিড়ী মহাশয়ের কাছে প্রায়ই আসতেন। তিনি একবার বলেছিলেন যে, একদিন ব্যারাকপুরে যখন তিনি লাহিড়ী মহাশয়ের কাছে বসেছিলেন, তখন লাহিড়ী মহাশয়ের গুরু বাবাজী মহারাজ নিঃশব্দে ঘরে প্রবেশ ক'রে উভয়ের সঙ্গে কথাবার্তা শুরু করেন।

একবার ত্রৈলোক্য স্বামী তাঁ'র মৌনব্রত পরিত্যাগ ক'রে প্রকাশ্যে লাহিড়ী মহাশয়কে মহাসমাদরে অভ্যর্থনা করলেন। কাশীর তাঁ'র এক শিষ্য এতে দারুণ আপত্তি জানালেন!

তিনি বললেন, “ম'শায়, আপনি সম্যাসী, সংসার ত্যাগ করেছেন, আপনি একজন গৃহীকে এ রকম সম্মান দেখাবেন কেন?”

ত্রৈলোক্য স্বামী উত্তর দিলেন, “বেটা, লাহিড়ী মহাশয় হ'চ্ছেন মায়ের আত্মরে ছেলে, মা তাঁ'কে যেখানে রাখবেন সেখানেই থাকবেন। সাংসারিক লোক হিসাবে কর্তব্যপালন করতে করতে তিনি সেই পূর্ণব্রহ্মজ্ঞান লাভ করেছেন, যা' পাবার জন্যে আমি লেংটিটাও অবধি ত্যাগ ক'রে এসেছি, বুঝলে?”

৩২শ পরিচ্ছেদ

রামের পুনরুজ্জীবন

“তা’রপর ল্যাজারাস্ নামে জনৈক লোক অসুস্থ হয়ে পড়ল যীশু তা’র যখন শুনলেন, তিনি বললেন যে এ অসুখে মৃত্যু হবে না, ভগবানের মহিমা প্রকাশের জন্তেই এ অসুখ, যা’তে ক’রে ঈশ্বরের পুত্রও মহিমায়িত হয়ে উঠবেন।”

শ্রীরামপুর আশ্রমের বারান্দায় ব’সে এক রৌদ্রকিরণোজ্জ্বল প্রভাতে শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজি খ্রীষ্টিয় ধর্মশাস্ত্র ব্যাখ্যা করছিলেন। গুরুদেব ছাড়া আরও জনকতক শিষ্য সেখানে ছিলেন, আগিও রাঁচির জনকতক ছাত্রকে নিয়ে সেখানে উপস্থিত ছিলুম।

গুরুদেব ব্যাখ্যা করলেন, “এই কথাগুলোতে যীশু নিজেকে ঈশ্বরের পুত্র বলে অভিহিত করলেন। যদিও তিনি আসলে ঈশ্বরের সহিত একাত্মীভূত, তবুও এখানে এইরূপ উল্লেখে তাঁ’র একটা গভীর নৈর্ব্যক্তিক উদ্দেশ্য আছে। ঈশ্বরের পুত্র হচ্ছেন যীশুখৃষ্ট বা মানুষের ভিতরের ব্রহ্মজ্ঞান। মরুভূমির কেউ ঈশ্বরের মহিমা প্রদর্শন করতে পারে না। মানুষ তাঁ’র স্রষ্টাকে সম্মান প্রদর্শন করতে পারে তাঁ’কে অনুসন্ধানের দ্বারা; মানুষ কি কোন নিরুপাধিক সত্তাকে মহিমায়িত করতে পারে যা’ সে কিছুমাত্র জানে না? সাধুসন্তদিগের মস্তকোপরি যে ‘জ্যোতির্মণ্ডল’ অর্থাৎ ছটা, তা’ হচ্ছে ঈশ্বরের প্রতি ভক্তিপ্রদর্শনের ক্ষমতার নিদর্শন।

ল্যাজারাসের পুনরুজ্জীবনের অত্যাম্ভ্য গল্প শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজি পড়ে যেতে লাগলেন। শেষ হ’লে গুরুদেব গভীর নিশ্চিন্ততার মধ্যে মগ্ন হয়ে গেলেন, হাঁটুর উপর সেই পবিত্র ধর্মশাস্ত্র খোলাই পড়ে রইল।

গুরুদেব অবশেষে গভীর উচ্ছ্বাসের সঙ্গে বলতে লাগলেন, “আমারও ঐ রকম একটি অলৌকিক ব্যাপার দর্শনের সুযোগ ঘটেছিল। লাহিড়ী মহাশয়ই আমার একটি বন্ধুকে মৃতাবস্থা থেকে পুনরুজ্জীবিত করেন।”

শোনবার গভীর আগ্রহে ছেলেদের মুখে হাসি দেখা দিলে। আমিও উৎসাহিত হ'য়ে উঠলুম, কারণ শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজির কাছে শুধু দার্শনিক আলোচনা নয়, বিশেষ ক'রে তাঁর গুরুদেবের যে কোন অলৌকিক ঘটনার বিবরণ শোনবার মত আমার মধ্যেও যথেষ্ট বালকহুলভ গভীর উৎসাহ আর আগ্রহও বর্তমান ছিল।

গুরুজি শুরু করলেন, “রাম আর আমি ছিলাম অভিন্নহৃদয় বন্ধু। লাজুক আর লোকজন তেমন পছন্দ করে না ব'লে, রাম গভীররাত্রে আর ভোরবেলায় আমাদের গুরু লাহিড়ী মহাশয়কে দর্শন করতে আসত। সে সময় দিনের বেলাকার লোকেদের আর ভিড় থাকত না। রামের অন্তরঙ্গ বন্ধু হিসেবে আমিই ছিলাম তাঁর অধ্যাপনদ্বার, যাঁর মধ্য দিয়ে তাঁর আধ্যাত্মিক অনুভূতির ঐশ্বর্যের বিষয় সব প্রকাশ পেত। তাঁর আদর্শ সাহচর্যে আমারও প্রেরণা আসত।” কথাগুলি স্বরণ ক'রে গুরুদেবের আনন মধুরস্বত্বিতে উজ্জল হ'য়ে উঠল।

গুরুজি বলতে লাগলেন, “রামের এক দারুণ পরীক্ষা এল। এসিয়াটিক কলেরায় তাঁকে ধরলে। গুরুতর অসুখের সময় গুরুদেব অবশ্য ডাক্তার ডাকা বারণ করতেন না, কাষেই দু'জন বিশেষজ্ঞকে ডাকা হ'ল। চিকিৎসা খুব জোর চলতে লাগল বটে কিন্তু আমিও এখানে লাহিড়ী মহাশয়ের কাছে গভীরভাবে প্রার্থনা করতে লাগলুম। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর বাড়ীতে গিয়ে পড়ে চোখের জলে ভেসে ব্যাপারটা তাঁকে জানালুম। কিন্তু গুরুদেব আমার বেশ স্ফুর্তির সঙ্গে হেসে বললেন, ‘ডাক্তারেরা ত’ রামকে দেখছে। সে ভাল হ'বে বই কি।’

“গুনে মনটা একটু হাল্কা হ'ল। বন্ধুর বাড়ী ফিরলুম, গিয়ে দেখি অবস্থা খুবই খারাপ—মরণ শিয়রে।

“হতাশাকরুণ স্বরে একজন ডাক্তার বললেন, ‘আর ঘণ্টাখানেক কি বড় জোর দু'ঘণ্টা!’ আবার দৌড়লুম লাহিড়ী মহাশয়ের কাছে।

“‘ডাক্তারেরা ত’ বিবেচক লোক, তাঁরা ঠিক চিকিৎসাই করছেন। রাম নিশ্চয়ই ভাল হ'য়ে যাবে দেখো!’ ব'লেই আমাকে প্রফুল্লভাবে বিদায় দিলেন।

“রামের বাড়ীতে এসে দেখলুম যে, ডাক্তার দু'জনেই স'রে পড়েছেন।

একজন আবার একছত্র লিখেও রেখে গেছেন, ‘আমাদের যা’ করবার সবই করেছি, কিন্তু এর আর কোনো আশা নাই।’

“বন্ধুর চেহারা দেখে বোধ হ’ল যে, সত্যিই মরণ ঘনিষে আসছে। আমি কিন্তু বুঝতে পারলুম না লাহিড়ী মহাশয়ের কথা কেমন ক’রে সত্য না হয়, অথচ রাম অতিদ্রুত মরণের দিকে এগিয়ে চলেছে দেখে মনে হ’তে লাগল যে ‘এবার সব শেষ’। একবার বিশ্বাস আবার পরক্ষণেই ভীতিমূলক সন্দেহের দোলায় দোহুল্যমান হ’য়ে বন্ধুর যতটা পারা যায় সে সময় ত’ তা’ সব ক’রলুম। একটু ঘোর কেটে যেতেই সে টেঁচিয়ে ব’লে উঠল, ‘যুক্তেশ্বর, গুরুদেবের কাছে দৌড়ে যাও, ব’ল গিয়ে যে আমি মরলুম। আর বোলো যে, আমার শেষ কাষের আগে যেন তিনি আমার দেহকে আশীর্বাদ করেন।’ এই কথা গুলি ব’লে একটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে রাম মরণের কোলে চ’লে পড়ল। *

“তা’র অতিপরিচিত প্রিয় দেহের কাছে বসে ত’ ঘণ্টাখানিক ধ’রে ধূব খানিকটা কাঁদলুম। নীরবতার চির উপাসক—এখন সে মৃত্যুর গভীর নিস্তর্রতার মধ্যে মগ্ন। আর একজন শিষ্য সেখানে এল। তা’কে যতক্ষণ না ফিরি বাড়ীতে থাকতে ব’লে উদ্ভ্রান্ত চিত্তে, শ্রান্তক্লান্তপদে চললুম গুরুর বাড়ী।

“লাহিড়ী মহাশয় একগাল হেসে বললেন, ‘রাম এখন কেমন আছে গো?’ আর সামলাতে না পেরে একেবারে সোজাসুজি মুখের উপর ব’লে দিলুম, ‘ব’শায়, শীগ্গিরিই দেখতে পাবেন সে কেমন আছে। ঘণ্টাকতক বাদেই দেখবেন তা’কে শ্মশানে নিয়ে যাওয়া হ’চ্ছে।’ আর স্থির থাকতে পারলুম না, একেবারে প্রবল ক্রন্দনে ভেঙ্গে পড়লুম।

“‘যুক্তেশ্বর, যুক্তেশ্বর, ধৈর্য্য ধর, একটু ঠাণ্ডা হও। এখন শাস্ত হয়ে ব’সে একটু ধ্যান কর ত’ দেখি।’ ব’লে গুরুদেব সমাধিতে মগ্ন হ’লেন। সেদিনকার বৈকাল আর রাত এক অথও নীরবতার মধ্য দিয়েই কাটল। মনকে শাস্ত করবার জন্তে বৃথাই চেষ্টা করলুম।

“ভোরের দিকে লাহিড়ী মহাশয় আমার দিকে আশ্বাসহচক দৃষ্টিতে চেয়ে বললেন, ‘এঃ, দেখছি যে তোমার মন এখনও শাস্ত হয় নি। আরে

* কলেরা রোগীর শেষ পর্য্যন্ত পরিপূর্ণ জ্ঞান বর্তমান থাকে।

কালকে তুমি আমার কেন বললে না যে, ওষুটবুধ গোছের একটা প্রত্যক্ষ কিছু সাহায্য চাই, এ'্যা ?' তা'রপর রেড়ির তেলের পিঁদীমটা দেখিয়ে দিয়ে বললেন, 'একটা ছোট শিশিতে ঐ পিঁদীমটা থেকে খানিকটা তেল ঢেলে নিয়ে রামের মুখে সাতটা ফোঁটা ঢেলে দাওগে, বুঝলে ?'

“আমি ত' একেবারে ঝঙ্কার দিয়ে চোঁচিয়ে উঠলুম, 'ম'শায়, সে লোকটা কাল দুপুরবেলা মারা গেছে আর আপনি কি না ব'লছেন যে মুখে তেল ঢেলে দাও—এখন আর তেলের কি দরকার ব'লুন ?’

“'কুছ পরোয়া নেহি, যা' ব'লি তা'ই ক'র দেখি', লাহিড়ী মহাশয়ের ক্ষুভিত কারণ ত' কিছু বোধগম্য হ'ল না। শোকের দারুণ যন্ত্রণা তখনও আমার উপশমিত হয় নি। যাক্, কি আর করা যায়, খানিকটা তেল ত' ঢেলে নিয়ে রামের বাড়ীর দিকে এগোলুম।

“গিয়ে দেখি রামের শব কঠিন, হিমশীতল। তা'র এ বীভৎস অবস্থার দিকে দৃকপাত না ক'রে ডান হাতের আঙুল দিয়ে ঠোঁট দুটো ফাঁক ক'রে, বাঁ হাত আর ছিপি দিয়ে তা'র দাঁতলাগা মুখের উপর ফোঁটা ফোঁটা ক'রে সেই তেল ফেলতে লাগলুম।

“এক, দুই, তিন, ... চার, পাঁচ, ... ছয় ... সাত, যেমনি সপ্তম ফোঁটাটি তা'র মরণ-নীল হিমশীতল ওষ্ঠাধর স্পর্শ ক'রলে, অমনি রামের দেহ ভীষণভাবে থর থর ক'রে কেঁপে উঠল। ধড়মড় ক'রে উঠে ব'সে রাম আশ্চর্য হ'য়ে চারিদিক তাকিয়ে দেখতে লাগল। পা থেকে মাথা পর্যন্ত তা'র দেহের মাংসপেশীগুলো সব সবেগে স্পন্দিত হচ্ছে!

“বেশ পরিষ্কার গলায় সে বললে, 'লাহিড়ী মহাশয়কে দেখলুম এক অতি উজ্জ্বল জ্যোতির্ম্মণ্ডলের মাঝখানে, যেন সূর্য্যের মতন জ্বলছেন। তিনি আমার আদেশ করলেন, 'ওঠ ওঠ, ঘুম ছেড়ে উঠে পড় আর যুক্তেশ্বরকে সঙ্গে করে নিয়ে আমার কাছে দেখা করতে এস!'”

“ব'লে ত' রাম বেশ ঝেড়েঝুড়ে উঠে পড়ে, জামাকাপড় প'রে আমার সঙ্গে চলল গুরুদর্শনের জন্তে। এই রকম সাংঘাতিক রোগের পর যে হাঁটবার মত বলই বা পেলে কি ক'রে আর বেশ দিব্যি সপ্রতিভভাবে গুরুদর্শনেই বা চলল কেমন ক'রে তা' দেখে শুনে ত' বুদ্ধি আমার লোপ পাবার উপক্রম। অথচ চোখের সামনে যা' দেখছি তা' সবই সত্যি আবার এ ধারে

চোখকেও বিশ্বাস করি কেমন ক'রে. ভেবে চিন্তে মাথা গেল একদম গুলিয়ে।
রাম সোজাসুজি গুরুর কাছে পৌছে তাঁ'র চরণে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করলে—
চক্ষে তা'র কৃতজ্ঞতার আনন্দাশ্রুধারা!

“গুরুদেব উল্লাসে একেবারে আত্মহারা। আমার দিকে চোখ মিট মিট
ক'রে একটু দুষ্টামির হাসি হেসে বললেন, ‘বুদ্ধেশ্বর, এবার থেকে তুমি নিশ্চয়ই
একটি রেড়ির তেলের শিশি সঙ্গে রাখতে ভুলবে না, কি বল? যখনই
কোন মৃতদেহ দেখবে, তখনই তা'র মুখে এই রেড়ির তেলের গোটাকতক
কোঁটা ফেলে দিও আর কি! আরে এ রেড়ির তেলের সাতটি কোঁটা
তোমার বনকেও নিশ্চয় হার মানাবে, তা' দেখে নিও।”

“গুরুজি, আমায় আর ঠাট্টা করবেন না। ব্যাপারটা যে কি, তা' এ
পর্যন্ত ত' আদৌ বুঝে উঠতে পারলুম না; কোথায় আমার ভুল হয়েছে
বলুন দেখি?”

“লাহিড়ী মহাশয় বোঝাতে লাগলেন, ‘দেখ, হু' ছবার আমি তোমায় বললুম
যে রাম ভাল হয়ে উঠবে, তবুও তোমার আমায় সম্পূর্ণ বিশ্বাস হ'ল না।
অবিশিষ্ট এ কথা আমি বলিনি যে ডাক্তারেরাই ওকে ভাল ক'রে তুলবে। আমি
শুধু এই কথাটি বলতে চেয়েছিলুম যে তা'রা কাছে রয়েছে তবে আর ভাবনা
কি! আমার দুটো কথার মধ্যে ত' কোন কার্যকারণ সম্বন্ধ নেই।
ডাক্তারদের কাছে আমি হস্তক্ষেপ করতে চাই নি; তা'দেরও রোজগারপাতি
ক'রে বাঁচতে হ'বে ত'!’ তা'রপর আনন্দোচ্ছ্বাসিত কলকণ্ঠে তিনি ব'লে
উঠলেন, ‘সর্বদা মনে রেখো সেই অক্ষর, অদ্বয় পরমাত্মাই যে কোন লোককে
স্বাৰাম ক'রে তুলতে পারেন, ডাক্তার থাকুক আর নাই থাকুক।’

“অত্যন্ত অল্পতপ্ত চিন্তেই স্বীকার করলুম, ‘এখন আমার ভুল বুঝতে
পেরেছি। এখন আমি জানলুম যে আপনার সামান্য দুটি কথায় সংসার
যবধি উন্টে যেতে পারে।”

শ্রীবুদ্ধেশ্বর গিরিজি এই অপূৰ্ণ রোমাঞ্চকর কাহিনী শেষ ক'রতেই স্তম্ভিত
শ্রোতৃবর্গের মধ্য থেকে একটি ছোট ছেলে প্রশ্ন ক'রে বসল—যা'র দুটো মানে
হয়, “বশায় আপনার গুরু রেড়ির তেল খেতে দিলেন কেন?”

“বাছা, তেল দেওয়ার কোন মানেই হয় না—কেবল এইটুকুমাত্র ছাড়া যে
আমি প্রত্যক্ষ একটা কিছু চাই। তা'ই লাহিড়ী মহাশয় হাতের কাছে তেল

পেয়ে তাই দিলেন, আমার বিশ্বাস অধিকতর জাগ্রত করবার একটা নূর প্রতীক ব'লে আর কি। গুরুদেব রামকে মরে যেতে দিলেন, কেন জান, আমি খানিকটা সন্দেহ করেছিলুম ব'লে। কিন্তু আমার সাক্ষাৎ ভগবান গুরু জানতেন যে, যেহেতু তিনি বলেছেন যে শিষ্যটি ভাল হ'বে, তা'কে আরাম হ'তেই হবে—এমন কি মরণের মুখ থেকে বাঁচিয়েও,—যা' সাধারণতঃ একেবারে চরম ব্যাধি।”

তা'রপর শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজি ছোট দলটিকে বিদায় দিয়ে আমাকে তাঁ'র পায়ের কাছে একটি কম্বল আসনে ব'সতে ইঙ্গিত ক'রলেন।

অস্বাভাবিক গান্ধীর্ষ্যের সঙ্গে তিনি ব'লতে লাগলেন, “যোগানন্দ, তোমার ত' লাহিড়ী মহাশয়ের সাক্ষাৎ শিষ্যেরা ছেলেবেলা থেকেই ঘিরে আছেন। আমাদের মহাগুরু তাঁ'র মহিমময় জীবন আংশিক নির্জ্ঞনতার মধ্যেই কাটিয়েছেন আর তাঁ'র অনুচরবর্গদের তাঁ'র শিক্ষা নিয়ে কোন প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে বরাবরই অস্বীকার ক'রে এসেছেন। যা'ই হোক তিনি একটি অর্থপূর্ণ ভবিষ্যদ্বাণী ক'রে গেছেন, বন্দি শোন।”

“তিনি বলেছিলেন, ‘আমার দেহত্যাগের পঞ্চাশবৎসর পরে আমার জীবন কথা লিখিত হবে, কারণ প্রতীচ্যে যোগ সম্বন্ধে তখন একটা গভীর আশ্রয় দেখা দেবে; এই যোগের বার্তা সে সময় সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়বে আর মানবজাতি যে এক পিতার সন্তান তা'র প্রত্যক্ষ অনুভূতি থেকে তা' বিশ্বভ্রাতৃত্ব গড়ে তুলতে খুব সাহায্য করবে।’

শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজি বন্দিতে লাগলেন, “বৎস যোগানন্দ, যোগের বার্তা প্রচার করতে আর তাঁ'র পবিত্র জীবনকথা লিপিবদ্ধ করতে তুমি অবশ্যই তোমার সাধ্যমত চেষ্টা করবে।”

লাহিড়ী মহাশয়ের ১৮৯৫ সালের তিরোভাবের তারিখ হতে ৫০ বৎসর পূর্ণ হয় ১৯৪৫ সালে, এই বছরেই বর্তমান পুস্তক রচনার পরিসমাপ্তি হয়। আর এই ১৯৪৫ সালেই বিপ্লবকারী আণবিক শক্তির যুগ আরম্ভের যোগাযোগ দেখে আমি বিশ্বয়ে অবাক হয়ে যাই! চিন্তাশীল মনীষীরা শান্তি ও বিশ্বভ্রাতৃত্বের সমস্যা সত্ত্ব সমাধানের জন্ত আগের চেয়ে এখন সব চেয়ে বেশী মনঃসংযোগ করছেন, পাছে অবিরত জড়শক্তিপ্রয়োগে এই সব সমগ্রসমাধানের সঙ্গে মানুষের অবস্থারও একেবারে চরম সমাধান হ'য়ে যায়!

যদিও মানবজাতি আর তা'দের কার্যকলাপ সময়ের প্রভাবে অথবা বোমার প্রসাদে নিশ্চিহ্ন হয়ে উড়ে যায় তা'হ'লেও স্বর্ঘ্যোব তাঁ'র পথ ছেড়ে কখনও বিপথে বা'ন না; গ্রহনক্ষত্র ত' যে যা'র স্থানে ব'সে ঠিক নিয়মিত পাহারা দিয়ে যাচ্ছে। প্রাকৃতিক নিয়ম ত' কখনও স্থগিত বা পরিবর্তিত হয় না, তাই মানুষ এদের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে চললে ভালই করবে। যদি বিশ্বপ্রকৃতি শক্তি-প্রদর্শনের বিরোধী হয়, স্বর্ঘ্য যদি গ্রহনক্ষত্রের সঙ্গে লড়াই না ক'রে তা'দের ক্ষুদ্র অধিকারটুকু ছেড়ে দিয়ে নির্দিষ্ট সময়ে অন্ত যায়, তবে আর আমাদের মুষ্টি-আফালনের প্রয়োজন কি? সত্যিই কি কোন শাস্তি আসবে এ থেকে? কাটাকাটি হানাহানি নয়, সদিচ্ছা আর প্রেমের শক্তিতেই বিশ্বপ্রকৃতির স্নায়ু শক্তিমান; পরিপূর্ণ শান্তিতেই মানবজাতি জানতে পারবে বিজয়লাভের অনন্ত ফল আর তা' শোণিতসিক্ত মৃত্তিকাজাত বৃক্ষ হ'তে উৎপন্ন ফলের চেয়ে ঢের ঢের বেশী সুমধুর।

এই এতবড় নামজাদা লীগ অফ্ নেশন্স, তা' তখন একটা অত্যন্ত সহজ আর স্বাভাবিক, নামহীন, মানবহৃদয়ের মিলনক্ষেত্র হ'য়ে দাঁড়াবে। পৃথিবীর দুঃখনিবারণের জন্ত উদার সহানুভূতি আর হৃদয় অন্তর্দৃষ্টি, মানুষের বৈচিত্র্য আর ভেদবুদ্ধির কেবলমাত্র একটা খুব বিস্তৃত বিশ্লেষণ আর বিচার থেকে পাওয়া যাবে না, একমাত্র তা' পাওয়া যাবে তা'দের মধ্যকার গভীর ঐক্যবন্ধনের ভিতর থেকে—ভগবানের সঙ্গে তা'র আত্মীয়তার মধ্য থেকে। পৃথিবীর চরমআদর্শ উপলব্ধির পথে—বিশ্বভ্রাতৃত্বের মধ্য দিয়ে পৃথিবীতে শান্তি-প্রতিষ্ঠা—ঈশ্বরের সহিত ব্যক্তিগত সংযোগস্থাপনের বিজ্ঞান এই যোগই যেন সকল দেশে সকল লোকের ভিতরই সময়ে প্রতিষ্ঠা লাভ করে।*

* হুথিয়াত ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার, চার্ল'স পি, ষ্টাইনমেংজ্কে রজার ডব্লিউ ব্যাবসন্ একবার জিজ্ঞাসা করেছিলেন, “আগামী পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে কিসের গবেষণায় সর্বোচ্চ পরিণতির হুচনা হবে?” ষ্টাইনমেংজ্ উত্তর দিলেন, “আমার মনে হয় আধ্যাত্মিক পথেই সর্বশ্রেষ্ঠ পরিণতি লাভ হবে। ইতিহাস সুস্পষ্টরূপে শিক্ষা দেয় যে এখানে এমন একটি শক্তি আছে যা' মানবজাতির পূর্ণ অভিব্যক্তির হবে সর্বশ্রেষ্ঠ শক্তি! তবুও আমরা যেন এর সঙ্গে ছেলেখেলা করেই চলেছি, কারণ জড়শক্তি সম্বন্ধে যেমন আমরা করেছি তেমনি গুরুতরভাবে এর আলোচনা বা চর্চা কখনও করি নি। কেদিন না একদিন লোকেরা বুঝতে পারবে যে পাখি কোন বস্তু হুথ এনে দেয় না আর তা' নদীরকে হুজনক্ষম আর শক্তিশালী ক'রে তুলতে একেবারেই অক্ষম। তখন এ পৃথিবীর বৈজ্ঞানিক-বলী তাঁ'দের পরীক্ষাগারে ঈশ্বর, প্রার্থনা আর আধ্যাত্মিকশক্তি সম্বন্ধে গবেষণাকার্য্য শুরু ক'রে দেবে, যা'র সামান্যমাত্র হুচনা এখনও পর্যন্ত হয় নি বললেই চলে। সে দিন যখন আসবে, পৃথিবীতে এক যুগের মধ্যে যতটা উন্নতি দেখা দেবে, তা' গত চার যুগের মধ্যেও তা' দেখা যায় নি।”

যদিও ভারতবর্ষের সভ্যতা যে কোন জাতির চেয়ে পুরাতন, তা'হলেও অতি অল্প ঐতিহাসিকেরাই খবর রাখেন যে তা'র জাতি হিসাবে বেঁচে থাকার কৃতিত্ব কোন দিক দিয়েই একটা আকস্মিক ঘটনা নয়, তা'র কারণ ভারতবর্ষ যুগে যুগে তা'র শ্রেষ্ঠ সন্তানদের হাত দিয়ে সেই অনন্ত সত্যকে যে ভক্তি অর্থাৎ প্রদান ক'রে এসেছে তা'রই এ একটা ত্রায়সঙ্গত পরিণতি। শুধু বাঁচার জন্তেই বেঁচে থাকা, যুগে যুগে কস্মীণীনতার পরিচয়ে—তা'তে কোন ক্লাস্ত পরিশ্রাস্ত গবেষক কি আমাদের সত্যিই বলতে পারেন তা' কতগুলি? কালের দ্বন্দ্ববুদ্ধির আবহানে যে কোন জাতির চেয়ে ভারতবর্ষই তা'র যোগ্যতম উত্তর প্রদান করেছে।

বাইবেলের গল্পে এব্রাহাম যে ভগবানের কাছে আবেদন জানিয়েছিল যে যদি দশটি সদাচারপরায়ণ লোক পাওয়া যায় তা'হ'লে সোডম নগরী যেন ধ্বংসের হাত থেকে অব্যাহতি পায়, তা'তে দৈববাণী হয়েছিল যে, “আজ আমি ঐ রকম দশটি লোকের জন্তেই এ আর ধ্বংস ক'রব না,” এতে ভারতবর্ষ যে বিশ্বজিতির গর্ভে বিলুপ্ত হ'বার হাত এড়িয়ে বেঁচে গেছে—যে বিশ্বজিতির ভিতরে আজ ব্যাবিলন, মিশর, আর অগ্ন্যগ্ন মহাপরাক্রমশালী জাতিসমূহ, যা'রা এক সময়ে ভারতবর্ষেরই সমসাময়িক ছিল, তা'রা একে-বারেই বিলুপ্ত হ'য়ে গেছে—এতে ভারতবর্ষের সম্পূর্ণ বিলুপ্তির হাত হতে এড়িয়ে যাবার ব্যাপারে একটা নতুন অর্থ প্রদান করে। ভগবানের উত্তরে স্পষ্ট বোঝা যায় যে, কোন স্থানের অস্তিত্ব বজায় থাকে—তা'র জড় উন্নতিতে নয়, তা'র অতিমানবদের কৃতিত্বেরই বলে।

আজকের এই বিংশশতাব্দী অর্দ্ধাংশ অতীত হ'বার পূর্বেই দুইটি মহাযুদ্ধের রক্তধারায় রঞ্জিত হয়েছে। আজ যেন আবার সেখানে ঈশ্বরের সেই বাণীই শোনা যায় যে, যে জাতির মধ্যে অন্ততঃ দশজনও প্রকৃত ধর্মপরায়ণ ব্যক্তি খুঁজে পাওয়া যায়—যা'রা সেই অমোঘ জ্ঞানের বিচারকের চক্ষে শ্রেষ্ঠ, যে জাতি কখনও ধ্বংসের পথে এগোতে পারে না। এই উপদেশ অমূল্য ক'রে ভারতবর্ষ প্রমাণ করেছে যে, মহাকালের সহস্র চাতুরীর মাঝখানেও সে তা'র বুদ্ধি হারায় নি—বরাবরই মাথা ঠিক রেখে এসেছে। প্রতি শতাব্দীতেই সিদ্ধগুরুগণ তা'র মৃত্তিকা পবিত্র ক'রে এসেছেন; আধুনিক

খ্রীষ্টসম ঋষিগণ লাহিড়ী মহাশয় বা তাঁ'র শিষ্য শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজি আজ এ কথা ঘোষণা করতে দণ্ডায়মান হয়েছেন যে, মাহুঘের সাংসারিক স্বথস্বাচ্ছন্দ্য আর জাতির আয়ুবুদ্ধির জন্ত জড়োন্নতির চেয়ে যোগবিজ্ঞানই একান্ত প্রয়োজন।

লাহিড়ী মহাশয়ের জীবন আর তাঁ'র সার্বজনীন মতবাদ সম্বন্ধে অতি অল্প সংবাদই ছাপার অক্ষরে পাওয়া যায়। ভারতবর্ষ, আমেরিকা আর ইউরোপে প্রায় ত্রিশ বৎসর ধ'রে আমি দেখে এসেছি যে মুক্তিপ্রদায়ক তাঁ'র যোগের বাণী সম্বন্ধে লোকেদের কি গভীর আর আস্তরিক আগ্রহ। এখন প্রতীচীতে যেখানে আধুনিক শ্রেষ্ঠযোগীদের সম্বন্ধে লোকে অল্পই জানে—সেখানে, তিনি যেমন ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন—ঠিক সেই রকম মহাযোগীর একটি লিখিত বিবরণীর একান্ত আবশ্যক।

সেই মহাপুরুষের জীবন সম্বন্ধে ইংরেজিতে দু' একটা ক্ষুদ্র পুস্তিকা ছাড়া আর কিছুই লেখা হয় নি। ১৯৪১ সালে “শ্রীশ্রীশ্যামাচরণ লাহিড়ী মহাশয়” * নামে বাংলায় একটি ক্ষুদ্র জীবনী বার হয়। বইটি আমার শিষ্য স্বামী সত্যানন্দের লেখা, বহু বৎসর ধ'রে সে আমাদের রাঁচি বিদ্যালয়ের আচার্য্য। আমি তা'র বই থেকে কিছু অনুবাদ ক'রে লাহিড়ী মহাশয়ের এই অধ্যায়ে সংযোজিত ক'রে দিয়েছি।

১৮২৮ সালের ৩০শে সেপ্টেম্বর তারিখে লাহিড়ী মহাশয় এক ধর্ম্মনিষ্ঠ প্রাচীন ব্রাহ্মণবংশে জন্মগ্রহণ করেন। নদীয়া জেলার ব্রহ্মনগরের কাছে ষুর্গিনামক গ্রামে তাঁ'র জন্ম হয়। পিতা পূজ্যপাদ গৌরমোহন লাহিড়ী আর লাহিড়ী মহাশয় হচ্ছেন তাঁ'র দ্বিতীয়া স্ত্রী যুক্তকেশীর গর্ভজাত কনিষ্ঠ সন্তান (গৌরমোহন লাহিড়ী মহাশয়ের প্রথমা স্ত্রী তিনটি সন্তান জন্মগ্রহণ করার পর তীর্থ ভ্রমণকালে পরলোক গমন করেন)। তাঁ'র অতি শৈশবেই নানাবিযোগ ঘটে; আর তাঁ'র মাতাঠাকুরাণী একমাত্র মহাযোগেশ্বর শিবের † ভক্ত উপাসক ছিলেন, এ ছাড়া আর বেশী কিছু তাঁ'র সম্বন্ধে জানা যায় না।

* শ্রীযুগধর্ম্ম প্রচারক—মহাপুরুষগণের নামের পূর্বে দুই বা ততোধিক সংখ্যায় ব্যবহৃত হয়।

† জিম্বুতি—ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বরের এক মূর্তি, ব্রহ্মাণ্ডে যথাক্রমে এ'রা সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়ের কর্তা। শাস্ত্রে মহাযোগীস্বরূপে বর্ণিত শিব, ভক্তসম্মুখে স্বপ্নে বিভিন্নরূপে আবির্ভূত হ'ন—কখনও জটাভূষণী মহাযোগী কখনও বা নটরাজরূপে।

বালকের পিতৃদত্ত নাম শ্যামাচরণ, নদীয়াতে তাঁ'দের পৈতৃক বাসস্থানে তাঁ'র শৈশব অতিবাহিত করেন। বয়স যখন তাঁ'র তিন কি চার, তখন তাঁ'কে প্রায়ই দেখা যেত যে বালির তলায় যোগাসনে বসে আছেন, শরীরটি বালির মধ্যে সম্পূর্ণ বিলুপ্ত, কেবল মাথাটি বা'র করা আছে।

১৮৩৩ সালে লাহিড়ীদের সম্পত্তি সব বিনষ্ট হয়ে যায় যখন নিকটবর্তী জলঙ্গী নদী তা'র গতি পরিবর্তন ক'রে গঙ্গার সঙ্গে মিলিত হয়। বাড়ীর ভিটার সঙ্গে লাহিড়ীদের প্রতিষ্ঠিত একটি শিবমন্দিরও গঙ্গাগর্ভে প্রবেশ করে। জ্ঞানৈক ভক্ত শিবলিঙ্গটি ঘূর্ণায়মান জলস্রোত থেকে উদ্ধার ক'রে একটি নূতন মন্দিরে সেটিকে স্থাপন করেন, এখন তা' ঘূর্ণি শিবালয় ব'লে সুপরিচিত।

গৌরমোহন লাহিড়ী মহাশয় পরিবারবর্গসহ নদীয়া পরিত্যাগ ক'রে বারাগসীর অধিবাসী হ'ন। সেখানেও তিনি একটি শিবমন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। সেখানে তিনি বৈদিক নিষ্ঠার সঙ্গে সংসারধর্ম পালন করতেন ঠিক নিয়মিত পূজা অর্চনা, দানদান, শাস্ত্রপাঠ ইত্যাদি ক'রে। ছাত্রপরায়ণ ও উদারহৃদয় ব'লে, তিনি আধুনিক মতেরও প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করতেন না।

বালক শ্যামাচরণ কাশীর পাঠাগারে হিন্দী * ও উর্দুতেও পাঠ গ্রহণ করেছিলেন। জয়নারায়ণ ঘোষাল পরিচালিত বিদ্যালয়ে তিনি সংস্কৃত, বাংলা, ফ্রেঞ্চ ও ইংরেজিরও শিক্ষা গ্রহণ করেন। বেদাধ্যয়নে গভীর অধ্যবসায় নিয়োজিত ক'রে বালকযোগী শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণদের শাস্ত্রবিচার আগ্রহসহকারে শুনতেন। তাঁ'দের মধ্যে তখন নাগভট্ট নামে একজন মহারাষ্ট্র পণ্ডিত ছিলেন।

শ্যামাচরণ শান্ত, দয়ালু আর সাহসী যুবক ছিলেন। তাঁ'র সঙ্গীরা সকলেই তাঁ'কে ভালবাসত। স্বাস্থ্যজ্ঞান, সুসমজ্ঞস, বলিষ্ঠ দেহ ছিল তাঁ'র। সম্ভরণে আর হস্তসাধিতকৌশলেও তিনি অপূর্ব পারদর্শিতা প্রদর্শন করতে পারতেন।

* হিন্দী স্বাধীনভারতে রাষ্ট্রভাষারূপে পরিগণিত। হিন্দী আৰ্য-ভারতীয় ভাষা, প্রধানতঃ সংস্কৃত ধাতু থেকে এর উৎপত্তি। উত্তরভারতে এর প্রচলন খুব বেশী। পশ্চিমা হিন্দীর প্রধান কথ্যভাষা হিন্দুস্থানী, দেবনাগরী আর আরবী অক্ষরে লিখিত হয়। উর্দু ভাষা মুসলমানগণ কর্তৃক ব্যবহৃত হয়।

১৮৪৬ সালে শ্রীদেবনারায়ণ বোম্বালের কন্যা শ্রীমতী কাশীমণি দেবীকে তিনি বিবাহ করেন। কাশীমণি দেবী ছিলেন আদর্শ স্ত্রী—অতিথি আর দরিদ্র-নারায়ণের সেবা ক'রে তিনি সব সাংসারিক কর্তব্যসকল হাসিমুখে সম্পন্ন করতেন। বিবাহের ফলে তাঁ'দের তিনকড়ি আর দুকড়ি নামে দুটি সাধুপ্রকৃতি পুত্রলাভ হয়েছিল।

১৮৫১ সালে, তেইশ বৎসর বয়সে, লাহিড়ী মহাশয় ইংরেজ গভর্ণমেন্টের মিলিটারি ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্ট্মেন্টে একাউন্ট্যান্টের পদগ্রহণ করেন। কার্যকালে তাঁ'র বহু পদোন্নতি সাধিত হয়। এইরূপে ভগবানের কাছে তিনি যে একজন মহাযোগী ব'লেই প্রতিভাত হয়েছিলেন শুধু তা'ই নয়, এ সংসারে মানবজীবন নাট্যাভিনয়ে তাঁ'কে প্রদত্ত অফিসকর্মচারীর অংশ অভিনয়েও তিনি রত্নকার্য্য হয়েছিলেন।

সমরবিভাগের অফিস স্থানান্তরিত হওয়ার সময় লাহিড়ী মহাশয়কে গাজিপুর, মিরজাপুর, দানাপুর, নৈনিতাল, কাশী ও অগ্নাত্ম স্থানেও বদলী হ'তে হয়েছিল। পিতার মৃত্যুর পর, লাহিড়ী মহাশয়ের উপর সংসারের সম্পূর্ণ ভার এসে পড়ল। পরিবারবর্গের জ্ঞাত্য তিনি কাশীতে গুরুদেবের মহলায় একটি বাড়ী খরিদ করেন।

তাঁ'র তেত্রিশ বৎসর বয়সের সময় লাহিড়ী মহাশয় তাঁ'র পুনর্জন্মগ্রহণের উদ্দেশ্য পূর্ণ হ'তে দেখতে পান। ভ্রাম্যচ্ছাদিত অগ্নি, যা' এতদিন ধিকি ধিকি জ্বলছিল, তা' এখন প্রবল বহ্নিশিখায় পরিণত হ'বার স্মরণ পেলো। মানবনয়নের অগোচরে বিধির বিধান গূঢ়ভাবে কাষ ক'রে ঠিক উপযুক্ত সময়েই সব ঘটনা বাইরে প্রকাশ করে। রাগীক্ষেতের কাছে তাঁ'র গুরু বাবাজী মহারাজের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয় আর তাঁ'র দ্বারাই তিনি ক্রিয়াযোগে দীক্ষিত হ'ন।

এই মঙ্গলপ্রসূ ঘটনা শুধু তাঁ'র একার জন্মেই ঘটেনি, সমগ্র মানবজাতির এ একটা পরম মাহেন্দ্রক্ষণ; অনেকেই তাঁ'র এই আত্মজ্ঞানবিকাশী ক্রিয়া-যোগে দীক্ষিত হ'বার সৌভাগ্য লাভ ক'রেছিল। অবলুপ্ত অথবা বহুকাল বিলুপ্ত উচ্চতম যোগশিক্ষা আবার সাধারণ্যে প্রকাশিত হ'ল। বহু ধর্ম-পিপাসু স্ত্রীপুরুষ অবশেষে ক্রিয়াযোগের সূর্য্যোদয় সলিলে অবগাহন ক'রে সংসারদাবদন্ধহৃদয়ে অনাবিল শান্তির আনন্দ লাভ করলেন। ভগীরথের তপস্তায়

প্ৰীত হ'য়ে আকাশবাহিনী গঙ্গা যেমন ধূৰ্জটিক জটিল জটাজুটক উপর
পতিত হ'য়ে আহাচল বেয়ে নেমে এসে সহস্রধারে ভারতভূমিকে প্লাবিত
ক'রে সরস সুন্দর প্রাণবন্ত আর পুণ্যময় ক'রে তুলেছে—এই “ক্রিয়াযোগ”
তেমনি হিমালয়কন্দর হ'তে নির্গত হ'য়ে মানবের সংসারদাবদণ্ড হৃদয়ে
অমিয়ধারার প্লাবন বহাবার জন্তেই ছুটে চলেছে।

৩৩শ পরিচ্ছেদ

বাবাজী বর্তমান যুগের যোগী অবতার

বদরীনারায়ণের কাছে উত্তর হিমাচলপ্রদেশের শৈলশিখরে লাহিড়ী মহাশয়ের গুরু বাবাজী মহারাজ এখনও জীবিতভাবে অবস্থিতি করছেন। নিঃসঙ্গ মহাপুরুষ তাঁ'র নশ্বরদেহ শতাব্দী ধরে কি, যুগযুগান্ত ধরে রক্ষা ক'রে আসছেন। বর্তমান যুগে বাবাজী একজন অবতার।

শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজি একদিন আমায় বল্লেন, “বাবাজীর আধ্যাত্মিক অবস্থা মানবকল্পনারও অতীত। মানুষের সন্ধীর্ণদৃষ্টি তাঁ'র অতীন্দ্রিয় আধ্যাত্মিক জ্যোতিঃ ভেদ করতে পারে না। এই অবতারের যোগৈশ্বর্য্য কল্পনাই করা যায় না। এ একেবারে ধারণার অতীত।”

উপনিষদে আধ্যাত্মিক উন্নতির প্রত্যেক অবস্থার সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মভাবে শ্রেণী-বিভাগ করা হয়েছে। “সিদ্ধ” মহাপুরুষের জীবন্মুক্ত অবস্থায় (জীবিত অবস্থায় মুক্তিলাভ) উন্নীত হ'বার পর পরামুক্ত অবস্থা (পূর্ণ মুক্তিলাভ ধ'টে মরণের অতীত হওয়া) লাভ হয়; এই পরামুক্তি ধা'র ঘটেছে, তিনি মায়ার নাগপাশ ছেদন আর তা'র জন্মমৃত্যুর হাত সম্পূর্ণভাবে এড়িয়ে গেছেন। কাষেই পরামুক্ত যিনি, তিনি কদাচিৎ নশ্বরদেহে প্রত্যাবর্তন করেন; আর যদিই বা তা' করেন, তা' অবতার হ'বার জন্ম, সংসারের উপর দেবতার আশীর্বাদের মতন তিনি ঈশ্বরপ্রেরিত মহাপুরুষ হ'য়েই এ জগতে আগমন করেন।

অবতার কখনও প্রাকৃতবিধির অধীন হন না। তাঁ'র শুদ্ধদেহ, যা' কেবল আলোকনির্মিত প্রতিমূর্তির মতই পরিদৃশ্যমান, তা'র উপর প্রকৃতির কোনই আধিপত্য নাই। আকস্মিক দৃষ্টিতে অবতারের আকৃতিতে কোনই বিশেষত্ব পরিলক্ষিত হয় না, কিন্তু সময়বিশেষে এর কোন ছায়া বা পদচিহ্ন বাটির উপর পড়তে দেখা যায় না। অন্তরে মায়াকার আর জড়বন্ধনের

অভাবহুচক এই সব লক্ষণগুলিই হচ্ছে তাঁ'দের বাহ্যিক প্রমাণ-নিদর্শন। এরূপ পরম ভাগবতেরাই কেবল জীবনমৃত্যুর আপেক্ষিকসম্বন্ধের পিছনে সত্যের সন্ধান অবগত আছেন। ওমর খয়য়াম, যাঁ'র কবিতার অন্তর্নিহিত ভাবসম্বন্ধে অনেকেই ভ্রান্ত ধারণা, তিনি তাঁ'র অমরকবিতা “রোবায়াতে” এইরূপ মৃতপুরুষ সম্বন্ধে ব'লে গেছেন :—

“অন্তরে মোর আনন্দেরি রাকাশশীর হাসির মাঝ,
এই গগনের উজলকিরণ চাঁদের উদয় আবার আজ ;
বৃথাই আমার খোঁজের তরে, উদয়পথে চলার কাল,
এই বাগিচার কুঞ্জমাঝে, মেলবে সে তা'র দৃষ্টিজাল।” ৥৭৪৥

এই “আনন্দের রাকাশশী” হ'চ্ছে ঈশ্বর—সেই চিরন্তন প্রবতারা, কালের বুকে যে অটল স্থির, সময়ের যা'র কখনও ভুল হয় না ; আর “এই গগনের চাঁদ” হ'চ্ছে বাইরের বিশ্বজগৎ, যা' সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়ের নিয়মাধীন—ভাঙ্গাগড়ার খেলায় যা'র প্রয়োজন। পারস্তের এই স্রষ্টাকবি তাঁ'র আত্মোপলব্ধিবলে চিরতরে এর শৃঙ্খল ভগ্ন ক'রে ফেলেছেন। “বৃথাই আমার খোঁজার তরে,……মেলবে সে তা'র দৃষ্টিজাল।” চিরমুক্তির জন্ত উন্নতবিশ্বের কি নিষ্ফল অহুসন্ধান !

যীশুখৃষ্ট তাঁ'র মুক্তিসম্বন্ধে আর এক উপায়ে বর্ণনা ক'রে গেছেন :—

“তা'রপর জনৈক লিপিকর এসে তাঁ'কে বল্লে, প্রভু, আপনি যেখানেই যা'ন না কেন, আমি আপনাকে অহুসরণ ক'রব। তা'রপর যীশু তা'কে বল্লেন, শিয়ালদের বাসস্থান গর্ত আছে, আকাশের পাখীদেরও বাসা আছে, কিন্তু মানবপুত্রের মাথা রাখবার ঠাই নাই।”

সর্বব্যাপিত্বের দ্বারা দিক্দিগন্তবিস্তৃত যীশুখৃষ্টকে সত্যই কি কোথাও অহুসরণ করা যায়—কেবল সেই সর্বব্যাপী পরমাত্মার ভিতর ছাড়া ?

শ্রীকৃষ্ণ, রামচন্দ্র, বুদ্ধদেব, পতঞ্জলি প্রভৃতি এ'রাই হচ্ছেন প্রাচীন অবতার। অগস্ত্য নামে দক্ষিণভারতের এক অবতারের নামে তামিল ভাষায় বহু কাব্যসাহিত্য রচিত হয়েছে। খ্রীষ্টিয় যুগের পূর্বে এবং পরে বহু শতাব্দী ধ'রে তিনি নানা অলৌকিকক্রিয়া সম্পন্ন করেন। কথিত আছে যে অগ্ন্যবধি তিনি নশ্বরদেহে বর্তমান।

ভারতবর্ষে বাবাজীর জীবনের উদ্দেশ্য হচ্ছে মহাপুরুষদের বিশেষ বিধান

পালনে সহায়তা করা। শাস্ত্রীয় লক্ষণানুসারে তিনি মহাবতারপদবাচ্য। তিনি বলেছেন যে, তিনি পরমজ্ঞানী জগৎগুরু শঙ্করাচার্য্য * আর মধ্যযুগের মহাপুরুষ সন্ত কবীরকে যোগদীক্ষা দেন। ঊনবিংশ শতাব্দীতে তাঁ'র প্রধান শিষ্য হচ্ছেন, লুপ্ত ক্রিয়াযোগের পুনরুদ্ধারক লাহিড়ী মহাশয়।

মহাবতার সর্বদা খ্রীষ্টের সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে রয়েছেন; সর্বদাই তাঁ'রা মুক্তির স্পন্দন প্রেরণ করছেন আর বর্তমান যুগে মুক্তির জগৎ আধ্যাত্মিক প্রক্রিয়ারও ব্যবস্থা ক'রে রেখেছেন। এই দুই পূর্ণজ্ঞানী মহাপুরুষদের একজন শরীরী আর একজন অশরীরী। এঁদের কাষ হচ্ছে আত্মঘাতী বুদ্ধ, জাতিবৈষম্য, ধর্মের গোঁড়ামি আর জড়বাদের প্রতিক্রিয়াপ্রসূ এ সমস্ত পরিত্যাগ করবার জগৎ সকল জাতিদের উদ্বুদ্ধ করা। বাবাজী বর্তমানকালের গতি বেশ ভালরকমই জানেন, বিশেষতঃ পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রভাব আর তা'র জটিলতা এবং প্রাচ্য ও প্রতীচ্যে আত্মোন্নতিবিধায়ক যোগের সমভাবে প্রচারের প্রয়োজনীয়তাও উপলব্ধি করেন।

বাবাজীর সম্বন্ধে যে কোন ঐতিহাসিক উল্লেখ পাওয়া যায় না এতে আশ্চর্য্য হ'বার কিছুই নাই। এর কারণ কোন শতাব্দীতেই মহাপুরুষ কখনও প্রকাশ্যে আবিভূর্ত হ'ন নি। তাঁ'র যে যুগযুগান্তব্যাপী কল্পপ্রচেষ্টা, তা'তে প্রচারকার্যের চিত্তবিভ্রমকারী আলোর ধাঁধা লাগাবার কোনই স্থান নাই। একমাত্র নীরব মহাশক্তিমান বিশ্বস্রষ্টারই গ্রায় বাবাজী দীন আত্মগোপনের মধ্য দিয়ে নিঃশব্দে কাষ ক'রে যাচ্ছেন।

শ্রীকৃষ্ণ বা যীশুখ্রীষ্টের গ্রায় বিরাট অবতারের। এ পৃথিবীতে আবিভূর্ত হ'ন লীলাপ্রদর্শনের জগৎ আর এক বিশিষ্ট উদ্দেশ্য নিয়ে; আর তা' সমাধান হ'লেই তখন তাঁ'রা তিরোহিত হ'ন। বাবাজী মহারাজের গ্রায় অত্যাশ্চর্য্য অবতারের। ইতিহাসে কোন বিশেষ আর প্রধান ঘটনা সৃষ্টি করা অপেক্ষা শতাব্দীর পর শতাব্দী ধ'রে বিবর্তনের মধ্য দিয়ে মানবজাতির ধীর উন্নতি সাধিত করবার ব্যাপারে কার্যভার গ্রহণ করেন। এরূপ মহাপুরুষগণ জনতার স্থূলদৃষ্টি থেকে সর্বদাই আত্মগোপন ক'রে থাকেন, আর ইচ্ছা-

* গোবিন্দ যতীর শিষ্য শঙ্করাচার্য্য কাশীতে বাবাজী মহারাজের কাছ থেকে যোগদীক্ষা প্রাপ্ত হন। লাহিড়ী মহাশয় এবং স্বামী কেবলানন্দজীকে এর কাহিনী বলবার সময় বাবাজী সেই জগৎস্বরেণ্য মহাবতাদী শঙ্করাচার্য্যের সহিত সাক্ষাতের বহু হৃদয়গ্রাহী ব্যাপার বর্ণনা করেছিলেন।

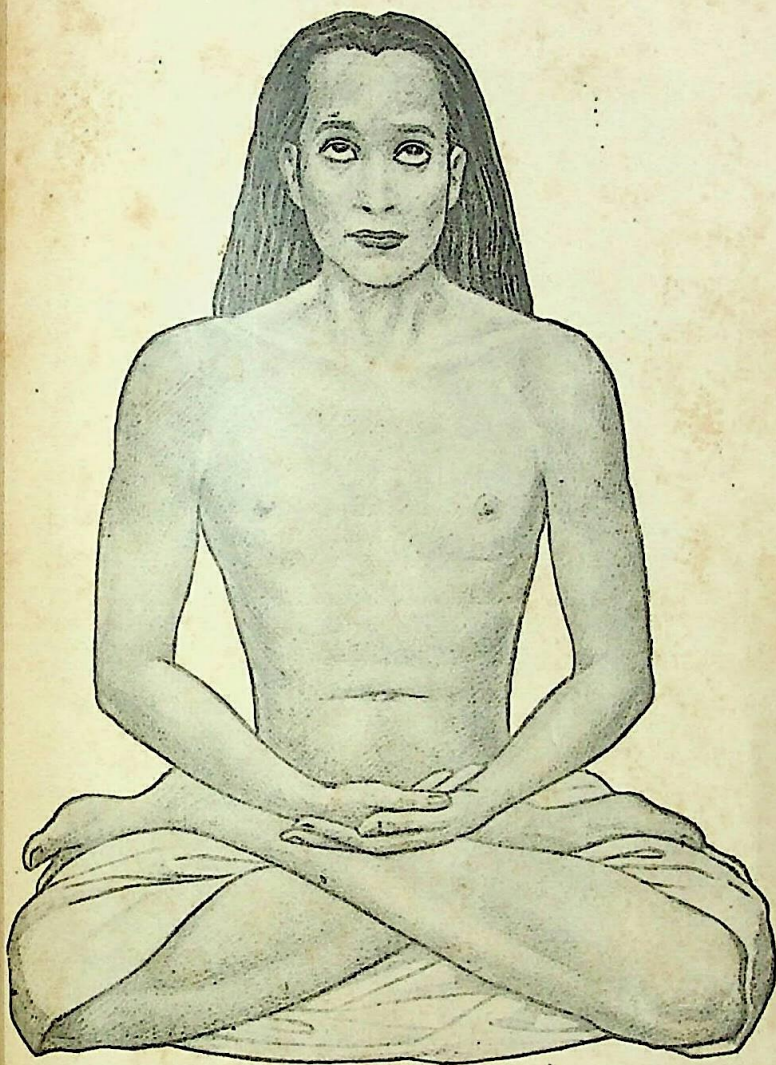
মাত্র তাঁ’দের অদৃশ্য হওয়ারও ক্ষমতা থাকে। এই সব কারণে আর যেহেতু তাঁ’রা তাঁ’দের শিষ্যবর্গকে তাঁ’দের সম্বন্ধে নীরবতা অবলম্বন করবার উপদেশ দেন, সেই জন্তই বহু বিরাট বিরাট আধ্যাত্মিক মহাপুরুষেরা জগতের কাছে অপরিচিতই র’য়ে গেছেন। নীচের কয়েকটি ছত্রে আমি বাবাজীর জীবন সম্বন্ধে একটু আভাসমাত্র দে’ব—কেবল সেই ঘটনাগুলিমাাত্র উল্লেখ ক’রে, যা’ তিনি সাধারণের উপকারের জন্ত প্রকাশে বিবৃত ক’রবার উপযুক্ত ব’লে বিবেচনা করেন।

বাবাজীর কোন জন্মস্থান বা তাঁ’র পরিবারবর্গের সন্ধান বা সে সম্বন্ধে ঐতিহাসিকের কৌতুহলনিবারক কোনও ক্ষুদ্রতথ্যও এ পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নি। সাধারণতঃ যদিও তিনি হিন্দীতে কথাবার্তা ব’লেন, তবুও তিনি যে কোন ভাষার অবলীলাক্রমে আলাপ ক’রতে পারেন। তিনি নিজে “বাবাজী” * এই অত্যন্ত সাদাসিধে নামটি গ্রহণ করেছেন। লাহিড়ী মহাশয়ের শিষ্যেরা আরও বহু সম্মানজনক উপাধিসংযোগে তাঁ’কে অভিহিত করেন, যথা—মহামূনি বাবাজী মহারাজ, মহাযোগী, ত্র্যম্বকবাবা, শিববাবা (সবই শিবাবতারের নাম)। পরামুক্ত জন্মমৃত্যুবন্ধনের অতীত এই মহাপুরুষ সংসারজীবনের কোন পৈতৃক নাম নাই—তা’তে কি কিছু আসে যায় ?

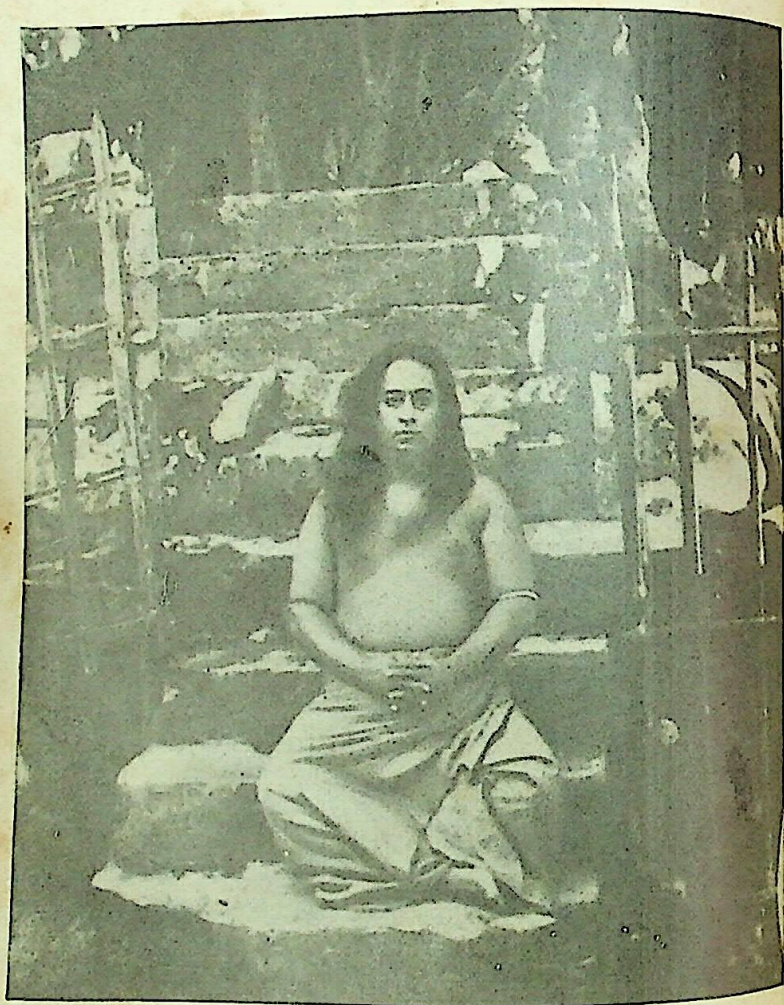
লাহিড়ী মহাশয় বল্শেন যে, “যখনই কেউ ভক্তিভরে বাবাজীর নাম উচ্চারণ করুক না কেন, সঙ্গে সঙ্গে সেই ভক্তের উপর বাবাজীর আধ্যাত্মিক আশীর্বাদ বর্ষিত হয়।”

অমর মহাপুরুষ দেহে বার্ককোর কোন চিহ্নই পরিলক্ষিত হয় না। দেখলে তাঁ’কে পঁচিশবছরের একটি যুবক ছাড়া আর কিছুই বোধ হয় না। উজ্জলবর্ণ, মধ্যমাকৃতি, বাবাজীর অনিন্দ্যসুন্দর বলিষ্ঠ দেহ হ’তে একটা যেন অপূর্বজ্যোতিঃ বিনির্গত হ’চ্ছে। চক্ষু’টি ঘনকৃষ্ণবর্ণ, শাস্ত স্নিগ্ধোজ্জল দৃষ্টি। তাঁ’র সুদীর্ঘ উজ্জল কেশপাশ তাম্রবর্ণ। সবচেয়ে আশ্চর্য্য ব্যাপার হ’চ্ছে, তাঁ’র শিষ্য লাহিড়ী মহাশয়ের সঙ্গে তাঁ’র অদ্বিত সাদৃশ্য। এই সাদৃশ্য এত

* বাবাজী একটা সাধারণ উপাধি মাত্র। প্রাচীন ও নবীন বহু পুস্তকেই কারুর না কারুর প্রতি প্রযুক্ত এই বাবাজী নামের উল্লেখ দেখতে পাওয়া যায়—কিন্তু তা’দের কোনটারই সঙ্গে লাহিড়ী মহাশয়ের গুরু “বাবাজী” এই নামের কোনই সম্পর্ক নাই।



মহাবতার বাবাজী মহারাজ
(লাহিড়ী মহাশয়ের গুরু)



পরমহংস যোগানন্দ দক্ষিণেশ্বর কালীমন্দিরস্থ
পঞ্চবটীতে সমাধি অবস্থায়।

অদৃত যে. পরবর্তীকালে লাহিড়ী মহাশয় যুবকের মতন দেখতে বাবাজী মহারাজের পিতা ব'লে অনায়াসে চলে যেতে পারতেন।

আমার সাধুপ্রকৃতি সংস্কৃতির শিক্ষক মহাশয় স্বামী কেবলানন্দজী বাবাজী মহারাজের সঙ্গে হিমালয়ে কিছুদিন কাটিয়েছিলেন।

কেবলানন্দজী আমার বলেছিলেন, “সেই অদ্বিতীয় মহাশক্তি হিমালয়ের মধ্যে তাঁ'র দলবল নিয়ে স্থান হ'তে স্থানান্তরে পরিভ্রমণ করেন। তাঁ'র ছোট্ট দলটির মধ্যে খুব উচ্চ আধ্যাত্মিক অবস্থাসম্পন্ন দু'জন আমেরিকান শিষ্যও আছেন। কোন স্থানে কিছুকাল থাকবার পরই বাবাজী ব'লেন, ‘ডেরা ডাণ্ডা উঠাও!’ তিনি হচ্ছেন দণ্ডধারী। তাঁ'র এই কথাগুলোই হ'চ্ছে দলবল সমেত তৎক্ষণাৎ স্থানান্তরগমনের ইঙ্গিত। সর্বদাই যে তিনি এইরূপভাবে পরিভ্রমণ করেন তা' নয়, কখনও কখনও শিখর হ'তে শিখরান্তরে তিনি পদব্রজেই গমনাগমন করেন।

“তিনি ইচ্ছা করলে তবে কেউ তাঁ'কে দেখতে বা চিন্তে পারে; তা' না হ'লে নয়। জানা গেছে যে, তিনি ঈশ্বর পরিবর্তিত বহু বিভিন্ন আকৃতি ধারণ ক'রে তাঁ'র নানাশিষ্যদের সম্মুখে উপস্থিত হ'তেন—কখনও শ্রদ্ধাশ্রদ্ধা-বিশিষ্ট, কখনও বা শ্রদ্ধাশ্রদ্ধাবিহীন! তাঁ'র অমরদেহ পোষণের জন্য কোন প্রকার আহারের প্রয়োজন হয় না ব'লে তিনি কদাচিৎ কোন খাদ্য গ্রহণ করেন। শিষ্যদের দর্শনদানের সময় লৌকিকতা হিসেবে কখনও কখনও তিনি ফল, পায়ের বা স্নাত গ্রহণ করেন।”

কেবলানন্দজী বলতে লাগলেন, “বাবাজীর জীবনের দু'টি অতি আশ্চর্য ঘটনা আমার জানা আছে। বৈদিক পুণ্য যজ্ঞানুষ্ঠানের জন্য এক প্রকাণ্ড অগ্নিকুণ্ড রচনা করা হয়েছে, তা'র চারপাশ ঘিরে শিষ্যেরা সব ব'সে। মহাশক্তি হঠাৎ একটা জলন্ত কাষ্ঠখণ্ড গ্রহণ ক'রে অগ্নিকুণ্ডের নিকটে উপবিষ্ট জনৈক শিষ্যের স্কন্ধে একটি মৃদু আঘাত করলেন!

“লাহিড়ীমহাশয় তখন সেখানে উপস্থিত। তিনি প্রতিবাদে চিৎকার ক'রে বললেন, ‘এ কি ম'শায়, কি নিষ্ঠুর আপনি!’

“বাবাজী বললেন, ‘ওর কর্মফলে ওকে আগুনে পুড়ে ছাই হ'য়ে যেতে হয়। চোখের সামনে কি তুমি তা'ই দেখতে চাও?’

“কথাগুলি ব'লেই তিনি তাঁ'র পদ্যহস্ত সেই চেলাটির ক্ষতবিক্ষত স্কন্ধের

উপর बुलिये दिलेन। ক্ষतचिह्न सङ्गे सङ्गे मिलिये गेल। ता'रपर बल्लेन, 'आजरात्रे আমি তোমাকে যন্ত্রণাদায়ক মৃত্যুর হাত থেকে মুক্তি দিলুম। এই একটু আগুনে পোড়া থেকেই তোমার কর্মফল খণ্ডে গেছে।'

“আর একটা উপলক্ষ্যে বাবাজীর সঙ্গেকার সেই সাধুগণ্য জনৈক অপরিচিতের আগমনে একবার বিশেষ বিব্রত হয়ে পড়েছিল। গুরুর আস্তানার কাছে পাহাড়ের একটা ভূগম পাড় বেয়ে লোকটা সে সময় আশ্চর্য্য দক্ষতার সঙ্গে সেই জায়গায় উঠে পড়েছিল।

“অপরিসীম ভক্তিতে উজ্জলবদন আগন্তুক ব্যক্তিটি বাবাজীকে দেখেই বলে উঠল, ‘ম’শায়, আপনি নিশ্চয়ই সেই মহাগুরু বাবাজী! এই সব ভূগম পাহাড় পর্বতে কতমাস ধ’রে যে আমি আপনার জন্তে অবিরাম সন্ধান ক’রে ফিরেছি, তা’ আর কি বলব। আপনার পায়ে পড়ি, দয়া করে আমায় আপনার শিষ্য ক’রে নিন। এবার আর আমায় ফেরাবেন না।’

“গুরুজী কোনই উত্তর দিলেন না; তখন লোকটি পায়ের নীচে এক গভীর পাহাড়ের খাদ দেখিয়ে বললে, ‘যদি আপনি অস্বীকার ক’রেন, তা’হ’লে আমি এই পাহাড় থেকে লাফিয়ে পড় লুম ব’লে। ভগবানকে লাভ করতে গেলে আপনার মতন লোকের কাছ থেকেই যদি উপদেশ না পাই তবে আর আমার জীবনের মূল্য রইল কি?’

“বাবাজী তাবলেশহীনমুখে শুধু মাত্র বল্লেন, ‘পড় তা’ হ’লে লাফিয়ে। তোমার এখনকার অবস্থায় আমি তোমায় নিতে পারি না!’

“লোকটা তৎক্ষণাৎ সেই পাহাড় থেকে লাফ দিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল। সেখানে উপস্থিত সাধুদের ত’ ভয়ে বিস্ময়ে বাক্শক্তি লোপ পেলে। কি আর করেন, বাবাজী হতবাক্ তাঁ’র শিষ্যদের সেই অপরিচিতের দেহটি কুড়িয়ে আনতে বল্লেন। তাঁ’রা যখন ক্ষতবিক্ষত, বিকৃতমূর্ত্তি, পিণ্ডাকার দেহটি নিয়ে উপরে উঠে এলেন তখন সেই মহাগুরু আবার তাঁ’র দৈবহস্ত সেই মৃতদেহের উপর বুলিয়ে দিলেন। আশ্চর্য্য! লোকটি চক্ষুভূটি খুলে উঠে পড়ে সেই সর্ব্বশক্তিমান গুরুর পদতলে গভীর ভক্তির সঙ্গে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করলে।

“বাবাজী মহারাজ তখন পুনরুজ্জীবিত চেলাটির প্রতি সন্মুখে দৃষ্টিপাত ক’রে বল্লেন, ‘এখন তুমি শিষ্য হ’বার জন্তে উপযুক্ত হ’লে। তুমি খুব একটা কঠিন পরীক্ষা অতি সাহসের সঙ্গেই উৎরে গেছ। মৃত্যু আর তোমায় স্পর্শ

করতে পারবে না, এখন তুমি আমাদের এই অমর সাধুসঙ্ঘের একজন হ'লে।' তাঁ'রপরেই তাঁ'র সেই সোজা কথা, 'ডেরা ডাঙা উঠাও,' আর সমগ্র দলটিরও সঙ্গে সঙ্গে সেই পাহাড় থেকে অন্তর্দ্বন্দ্ব।"

অবতার সর্বব্যাপী পরমাত্মনেই অবস্থান করেন, তাঁ'র জন্ম কোন দূরত্বেরই পরিমাপ নাই। তা'হ'লে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধ'রে তাঁ'র জন্ম-দেহ ধারণ ক'রবার একটি মাত্র কারণ থাকতে পারে—তা' হ'চ্ছে মানব-জাতিকে তাঁ'র ভবিষ্যৎসত্তাবনার প্রত্যক্ষ উদাহরণ যোগাবারই অভিপ্রায় ছাড়া আর কিছু নয়। মানুষ যদি রক্তমাংসের শরীরে দেবত্বের ক্ষণিক আবির্ভাবেরও আশা না পেত, তা' হ'লে সে কখনও তাঁ'র মরণ অতিক্রম করতে পারবে না এই ব্রাহ্ম মায়া'র বশবর্তী হয়েই তাঁ'কে চিরকাল থাকতে হ'ত।

যীশুখৃষ্ট পূর্ব হ'তেই তাঁ'র জীবনধারার বিষয় অবগত ছিলেন। যে সব ঘটনা তাঁ'র জীবনে ঘটেছে তাঁ'র প্রত্যেকটার ভিতর দিয়ে তিনি তাঁ'র নিজের জন্ম নয় বা তাঁ'র কর্মফলের দরুণ নয়—এসেছেন, কেবলমাত্র মানবজাতির উদ্ধারের জন্ম। তাঁ'র চারটি লেখকশিষ্য ম্যাথ্যু, মার্ক, লিউক আর জন তাঁ'র অমর নাট্যলীলা ভবিষ্যৎ যুগের উপকারের জন্ম লিপিবদ্ধ ক'রে গেছেন।

বাবাজীর জন্মও মহাকালের নিরবচ্ছিন্ন গতিতে অতীত, বর্তমান, আর ভবিষ্যৎ ব'লে কোন সাময়িক ছেদ নাই; আদিকাল হ'তেই তাঁ'র জীবনের সর্বাবস্থার সঙ্গে তিনি পরিচিত। তবু মানবের সীমাবদ্ধ জ্ঞানে গ্রহণযোগ্য ক'রে তিনি এক বা একাধিক সাক্ষীর সম্মুখে তাঁ'র দৈবজীবনের বহুলীলা সংঘটন করেছেন। এইরূপ একটা ব্যাপার ঘটেছিল যখন বাবাজী মহারাজ নখর দেহের অমরত্বের সম্ভাবনা ঘোষণা করবার তাঁ'র পক্ষে তখন সময় উপস্থিত হয়েছে ব'লে বিবেচনা করলেন। সে সময় লাহিড়ী মহাশয়ের একজন শিষ্যও সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি এই প্রতিজ্ঞা তাঁ'র সেই শিষ্য রামগোপাল মজুমদারের কাছে উল্লেখ করেছিলেন, যা'তে ক'রে এ অবশেষে সুবিদিত হয়ে অমুসন্ধিৎসু মনে অমুপ্রেরণা জাগাবে। বড় বড় মহাজনেরা তাঁ'দের বাণী প্রদান ক'রেও আপাতদৃশ্য স্বাভাবিক ঘটনার ধারাই অবলম্বন করেন—একমাত্র মানুষের মঙ্গলের কারণে। যীশুখৃষ্টও ঐরূপ

বলেছেন, “পিতঃ: ... আমি জানি যে তুমি আমার কথা সর্বদাই শোন, কিন্তু আমি আমার অমুগামী লোকেদের জন্তেই এ কথা বলেছি, যাঁতে ক’রে তা’রা বিশ্বাস করতে পারবে যে তুমিই আমার প্রেরণ করেছ!”

বণবাজপুরের সেই “বিন্দ্র সাধু” † রামগোপাল বাবুর সঙ্গে সাক্ষাতের সময় তিনি বাবাজীর প্রথম দর্শনলাভের অদ্ভুত ঘটনাটি বর্ণনা করেন।

রামগোপালবাবু বলেছিলেন, “কখনও কখনও আমার নির্জন গুহা পরিত্যাগ ক’রে আমি কাশীতে লাহিড়ী মহাশয়ের চরণোপাস্তে এসে উপস্থিত হ’তুম। একদিন গভীর রাত্রে তাঁ’র শিষ্যদের সঙ্গে নীরবে ধ্যানে বসেছি, গুরুদেব আমায় এক অদ্ভুত আদেশ ক’রলেন, ‘রামগোপাল, এক্ষণি তুমি দশাশ্বমেধ যাতে চলে যাও!’

“অতিক্রম গিয়ে পৌছলুম তখন সেই নির্জন স্থানে। উজ্জল নক্ষত্র আর চন্দ্রালোকে রাত তখন হাসছে। খুব ধৈর্য ধ’রে চুপ ক’রে কিছুক্ষণ ব’সে থাকবার পর, আমার পায়ের কাছেই একটি প্রকাণ্ড প্রস্তরখণ্ডের দিকে আমার মনোযোগ আকৃষ্ট হ’ল। ধীরে ধীরে পাথরটা উপরে উঠতে লাগল, নীচে দেখা গেল মাটির তলায় একটি গুহা। কোন এক অজ্ঞাত উপায়ে পাথরটি যখন উঁচু হ’য়ে দাঁড়িয়ে রইল, তখন একটি স্তম্ভজিতা অপক্লপ রূপলাবণ্যবতী সুন্দরী রমণীমূর্তি সেই গুহার ভিতর থেকে বেরিয়ে

* এ আশ্বাস কত গভীর, কত মহান! যে সব সাধুসন্তরা সঙ্কীর্ণ অহংভাব দূরীকরণে কৃতকাৰ্য হয়েছেন, তা’রা ঠিকই ঈশ্বরের বাণী শুনতে পান। মহাবিশ্বমাঝে সৃষ্টির কারণ ওদ্ধারধ্বনিরূপে যা’ নিয়তই ঝড় হ’চ্ছে, সেই আদিশব্দ, যা’র আত্মোপলব্ধি হয়েছে তাঁ’র কাছে তৎক্ষণাৎ তা’ বোধগম্য বাক্যরূপে পরিণত হয়। বাইনেলে আছে, “স্থির হও, আর উপলব্ধি কর যে আমি ঈশ্বর।”... ... তাঁ’র সর্বব্যাপিত্বে নিঃসংশয় হ’লে প্রভুর বাণী কেবলমাত্র অখণ্ড নীরবতার মধ্যেই প্রতিগোচর হয়।

“ঈশ্বরের সঙ্গে অবিরত বাক্যালাপের অভ্যাস সৃষ্টি করবার চেষ্টায় ... আমি কেবলমাত্র তাঁ’র পবিত্র সান্নিধ্য উপলব্ধি করবার চেষ্টা করি, আর আমি তা’ করি শুধু সহজ মনোযোগ আর ঈশ্বরপ্রীতি দ্বারা—এটাকেই আমি ঈশ্বরের সাক্ষাৎ উপস্থিতি ব’লে মনে করি। অথবা আরও ভাল করে বলতে গেলে বলা যায়, নীরব নিয়মিত অভ্যাসে অস্থির ভগবানের সহিত আত্মার কথোপকথন।”

†সেই সর্বদর্শী যোগী যিনি তারকেশ্বর তীর্থে আমার মাথা না নোয়ান’র কথা জানতে পেরেছিলেন।

উচ্চশৃঙ্গে এসে দাঁড়াল। মূর্তিটির চতুর্দিক একটি মহান্মিদ্ধ জ্যোতির্মণ্ডলে
বেষ্টিত। ধীরে ধীরে তিনি অবতরণ ক'রে আমার সামনে এসে স্থির হ'য়ে
দাঁড়াইলেন—অন্তর গভীর ব্রহ্মানন্দে নিমগ্ন! অবশেষে একটু নড়ে চড়ে উঠে
আমায় অতি ধীর শাস্ত্রস্বরে বললেন, 'আমি মাতাজী, * বাবাজী মহারাজের
ভগিনী। আমি তাঁ'কে আর লাহিড়ী মহাশয়কেও আজ রাতে আমার এই
গুহার আসনে বসেছি একটি গুরুতর বিষয় আলোচনা করবার জন্তে।'

“বলা শেষ হ'বার সঙ্গে সঙ্গে নীহারিকাপুঞ্জের মত যেন একটা আলোক-
পিণ্ড অতি দ্রুতবেগে গঙ্গাবক্ষের উপর দিয়ে ভেসে আসছে দেখা গেল। সেই
অপূর্ণ জ্যোতিঃ গঙ্গার অনচ্ছ (অস্বচ্ছ) জলের উপর প্রতিফলিত হচ্ছে দেখা
গেল। ক্রমশঃই সেটা নিকট হ'তে নিকটতর হ'তে লাগল, অবশেষে
নয়নান্বকারী বিদ্যুৎস্কুরণের মতন একটা জ্যোতির্বিকাশে সেটা মাতাজীর
পার্শ্বে এসে উপস্থিত হ'বামাত্র তৎক্ষণাৎ তা' ঘনীভূত হ'য়ে লাহিড়ী মহাশয়ের
মানমূর্তিতে পরিণত হ'ল। তিনি সেই মহাযোগিনী সাধবীর পদপ্রান্তে
ভক্তিভরে প্রণাম নিবেদন করলেন।

“এই অভূতপূর্ব বিশ্বয়ের ঘোর কাটিয়ে উঠতে না উঠতে আবার দেখে
হতবুদ্ধি হ'য়ে গেলুম যে, রহস্যময় একটি চক্রাকার আলোকপিণ্ড আকাশপথে
পরিভ্রমণ করছে। সেই ঘূর্ণায়মান জলন্ত অগ্নিশিখা আমাদের দলটির কাছে
দ্রুতবেগে নেমে এসে একটি সুন্দর যুবকের দেহে পরিণত হ'ল, দেখে তখনই
বুঝতে পারলুম যে ইনিই বাবাজী মহারাজ। দেখতে ঠিক লাহিড়ী
মহাশয়েরই মত—তা'র মধ্যে প্রধান পার্থক্য এই যে, বাবাজী মহারাজ
দেখতে আরও অল্পবয়স্ক আর তাঁ'র ছিল উজ্জল, সুদীর্ঘ কেশপাশ এবং
তিনি গুহ্মলেশবিহীন।

“লাহিড়ী মহাশয়, মাতাজী ও আমি সেই মহাগুরুর পূণ্য পাদপদ্মে
নতজানু হ'য়ে প্রণাম নিবেদন করলুম। তাঁ'র সেই দৈবীতত্ত্ব স্পর্শ ক'রবা-
মাত্র অবর্ণনীয় আনন্দগরিমার একটা স্বর্গীয়ানুভূতি আমার সকল সত্তা
পরিণামিত ক'রে তা'র প্রতি অগুপ্তমাগুকে পুলকান্বিত ক'রে তুললে।

* মাতাজীও বহুশতাব্দী ধ'রে জীবিতা আছেন। তিনিও প্রায় তাঁ'র ভ্রাতার মতই আধ্যাত্মিক
উচ্চাবস্থাপন্ন। তিনি কাশীর দশাধমেধ ঘাটের নিকট মাটির নীচে এক গুপ্ত গুহার মধ্যে ব্রহ্মানন্দে
মগ্ন হ'য়ে অবস্থান করেন।

“বাবাজী বল্লেন, ‘কল্যাণীয়া ভগিনি, আমি আমার এ দেহ বিসর্জন দিয়ে পরব্রহ্মসাগরে বিলীন হ’তে মনস্থ করেছি।’

“সেই মহিমময়ী কাতরনয়নে তাঁ’র দিকে তাকিয়ে বল্লেন, ‘পূজ্যপাদ গুরুজি, আমি আপনার অভিপ্রায়ের আভাস ইতিমধ্যেই পেয়েছি। সেই জন্তই আজ রাত্রে আমি আপনার সঙ্গে এ সম্বন্ধে আলোচনা ক’রতে চাই। দেহত্যাগ ক’রবেন কেন বলুন ত’ ?’

“‘পরব্রহ্মসাগরে আমার আত্মার তরঙ্গ দৃশ্যই হো’ক আর অদৃশ্যই হো’ক, তা’তে প্রভেদ কতটুকু ?’

“মাতাজী এবার অত্যন্ত চতুরতার সঙ্গে উত্তর দিলেন, ‘মরণজয়ি গুরু! যদি কোন প্রভেদ না’ই থাকে তবে দয়া ক’রে আপনি আর দেহত্যাগ করবেন না।’ *

“বাবাজী গাভীরোর সঙ্গে বল্লেন ‘তবে তাই হো’ক। আমি কখনও আমার এ জড়দেহ আর পরিত্যাগ ক’রব না। এ সর্বদাই দৃশ্য হ’য়ে থাকবে এই পৃথিবীতে, অন্ততঃ জনকতকেরও কাছে। পরমেশ্বর তোমার মুখ দিয়েই তাঁ’র অভিপ্রায় ব্যক্ত করলেন।’

“পরম শ্রদ্ধাস্পদ এই তিনটি ব্যক্তির কথোপকথন যখন সম্ভরভক্তির সঙ্গে শুনছিলুম, সেই মহাশুভ তখন আমার দিকে ফিরে প্রসন্নভাবে বল্লেন, ‘ভয় পেয়ো না রামগোপাল, এই অমর প্রতিজ্ঞার দৃশ্যে সাক্ষী হ’তে পেরে তুমি সত্যিই ভাগ্যবান।’

“বাবাজীর মধুর কণ্ঠস্বরের বান্ধার শেষ হ’তে না হ’তেই তাঁ’র আর লাহিড়ী মহাশয়ের মূর্তি ধীরে ধীরে শূণ্যে ভেসে উঠে গঙ্গার উপর দিয়ে আবার পিছন দিকে ফিরে চলল। নৈশাকাশে তাঁ’দের দেহ অদৃশ্য হ’বার সময় অত্যুজ্জল আলোকের একটা ছটা তাঁ’দের সমস্ত শরীর আচ্ছাদিত ক’রে রেখে ছিল। মাতাজীর দেহও শূণ্যে উঠে ভাসতে ভাসতে গুহায় প্রবেশ ক’রে তাঁ’র মধ্যে অন্তর্হিত হ’ল, আর সঙ্গে সঙ্গে সেই বৃহৎ প্রস্তরখণ্ডটিও আপনাআপনিই বন্ধ হয়ে গেল—যেন কোন অদৃশ্য কব্জারই এ কাষ।

* এই ঘটনা খেলের কথা শ্রবণ করিয়ে দেয়। জগদ্বিখ্যাত দার্শনিকপ্রবর প্রচার ক’রেছিলেন যে, জীবন আর মৃত্যুর মধ্যে কোন পার্থক্য নাই। একজন সমালোচক জিজ্ঞাসা করেছিল, “তা’ হ’লে আপন মরেন না কেন ?” তা’তে খেল্‌স উত্তর দেন, “কারণ ও একই কথা, তা’ তেও কোন পার্থক্য নেই।”

“অসীমভাবে অনুপ্রাণিত হ’য়ে আমি লাহিড়ী মহাশয়ের কাছে ধীরে ধীরে ফিরে চল্লুম। পৌছলুম যখন, তখন সবেমাত্র ভোর হ’য়েছে; তাঁ’র সামনে গিয়ে প্রণাম ক’রে দাঁড়াতে তিনি সমস্তই বুঝে আমার দিকে চেয়ে একটু হেসে বললেন, ‘রামগোপাল, আমি তোমার জন্তে সুখীই হয়েছি। বাবাজী আর মাতাজীকে দর্শনের অভিলাষ বা’ তুমি আমার কাছে প্রায়ই ব্যস্ত ক’রতে, আজ তাঁ’র শেষ পর্য্যন্ত একটা পুণ্য পরিণতি ঘটল।’

“আমার গুরুভাইয়েরা আমায় জানালেন যে, আগের দিনে রাত্রির গোড়ার দিক থেকেই লাহিড়ী মহাশয় তাঁ’র বেদীর উপর থেকে নিম্নমাত্রণ্ডে নড়েন নি।

“একটি চেলা বললেন, ‘আপনার দশাশ্বমেধ ঘাটে চ’লে যা’বার পর তিনি অমরত্ব সম্বন্ধে একটি অপূর্ণ ব্যাখ্যা প্রদান ক’রলেন।’ শাস্ত্রে লেখা এই সত্যই তখন সর্বপ্রথম পরিপূর্ণভাবে উপলব্ধি ক’রতে পারলুম যে পূর্ণ ব্রহ্মজ্ঞান যা’র লাভ হয়েছে, তিনি একই সময়ে বিভিন্নস্থানে দুই বা ততোহধিক শরীরে আবিভূত হ’তে পারেন।

রামগোপাল বাবু তাঁ’র কাহিনী অবশেষে এই ব’লে শেষ করলেন, “লাহিড়ী মহাশয় পরে এই জগৎসংসারসম্বন্ধে গুঢ় দৈবপরিকল্পনার বহু দার্শনিক তথ্য আমায় ব্যাখ্যা করেছিলেন। আমাদের এই জগৎব্রহ্মাণ্ডের অবস্থিতিকাল পর্য্যন্ত বাবাজী স্বদেহে অবস্থান করবেন, এইটাই ভগবানের অভিপ্রায়। যুগযুগান্তর অতীতের গর্ভে বিলীন হয়ে যাবে—কিন্তু আমাদের মরণবিজয়ী মহাগুরু শতাব্দীর পর শতাব্দীর নাট্যাভিনয় দেখতে দেখতে এই সংসারনাট্যক্ষেত্রে উপস্থিত থাকবেন।”

মরণের’ পর জয়ী হ’বে তুমি, নাহুবে যে করে জয়,

মরণ একবার মরিলে তখন, র’বে না মরণভয়।

সেক্সপিয়ারঃ—সনেট ১৪৬

৩৪শ পরিচ্ছেদ

হিমালয়ে প্রাসাদসৃষ্টি

স্বামী কেবলানন্দজী একবার বাবাজী মহারাজের সম্বন্ধে এক অলৌকিক ব্যাপারের বিষয় বর্ণনা করতে তিনি স্মরু করলেন, “বাবাজীর সঙ্গে লাহিড়ী মহাশয়ের প্রথম সাক্ষাৎ—সে এক অত্যাশ্চর্য্য ব্যাপার! আর এই সব ঘটনা থেকেই সেই অমর গুরুর বিষয়ে খুঁটিনাটি কিছু কিছু জানতে পারা যায়।”

প্রথম যখন কেবলানন্দজী এ ঘটনা বিবৃত করলেন, তখন তা’ শুনে তা’ আমি বিশ্বাসে হতবাক হ’য়ে গেলুম! এর পরে আরও বহুবার আমি স্বামীজির কাছ থেকে গল্পটি শুনেছি আর এ ঘটনাটি পরে শ্রীবুদ্ধেশ্বর গিরিজি মোটামুটি একই ভাষায় আমার বিবৃত করেছিলেন। এই উভয় শিনাই লাহিড়ী মহাশয়ের স্বযুখে বর্ণনা শ্রবণ করেছিলেন।

লাহিড়ী মহাশয় বলেছিলেন, “বাবাজী মহারাজের সঙ্গে আমার প্রথম সাক্ষাৎ ঘটে যখন আমার বয়স তেত্রিশ বৎসর। ১৮৬১ সালের শরৎকালে মিলিটারী ইঞ্জিনীয়ারিং ডিপার্ট্মেন্টে একাউন্ট্যান্ট হিসেবে দানাপুরে ছিলাম। একদিন সকালে অফিসে যেতে ম্যানেজার সাহেব ডেকে পাঠিয়ে বললেন, ‘লাহিড়ি, আমাদের হেড্ অফিস থেকে একটি টেলিগ্রাম এসেছে তোমায় রাণীক্ষেতে যেতে হ’বে, সেখানে সৈনিকদের একটা ধাঁচ * তৈরী হ’চ্ছে।’

“একটি চাকর সঙ্গে নিয়ে চল্লুম রাণীক্ষেতে—পাঁচশত মাইল রাস্তা। ঘোড়ার গাড়ীতে ক’রে আমাদের হিমালয়প্রদেশে রাণীক্ষেতে† পৌছতে লাগল পুরো একটি মাস।

* এখন একটি সামরিক স্থাননিবাস। ১৮৬১ খৃষ্টাব্দের মধ্যেই ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট সেখানে কয়েকটি টেলিগ্রাফের সংযোগ স্থাপন করতে পেরেছিলেন।

† যুক্তপ্রদেশের আলমোড়া জেলায় রাণীক্ষেত, হিমালয়ের সর্বোচ্চ শিখরগুলির অশ্রুতম নন্দাদেবীর (২৫,৬৬১ ফিট) পাদদেশে অবস্থিত।

“অফিসের কাষ যে খুব বেশী ভারি ছিল তা’ নয়। সময় বেশ পাওয়া যেত আর আমি হিমালয়ের পাহাড়পর্কতে নানা জায়গায় ঘুরে ঘুরে বেড়িয়ে খুব সময় কাটাতুম। লোকমুখে শোনা গেল যে জায়গাটিতে খুব বড় বড় সাধুসন্ন্যাসীরা বাস করেন। তাঁদের দেখতে মনে বড়ই বাসনা হ’ল। একদিন বিকেলের দিকে একটা পাহাড়ে বেড়াতে বেড়াতে শুনতে পেলুম খুব দূর থেকে আমার নাম ধ’রে কে ডাকছে। শুনে ত’ ভয়ানক আশ্চর্য্য হ’য়ে গেলুম। এ স্থানে আমি একেবারে অপরিচিত, কেউ আমায় চেনে না শোনে না—কে আমায় এই নির্জন জায়গায় এমন ক’রে আমার নাম ধ’রে ডাকে? আর আমি এই সেদিনমাত্র এখানে এলুম আমার নাম জান্লেই বা কি ক’রে? বাই হোক সেই পাহাড়ে—পাহাড়টার নাম ছিল দ্রোণগিরি—চড়াই ভেঙ্গে তখন খুব তাড়াতাড়ি উঠতে লাগলুম। মনে মনে একটু ভয়ও হ’তে লাগল যে, জঙ্গলে যদি অন্ধকার নেমে আসে ত’ তা’ হ’লে আর আমার ফিরে যাওয়া হ’বে না।

“যাক্—মরি আর বাঁচি, যা’ হয় হ’বে ভেবে অবশেষে উঠেও পড়লুম পাহাড়ের উপর। সামনে একটু ফাঁকা জায়গা, আর তা’র চারধারে সব ছোট ছোট গুহা। সেই পাহাড়ের একটা উঁচু পাথরের উপর দাঁড়িয়ে একটি সহাস্রবদন বুবক, আমায় সম্ভাষণ করবার জন্তে হাত বাড়িয়ে। দেখে আশ্চর্য্য হ’য়ে গেলুম যে, একমাত্র তামাতে রঙের তাঁ’র ঘন লম্বা চুল ছাড়া আমার সঙ্গে তাঁ’র এক অভূত সৌসাদৃশ্য রয়েছে।

“সাধুটি সম্মুখে আমার হিন্দীতে সম্বোধন ক’রে বললেন, ‘লাহিড়ি, তুমি এসেছ! যাক্, এই গুহাতে এখন একটু বিশ্রাম কর, আমিই তোমায় ডাকছিলাম, বুঝলে?’

“একটি পরিষ্কার ছোট্ট গুহাতে প্রবেশ ক’রে দেখলুম যে কতকগুলো পশমের কম্বল আর কমণ্ডলু সেখানে রয়েছে। একটা কোণে ছিল তাঁজ-করা একটি কম্বল—তা’ দেখিয়ে যোগীটি জিজ্ঞাসা ক’রলেন, ‘লাহিড়ি, তুমি ঐ আসনটি চিন্তে পা’র?’ বললুম, ‘না, ম’শায়!’ তা’রপর আমার ঈশাহসিক কাষে কতকটা যেন ভীতিবিহ্বল হয়ে পড়েই বললুম, ‘আমায় এখনই যেতে হ’বে, রাত এসে পড়ল ব’লে। সকালে অফিসে আমার কাষ আছে ত’।’

“সেই রহস্যময় সাধুটি তখন ইংরেজিতে উত্তর দিলেন, ‘অফিসকেই তোমার জন্ত এখানে আনা হয়েছে, তোমাকে অফিসের জন্তে নয়, বুঝলে?’

“শুনে অবাক হয়ে গেলুম যে এই অরণ্যবাসী সন্ন্যাসীটি শুধু ইংরেজিতেই কথাবার্তা বলতে পারেন তা’ নয়, যীশুখৃষ্টের বাণীরও ভাবার্থ করতে পারেন।* তা’রপর বললেন, ‘দেখছি যে আমার টেলিগ্রামের ফল ফলেছে।’ শুনে দুর্কোথা ঠেকল, এ কথার মানে কি জিজ্ঞাসা করলুম।

“‘আমি তোমার টেলিগ্রামের কথা বলছি যা’ পেয়ে তুমি এই নির্জন প্রদেশে এসেছ! আমিই তোমার উপরওয়ালার মনে নীরবে এই ধারণা জন্মিয়ে দিলুম যে তোমায় এখন রাণীক্ষেতে বদলী করা দরকার। মানবজাতির সঙ্গে যা’র মনের গভীর ঐক্য সংসাধিত হয়েছে, তখন সব মনই যেন সংবাদ-প্রেরক যন্ত্রের মত হয়ে দাঁড়ায় আর তা’র মধ্য দিয়েই সে তা’র ইচ্ছামত কায করতে পারে।’ তা’রপর তিনি শান্তস্বরে বললেন, ‘লাহিড়ি, নিশ্চয়ই এই গুহা তোমার কাছে পরিচিত ব’লে বোধ হচ্ছে?’

“হতবুদ্ধি হয়ে তখন নিশ্চক্ৰভাবে বসে রয়েছি, এমন সময়ে সাধুটি কাছে এসে আমার কপালে যুঁহুভাবে আঘাত করলেন। তাঁ’র হস্তের চৌম্বকম্পর্শে আমার মস্তিষ্কের ভিতর দিয়ে একটা অদ্ভুত প্রবাহ ব’য়ে গেল—সঙ্গে সঙ্গে আমার পূর্বজীবনের বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মধুরস্মৃতি মনের মধ্যে জাগরিত হয়ে উঠল।

“আনন্দের আবেগে অর্ধঅবরুদ্ধস্বরে বললুম, ‘মনে পড়েছে, মনে পড়েছে, আপনিই আমার গুরু বাবাজী, আহা, চিরজনমেরই আপনি আমার। এখন মনে অতীতের সব দৃশ্য স্পষ্টরূপে জেগে উঠছে—আমার গতজীবনের সাধনায় বহু বছর ধ’রে এইখানে এই গুহাতেই আমি অতিবাহিত করেছিলুম।’ অবর্ণনীয় স্মৃতির উচ্ছ্বাসে অভিভূত হয়ে আমি সাশ্রনয়নে আমার গুরুদেবের পদযুগল ধারণ করলুম।

“স্বর্গীয় প্রেমে বিগলিতকণ্ঠে বাবাজী বললেন, ‘তিরিশ বছর ধ’রে আমি তোমার জন্তে এইখানে অপেক্ষা করছি—অপেক্ষা করছি এই জন্তে যে তুমি আবার আমার কাছে ফিরে আসবে। কিন্তু তুমি পালিয়ে গেলে আমার কাছ থেকে; পালিয়ে গিয়ে, মরণ পারে যে নতুন জীবনের স্রোত বইছে

* যীশুখৃষ্ট বলেছিলেন, “বিশ্রামদিবস মানুষের জন্তেই সৃষ্ট হয়েছে—মানুষ তা’র জন্তে নয়”।

সেই স্রোতের মধ্যে তুমি অদৃশ্য হ'লে। প্রাক্তনকর্মের ঐশ্বর্যালিক দণ্ড তোমায় স্পর্শ করলে, আর তুমি হ'লে অদৃশ্য। তুমি আমায় দেখতে না পেলেও আমি কিন্তু তোমার উপর বরাবরই নজর রেখে এসেছি। স্বর্গের মহিমময় দেবদূতেরা যে জ্যোতিঃসাগর পরিভ্রমণ করেন, সেখানেও তোমায় অনুসরণ করেছি।

“যোর অন্ধকার, দারুণ ঝড়, ভীষণ বিপ্লব, বা অনন্ত আলো সবারই ভিতর দিয়ে তোমায় অনুসরণ ক'রে আমি তোমার পিছন পিছন ধেয়ে এসেছি— পক্ষীমাতা তা'র শাবককে রক্ষা করবার জন্ত যেমন ক'রে ছুটে আসে। মাতৃ-জ্ঞপ্তির অবস্থানকাল কাটিয়ে শিশুরূপে যখন তুমি ভূমিষ্ঠ হ'লে, আমার চক্ষু তখন সতত তোমার উপর স্থির! নবদ্বীপের গঙ্গাতীরে পদ্মাসনে ব'সে যখন ছোট্ট দেহটি বালির মধ্যে ঢাকা দিতে, তখনও আমি অদৃশ্যভাবে সেখানে উপস্থিত! দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বছরের পর বছর আমি এই শুভদিনটির জন্যে প্রতীক্ষা ক'রে তোমার উপর নজর রেখে আসছি; এখন তুমি আমার কাছে এসেছ। এই তোমার গুহা, কতকালের যে পুরান। আমি এ তোমার জন্যে সর্বদাই বাক্বাকে তক্তকে পরিষ্কার ক'রে রেখে এসেছি। এই তোমার কলসন, যেখানে তুমি রোজ ভগবানের ধ্যানের জন্যে বসতে! ঐ দেখ তোমার পাত্র, যা'তে ক'রে তুমি আমার তৈরী স্নান পান ক'রতে। দেখ, তোমার পেতলের কমণ্ডলুটি কেমন বাক্বাকে পালিশ ক'রে রেখেছি, যা'তে ক'রে আবার তুমি এ থেকে পান করতে পারবে। বৎস আমার! এখন সব বুঝতে পারছ কি?”

“গুরুদেব! আমি আর কি বলব, বলুন?” কোন গতিকে অশ্রুটস্বরে কথা ক'টি বললুম, ‘একুপ অমর স্নেহের কথা কে কোথায় কবে শুনেছে বলুন?’ আমার জীবনমরণের গুরু, আমার ইহকালপরকালের সাধনা, আমার চিরন্তন ধন—চেয়ে রইলুম তাঁ'র দিকে অসীম অবর্ণনীয় আনন্দে, অপরিসীম শুভায়!

“লাহিড়ি, তোমার শুদ্ধি দরকার। এই বাটি থেকে খানিকটা তেল নিয়ে খেয়ে ফেল। তা'রপর নদীর ধারে গিয়ে শুয়ে থাক।”

“বাবাজী হ'চ্ছেন কাষের লোক, সে কথা স্মরণ ক'রে একটু হাসলুম। কাষের কথা তাঁ'র সবার আগে।

“তা’র আজ্ঞা পালন ক’রতে গেলুম। হিমালয়ের তুহিনশীতল রাহি যদিও তখন নেমে আসছে, তবুও বেশ আরামদায়ক উষ্ণতার একটা আভ্যন্তরীণ বিচ্ছুরণ যেন আমার শরীরের প্রতি কোমে স্পন্দিত হ’তে লাগল। অবাক হয়ে গেলুম। এই অজানা তেলটুকুতে কি কোন প্রকার আকাশের উত্তাপ সঞ্চিত ছিল ?

“অন্ধকারের ভেতর দিয়ে কনকনে ঠাণ্ডা হাওয়া আমার শরীরের উপর দিয়ে সশব্দে হু হু ক’রে বইতে লাগল ! প্রস্রবনয় নদীতীরে লম্বমান আমার দেহের উপর দিয়ে গোগশ নদীর তিমিশীতল তরঙ্গমালা অবিরতই ব’য়ে যেতে লাগল। কাছেই কোথায় বাঘের ভীষণ গর্জন মাঝে মাঝে শোনা যাচ্ছে। মনে আমার কিম্ব তখন একটুনাড়াও ভয় নাই, আমার মধ্যে নবজাত তাপবিকীরণশক্তি মনে দুর্দ্বিধ সাহস এনে দিলে। অতি দ্রুতবেগেই আমার কাছে কয়েকঘণ্টা কেটে গেল ; গতজীবনের অস্পষ্টত্ব আর বর্তমানে আমার গুরুদেবতার সঙ্গে পুনর্জীবনের চিন্তা নিয়ে মনে উজ্জ্বল কল্পনার জাল বুনে চললুম।

“আমার নির্জন চিন্তায় বাধা পড়ল—দূরাগত কোন লোকের পদধ্বনি ক্রমশঃই নিকটতর হ’য়ে আসছে। অন্ধকারে একটি মানুষের হাত বেহিমে এসে আমাকে ধ’রে দাঁড় করিয়ে দিলে, তা’রপর কিছু শুকনো কাপড় চোপড়ও দিলে ; পরলুম।

লোকটি বললে, ‘এস ভাই, গুরুদেব তোমার জন্তে অপেক্ষা করছেন—চল, শীগ্গির চল !’

“জঙ্গলের ভিতর দিয়ে লোকটি আমায় পথ দেখিয়ে নিয়ে চলল। তমসাস্তর রাত্রির বুকে কোথায় দূরে একটা স্থির উজ্জ্বলপ্রভা উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। আমি জিজ্ঞাসা করলুম, ‘স্বর্গা উঠল না কি ? কই রাত ত’ এখনও সব কাটে নি।’

“আমার পথপ্রদর্শক মুহূ হেসে বললে, ‘এখন রাত বারটা। ঐ যে দূরে আলো দেখা যাচ্ছে, ও হ’চ্ছে আমাদের অদ্বিতীয় মহাগুরু বাবাজী মহারাজের দ্বারা এই রাত্রেই তৈরী একটি সোনার রাজপ্রাসাদের আলোর ছটা। গুরুদেব অতীতে তুমি একবার রাজপ্রাসাদ দেখবার কামনা করেছিলে। আমাদের গুরুদেব তা’ই তোমার সেই ইচ্ছা আজ পূরণ করছেন—তা’ হ’লে

তোমার আর কোন কৰ্ম্মবন্ধন থাক্বে না! তা'রপর বল্লে, 'এই অপূৰ্ণ রাজপ্রাসাদেই আজ রাত্রে তুমি "ক্রিয়াযোগে" দীক্ষিত হ'বে। দেখ, তোমার সব গুরুভাইয়েরা আজ তোমার দৌৰ্নবিনীকাসনের পরিসমাপ্তি ব'লে জয়গানে আনন্দ প্রকাশ করছে!'

"আমাদের চক্ষের সম্মুখে উজ্জল সুবর্ণনির্মিত অসংখ্য মণিমাণিক্যখচিত এক বিরাট রাজপ্রাসাদ, চতুর্দিকে মনোরম উদ্যানবেষ্টিত—সে এক অবর্ণনীয় অদ্বৈত সৌন্দর্য্য। দেবতার মতন সাধুসন্ন্যাসীরা সব দ্বারে দ্বারে দাঁড়িয়ে আছেন। পদ্মরাগমণির রক্ত আভায় দ্বারসকল রক্তিমবর্ণ। কারুকার্য্যময় ধ্যানসমূহ বৃহদাকৃতি ও অত্যুজ্জল হীরা, মুক্তা, নীলা, পান্না প্রভৃতি বহুমূল্য প্রস্তরে সজ্জিত।

"সঙ্গীটির সঙ্গে একটি প্রশস্ত অভ্যর্থনাকক্ষে গিয়ে প্রবেশ করলুম। বায়ুর সঙ্গে ধূপধূনাপ্রভৃতি আর গোলাপের সুগন্ধ ভেসে আসছে, ক্ষীণ প্রদীপগুলি থেকে নানা বিচিত্রবর্ণের আলোর সৃষ্টি হয়েছে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তক্তদল—কেউ শ্রাম, কেউ গৌরবর্ণ, সব স্তোত্র পাঠ ক'রে চলেছেন অথবা ধ্যানাসনে উপবিষ্ট, ব্রহ্মানন্দে মগ্ন! সেখানকার প্রতি অগুপ্তমাণুতে যেন উজ্জল আনন্দের আবেগকম্পন!

"দেখে শুনে অবাক হয়ে বিশ্বয়ে অস্মুটধ্বনি ক'রে উঠ'ছি দেখে আমার পথপ্রদর্শকটি সহানুভূতির সঙ্গে মুহূ হেসে বল্লে, 'দেখ, দেখ, ভাল ক'রেই চারদিক বেশ ক'রে চোখ মেলে দেখ! কারণ এ কেবলমাত্র তোমার সম্মানের জন্তেই এখানে এখন তৈরী হয়েছে।' আমি বললুম, 'ভাই, এই রাজপ্রাসাদের সৌন্দর্য্য মানুষের কল্পনার অতীত। এর তৈরী হ'বার রহস্য-টুকু আমায় বলুন না!'

সঙ্গীটির ক্রমবর্ণ চক্ষুহুটি জ্ঞানের দীপ্তিতে উজ্জল হয়ে উঠ'ল, তিনি বল্লে, "খুব আনন্দের সঙ্গেই তোমায় আজ সব বল'ব! শোন, বস্তুতঃ এর সৃষ্টির মূলে অবোধ্য ব'লে কিছুই নেই। সারা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডটাই হচ্ছে সৃষ্টিকর্তার চিহ্নের জড়রূপ! এই যে ভারী, মাটির তৈরী পৃথিবীগ্রহের পিণ্ড শূণ্যে ভাসমান, এ ত' ঈশ্বরের স্বপ্ন! তিনি তাঁ'র জ্ঞান থেকেই এসব তৈরী করেছেন

* কৰ্ম্মবিধি অনুসারে প্রত্যেক মানবের বাসনাকামনার চরম পরিপূর্ণতা লাভ হওয়া চাই। এই বাসনাকামনাই হচ্ছে পুনর্জন্মগ্রহণচক্রে বন্ধনের শৃঙ্খল।

—মাছুষ যেমন তাঁ'র স্বপ্নজ্ঞান থেকে তাঁ'র অধিবাসী সমস্ত প্রাণীসমেত একটা স্বপ্নজগৎ তৈরী ক'রে তা' প্রত্যক্ষ করে। ঈশ্বর প্রথমে এই জগৎ তৈরী করেছিলেন একটা কল্পনা নিয়ে। তাঁ'রপর তা'তে তিনি প্রাণী সংধারণ করলেন। শক্তিকণার উদ্ভব হ'ল। তাঁ'রপর সেই পরমাণুগুলি সুসমঞ্জসভাবে সজ্জিত ক'রে এই নিরেট মাটির জগৎ তৈরী হ'ল। এ য়া' সব অণুপরমাণু, তা' সব তাঁ'রই ইচ্ছাশক্তিবলে পরস্পর দৃঢ়সংবদ্ধ। এই ইচ্ছা যখন তিনি সংবরণ ক'রে নেবেন, তখন আবার এই পৃথিবী বিলীন হয়ে গিয়ে শক্তিতে পরিণত হ'বে—শক্তি আবার তাঁ'র জ্ঞানে মিলিয়ে যাবে। তা' হ'লেই এই জগৎপরিকল্পনা প্রত্যক্ষীভূত অবস্থা থেকে একেবারে অদৃশ্য হয়ে যাবে।

স্বপ্নের যে সারবস্তু তাঁ'র রূপদান, স্বপ্নদর্শকের চেতনমনের চিন্তা থেকেই উদ্ভূত হয়। জাগ্রত অবস্থায় যখন সেই সংহতিকারক চিন্তা অপসারিত হয়, তখন সেই স্বপ্ন আর তাঁ'র উপাদানসমূহও বিলীন হয়ে যায়। মানুষ চোখ বন্ধ ক'রে স্বপ্নে কিছু একটা সৃষ্টি করে, যা' আবার জেগে উঠে বিনা আয়াসে সেটা সে লোপ ক'রে দেয়। সে ভগবানের আদিকল্পনাই অনুসরণ করে মাত্র, আর কিছু নয়। তেমনি ঐ রকম যখন ব্রহ্মজ্ঞান তাঁ'র মধ্যে জাগরিত হয় তখন সে বিনাআয়াসে এই জগৎমায়াস্বপ্ন বৃষ্টির দিতে পারে।

‘সেই সকলকারণের কারণ আর তাঁ'র সর্কার্থসাধক অনন্ত ইচ্ছাশক্তি সঙ্গে একীভূত হয়ে বাবাজী সৃষ্টির মূল উপাদান অণুপরমাণুদের সংহত ক'রে যে কোন আকারে প্রকাশিত করতে পারেন। মুহূর্ত্তমধ্যে প্রস্তুত এই স্বর্ণনির্মিত রাজপ্রাসাদ, এ প্রকৃতই সত্য—আমাদের এই বিশ্বজগৎ যতটো বাস্তবসত্য! ঈশ্বর যেমন এই পৃথিবী সৃষ্টি ক'রে তা'কে সম্পূর্ণভাবে ধারণ ক'রে আছেন, বাবাজীও তেমনি তাঁ'র মন থেকে এই প্রাসাদ তৈরী ক'রে তাঁ'র ইচ্ছাশক্তিবলে এর অণুপরমাণুদের সংহতি রক্ষা ক'রে তা'কে ধারণ ক'রে আছেন।’ অতঃপর তিনি বললেন, ‘আবার যখন এর কথা কুরিয়ে যাবে, বাবাজীর ইচ্ছায় তখন এও অদৃশ্য হয়ে যাবে!’

‘তবে বিশ্বয়ে স্তম্ভিত হয়ে রইলুম! আমার পথপ্রদর্শক মহাশয় এর বিচিত্র অঙ্গভঙ্গিসহকারে বললেন, ‘এই যে রাজপ্রাসাদ, নানা বহুমূল্যপ্রস্তুত

অপরূপ কারুকার্যখচিত, এ কোন মানবপ্রচেষ্টায় নির্মিত হয় নি অথবা বহু পরিশ্রমে খনি থেকে তোলা স্বর্ণ বা হীরকাদিতেও রচিত হয় নি। এ মানব-শক্তিকে দ্বন্দ্ববৃদ্ধে আহ্বান ক'বে সগর্বে উন্নতশিরে দৃঢ়ভাবে দণ্ডায়মান।* যে কেউ নিজেকে ঈশ্বরের সন্তান ব'লে প্রকৃতই উপলব্ধি করতে পেরেছে—বাবাজী যেমন করেছেন, তেমনি সে তা'র অস্বর্নিহিত অসীম শক্তিবলে যে কোন উদ্দেশ্য সাধন করতে পারে। অত্যন্ত সাধারণ একটুকরো পাথরের ভিতর যেমন বিরাট আণবিকশক্তির রহস্য লুক্কায়িত রয়েছে, ঠিক তেমনি মানুষের ভিতরেও দৈবশক্তির অফুরন্ত ভাণ্ডার লুকান আছে।'

“তা'রপরে মুনিবর নিকটস্থ একটা টেবিলের উপর থেকে একটি পুরম রমণীয় পুষ্পাধার তুলে নিলেন, এটির হাতল হীরায় বক্ বক্ করছে। তা'রপর সেটি এগিয়ে দিয়ে বললেন, ‘আমাদের মহাশুরু কোটি কোটি মুক্ত বোমরখি ঘনীভূত ক'রে এই প্রাসাদটি সৃষ্টি করেছেন। এই ফুলদানী আর তা'র হীরকগুলি স্পর্শ ক'রে দেখ—তোমার ইচ্ছিসংগ্রাহ অল্পভূতির সব পরীক্ষাগুলোতেই উৎরে যা'বে।

“ফুলদানীটি নিয়ে পরীক্ষা করলুম, তা'রপর উজ্জল চাকচিক্যশালী স্থলভাবে স্বর্ণে তৈয়ারী সেই ঘরের মন্ডপ দেওয়ালের উপর হাত বুলিয়ে দেখলুম। চতুর্দিকে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত বহুমূল্য হীরাজহরতপ্রভৃতি প্রস্তররাশির মধ্যে যে কোন একটি রাজারাজড়াদের ঐশ্বর্যের উপবৃত্ত। মনের মধ্যে একটা গভীর সন্তোষ সঞ্চারিত হ'ল। আমার অতীতজীবনের অবচেতনার মধ্যে লুক্কায়িত একটা অপরূপ কামনা—সঙ্গে সঙ্গে মনে হ'ল, পরিতৃপ্ত হয়ে একেবারে নির্মল হ'য়ে গেল!

“আমার সহচর নানাকারুকার্যখচিত গিলান ও লম্বা দালানের ভিতর দিয়ে আমায় সঙ্গে নিয়ে সম্রাটের প্রাসাদের মত বহুমূল্য উপকরণে সুসজ্জিত কতকগুলি কক্ষে গিয়ে উপস্থিত হলেন। এক বিশাল হলধরে আমরা প্রবেশ

* “অলৌকিক ঘটনা” —সে যে নিন্দা তিরস্কার,

মানবজাতিকে ভীত উপহাস আর।—এডওয়ার্ড ইয়ং প্রণীত “নাইট থটস”।

↑ ছেঁদের আণবিকগঠনের বিষয় বৈশেষিক আর জ্যায়দর্শনে আলোচিত ও ব্যাখ্যাত হয়েছে। প্রতি অণুকার ভিতরকার শূন্যস্থানে বিরাট বিধ সব লুক্কায়িত রয়েছে—স্বাক্ষরিতের ভিতর যেমন কোটি কোটি বুলিকণা ভেসে বেড়ায়—যোগবাসিষ্ঠ।

করলুম। মধ্যাহ্নে একটি স্বর্ণসিংহাসন স্থাপিত, নানা হীরা-জহরতাদিতে খচিত, তা' থেকে নানাবর্ণের উজ্জল ছাতি নির্গত হ'য়ে চতুর্দিক আলোকিত ক'রে রেখেছে। সেখানে পদ্মাসনে উপবিষ্ট আমাদের গুরুদেব। আমি সেই স্বর্ণবর্ণোজ্জল মেঝের উপর তাঁ'র পদতলে নতজাহ্নু হ'য়ে বসলুম।

“লাহিড়ি, এখনও কি তুমি তোমার সোনার রাজপ্রাসাদের স্বপ্নকামনার মসৃণল হ'য়ে রয়েছ ?” গুরুদেবের চক্ষু দু'টি তাঁ'র তৈরী নীলার মতই—উনার উদয়ে শুকতার। যেমন জলে তেমনি স্নিগ্ধজ্যোতিঃ বিকীরণ করছিল। গুরুদেব বললেন, ‘জাগ, বৎস জাগ, তোমার সব পার্থিব আকাঙ্ক্ষা এখন চিরতরে মিটে যেতে বসেছে।’ তা'রপর তিনি কতকগুলি দুর্কোষ্য মন্তে আশীর্ব্বচন উচ্চারণ ক'রে বললেন, ‘বৎস ওঠ। “ক্রিয়াযোগে”র সাহায্যে ভগবৎ সান্নিধ্যলাভের দীক্ষা নাও।’

“বাবাজী তাঁ'র দক্ষিণ হস্ত প্রসারিত ক'রলেন ; চারিদিকে ফলপুষ্পে বেষ্টিত এক হোমকুণ্ডে হোমায়িশিখা প্রজ্জলিত হ'য়ে উঠল। এই জলদ অগ্নিবৌদীর সন্মুখে আমি কৈবল্যদায়িনী যোগপ্রণালী লাভ করলুম।

“অতি প্রত্যবেশী সমস্ত অকুষ্ঠান সমাপ্ত হ'ল। সেই পরমানন্দময় অবস্থা লাভের পর আমার ঘূমের আর কোন প্রয়োজনই রইল না ; আমি প্রাসাদের চতুর্দিকে ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করতে লাগলুম। চারিদিকই অমূল্য ধনরত্ন আর অপূর্ব কারুশিল্পের দ্রব্যসম্ভারে পরিপূর্ণ। সুগন্ধে আমোদিত উদ্যানমাধো নেমে এসে দেখলুম যে অতি নিকটেই সেই সব একই গুহাগুলি আর তরুলতা-গুল্মবিহীন পর্ব্বতের পাড়গুলি সব রয়েছে, কিন্তু গতকাল রাজপ্রাসাদ বা পুষ্পবীথির কাছে তা'দের কোন চিহ্নই ছিল না। তুব্বারশীতল হিমালয়-পর্ব্বতের সূর্য্যাকিরণে উপকথার রাজপ্রাসাদের মতই দীপ্তিশালী সেই প্রাসাদে পুনঃপ্রবেশ ক'রে গুরুদেবের সাক্ষাৎ অন্বেষণ করলুম। তখনও তিনি সিংহাসনে আসীন, চতুর্দিকে বহুশিখ্য তাঁ'কে বেষ্টন ক'রে নীরবে উপবিষ্ট।

“বাবাজী বললেন, ‘লাহিড়ি, তোমার এখন ক্ষিধে পেয়েছে, বুঝতে পাচ্ছি। আচ্ছা, চোখ বোজ’

“চোখ খোলবার পর দেখি যে, সেই মায়াপ্রসাদ আর তা'র ছবির মত বাগান সবই অদৃশ্য হয়েছে। আমার নিজদেহ আর বাবাজী এবং তাঁ'র শিবা-গণের মূর্তিসব এখন ঠিক যে স্থানে প্রাসাদটি অবস্থিত ছিল—সেখানকার উন্মুক্ত

ভূমিতে সব উপবিষ্ট রয়েছে। জায়গাটা সেই পর্বতগুহার স্বর্য়্যালোকিত প্রবেশপথের কাছেই অবস্থিত। মনে পড়ে গেল যে, আমার পথপ্রদর্শক ত' আগেই বলেছিলেন যে প্রাসাদটি কাষ শেষ হ'য়ে গেলেই আবার অদৃশ্য হ'য়ে যাবে আর এর সংহত অণুপরমাণুগুলি যেখান থেকে তা'দের উৎপত্তি হ'য়েছিল সেই সব ভাবরূপেই বিলীন হয়ে যাবে। হতভয় হয়ে পড়লেও, আমি পূর্ণবিশ্বাসের সঙ্গেই গুরুর দিকে তাকানুম। কি জানি, আজকের এ ভোজবাজির দিনে আবার যে কি ঘটতে পারে তা'ত ধ'লুতে পারি না।

“বাবাজী বললেন, ‘যে উদ্দেশ্যে প্রাসাদটি তৈরী হয়েছিল তা’ এখন শেষ হয়ে গেল। এখন তোমার কিছু খাওয়াটাওয়া দবকার।’ ব'লেই ভূঁই হ'তে একটা মাটির হাঁড়ি তুলে নিয়ে আমায় বললেন, ‘এর ভেতরে হাত ঢুকিয়ে দেখ, যা’ তোমার খেতে ইচ্ছে হ'বে, তাই-ই পাবে। নাও, শুরু কর।’

“এ আবার কি ব্যাপার! মাটির হাঁড়িটা হাতে ক'রে তুলে নিতেই সেটা গরম গরম গাওয়াঘিয়েভাজা লুচি, নানারকম মুখরোচক তরকারি আর নানাবিধ দুস্প্রাপ্য মেওয়ারিগিষ্ঠানে একেবারে ভর্তি হয়ে গেল। খেতে লাগলুম দেখি যে হাঁড়িটা আর কুরোয় না। খাওয়া শেষ হ'লে জলের জন্তু চারিদিকে তাকানুম। গুরুদেব সামনের সেই হাঁড়িটাই দেখিয়ে দিলেন। আশ্চর্য্য! খাবারগুলো তখন সব অদৃশ্য হয়ে গেছে আর তা'র জায়গায় রয়েছে, নিম্মল শীতল জল—পর্বতনিঝরিণী হ'তে যেন স্রব-সংগৃহীত!

“বাবাজী বললেন, ‘অতি অল্পলোকেই জানে যে ভগবানের রাজ্যের ভিতর আমাদের এই সব পার্থিবপ্রয়োজনের রাজ্যও আছে। ঈশ্বরের রাজ্য আমাদের এ জগৎসংসার নিয়েই, এ ত' আর তাঁ'র রাজ্যের বাইরে নয়, সে কথা সকলে বোঝে না; কিন্তু এ জগৎসংসার সবই মান্যময় ব'লে, এতে সত্যের কোন সার নেই, বুঝলে?’

“বলুন, ‘পূজনীয় গুরুদেব, স্বর্গ ও মর্ত্যের সৌন্দর্য্যের সংযোগ, তা' সে কাল রাতে আপনি আমার জন্তু প্রদর্শন করেছেন।’ তা'রপরে সেই অদৃশ্য প্রাসাদের কথা স্মরণ ক'রে মনে মনে এই ভেবে হাসলুম যে, একরূপ প্রত্যক্ষ নিশ্চিন্ততার মধ্যে আমার স্মৃতিহানি আর গভীরতত্ত্ব উদ্ঘাটনে নিশ্চয়ই কোন

সাধারণ যোগী এমন ভাবে দীক্ষা পান নি। বর্তমান দৃষ্ণের রূঢ়তায়ও তেমনি শাস্ত্যাবেই তাকাতে লাগলুম। তৃণশম্পবিহীন ভূমি, উন্মুক্ত আকাশের ছাদ, মানুষের আদিম আশ্রয় পর্বতগুহা সবই আমার চতুষ্পার্শ্বের দেবদূতদের মত সাধুসন্তদিগের স্বাভাবিক পারিপার্শ্বিক বলেই বোধ হ'ল।

“সেই দিন বৈকালে আমি আমার কঙ্কলাসনে বসে আছি—অতীত জীবনের ঈশ্বরোপলব্ধিপূত চিত্ত অতলস্পর্শী আনন্দসাগরে ডুবে গেছে। আমার গুরুদেবতা কাছে এসে মাথার উপর হাত বুলিয়ে দিলেন। তাঁর পুণ্যহস্তস্পর্শে আমি নিষ্কিয়স সমাধি অবস্থায় প্রবেশ করলুম। এই অবস্থায় আমি একাদিক্রমে সাতদিন ছিলুম। আত্মজ্ঞানের বিভিন্নস্তরের অতিক্রম করে আমি পরমসত্যের মৃত্যুহীনরাজ্যে প্রবেশলাভ করলুম। সব মায়ারবন্ধন, ভেদ-ভেদজ্ঞান দূর হয়ে গিয়ে সেই পরমাত্মার অনন্তবেদীতে আমার আত্মার পূর্ণ অভিব্যক্তি ঘটল। আট দিনের দিন সমাধিভঙ্গ হ'লে গুরুদেবকে দেখতে পেয়ে তাঁর চরণতলে গিয়ে পড়ে সকাতির অম্লবোধ করলুম যেন এই পুণ্যময় বনভূমিতেই চিরকাল তিনি আমায় তাঁর কাছে রাখেন।

“বাবাজী আমায় আলিঙ্গন ক'রে বললেন, ‘বৎস আমার, এ জনমে বাইরের এই সংসাররঙ্গমঞ্চেই তোমার অভিনয় ক'রে যেতে হ'বে। তোমার বহুজনমের নির্জ্জন সাধনার আশীর্বাদপূত হ'লেও এ জীবনে তোমার এ সংসারের মানুষদের মধ্যেই মিশতে হ'বে।’

“বিয়ে হ'য়ে গিয়ে তোমার ছোটখাট কর্তব্যের ভার না পাওয়া পর্যন্ত যে এবারে আমার সঙ্গে তোমার দেখা হয় নি, তাঁর মধ্যে একটা গভীর উদ্বেগ নিহিত ছিল। হিমালয়ে আমাদের এই ছোট্ট দলটিতে তোমার যোগদান করবার ইচ্ছা এখন পরিত্যাগ কর ; তোমার জীবনে একজন আদর্শ গৃহস্থযোগী হিসেবে জনবহুল সংসারের ভেতরেই তোমায় কাটাতে হ'বে।’

“তিনি বলে যেতে লাগলেন, ‘সংসারের বহু বিভ্রান্ত নরনারীর হতাশ ক্রন্দন বুধাই মহাজনদের কর্ণে প্রবেশ করে নি। এই রকম বহু আগ্রহশীল আর অল্পসঙ্কিৎস লোকেদের “ক্রিয়াযোগে”র দ্বারা আধ্যাত্মিক শান্তি এনে দেবার জন্তে তুমিই নির্বাচিত হ'য়েছ। লক্ষ লক্ষ লোক, যাঁরা পারিবারিক বন্ধনে আর সংসারের গুরুভারে অবনত—তোমারই মতন যাঁরা গৃহী, তাঁরা তোমাকেই দেখে মনে আবার নতুন আশা পাবে। যোগমার্গের সর্বোচ্চ

অবস্থা যে গৃহস্থের পক্ষে ছুপ্রাপ্য নয়, তা'র পথ তোমাকেই প্রদর্শন ক'রতে হ'বে। এই সংসারের ভেতরেই কোন যোগী, যদি তা'র নিজের ব্যক্তিগত কোন কামনাবাসনা বা আকর্ষণ পরিত্যাগ ক'রে তা'র কর্তব্যসকল বিশ্বস্তভাবে পালন ক'রে, তা'হলে সে জ্ঞানের পথে নিশ্চয়ই অগ্রসর হয়।

“সংসার ত্যাগ করতে বাধ্য হবার তোমার কোন প্রয়োজন নাই, কারণ অন্তরে তোমার কর্মবন্ধন সব ছিন্ন হয়ে গেছে। তুমি এ জগতের লোক না হ'লেও তবু তোমায় এর ভেতর থাকতে হ'বে। এখনও তোমার বহু বছর বাকী আছে যা'র ভেতর তোমাকে পারিবারিক, কর্মজীবনের, পৌর অথবা আধ্যাত্মিক কর্তব্যসকল বিশ্বস্তভাবে পালন ক'রতে হ'বে। সাংসারিক লোকদের গুরুত্বদয়ে একটা মধুর নূতন আশার সঞ্চার হ'বে। তোমার সুসমঞ্জস জীবনের উদাহরণ থেকে তা'রা বুঝতে পারবে যে-মুক্তি আসে অন্তরের বৈরাগ্য থেকে, বাইরের ত্যাগে নয়।

“সেই হিমালয়ের নির্জনতার মধ্যে গুরুর কথাগুলি শুনতে শুনতে বোধ হ'ল যেন আমার সংসার, আমার অফিস, এ পৃথিবী ক-ত দূরে সরে গেছে। তবুও তাঁ'র কথার মধ্যে বজ্রকঠোর সত্যের ভাব কুটে উঠল। উপায় নাই, সেই স্বর্গীয় শাস্তির আনন্দনিলয় নিত্যান্ত অনুগতভাবেই ত্যাগ করতে সম্মত হ'লুম। শিব্যকে যোগসাধনে দীক্ষাদান করবার সব প্রাচীন আর কঠিন নিয়মগুলি বাবাজী আমায় সরল উপদেশ দিয়ে বুঝিয়ে দিলেন।

“বাবাজী বললেন, ‘যা'রা উপযুক্ত, যা'রা পাবার অধিকারী হয়েছে, তা'দেরই কেবল “ক্রিয়া” দেবে। ঈশ্বরলাভের জন্তে যে সবকিছু ত্যাগ করবার দৃঢ় পণ করেছে, সে-ই কেবল ধ্যানযোগের মধ্য দিয়ে জীবনের চরমরহস্য জানতে পারে।’

“আমি কাতরনয়নে অনুনয়ন ক'রে বল্লুম, ‘গুরুমহারাজ, দেবতা আমার, এই লুপ্ত “ক্রিয়াযোগের” উদ্ধার সাধন ক'রে আপনি মানবজাতির যে কি অশেষ কল্যাণসাধন ক'রলেন তা' আর বলা যায় না; কিন্তু আপনি যে ভাবে দীক্ষাদানের কথা ব'লছেন, তা'তে ক'রে ত' সাধারণলোকের “ক্রিয়া” পাওয়াই দুর্ঘট হয়ে উঠবে। “ক্রিয়া” নেবার সময় নিয়মকানুন গুলো একটু শিথিল ক'রে দিলে হয় না কি? তা'তে ক'রে কতলোকের যে “ক্রিয়া” পেয়ে উপকার হবে তা' আর কি বলব! তা'ই আমার প্রার্থনা এই

যে, সবাই যা'রা “ক্রিয়া” নিতে ইচ্ছুক—এমন কি তা'রা প্রথমে অন্তরে পরিপূর্ণ বৈরাগ্য আনবার প্রতিজ্ঞা না ক'রতে পারলেও তা'দের “ক্রিয়া” দেবার জন্তে আমার যেন অনুমতি দেন। ক্রিপাতাপে তাপিত,* দুঃখযন্ত্রণাক্লিষ্ট এই সংসারের নরনারী, তা'দের ত' একটা বিশেষ স্বেযোগ দরকার আর “ক্রিয়াযোগ” যদি তা'দের কাছ থেকে দূরেই সরিয়ে রাখা হয় এবং সহজে যদি তা'রা এ না পায়, তা' হ'লে ত' তা'দের মুক্তির পথে এগোবার কোন চেষ্টাই হ'বে না।'

“তবে তাই হোক। দেখছি যে ভগবানের ইচ্ছা তোমার মুখ দিয়েই প্রকাশ পেল। যে কেউই আগ্রহের সঙ্গে “ক্রিয়া” নিতে আসবে, অবশ্যে তা'দের সবাইকেই “ক্রিয়া” দিয়ে দিও।' এই ক'টি সোজা কথা ব'লেই সেই পরমদয়াল গুরুজি যে সব কঠিন বাধাবন্ধের দরুণ “ক্রিয়াযোগ” এতদিন সংসারের চোখের আড়ালে লুকোন ছিল, তা' সব একেবারে দূর ক'রে দিলেন।

“খানিক নীরব থেকে বাবাজী আবার বললেন, ‘তোমার প্রত্যেক শিষ্যের কাছে ভগবদগীতার এই অমর শ্লোকটি উদ্ধৃত ক'রে শোনাবে, “স্বল্পমশ্রু ধর্মশ্রু ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ”,†—অর্থাৎ এ ধর্মের অতি অল্পমাত্র অনুশীলনেও তোমার ভয় থেকে পরিত্রাণ হ'বে।’

“তা'র পরদিন সকালবেলা বিদায় নেবার সময়, গুরুদেবের চরণপ্রান্তে নতজাহ্নু হয়ে প্রণাম ক'রতে, তাঁকে ছেড়ে যেতে যে আমার একান্ত অনিচ্ছা তা' বুঝতে পেরে সম্মুখে তিনি আমার কাঁধের উপর একখানি হাত রেখে বললেন, ‘প্রিয় বৎস, আমাদের মধ্যে কখনও কোন বিচ্ছেদ নাই জেনো! যেখানেই তুমি থাক না কেন, আর যখনই তুমি আমায় ডাক না কেন, আমি তৎক্ষণাৎ তোমার কাছে গিয়ে উপস্থিত হ'ব।’ ‡

* আধিতৈতিক, আধিদৈবিক ও আধ্যাত্মিক, যথাক্রমে ব্যাধি, মানসিক অসম্পূর্ণতা এবং অবিদ্যা না অজ্ঞানরূপে প্রকাশিত।

† শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা—২য় অধ্যায়, ৪০ শ্লোক।

‡ গুরুর আশীর্বাদেব মহিমার উচ্ছ্বাসিত প্রশংসায় শঙ্করাচার্যাদেব বলেন, “ত্রিভুবনে প্রকৃত সদগুরুর কোন তুলনা খুঁজে পাওয়া যায় না। স্পর্শমণি যদি সত্যিই আছে ব'লে ধ'রে নেওয়া যায়, তা' হ'লে সে কেবল লোহাকেই সোনার পরিণত ক'রতে পারে—কিন্তু সে তা'কে আর একটা পরশপাথরে পরিণত করতে পারে না। পরমপূজ্য সদগুরু কিন্তু যে শিষ্য তাঁর চরণে আশ্রয় নেয় তাঁকে নিজেরই মতন সমান ক'রে তোলেন। সদগুরু তা'ই তুলনাবিহীন—না তিনি একেবারে অনির্কলনীয়

“তা’র এই অদ্ভুত প্রতিজ্ঞার আশ্রয় আর নবলব্ধ ভগবৎজ্ঞানের স্বর্ণ-
খনির সন্ধানলাভে আনন্দে উৎকল হয়ে ধীরে ধীরে পাহাড় থেকে নেমে
এলুম। অফিসে যেতে সহকর্মীরা সব হৈ হৈ ক’রে উঠল—দশ দিন ধ’রে
দেখা নাই, কোথায় গেল, কি ক’রলে, হিমালয়ের জঙ্গলে নিশ্চয়ই পথ
হারিয়েছি, এই সব ত’ তা’রা ভেবেই থন। যা’ই হো’ক, আমাকে ফিরতে দেখে
তা’রা আনন্দে উৎকল হ’য়ে উঠল। তা’রপর শীগ’গিরই হেড্ আফিস থেকে
একটি চিঠি এল। চিঠিতে লেখা ছিল, ‘লাহিড়ী দানাপুরের অফিসে ফিরে
আসবে। তা’র রাণীক্ষেতে বদলী হওয়া ভুলক্রমে হয়ে গিয়েছিল। আর
একজন লোককে রাণীক্ষেতের কাষের ভার নিতে পাঠান উচিত ছিল।’

“যা’ক, সব দেখে শুনে ত’ মনে মনে খানিকটা হাসলুম এই ভেবে যে
কি ধরনের ঘটনার উন্টাতোত আমাকে ভারতবর্ষের এই হৃদয়তম প্রদেশে
টেনে এনে ফেলেছে।

“দানাপুরে ফেরবার আগে মোরাদাবাদে আমি একটি বাঙ্গালী পরিবারে
দিনকতক ছিলাম। জনছয়েক বন্ধু মিলে একদিন গল্পগুজন চলছে,
কথাবার্তার মোড় ফিরল যখন আধ্যাত্মিক বিষয়ের দিকে, তখন আমাদের
গৃহস্বামীটি বিরসবদনে বললেন, ‘আর ব’লেন কেন, ভারতে আর আজকাল
তেননগোছের কোন সাধুসন্ন্যাসী নেই।’

“আমি সঙ্গেসঙ্গে তীব্র প্রতিবাদ ক’রে বললুম, ‘বাবু ম’শায়, আপনি
ব’লেন কি? এখনও ভারতভূমিতে খুব বড় বড় যোগীঋষিরা আছেন বই
কি।’ ব’লে উৎসাহের আতিশয্যে আমার হিমালয়ের অদ্ভুত অভিজ্ঞতার
কাহিনী তাঁ’দের সামনে বিবৃত করলুম। সেই ক্ষুদ্রদলটি কিন্তু তখন কোন
কিছু বিশ্বাস না ক’রেই চুপ ক’রে বসে রইল।

শঙ্করাচার্যের বহু শিষ্য ছিল—তা’র মধ্যে ব্রহ্মসূত্রের টিকাকার সনন্দন অশ্বত্থাম। মূল
শিষ্যখানি অগ্নিদগ্ধ হয়ে নষ্ট হয়ে যায়,—কিন্তু শঙ্করাচার্য (যিনি একবার মাত্র পাতাগুলির মধ্যে
নষ্ট বাক্য গিয়েছিলেন) তাঁ’র শিষ্যের কাছে বইয়ের প্রত্যেক পংক্তিই শব্দের পর শব্দ আবৃত্তি
কর গিয়েছিলেন। পঞ্চপদিকা নামে পুস্তকখানি আজ অবধি বিদ্বজ্জন কর্তৃক সযত্নে অধীত হয়।

শিষ্য সনন্দন একটি চমৎকার ব্যাপারের পর একটি নূতন নাম পেয়েছিলেন। সনন্দন একদিন নদী
উপর উপবিষ্ট, শুনেতে পেলেন গুরুদেব শঙ্করাচার্য নদীর অপর পার হ’তে তাঁকে ডাকছেন। ডাক
হ’লেই সনন্দন জলে ঝাঁপ দিয়ে পড়লেন। সর্বব্যাপী গুরুদেব শঙ্করাচার্য তাঁ’র বিশ্বাস আর ভক্তি
ক’রে রাখবার জন্য এবং নদীর উপর দিয়ে পদব্রজে গমনের জন্য সেই ফোনোডেল নদীর জলরাশির
উপর কুবলয়শ্রোণীর সৃষ্টি করলেন আর তাঁ’র উপর দিয়ে হেঁটে গিয়ে সনন্দন গুরুর নিকট উপস্থিত
হ’লেন। পরের উপর পাদবিক্ষেপে গমন করাতে সনন্দনের নূতন নামকরণ হ’ল—পদ্মপাদ।

“একটি লোক তা’র ভেতর থেকে একটু সাস্থনার স্বরে বললেন, ‘লাহিড়ি, হিমালয়ের উঁচু পাহাড়ে চড়ে তোমার মাথা একেবারে গুলিয়ে গেছে! এ যা’ বর্ণনা করলে, তা’ সব দিবাস্বপ্নের মত আর কি!’ সত্যভাগ্যের উৎসাহে প্রদীপ্ত হয়ে আমি অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না ক’রেই ব’লে ফেললুম, ‘দেখুন, আমি যদি এখন ডাকি, তা’হ’লে আমার গুরু এই বাড়ীতে এখনই এসে উপস্থিত হ’বেন।’

“শুনে ত’ সকলের চক্ষু উৎসাহে প্রদীপ্ত হয়ে উঠল। আর এরকম অলৌকিক উপায়ে কোন যোগীকে আবিভূত হ’তে দেখবার জন্মে নে দলের সকলেরই আগ্রহ হ’বে, সেটা বিশেষ কিছু আশ্চর্য্যের বিষয় ছিল না। যাই হোক কতকটা অনিচ্ছাসত্ত্বেও আমি একটি নির্জজন ঘর আর খানদুই নূতন কব্জল আসন চাইলুম।

“ঘরে প্রবেশ ক’রে আসনাদি যথাস্থানে সংস্থাপন ক’রে আমি তা’দের বললুম, ‘যোগিবর শূন্য হ’তেই আবিভূত হ’বেন। তিনি এলেই আমি আপনাদের ডাকব। এখন আপনারা দরজার বাইরে একটু অপেক্ষা করুন, কোন গোলমাল যেন না হয়!’ ব’লে দরজা বন্ধ ক’রে দিলুম।

“তা’রপর ধ্যানে বসলুম, ব’সে সকাতির গুরুদেবের সাক্ষাৎ প্রার্থনা করতে লাগলুম। সেই অন্ধকার ঘর শীগ’গিরই একটা স্নিগ্ধ মৃদু চন্দ্রালোকের ছটায় উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। তা’র ভেতর থেকে বাবাজীর জ্যোতির্ময় মূর্তি বেরিয়ে এল।

“‘লাহিড়ি! তুমি একটা অতি তুচ্ছ কারণে আমায় ডাকলে’ বাবাজীর দৃষ্টি কঠিন। ‘এ ধর্ম্মের সত্য কেবল তা’দেরই জন্মে, মনেপ্রাণে যাদের আগ্রহ আছে, কারুর অলস কৌতুহলপরিতৃপ্তির জন্মে নয়। দেখলে অবিশ্রি বিশ্বাস করা সহজ হয়—তখন আর অস্বীকার করার কিছুই থাকে না। যা’রা তা’দের স্বাভাবিক জড়বাদী সন্দেহভাব হ’তে মুক্ত হ’তে পেরেছে তা’রাই কেবল এই অতীন্দ্রিয় সত্য আবিষ্কার করতে পারে আর তা’ পাবার উপযুক্ত!’ তা’রপর অত্যন্ত গম্ভীরভাবে বললেন, ‘আমায় যেতে দাও!’

“আমি তাঁ’র চরণতলে পড়ে মিনতি ক’রে বললুম, ‘পূজ্যপাদ গুরুদেব, আমার গুরুতর ভুল এখন আমি বুঝতে পাচ্ছি, অতি দীনভাবে আমি

আপনার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি। আধ্যাত্মিক বিষয়ে অন্ধ এই সব লোকে-
দের মনের ভিতর বিশ্বাসসৃষ্টির উদ্দেশ্য নিয়েই আমি আপনাকে ডাকতে সাহসী
হয়েছিলুম। যখন আপনি আমার প্রার্থনা মঞ্জুর করে দয়া করে এসে
উপস্থিত হইয়েছেন, তখন আর আমার বন্ধুদের আশীর্বাদ না করে যেন চলে
যাবেন না। অবিশ্বাসী তা'রা সত্যি বলে, কিছু তা'রা ত' অন্ততঃ আমার
মৃত উক্তির সত্যতার বিষয়ে অনুসন্ধান করতেই ইচ্ছুক হয়েছিল।”

“আচ্ছা বেশ, থাকব কিছুক্ষণ; অবিশ্বাসি আমিও ইচ্ছে করিনে যে তোমার
বন্ধুদের সামনে তোমার কথা খেলো হ'য়ে যায়।’ বাবাজীর অনন্য শাস্ত
কোমল হ'য়ে এল। তা'রপর তিনি স্নিগ্ধমধুর স্বরে বললেন, ‘বাবা, এখন
থেকে কেবল তোমার সত্যি সত্যিই দরকার পড়লে তবে ডাকলে আসব, সব
সময়েই ডাকলে আর আসব না।’

“দরজা যখন খুললুম, একটা প্রগাঢ় নিস্তরঙ্গতা সেই ক্ষুদ্র দলটির ভিতর
বিরাজ করছিল। বন্ধুবর্গ, যেন তা'দের চোখকানকে অবিশ্বাস করে সেই
কহলাসনের উপর উপবিষ্ট জ্যোতির্ময় মূর্তির দিকে ফাল্ ফাল্ করে
চোরেই রইল।

“একটা লোক হো হো করে হেসে উঠে বললে, ‘এ হচ্ছে সকলকে
একসঙ্গে সন্মোহিত করা, এ ছাড়া আর কিছু নয়! আর তা' ছাড়া
আমাদের অজান্তে কোন লোকের এ ঘবে ঢোকাই বা সম্ভব হ'বে
কি করে?’

“বাবাজী একটু মুহূর্তে হেসে এগিয়ে গিয়ে প্রত্যেককেই তাঁ'র শরীরের উষ্ণ
দৃঢ়মাংস স্পর্শ করতে ইঙ্গিত করলেন। একে একে সকলের সন্দেহভঞ্জন
হ'বার পর সকলেই ভীত ও অনুতপ্তচিত্তে বাবাজীর সম্মুখে মেঝের উপর ভূমিষ্ঠ
হয়ে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করলে।

“বাবাজী তখন বললেন, ‘খানিকটা হালুয়া তৈরী করে আন দেখি, এস
সবাই মিলে খাওয়া যাক, কি বল?’ আমি বৃদ্ধ পায়ের উপর দিয়ে তাঁ'র শরীরে
অনির্ভাবের সত্যতার আরও প্রমাণপ্রদর্শনের জন্ত তিনি এই অনুরোধ

আত্মোপলব্ধির পথে এমন কি ঈশ্বরোপলব্ধি লাহিড়ী মহাশয়ের মত গুরুবাও উৎসাহের আতিশয্য
প্রদর্শন করেন এবং তা' সংঘত করারও প্রয়োজন হয়ে পড়ে। ভগবদগীতায় ভক্তশ্রেষ্ঠ অর্জুনকেও
উপবাসনাক্রমে শ্রীকৃষ্ণ এজন্য তিরস্কার করেছিলেন, তা' গীতায় বহু পংক্তির মধ্যে দেখতে পাওয়া যায়।

ক'রলেন। হালুয়া তৈরী হ'তে লাগল, এখানে গুরুদেবও অতি মধুরভাবে তাঁদের সঙ্গে নানাবিধ আলাপ ক'রতে লাগলেন। (সন্দিগ্ধ টমাসদের ভক্তশ্রেষ্ঠ সেন্টপলে বিরাট পরিবর্তন সাধিত হ'ল।) রত্নাকর হ'ল বাল্মীকি, জগাইমাধাইএর দলের তখন হ'ল উদ্ধারসাধন। খাওয়াদাওয়া হ'য়ে যা'বার পর বাবাজী একে একে প্রত্যেককেই আশীর্বাদ ক'রলেন—তা'রপর হঠাৎ একটা বিদ্যাবলকের মতন জ্যোতির স্ফুরণ! আমরা দেখলুম, বাবাজীর পাঞ্চভৌতিক দেহের মূল উপাদানের অণুপরমাণুগুলি তৎক্ষণাৎ ছিন্নবিচ্ছিন্ন হয়ে শূন্যবিসারী আলোকবাম্পে পরিণত হ'ল। গুরুদেবের ঈশ্বরানুপ্রাণিত প্রবল ইচ্ছাশক্তি এখন তাঁর শরীররূপে ধৃত অণুপরমাণুগুলির সংহতি রূপ ক'রে দিলে, সঙ্গে সঙ্গে কোটিকোটি প্রাণকণিকাফুলিঙ্গ সেই অনন্ত আধারে মিলিয়ে গেল।

“সেই দলের ভিতরের মৈত্র মহাশয়* নামে এক ভদ্রলোক অত্যন্ত গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গেই আমায় একবার বলেছিলেন, ‘আমি নিজের চোখে সেই মৃত্যুঞ্জয়ী মহাগুরুকে দেখেছি। শিশুরা সাবানের ফানুস নিয়ে যেমন খেলে ওড়ায়, আমাদের মহাগুরুও তেমনি দিক ও কাল নিয়ে খেলে গেলেন। এই গুরুর হাতেই একসঙ্গে স্বর্গ ও মর্ত্যের চাবিকাঠি রয়েছে।’ বলতে বলতে নবলব্ধ জ্ঞানের আনন্দালোকে তাঁর মুখমণ্ডল উদ্ভাসিত হয়ে উঠল।

“শীগ'গিরই দানাপুরে ফিরলুম। পরমাত্মায় মন দৃঢ় সংলগ্ন ক'রে আবার নানারকম কায আর গৃহস্থের সাংসারিক কর্তব্যভার সব হাতে তুলে নিলুম।”

বাবাজী প্রতিজ্ঞা করেছিলেন, “তোমার যখনই আমায় দরকার হ'বে, তখনই আবার আমি আসব।” যে অবস্থায় প'ড়ে বাবাজীর সঙ্গে লাহিড়ী মহাশয়ের আর একবার সাক্ষাৎ হয়েছিল, তা'র বিবরণ তিনি স্বামী কেবলানন্দ আর শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজিকে ব'লেছিলেন।

* মৈত্র মহাশয় বলে যে লোকটির কথা লাহিড়ী মহাশয় এখানে উল্লেখ করছেন: পরে তাঁর পু' উচ্চ আধ্যাত্মিক অবস্থা লাভ হয়েছিল। আমার কলেজে প্রবেশ করবার অল্প কিছুকাল পরেই মৈত্র মহাশয়ের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎলাভ হয়; কাশীর মহানগর আগ্রামে আমি যখন ছিলাম, তখন তিনি আগ্রামগিরিদর্শনের জন্য সেখানে যান। সে সময় তিনি আমায় মোরাদাবাদের সেই দলটির সামনে বাবাজীর সশরীরে আবির্ভাবের কথা উল্লেখ ক'রে বলেন, “এই অলৌকিকবাপার সন্দর্শনের পর হ'তেই আমি লাহিড়ী মহাশয়ের আজীবন শিষ্য হয়েছিলাম।”

লাহিড়ী মহাশয় তাঁ'র শিষ্যদের কাছে নিম্নলিখিত ঘটনাটি বিবৃত ক'রেন, “দৃশ্যটা হচ্ছে প্রয়াগে কুস্তমেলা। আফিসের কাষ থেকে অল্প কিছুদিনের ভ্রম্ভে ছুটি নিয়ে সেখানে গেছি। কুস্তমেলায় যোগদানের জন্ত বহুদূর-দূরান্তর হ'তে আগত সহস্র সহস্র সাধুসন্ন্যাসীদের সমাগম হয়েছে, সেখানে তাঁ'দের মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছি,—ভিক্ষাপাত্র হাতে একটি ভিক্ষমাথা সন্ন্যাসীর প্রতি দৃষ্টি পড়ল। মনে হ'ল যেন লোকটা ভণ্ড, বাইরে ত্যাগের বড়াই—মনে কিন্তু তা'র বৈরাগ্যের ছিটেকোঁটাও নাই।

“যা'ক, সাধুটিকে ছাড়িয়ে যেই এগিয়েছি, অমনি বাবাজীর উপর দৃষ্টি পড়ল। দেখে আশ্চর্য্য হয়ে গেলুম যে, তিনি একটি জটাজুটধারী সন্ন্যাসীর সামনে হাঁটু গেড়ে বসে আছেন—অবাক কাণ্ড।

“তাড়াতাড়ি তাঁ'র কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলুম, ‘গুরুজি, একি, এখানে কি করছেন ম'শায়?’

“বাবাজী শিশুর মতন সরল হেসে বল্লেন, ‘আমি এই সন্ন্যাসীটির পা ধুইয়ে দিছি, তা'রপর এ'র উচ্ছিষ্ট বাসন মেজে দে'ব।’ তখন আমি বুঝতে পারলুম যে তিনি আমার এই শিক্ষা দিতে চাইছেন যে আমি যেন কারুর কোন সমালোচনা না করি আর উচ্চনীচ সকলকার দেহমন্দিরেই যে ভগবান সমভাবে অধিষ্ঠান করছেন সেইটাই যেন আমি মনে রাখি। মহাগুরু তা'রপর বল্লেন, ‘জ্ঞানী অজ্ঞানী এই দু'রকম সাধুদেরই সেবা ক'রে আমি সকল ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠ, ভগবানের কাছে যা' সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়, তা'ই শিক্ষা করছি—নম্রতা আর বিনয়।’

৩৫শ পরিচ্ছেদ

লাহিড়ী মহাশয়ের পুণ্যময় জীবন

“এইরূপে আমাদের সকল সদাচরণ পালন করা উচিত।” জন দি ব্যাপ্টিষ্টকে এই কথাগুলি বলে আর জনকে তাঁকে দীক্ষিত করতে বান্ধে যীশু তাঁর গুরুর দৈবঅধিকার স্বীকার করছিলেন।

প্রাচ্যের দৃষ্টিতে* বাইবেলের শ্রদ্ধাসহকারে পাঠ আর অন্তরের অনুভূতিতে আমার এ বিশ্বাস হয়েছে যে অতীতজীবনে জন দি ব্যাপ্টিষ্ট যীশুখৃষ্টের মহান্‌গুরু ছিলেন। বাইবেলে এমন কতকগুলি পংক্তি আছে যাতে ক’রে বোঝা যায় যে, জন আর যীশুখৃষ্ট তাঁদের গতজন্মে যথাক্রমে ইলাইজা আর তাঁর শিষ্য এলিশা বলে পরিচিত ছিলেন। (এইগুলি ওল্ড টেষ্টামেন্টের বানান্‌। গ্রীক অনুবাদকেরা বানান্‌ করেছিলেন এলিয়াস্ আর এলিসিয়ুস্; নিউ টেষ্টামেন্টে তাঁরা এইরূপ পরিবর্তিত আকারেই পুনরায় স্থান পেয়েছেন।)

ওল্ড টেষ্টামেন্টের শেষ অংশটাই হচ্ছে ইলাইজা আর এলিশার পুনর্জন্মের ভবিষ্যদ্বাণী। “দেখো, আমি প্রভুর সেই ভয়ঙ্কর দিন আসবার পূর্বেই ঈশ্বর প্রেরিত মহাপুরুষ ইলাইজাকে তোমার কাছে পাঠাব।” তা’ই জন (ইলাইজা) “সেই দিন……আসবার পূর্বেই” প্রেরিত হ’য়ে খৃষ্টের অগ্রদূত হিসেবে কিছু আগেই জন্মগ্রহণ করেছিলেন। পিতা জ্যাকেরিয়াসের কাছে একটি দেবদূত আবির্ভূত হ’য়ে প্রমাণ দিয়ে গেলেন যে তাঁর ভাবীপুত্র ‘জন’, ইলাইজা (এলিয়াস্) ছাড়া আর কেউ ন’ন।

* বাইবেলের বহু পংক্তিতে দেখা যায় যে পুনর্জন্মবাদ অবগত আর স্বীকৃতও হয়েছে। প্রত্যেক প্রচলিত যে অনুমান যাতে ক’রে যে একটা কিছু (আত্মবোধ) তা’ শূন্য থেকেই এসেছে অর্থাৎ তার উৎপত্তির কোনই কারণ নেই, আর তা’ ত্রিশ অথবা নব্বই বৎসর ভোগবাসনার তারতম্যাদেশে বিভিন্ন অবস্থায় থেকে আবার সেই আদি শূন্যাবস্থাতেই ফিরে যায়—এ ধারণার চেয়ে পুনর্জন্মবাদ হচ্ছে মানবজাতির বিবর্তনের বিভিন্ন অবস্থার অধিকতর যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যা। এরূপ শূন্যাবস্থার অজ্ঞেয় প্রকৃতি রহস্যময় বলে মধ্যযুগের দার্শনিক ও পণ্ডিতদের মনে একটা উল্লাসের ভাব জ্ঞান।

“কিন্তু সেই দেবদূত তাঁকে বললেন,—ভয় পেয়ো না জ্যাকেরিয়াস, কারণ তোমার প্রার্থনা শ্রুত হয়েছে ; তোমার স্ত্রী এলিসাবেথের একটি পুত্রসন্তান হবে, আর তুমি তাঁর নাম রাখবে ‘জন’। আর ইস্রায়েলসন্তানদের মধ্যে অনেককে তাঁদের ঈশ্বর যীশুখৃষ্টের কাছে ফিরিয়ে নিয়ে যাবে। আর সে এলিয়াসের আত্মা ও শক্তির বলে প্রভুর আগে যাবে, পিতাদের হৃদয় সন্তানদের দিকে, এবং অবাধ্যদের ধর্মশীলের ত্রায়ণিষ্ঠার দিকে ফিরাতে, আর প্রভুর ভ্রাতা দেশের লোকেদের তৈরী করতে।’

যীশুখৃষ্ট দুইবার স্পষ্টবাক্যে ইলাইজা (এলিয়াস) কে ‘জন’ বলে নির্দেশ করে গেছেন। “এলিয়াসের ইতিমধ্যে আগমন ঘটেছে—কেউ তাঁকে জানে না ... তা’রপর শিষ্যেরা বুঝতে পারলেন যে জন দি ব্যাপ্টিষ্টের কথাই তিনি তাঁদের বলেছিলেন।”

পুনরায় যীশুখৃষ্ট বলছেন, “কারণ ‘জন’ পর্যন্ত সমস্ত ভবিষ্যদ্বক্তা আর বিধি-নিয়মের ভবিষ্যদ্বাণী হয়েছে। আর তোমরা যদি গ্রহণ করতে সম্মত হও, তা’হলে জেনো যে যাঁর আগমন হ’বে তিনিই এই ব্যক্তি—এলিয়াস।”

জন যখন অস্বীকার করলেন যে তিনি এলিয়াস (ইলাইজা) ন’ন, তখন তিনি এই বোঝাতে চেয়েছিলেন যে জনের ক্ষুদ্রবেশে তিনি আর মহাগুরু ইলাইজার বাহ্যমহিমা নিয়ে আসেন নি। পূর্বজন্মে তিনি তাঁর মহিমা আর আধ্যাত্মিকসম্পদের “প্রাবরণ” তাঁর শিষ্য এলিশাকে দিয়েছিলেন। “আর এলিশা বললেন, আমি আপনার কাছে এই প্রার্থনা করি যে আপনার আত্মার দুইটি অংশ আমাতে আসুক ; তা’রপর তিনি বললেন, তুমি বড় কঠিন জিনিস চেয়েছ ; যাই হোক, তোমার কাছ থেকে আমার নিয়ে যাবার সময় যদি তুমি আমার দেখ তা’হলে তোমার এই রকমই হ’বে...তা’রপর ইলাইজাপরিত্যক্ত “প্রাবরণ” তিনি তুলে নিলেন ... ইলাইজার আত্মাই এলিশাতে অবস্থান করছে।”

এইবার তাঁদের ভূমিকা পরিবর্তিত হয়ে গেল, কারণ এলিশা-যীশুর এখন পূর্ণজ্ঞান লাভ হওয়াতে আর ইলাইজা-জনের তাঁর প্রকাশ্য গুরু হ’বার কোন প্রয়োজন রইল না।

পর্যন্তের উপর খৃষ্টের রূপান্তরসাধনের সময় মূসার সঙ্গে তাঁর গুরু এলিয়াসকে তিনি দেখেছিলেন। আবার ক্রুশের উপর তাঁর অন্তিমসময়ে

বীশু ঈশ্বরের নাম এই ব'লে চিংকার ক'রে উঠেছিলেন, “এলী, এলী, আমার ঈশ্বর, আমার ঈশ্বর, আমার পরিত্যাগ ক'রলেন কেন? ...বা'রা কাছে দাঁড়িয়েছিল তা'দের মধ্যে জনকতক তা' শুনে বল্লে, এই ব্যক্তি এলিয়ামকে ডাক্ছে, দেখা যাক্, এলিয়াস ওকে বাঁচাতে আসে কিনা।”

জন আর বীশুখ'ষ্টের মধ্যে গুরুশিষ্যের যে চিবস্তন সম্বন্ধ ছিল, তা' বাবাজী আর লাহিড়ী মহাশয়ের মধ্যেও ছিল। তাঁ'র শিষ্যের দুইটি অতীতজীবনের মধ্যকার বিশৃতিসাগরের আবর্ত অতিক্রম ক'রে মেহব্যাকুল হৃদয়ে তিনি প্রথমে শিশু পরে পূর্ণবয়স্ক লাহিড়ী মহাশয়ের জীবনের গতি ক্রমে ক্রমে নিয়ন্ত্রিত করেছিলেন। শিষ্যের তেত্রিশ বছর বয়স না পাওয়া পর্যন্ত বাবাজী সেই অচ্ছেদ্যবন্ধনের প্রকাশে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করার উপযুক্ত সময় হয়েছে ব'লে বিবেচনা করেন নি। তা'রপর রাণীক্ষেতে তাঁ'দের সেই স্বল্পকালের ভ্রম সাক্ষাতের পর সেই নিঃস্বার্থ মহাপুরু তাঁ'র প্রাণাপেক্ষা প্রিয় শিষ্যকে পরিত্যক্ত সেই ক্ষুদ্র শিষ্যদল হ'তে নির্বাসিত ক'রে বাইরের সংসারের কাষে পাঠিয়ে দিলেন এই ব'লে যে, “বাবা, যখনই তোমার দরকার হ'বে আমি তোমার কাছে এসে হাজির হ'ব।” কোন্ প্রেমিকমানব এমন অসীম প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ হ'তে পারে?

লোকসমাজে সাধারণভাবে অপরিচিত থাকলেও কাশীর এক অখ্যাত ক্ষুদ্র পল্লীকোণ হ'তে এক বিরাট আধ্যাত্মিক জাগরণ সাধিত হ'তে লাগল। কুলের সৌরভ যেমন চেপে রাখা যায় না, তেমনি অত্যন্ত সঙ্কোপনে একটি আদর্শগৃহী হিসেবে বাস ক'রেও লাহিড়ী মহাশয় তাঁ'র অন্তরগৌরব চেপে বাধতে পারেন নি। ধীরে ধীরে ভারতের সর্বত্র হ'তে ভক্তমধুকরবৃন্দ সেই জীবন্ত মহাপুরুষের উপদেশমকরন্দ পানের লোভে তাঁ'র চারপাশে এসে জুটতে লাগলেন।

অকিসের সাহেব সুপারিন্টেণ্ডেণ্টই সর্বপ্রথম লক্ষ্য করেন যে তাঁ'র এই কর্মচারীটির একটা অতীন্দ্রিয় পরিবর্তন সাধিত হয়েছে, তা'ই তাঁ'কে আদর ক'রে “ব্রহ্মানন্দ বাবু” ব'লে ডাকতে আরম্ভ করলেন।

একদিন সকালে এসে লাহিড়ী মহাশয় তাঁ'র সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট সাহেবকে জিজ্ঞাসা করলেন, “সার, আপনাকে বড় বিনম্র দেখাচ্ছে। ব্যাপার কি বলুন ত'?”

সাহেব তখন বল্লেন, “বিলেতে আমার জী সাংঘাতিক পীড়িতা— মরণাপন্ন অবস্থা। দারুণ উদ্বেগ আর আশঙ্কায় আমি পাগল হয়ে গেছি।”

“আচ্ছা, তাঁর সহকে আমি এখনিই খবর এনে দিচ্ছি!” ব’লে লাহিড়ী মহাশয় ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়ে একটি নির্জন স্থানে কিছুক্ষণ চুপ ক’রে বসে রইলেন। তা’রপর উঠে এসে হাস্তে হাস্তে বল্লেন, “ভয় নেই, আপনার জী সেরে উঠছেন। তিনি আপনাকে এখন একটি চিঠি লিখছেন।” ব’লে সেই সর্বদর্শী যোগিবর সেই পত্রের কতকাংশ উদ্ধৃত ক’রে শোনাগেলেন।

“ব্রহ্মানন্দ বাবু, আমি জানি যে আপনি কোন সাধারণ মানুষ ন’ন। কিন্তু তবুও আমি এখনও বিশ্বাস করতে পারছি না যে আপনি ইচ্ছামাত্র সময় আর দূরত্বের বাধা এমন করে অতিক্রম করতে পারেন।”

তাঁর জীর লেখা সেই চিঠিখানি শেষ পর্যন্ত এসে হাজির হ’ল। বিশ্বয়ে শুদ্ধিত হয়ে সুপারিণ্টেণ্ডেন্টপ্রভু দেখলেন যে, পত্রে যে শুধু তাঁর জীর আরোগ্যলাভের সুসংবাদ আছে তা’ই নয়, লাহিড়ী মহাশয় হস্তাকতক আগে যে সব কথাগুলি চিঠি থেকে উদ্ধৃত ক’রে শুনিরেছিলেন, সে সব কথাগুলোও হুবহু তা’তে লেখা আছে!

মাসকতক পরে তাঁর জী ভারতবর্ষে এলেন। আফিসে বেড়াতে এসে দেখলেন যে লাহিড়ী মহাশয় তাঁর ডেস্কে ব’সে নীরবে কায করছেন। ভদ্র-মহিলা অত্যন্ত শ্রদ্ধাযুক্তহৃদয়ে তাঁর কাছে অগ্রসর হয়ে এসে বল্লেন, “মহাশয়, লগুনে আমার রোগশয্যার পাশে স্বর্গীয় আলোর ছটায় যেরা আপনারই এই মূর্তি আমি মাস কতক আগে দেখেছিলুম। সেই মুহূর্তেই আমার রোগ একেবারে সম্পূর্ণভাবে আরাম হয়ে গেল। তা’রপরে আমি অতি শীঘ্রই ভারতবর্ষের পথে এই সুদীর্ঘ সমুদ্রযাত্রায় বেরিয়ে পড়তে সমর্থ হলাম; পথে আমার কিছুমাত্র কষ্ট হয় নি।”

দিনের পর দিন একটি ছ’টি ক’রে ক্রিয়াযোগে দীক্ষাপ্রার্থী ভক্তেরা সব আস্তে লাগলেন। তাঁর এই সব আধ্যাত্মিক, সাংসারিক আর কর্মস্থলের কর্তব্যসম্পাদন ছাড়াও তিনি শিক্ষাবিনয়ে বিশেষ উৎসাহ ও আগ্রহ প্রকাশ করতেন। তিনি বহু পাঠচক্র সৃষ্টি করেছিলেন, তা’ ছাড়া কাশীর বাঙ্গালী-টোলা অঞ্চলে একটি বৃহৎ উচ্চবিদ্যালয় স্থাপনেও তিনি সক্রিয় অংশ গ্রহণ

করেন। “গীতাসম্মিলনী” ব’লে তাঁ’র একটি নিরমিত শাস্ত্রালোচনার ব্যবস্থাও ছিল। বহু ধর্মপিপাসু ব্যক্তি তা’তে সাগ্রহে যোগদান করতেন।

সংসারীলোকে যে বলে, “রোজগার আর সংসারের কায়কর্ম করবার পর ধর্মচর্চা করবার আর সময় থাকে কোথায়?” লাহিড়ী মহাশয় এই সব বিভিন্ন কর্মপ্রচেষ্টার দ্বারা তাঁ’র উত্তর জনসাধারণের সম্মুখে দিতে চেয়েছিলেন। এই শ্রেষ্ঠ গৃহস্থগুরুর সুসমঞ্জস জীবন সহস্র সহস্র সন্ধিক্ষণনাদের ভিতর নীরব অল্পপ্রেরণা এনে দিত। অল্পবেতন উপার্জন ক’রে মিতব্যয়ী, অনাড়ম্বর আর সকলের পক্ষে সহজলভ্য হয়ে, গুরুদেব অত্যন্ত সহজ আর স্বাভাবিকভাবে এবং সুখেতেই সংসারযাত্রা নির্বাহ করতেন।

পরমায়ার সঙ্গে একীভূত হয়েও লাহিড়ী মহাশয় জ্ঞানীমূর্খনির্কিঞ্চেদে সকলকেই যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শন করতেন। তাঁ’র ভক্তেরা তাঁ’কে প্রণাম ক’রলে তা’দেরও তিনি প্রতিমসঙ্গার করতেন। শিশুহুলভ সরলতার মধ্যে লাহিড়ী মহাশয় প্রায়ই অপরের পাদস্পর্শও করতেন, কিন্তু কদাচিৎ তিনি অপরকে ঐরূপভাবে তাঁ’কে প্রণাম ক’রতে দিতেন।

লাহিড়ী মহাশয়ের জীবনের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিষয় হচ্ছে তাঁ’র সকল ধর্মাবলম্বীদেরই ক্রিয়াযোগে দীক্ষাদান। কেবলমাত্র যে হিন্দু তা’ই নয়, মুসলমান বা খৃষ্টধর্মাবলম্বীরাও তাঁ’র প্রধান শিষ্যদের মধ্যে অনেকেই ছিলেন। দ্বৈত বা অদ্বৈতবাদী বা সকল ধর্মমতের অথবা সুপ্রতিষ্ঠিত কোন বিশেষ ধর্মমতের নয়, এমন বহু লোকেদেরও বিশ্বগুরু নিরপেক্ষভাবে গ্রহণ ক’রে শিক্ষাদান করতেন। তাঁ’র খুব উচ্চাবস্থার শিষ্যদের মধ্যে আবহুল গকর বা নামে একজন মুসলমান চেলাও ছিলেন। আর তাঁ’র মত একজন বর্ণশ্রেষ্ঠ নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ হয়ে তাঁ’র সময়ে যে জাতিভেদের কঠিন গোঁড়ামি ভেঙে দেবার যে তিনি চেষ্টা করেছিলেন, তা’তে ক’রে লাহিড়ী মহাশয়ের দুঃসাহসের পরিচয় পাওয়া যায় বই কি! মহাগুরুর বিশ্বব্যাপী পক্ষপৃষ্ঠের অন্তরালে জীবনের বিভিন্নস্তরের লোক আশ্রয় পেয়েছিল। ঈশ্বরে উদ্বুদ্ধ, পতিতপাদ সকল ধর্মগুরুদের মতন তিনি সমাজনিন্দিত, পতিত, সকল পাপীতাপীনে প্রাণে আশার নবাবরণরোগের সঞ্চার করতেন।

তিনি শিষ্যদের বলতেন, “সর্বদা মনে রেখো যে তুমি কারুরই নও আর কেউই তোমার নয়। ভেবে দেখো যে একদিন এ সংসারের সব কিছুই ফেঁদে

রেখে তোমাকে ইঠাংই চলে যেতে হ'বে—কাবেই এখন থেকেই ভগবানের একটুআধটু খোঁজখবর নেওয়া শুরু কর আর রোজই একটু একটু ক'রে ঈশ্বরানুভূতির বেলুনে চড়ে মরণের শূন্যপথে মহাযাত্রার জন্তে তৈরী হও। মারামোহে মুগ্ধ হয়ে তোমার হাড়মাংসের খাঁচাটাকেই তোমার স্ব-রূপ বলে ভাবছ? এ আর কি, বড়জোর একটা জ্বালাবগ্ননা দুঃখকষ্টের বাসা বই ত' আর কিছু নয়! * ধ্যান কর, ধ্যান কর, অবিরাম ধ্যান ক'রে যাও—যা'তে ক'রে অতি শীগ'গিরই তুমি সেই সকল দুঃখক্লেশমুক্ত, সকল কাষাবন্ধ-হীন অনাদি অনন্ত পরমাত্মার স্বরূপ দেখতে পাবে। ক্রিয়াযোগের গুপ্ত-চাবিকাঠি দিয়ে তোমার দেহকারাগারের বন্দিত্ব থেকে মুক্ত হ'য়ে পরমাত্মার সঙ্গে মিলিত হ'বার শিক্ষালাভ কর।”

মহাগুরু তাঁ'র বিভিন্ন শিষ্যদের তাঁ'দের আপন আপন ধর্মশাস্ত্রানুমোদিত নিষ্ঠাপালনে উৎসাহিত করতেন। ক্রিয়াযোগের সর্বগ্রাহী প্রকৃতি যে বক্তৃতাভের কার্যকরী উপায়, তা'র উপর জোর দিয়ে লাহিড়ী মহাশয় তাঁ'র শিষ্যদের পারিপার্শ্বিক অবস্থা আর শিক্ষাদীক্ষার সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা ক'রে তাঁ'দের নিজ নিজ জীবন কুটিয়ে তুলতে স্বাধীনতা দিয়েছিলেন।

লাহিড়ী মহাশয় বলতেন, “মুসলমান দিনে চারবার নমাজ পড়বে আর হিন্দুও দিনে চারবার জপতপে বসবে। খৃষ্টানও রোজ চারবার হাঁটু গেড়ে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করবে, তা'রপর বাইবেল পড়বে।”

গুরুদেব তাঁ'র শিষ্যদের, তা'দের প্রত্যেকের স্বাভাবিকপ্রবৃত্তি অনুযায়ী জ্ঞান, ভক্তি, কর্ম বা রাজযোগের পথে তা'দেরকে অতি বিচক্ষণতার সঙ্গে পরিচালিত করতেন।

আদর্শগুরু হিসেবে তিনি শিষ্যদের শুধু শাস্ত্রের গুরুতর্ক নিয়ে পড়ে পাকা এড়িয়ে চলতেই পরামর্শ দিতেন। তিনি বলতেন, “প্রাচীন শাস্ত্রের মার সত্য, শুধু পঠনপাঠনে নয়, অস্তরের মধ্যে প্রকৃত উপলব্ধি করবার জন্ত যে সাধন করে সেই বুদ্ধিমান। তোমার যা' কিছু সমস্যা তা' ধ্যানধারণার ভিতর দিয়ে সমাধানের চেষ্টা কর। ধর্মের মধ্যে সত্যের অনুসন্ধান করতে

* “আমাদের শরীরে কত রকমের মৃত্যু আছে। মৃত্যু ছাড়া আর সেখানে কিছুই নাই।” মার্টিন লুথার—টেবল্ টক্।

† নমাজ—মুসলমানদের দৈনিক চারপাঁচবার প্রার্থনা।

গিয়ে কোন অনিশ্চিত ধারণায় ত' লাভ নেই, তা'র চেয়ে বরং প্রত্যক্ষ ঈশ্বরসঙ্গলাভের চেষ্টা ক'র। মনের ভিতর থেকে ধর্মের গোঁড়ামির সব জালজঞ্জাল দূর ক'রে ফেল—সাক্ষাৎ অল্পভূতির নিশ্চল, পূত শাস্তি-বারিতে মন প্রাণিত কর।* অন্তরের যা' প্রত্যক্ষ নির্দেশ তা'ই পালন করতে মনকে তৈরী কর; আর হৃদয়ের সঙ্গোপনে যে ঈশ্বরের বাণী লুক্কায়িত আছে তা' শোনবার জগ্গে কান পেতে রাখ, সেখানেই তুমি জীবনের সব জটিলসমস্যার একমাত্র উত্তর খুজে পাবে দেখো। মানুষের নিজ কল্পদোষে যেমন দুঃখকষ্টে পড়বার চেষ্টার অন্ত নাই, তেমনি সকল উপায়ের উপায়, সেই পরমদয়ালের করুণারও অন্ত নাই।”

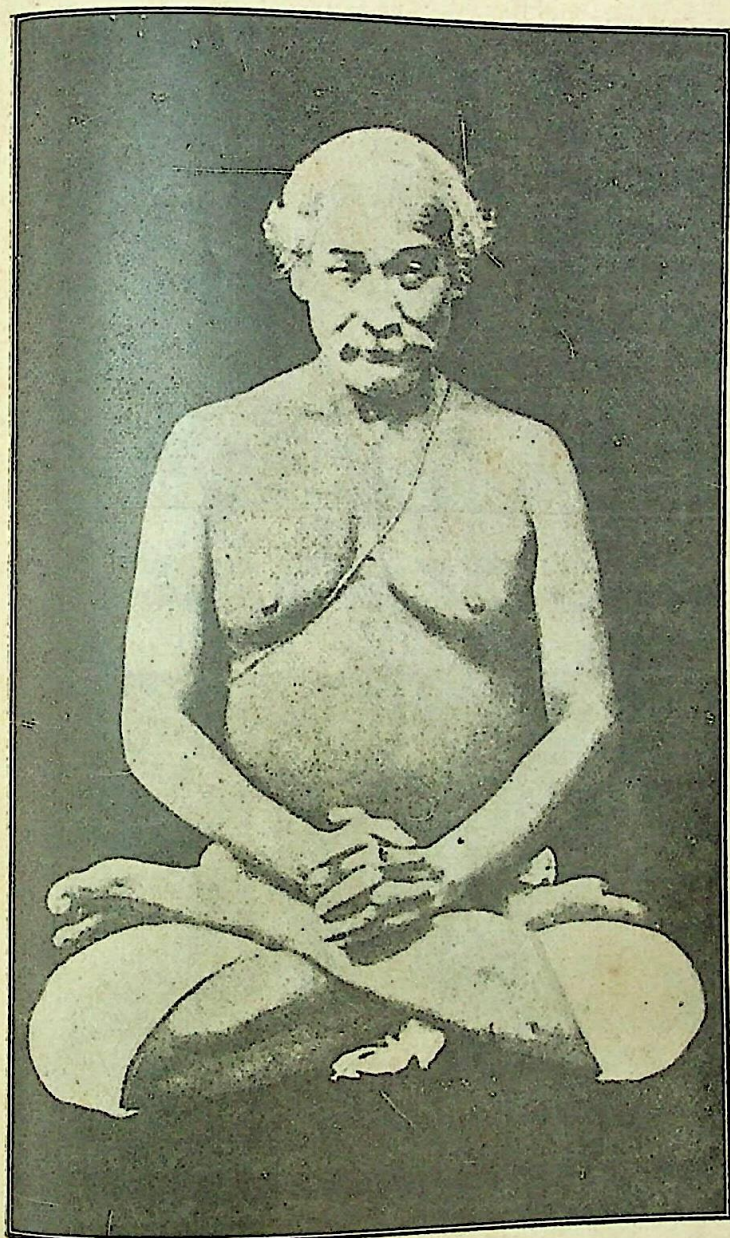
একদিন ভগবদ্গীতার ব্যাখ্যা শ্রবণকালে তাঁ'র শিষ্যগণ তাঁ'দের গুরুদেবের সর্বব্যাপিত্বের এক নিদর্শন পান। লাহিড়ী মহাশয় যখন কূটস্থচৈতন্য অর্থাৎ সকল স্পন্দনশীল সৃষ্টির মূলে যে ব্রহ্মজ্ঞান তা'র অর্থ ব্যাখ্যা করছিলেন, তখন তিনি হঠাৎ দম আটকে যাওয়ার মত চিৎকার ক'রে ব'লে উঠলেন, “জাপানের সমুদ্রতীরে আমি বহলোকের শরীরে থেকে ডুবে যাচ্ছি।”

তা'রপরদিন সকালবেলা শিষ্যেরা সংবাদপত্র খুলে পাঠ ক'রে দেখলেন যে, আগের দিন জাপানের কাছে এক জাহাজডুবি হয়ে বহলোক মারা গেছে।

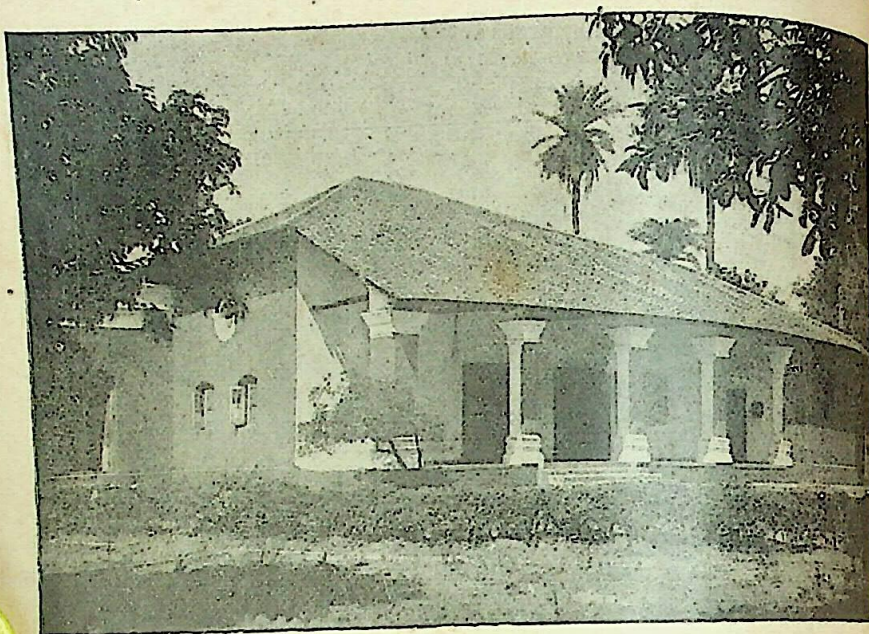
লাহিড়ী মহাশয়ের দূরের শিষ্যরা তাঁ'দের নিকট তাঁ'র সর্বব্যাপী অদৃশ্য উপস্থিতি প্রায়ই অবগত হ'তেন। যা'রা তাঁ'র কাছে উপস্থিত থাকতে পারতেন না তাঁ'দের আশ্বস্ত ক'রে তিনি বলতেন, “যা'রা ‘ক্রিয়া’ অভ্যাস করে তাঁ'দের কাছে আমি সর্বদাই উপস্থিত থাকি। তোমার কোন ভাবনা নাই, তোমার ক্রমিক উপলব্ধির সঙ্গে সঙ্গে আমি পথ দেখিয়ে দেখিয়ে তোমার সেই চিরআশ্রয়স্থলে আমি তোমায় নিয়ে যাব।”

স্বামী সত্যানন্দজীকে একজন ভক্ত বলেছিল যে কাশীতে গিয়ে সে লাহিড়ী মহাশয়ের কাছ থেকে “ক্রিয়া” নিতে পারে নি ব'লে মনে তা'র বড়ই ক্ষোভ ছিল—সর্বদাই সে লাহিড়ী মহাশয়ের কাছে প্রার্থনা জানাত যে তিনি যেন নিজে তাঁ'কে “ক্রিয়া” দেন। লাহিড়ী মহাশয় ভক্তের প্রার্থনায় স্থির থাকতে না পেরে স্বপ্নে আবিভূত হ'য়ে তা'কে সঠিক “ক্রিয়াযোগে” দীক্ষিত করেন।

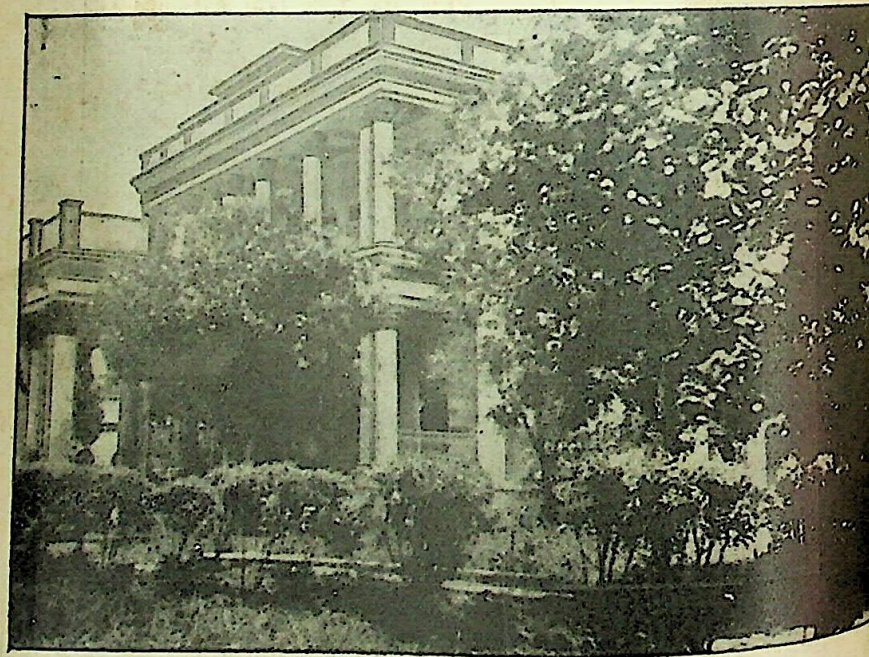
* “থ্যানেতেই সত্যের সন্ধান কর—জীর্ণ পু'থিতে নয়। চাঁদের জন্ত আকাশে দৃষ্টিপাত কর—পুরুরিণিতে নয়।” পারশ্বদেশীয় প্রবাদ।



যোগাবতার—শ্রীশ্রীলাহিড়ী মহাশয়



রাঁচি যোগদা ব্রহ্মচর্য্য বিদ্যালয়ের প্রধান বাটিকা
(“লাহিড়ী মহাশয় মিশন” এর সঙ্গে সংযুক্ত)



কলিকাতার নিকটস্থ দক্ষিণেশ্বরে গঙ্গাতীরে অবস্থিত
যোগদা সংসদ সোসাইটির ভারতীয় প্রধান কেন্দ্র

যে সব শিষ্যেরা সম্মাসগ্রহণের জন্ত ইচ্ছাপ্রকাশ ক'রত, তা'দের তিনি নানা উপলক্ষ্যে এই ব'লেই নিরুৎসাহিত ক'রতেন, “ঈশ্বরোপলব্ধিশূন্য হ'য়ে গৈরিকবসন ধারণ করা সমাজের পক্ষে আন্তর্যারণা সৃষ্টিকর। বাইরে সব ত্যাগের চিহ্নের কথা ভুলে যাও, এতে ক'রে তোমার মনে একটা মিথ্যা গর্ব এনে তা' তোমার পক্ষে ক্ষতিকর হ'তে পারে। তোমার দৈনিক আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্ত অটল সাধনারই একমাত্র প্রয়োজন, তা' ছাড়া আর কিছু নয়; আর তা'র জন্তে ‘ক্রিয়াযোগ’ অভ্যাস কর।”

সাংসারিক কোন কর্তব্যে অবহেলা ক'রলে লাহিড়ী মহাশয় তা'র শিষ্যকে স্নেহ উপদেশ দিয়ে তা'র ত্রুটিবিচ্যুতি সংশোধন ক'রে তা'কে কর্তব্য-পালনে অবহিত ক'রতে তুলতেন।

শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজি একদিন আমার বলেছিলেন, “লাহিড়ী মহাশয় তাঁ'র কোন চেলার দোষের বিষয় সর্বসমক্ষে বলতে বাধ্য হলেও তিনি স্নেহপূর্ণস্বরে মিষ্টভাবে বুঝিয়ে তা' সংশোধন ক'রে দিতেন।” তা'রপর তিনি সখেদে বললেন, “আমাদের গুরুদেবের খোঁচা খেয়ে এ পর্য্যন্ত কোন শিষ্যই তাঁ'র কাছ থেকে পালায় নি।” শুনে হাসি চাপতে পারলুম না; যা'ই হোক আমি কিন্তু সেই কথা শুনে সত্যসত্যই শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজিকে বললুম যে কড়াই হোক আর মোলায়েমই হোক, তাঁ'র প্রত্যেক কথাটিই আমার কানে সঙ্গীতের মতই স্নমধুর হয়ে বাজত।

লাহিড়ী মহাশয় “ক্রিয়াযোগের” চারটি ধাপ সম্বন্ধে বেছে দিয়েছিলেন।* শিষ্যের আধ্যাত্মিক উন্নতি সুনির্দিষ্টভাবে প্রকাশ পেলে তবে তিনি বাকী তিনটি উচ্চতর প্রশালী তা'কে শিক্ষা দিতেন। একদিন তাঁ'র জনৈক শিষ্য তা'র মূল্য যথাযথভাবে স্বীকৃত হচ্ছে না ভেবে অসন্তোষ প্রকাশ ক'রে বললে, “গুরুদেব, এখন আমি দ্বিতীয়ক্রিয়া পা'বার নিশ্চয়ই উপযুক্ত হয়েছি, কি বলেন?”

সেই মুহূর্ত্তে দরজা খুলে গেল, ঘরে প্রবেশ ক'রল তাঁ'র এক অতি দীন, তক্তশিষ্য—নাম বৃন্দা ভকত। সে ছিল কাশীর একজন ডাকহরকরা।

* “ক্রিয়াযোগ”কে নানাভাগে বিভক্ত করা যায় ব'লে লাহিড়ী মহাশয় তা'র মধ্য থেকে “ক্রিয়াযোগের” সারস্বরূপ চারটি প্রশালী স্পষ্টভাবে নির্বাচিত করেছিলেন, যেগুলি হ'চ্ছে প্রত্যক্ষ ক্রিয়ানুশীলনে একেবারে অমূল্য।

সন্মুখে তা'র দিকে চেয়ে যত্ন হেসে গুরুদেব বল্লেন, “এস, এস, বৃন্দা, এখানে এসে আমার কাছে বস! আচ্ছা বলত' বৃন্দা, তুমি কি দ্বিতীয়ক্রিয়া নিতে চাও?”

অতি দীন ও নম্র বিনয়ের সঙ্গে সেই ক্ষুদ্র পোষ্টপিওন করষোড়ে গুরুদেবকে সভয়ে নিবেদন করলে, “গুরুদেব, আর আমার ক্রিয়ার দরকার নেই! আরও উঁচু ক্রিয়া নিয়ে আমি কি ক'রে সাধন ক'রব? আমি অভ এখানে এসেছি আপনার আশীর্বাদ নিতে, কারণ প্রথমক্রিয়াতেই আমার মন এমন আনন্দে উদ্ভাস্ত আর আত্মহারা হয়েছে যে আমি চিঠিবিলিই ক'রতে পারি না।”

লাহিড়ী মহাশয় বল্লেন, “বৃন্দা এখন ব্রহ্মানন্দসাগরে ভাসছে!” অপর শিষ্যটি কথাগুলি শুনে মাথা হেঁট করলে।

তা'রপর সেই শিষ্যটি বললে, “গুরুজি, দেখছি যে আমি একেবারেই আনাড়ি—কেবল ‘ক্রিয়া’র দোবই খুঁজে বেড়াচ্ছি, তা'র গুণগুলো আর নয়!”

সেই নিরক্ষর ডাকপিওন ক্রিয়াযোগের সাহায্যে এতদূর আধ্যাত্মিক উন্নতিলাভ করলে যে বহু পণ্ডিত তা'র কাছ থেকেই শাস্ত্রের গূঢ় অর্থের ব্যাখ্যা সময়ে সময়ে শুনতে চাইতেন! অনক্ষর আর অপাপবিন্দু সেই ক্ষুদ্র বৃন্দা ভকত শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতমহলে বহু স্মৃতি অর্জন করেছিল।

কাশীর বহুশিষ্য ছাড়া ভারতবর্ষের বহু দূরদূরান্তর থেকেও শত শত লোক তাঁ'র কাছে শিষ্যত্ব গ্রহণ করবার জন্মে আসত। বাংলাদেশে তাঁ'র দুই বেহাইবাড়ী তিনি বহু উপলক্ষ্যে গিয়েছিলেন। তাঁ'র উপস্থিতির স্মরণ পেয়ে বাংলার ভিতরে বহুস্থানে ক্রিয়াবান্দের ছোট ছোট দল সব গড়ে উঠেছিল। বিশেষতঃ কলকাতার আর বিষ্ণুপুর এই দুই জেলার ভিতর বহু নীরব ক্রিয়াবান্ আজ পর্যন্ত তাঁ'র সাধনার ধারা অব্যাহত রেখেছেন।

লাহিড়ী মহাশয়ের কাছ থেকে যে সব সাধুসন্তেরা “ক্রিয়া” পেয়েছিলেন, তাঁ'দের মধ্যে কাশীর স্বামী ভাস্করানন্দ সরস্বতী আর দেওঘরের খুব উচ্চাবস্থার সাধু বালানন্দ ব্রহ্মচারীর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কাশীনরেশ মহারাজ ঈশ্বরীনারায়ণ সিংহ বাহাদুরের পুত্রের তিনি কিছুকাল শিক্ষকতাও করেছিলেন। গুরুদেবের আধ্যাত্মিক ঐশ্বর্যের পরিচয় পেয়ে, মহারাজ আর তাঁ'র পুত্র উভয়েই তাঁ'র কাছ হ'তে ক্রিয়াযোগে দীক্ষাগ্রহণ

করেন। মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরও তাঁ'র নিকট ক্রিয়াযোগে দীক্ষা-প্রাপ্ত হ'ন।

লাহিড়ী মহাশয়ের কতকগুলি প্রভাবপ্রতিপত্তিশালী শিষ্য প্রচারকার্যের দ্বারা তাঁ'র ক্রিয়াযোগের প্রসার ও তা'র পরিধি বিস্তার করতে উদ্বৃত্ত হয়ে-ছিলেন। গুরুজি তা'তে অল্পমতি দিতে অস্বীকার করেন। তাঁ'র আর একটি শিষ্য, কাশীনরেশের রাজচিকিৎসক, গুরুদেবের নাম “কাশীবাবা” * রূপে প্রচারের জন্ত সংগঠনপ্রচেষ্টা শুরু করেছিলেন—এবারেও তা' তিনি নিবারণ করলেন।

তিনি বললেন, “ক্রিয়াযোগপুষ্পের সৌরভ, প্রচার বিনা স্বাভাবিকভাবে আপনিই বিস্তৃত হো'ক। অধ্যাত্মভাবের উর্ধ্বর হৃদয়ভূমিতে এর বীজ আপনিই অঙ্কুরিত হ'বে।” যদিও গুরুমহারাজ আধুনিক সংগঠন অথবা সংবাদপত্রের মাধ্যমে কোন প্রচারপ্রণালী অবলম্বন করেন নি, তবু তিনি জানতেন যে তাঁ'র মহাবাণী বহুবার দুর্নিবার স্রোতের মত উথলে উঠে, নিজের শক্তিবলে মানবহৃদয়ের দু'কূল পরিপ্লাবিত ক'রে ছুটে চলেবে। ভক্তদের পরিবর্তিত আর পবিত্র জীবনই হচ্ছে ক্রিয়াযোগের অমর অস্তিত্বের পূর্ণ নিদর্শন।

১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে, রাণীক্ষেতে দীক্ষালাভের পঁচিশবছর পরে লাহিড়ী মহাশয় পেন্সন নিয়ে অবসর গ্রহণ করেন।† এখন তাঁ'কে দিনের বেলায়ও সহজে পাওয়া যায় দেখে ভক্তের দল ক্রমশঃই বাড়তে লাগল।‡ মহাগুরু এখন তাঁ'র অধিকাংশ সময় নীরবে শাস্তিময় পদ্মাসনে বসেই কাটিয়ে দিতেন। এমন কি একটু বেড়াবার জন্তে অথবা বাড়ীর অগ্ন্যাগ্ন অংশে যা'বার জন্তেও তিনি কদাচিৎ বৈঠকখানা ত্যাগ ক'রে আসতেন। গুরুদেবের দর্শনলাভের জন্তে শিষ্যদের নীরবে যাতায়াত সারাদিন ধ'রে অবিরামভাবেই চলত।

দর্শনপ্রার্থীরা সভয়ে দেখত যে লাহিড়ী মহাশয়ের শরীরের স্বাভাবিক অবস্থায়—স্বাসহীনতা, বিনিদ্রতা, ধমনী আর হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়ালোপ, ঘণ্টার

* তাঁ'র শিষ্যরা তাঁ'কে, যোগিবর, যোগিরাজ, মুনিবর প্রভৃতি বলেও ডাকতেন। “যোগাবতার” নামক আনাকর্তৃক সংযোজিত।

† গভর্নমেন্ট আফিসে তাঁ'র কার্যকাল সবশুদ্ধ ৩৫ বৎসর।

‡ লাহিড়ী মহাশয় প্রায় ৫০০০ শিষ্যকে ক্রিয়াযোগে দীক্ষিত করেন। এঁদের মধ্যে কতকগুলি ইংরেজ, ইউরোপীয় এবং আমেরিকান শিষ্যও ছিলেন।

পর ঘণ্টা ধরে শাস্ত্র নয়নহুঁটিতে স্থির নিম্পলকদৃষ্টি আর তা'র সঙ্গে গভীর-
শান্তির একটা স্নিগ্ধতা তাঁকে বেঁধে ক'রে রয়েছে—এইসব দেহাতীত লক্ষণ
সকল প্রকাশ পে'ত! উপস্থিত সকলেই তখন উপলব্ধি ক'বত যে প্রকৃতই
একজন ভগবৎসাক্ষাৎকারপ্রাপ্ত, পরমপুণ্যবান মহাজ্ঞানী গুরুশ্রেষ্ঠের নীরব
পুত আশীর্বাদে তা'দের মানবজীবন ধ্বংস হয়ে গেছে।

গুরুদেব এবারে তাঁ'র শিষ্য পঞ্চানন ভট্টাচার্য মহাশয়কে কলকাতার
“আর্যামিশন ইনস্টিটিউশন” নামে এক বিদ্যালয় স্থাপনে অল্পমতি দিলেন।
এখানে তাঁ'র সেই সাধুশিষ্যটি ক্রিয়াযোগের বার্তা প্রচার করতে লাগলেন
আর জনসাধারণের উপকারের জন্য কতকগুলি লতাগুল্মের যৌগিক ঔষধও
প্রস্তুত করতে শুরু করেন। প্রাচীন প্রথাভ্রাষারী লাহিড়ী মহাশয় বহুবিধ
রোগ আরামের জন্তে একটি নিমের তেল* তৈরী ক'রে জনসাধারণের
মধ্যে বিতরণ করতেন।

গুরুদেব তাঁ'র কোন শিষ্যকে তেলটি চোলাই করতে বললে সে তা' অতি
সহজেই সম্পাদন করতে পারত কিন্তু অপর কেউ যদি তা' করতে চেষ্টা করত,
তা'হ'লে নানা অদ্ভুত বাধা এসে উপস্থিত হ'ত—তা'তে দেখা যেত যে চোলাই
করবার সময় সেই ওষুধের তেলটির অধিকাংশই উবে গেছে। এতে বোঝা যায়
যে গুরুদেবের আশীর্বাদও ওষুধটার একটা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় উপকরণ ছিল।

* নিমের ভৈষজ্যগুণাবলী এখন প্রতীচ্যেও স্বীকৃত হয়েছে। ভৈষজ্য বিজ্ঞান—লতাপাতার
গুণাগুণ সম্বন্ধে প্রাচীনশাস্ত্র ও সংস্কৃতগ্রন্থে বিরাট জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়। ১৯০৮ সালে
সাতাত্তরবৎসরবয়স্ক কাশী হিন্দু ইউনিভার্সিটির ভাইস চ্যান্সেলর পণ্ডিত মদনমোহন মালবোর কায়কল-
চিকিৎসা সারাজগতের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। মালবাজী মাত্র ৪৫ দিনের ভিতরে বহুল পরিমাণে
নূতনতর স্বাস্থ্য, বল, শ্রুতি ও দৃষ্টিশক্তির প্রথরতা লাভ করলেন, তৃতীয়বার তাঁ'র নূতন দন্তোদ্যম
হ'তে দেখা গেল আর মুখের উপর তাঁ'র সমস্ত বলিরেখা নিশ্চিহ্ন হয়ে অন্তর্হিত হ'ল। আয়ুর্বেদশাস্ত্রে
পুনর্দেবনলাভের ৮০ প্রকার চিকিৎসার মধ্যে কায়কলচিকিৎসা একটি। মালবাজী ব্রীকলচিকিৎসা
স্বামী বিষণ্ণদাসজী কর্তৃক চিকিৎসিত হয়েছিলেন। তিনি ১৭৬৬ খ্রীষ্টাব্দে তাঁ'র জন্মবৎসর বলে
নির্দেশ করেন আর তা'ছাড়া তাঁ'র বয়স যে শতাধিক বৎসরের তা' প্রমাণের জন্য দলিলপত্রাদিও
নাকি তাঁ'র কাছে আছে। এসোসিয়েটেড প্রেসের রিপোর্টারেরা বলেন যে দেখলে তাকে
বৎসরের বেশী বোধ হয় না।

আয়ুর্বেদের আটটি অঙ্গ (শাখা) আছে যথা, (১) শল্য, (২) শালক্য, (৩) কায়চিকিৎসা,
(৪) ভূতবিদ্যা, (৫) কোমার, (৬) অগদ, (৭) রসায়ন, (৮) বাজীকরণ। বৈদিকযুগের
চিকিৎসাতেও অতিশুদ্ধ শস্ত্রব্যবহার, প্রাস্টিক সার্জারী, বিষাক্ত গ্যাসের প্রতিষেধক ব্যবহার, সার্জারিসমূহ
অপারেশন আর মস্তিষ্কব্যবচ্ছেদ প্রভৃতি এবং ঔষধে সূক্ষ্মশক্তিসন্ধারের প্রক্রিয়ার পরিচয় পাওয়া যায়।
খ্রিঃ পূঃ ৫ম শতাব্দীর সুবিখ্যাত চিকিৎসক হিপোক্রেটস তাঁ'র ভৈষজ্যবিজ্ঞানে বহু উপকরণ বিব্রত
আয়ুর্বেদশাস্ত্র হ'তেই গ্রহণ করেছিলেন।

অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে
কাজিত্ব যা এসা
সহ

নিবেশ উল্লেখ
শাস্ত্রবিমুদ্রা
ও শ্রেষ্ঠ আদিত্য

অর্থায়ন দ্বারা নিবেশ পদ্মনা
আশ্রয় শাস্ত্রী মুদ্রা-মিষ্ট-

শ্রীশ্রীমাচার্য দেবশর্মা-
ও শাস্ত্রী

লাহিড়ী মহাশয়ের হস্তাক্ষর আর তাঁ'র স্বাক্ষর উপরে প্রদর্শিত হ'ল। তাঁ'র শিষ্যকে লিখিত একটি পত্র হ'তে লাইনগুলি উদ্ধৃত ক'রে দেখান হয়েছে। এতে গুরুদেব একটি সংস্কৃতশ্লোকের নিম্নলিখিত ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন, “যে একরূপ স্থির অবস্থা প্রাপ্ত হয়েছে—যা'তে ক'রে তা'র চোখের পলক পড়ে না, সে শান্তবীমুদ্রাঃ সিদ্ধ !

(স্বাঃ) শ্রীশ্রীমাচার্য দেবশর্মাঃ।”

আর্যামিশন ইনষ্টিটিউসন লাহিড়ী মহাশয়ের বহু শাস্ত্রব্যাখ্যা প্রকাশের ভার গ্রহণ করেন। যীশুখৃষ্ট বা অগ্ন্যাগ্ন মহাপুরুষদের মত লাহিড়ী মহাশয় নিজে কোন পুস্তক লেখেন নি, কিন্তু তাঁ'র গভীর শাস্ত্রব্যাখ্যা তাঁ'র বহু শিষ্যের দ্বারা লিখিত আর সুসম্বদ্ধ হয়ে প্রকাশিত হয়েছে। গুরুদেবের গভীর অন্তর্দৃষ্টির সঠিক বর্ণনা দিতে এই সব স্বেচ্ছাকৃতলিপিকারদের মধ্যে কতকগুলি বাস্তবিকই হৃন্দদর্শী ছিলেন; মোটের উপর তাঁ'দের প্রচেষ্টা সার্থকই হয়েছিল। তাঁ'দেরই উৎসাহে লাহিড়ী মহাশয়ের প্রায় ছাব্বিশটি প্রাচীন শাস্ত্রের অপূর্ব ব্যাখ্যা, টিকাটিপ্পনী প্রভৃতি প্রকাশিত হয়ে জগৎ আজ সমৃদ্ধ আর উপকৃত হয়েছে।

*মুদ্রা হ'চ্ছে কোন ক্রিয়াকাণ্ড বা অনুষ্ঠানে কর বা অঙ্গুলিবিভাগ। শান্তবীমুদ্রা কতকগুলি হাতের উপর এমন ক্রিয়া প্রকাশ করে যে তা'তে একটা গভীর মানসিক শান্তির উদয় হয়। প্রাচীন শাস্ত্রে শরীরস্থ নাড়ীমণ্ডলী বা স্নায়ুচক্রের সঙ্গে মনের সম্বন্ধের হৃন্দাতিহীন শ্রেণীবিভাগ আছে। কানেই পূজা প্রভৃতি অনুষ্ঠান আর যোগাদি প্রক্রিয়াসাধনে মুদ্রার ব্যবহারের একটা বৈজ্ঞানিক ভিত্তি আছে। মুদ্রার বিস্তৃতভাবার পরিচয় ভারতবর্ষের মূর্ত্তিশিল্প আর পূজাপার্বণ প্রভৃতিতে নৃত্যগীতাদি অনুষ্ঠানে পাওয়া যায়।

লাহিড়ী মহাশয়ের পৌত্র শ্রী আনন্দমোহন লাহিড়ী ক্রিয়াযোগের বিষয়ে একটি হৃদয়গ্রাহী পুস্তিকা লিখেছেন। তিনি লিখেছেন, “শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা হচ্ছে বিরাট মহাকাব্য—মহাভারতেরই এক অংশ; মহাভারতে কতকগুলি ব্যাসকূট আছে। এই সব ব্যাসকূটের প্রশ্ন অমীমাংসিত রাখলেই দেখা যাবে যে তা’ একটা অদ্ভুত আর সহজেই ভুল বোকা যেতে পারে এমন গোছের পৌরাণিক গল্পসমষ্টি। আর ঐসব ব্যাসকূটের যথাযথ ব্যাখ্যা প্রদত্ত না হ’লে আমরা দেখতে পাব যে আমরা এমন এক বিজ্ঞান হারিয়েছি যা’ প্রাচ্য হাজার হাজার বছর ধরে নানাবিধ পরীক্ষার তত্ত্বানুসন্ধানে সে সব অমাহু্যিক ধৈর্যের সঙ্গে রক্ষা করে এসেছে।* লাহিড়ী মহাশয়ের ব্যাখ্যা শাস্ত্রবাক্য আর রূপকের ভিতর সূচত্বরভাবে লুক্কায়িত ধর্মবিজ্ঞানকে, তা’র রূপকের আনবরণ মুক্ত ক’রে সর্বসমক্ষে প্রকাশিত করেছে। আপাতদৃষ্টিতে অর্থহীন বৈদিক যাগযজ্ঞ, পূজার্চনার মন্ততন্ত্র এখন আর কতকগুলি তুর্কোথা বাক্যের সমষ্টি বা কসরৎ নয়; লাহিড়ী মহাশয় প্রমাণ করেছেন যে তা’দের মধ্যে বৈজ্ঞানিক অর্থ নিহিত আছে আমরা জানি যে মানুষ সাধারণতঃ কুপ্রবৃত্তির অদম্যপ্রভাবে প’ড়ে অসহায় হয়ে পড়ে, কিন্তু যখন তা’র জ্ঞানের মধ্যে ক্রিয়াযোগের দ্বারা এক অনাস্বাদিতপূর্ব পরমানন্দের আবির্ভাব হয় তখন তা’রা শক্তিহীন হয়ে পড়ে আর মানুষও তা’দের প্রশ্রয় দেবার কোন উদ্দেশ্য খুঁজে পায় না। এখানে কুপ্রবৃত্তিত্যাগের সঙ্গে যুগপৎ সুনিশ্চিত পরমানন্দলাভ ঘটে! এ পথ ছাড়া, শত শত নীতিবাক্য যা’ কেবল এ কোরো না ও কোরো না এই সব ব’লেই অঙ্গুলিনির্দেশ ক’রে এসেছে, তা’ আমাদের কাছে একেবারে নিরর্থক হ’য়ে দাঁড়ায়

* “প্রভুতত্ত্ব অনুশীলনে সিদ্ধদের উপত্যাকার ভূগর্ভে ঘননকালে সম্প্রতি কতকগুলি মূর্তি আবিষ্কৃত হয়েছে, সেগুলি বর্তমান যোগপ্রণালীতে ব্যবহৃত আসনের মত অবস্থায় উপবিষ্ট এবং তা’ হচ্ছে ঋ: পুং তিন হাজার বছরের। এ থেকে প্রমাণ হয় যে সে সময়েও যোগের অমৃতত: মূলতত্ত্ব বিষয়ে লোক-দেব কিছু কিছু জানা ছিল। আর এতে ক’রে আমাদের এ সিদ্ধান্তে উপনীত হ’তে নিতান্তই অযৌক্তিক হ’বে না যে বিশিষ্ট প্রণালীর অভ্যাসের দ্বারা নিয়মিত অন্তর্দর্শনের চর্চা ভারতবর্ষে পাঁচ হাজার বছর ধরে হয়েছে ভারতবর্ষ ধর্মসম্বন্ধীয় কতকগুলি অমূল্য মনোভাব আর নৈতিক মতবাদের যে বিকাশ সাধন করেছে তা’ মতাই অপূর্ব, অমৃতত: জীবনে প্রয়োগ করবার তা’দের ব্যাপকতার দিক দিয়ে। এদের মধ্যে হচ্ছে মতবাদের প্রশ্নে সহনশীলতা যা’ প্রতীচোর পক্ষে অত্যন্ত বিশ্বয়কর—যেখানে বহু শতাব্দী ধরে উপমতপ্রতিষ্ঠাই হচ্ছে সাধারণভাবে প্রচলিত আর ধর্মের গোড়ারি জন্তে দুই দলের মধ্যে যুদ্ধ আর লড়াই প্রায়ই ঘটে।”—ওয়াশিংটনের এসেরিকান কাউন্সিল অফ দি লার্নেড সোসাইটির ১৯৩৯ সালের মে সংখ্যার বুলেটিনে প্রোফেসর ডব্লিউ নর্মান ব্রাউন কর্তৃক লিখিত প্রবন্ধের সারাংশ হ’তে উদ্ধৃত।

“লাহিড়ী মহাশয়ের আদর্শজীবনের উদাহরণ, যোগ যে একটা গুপ্তপ্রক্রিয়া-মাত্র এই অমায়িক ধারণার একটা আমূল পরিবর্তন এনে দিয়েছে। প্রত্যেক মানুষই এখন ক্রিয়াযোগের ভিতর দিয়ে প্রকৃতির সঙ্গে তা’র সঠিক সম্বন্ধ কি, তা’ জানবার পথ খুঁজে নিতে পারে আর সকল জাগতিক ঘটনার জগৎ একটা আধ্যাত্মিক শ্রদ্ধাও অনুভব করতে পারে—তা’ সে পদার্থবিজ্ঞানের বাস্তবতা* সম্বন্ধেও রহস্যময় কোন ঘটনাই হোক আর দৈনন্দিন কোন ব্যাপারই হোক। আমাদের মনে সর্বদা স্মরণ রাখা কর্তব্য যে হাজার বছর আগে যা’ রহস্যময় ছিল আজ আর তা’ নেই—আর আজ যা’ রহস্যজনক একশ’ বছর পরে তা’ ঠিক বিধিসম্মতভাবে সহজবোধ্য হবে। পার্থিব সকল লীলার পিছনে লুকিয়ে আছে যে সেই অনন্তশক্তির মহাসমুদ্র।

“ক্রিয়াযোগের বিধি সনাতন। এ গণিতশাস্ত্রের মত একেবারে অশ্রাস্ত; যোগবিয়োগের সহজপ্রণালীর মত ক্রিয়াযোগের বিধিও কখনও নষ্ট হ’তে পারে না। গণিতশাস্ত্রের সমস্ত পুস্তক অগ্নিতে আহুতি দিলেও যুক্তিবাদী মন যেমন এর সত্য সব সিক পুনরায় আবিষ্কার ক’রে ফেলবে, তেমনি যোগ-শাস্ত্রের সমস্ত বই পুড়িয়ে ফেললেও, যদি একজন প্রকৃত যোগী আবিভূত হ’ন—যা’র মধ্যে শুদ্ধাভক্তি ও শুদ্ধজ্ঞানের সমন্বয় ঘটেছে, তা’হলে তিনি এর মূলবিধি সবই পুনরায় আবিষ্কার ক’রে ফেলতে পারবেন।”

বাবাজী যেমন অবতারশ্রেষ্ঠ “মহাবতার,” শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজি যেমন “জ্ঞানাবতার,” তেমনি লাহিড়ী মহাশয়ও “যোগাবতার”! সামাজিক মঙ্গল-সাধনে, গুণ ও পরিমাণ এই দুইএর বিচারে তিনি সমাজকে আধ্যাত্মিকতার আরও উচ্চতর স্তরে উন্নীত ক’রে দিয়েছেন। তাঁ’র অন্তরঙ্গ ভক্তশিষ্যদের উচ্চতর অবস্থাতে উন্নীত করবার শক্তিতে আর সাধারণো সত্যের বহুল প্রচারে লাহিড়ী মহাশয় মানবজাতির মুক্তিদাতা ব’লে গণ্য।

মহাপুরুষরূপে তাঁ’র অপূর্ব বৈশিষ্ট্য হচ্ছে তাঁ’র ক্রিয়াযোগরূপ স্পষ্টপ্রতিষ্ঠিত প্রণালীর উপর ব্যবহারিক গুরুত্ব আরোপ—যা’তে ক’রে তিনি সর্বপ্রথম

* এখানে কার্লাইলের “সার্টার রেজার্টাসে” একটি মন্তব্যের কথা মনে পড়ে, “যে মানুষের বিশ্বাসের উৎসাহ হ’ল, যে মানুষের বিশ্বাসিত হ’বার (এবং শ্রদ্ধা করায়) অভ্যাস নাই, সে অসংখ্য রয়্যাল সোসাইটির সভাপতি হলেও এবং সমস্ত পরীক্ষাগার এবং মানমন্দিরের সারসংগ্রহ তা’র একটিনাত্র মস্তিষ্কে স্থান পেলেও সে এক জোড়া চশমারই মতন—যা’র পিছনে কোন চক্ষু নাই।”

যোগের বন্ধদ্বার উন্মুক্ত ক'রে তাঁর পথ স্মৃগম ক'রে দিয়েছেন। তাঁর জীবনের সব অলৌকিক ঘটনার কথা ছেড়ে দিলেও বলা যায় যে, যোগাবতার লাহিড়ী মহাশয় অত্যাশ্চর্য ক্ষমতার সর্বোচ্চচূড়ায় আরোহণ করেছিলেন যখন তিনি যোগশাস্ত্রের সব কিছু প্রাচীন জটিলতা দূর ক'রে সাধারণের পক্ষে তা' প্রত্যক্ষফলপ্রদ সহজসাধ্য এই “ক্রিয়া”যোগে পরিণত করেছিলেন।

অলৌকিক ঘটনার উল্লেখ লাহিড়ী মহাশয় প্রায়ই বলতেন, “অতি সূক্ষ্ম বিধিনিয়ম ব'লে যা' সব ঘটে—সাধারণের কাছে যা' অজ্ঞাত, তা' প্রকাশে আলোচিত বা বিশেষ বিবেচনা ব্যতিরেকে প্রকাশিত হওয়া উচিত নয়।” এই পাতাকয়টিতে যদিও আমি তাঁর সাবধানবাণী লঙ্ঘন করেছি ব'লে বোধ হয়, তা' হ'লেও সেটা তাঁর কাছ থেকে অন্তরে পুনরাবাস পাওয়াতেই আমার পক্ষে সম্ভব হয়েছে। আর তা' ছাড়া বাবাজী, লাহিড়ী মহাশয়, শ্রীবুদ্ধেশ্বর গিরিজি প্রভৃতি গুরুমহারাজগণের জীবনআলেখ্য প্রদর্শনের সময় আমি বহু সত্য অলৌকিক ঘটনার উল্লেখ বর্জন করাই বুদ্ধিসঙ্গত ব'লে বোধ করেছি আর সে সব ঘটনাও সাধারণের অনধিগম্য। অত্যন্ত দুর্বোধ্য জটিল দর্শনশাস্ত্রের এক বিরাট ব্যাখ্যাপুস্তক না লিখে তা' আর প্রকাশ করা সম্ভবপর নয়।

গৃহীযোগী হিসাবে লাহিড়ী মহাশয় আধুনিক ভারতের প্রয়োজনোপযোগী কার্যকরী পন্থার বাণী বহন ক'রে এনেছেন। প্রাচীনভারতের সর্বোৎকৃষ্ট ধর্ম ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থাসকল এখন আর স্মৃত নয়। কাষেই ভিক্ষাপাত্র-হস্তে ইতস্ততঃ ভ্রমণশীল যোগীর প্রাচীন আদর্শ এই মহাগুরু আর অনুমোদন করেন নি। বরং তিনি স্বোপার্জননিরত, অর্থসঙ্কটগ্রস্ত সমাজের উপর নির্ভরতা-বিহীন, আর নিজ আবাসে গুপ্তসাধনশীল আধুনিক যোগীর স্মযোগসুবিধার প্রতিই অধিকতর আগ্রহ প্রদর্শন করেছেন। উপরোক্ত নীতির অনুসরণের সঙ্গে তিনি প্রাণমনে শক্তিসঞ্চারী নিজের অপূর্ণ আদর্শের সংযোগসাধন করেছেন। তিনি হচ্ছেন অতিআধুনিক ধরণের, ইংরেজীতে যাকে ব'লে “স্টীম-লাইন্ড” যোগীর আদর্শ। বাবাজী কর্তৃক পরিকল্পিত তাঁর জীবনআদর্শ শুধু যে কেবল প্রাচ্যের পক্ষেই তা' নয়, প্রতীচ্যের যোগসাধনেচ্ছুদের পক্ষেও পথপ্রদর্শকরূপে গঠিত।

নূতন মানবজাতির পক্ষে নবীন আশার আবির্ভাব! যোগাবতার ঘোষণা ক'রে গেছেন, “ভগবৎসঙ্গলাভ নিজ চেষ্টাতেই সম্ভব—আর তা'

কোন ধর্মতত্ত্বে বিশ্বাস বা কোন জগৎনিয়ন্তার খেলালখুসির উপর নির্ভর করে না।”

আর এই ক্রিয়াযোগের চাবিকাঠি দিয়েই, যে সব লোকেরা কোন মানবের দেবত্বে বিশ্বাস করে না, তা'রাই আবার শেষ পর্য্যন্ত দেখতে পাবে যে তা'দের নিজেদের মধ্যেই পূর্ণদেবত্বের আবির্ভাবের সম্ভাবনা বর্তমান আছে।

৩৬শ পরিচ্ছেদ

বাবাজীর প্রতীচ্যের প্রতি আকর্ষণ

শ্রীমন্তমথুর নিদাঘ নিশীথ। মাথার উপর বড় বড় উজ্জল নক্ষত্রগুলো আকাশের বৃকে স্নিগ্ধকোমল আলো ছড়িয়ে দিয়ে চারিদিকে একটা স্বপ্নের মায়াজাল রচনা করেছে। শ্রীরামপুর আশ্রমের দোতলার বারান্দায় শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজির পাশে আমি ব'সে। জিজ্ঞাসা করলুম, “গুরুদেব, আপনি বাবাজীর কখনও দর্শন পেয়েছেন কি?” শুনে তাঁ’র চোখদুটি ভক্তিতে উজ্জল হয়ে উঠল। আমার এই সোজাসুজি প্রশ্নে একটু হেসে তিনি উত্তর দিলেন, “হ্যাঁ, পেয়েছি বই কি! আমার বহু পুণ্যফলে আমি তিন তিনবার এই অমর মহাগুরুর সাক্ষাৎ পেয়েছি। প্রথমবার হ’চ্ছে এলাহাবাদে কুস্তমেলায়।”

ভারতবর্ষে কুস্তমেলার মত মহামেলা বা বিরাট ধর্মসম্মেলন স্মরণাতীত যুগ হ’তে চলে আসছে। এইসব ধর্মমহাসম্মেলন লক্ষ লক্ষ লোকের চোখের সামনে একটা আধ্যাত্মিক লক্ষ্য সর্বদা ধ’রে রেখে আসছে। হাজার হাজার সাধু-সন্ন্যাসী যোগীঋষিদের দর্শনলাভের জন্য লক্ষ লক্ষ অগণিত ভক্ত প্রতি ছয় অথবা বারবৎসর অন্তর একবার ক’রে মেলায় সমবেত হন। এমন সব সাধু-সন্ন্যাসীরা আছেন, যাঁরা কেবলমাত্র একবার মেলায় এসে সংসারের নরনারী-দের তাঁ’দের পুণ্য আশীর্বাদ বর্ষণকরা ছাড়া আর কখনও তাঁ’দের নির্জন স্থান হ’তে বা’রই হ’ন না।

শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজি বলতে লাগলেন, “বাবাজীর সঙ্গে যখন আমার সাক্ষাৎ হয় তখনও আমি সন্ন্যাস গ্রহণ করিনি। কিন্তু লাহিড়ী মহাশয়ের কাছ থেকে তখন আমার ‘ক্রিয়া’ নেওয়া হয়ে গেছে। ১৮৯৪ সালের জামুয়ারী মাসে এলাহাবাদে যে কুস্তমেলা হয়, তাঁ’রই উৎসাহে আমি সে মেলাতে যোগদান করি। এই আমার প্রথম কুস্তমেলা দর্শন। দারুণ ভিড় আর হট্টগোলার মাঝে আমি একটু বিভ্রান্ত হয়ে পড়ি। চতুর্দিকে আমার আগ্রহ-ব্যাকুল দৃষ্টির সম্মুখে কোন প্রকৃত সদগুরুর পুণ্যমূর্তি ধরা পড়ল না। গঙ্গার

তীরে একটা পোলের কাছ দিয়ে যাচ্ছি, চোখে পড়ল একটা পরিচিত মূর্তি—
কাছেই দাঁড়িয়ে আছেন ভিক্ষাপাত্রটি বাড়িয়ে দিয়ে।

“ভ্রান্তিবশতঃ ভাবলুম, ‘এ মেলাটা একটা ভিখিরীর দলের চৈচামেচি
আর হট্টগোল ছাড়া আর কিছু নয়। আমার মনে হয় যে পশ্চিমের
বৈজ্ঞানিকেরা যাঁ’রা মানবজাতির প্রত্যক্ষ মঙ্গলসাধনের জন্তে জ্ঞানের
পরিধি ধৈর্যের সঙ্গে বাড়িয়ে চলেছেন, তাঁ’রা কি এই সব, যাঁ’রা ধর্মের
ভগ্নাঙ্গ করে অথচ ভিক্ষাই যাঁ’দের একমাত্র উপজীবিকা, তাঁদের চেয়ে
ভগবানের কাছে বেশী প্রিয় ন’ন?’

“সমাজসংস্কারের এই সব ছোটখাট চিন্তাগুলি হঠাৎ বাধা পেলে, সামনে
এক দীর্ঘকায় সন্ন্যাসী দাঁড়িয়ে আগায় বল্ছেন,—

“‘ম’শায়, এক সাধুজি আপনায় ডাকছেন!’

“‘কে তিনি?’

“‘আম্বন, এলে নিজেই দেখতে পাবেন!’

“ইতস্ততঃ ক’রে এই ক্ষুদ্র উপদেশটি পালন করতে গিয়ে এলুম একটা
গাছতলায়—তা’র শাখাপ্রশাখার নিচে একজন গুরু তাঁ’র দলবল নিয়ে
বসে আছেন। গুরুজির মূর্তি অপূর্বদর্শন, বনরক্ষা চক্ষুটি অত্যন্ত
আমার আগমনে উঠে দাঁড়িয়ে তিনি আগায় আলিঙ্গন ক’রে সম্মেহে
বল্লেন, ‘এস এস, স্বামীজি।’

আমি সজোরে প্রতিবাদ ক’রে বললুম, “না ম’শায়, আগায় স্বামীটামনী
কিছু বলবেন না; আমি ওসব কিছু নই।”

“দৈবাদেশে যাঁ’দের আমি “স্বামী” উপাধি দিই, তাঁ’রা আর তা’
পরিত্যাগ ক’রতে পারে না।’ সাধুটি নিতান্ত সাধারণভাবে কথাগুলি বললেও
কথাগুলির মধ্যে গভীর সত্যের দৃঢ়তা ছিল; সঙ্গেসঙ্গে মনে হ’ল যেন দেবতার
আশীষধারার প্রাবিত হয়ে গেছি! আমার একপ হঠাৎ স্বামীপদবীতে *
পদোন্নতিলাভ হওয়াতে একটু হেসে আমি সেই নরদেহে দেবতারূপী
মহাগুরুর চরণে প্রণাম নিবেদন করলুম।

“বাবাজী—কারণ তিনি ছাড়া আর কেউ ন’ন—সেই গাছতলায় তাঁ’র

* শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজি পরে বুদ্ধগয়ার মোহান্ত মহারাজের কাছ থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে সন্ন্যাস
গ্রহণ করেন।

নিকটে একটি আসনে আমার বসতে বললেন। শরীর তাঁ'র বেশ দঢ় আর বলিষ্ঠ, দেখতে ঠিক লাহিড়ী মহাশয়ের মত! যদিও আমি এই দুই গুরু অদ্ভুত সাদৃশ্যের কথা বলবার শুনেছিলুম তবুও কিম্ব তখন তা' আমার চোখে ঠিক ধরা পড়েনি। বাবাজীর এমন একটা শক্তি ছিল যে কারুর মনে কোন বিশেষ চিন্তার উদয় হ'লে তা' তিনি নিবারণ ক'রতে পারতেন। বোধ হয় সেই মহাগুরুর এই ইচ্ছা ছিল যে তাঁ'র সামনে আমি সম্পূর্ণ স্বাভাবিকভাবেই থাকব—তাঁ'র প্রকৃত পরিচয় পেয়ে আর বেশী কিছু অভিভূত হ'য়ে পড়ব না।

“কুন্তুমেলা দেখে কি মনে হয়?”

“তাড়াতাড়ি ব'লে ফেললুম, 'আপনার দর্শন না পাওয়া পর্য্যন্ত আমি বড়ই হতাশ হয়ে পড়েছিলুম। কেন জানি না—আমার মনে হয় শাস্ত্রশিষ্ট সাধুসন্ন্যাসীদের সঙ্গে এই সব হটগোল একেবারেই খাপ খায় না।’

“গুরু মহারাজ বললেন, 'বৎস, (যদিও দেখলে তাঁ'র দুগুণ আমার বয়স ব'লে বোধ হবে) বছর দোনের জন্মে সবাইকেই একসঙ্গে বিচার ক'রে বোসো না। পৃথিবীতে সব জিনিসই ভালমন্দে মিশানো—বালির সঙ্গে চিনি যেমন। চতুর পিপীলিকার মত হও, বালি থেকে চিনির দানা খুঁটে নাও। অবিশ্রি যদিও অনেক সাধু সন্ন্যাসী এখানে এখনও মায়া আর ভ্রান্তিবশে ঘরে বেড়াচ্ছেন, কিম্ব তবুও মেলাতে এমন লোকও আছেন, যাঁ'দের প্রকৃতই ঈশ্বরলাভ হয়েছে।’

“মেলায় এই মহাগুরুর দর্শনলাভের কথা শ্রবণ ক'রে আমি তৎক্ষণাৎ তাঁ'র কথায় সায় দিলুম।

“আমি বললুম, 'ম'শায়, আমি পশ্চিমের বৈজ্ঞানিকদের কথাই ভাবছি। বুদ্ধিতে তাঁ'রা আমাদের এখানকার সমবেত অধিকাংশের চেয়েও কত বেশী বড়। কোন সুদূরদেশে ইউরোপ এমেরিকায় তাঁ'রা বাস করেন—তাঁ'দের ধর্মমতও আলাদা আর এই মেলার মত সব মেলার প্রকৃত মূল্য কি, তা'ও তাঁ'রা জানেন না। তাঁ'রা ভারতবর্ষের ধর্মগুরুদের সাক্ষাৎ পেলে খুবই উপকৃত হ'তে পারেন। কিম্ব বুদ্ধিবৃত্তিতে তাঁ'রা খুব উন্নত হ'লেও বহু প্রতীচীবাসী একে-বারে দারুণ জড়বাদী। অপর সকলে বিজ্ঞান বা দর্শনশাস্ত্রে সুপণ্ডিত হ'লেও সকল ধর্ম যে মূলতঃ এক, সে কথাটা তাঁ'রা মানেন না। তাঁ'দের বিশ্বাসটাই হচ্ছে এক দুর্লভ্য বাধা, যা' আমাদের কাছ থেকে তাঁ'দেরকে বরাবরই পৃথক ক'রে রেখেছে।’

“গুনে বাবাজীর মুখ আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। বললেন, ‘দেখছি যে তোমার প্রাচ্য আর প্রতীচ্য এই দুই দেশের জন্তেই বিশেষ আগ্রহ রয়েছে। কি পূর্ব কি পশ্চিম সকল দেশের লোকেদের জন্তেই তোমার উদারহৃদয় যে কৈদে উঠেছে তা’ আমি টের পেয়েছি, তা’ই তোমাকে এই জায়গায় টেনে এনেছি।

“তিনি বলতে লাগলেন, ‘পূর্ব আর পশ্চিম এই দুই দেশের মধ্যে কৰ্ম্ম আর ধৰ্ম্মসাধনার স্বর্ণসেতু রচনা করা উচিত। পশ্চিমের কাছ থেকে পার্থিব উন্নতিহিসেবে ভারতবর্ষের যেমনি অনেক কিছু শেখবার আছে, তেমনি তাঁর প্রতিদানে ভারতবর্ষও পশ্চিমকে এমন এক সার্বজনীন প্রণালী শিক্ষা দিতে পারে যা’তে ক’রে সে যোগবিজ্ঞানের সুদৃঢ়ভিত্তির উপর তাঁর ধৰ্ম্মমত প্রতিষ্ঠিত করতে সমর্থ হ’তে পারে।

“স্বামীজি, পূর্বপশ্চিমের সুসঙ্গতভাবে ভবিষ্যত আদানপ্রদানের কাষে তোমার অংশ গ্রহণ করতে হবে। বছরকতক বাদে আমি তোমার কাছে একটি শিষ্য পাঠাব যা’কে পশ্চিমে যোগপ্রচারের কাষে তৈরী ক’রে নিতে হবে। সেখানে বহু ধৰ্ম্মপিপাসু আত্মার আকুল আহ্বান বন্ধার মত আমার কাছে এসে পৌঁছেছে! আমি টের পাচ্ছি যে আমেরিকা আর ইউরোপে বহু ভাবী সাধুসন্তরা জাগরিত হ’বার জন্তে অপেক্ষা করছেন—তাঁদের নিদ্রা-ভঙ্গ করা এখন দরকার।’”

তাঁর গল্পের এই স্থানে শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজি তাঁর পূর্ণদৃষ্টি আমার মুখের উপর স্থাপিত করলেন।

মিথু চন্দ্রালোকে চারিদিক তখন হাস্ছে, প্রকৃতির একটা শাস্ত মধুরিমা সকলের অন্তরে ছায়াপাত ক’রে একটা মিথুপেলব স্পর্শ বুলিয়ে দিয়েছে; বন তখন আনন্দে ভরপুর।

শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজি একটু হেসে শুরু করলেন, “বৎস, তুমিই হ’চ্ছ সেই শিষ্য, যা’কে বাবাজী মহারাজ বহুবছর পূর্বে আমার কাছে পাঠিয়ে দেবার প্রতিজ্ঞা করেছিলেন।”

গুনে অবশ্য খুবই খুসী হ’লুম যে বাবাজীই আমাকে শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজির কাছে এনে ফেলবার ব্যবস্থা করেছিলেন, কিন্তু এও আমি তখন কিছুতেই ভেবে উঠতে পারলুম না যে আমার ভক্তিতাজন গুরুদেব আর তাঁর এই

শাস্ত্রসাম্পদ আশ্রম ত্যাগ ক'রে আমি পশ্চিমে গিয়ে থাক্বে কি ক'রে আর কি নিয়ে!

যা'ক, শ্রীষুক্তেশ্বর গিরিজি তা'রপর বলতে শুরু করলেন, “বাবাজী তখন ভগবদ্গীতা সম্বন্ধে বলতে লাগলেন। তাঁ'র কতকগুলো আমার প্রশংসার কথা শুনে আশ্চর্য্য হয়ে গেলুম যে গীতার বিভিন্ন অধ্যায়ের আমি যে সব ব্যাখ্যা লিখেছি সে খবরও তিনি জানেন।

“তা'রপর সেই মহাশুরু বললেন, ‘স্বামীজি, আমার একটা অনুরোধ, আর একটি কাষের ভার তোমায় নিতে হ'বে। তুমি খ্রীষ্টিয় আর হিন্দুধর্ম-শাস্ত্রের মূলগত ঐক্য প্রদর্শন ক'রে একটি ছোট্ট বই লেখ না কেন? এই দুই শাস্ত্র থেকে সমভাবের উক্তিসকল পাশাপাশি উদ্ধৃত ক'রে দেখিয়ে দাও যে ঈশ্বরের প্রিয়ভক্তেরা সবাই একই সত্য কয়ে গেছেন—এখন তা' মানুষের সাম্প্রদায়িকতার অজ্ঞানতমসায় আচ্ছন্ন।’

কতকটা সংশয়ের সঙ্গে বললুম, “মহারাজ, এ আপনার কি অদ্ভুত আদেশ! এ কি আমি পালন করতে পারব?”

“বাবাজী মৃদু মধুর হেসে আশ্বাস দিয়ে বললেন, ‘বাবা, সন্দেহ হচ্ছে কেন, এঁা? আরে এ কা'র কাষ আর সবকাষ কেই বা করায় ব'ল? ভগবান আমায় দিয়ে যা' কিছুই বলাচ্ছেন না কেন, তা' সব সত্য হয়ে ফলে যেতে বাধ্য।’

“সাধুমহারাজের আশীর্ব্বাদে মনে নববলের সঞ্চার হ'ল, বই লিখতে সম্মত হ'লুম। যা'বার সময় উপস্থিত দেখে নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও উঠে দাঁড়ালুম।

“গুরুমহারাজ জিজ্ঞাসা ক'রলেন, ‘লাহিড়ীকে জান? একজন মহাপুরুষ কি ব'ল? আমাদের দেখা হয়েছে তা' তা'কে বোলো।’ ব'লে লাহিড়ী মহাশয়কে জানাবার জন্তে আমায় একটা খবর দিলেন।

“বিদায়গ্রহণকালে ভক্তিভরে প্রণাম ক'রে উঠতেই তিনি মধুর হেসে বললেন, ‘তোমার বই লেখা শেষ হ'লেই আমি তোমায় দর্শন দেব—উপস্থিত এখন বিদায়।’

“তা'র পরদিনই এলাহাবাদ পরিত্যাগ ক'রে কাশীর ট্রেন ধরলুম। গুরুদেবের বাড়ী পৌঁছেই আমি কুস্তমেলার সেই অপূর্ব সাধুটির সমস্ত বিবরণ তাঁ'র কাছে সবিস্তারে বর্ণনা করলুম।

“শুনে লাহিড়ী মহাশয়ের চোখ দুটি আনন্দে নেচে উঠল, ব’লে উঠলেন, ‘আরে তাঁকে চিনতে পারলে না—ওঃ, দেখছি যে তা’ত’ তুমি পারবে না কারণ তিনি ইচ্ছে ক’রেই ধরা দেন নি। তিনিই হচ্ছেন আমার অদ্বিতীয় গুরুদেব—পরম ভাগবত বাবাজী মহারাজ।’

“স্তম্ভিত হয়ে বললুম—‘বাবাজী। ব’লেন কি ম’শায় যোগিশ্রেষ্ঠ বাবাজী মহারাজ! এঁা, আমাদের পতিতপাবন বাবাজী—যিনি কখনও দৃশ্য কখনও অদৃশ্য! হায় হায়, একবার যদি সে দিন আজ ফিরে আসে আর তাঁর দর্শন পাই, তা’হ’লে তাঁর চরণকমলে ভক্তিবিবেদন ক’রে যে একেবারে ধগ্গ হ’য়ে যাই!’

“লাহিড়ী মহাশয় সাস্থনা দিয়ে বললেন, ‘যা’ক, কিছু ভেবো না—তিনি ত’ তোমায় দেখা দেবেন প্রতিজ্ঞা করেছেন, তবে আর ভাবনা কি?’

“তা’রপর বললুম, ‘গুরুদেব, বাবাজী মহারাজ আপনাকে একটি খবর দিতে বলেছেন। তিনি বললেন, “লাহিড়ীকে বোলো যে এ জীবনের দক্ষিণ শক্তি সব কুরিয়ে আসছে—প্রায় শেষ হয়ে এল আর কি।”’

“এই রহস্যময় কথাগুলো উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গেই লাহিড়ী মহাশয়ের দেহ থর থর ক’রে কাঁপতে লাগল—যেন বিদ্যুৎপ্রবাহ স্পর্শ করেছে। মুহূর্ত্ত-মধ্যে তাঁর চারদিকে সব কিছু একেবারে নিস্তব্ধ হ’য়ে গেল, তাঁর সদাহাস্যময় আনন একেবারে অদ্ভুতভাবে কটিন হয়ে উঠল। আসনের উপর কাঠের মূর্ত্তির মত গম্ভীর আর নিশ্চল তাঁর দেহ একেবারে বর্ণহীন হয়ে পড়ল। দেখেগুনে ভয় পেয়ে গিয়ে আমার বুদ্ধিশুদ্ধি সব একেবারে লোপ পেলে। এমন সদানন্দময় পুরুষের এমন ভীতিপ্রদ গাম্ভীর্য আমি জীবনে আর কখনও দেখি নি। উপস্থিত অত্যাশ্চর্য শিবোরাও ভয়ে ভয়ে চারিদিকে তাকাতে লাগল।

“গভীর নিস্তব্ধতার মধ্যে তিন ঘণ্টা কেটে গেল। কিছুক্ষণ চুপ ক’রে বসে থাকবার পর লাহিড়ী মহাশয় পুনরায় তাঁর স্বাভাবিক প্রফুল্লভাব ধারণ করলেন, তা’রপর প্রত্যেক চেলারই সঙ্গে সম্মেহে কথাবার্তা কইতে লাগলেন। সকলে হাঁফ ছেড়ে বাঁচল।

“গুরুদেবের এই প্রতিক্রিয়াতে আমি বুঝতে পারলুম যে বাবাজী মহাশয়ের সংবাদে এমন একটা নিশ্চিত ইঙ্গিত ছিল যা’তে ক’রে লাহিড়ী মহাশয়

টের পেয়েছিলেন যে তাঁকে শীঘ্রই দেহরক্ষা করতে হ’বে। তাঁর ভয়ঙ্কর গাভীর্ঘ্যে প্রমাণিত হ’ল যে আমাদের গুরুদেব তৎক্ষণাৎ সঙ্গে সঙ্গে আত্মসংযম ক’রে এখানকার পাখিব আকর্ষণের শেব বন্ধনটুকু ছিন্ন ক’রে সেই পরম-পুরুষের অনন্তসত্তার সঙ্গে মিলিত হয়েছিলেন। বাবাজীর উক্তিতে তাঁর বলার ধরণই ছিল যে, ‘আমি তোমার সঙ্গে সঙ্গে সর্বদাই থাকব।’

“বদিও বাবাজী আর লাহিড়ী মহাশয় উভয়েই সর্বদশী ছিলেন আর আমার বা অথ কোনও মধ্যস্থের দ্বারা পরস্পরের সঙ্গে সংযোগরক্ষা করবার তাঁদের কোনও আবশ্যকতা ছিল না, তবুও এই সব বড় বড় মহাগুরুগণ প্রায়ই এই সংসারের নাটকাভিনয়ে সাধারণ মানবচরিত্রের অংশই গ্রহণ ক’রে থাকেন। মাঝে মাঝে তাঁরা কোন লোকমারফত অত্যন্ত সাধারণ ভাবেই তাঁদের ভবিষ্যদ্বাণী প্রেরণ করেন, যা’তে ক’রে ভবিষ্যতে সেগুলো ফলে গেলে লোকে পরে তাঁদের কথা শুনে দৈবে আরও প্রগাঢ় বিশ্বাস স্থাপন করতে পারে।

শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজি ব’লে যেতে লাগলেন, “কাশী ছেড়ে শীগ্গিরই শ্রীরামপুরে ফিরলুম, বাবাজীর অনুরোধে শাস্ত্রসম্বন্ধে লেখা সুরু করবার জগ্গে। লেখা সুরু করবার সঙ্গে সঙ্গেই সেই অমরগুরুর নামে উৎসৃষ্ট এক কবিতা আমি রচনা ক’রে ফেললুম। কলমের মুখ দিয়ে বিনাপ্রয়াসেই শ্রুতিমধুর পদগুলি বেরিয়ে এসে একটি সুন্দর কবিতা রচিত হয়ে গেল—আশ্চর্যের বিষয় এই যে এর পূর্বে আমি সংস্কৃতকবিতা রচনা করবার জগ্গে কখন চেষ্টা পর্যন্তও করি নি।

“এক নীরব নিশীথে, বাইরের কোলাহল যখন সব থেমে এসেছে—চিন্তার পক্ষে যখন উপযুক্ত অবসর, তখন বাইবেল আর সনাতন ধর্মশাস্ত্রের* তুলনা-

* বৈদিকধর্মের শিক্ষাসমষ্টিকেই সনাতনধর্ম এই নাম প্রদত্ত হয়েছে। সিদ্ধুন্দের তীরবর্তী বাসিন্দাদের গ্রীকেরা হিন্দু আখ্যা প্রদান করতে তাদের ধর্ম সনাতনধর্ম নামে অভিহিত হয়েছে। হিন্দু নামের প্রকৃত অর্থ হচ্ছে বা’রা সনাতনধর্ম অথবা হিন্দুধর্ম পালন করে। “ইণ্ডিয়ান” কথাটি কিন্তু ভারতভূমির হিন্দু মুসলমান ও অন্যান্য অধিবাসীদের প্রতি সমভাবেই প্রযুক্ত হয় (আর কলহাসের ভ্রান্তিবশতঃ আমেরিকার মঙ্গোলীয় আদিম অধিবাসীদের প্রতিও)।

ভারতবর্ষের প্রাচীন নাম হচ্ছে “আর্যাবর্ত” অর্থাৎ আর্যদিগের আবাসভূমি। সংস্কৃত ৯ ধাতুর ব্যুৎপত্তিলভা অর্থ হচ্ছে জ্ঞানশীল অর্থাৎ “মানী, পূজ্য, শ্রেষ্ঠ।” পরে নৃতত্ত্বে “আর্য্য” কথাটির

মূলক সমালোচনা আরম্ভ করলুম। প্রভু যীশুখৃষ্টের বাণী উদ্ধৃত ক'রে দেখালুম যে বেদের অন্তর্নিহিত সত্যের সঙ্গে তাঁ'র শিক্ষা মূলতঃ এক! যা'ই-হোক, অল্পসময়ের মধ্যেই পুস্তকরচনা শেষ হয়ে গেল। আমি অবশ্য বুঝতে পেরেছিলুম যে অতিদ্রুত রচনা শেষ করা আমার পরমগুরু মহারাজের* আশীর্বাদের জোরেই সম্ভবপর হয়েছে। অধ্যায়গুলি প্রথমতঃ 'সাধুসম্বাদ' নামক পত্রিকায় প্রকাশিত হয়, তা'রপরে সেগুলি পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়েছে।†

গুরুদেব বলতে লাগলেন, “লেখা শেষ করবার পরদিন সকালে এখানকার রায়ঘাটে গেলুম গঙ্গাস্নান সাবতে। লোকজন সেখানে তখন কেউ ছিল না; খানিকক্ষণ রোদে দাঁড়িয়ে একটু আরাম উপভোগ করলুম। তা'রপর জলে গোটাকতক ডুব দিয়ে বাড়ীমুখো ফিরলুম। পথঘাট নির্জন, কোনও সাড়াশব্দ নাই। সেই নিস্তব্ধতার মধ্যে একমাত্র শব্দ শুনতে পাওয়া যাচ্ছে প্রতি পদক্ষেপে আমার গঙ্গানাওয়া ভিজেকাপড়ের শপশপ শব্দ! গঙ্গার তীরে একটা খুব বড় বটগাছ ছিল, সে জায়গাটা পেরিয়ে আসতেই মনে কেমন যেন একটা প্রবল ইচ্ছার উদয় হ'ল যে পিছন ফিরে একবার তাকাই। ফিরে দেখি যে সেই প্রকাণ্ড বটগাছের ছায়ায় ব'সে বাবাজী মহারাজ আর তাঁ'কে ঘিরে ব'সে তাঁ'র গুটিকতক শিষ্য।

“‘স্বাগত, স্বামীজি!’ মহাগুরুর মধুর কণ্ঠস্বর কর্ণে প্রবেশ ক'রতে নিশ্চিত হনুম যে সত্যি সত্যি আমি কোন স্বপ্ন দেখছি না। বাবাজী ব'লতে লাগলেন, ‘দেখছি যে বইখানি ভালভাবেই লেখা শেষ হয়েছে—যাক, কথা দিয়েছিলুম যে আসব, তা'ই আজ এসেছি তোমায় ধন্যবাদ দিতে।’

স্বপ্নাবহারে তা'র অর্থ আধ্যাত্মিক না হ'য়ে, দৈহিক বৈশিষ্ট্য হয়ে দাঁড়াতে, স্রবিত্যাত প্রাচ্যতত্ত্ববিদগণ দার্শনিকদের একটি চমৎকার উক্তি করেছেন, “কোন নৃতত্ত্ববিদ যিনি আধ্যাত্মিকতা, আধ্যাত্মিকতা, আধ্যাত্মিকতা ও কেশ প্রভৃতির কথা বলেন, তিনি ইচ্ছেন আমার কাছে কোন ভাবাতত্ত্ববিদ যিনি দীর্ঘ রোটার অভিধান অথবা থর্ক রোটার ব্যাকরণের কথাই বলেন—তা'র মতনই সমান পাপী।”

* গুরুর গুরুকে পরমগুরু বলে। লাহিড়ী মহাশয়ের গুরু বাবাজী মহারাজ ছিলেন শ্রীযুক্তেশ্বর পিরিজির পরমগুরু, অতএব তিনি হচ্ছেন আমার পরম পরমগুরু।

† দি হোলি সায়েন্স, (ইংরেজিতে লিপিত) মূল্য—একটাকা বার আনা : যোগদা মঠ, পোঃ আঃ মাদ্রিগাদহ, দক্ষিণেশ্বরে প্রাপ্তব্য।

“দ্রুতস্পন্দিতহৃদয়ে, আনন্দে মুক হয়ে গিয়ে তাঁ’র চরণতলে গিয়ে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম ক’রে করষোড়ে নিবেদন করলুম, ‘পরমশুরুজি, এই কাছেই আমার বাড়ী, আপনি আর আপনার চেলারা দয়া ক’রে সেখানে একটু পায়ের ধুলো দিয়ে কি আমায় রুতার্থ করবেন না?’

“মহাশুরু মূহূহাশ্রে তা’ প্রত্যাখ্যান ক’রে বললেন, ‘না বাছা! আমাদের এই গাছতলাটুকুই ভাল; কেন, এ জায়গা ত’ বেশ আরামের—কোনই কষ্ট নেই।’ কি আর করি, অগত্যা আর কোন উপায় না দেখে কাতরনয়নে সান্ত্বনয়ে তাঁ’কে নিবেদন করলুম, ‘পরমশুরু মহারাজ, দয়া ক’রে এখানে একটু অপেক্ষা করুন, কিছু ভাল মিষ্টি নিয়ে আমি এখনিই ফিরে আসছি!’ মিনিটকতক বাদেই আমি কিছু মিষ্টি নিয়ে ফিরে এলুম। এসে দেখি, কি আশ্চর্য্য! সেই বিরাট গাছতলায় বাবাজী বা তাঁ’র দলবলের চিহ্নমাত্রও নাই! ঘাটের চারদিকে তন্নতন্ন ক’রে খুঁজলুম—নাঃ, কোথাও আর তাঁ’দের দেখতে পাওয়া গেল না, মনে মনে বুঝলুম যে তাঁ’রা শূন্যে অদৃশ্য হয়েছেন!

“মনে গভীর আঘাত পেলুম—এ কি! তাঁ’দের একটু আদরআপ্যায়ন করার জগ্গে বাড়ী থেকে গোটাকতক মিষ্টি আনতে গেছি, এসে দেখি কি তাঁ’রা আর নাই, একদম অদৃশ্য হয়ে গেছেন আর আমার আসার অপেক্ষাটুকুও সহিল না! ‘যাক্, এবার আমাদের দেখা হ’লেও তাঁ’র সঙ্গে আর কথাই কইব না! নিতান্তই নিষ্ঠুর তিনি, এমনভাবে হঠাৎ চলে যাওয়ার মানে কি?’ এই রকম সাতপাঁচ ভাবতে ভাবতে মনে একটু রাগও হ’ল—অবিশ্রি এটা অভিমানের, তা’র বেশী আর কিছু নয়।

“মাসকতক বাদে কাশীতে লাহিড়ী মহাশয়কে দর্শন করতে গেলুম। ছোট্ট বৈঠকখানাটিতে ঢুকতেই শুরুদেব একটু হেসে আমায় বললেন,—

“‘এস, এস, যুক্তেশ্বর; আচ্ছা আসবার সময় কি তুমি ঘরের দোর-গোড়ায় বাবাজী মহারাজকে দেখতে পেলেন?’

“আশ্চর্য্য হ’য়ে বললুম, ‘কই, না ত’!’

“‘আচ্ছা, তা’ হ’লে এস এখানে’, ব’লে লাহিড়ী মহাশয় আমার কপালের মাঝখানে হাত দিয়ে মূহূস্পর্শ করলেন, সঙ্গে সঙ্গে দেখতে পেলুম দরজার কাছে দাঁড়িয়ে বাবাজীর জীবন্তমূর্ত্তি একটি পরিপূর্ণ প্রস্ফুটিতশতদলের মত পরমানন্দের অন্নান আলোকে আপনি ঝলমল।

“আমার সেই পুরান আঘাতের কথা মনে পড়ল। প্রণাম ক’রলুম না। লাহিড়ী মহাশয় অত্যন্ত আশ্চর্য্য হ’য়ে আমার দিকে তাকিয়ে রইলেন।

“বাবাজী মহারাজ তাঁ’র গভীর অতল মেহকোমল চোখদুটি আমার দিকে ফিরিয়ে বললেন, ‘তুমি আমার উপর বিরক্ত হয়েছ, না?’

“আমি বললুম, ‘কেনই বা হ’ব না ম’শায়! আপনার ভোজবাজির দলবল নিয়ে আপনি শূন্য থেকে উড়ে এলেন আবার সেই শূন্যেতেই মিলিয়ে গেলেন—না পারলুম আপনার সেবা ক’রতে, না পারলুম বা দুটো কথা কইতে! দুঃখ হবে না, রাগ হ’বে না ত’, কি হ’বে ব’লুন ত’?’

“বাবাজী অতি স্নিগ্ধমধুর হেসে বললেন, ‘আমি শুধু বলেছিলুম যে আমি তোমার সঙ্গে দেখা করব—কিন্তু কতক্ষণ ধ’রে থাকব, তা’ত আমি কিছু বলিনি! তুমি তখন খুবই উত্তেজিত হয়ে উঠেছ। তবে অবিশ্রি আমি একথা বলব যে তোমার চঞ্চলতার দাপটে আমি প্রায় শূন্যেই মিলিয়ে গিয়েছিলুম আর কি!’

“এই সরল উত্তরে আমার মনের সকল ক্ষোভ তৎক্ষণাৎ দূর হয়ে গেল। তাঁ’র চরণতলে নতজানু হয়ে বসলুম; বাবাজী মহারাজ স্নেহে আমার কাঁধ চাপড়ে দিলেন।

“তা’রপর বাবাজী আমায় বললেন, ‘বাবা, আরও ধ্যান কর, আরও ধ্যান কর, তোমার দৃষ্টি এখনও বেশ নির্দোষ হয় নি; স্বর্ঘ্যের আলোর পিছনে যে আমি লুকিয়ে আছি, তা’ত তুমি আমায় দেখে বা’র করতে পারলে না।’ স্বর্গীয় মধুর বংশীধ্বনির মত এই কথাগুলি ব’লেই বাবাজী মহারাজ গুপ্ত জ্যোতির মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজি বললেন, “গুরুদর্শনের জন্মে কাশী যাওয়া সেই বোধ হয় আমার শেষ বা তা’রপর এক আধবার হয়ত’ গিয়েছিলুম। কুস্ত-মেলায় বাবাজীও ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে লাহিড়ী মহাশয়ের জীবন শীঘ্রই শেষ হয়ে আসছে। ১৮৯৫ সালের গ্রীষ্মকালে তাঁ’র বলিষ্ঠ দেহের পৃষ্ঠদেশে একটি ক্ষুদ্র স্ফোটকের উৎপত্তি হ’ল। তিনি শস্ত্রপ্রয়োগ করতে পারেন, কারণ তিনি নিজদেহে তাঁ’র কতকগুলি শিষ্যের কন্মফল ক্ষয় ক’রে নিচ্ছিলেন। শেষে তাঁ’র কতকগুলি শিষ্য খুব জোরজবরদস্তি করাতে গুরুদেব রহস্যময়ভাবে উত্তর দিলেন, ‘শরীর বাওয়ার একটা কারণ ত’ হওয়া

চাই ; আচ্ছা তোমাদের যা’ ইচ্ছে ক’রতে হয় কর, তা’তেই আমি রাজি, কোন আপত্তিই আমি আর করব না।’

অল্প কিছুকাল পরেই সেই গুরুশ্রেষ্ঠ অদ্বিতীয় লাহিড়ী মহাশয় কাশীতে তাঁ’র দেহরক্ষা করেন। তাঁ’র সেই ছোট্ট বৈঠকখানাটিতে আর আমার তাঁ’র দর্শনলাভের জন্ত যেতে হয় না। এখন আমার জীবনের প্রতিটি দিনই তাঁ’র সর্বব্যাপী আবির্ভাবের আশীর্বাদপূত !”

বহুরকতক বাদে, তাঁ’র একজন খুব উন্নতশিষ্য স্বামী কেশবানন্দ মহারাজের * মুখ থেকে লাহিড়ী মহাশয়ের তিরোধানের বহু আশ্চর্যজনক ঘটনার বিবরণ শুনতে পাই।

কেশবানন্দজী বলেছিলেন, “আমার গুরুদেব তাঁ’র দেহরক্ষা করাবাব অল্প কিছুদিন আগেই হরিদ্বারে আমার আশ্রমে সশরীরে আবিভূত হয়ে আমাকে দর্শনদান করেন।’ ‘কাশীতে এখনুই চলে এস।’ ব’লেই তিনি সঙ্গেসঙ্গে অদৃশ্য হ’য়ে গেলেন।

“কাশীর গাড়ী কালবিলম্ব না ক’রে তখনই গিয়ে ধ’রলুম। গুরুদেবের বাড়ীতে পৌঁছেই দেখলুম যে বহু শিষ্য সেখানে সমবেত হয়েছেন। সেইদিন ঘটাকতক ধ’রে তিনি গীতা ব্যাখ্যা করলেন ;† তা’রপর তিনি আমাদের শুধু বললেন, ‘এবার আমি বাড়ী যাচ্ছি।’ শুনে সমবেত শিষ্যমণ্ডলী আসন্ন-বিচ্ছেদের আশঙ্কায় অবিরাম ক্রন্দনের বেগে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল।

“‘তোমরা শান্ত হও, কোন ভাবনা নেই ; আবার আমি তোমাদের দেখা দেব।’ এই কথাগুলি ব’লে তিনি তাঁ’র দেহটিকে তিনবার চক্রাকারে গরিয়ে নিয়ে উত্তরমুখ হয়ে পদ্মাসনে বসলেন, তারপর পরিপূর্ণ আধ্যাত্মিক গরিমার মধ্যে মহাসমাধিতে নিমগ্ন হ’লেন।‡

* আমার কেশবানন্দজীর আশ্রমদর্শন ৪২শ পরিচ্ছেদে বর্ণিত হয়েছে।

† ১৮৯৫ সালের ২৬শে সেপ্টেম্বর তারিখে লাহিড়ী মহাশয় দেহত্যাগ করেন। আর দিনকতক হ’লেই তাঁ’র বয়স আটবাড়ি বছর পূর্ণ হ’ত।

‡ শরীরকে তিনবার চক্রাকারে ঘুরিয়ে উত্তরমুখে হয়ে উপবেশন হ’চ্ছে বৈদিকক্রিয়াকাণ্ডের একটি অংশ আর তা’ অনুসৃত হ’ত বড় বড় মহাগুরুদের দ্বারা, যাঁরা পূর্ব হ’তেই জানতে পারতেন যে তাঁ’দের অন্তিমসময় নিকটবর্তী হয়ে এসেছে। শেষখানে বসে গুরু যখন পরমসত্যায় বিলীন হন তখন তাঁকে বলা হয় মহাসমাধি।

“ভক্তদের প্রাণপ্রিয় লাহিড়ী মহাশয়ের অনবগ্ন দেহ পবিত্র গঙ্গাতীরে মণিকর্ণিকা ঘাটে দাহ করা হ’ল। শেষকৃত্যের সময় গৃহস্থের সমস্ত অমুষ্ঠান যথোচিত গাভীর্যের সঙ্গে পালন করা হয়েছিল।” কেশবানন্দজী বলতে লাগলেন, “তা’র পরদিন—সেদিনও আমি কাশীতে, সকালবেলা প্রায় দশটা নাগাদ আমার ঘরটি হঠাৎ এক অপূর্ণ জ্যোতিঃতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। আশ্চর্য্য! চেয়ে দেখি যে রক্তমাংসের শরীরে লাহিড়ী মহাশয় আমার চোখের সামনে দাঁড়িয়ে! তা’র মূর্তি ঠিক আগেকারই মত, শুধু এইটুকুমাত্র পরিবর্তন ঘটেছে যে, তা’ যেন আরও বেশী তরুণভাবাপন্ন আর জ্যোতিঃসমুজ্জ্বল।

“আমার গুরুদেবতা তখন আমার সঙ্গে কথা কইলেন। তিনি বললেন, ‘কেশবানন্দ, এ আমি। আমার দাহকরা শরীরের শূত্রবিলাসী অণুপরমাণু হ’তে আবার আমার মূর্তির পুনরুত্থান হয়েছে। পৃথিবীতে আমার গৃহস্থের কর্তব্য শেষ হয়েছে। কিন্তু আমি এ পৃথিবী ছেড়ে একেবারে যাচ্ছি না। এরপর আমি বাবাজীমহারাজের সঙ্গে হিমালয়ে কিছুকাল কাটিয়ে তা’রপরে তা’র সঙ্গে অন্তরীক্ষে বাস ক’রব।’

কয়েকটি আশীর্বাদী উচ্চারণ ক’রে সেই অদ্বিতীয় মহাগুরু তখন অদৃশ্য হয়ে গেলেন; আশ্চর্য্য একটা উদ্দীপনা এসে আমার অন্তর পরিপূর্ণ ক’রে দিলে। যীশুখৃষ্ট আর কবিরের* জড়দেহের মৃত্যুর পর তা’দের জীবন্তদেহ দর্শন ক’রে তা’দের শিষ্যদের মনে যেমন অপূর্ণতাবের সঞ্চার হয়েছিল আমার মনে তেমনি একটা উন্নততাবের উদয় হ’ল!

* মৃতকবীর হ’ছেন ষোড়শশতাব্দীর মহাগুরু, তা’র বহু হিন্দু ও মুসলমান শিষ্য ছিলেন। দেহরক্ষার সময়ে তা’র শেষকৃত্যের ব্যবস্থা নিয়ে এই উভয়বিধ শিষ্যদের মধ্যে বিবাদ উপস্থিত হ’ল। মহাগুরু অত্যন্ত বিব্রত হয়ে তা’র মহানিদ্রা থেকে উখিত হয়ে উপদেশ দিলেন—তা’র দেহাবশেষের অর্ধাংশ মুসলমানধর্ম্মানুযায়ী প্রোথিত করা হ’বে আর অপরার্ধাংশ হিন্দুসংস্কারানুযায়ী দাহ করা হ’বে। তা’রপরেই তিনি অদৃশ্য হয়ে গেলেন। শিষ্যের দল শবাচ্ছাদন বস্ত্র উত্তোলিত করতেই দেখা গেল, শবের পরিবর্তে সেখান গুচ্ছগুচ্ছ পুষ্প সজ্জিত রয়েছে। এর অর্ধাংশ মুসলমানেরা মবর নামকস্থানে তা’র ষড়্ভিপ্রায়ানুযায়ী প্রোথিত করেন। উক্তস্থান অদ্যাবধি তীর্থরূপে পূজা পেয়ে আসছে। অপরার্ধাংশ হিন্দুমতে দাহ করা হ’ল।

যোবনে কবীরের নিকট দুইটি শিষ্য এসে উপস্থিত হ’য়ে ঈশ্বরলাভের জন্তে সূক্ষ্মজ্ঞানমার্গে প্রবেশপথের নির্দেশ অনুসন্ধান করাতে কবীর শুধু বললেন—

“পাথর সন্ধান করলেই দূরত্বের কথা এসে পড়ে: তিনি যদি তোমার নিকটেই থাকেন, তবে আর পাথর খোঁজের দরকার কি? তাই যখন ভাবি যে গভীরজলে মীন পিয়াসী তখন আমার বড় হাসি পায়,—

‘পানী বিচ মীন পিয়াসী,
সোতি হুন হুন অব ত’ হাঁসী।’”

“কেশবানন্দজী বলতে লাগলেন, ‘হরিদ্বারের নির্জন আশ্রমে ফিরে যাবার সময় আমি আমার গুরুদেবের পবিত্র চিতাভস্ম সযত্নে সংগ্রহ ক’রে নিয়ে গিয়েছিলুম। আমি জানি যে, দেশকালে সীমাবদ্ধ এই দেহপিঞ্জর থেকে তিনি পালিয়ে গেছেন; তাঁ’র সর্বব্যাপী প্রাণপাখী আজ মুক্ত! তবুও তাঁ’র পুণ্য দেহাবশেষ সমাধিস্থ ক’রে হৃদয় কতকটা শান্ত হ’ল!’

আর একটি শিষ্য যিনি মৃত্যুর পর পুনরাবিভূত গুরুর মূর্তি দর্শন ক’রে কৃতার্থ হয়েছিলেন, তিনি হচ্ছেন সাধুপ্রকৃতি পঞ্চানন ভট্টাচার্য্য মহাশয়—আর্য্য-মিশন ইনস্টিটিউশনের প্রতিষ্ঠাতা।* কলকাতার বাড়ীতে আমি পঞ্চানন বাবুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলুম; গুরুর সঙ্গে তাঁ’র বহুবৎসর অবস্থিতির কাহিনী শুনে বিশেষ আনন্দলাভ করলুম। পঞ্চাননবাবু তাঁ’র জীবনের সর্বাপেক্ষা আশ্চর্য্যজনক যে ঘটনা ব’লে তিনি শেষ করেন, তা’ হচ্ছে এই—

“লাহিড়ী মহাশয়ের শেষরুত্যের পরের দিন বেলা ঠিক দশটার সময় এই কলকাতার বাড়ীতে তিনি এখানে এসে আমার সশরীরে দেখা দিয়ে যান।”

*লাহিড়ী মহাশয়ের উপদেশে পণ্ডিত পঞ্চানন ভট্টাচার্য্য মহাশয় গীতাপাঠ লোকপ্রিয় করবার উদ্দেশ্যে গীতাপ্রচারের জন্ত “আর্য্যমিশন গীতা” নামে গীতার এক মূলভ হিন্দী ও বাঙ্গলা সংস্করণ বাংলাদেশে প্রথম প্রকাশিত করেন। পঞ্চানন ভট্টাচার্য্য মহাশয় সাঁওতালপরগণার বৈজ্ঞান্যধামে (দেওঘর) পঞ্চাশবিঘার উপর এক উদ্যানবাটিকায় একটি শিবমন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। সেখানে লাহিড়ী মহাশয়ের একটি তৈলচিত্র রক্ষিত আছে।

১৯২৭ সালে, লাহিড়ী মহাশয়ের শতবার্ষিকী উপস্থিত হ’লে, তাঁ’র পৌত্র শ্রীআনন্দমোহন লাহিড়ী পুণ্য উৎসবটি পালনে উন্মুখ হ’ন। লাহিড়ী মহাশয়ের কোন প্রতিমূর্তি না থাকায়, মনে মনে তাঁ’র একান্ত বাসনা ছিল যে লাহিড়ী মহাশয়ের একটি মন্মুরমূর্তির প্রতিষ্ঠা হয়। আশ্চর্য্যের বিষয়, শ্রীআনন্দমোহন লাহিড়ী কৃষ্ণনগরের স্থবিখ্যাত মুংশিল্লী ও ভাস্কর বহুনাথ পাল মহাশয়ের নিকট হ’তে লাহিড়ী মহাশয়ের একটি মন্মুরমূর্তি প্রাপ্ত হ’ন। বহুনাথবাবু বলেন যে, লাহিড়ী মহাশয়ের প্রস্তরমূর্তি গঠন ক’রে তাঁ’র পৌত্রকে সেটি উপহার দেবার জন্তে তিনি দৈবাদেরশ প্রাপ্ত হ’ন।

শ্রীভূপেন্দ্রনাথ সান্নাল মহাশয় (লাহিড়ী মহাশয়ের সাক্ষাৎ শিষ্য; ইনি নিজের গভীর পাণ্ডিত্যপূর্ণ গীতার টিকা রচনা ছাড়া লাহিড়ী মহাশয়ের যে টিকা বহুকাল ধ’রেই ছাপা ছিল না, তা’ও তাঁ’র গীতা-সম্পাদনায় সংযোজিত করেছেন) যোগাবতার লাহিড়ী মহাশয়ের মন্মুরমূর্তি তাঁ’র পুরী ও মন্দির পাহাড়ের আশ্রমসমূহে প্রতিষ্ঠা করেছেন।

লাহিড়ী মহাশয়ের মূর্তি এখন আরও অনেক জায়গাতেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে—মালিপুর; রাঁচির ব্রহ্মচর্য্য বিদ্যালয়ভূমিতে মন্দিরমধ্যে, কাশীতে তাঁ’র নিজবাটির ক্ষুদ্র বৈঠকখানায় আর আমেরিকার লস এঞ্জেলিস সহরে সেলুফ্-রিয়ালাইজেশন্স চার্চ অফ্-অল রিলিজেন্সের প্রতিষ্ঠানে।

স্বামী প্রণবানন্দজীও—সেই “হুই দেহধারী সাধু”, তাঁ’র অতীন্দ্রিয় অভিজ্ঞতার কথা আমাদের বলেছিলেন।

রাঁচি বিদ্যালয়ে যখন প্রণবানন্দজী বেড়াতে আসেন তখন একদিন তিনি আমাদের বলেন যে, “লাহিড়ী মহাশয় দেহরক্ষা করবার অল্প কিছুদিন আগে আমি তাঁ’র কাছ থেকে একখানি পত্র পাই, তা’তে আমাদের অবিলম্বে কাশীতে রওনা হ’বার কথা লেখা ছিল। আমার কিন্তু কিছু দেরী হয়ে গিয়েছিল, সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে পড়তে পারি নি। যাবার উদ্যোগ আয়োজন করছি—বেলা তখন দশটা, তখন হঠাৎ দেখি গুরুদেবের উজ্জল মূর্তি আমার সামনে দাঁড়িয়ে, নিশ্চয়ে আনন্দে অভিভূত হয়ে পড়লাম।

“লাহিড়ী মহাশয় তখন একটু হেসে বললেন, ‘আর এখন তাড়াতাড়ি কাশী যাওয়া কেন? আর ত’ তুমি সেখানে আমার দেখতে পাবেন না।’

“কথাগুলির অর্থ যখন পূর্ণভাবে জন্মজন্ম করতে পারলাম তখন শোক, দুঃখ, হতাশায়, ক্রন্দনানুগে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলাম—মনে হ’তে লাগল যে সামনে যা’ দেখছি এ তাঁ’র প্রকৃত মূর্তি নয়, কেবলমাত্র স্বপ্নেই তাঁ’কে দেখছি।

“গুরুদেব সাঙ্গনা দিয়ে আমার দিকে এগিয়ে এসে বললেন, ‘এই দেখ—আমার শরীর ছুঁয়ে দেখ, বরাবরই যেমন, আজও তেমনি আমি বেঁচে আছি, কষ্ট মরিনি ত’। ছিঃ, আমার জন্মে শোক করা কেন? তোমার সঙ্গে ত’ আমি চিরদিনই আছি, তবে আর দুঃখ কিসের?’

এই তিনটি প্রধান শিনাদের মূখ হ’তে যে আশ্চর্য ঘটনাটির উল্লেখ হয়েছিল তা’ থেকে এই সত্যটি পাওয়া যায় যে লাহিড়ী মহাশয়ের দেহ-রক্ষার পর পবিত্র গঙ্গাতীরে* মণিকর্ণিকাঘাটে সর্বসমক্ষে তাঁ’র পুণ্যদেহ

*হিন্দুরা গঙ্গাকে “মাতর্গঙ্গে” “পুণ্যসলিলা” “পতিতোদ্ধারিণী” প্রভৃতি বলে কেন? তাঁ’র এমন অনেক কারণ আছে যা’ সব পুরাণে পাওয়া যায় না। গঙ্গার উৎপত্তি হচ্ছে গভীর নিম্নকর্তা যেখান দল বিরাজমান সেই চিরতমারাবৃত হিমালয়ের একটি বরফগুহার ভিতর থেকে। পৃথিবীর সর্বোচ্চ পর্বত হিমালয় (যা’র সর্বোচ্চ চড়া গৌরীশঙ্কর, ২৯০০০ ফিট উচ্চ, মনুষ্যদ্বারা কখনও পাদস্পৃষ্ট হয় নি) মহাদেবের বাসস্থান বলে বর্ণিত। (এই পুস্তকে নরসিংহ পর্বতচূড়ায় আসীন মহাদেবের চিত্র দ্রষ্টব্য।)

কথিত আছে হিমালয়ের নদীসমূহের অধিষ্ঠাত্রীদেবীরূপে গঙ্গাদেবী স্বর্গ হ’তে মর্কট অবতরণ করেন। কাবো গঙ্গানদী আকাশ থেকে অবতরণ ক’রে মহাদেবের জটাভূটের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হ’ন বলে বর্ণিত হয়েছে। প্রতীচাদেশবাসী,—এফ্. ডব্লিউ. টমাস “লিগেসী অফ্. ইণ্ডিয়া”য় লিখছেন,

চিতাগ্নিতে ভস্মসাৎ করার পরদিন সকালে বেলা দশটা নাগাদ, তিনটি বিভিন্ন সহরে তাঁর তিনটি প্রধানশিষ্যের সম্মুখে প্রকৃতই রক্তমাংসের শরীরে লাহিড়ী মহাশয় প্রত্যক্ষভাবে আবিভূত হয়েছিলেন।

“সুতরাং যখন এই নশ্বরদেহ অক্ষয়ত্ব লাভ করবে আর এই মরজীবন অমরত্ব লাভ করবে তখন যেই উক্তি লিখিত আছে তা’ই ঘটবে। মৃত্যু বিজিত। মরণ, তোমার দংশন কোথায়? সন্নাধি, তোমারই বা জন্ম কোথায়?”—বাইবেল।

“হয়ত এ উপলব্ধিই করতে পারবে না যে, ভারতীয় কবি এই বিশ্বপ্রকৃতিকে শুধু জড়প্রকৃতি বা ‘দ্রবের’ সৃষ্টি বলেই দেখতেন না, দেখতেন যে এ বহুদৈবশক্তির লীলাক্ষেত্র, যা’ কেবল মানব সহানুভূতি দ্বারাই অধিগম্য এবং অজ্ঞাত ভাবসাহচর্য দ্বারা আকর্ষণ, যা’ কেবলমাত্র যে পৌরাণিক তা’ নয়। কবি কালিদাস যখন হিমালয়কে শিবের “রাশীভূত অট্টহাসি” (রাশীভূতঃ প্রতিদিনমিব ত্র্যম্বকস্তাট্টহাসঃ—মেঘদূতঃ; পূর্বমেঘ, শ্লোক ৬০।) বলে বর্ণনা করেন, তখন পাঠক হয়ত তা’ শুভ দম্পত্যস্তির বিস্তারভাবের কল্পনা করলেও করতে পারেন, কিন্তু তা’র সম্পূর্ণ অর্থ তাঁর নিকট লুক্কায়িতই থেকে যাবে যতক্ষণ না তিনি সেই মহাবোগীশ্বর শিবের মূর্তি কল্পনা করতে পারছেন, যিনি অভ্রলিহ পর্বতচূড়ায় চিরসমাসীন, যেখানে সর্গ হ’তে মর্ত্যে অবতরণকালে গঙ্গা চল্লমৌনি মহাদেবের জটাভূটের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়েছেন।

গঙ্গাজলের পবিত্রতার একটা অসাধারণ আর বোধ হয় অনন্তমূলত বৈশিষ্ট্য হ’চ্ছে তা’র অদৃশ্য গুণ আর তা’র নির্বিকার বীজাণুশূন্যতা। কোটি কোটি হিন্দুরা বা’রা স্নান আর পানের জন্ত গঙ্গাজল ব্যবহার করে, তা’রা গঙ্গাবারির দ্বারা সংক্রামিত কোন রোগের দ্বারা আক্রান্ত হয়নি। আধুনিক বৈজ্ঞানিকদের পক্ষে ব্যাপারটি এতই আশ্চর্যজনক। তাঁদের মধ্যে একজন, ডাঃ জন হাওয়ার্ড নর্থুপ—১৯৪৬ খৃষ্টাব্দে রসায়নশাস্ত্রে নোবেলপ্রাইজের অংশীদার, সম্প্রতি বলেছেন, “আমরা জানি যে গঙ্গার জল ভীষণভাবে বীজাণুপূর্ণ, কিন্তু ভারতবাসীরা এর জলে সাঁতার কাটে, পান করে, কিন্তু সাধারণতঃ এতে তা’দের কোনই ক্ষতি হয় না।” তা’রপর আশাবিত্ত হৃদয়ে বলেছেন, “বোধ হয় ব্যাক্টেরিয়াকাজ্জ (বীজাণুভুক্) নদীজলকে বীজাণুশূন্য করে।”

গঙ্গা ও এর বারটি উপনদীসমেত সমতলভূমি তিনলক্ষ বর্গমাইলের এক বিরাট উর্বরভূমি। ভারতবর্ষের তিনটি শ্রেষ্ঠ তীর্থস্থান, হরিদ্বার, প্রয়াগ আর কাশী, দুর্গম হিমালয়েয় তুষারবিগলিত গঙ্গা-নদীর তীরে অবস্থিত। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে হাজার হাজার সাধুসন্ন্যাসীরা, বাঁরা গঙ্গার তীরে পরমানন্দে বাস করেন, তাঁরা নিশ্চয়ই এর তীর আশীর্বাদপূত করে রেখেছেন। বেদে সকল প্রাকৃতিক ঘটনার প্রতি ভক্তিপ্রদর্শনের প্ররোচনা আছে। আসিসির সেট ফ্রান্সিসের এই উক্তি ভক্তহৃদ উত্তমরূপেই অবধান করতে পারেন, “আমাদের ভগ্নী প্রবাহিনীর জন্ত আমাদের প্রভু জয়যুক্ত হউন, বাঁর জল এত প্রয়োজনীয়, পবিত্র আর অমূল্য।”

৩৭শ পরিচ্ছেদ

আমার আমেরিকা গমন

রাঁচি বিদ্যালয়ের ভাঁড়ারঘরে কতকগুলো ধুলোমাখা বাক্সর পিছনে দসে আছি, জায়গাটা এমন আড়ালকরা যে ছেলেরা কেউ চট্ ক'রে তা' খুঁজে পাবে না। দসে বসে খুব গভীরভাবে চিন্তা করছি হঠাৎ আমার অন্তঃকক্ষের সন্মুখে পশ্চিমবাসী লোকদের কতকগুলো মুখের দৃশ্যপট যেন ভেসে উঠল। দেখেই মনে হ'ল—আরে এ যে আমেরিকা, আর এ লোকগুলো ত' আমেরিকান্ দেখছি!

স্বপ্ন তখনও ভাঙেনি। একটা বিরাট জনতা* আমার মুখের দিকে আগ্রহের সহিত তাকাতে তাকাতে আমার জ্ঞানের রঙ্গভূমিতে অভিনেতাদের মত একে একে চলে যেতে লাগল। একি দেখছি!

ভাঁড়ারঘরের দরজাটা হঠাৎ খুলে গেল। বা' ভয় ক'রেছিলুম, তা'ই। একটা ছেলে আমার লুকোবার জায়গাটা কি রকম ক'রে খুঁজে বা'র ক'রে ফেলেছে।

বা'ই হোক, মনটা ছিল তখন বেশ প্রক্লম; একটু স্মৃতির সঙ্গেই বল্লুম, “এস, এস বিমল, একটা স্মথবর আছে। ভগবান আমায় আমেরিকায় ঢাক দিয়েছেন যে!”

“আমেরিকায়? এ্যা, ব'লেন কি—আমেরিকায়?” বিমল আমার কথাগুলোর এমনভাবে প্রতিধ্বনি করলে যে আমি যেন আমেরিকা না ব'লে “চন্দ্রলোকে” বা'বার কথাই তা'কে বলেছি।

বল্লুম, “হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমেরিকা! কলম্বাসের মত আমেরিকা আবিষ্কার করতেই যাচ্ছি! তিনি ত' ভেবেছিলেন যে তিনি ভারতবর্ষই আবিষ্কার

*তাদের মধ্যে অনেকেরই মূখ আমি পশ্চিমে গিয়ে দেখতে পেয়েছিলুম আর দেখবামাত্রই চিন্তে প্রক্লম।

ক'রে ফেলেছেন, কিন্তু হয়ে গেল আমেরিকা; যাক্ দেখা যাচ্ছে যে এই দু'টি দেশের মধ্যে নিশ্চয়ই একটা কর্মস্থলের যোগ আছে।”

বিমল ত' শুনে আনন্দে লাফাতে লাফাতে চলে গেল। শীগ'গিরই এই দু'ঠেঙে খবরের কাগজের খবরটি সারা স্কুলময় ছড়িয়ে পড়ল! হতভম্ব বিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষকে বিদ্যালয়ের ভার অর্পণ করবার সময় বল্লুম, “আমার এ বিশ্বাস অবশ্য আছে যে শিক্ষাদানবিষয়ে আপনারা লাহিড়ী মহাশয়ের যোগের আদর্শ সর্বদা সম্মুখে রেখেই অগ্রসর হ'বেন। আমার আর কিছু বলবার নেই! প্রায়ই আমি আপনাদের লিখব, কিছু ভাববেন না। ঈশ্বরের ইচ্ছা হ'লে একদিন আবার ফিরে আসব।”

রাঁচির সেই রৌদ্রকরোজ্জ্বল সুবিস্তৃত ভূমি আর আমার প্রাণপ্রিয় শিশু-ছাত্রদের দিকে দৃষ্টিপাত ক'রতেই চক্ষুদু'টি অশ্রুপূর্ণ হয়ে এল। জান্লুম যে আমার জীবনের একটা অধ্যায় এখানেই শেষ হ'ল। এরপর থেকে দূরে, বহু দূরদেশে আমায় বাস করতে হ'বে! আমার স্বপ্নদর্শনের ঘণ্টাকতকের মধ্যেই রাঁচি পরিত্যাগ ক'রে কলকাতার গাড়ীতে চেপে বসলুম। কলকাতায় গিয়ে তা'রপরদিনই আমি আমেরিকার উদারধর্মমতাবলম্বীদের আন্তর্জাতিক কংগ্রেস হ'তে ভারতবর্ষের প্রতিনিধিত্ব করবার জগ্গে একটি নিমন্ত্রণপত্র পাই। আমেরিকান ইউনিটেরিয়ান এসোসিয়েশনের অধীনে সে বছর এর অধিবেশন বোষ্টন সহরে হ'বার কথা ছিল।

মাথা তখন ঘুরছে। বুদ্ধি গুলিয়ে যাবার যোগাড়, কি করি, ছুটলুম শ্রীরামপুরে—গুরুদেব শ্রীবক্তেশ্বর গিরিজির পরামর্শ নিতে।

বল্লুম, “গুরুজি, এইমাত্র আমি আমেরিকা হ'তে একটা নিমন্ত্রণপত্র পেলাম, সেখানে এক ধর্ম্মমহাসম্মেলনে আমায় বক্তৃতা দেবার জগ্গে ডেকেছে, যা'ব নাকি?”

গুরুদেব শুধুমাত্র বল্লেন, “সকল দুয়ারই ত' তোমার জগ্গে খোলা—এখন না হ'লে আর কখনও তোমার হবে না, বুঝলে।”

সভয়ে বল্লুম, “কিন্তু ম'শায়, সভায় দাঁড়িয়ে বক্তৃতাটুকুতা দেওয়ার ত' আমার কোন অভ্যেস নেই আর তা'র কিই বা আমি জানি বলুন। কখনও ত' বক্তৃতা দিই নি, আর ইংরেজিতে ত' নয়ই!”

“আরে ইংরেজিই হোক আর নাই হোক, যোগের বিষয়ে তোমার কথা পশ্চিমের সবাই শুনে, দেখে নিও।”

আমি হেসে ফেললুম, গুরুজিকে কি ব’লে বোঝাই। শেষে বললুম, “গুরুজি, আমার বক্তৃতা শুনে আমেরিকানরা কি বাঙ্গালা শিখবে ভেবেছেন নাকি? যাই হোক ইংরেজিতে বক্তৃতা দেবার দারুণপরীক্ষা যা’তে উত্তীর্ণ হ’তে পারি তা’র জন্তে আপনি আমায় আশীর্বাদ করুন।”

বাড়ীতে ফিরে এলুম। পিতার কাছে মতলবটি খুলে বলতে তিনি ত’ একেবারে হতভম্বই হ’য়ে গেলেন। আমেরিকা তাঁ’র কাছে অবিস্থান্ত রকমে দূর; সেখানে পৌছতে পারাই মুকিল আর পৌছলে না কি ফেরা যায় না! তাঁ’র ভয় হ’ল, আমায় আর তিনি দেখতে পাবেন না।

তিনি রুক্ষভাবে জিজ্ঞাসা করলেন, “তুমি যাবে কি ক’রে? আর তোমার টাকাই বা দেবে কে শুনি?”

সেহেতু তিনি আমার শিক্ষা আর সারাজীবনের ভার সাদরে বহন করে এসেছিলেন, সেহেতু তিনি নিঃশংসয়ে আশা করেছিলেন যে আমার মতলব এই একটিমাত্র প্রশ্নের আঘাতেই কাত হ’য়ে যাবে। বললুম,—

“ভগবানই নিশ্চয় আমায় টাকা যুগিয়ে দেবেন।” এই উত্তর দেবার সময় মনে পড়ল যে ঠিক এই রকমই উত্তর বহুপূর্বে আমি আগ্রায় আমার দাদা অনন্তকে দিয়েছিলুম। আর বেশী কোনরকম চাতুরী না ক’রে সোজা-সুজিভাবেই ব’লে ফেললুম, “বাবা, আমায় সাহায্য করতে ভগবানই আপনার মন ঠিক ক’রে দেবেন।”

“না, কখনই নয়!” ব’লে তিনি আমার দিকে করুণদৃষ্টিতে তাকালেন। যাক, মনে হ’ল ব্যাপারটার এইখানেই ইতি।

কিন্তু তা’রপরদিন যখন বাবা আমায় ডেকে একটি মোটাটাকার চেক আমার হাতে তুলে দিলেন, তা’ দেখে ত’ আমি বিস্ময়ে অবাক হ’য়ে গেলুম।

চেকটি দিয়ে তিনি আমায় বললেন, “দেখ, তোমায় যে আমি এই টাকাটা দিচ্ছি, তা’ তোমার আমি বাবা ব’লে নয়, কিন্তু লাহিড়ী মহাশয়ের একজন ভক্তশিষ্য ব’লে। এখন পশ্চিমে যাও, গিয়ে সেখানে ক্রিয়াযোগের জাতি-ধর্মনির্বিশেষে শিক্ষাদানের কথা প্রচার কর গিয়ে।”

যে নিঃস্বার্থভাবে প্রণোদিত হয়ে পিতা তাঁর ব্যক্তিগত আকাঙ্ক্ষা, স্বার্থচিন্তা সমস্ত দমন ক'রে ফেললেন তা' দেখে আমার অন্তর গভীরভাবে আলোড়িত হয়ে উঠল। বিদেশভ্রমণের একটা সাধারণ ইচ্ছা নিয়ে যে আমার সমুদ্রযাত্রার মতলব নয় এ সত্য আগের দিনে রাত্রিতেই পিতা প্রকৃতভাবে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। পিতার বয়স তখন সাতবৃষ্টি— আর কতদিনই বা থাকবেন ভেবে অত্যন্ত বিষমভাবে বললেন, “তুমি ত' চলে যাচ্ছ, বোধ হয় এ জীবনে আর আমাদের কখনও দেখা হ'বে না।”

মনের ভিতর থেকে কে যেন ব'লে দিলে—উত্তর দিলুম, “নিশ্চয়ই, ভগবান অন্ততঃ আর একবারও আমাদের দু'জনের দেখা করিয়ে দেবেন বই কি! কিচ্ছু ভাববেন না বাবা!”

আমার জন্মভূমি, আমার গুরুদেব সব ত্যাগ ক'রে আমেরিকার কোন অজানা দেশে পাড়ি জমাবার জন্তে যখন তৈরী হ'তে লাগলুম—মন যে ভয়ে একটুও কাঁপেনি তা' নয়! প্রচণ্ড জড়বাদী প্রতীচ্যের আবহাওয়ার গড়ে ওঠা নানাবিষয়ের গল্প আমি বহু শুনেছিলুম—সে সব সাধুসন্ন্যাসীদের শতশত বৎসরের গভীরসাধনালব্ধ, ভারতবর্ষের উজ্জল আধ্যাত্মিক পটভূমির চিত্র হ'তে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। ভাবলুম, “প্রাচ্যের কোন লোকগুরু, যিনি প্রতীচ্যের জীবনধারণার মধ্যে প্রবেশ করবার সাহস করবেন, তাঁকে হিমালয়ের দারুণ শৈত্যের মধ্যে কঠিন তপস্তার চেয়েও কঠোরতর সাধনার সম্মুখীন হ'তে হ'বে।”

অতিপ্রভুত্বে উঠে একদিন প্রার্থনা শুরু করলুম, মনে দৃঢ় সঙ্কল্প যে ঈশ্বরের বাণী শুনতে না পাওয়া পর্যন্ত প্রার্থনা করেই যাব—মরেও যদি বাই, তা' হ'লে প্রার্থনা না শোনা অবধি আর তা' বন্ধ হ'বে না। আমার প্রার্থনা ছিল, মনে আশ্বাস, দৃঢ়বল ও সাহস আর সর্বোপরি তাঁর আশীর্বাদ, যা'তে ক'রে আমি আধুনিক হিতবাদের কুশ্লীলতার মধ্যে নিজেই হারিয়ে না ফেলি। অবশ্য আমেরিকায় যা'বার জন্তে মন পূর্ব থেকেই স্থির ক'রে ফেলেছিলুম, কিন্তু প্রথমে ঈশ্বরের ওহুমতি আর তাঁর আশ্বাসবাণী শোনবার জন্তে মনে সঙ্কল্প আরও দৃঢ়তর হয়ে উঠেছিল।

প্রার্থনা চলতে লাগল—বিরাম নেই। বুকের কান্না বুকে চেপে রেখে অনড় হয়ে বসে সমস্ত অন্তর উজাড় ক'রে ভগবচ্চরণে আমার কাতর

প্রার্থনা করণভাবে নিবেদন করতে লাগলুম। কোন উত্তর এল না। আমার নীরবপ্রার্থনা ক্রমশঃ গভীর হতে গভীরতর হ'তে লাগল, মনে দারুণ যন্ত্রণা। দুপুরবেলা নাগাদ মনে হ'ল যেন চরমে পৌঁছেছি—যন্ত্রণা আর সহ করতে পারছি না। মনের আকুলতাবেগে আরও গভীরভাবে ক্রন্দন করতে গেলে মনে হচ্ছিল যেন মাথা বুঝি বা এখুনিই ফেটে যায়! সেই মুহূর্তে আমাদের গড়পার রোডের বাড়ীর ঘরের সামনের বারান্দার কাছে একটা আঘাতের শব্দ শুন্তে পেলুম। দরজা খুলে দেখি, কোপীনবारी এক নবীন সন্ন্যাসী। ঘরে প্রবেশ ক'রে তিনি পিছনে দরজা বন্ধ ক'রে দিতে আমি তাঁ'কে বসতে অল্পরোধ করলুম—কিন্তু তিনি তা' উপেক্ষা ক'রে ইঙ্গিতে বোঝালেন যে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই তিনি আমার সঙ্গে কথা বলতে চান।

হতভম্ব হয়ে গিয়ে ভাবলুম যে “ইনি নিশ্চয়ই বাবাজী হ'বেন!”—কারণ আমার সন্মুখে যিনি উপস্থিত, তাঁ'র আকৃতিতে লাহিড়ী মহাশয়ের বুবা-বয়সের সাদৃশ্য আছে।

আমার মনের কথা বুঝতে পেরেই যেন তিনি জবাব দিলেন, “হ্যাঁ, আমিই বাবাজী।” তাঁ'রপর অতি মধুরহিন্দীতে বললেন, “আমাদের পরমপিতা পরমেশ্বর তোমার প্রার্থনা শুনেছেন, তিনি তোমায় বলতে আমাকে আদেশ করেছেন যে, তুমি গুরুর আজ্ঞা শিরোধার্য্য ক'রে আমেরিকায় যাও, ভয় কোরো না। ঈশ্বরই সর্বদা তোমায় রক্ষা করবেন।”

অল্প কিছুক্ষণ নীরব থাকবার পর বাবাজী পুনরায় বলতে শুরু করলেন, “তোমাকেই আমি পশ্চিমে ক্রিয়াযোগের বাণী প্রচার করবার জন্তে নির্বাচিত করেছি। বহুদিন পূর্বে কুস্তমেলায় তোমার গুরুদেবের সঙ্গে আমার দেখা হয়। তখন আমি তাঁ'কে বলেছিলুম যে তোমাকেই আমি তাঁ'র কাছে শিক্ষার জন্তে পাঠাব।”

তাঁ'র আবির্ভাবে, আর তিনিই যে আমায় শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজির কাছে পাঠিয়েছিলেন, তাঁ'র স্বমুখনিঃসৃত এ কথাগুলি শুনে ভয়ে ভক্তিতে আমি নির্বাক নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে রইলুম। তাঁ'রপর আমি সেই মরণজয়ী মহাগুরুর পদতলে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করলুম। ভূমি হ'তে সমস্তে তিনি আমাকে উঠিয়ে নিয়ে আমার জীবনের নানাকথা তিনি আমাকে শোনালেন,

তা’রপর তিনি আমায় কতকগুলি ব্যক্তিগত উপদেশ দিয়ে গুটিকতক গুপ্ত ভবিষ্যদ্বাণী করলেন।

পরিশেষে তিনি গম্ভীরভাবে বললেন, “ঈশ্বরানুভূতির যে বৈজ্ঞানিক প্রণালী তা’ সবদেশেই শেষে বিস্তারলাভ করবে—আর মানুষের সেই অনন্তকরণাময় পরমপিতার ব্যক্তিগত অতীন্দ্রিয় অনুভূতির মধ্য দিয়েই জাতিসমূহের মিলন সাধিত হ’বে।”

তা’রপর, তাঁ’র বিরাট দৃষ্টিশক্তিবলে, সেই মহাশুরু তাঁ’র ব্রহ্মজ্ঞানের ক্ষুরেণ আমাকে যেন বিদ্যুতাক্ষিত ক’রে তুললেন।

“দ্বিবি সূর্য্যসহস্রশ্চ ভবেদ্ যুগপদুখিতা।

যদি ভাঃ সদৃশী সা শ্রান্তাসন্তশ্চ মহাত্মনঃ।

যদি কখন আকাশে সহস্র সহস্র সূর্য্যের প্রভা (দীপ্তি) এককালে সমুখিত হয়, তবে সেই প্রভার (দীপ্তির) সহিত ঐ মহান বিশ্বরূপের প্রভার কিঞ্চিৎ সাদৃশ্য হইতে পারে।” (গীতা—১১শ অধ্যায়, ১২ শ্লোক)।

তা’রপরেই দরজার দিকে এগিয়ে তিনি বললেন, “আমায় ধরবার চেষ্টা কোরো না—তা’ তুমি পারবে না।” আমি তখন তাঁ’কে বারম্বার বলতে লাগলুম, “বাবাজী মহারাজ, দয়া ক’রে যাবেন না, যাবেন না—আমাকে আপনার সঙ্গে নিয়ে যান।”

পিছন ফিরে তাকিয়ে তিনি বললেন, “এখন নয়, আর এক সময়।”

ভাবে অভিভূত হয়ে আমি তাঁ’র বারণ অগ্রাহ্য ক’রে এগোতে গিয়েই দেখলুম যে আমার হু’টি পা’ই মেঝেতে একেবারে শক্ত হয়ে এঁটে গেছে! দোরের কাছে দাঁড়িয়ে বাবাজী একবার আমার প্রতি শেষ সম্মেহ দৃষ্টিপাত করলেন, তা’রপর আশীর্ব্বাদচ্ছলে একবার হাত তুলেই তিনি প্রস্থান করলেন—আমার দৃষ্টি তখনও তাঁ’র উপর স্থিরভাবে সংলগ্ন। মিনিট কতকবাদেই আমার পা খুলে গেল। আসনে বসে গভীর ধ্যানে নিমগ্ন হ’লুম; ভগবানের প্রতি আমার অজস্র ধ্যানবাদ যে কেবল শুধু আমার প্রার্থনা পূরণ করেছেন তা’ই বলে নয়—বাবাজী দর্শনদানে আমাকে আশীর্ব্বাদ-পূত করেছেন, এই ব’লেও। আমার সন্মর্শরীর সেই প্রাচীন অগ্ধ চিরনবীন মহাশুর পুণ্যস্পর্শে ধাতু আর পবিত্র হয়ে গেছে। তাঁ’কে

দেখবার জন্তে একটা জলন্ত আগ্রহ বহুদিন থেকেই মনের মধ্যে ছিল, আজ তা' মিটল।

বাবাজীর সঙ্গে আমার সাক্ষাতের গল্প এপর্যন্ত আমি কারুরই কাছে কখনও বলিনি। আমার মানবজীবনের এ পবিত্রতম অভিজ্ঞতা ব'লে মনে ক'রে আমি এ অন্তরে চিরলুক্কায়িতই রেখেছিলুম। কিন্তু এই চিন্তা আমার মনে উদয় হ'ল যে এই আত্মজীবনীর পাঠকবর্গ সেই নিঃসঙ্গ বাবাজী আর তাঁ'র জগতের উন্নতিতে আগ্রহের বিষয়ের সত্যতা উপলব্ধি করতে পারবেন যদি আমি বলি যে আমি তাঁ'কে স্বচক্ষে দেখেছি। আমি একজন চিত্র-শিল্পীকে আধুনিক ভারতের মহাবোগীশ্বর বাবাজী মহারাজের প্রকৃত আলোচ্য চিত্রিত করতে সাহায্য করেছি; সে চিত্র এই পুস্তকে সন্নিবেশিত হয়েছে।

আমেরিকা যাবার প্রাক্কালে আমি শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজির পুণ্যপদতলে প্রণাম নিবেদন ক'রে বিদায় গ্রহণ করতে গেলুম।

গুরুদেব তাঁ'র স্বভাবসিদ্ধ শাস্ত্রম্বরে আমায় জ্ঞানোপদেশ দিয়ে বললেন, “তুলে যাও যে তুমি একজন হিন্দু হয়ে জন্মেছ আর মার্কিনদেরও জীবনধারার সব কিছু যেন নিয়ে বোসো না। উভয়ের যা' সব চেয়ে ভাল তা'ই গ্রহণ কোরো। অমৃতের পুত্র তুমি—তোমার যা' স্বরূপ, তাইতেই প্রকাশিত হ'য়ে। আর পৃথিবীর চারদিকে বিভিন্ন জাতির মধ্যে ছড়িয়ে রয়েছে যে তোমার সব ভাইয়েরা, তা'দের মধ্যে যা' কিছু সব সদগুণ তা' নিয়ে নিজেকে গড়ে তুলো।”

তা'রপর তিনি আমাকে আশীর্বাদ ক'রে বললেন, “ঈশ্বরের সন্ধানে যা'রাই তোমার কাছে বিশ্বাস ক'রে আসুক না কেন, সকলেই তা'রা উপকৃত হ'বে! তা'দের প্রতি তোমার দৃষ্টিপাতে, তোমার চক্ষু ছু'টি হ'তে নির্গত আধ্যাত্মিকশক্তির প্রবাহ তা'দের মস্তিষ্কে প্রবেশ ক'রে তা'দের পার্থিব অভ্যাসের পরিবর্তন সাধিত ক'রে তা'দের আরও বেশী ঈশ্বরমুখী ক'রে তুলবে।”

তারপর তিনি বলতে লাগলেন, “প্রকৃত ধর্মপিপাসু লোকেদের আকর্ষণ করার ভাগ্যও তোমার খুব ভাল। যেখানেই তুমি যাওনা কোন—এমন কি বনেজঙ্গলে গেলেও তুমি বন্ধু খুঁজে পাবে!”

তা'র এ উভয় আশীর্বাদই প্রচুরভাবে ফলে গিয়েছিল। আমেরিকায় এলুম একলা—যেন জঙ্গলে, একটিও বন্ধু নেই, কিন্তু এসে দেখলুম যে হাজার হাজার লোক মহাকালের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ আধ্যাত্মিকশিক্ষার প্রশালী গ্রহণ করবার জন্য উৎসুক আগ্রহে সেখানে অপেক্ষা করছে।

১৯২০ সালের আগষ্ট মাসে “সিটি অফ স্পার্টা” নামক জাহাজে আমি ভারতবর্ষ ত্যাগ করলুম। প্রথম মহাবুদ্ধের পর সেইটাই হচ্ছে প্রথম যাত্রীবাহী জাহাজ যা' আমেরিকায় যাচ্ছিল। ছাড়পত্র পা'বার বহু হান্সামাহাজ্জত বলতে গেলে প্রায় অলৌকিক উপায়ে এড়িয়ে তবে স্থান সংগ্রহ করতে পেরেছিলুম। এই দু'মাস ধ'রে সমুদ্রযাত্রার মাঝখানে একজন সহযাত্রী আবিষ্কার ক'রে ফেললেন যে বোষ্টন কংগ্রেসে আমি ভারতীয় প্রতিনিধি।

তিনি বললেন, “সোয়ামী ইয়োগানন্দ”—মার্কিনেরা আমার পরে যে সব অদ্ভুত উচ্চারণের নামে অভিহিত ক'রেছিল এইটেই অবিশ্বি সন্দেহপ্রথম—“এই বৃহস্পতিবার রাত্রে আপনি অনুগ্রহ ক'রে সহযাত্রীদের সামনে একটি বক্তৃতা দেন না কেন? আমার মনে হয় বক্তৃতার বিষয় ‘জীবনবুদ্ধ ও জয়ের উপায়’ হ'লে সবাইকার ভাল লাগবে, কি ব'লেন?”

হা ভগবান, সেই বুধবাররাত্রেই আমি আবিষ্কার করলুম যে আমার নিজেরই জীবনবুদ্ধের লড়াইএ এখন আমার নামতে হবে—তা' অতীকে আমি সে বিষয় আর কি ব'লব? যা'ক, ইংরেজিতে বক্তৃতা দেবার জন্তে ভাবটাবগুলো একটু-আধটু গুছিয়ে নেবার জন্তে খানিকক্ষণ ধ'রে প্রাণপণে চেষ্টা করার পর শেষে একেবারে হাল ছেড়ে দিলুম; চিন্তাগুলো, ইংরেজি ব্যাকরণের নিয়ম-কানূনের সঙ্গে অসহযোগিতা ক'রে তা'র জালে না পড়ে, ব্যাধদর্শনে পক্ষিদলের মতই কে কোথায় উড়ে পালাল। অবশেষে গুরুদেবের অতীতে আশ্বাসদানের কথা স্মরণ ক'রে ষ্টিমারের সেলুনে বক্তৃতা দেবার জন্তে শ্রোতৃ-বৃন্দের সম্মুখে ত' উপস্থিত হ'লুম। বাগ্মিতা প্রদর্শন করা ত' দূরে থাক, সেই জনমণ্ডলীর সম্মুখে বাকশক্তিহীন হ'য়ে দাঁড়িয়েই রইলুম খানিকক্ষণ। এক মিনিট... দু' মিনিট... ...তিন মিনিট... ...দশ মিনিট কেটে গেল, কথা আর বেরোয় না। জনতা আমার হৃদ্বিশার কথা অনুধাবন ক'রে হাসাহাসি শুরু ক'রে দিলে।

ব্যাপারটা অবিশ্বি আমার কাছে আদৌ প্রীতিকর ছিল না—রাগে,

হৃৎক্ষেপে, ক্ষোভে, নীরবে গুরুদেবের কাছে প্রার্থনা করতে আরম্ভ করলুম। তৎক্ষণাৎ আমার অন্তরের মধ্যে তাঁ'র বাণী ধ্বনিত হয়ে উঠল, “তুমি পারবে! তুমি পারবে! ব'ল, কথা ব'ল!”

সঙ্গে সঙ্গে ভাবগুলি বেশ গুছিয়ে এসে ইংরেজি ব্যাকরণের সঙ্গে মিতালি পাতিয়ে মনের মধ্যে ভিড় ক'রে এসে দাঁড়াল। পৌনে একঘণ্টা শোনবার পর শ্রোতৃবৃন্দ তখনও শূন্যে সমান উৎসুক। সেই বক্তৃতার পর আমেরিকার নানাদল থেকে আমার কাছে বক্তৃতা দেবার জ্ঞে নিমন্ত্রণ আসতে লাগল।

বক্তৃতা শেষ হবার পর, কি যে সব বলেছিলুম আর কি যে সব করে-ছিলুম তা'র একটা কথাও আর স্মরণ রইল না। অত্যন্ত সংযত অল্পসঙ্কানের পর কতকগুলি যাত্রীদের কাছ হ'তে জানতে পারা গেল যে, “আপনি নিভুল ইংরেজিতে উদ্দীপনাময়ী আর অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী এক বক্তৃতা দিয়েছেন।” এই আনন্দসংবাদে আমি ভক্তিনতচিত্তে যথাসময়ে সাহায্য পাঠাবার জ্ঞে আমার গুরুদেবকে অন্তরের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করলুম। আবার নতুন ক'রে উপলব্ধি করলুম যে তিনি আমার সঙ্গে সর্বদাই রয়েছেন, দেশকালের বাবধান আর তাঁ'কে রুখতে পারে না।

সমুদ্রযাত্রার শেষের দিকটায় কিন্তু একবারমাত্র আগামী বোষ্টনকংগ্রেসের বক্তৃতা জ্ঞে একটু ভীতিপ্রদভাবের উদয় হয়েছিল।

তা'তে আমি ভগবানের কাছে এই ব'লে প্রার্থনা করলুম যে, “দয়াময়, তুমিই আমার বক্তৃতার প্রেরণা যোগাও, ভাবের উৎস হও—আমি আর কিছুই ভয় করি না। দেখো যেন আবার আমি সেখানে গিয়ে হাসিঠাট্টার পাত্র হ'য়ে না দাঁড়াই।”

“সিটি অফ্ স্পার্টা” সেপ্টেম্বরের শেষে গিয়ে বোষ্টন সহরের ডকে গিয়ে ভিড়ল।

৬ই অক্টোবর তারিখে আমি কংগ্রেসে গিয়ে আমেরিকায় আমার প্রথম বক্তৃতা দিলুম। সকলেই খুসী হয়েছিলেন। যাক, মুক্তির নিঃশ্বাস ছেড়ে বাঁচলুম। কংগ্রেসের প্রকাশিত কার্যবিবরণীতে* আমেরিকান ইউনিটেরিয়ান এসোসিয়েশনের উদারহৃদয় সেক্রেটারীমহাশয় নিম্নলিখিত মন্তব্য প্রকাশ করেন,—

“ভারতবর্ষের রাঁচি ব্রহ্মচর্যা আশ্রম থেকে স্বামী যোগানন্দ তাঁ'র সমিতির

* নিউ পিগ্রিমেন্স অফ্ দি স্পিরিট (বোষ্টনের বুকন প্রেস হ'তে প্রকাশিত, ইং ১৯২১)।

অভিনন্দন নিয়ে এসেছেন। বিশুদ্ধ আর পরিষ্কার ইংরেজিতে আর উদ্দীপনাময়ী ভাষায় তিনি “ধর্মবিজ্ঞান” সম্বন্ধে দার্শনিকতত্ত্বপূর্ণ এক বক্তৃতা দেন। বহুল প্রচারের উদ্দেশ্যে বক্তৃতাটি ক্ষুদ্র পুস্তিকাকারে মুদ্রিত হয়ে প্রকাশিত হয়েছে। তিনি বলেছেন যে, ধর্ম হচ্ছে সার্বজনীন আর এক। আমরা অবিশ্রি কোন বিশিষ্ট প্রথা বা বিশ্বাসকে সার্বজনীন রূপ দিতে পারি না, কিন্তু ধর্মের মূলতত্ত্বকে সার্বজনীন ক’রে তোলা যেতে পারে—আর তা’ আমরা সকলকে অনুসরণ ক’রতে আর মানতেও বন্তে পারি।”

পিতার উদার ও মহান্ দানের ফলে, কংগ্রেস শেষ হ’য়ে গেলেও আমি আমেরিকায় থেকে যেতে পারলুম। বোষ্টনে অতি স্নেহে সরল আর অনাড়ম্বর-ভাবে চারটি বৎসর কেটে গেল। বক্তৃতাপ্রদান, যোগসম্বন্ধে ক্লাসে শিক্ষাদান ছাড়াও একটি কবিতার বই লিখেছিলুম—বইটির নাম “সংস্ অফ্ দি সোন্”; এর মুখবন্ধ লিখে দিয়েছিলেন, ডাঃ ফ্রেডারিক বি. রবিন্সন্, সিটি অফ নিউ ইয়র্ক কলেজের প্রেসিডেন্ট।*

১৯২৪ সালের গ্রীষ্মকালে মহাদেশাতিক্রম্য যাত্রা শুরু ক’রে প্রধান প্রধান সহরে হাজারহাজার লোকের সামনে বক্তৃতা দিতে হয়েছিল। যাত্রা শেষ হ’ল পশ্চিমভ্রমণে—পরমরমণীয় আলাস্কার উত্তরপ্রদেশে অবকাশযাপন ক’রে।

উদারহৃদয় ছাত্রদের বদাশ্রিতায় ১৯২৫ সালের শেষের দিকে আমি লস এঞ্জেলিস্ সহরে মাউন্ট ওয়াশিংটন এস্টেটসে আমেরিকার একটি প্রধানকেন্দ্র স্থাপন করেছিলুম। বহুবৎসর পূর্বে কাশ্মীরভ্রমণের সময় আমি স্বপ্নে এই বাড়ীটির দর্শন পাই। আমেরিকার এই দূরদেশে কার্যকলাপের চিত্রাবলী আমি অবিলম্বে শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজির নিকট পাঠাই। তা’তে তিনি আগায় একটি পোষ্টকার্ড লেখেন,—

১১ই আগষ্ট ১৯২৬।

আমার মানসপুত্র যোগানন্দ,

তোমার স্কুল আর ছাত্রদের ফটো দেখে আমার মনে যে কি আনন্দ হ’চ্ছে তা’ আমি ভাষায় প্রকাশ ক’রতে পারি না। নানাসহরে তোমার যোগের ছাত্রদের দেখে মন আনন্দে বিগলিত হয়েছে। স্তোত্রপাঠ, রোগনিবারণে

* ডাক্তার এবং মিসেস রবিনসন ১৯৩৯ সালে কলকাতায় এসেছিলেন এবং যোগদা কলিকাতা শাখায় মাননীয় অতিথি হ’য়েছিলেন।

শক্তিসঞ্চার আর দৈবউপায়ে রোগনিরাময়ে প্রার্থনা প্রভৃতির তোমার
প্রণালী দেখে আমার আন্তরিক আশীর্বাদ তোমায় না দিয়ে থাকতে পাচ্ছি না।
মাউন্ট ওয়াশিংটন এস্টেটসের গেট, তা'র ক্রমোন্নত আঁকাবাঁকা
পার্বত্যপথ আর তা'র নিচের অপূৰ্ণ প্রাকৃতিকদৃশ্য দেখে আমার নিজের
চোখে সব দেখতে ইচ্ছে করে।

এখানকার সব মঙ্গল। ভগবৎরূপায় তুমি চিরসুখী হও।

শ্রীযুক্তেশ্বর গিরি

বছরের পর বছর কেটে গেল। এই নূতন মহাদেশের প্রত্যেক অংশেই
আমি বক্তৃতা দিয়ে বেড়ালুম। শত শত ক্লাব, কলেজ, চার্চ আর নানা
দলের সামনে আমায় অনেক কিছুই বলতে হ'ল। লক্ষ লক্ষ আমেরিকাবাসী
যোগে দীক্ষা পেল। তা'দের সকলের নামে “অনন্তের আহ্বান” নামে
একটি নূতন প্রার্থনা-ভাবের পুস্তক উৎসর্গ ক'রলুম। এমেলিটা গ্যালি-
কার্সি* এর প্রস্তাবনা লিখে দিয়েছেন। এক রাতে বক্তৃতামঞ্চে দাঁড়িয়ে—
“ঈশ্বর! ঈশ্বর! ঈশ্বর!” নামে একটি কবিতা রচনা করেছিলুম; ঐ
বই থেকে সেটা এখানে উদ্ধৃত ক'রে দেওয়া হ'ল;

ঈশ্বর! ঈশ্বর! ঈশ্বর!

স্বপ্নস্থি গভীর হতে জাগিলাম আমি

উঠিছু যবে জাগ্রতের ঘূর্ণ্যমান সোপান উপর

চুপে চুপে কহিব কর্ণে

ঈশ্বর! ঈশ্বর! ঈশ্বর!

তুমি যে আমার খাড়া

রাত্রি বিরহ পরে

উল্লাসে উঠিয়া বসি উবার আসনে

উচ্চারিব তানে তানে আমার পরাগে

ঈশ্বর! ঈশ্বর! ঈশ্বর!

* মাদাম গ্যালি-কার্সি এবং তা'র স্বামী সুবিখ্যাত পিয়ানোবাদক হোমার স্ট্রাময়েল্‌স্‌ বিশ্ববৎসর
ব্যাপী ক্রিয়ামোগ সাধনে রত। সুপ্রসিদ্ধা মুখ্যগায়িকার সঙ্গীতজীবনের উদ্দীপনাময়ী কাহিনী
সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে। (গ্যালি-কার্সির সঙ্গীতজীবন—সি, ই, লেমােনো প্রণীত; পাবার কোং,
নিউইয়র্ক)।

আঁকা বাঁকা সোজা পথে

যেথায় যেথায় যাই

আলোকেতে আঁধারেতে

যেথায় বেড়াই

সেথায় আমার মন

তব দিকে অম্লক্ষণ

চাহিয়া রহিবে।

কন্ময়ুধে ঝাঁপাইব

হুঙ্কারিয়া তব নাম

গাহিব অবিরাম

ঈশ্বর! ঈশ্বর! ঈশ্বর!

দৈব আকাশের মেঘ যবে

দুঃখবজ্র করিবে নিনাদ

সদা সে শব্দ করিব স্তব্ধ

চিৎকারিয়া তব নাম

ঈশ্বর! ঈশ্বর! ঈশ্বর!

তন্তুবায় মন মোর নিদ্রাবস্ত্রোপরি

বুনিতে শিথিবে যবে স্বপন সুন্দর

সেথায় তোমার নাম বুনিব প্রথম

ওগো প্রাণের ঈশ্বর! ঈশ্বর! ঈশ্বর!

গভীর হইলে নিশি সুষুপ্তির ঘরে

ডাকে অবিরত সুশাস্তি স্বপ্ন আমার

আনন্দ আনন্দ আসে নাচিয়া গাহিয়া

মরমের সখা ঈশ্বর! ঈশ্বর! ঈশ্বর!

দেখি তৌহে জাগ্রতে আহায়ে কন্মের কুহকে

সুস্বপনে নিশীথ নিদ্রার অচেতনে

সবে সহায়করণে ভাবোন্মাদ ধ্যানে

প্রেমের উদ্ভানে সমাধি আসনে
 অতি চুপেচুপে গুপ্ত অন্তরের পারে গাহিব নিরন্তর
 শাস্তিময় সুধাময় আমারি প্রাণেশ নাথ
 ঈশ্বর ! ঈশ্বর ! ঈশ্বর !*

কখনও কখনও—সাধারণতঃ মাসের পয়লা তারিখেই মাউন্ট ওয়াশিংটন এস্টেটের এবং এস, আর, এফ্‌এর অন্ত্যস্ত কেন্দ্রসকলের ব্যয়নির্বাহের জন্তে বিল সব এসে হাজির হ'ত !—তখন ভারতবর্ষের সরল অনাড়ম্বর শাস্তিময় জীবনের জন্তে প্রাণের ব্যাকুলতা জেগে উঠত। কিন্তু প্রাচী আর প্রতীচীর ভাবের আদানপ্রদানের দৈনিক প্রসার দেখে মন আনন্দে উল্লসিত হ'য়ে উঠত।

পূর্ব আর পশ্চিমের অভিজ্ঞতায় আমার এ চিন্তার উদয় হয়েছে যে একের অপরের প্রধান গুণগুলি গ্রহণ করা আবশ্যিক। বর্তমানে প্রাচ্য ও প্রতীচ্যবাসী উভয়েই অসমঞ্জস সভ্যতা থেকে ভুগছে। ভারতবর্ষ, আমেরিকার পার্থিব বিষয়ে নৈপুণ্য আর সব ব্যাপারের ব্যবহারিক জ্ঞানের প্রতিযোগিতা থেকে যথেষ্ট উপকৃত হ'তে পারে। অপরপক্ষে প্রতীচ্যেরও মানবজীবনের আধ্যাত্মিকভিত্তির সম্বন্ধে গভীর জ্ঞান থাকা দরকার,—বিশেষতঃ অতীতে ভারতবর্ষ ঈশ্বরোপলব্ধির পথে যে সব বৈজ্ঞানিক প্রণালীর পরিপুষ্টি সাধন করেছিল, সে দিকেও। পূর্ব আর পশ্চিম উভয়েরই জড় আর আধ্যাত্মিক মূল্যের যথোপযুক্ত সামঞ্জস্য রক্ষাকরা একান্ত কর্তব্য। পরিপূর্ণ আর সুসমঞ্জস সভ্যতার আদর্শ একেবারে কাল্পনিক নয়;—কারণ বাস্তবিক বহুবুগ ধরেই ভারতবর্ষ যে শুধু বিরাট আধ্যাত্মিক গরিমার আবাসভূমি ছিল, তা' নয়, তা'র বিশাল ধনসম্পদও ছিল।

“জাতির পিতা” জর্জ ওয়াশিংটন, যা'র জীবন অতীন্দ্রিয়স্বপ্নদর্শন আর দৈবনির্দেশে পরিচালিত হ'ত, আমেরিকার আধ্যাত্মিক অনুপ্রাণনার জন্ত নিম্নলিখিত কথাগুলি বলেছিলেন,—

“স্বাধীন, শিক্ষিত আর অচিরেই একটি বিরাট জাতিতে পরিণত—এদের পক্ষে সর্বদা উচ্চ ত্রায়বিচার আর লোকহিতৈষণার দ্বারা চালিত জাতির

* পরমহংস যোগানন্দ কর্তৃক ইংরাজী হইতে বাংলায় অনূদিত

একটা অতি অদ্ভুত আর বিরাট উদাহরণ মানবজাতিকে দেওয়ার সে উপবৃত্তই হ'বে। নিঃসংশয়ে বলা যায় যে সময় আর ঘটনার পথে এরূপ একটা বিরাট পরিকল্পনার ফল, এ শুধু ধৈর্য্য ধরে অনুসরণ করার সাময়িক ক্ষতি বহুগুণেই পূরণ করবে। একি কখন হ'তে পারে যে ভাগ্য একটা জাতির গুণের সঙ্গে তা'র চিরস্থায়ী সুখ আর সৌভাগ্য সংযুক্ত ক'রে রাখে নি ?”

ছইটম্যানের “আমেরিকা প্রশান্তি”

তোমার ভবিষ্যকালে তুমি,
বুদ্ধিদীপ্ত বৃহত্তর তব নরনারীদলে তোমা' নামে—
তোমার সে শক্তিধর, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক ;
উত্তর, দক্ষিণ আর প্রাচী ও প্রতীচি ।
নৈতিকসম্পদে তব আর সভ্যতায়
(ততদিন জড়সভ্যতার তব বৃথাগর্ভ রহিবে কেবল)
সর্বার্থসাধক, তব শ্রদ্ধা সর্বব্যাপী—অথবা যে
কেবল একটিমাত্র বাইবেল, ত্রাণকর্তামাঝে,
আবদ্ধ তুমি ত' নও,
মুক্তিদাতারূপে গণ্য তোমা' নামে যা'রা
—সংখ্যা নাই তা'র,
নিদ্রিত রয়েছে তা'রা বুকের নাম্বারে তব,
যেকোন লোকের সাথে তুলনায় আর দৈবীভাবে,
সমতুল এ সবাই ! এরাই তোমার নামে
(নিশ্চয় আসিবে দেখো)
ভবিষ্যদ্বাণী আমি ক'রে বাই আজ !*

* ওয়াশ্‌ট ছইটম্যানের “দাউ মাদার উইথ্‌, দাই ইকোয়াল ব্রড্‌” হ'তে উদ্ধৃত।

৩৮শ পরিচ্ছেদ

লুথার বারব্যাঙ্ক—গোলাপবাগের সাধু

লুথার বারব্যাঙ্ক হচ্ছেন একজন বৃগাস্তকারী মার্কিন উদ্ভিদতত্ত্ববিদ—
উদ্ভিদরাজ্যের যাত্রাকর। অসীম ধৈর্য্য আর অপূর্ব মনীষাবলে ইনি উদ্ভিদ-
রাজ্যে নানা নূতন নূতন ফলফুলের সৃষ্টি করেছেন। প্রকৃতির হাতে যে ব্যাপার
সংঘটিত হ'তে দশবৎসর লাগে, সেটা তিনি একবৎসরের মধ্যেই ঘটিয়েছেন।
তাঁর পরীক্ষাক্ষেত্র ছিল শাস্তা রোজা উদ্যান। একদিন যখন তাঁর সঙ্গে
সেখানে বেড়াচ্ছি, লুথার বারব্যাঙ্ক তখন এই জ্ঞানগর্ভ সত্যটি প্রকাশ ক'রে
বললেন, “উন্নতধরণের উদ্ভিদপ্রজননের গুপ্তরহস্য হ'চ্ছে, অবিশ্রি বৈজ্ঞানিক
জ্ঞান ছাড়া—প্রেম।” আমরা আচারযোগ্য একপ্রকার কাঁটাশূণ্য মনসা-
গাছের বাগানের কাছে এসে তখন দাঁড়ালুম।

তিনি বলতে লাগলেন, “যখন আমি মনসাগাছকে কাঁটাশূণ্য করবার
পরীক্ষা চালাচ্ছিলুম, তখন আমি প্রায়ই তা'দের আদর ক'রে ভালবাসার
কথা সব বলতুম। আমি তা'দের বলতুম, ‘তোমাদের কিছু ভয় নেই।
আত্মরক্ষার জন্তে তোমাদের কাঁটার কি দরকার গো, আমি তোমাদের রক্ষা
ক'রব, বুঝলে?’ এই রকম ক'রে নানাকথা বললে আমি যেন তা'দের সব
ভয় ভাঙাতুম। অনশেষে দেখা গেল যে মরুভূমির সেই দারুণ কাঁটাওয়ালা
ফণীমনসার গাছ হ'তে একেবারে কাঁটাশূণ্য অতিপ্রয়োজনীয় এক বিশেষ-
শ্রেণীর গাছের উদ্ভব হয়েছে।”

এই অলৌকিক ব্যাপারের কথা শুনে ত' আমি একেবারে মুগ্ধ হয়ে
গেলুম। বললুম, “প্রিয় লুথারসাহেব, আমাকে কতকগুলো ফণীমনসার
পাতা দেবেন ত', মাউন্ট ওয়াশিংটনে আমার বাগানে পু'ত্ব।”

কাছেই একটা মালী দাঁড়িয়েছিল, তাড়াতাড়ি কতকগুলো পাতা ছাঁটতে
শুরু ক'রে দিলে। বারব্যাঙ্ক তা'কে বারণ ক'রে বললেন, “থাক, থাক, আমি

নিজেই স্বামীজির জন্তে পাতা তুলে দিচ্ছি”, ব’লে আমার তিনটি পাতা তুলে দিলেন। বাগানে সেগুলি লাগাতে খুব বড় হয়ে উঠল দেখে ভারি আনন্দ হ’ল।

সেই শ্রেষ্ঠ উদ্ভিদতত্ত্ববিদ আমার বলেছেন যে তাঁ’র প্রথম উল্লেখযোগ্য সাফল্য হচ্ছে সুবৃহৎ আলু—তাঁ’র নিজ নামে এখন পরিচিত। বিরাট প্রতিভার অক্লান্ত পরিশ্রম নিয়ে তিনি প্রকৃতিতে নানা বর্ণসঙ্করজাতির সৃষ্টি ক’রে পৃথিবীকে বহু নূতন আর উন্নতধরণের ফলকুল উপহার দিয়েছেন। তাঁ’র নামে পরিচিত—বিলাতীবেগুন, ভুট্টা, স্কোয়াশ, চেরী, কুল, নেষ্টোরিয়, বেরী, পপি, লিলি, গোলাপ ইত্যাদি।

লুথারসাহেব যখন আমার তাঁ’র সেই বিখ্যাত বাদামগাছের কাছে নিয়ে গেলেন তখন আমি আমার ক্যামেরার মুখ সেদিকে ফিরোলুম। এই বাদামগাছ থেকে তিনি প্রমাণ করেছিলেন যে প্রাকৃতিক বিবর্তন দ্রুততমগতিতে বৃদ্ধি করা যেতে পারে।

তিনি বললেন, “বোলবছরে এই বাদামগাছে এমন প্রচুর ফলন ফলেছিল যে, কোন সাহায্য না পেয়ে প্রকৃতিকে তেমনভাবে ফলাতে গেলে অন্ততঃ তা’র তিরিশ অথবা তা’রও বেশী বছর সময় লাগত !”

বারব্যাক্সের বেটী নামে ছোট্ট পালিতাকণ্ঠাটি বনিটা নামে তা’র একটি পোষা কুকুর সঙ্গে নিয়ে লাফাতে লাফাতে বাগানে এসে ঢুকল।

লুথার সাহেব সম্মেহে তা’কে দেখিয়ে দিয়ে বললেন, “ও হচ্ছে আমার মানবতরু। সমগ্র মানবজাতিকে আমি একটিমাত্র বিরাট বনস্পতির মতই মনে করি; তা’দের পূর্ণবিকাশ আর চরমপরিণতির জন্তে দরকার প্রেম, মুক্ত আলোবাতাসের প্রকৃতির আশীর্বাদ আর সূচতুর নির্বাচন ও গিলন-সংঘটন। আমার এই নিজেরই জীবনকালে বৃক্ষলতার বিবর্তনে এতবড় আশ্চর্য্য উন্নতি আমি দেখেছি যে, তা’তে ক’রে আমার খুবই আশা হয় যে, যদি এর সন্তানসন্ততিদের সরল আর সুসঙ্গতভাবে জীবনযাত্রা নির্বাহ করতে শিক্ষা দেওয়া হয়, তা’হলে জগৎ সুন্দর আর স্বাস্থ্যবান হয়ে উঠবে। প্রকৃতি এবং প্রকৃতির স্রষ্টা সেই ঈশ্বরেই আমাদের ফিরে যাওয়া উচিত।”

“লুথারসাহেব, আপনি আমার রাঁচিবিদ্যালয়ের মুক্ত আকাশতলে

পঠনপাঠনের ব্যবস্থা আর সেখানে শাস্তির আবহাওয়ায় সরল অনাড়ম্বর জীবনযাপন দেখে খুসী হ'বেন।”

আমার কথাগুলি বারব্যাঙ্কের হৃদয়তন্ত্রী কোমল পর্দায় গিয়ে আঘাত করলে। শিশুশিক্ষাবিদগণ বারব্যাঙ্কের মনে একটা আলোড়ন উপস্থিত করলে। প্রশ্নের পর প্রশ্ন তুলে তিনি আমাকে অস্থির ক'রে তুললেন। তাঁর শাস্তগভীর চোখদুটি আগ্রহে উদ্দীপ্ত!

অবশেষে তিনি বললেন, “স্বামীজি, আপনার বিদ্যালয়ের মত বিদ্যালয়ই ভবিষ্যৎযুগের একমাত্র আশা। আমি বর্তমানযুগের শিক্ষাপ্রণালীর উপর একেবারে খজ্ঞাহস্ত—যে শিক্ষা প্রকৃতি হ'তে বিচ্ছিন্ন ক'রে সমস্ত ব্যক্তিত্বকে চেপে মেরে ফেলে! আপনার শিক্ষার যে কার্য্যকরী আদর্শ, তা'র সঙ্গে মনেপ্রাণে আমি এক।”

এই সৌম্যমূর্তি ঋষিটির কাছ হতে বিদায় নিতে যাবার সময় তিনি একটি ছোট বইয়ে স্বাক্ষর ক'রে সেটি আমায় উপহার দিয়ে বললেন, “এই আমার বই, “মানবতন্ত্রের লালনপালন”।† এখন চাই নূতনধরণের শিক্ষা আর চাই নির্ভীক পরীক্ষা! সময়ে সময়ে খুব দুঃসাহসী পরীক্ষার ফলে সর্বোৎকৃষ্ট ফলফুলের উৎপাদন সম্ভব হয়েছে। শিশুশিক্ষায় নূতনপ্রণালী প্রবর্তনেও তেমনি দুঃসাহসী, তেমনি বহুল পরীক্ষা প্রয়োজন।

গভীর আগ্রহে তাঁর সেই বইটি আমি সেই রাত্রিতেই পড়ে শেষ ক'রে ফেললাম। জাতির গৌরবময় উজ্জ্বল ভবিষ্যতের দিকে দৃষ্টি রেখে তিনি লিখেছেন,—

“এই পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশী অনন্য সজীব বস্তু—পরিবর্তন যা'র অত্যন্ত

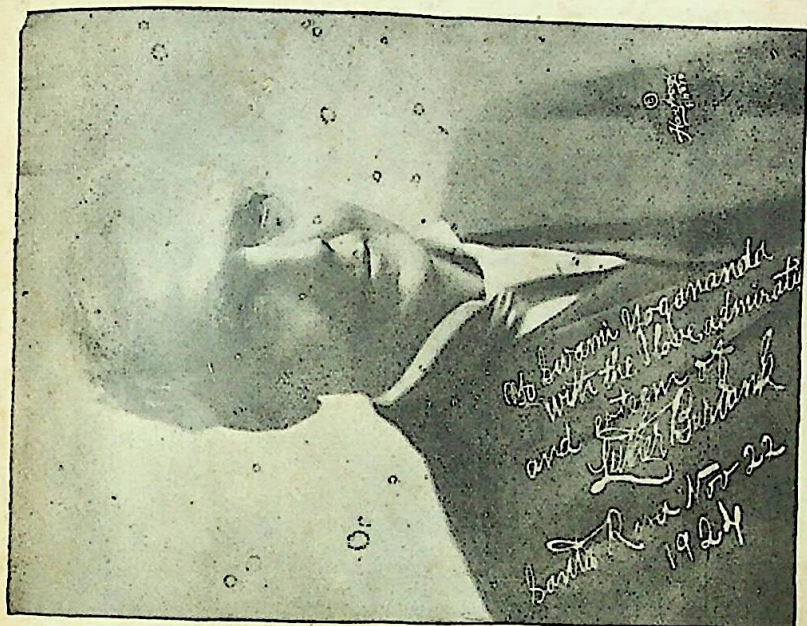
* লুথার বারব্যাঙ্ক তাঁর স্বাক্ষরিত একটি নিজের ফটোগ্রাফও আমায় দিয়েছিলেন। জনৈক হিন্দুগণিক লিন্কনের একটি প্রতিকৃতি একদা যেমন অমূল্য ব'লে বিবেচনা করতেন, বারব্যাঙ্কের প্রতিকৃতিও আমি সেই রকমই বিবেচনা করি। গৃহবিবাদের সময় উক্ত হিন্দুগণিকটি আমেরিকায় ছিলেন। তিনি লিন্কনের প্রতি এতদূর অপরিসীম শ্রদ্ধা পোষণ করতেন যে তিনি সেই “বিরিট মুক্তিদাতার” একখানি ছবি সংগ্রহ না করা পর্য্যন্ত ভারতবর্ষে আর কিছুতেই ফিরতে চাইলেন না। একদিন লিন্কন সাহেবের বাড়ীর দরজা গোড়ায় এসে ভক্তলোক একেবারে অনড় হ'য়ে বসেই রইলেন, বতর্কণ না তিনি বিব্রত প্রেসিডেন্ট সাহেবের কাছ থেকে তাঁর চিত্র অঙ্কিত করবার জন্তে নিউইয়র্কের বিখ্যাত চিত্রকর ড্যানিয়েল হাষ্টিংটনকে নিযুক্ত ক'রবার অনুমতি পেলেন। চিত্রটি সম্পূর্ণ হ'তেই হিন্দুভক্তলোকটি বিজয়গর্বে সেটি বহন ক'রে কলকাতায় ফিরলেন।

† নিউইয়র্ক হ'তে এপলটন-সেকুরী কর্তৃক প্রকাশিত, ১৯২২।

কঠিন, সে হচ্ছে একটি গাছ, যা'র কতকগুলি অভ্যাস একেবারে বন্ধমূল হয়ে গেছে। অরণ রাখবেন যে এই গাছটি যুগেযুগে তা'র বৈশিষ্ট্য বজায় রেখে এসেছে; বোধ হয় এটি সেই, যা'র উৎপত্তি অল্পসরণ ক'রে কাল-প্রবাহের মধ্য দিয়ে গেলে তা'কে প্রস্তরের স্তরের মধ্যেই দেখতে পাওয়া যাবে। এই এতবড় সময়ের মধ্যে তা'র বিশেষ কোন পরিবর্তন ঘটেনি। আপনার কি মনে হয় যে এই যুগযুগান্তরের জন্মমৃত্যুর পর গাছটির অপূর্ণ দৃঢ়তাসম্পন্ন কোন ইচ্ছা—ইচ্ছা যদি বলতে চান, বলুন—তা'র অধিগত হয় নি? বাস্তবিক এমন কতকগুলি গাছ আছে, যেমন কতকগুলি পামজাতীয় গাছ—তা'রা এত সংরক্ষণশীল যে কোন মানবশক্তি এপর্যন্ত তা'দের মধ্যে কোন পরিবর্তন ঘটাতে পারে নি। একটা গাছের ইচ্ছার তুলনায় মানুষের ইচ্ছা অত্যন্ত দুর্বল। কিন্তু দেখুন, এই সম্পূর্ণ গাছটার জীবনব্যাপী দৃঢ়তা শুধু বর্ষসঙ্করতা ঘটিয়ে নতুন জীবন সংযোগ ক'রে তা'র জীবনে একটা দৃঢ় আর সম্পূর্ণ পরিবর্তন এনে কি ক'রে তা' ভগ্ন ক'রে ফেলা যায়। তা'রপর সেই ভাঙন এলে তা'কে বৎসরের পর বৎসর ধ'রে অত্যন্ত ধৈর্যের সঙ্গে সুনির্বাচন আর পরিদর্শন ক'রে তা'র অভ্যাস ক্ষুদ্র ক'রে তুলুন—দেখবেন, নতুন গাছটি নবজীবনধারায় অভ্যস্ত হয়ে গেছে, আর সে তা'র পুরান অবস্থায় কখনও ফিরে যাবে না; তা'র অনমনীয় ইচ্ছা পরিশেষে একেবারে লুপ্ত আর পরিবর্তিত!

“এইরকম ব্যাপার যখন শিশুপ্রকৃতির মতন একটা ভাবপ্রবণ আর নমনীয় বিষয়ে ঘটে তখন সেটা অত্যন্ত সহজ আর সরল হয়ে আসে শিশুকে আত্মসম্মানজ্ঞান শিক্ষা দিন। বৃক্ষ-উৎপাদক বৃক্ষের মধ্যে যেমন উত্তম বৈশিষ্ট্য সকল প্রদান করে, শিশুর মধ্যেও তেমনি সব সদ্গুণাবলী বঙ্গার করুন। সর্বোপরি অরণ রাখবেন পৌনঃপুনিক প্রবর্তন—একটি প্রভাবের পুনঃপুনঃ প্রয়োগ। কোন প্রভাবের অবিরাম প্রয়োগ—এই উপায়েই বৃক্ষের মধ্যে তা'র চরিত্রগত বৈশিষ্ট্যগুলি স্থিতিস্থাপন আর বন্ধমূল করা যায়। নিরুৎসাহ হয়ে পড়লে, চলবে না। আপনি হাতে নিয়েছেন, যেকোন বৃক্ষের চেয়ে বহু বহুগুণ মূল্যবান এক বস্তু—একটি শিশুর মহার্ঘ্য অমূল্যজীবন।”

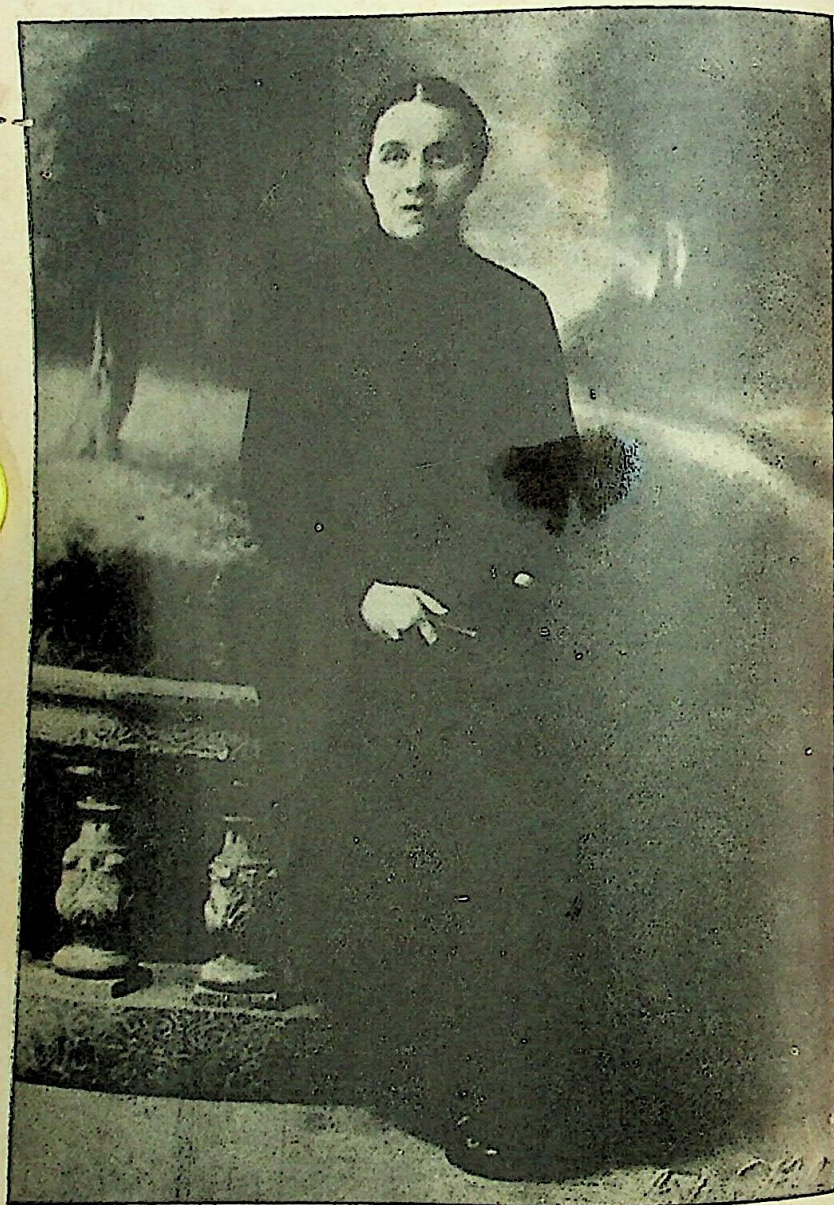
এই শ্রেষ্ঠ আমেরিকান বৈজ্ঞানিকের মনীষায় চৌম্বকারুণ্য হয়ে আমি বহুবার তাঁ'র সঙ্গে সাক্ষাত করতে যাই। একদিন সকালে গিয়ে পড়েছি, সেই



ଭୂଥାର ବାରବାଟୀ ।



ଭୂଥାର ବାରବାଟୀ ଓ ଆମି ।



থেরেসা বিউম্যান্ ।

সময়ে ডাকপিয়নও এসে হাজির। বারব্যাঙ্কের পড়বার ঘরে একটা থলে ক'রে তাঁর নামে চিঠি দিয়ে গেল—হাজারখানেক চিঠি। পৃথিবীর সমস্ত হ'তে উদ্ভানতত্ত্ববিদেরা তাঁকে লিখেছেন।

লুথারসাহেব খুসী হ'য়ে বল্লেন, “স্বামীজি, এসে পড়েছেন ভালই হয়েছে—আপনার দোঁহাই দিয়ে চলুন বাগানে বেরিয়ে পড়ি।” তাঁর পর একটা প্রকাণ্ড ডেস্ক-ড্রয়ার টেনে তাঁর ভিতর থেকে অনেকগুলো দেশভ্রমণের ছবি বাঁক'রে নিয়ে বল্লেন, “এই দেখুন, আমি কেমন ক'রে দেশভ্রমণ ক'রে বেড়াই। গাছের সেবা আর চিঠিপত্র লেখালিখিতে বাঁধা পড়ে বিদেশভ্রমণের সুখ আমার মাঝেমাঝে এই সব ছবিগুলো দেখেই মিটতে হয় আর কি। আমার গাড়ী দরজার কাছেই দাঁড়িয়ে ছিল। লুথার সাহেব আর আমি সেই ছোট্ট সहरটির রাস্তায় রাস্তায় একটু ঘুরে বেড়ালুম। সहरটির চারদিকের বাগান তাঁরই আবিস্কৃত শাস্তা রোজা, পীচরো, বারব্যাঙ্ক গোলাপে আলো হয়ে রয়েছে।

প্রথম প্রথম তাঁর কাছে আমার যাতায়াতের সময়েই লুথার বারব্যাঙ্ক ক্রিয়াযোগে দীক্ষিত হয়েছিলেন।

তিনি বলেছিলেন, “আমি অত্যন্ত শ্রদ্ধার সঙ্গেই প্রক্রিয়াটি অভ্যাস করি।” তারপর যোগের বিভিন্ন অঙ্গ সম্বন্ধে আমাকে বহু সূচিস্থিত প্রশ্ন করবার পর শেষে ধীরে ধীরে বল্লেন, “সত্যিই প্রাচ্যের এত বড় জ্ঞানভাণ্ডার আছে, যা প্রতীচ্য অতি অল্পই অনুসন্ধান করতে আরম্ভ করেছে।”

প্রকৃতির সঙ্গে গভীর সংযোগের ফলে প্রকৃতি যে তাঁর সম্বন্ধরক্ষিত বহু গুণ্ডরহস্ত তাঁর কাছে উদ্ঘাটিত ক'রে দিয়েছিল—তাঁতে ক'রে লুথার বারব্যাঙ্ক লাভ করেছিলেন অপরিমিত আধ্যাত্মিক শ্রদ্ধা!

তিনি সসঙ্কোচে একদিন আমার বল্লেন, “মাঝে মাঝে আমি সেই অনন্তশক্তির স্পর্শ খুব নিকটেই পাই। তাঁতে ক'রে আমি আশেপাশের রূপ লোকেদের আর অসুস্থ গাছেদেরও সুস্থ করে তুলতে পেরেছি।”

তাঁর মা ছিলেন একজন খাঁটি ক্রিষ্টান। তাঁর কথা উল্লেখ ক'রে বল্লেন, “মায়ের মৃত্যুর পর বছবার তিনি আমার স্বপ্নে দেখা দিয়ে আমার সঙ্গে কথা কয়েছেন।”

লুথার বারব্যাঙ্ক

শাস্তা রোজা, ক্যালিফোর্নিয়া

২২শে ডিসেম্বর, ১৯২৪

ইউ. এস. এ.

আমি স্বামী যোগানন্দের যোগদাপ্রণালী পরীক্ষা ক'রে দেখেছি আর আমার মতে মানুষের দৈহিক, মানসিক আর আধ্যাত্মিক প্রকৃতির শিক্ষা আর সামঞ্জস্যবিধানে এ আদর্শ। স্বামীজির উদ্দেশ্য হচ্ছে পৃথিবীব্যাপী আদর্শ জীবনযাপনপ্রণালীর বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা, যেখানে শিক্ষা কেবলমাত্র বুদ্ধিবৃত্তির উৎকর্ষসাধনেই আবদ্ধ থাকবে তা' নয়—শরীর, ইচ্ছা, অনুভূতি এদেরও শিক্ষার ব্যবস্থা থাকবে।

মনঃসংযোগ আর ধ্যানের সরল ও বৈজ্ঞানিকপ্রক্রিয়ার দ্বারা যোগদাপ্রণালীর মাধ্যমে শরীর, মন আর আত্মার উৎকর্ষসাধনে, জীবনের অনেক কিছু জটিলসমস্যার সমাধান হ'তে পারবে, আর পৃথিবীতে শান্তি আর সদিচ্ছা নেমে আসবে। স্বামীজির মতে প্রকৃতশিক্ষা হ'বে, সকল প্রকার দুঃখেরতা আর অকার্যকারিতা হ'তে মুক্ত সহজ সাধারণজ্ঞান, তা' না হ'লে এ আমার অনুমোদন পেত না।

প্রকৃত জীবনযাপনপ্রণালীর উদ্দেশ্যে আন্তর্জাতিক বিদ্যালয়ের জন্ম স্বামীজির আবেদনে অন্তরংগের সঙ্গে যোগদানের এই সুর্যোগ পেয়ে আমি আনন্দিত, বা' প্রতিষ্ঠা হ'লে স্বর্গরাজ্যস্থচনার কাছাকাছি হ'বে; এর বেশী আর কিছু যে কি আছে তা' আর আমার জানা নেই।

লুথার বারব্যাঙ্ক

নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও আমরা তাঁ'র বাড়ী ফিরলুম—হাজারখানেক চিঠি তখনও খোলবার অপেক্ষায় পড়ে রয়েছে।

বাড়ী ফিরে লুথারসাহেবের কাছে একটা কথা পাড়লুম। বললুম, “লুথারসাহেব, আসছে মাস থেকে আমি একটি পত্রিকা বা'র করছি, পূর্ব আর পশ্চিমের বা' কিছু সত্যের দান, তা' এর ভেতর দিয়েই লোকের হাতে পৌছে দেব। পত্রিকাটির জন্তে একটি বেশ ভাল নাম নির্বাচিত করবার জন্তে আমায় সাহায্য করবেন।”

কিছুক্ষণ এ বিষয়ে আলোচনার পর অবশেষে “ইষ্ট-ওয়েস্ট”* অর্থাৎ প্রাচী ও প্রতীচী এই নামটাই সাব্যস্ত হ'ল। তা'রপর পুনরায় তাঁ'র পড়বার ঘরে প্রবেশ করবার পর বারব্যাঙ্ক সাহেব “বিজ্ঞান ও সভ্যতা” এই বিষয়ে তাঁ'র একটি লেখা আমায় পড়তে দিলেন।

লেখাটি পেয়ে আমি সক্রতজ্ঞভাবে বললুম, “ইষ্ট-ওয়েস্টে”র প্রথম সংখ্যাতেই এই লেখাটি বেরুবে।”

আমাদের অন্তরঙ্গতা গভীর হ'তে গভীরতর হ'তে আমি বারব্যাঙ্ক সাহেবকে “আমেরিকার সাধু” ব'লে অভিহিত করতে লাগলুম। প্রায়ই আমি বলতুম, “দেখ, ইনি এমন একটি লোক যা'র মধ্যে কোন খলকপটতা নেই। কি সরল আর অমায়িক!” তাঁ'র হৃদয় ছিল অতলগভীর, সুদীর্ঘঅভ্যাস্ত নম্রতা, ধৈর্য্য আর ত্যাগে ভরপুর। গোলাপবাগানের মধ্যে তাঁ'র ছোটবাড়িটি ছিল নিতান্তই সরল আর অনাড়ম্বর; বিলাসিতা আর তুচ্ছ কতকগুলি ভোগের বিষয়ের অসারতা তিনি বুঝতেন। তাঁ'র বৈজ্ঞানিক প্রতিভার খ্যাতি যে দীনতার সঙ্গে তিনি বহন করতেন, তা'তে বারম্বার এই কথাই আমার মনে হ'ত যে, গাছ ফলভারাবনত হ'লে আপনিই নত হয়ে আসে; আর ফলহীন বৃক্ষেরাই নিফলগর্বে মস্তকোত্তলন ক'রে দাঁড়িয়ে থাকে।

১৯২৬ সালে আমি যখন নিউইয়র্কে, তখন আমার প্রিয় বন্ধুবর ইহলোক পরিত্যাগ করেন। সজলনয়নে আমি ভাবলুম, “আহা, তাঁ'র সঙ্গে দেখা হ'ল না। তাঁ'র একটিবারমাত্র দেখাপাবার জন্তে যে আমি এখান থেকে শান্তা রোজা পর্য্যন্ত হেঁটে যেতে পারি!” আমার সেক্রেটারী আর আগন্তুক-

* ১৯২৫ সালে প্রতিষ্ঠিত; ১৯৪৮ সালে “সেলফ-রিয়্যালাইজেশন্স ম্যাগাজিন” নামে অভিহিত।

অভ্যাগতদের কাছ থেকে নিজেকে লুকিয়ে রেখে তা'রপর দিনরাত চক্ষিৎ
ঘণ্টা ধরে আমি নির্জনতার মধ্যে কাটিয়েছিলাম।

তা'র পরেরদিন লুথারসাহেবের একটি প্রকাণ্ড ছবির সামনে আমি তাঁ'র
আত্মার মঙ্গলকামনায় পারলৌকিক ক্রিয়ার জন্ত একটি বৈদিক অনুষ্ঠান
পালন করলাম। অনুষ্ঠানের উপযোগী হিন্দুসাজসজ্জায় সজ্জিত আমার
কতকগুলি আমেরিকান শিষ্য, দেহের পাঞ্চভৌতিক উপাদানের প্রতীক—অগ্নি,
জল আর পুষ্প প্রদান করে তাঁ'র তা'দের পঞ্চভূতে বিলীন হওয়া উপলক্ষ্যে
স্তোত্র পাঠ করলে।

যদিও লুথারবারব্যাঙ্কের দেহ আজ তাঁ'র বাগানে বহুদিন আগে রোপিত
এক লেবানন সিডার বৃক্ষতলে মহানিদ্রায় মগ্ন,* কিন্তু তাঁ'র আত্মার প্রকাশ
আমার কাছে চলার পথে রাস্তার ধারে আলোহাসিতে উজ্জ্বল, প্রস্ফুটিত
প্রতি ফুলেফুলে। প্রকৃতির বিরাট আত্মার সঙ্গে সাময়িকভাবে মিশে গিয়ে
লুথার বারব্যাঙ্কই কি বাতাসের কানেকানে কথা কইছেন না—উনার আগমনে
জীবনপ্রভাতের সূচনা করে?

তাঁ'র নাম এখন আর একটা ব্যক্তিবিশেষের নাম নয়, তা' এখন সাধারণ
ভাষার অঙ্গীভূত একটা শব্দরূপে প্রচলিত হয়েছে। ওয়েবস্টারের নিউ
ইন্টারন্যাশনাল ডিক্সনারীতে তাঁ'র নাম সর্কর্মক ক্রিয়ারূপে শব্দের তালিকা-
ভুক্ত হয়েছে—তাঁ'র মানে দেওয়া হয়েছে জোড়বাধা বা কলমকরা। স্মৃতির
রূপকঅর্থে তা' বোঝায় মন্দলক্ষণগুলি পরিত্যাগপূর্বক উত্তমবৈশিষ্ট্যগুলি
সংযোজিত করে কোন কিছুর উন্নতিসাধন করা।”

বারব্যাঙ্ক কথাটির অভিধানে প্রদত্ত সংজ্ঞা পাঠ করে আমি বলে উঠলাম,
“প্রিয়তম বারব্যাঙ্ক, আপনার নামটাই হচ্ছে উৎকর্ষ আর সাধুতার
প্রতিশব্দ।”

* বারব্যাঙ্ক তাঁ'র স্বভাবসিদ্ধ বিনয় আর লোকহিতৈষণার সঙ্গে বলেছিলেন, “আমি যখন চলে যাব,
তখন কোন স্মৃতিস্তম্ভ স্থাপন কোরো না—একটি বৃক্ষ রোপণ কোরো।” ক্যালিফোর্নিয়াবাসীরা
সম্প্রতি ইউরেকার নিকটে রেডউডের একটি “লুথার বারব্যাঙ্ক স্মৃতিবৃক্ষ” প্রতিষ্ঠা করেছেন। পৃথিবীর
মধ্যে সর্কাপেক্ষা প্রাচীন সজীববস্তুগুলির মধ্যে এই ৩০০শ ফুট উচু রেডউড একটি। প্রতিবৎসর
৭ই মার্চ তারিখে সারা ক্যালিফোর্নিয়া প্রদেশে লুথার বারব্যাঙ্কের জন্মদিন “জারবার ডে” অর্থাৎ “বৃক্ষ-
দিবস” বলে পালিত হয়।

৩৯শ পবিচ্ছেদ

থেরেসা মিউগ্যান—খ্রীষ্ট ক্ষতাক্ষধারিণী ক্যাথলিক

মাউন্ট ওয়াশিংটন এস্টেটসের হেডকোয়ার্টারে একদিন খানে বসে আছি, হঠাৎ আমার অন্তরের কর্ণে শ্রীবুদ্ধেশ্বর গিরিজির স্বর ধ্বনিত হয়ে উঠল, “ভারতবর্ষে ফিরে এসো; তোমার জন্তে আমি পনের বছর ধৈর্য্য ধ’রে অপেক্ষা ক’রে বসে আছি। শীঘ্রই আমি দেহত্যাগ ক’রে অনন্তের দিকে পাড়ি জমাব। যোগানন্দ, চলে এস!”

চক্ষের পলকে দশহাজার মাইল অতিক্রম ক’রে তাঁ’র আহ্বান আমার অন্তরে এসে পৌঁছল—বিদ্যাসুন্দরগের মত।

পনের বছর। হ্যাঁ, পনের বছরই ত’ বটে! দেপলুম, এটা ১৯৩৫ সাল; এসেছিলুম ১৯২০ সালে। পনের বছর ধ’রে আমি গুরুর শিক্ষা আমেরিকায় প্রচার ক’রে এসেছি। এখন গুরু আমার ডাক দিয়েছেন।

সেইদিন বিকালে একটি শিষ্য সাক্ষাৎ করতে এলে আমার এই অনুভূতির কথা তাঁকে বললুম। ক্রিয়াবোগ সাধন ক’রে তাঁ’র আধ্যাত্মিক উন্নতি এতদূর সাধিত হয়েছিল যে আমি তাঁকে প্রায়ই ‘সাদু’ ব’লে অভিহিত করতুম। বাবাজীর ভবিষ্যদ্বাণী মনে পড়ত যে আমেরিকায়ও এমন সব নরনারী তৈরী হ’তে পারে যা’দের প্রাচীন যোগের পথে ঈশ্বরোপলব্ধি হয়েছে।

এই শিষ্যটি এবং আরও অগাণ্ড সকলে আমার যাত্রার ব্যবস্থার জন্তে অর্থ প্রদান করতে চাইলে। আর্থিকপ্রশ্ন দূরীভূত হ’লে আমি ইউরোপ হয়ে ভারতবর্ষে যাবার ব্যবস্থা করতে লাগলুম। মাউন্ট ওয়াশিংটনে কয়েকটা কর্মব্যস্ত সপ্তাহ কাটল। ১৯৩৫ সালের মার্চমাসে আমি এস, আর, এফ্.কে ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটের আইন অনুসারে লভ্যহীন প্রতিষ্ঠানরূপে রেজিস্ট্রী করলুম। এই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে জনসাধারণের সমস্ত দান, আর মার পুস্তকাবলী, মাসিকপত্রিকা, লিখিত শিক্ষাপ্রণালী প্রভৃতির বিক্রয়লব্ধ

অর্থ, বা ক্লাসে অধ্যাপনা এবং অগ্রাগ্র ব্যবস্থাসকল হ’তে সমস্ত আয়ই তাঁরা পাবে।

ছাত্রদের বললুম, “আমি আবার ফিরে আসব। আমেরিকাকে আমি কখনও ভুলব না।”

স্নেহালুগত বন্ধুবর্গ লস্ এঞ্জেলিসে আমাকে বিদায় অভিনন্দন দিতে এক ভোজ দিলেন। তাঁদের মুখের দিকে বহুক্ষণ চেয়ে আমি সক্রতজ্ঞমনে ভাবলুম, “ভগবান্, তোমাকেই যে একমাত্র সকল দানের দাতা বলে ভাবতে পারে, মানুষের মধ্যে বন্ধুত্বের মাধুর্য্য খুঁজে পাবার তাঁর কখনও অভাব হবে না।”

১৯৩৫ সালের ৯ই জুন আমি “ইউরোপা” নামক জাহাজে নিউইয়র্ক ত্যাগ করলুম। দু’টি শিষ্য আমার সঙ্গে এল। আমার সেক্রেটারী মিষ্টার সি, রিচার্ড রাইট আর একজন বয়সী মহিলা, মিস্ এটি ব্লেচ্। সমুদ্রযাত্রার শান্তিময় দিনগুলি বড়ই আনন্দে কাটল, আগেকার কর্মব্যস্ত সপ্তাহগুলির সঙ্গে তাঁদের কত পার্থক্য! আমাদের অবসরবিনোদন আর বেশীদিন ঘটল না। আধুনিক জলযানের গতির ভিতরেও কিঞ্চিৎ ক্ষোভের বিষয় আছে বই কি!

আর সব উৎসুক ভ্রমণকারীদের মত আমরাও সেই বিশাল আর প্রাচীন মহানগরী লণ্ডন বেড়িয়ে বেড়ালুম। তাঁর পরদিন ক্যান্সটন হ’লে এক বিরাট জনতার সম্মুখে বক্তৃতা দেবার জগ্গে নিমন্ত্রিত হ’লুম। সেখানে স্ত্রার ফ্রান্সিস্ ইয়ংহাজ্ ব্যাণ্ড লণ্ডনের শ্রোতৃমণ্ডলীর নিকট আমার পরিচিত ক’রে দিলেন। তাঁরপরে আমাদের দলের নিমন্ত্রণ এল স্ত্রার হারি লডারের স্কটল্যাণ্ডে তাঁর এষ্টেটে এক অবসরদিনস যাপন করবার জগ্গে। দিনটা খুব আনন্দেই কাটল। তাঁরপর শীঘ্রই আমরা ইংলিশ চ্যানেল পার হয়ে ইউরোপে প্রবেশ করলুম, কেন না আমার ইচ্ছা ছিল যে জার্মানীর ব্যাভেরিয়া প্রদেশে একটি বিশেষ তীর্থস্থান দর্শনের জগ্গে যাত্রাকরা। কারণ আমি ভাবলুম যে কোনারূপের ক্যাথলিক মিস্টিক থেরেসা নিউম্যানকে দর্শন করার হবে আমার এই একমাত্র সুযোগ।

* এখানে সঠিক তারিখ দেওয়া সম্ভবপর হয়েছে তাঁর কারণ আমার সেক্রেটারী রাইট সাহেব একটি ভ্রমণের ডায়েরী রেখেছিল।

বলবৎসর আগে আমি থেরেসা নিউম্যানের একটি অলৌকিক বিবরণ পাঠ করেছিলুম। তা'তে নিম্নলিখিত ঘটনাগুলি বিবৃত করা ছিল :—

(১) ১৮২৮ সালে গুড্‌ফ্রাইডের দিন থেরেসার জন্ম; বিশবৎসর বয়সে তিনি একটি দুর্ঘটনায় আহত হয়ে অন্ধ ও পক্ষাঘাতগ্রস্ত হন।

(২) ১৯২৩ সালে লিসিউর সেন্ট থেরেসা, “দি লিটল ফ্লাওয়ারের” কাছে প্রার্থনার ফলে তিনি তাঁর দৃষ্টিশক্তি পুনরায় ফিরে পান। পরে থেরেসা নিউম্যানের অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি অবিলম্বে আরোগ্য লাভ করে।

(৩) ১৯২৩ সাল হতে থেরেসা দৈনিক একটি ক্ষুদ্র পবিত্রকণ্ঠ আহ্বার করা ব্যতীত পাগপানীয় গ্রহণে সম্পূর্ণ বিরত।

(৪) ষ্টিগম্যাটা অর্থাৎ ক্রশবিদ্ধ যীশুখৃষ্টের পবিত্র ক্ষতচিহ্নসকল ১৯২৬ সালে থেরেসার মস্তকে, বক্ষে, হস্ত ও পদদ্বয়ে প্রকাশিত হ'ল। তাঁরপর হতে প্রতি সপ্তাহের শুক্রবারে তিনি তাঁ'র নিজশরীরে সেই সব ঐতিহাসিক ঘটনা আর ক্রেশ ভোগ ক'রে যীশুখৃষ্টের মৃত্যুর অবস্থার ভিতর দিয়ে আসতেন।

(৫) থেরেসার কেবলমাত্র তাঁ'র নিজগ্রামের সরল জার্মানভাষা জানা ছিল, কিন্তু প্রতি শুক্রবারে তাঁ'র “ভর” হবার সময় তিনি এমন সব কথা উচ্চারণ করেন, যা' পণ্ডিতেরা প্রাচীন আরামেয়িক ব'লে নির্দ্ধারিত করেছেন। তাঁ'র “ভর”ের সময় যথাস্থানে তিনি হিব্রু বা গ্রীক ভাষাতেও কথা বলেন।

(৬) গির্জার কর্তৃপক্ষের অনুমতি অনুসারে থেরেসাকে বারকতক কঠিন বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাধীনে রাখা হয়। প্রোটেষ্ট্যান্ট জার্মান সংবাদপত্রের সম্পাদক, ডাক্তার ফ্রিৎস্ গেলিক কোনারসক্রেথে গেলেন ক্যাথলিক বৃজ্জকি ফাঁসিয়ে দিতে—ফিরে এসে লিখলেন তাঁ'র এক শ্রদ্ধাপূর্ণ জীবনকাহিনী।*

কি পূর্ক কি পশ্চিম, সাধুদর্শনের ভণ্ডে আমি সর্বদাই লালারিত। ১৬ই

* থেরেসার জীবন সম্বন্ধে অস্বাভাবিক বই হচ্ছে, “থেরেসা নিউম্যান”—বর্তমানকালের ষ্টিগম্যাটিষ্ট্‌ আর “থেরেসা নিউম্যানের আরও গল্প”, দুইই ফ্রেড্রিক রিটার ফন্‌ লামা কর্তৃক লিখিত : আর একটি হচ্ছে এ. পি শিয়ার্গ কর্তৃক লিখিত “থেরেসা নিউম্যানের গল্প” (১৯৯৭)। মিলওয়াকী হ'তে ক্রস পাবলিশিং কোম্পানী এই তিনটি বইই প্রকাশ করেছেন। শিয়ার্গের বইয়ে নাজিরি যখন থেরেসাকে হত্যা করবার নিষ্ফল চেষ্টা করছিল তখনকার তাঁ'র অভিজ্ঞতার বিষয় বর্ণনা করা আছে।

জুলাই তারিখে আমাদের ছোটদলটি কোনারক্ষণের সেই অদ্বিত গ্রামটিতে প্রবেশ করতে আনন্দে উল্লসিত হয়ে উঠলুম। ব্যাভেরিয়ার চারীরা আমাদের ফোর্ড গাড়ী (আমেরিকা হতে আমাদের সঙ্গে আনা) আর তা'তে আমাদের এই বিচিত্র দলটি—একটি মার্কিন, একটি বয়স্ক মহিলা আর একটি শ্রামবর্ণের প্রাচ্যদেশবাসী, বা'র স্কন্ধবিলম্বিত কেশেরগুচ্ছ কোটের কলারের ভিতর লুকায়িত—দেখে অপূর্ব কৌতুহল প্রদর্শন করলে।

থেরেসার ছোট কুটিরটি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। পুরান ধরণের একটি কুয়ার ধারে জিরেনিয়াম ফুল কুটে রয়েছে—কিন্তু হয়, নেমে দেখি যে তা' বন্ধ, একেবারে নিস্তন্ধ। প্রতিবেশীরা, এমন কি সেইখান দিয়ে তখন ডাকপিওন যে বাচ্ছিল সেও তাঁ'র বিষয়ে কিছুই খবর দিতে পারলে না। বৃষ্টি পড়তে শুরু হ'ল। সঙ্গীরা সব বললে—ফেরা বাক্।

আমি কিন্তু দৃঢ়ভাবে বললুম, “বতক্ষণ না আমি থেরেসার কোন সন্ধান পাচ্ছি ততক্ষণ আমি এখানেই থাকব।”

ঘণ্টা দুই কেটে গেল—তখনও আমরা বৃষ্টির মধ্যে বসে সেই গাড়ীর ভিতর। দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে ভগবানের কাছে নালিশ জানালুম,—“ভগবান, থেরেসা যদি অন্তর্দ্বন্দ্বিতা করলেন তবে তুমি তাঁ'র কাছে আমায় এনে ফেললে কেন?”

কাছে এসে একটি লোক দাঁড়াল—লোকটা ইংরেজি জানত। জিজ্ঞাসা করলে, কিছু সাহায্য করতে পারে কি না।

সে বললে, “থেরেসা কোথায় তা' অবশ্য আমি ঠিক জানি না। কিন্তু তিনি মাঝেমাঝে প্রফেসর ওয়াংসের বাড়ী যান—তিনি হচ্ছেন আইখ্‌ষ্ট্যাটের স্কল-মাষ্টার,—জায়গাটা এখান হতে আশী মাইল হ'বে।” তারপরদিন আবার আমাদের দলটি আইখ্‌ষ্ট্যাটের শান্ত গ্রামটিতে গিয়ে উপস্থিত হ'ল। পাথর-বাধান সড়ক রাস্তা দিয়ে ঘেরা। ডাক্তার ওয়াংস তাঁ'র বাড়িতে আমাদের আন্তরিক অভ্যর্থনা জ্ঞাপন ক'রে বললেন, “হ্যাঁ, থেরেসা এখন এখানেই আছেন।” ব'লে তিনি এই সব দর্শনপ্রার্থীদের কথা তাঁ'কে ব'লে পাঠালেন। তাঁ'র উত্তর নিয়ে একটি লোক শীঘ্রই নীচে নেমে এল। তা'তে লেখা ছিল, “যদিও বিশপ তাঁ'র অনুমতি বিনা আমায় কারুর সঙ্গে দেখা করতে নিষেধ করেছেন, তবুও আমি ভারতবর্ষের এই সাধুটির সঙ্গে দেখা করব।”

তাঁর কথাগুলিতে মন গভীরভাবে আলোড়িত হয়ে উঠল। ডাক্তার ওয়াংসের সঙ্গে উপরতলায় বসবার ঘরে গেলুম। থেরেসাও সঙ্গেসঙ্গে ঘরে প্রবেশ করলেন। তাঁর পুণ্যদেহ হ'তে একটা যেন শান্তি আর আনন্দের জ্যোতিঃ বিচ্ছুরিত হ'চ্ছিল। পরিধানে ছিল একটা কাল গাউন আর অকলঙ্ক শ্বেতবর্ণের মস্তকাবরণ। এই সময়ে তাঁর সাঁইত্রিশবছর বয়স হলেও দেখতে তিনি যেন আরও নবীন, শিশুর সৌকুমার্য আর লাবণ্য ঘেরা। সুগঠিত আকৃতি স্বাস্থ্যপূর্ণ—কপোলদেশে গোলাপের আভা, প্রকুলবদন এই সেই সাক্ষী যিনি অনাহারে থাকেন।

থেরেসা আমার সঙ্গে অতিমৃদু করমর্দনে আমার অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করলেন। নীরবে উভয়েই উভয়কে ঈশ্বরপ্রেমিক জেনে আমাদের উভয়েরই মুখে মৃদু হাসি ফুটে উঠল।

ডাক্তার ওয়াংস দয়া ক'রে বললেন যে তিনি আমাদের দোভাষীর কায করবেন। সকলে উপবেশন করতে দেখা গেল যে থেরেসা অবিস্মিত কৌতূহলের সঙ্গে আমার দিকে তাকাচ্ছেন—স্পষ্টতঃ বোঝা গেল যে ব্যাভেরিয়া অঞ্চলে কেউ বোধ হয় কখনও কোন হিন্দুকে দেখে নি।

তাঁর নিজের মুখ থেকে উত্তরটা শোনবার আশায় আমি প্রশ্ন করলুম, “আপনি কি কিছুই খান না?”

“না, কেবলমাত্র ছোট্ট একটুকরো চালেরগুঁড়ির একটা পাতলা প্রসাদীকুটি ছাড়া—তা'ও সকাল ছ'টার সময় একবারমাত্র খাই।”

“কুটিটি কত বড়?”

“কাগজের মতন পাতলা, আর একটি ছোট টাকার মত। আমি এটা গ্রহণ করি—পবিত্র অনুষ্ঠানপালনেরই জন্ত। যদি এ প্রসাদী না হয়, তা'হলে আমি তা' আর গিলতে পারি না।”

“তা'তে ক'রে ত' আপনি আর এই সারা বারবছর ধ'রে বেঁচে থাকতে পারেন না।”

তাঁর উত্তর এল অত্যন্ত সরল আর আইনষ্টাইনীয়,—“আমি ঈশ্বরের জ্যোতিঃতেই বেঁচে আছি।”

“তা'হলে দেখছি যে আপনি ইথার, আলো, আর বায়ু থেকেই আপনার শরীরের জন্ত শক্তি ও পুষ্টি সংগ্রহ করেন।”

তাঁ'র মুখের উপর একটা মৃদুহাসির ঝিলিক খেলে গেল। বন্লেন, “কেমন করে বেঁচে আছি তা’ যে আপনি বুঝতে পেরেছেন, জেনে আমি ভারি খুসি হলাম।”

“হীন্তুপষ্ট যে মহাসত্য উচ্চারণ ক’রে ব’লে গেছেন যে, ‘মানুষ কেবলমাত্র শুধু অন্তরেই জীবনধারণ করবে তা’ নয়, ভগবানের শ্রীমুখনিঃসৃত তাঁ’র প্রত্যেক বাণীর দ্বারা ই সে তা’র জীবনধারণ করবে।’ একথার সত্যতার দৈনন্দিন জীবন উদাহরণ হচ্ছে আপনার পুণ্যময় জীবন।”*

আমার বাখায় তিনি পুনরায় আনন্দ প্রকাশ ক’রে বন্লেন, “বাস্তবিকই তাই। এ জগতে আজ বেঁচে থাকার একটি কারণ হচ্ছে যে শুধু অন্তরেই নয়, ঈশ্বরের অদৃশ্য আলোকেই মানুষ বেঁচে থাকতে পারে, তা’ প্রমাণ করা।”

“আচ্ছা, কি ক’রে মানুষ না খেয়ে বেঁচে থাকতে পারে, তা’ আপনি তা’দের শিখিয়ে দিতে পারেন কি?”

মনে হ’ল একটু বিব্রত হয়ে পড়লেন—বন্লেন, “আমি ত’ তা’ পারি না, ঈশ্বরের তা’ ইচ্ছা নয়।”

তাঁ’র বলিষ্ঠ অথচ স্নন্দর দুটি হস্তের উপর আমার দৃষ্টি পড়তেই পেরেসা তাঁ’র উভয় করতলে একটি ক’রে ক্ষুদ্র চতুষ্কোণ সদ্যআরোগাপ্রাপ্ত ক্ষতচিহ্ন প্রদর্শন করলেন। প্রত্যেক হাতের উল্টো পিঠে তিনি দেখালেন যে আরও সব ক্ষুদ্র অর্ধচন্দ্রাকৃতি ক্ষতচিহ্ন—সবেমাত্র শুকিয়েছে। এই দুটি ক্ষতচিহ্ন

* মানুষের দেহরূপ বাটারি যে কেবলমাত্র জড় অন্তরেই পরিপুষ্ট লাভ ক’রে তা’ নয়। তা’ ক’রে স্পন্দনশীল বিংশক্তি বলে (শব্দব্রহ্ম বা প্রণব স্বভাব)। মেরুমজ্জার (সহস্রদল পত্র) দ্বারের ভিতর দিয়ে এই অদৃশ্য মহাশক্তি মানবশরীরে সঞ্চারিত হয়। বাড়ুর পিছনে মেরুদণ্ডস্থিত পাঁচটি চক্রের উপর এই বহুচক্রটি অবস্থিত। এই চক্রই হচ্ছে শরীরের মধ্যে বিশ্বপ্রাণশক্তি (প্রণব) সঞ্চারের প্রধান প্রবেশদ্বার এবং তা’ দুই স্রমধ্যস্থ তৃতীয়নেত্রস্থিত সপ্তমচক্র অথবা কূটস্থ কেন্দ্রীভূত আর তা’ মানবের ইচ্ছাশক্তির সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে সংলগ্ন। অতএব এই মহাবোমশক্তি নস্তিকের মধ্যে অসীম সম্ভাবনার আধাররূপে সঞ্চিত থাকে—বেদে কবির ভাষায় এ “ব্রহ্মজ্যোতিঃ” সহস্রদল কমলরূপে বর্ণিত হয়েছে। বাইবেলের লেখকগণ যখন “শব্দ” অথবা “আমেন” কিংবা “পবিত্রাত্মা” বলে উল্লেখ করেন, তখন তাঁ’রা ওয়ার অথবা শব্দব্রহ্মকে অদৃশ্য প্রাণশক্তি অর্থে ব্যবহার করেন যে ঐশী বলে এ নিগিল সৃষ্টি পূত হয়ে আছে। “কি? তুমি কি জান না যে তোমার দেহ হচ্ছে তোমার মধ্যে অবস্থিত ‘পবিত্রাত্মার’ মন্দির, না’ তুমি ঈশ্বরের কাছ হ’তে লাভ করেছ, আর তুমি তোমার নিজের কিছু নও?”—বাইবেল।

হাতের চেটোর মধ্য দিয়ে কুঁড়ে গিয়েছে। এই দৃশ্য দেখে আমার স্পষ্ট মনে পড়ল, বড় বড় চৌকা লোহার পেরেকের তলাগুলো ঠাদের ফালির মত, এখনও তা' পূর্বাঞ্চলে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু আমি সে সব পশ্চিমে ব্যবহৃত হতে দেখেছি ব'লে ত' মনে পড়ে না।

তারপর থেরেসা নিউম্যান তাঁর সাপ্তাহিক "ভরে'র কথা কিছু ব'লে বললেন, "অসহায় দর্শকের মত আমি যীশুখৃষ্টের মরণদৃশ্যের সবটাই প্রত্যক্ষ করি।" প্রতি বৃহস্পতিবার মধ্যরাত্র থেকে শুক্রবার বেলা ১১ টা পর্যন্ত তাঁর ক্ষতস্থানগুলির মুখ খুলে গিয়ে রক্তক্ষরণ হতে থাকে। সাধারণতঃ তাঁর দেহের ওজন ১২১ পাউণ্ড, তা' থেকে দশপাউণ্ড তখন কমে যায়। তাঁর এ গভীর ঈশ্বরপ্রেমে দারুণযত্না ভোগ করেও থেরেসা তাঁর প্রভু যীশুখৃষ্টের সাপ্তাহিক দর্শনলাভের আশায় সানন্দে অপেক্ষা করেন।

আমি তখনই বুঝলুম যে তাঁর এ অদ্ভুত জীবনে সকল খৃষ্টানের কাছে নূতন টেষ্টামেন্টে বাণত যীশুখৃষ্টের জীবন ও ক্রুশবিদ্ধ হওয়ার বিষয়ে ঐতিহাসিক সত্যতা প্রতিষ্ঠা করা আর সেই গ্যালিলীয় গুরু আর তাঁর ভক্তশিষ্যদের মধ্যে চিরস্থায়ী বন্ধন নাটকীয়ভাবে প্রদর্শন করাই ঈশ্বরের অভিপ্রেত।

তারপর প্রফেসর ওয়াৎস সেই সাক্ষীমহিলার বিষয়ে কতকগুলি ঘটনা বর্ণনা করলেন।

তিনি বললেন, "আমাদের মধ্যে জনকতক—তাঁর মধ্যে থেরেসাও থাকেন, সারা জার্মানীর ভিতর দিয়ে দিনেরপর দিন ধরে দেশবিদেশ দেখবার জন্তে প্রায়ই বেড়াতে বা'র হই। তখন এক বিসদৃশ ব্যাপার ঘটে! আমরা যখন দিনের মাথায় তিনবার ক'রে বেশ পরিপাট্যরূপে ভোজনক্রিয়াটি সম্পন্ন করি—থেরেসা তখন বিন্দুমাত্র জলও গ্রহণ করেন না। দেশ ঘুরে ঘুরে বেড়িয়ে আমরা যখন ভ্রমণক্লান্ত, বিশ্রাম খুঁজি—থেরেসার কিন্তু বিন্দুমাত্রও ক্লান্তি নাই, তখনও তিনি সন্ধ্যোফোটা একটি গোলাপফুলেরই মত তাজা। ক্ষিধেয় পেট জলুতে স্তূরু করলে আমরা যখন রাস্তার ধারে সরাইখানা চুঁড়ে যরি, থেরেসা কুঁড়ির চোটে কেবল হাসেন আর কি!"

প্রফেসর সাহেব তাঁর শারীরিক বৈশিষ্ট্যসম্বন্ধে আরও কতকগুলি কৌতূহলোদ্দীপক ব্যাপার বলেন। তিনি বললেন, থেরেসা কোনও প্রকার

আহার্য গ্রহণ না করাতে, তাঁ'র পাকস্থলী কুঞ্চিত হয়ে গেছে। তাঁ'র মলমূত্র ত্যাগ হয় না—কিন্তু তাঁ'র ঘর্ষণগ্রস্তির ক্রিয়া সব ঠিকই আছে। চন্দ্র তাঁ'র সর্বদাই কোমল অথচ দৃঢ়।

বিদায়গ্রহণকালে আমি থেরেসাকে তাঁ'র “ভর” হবার সময় উপস্থিত থাকবার ইচ্ছা প্রকাশ করলুম।

তিনি সৌজ্ঞ প্রকাশ ক'রে বললেন, “হ্যাঁ, কোনারূপে আসুন না কেন—আসছে শুক্রবারে। বিশপের কাছ থেকে অনুমতিপত্র পাবেন। আমার আইখ্‌ষ্ট্যাটে খুঁজতে গিয়েছিলেন শুনে আমি ভ'রি খুসি হয়েছি।”

বহুবার মৃদুভাবে কর্মর্দন ক'রে থেরেসা আমাদের দলটিকে এগিয়ে দিতে গেটের কাছ পর্যন্ত এলেন। রাইটসাহেব মোটরগাড়ীর রেডিওটি খুলে দিতেই থেরেসা সহাস্রকৌতুহলে বহুটি পরীক্ষা করতে লাগলেন। সেই সময় উপস্থিত ছোকরাদের দল এত বেজায় ভারি হয়ে উঠল যে থেরেসাকে বাড়ীর ভিতর ঢুকে পড়তে হ'ল। আমরা গাড়ী ছেড়ে দিলুম—দেখি যে থেরেসা জানলার কাছে দাঁড়িয়ে আমাদের দিকে উঁকি মারছেন আর ছোট শিশুদের মত আমাদের দিকে হাত নাড়ছেন।

থেরেসার ছুটি ভাই, ভারি অমায়িক আর তাঁদের ব্যবহারও অতি মধুর। তাঁদের সঙ্গে কথাবার্তা থেকে জানতে পারলুম যে থেরেসা মাত্র এক বা দুইঘণ্টাটুকু রাত্রিতে ঘুমান। তাঁ'র শরীরে বহু ক্ষতচিহ্ন থাকা সত্ত্বেও তিনি বেশ কার্যক্ষম আর উৎসাহদীপ্ত। পাগী খুব ভালবাসেন, মাছের একটি জলাধার আছে—তা'র দেখাশোনা করেন, আর তাঁ'র বাগানে উদ্যান-চর্যাতেই তাঁ'র বহুসময় কাটে ; চিঠিপত্র লেখালিখিও তাঁ'কে খুব করতে হয়। ক্যাথলিক ভক্তেরা তাঁ'কে প্রার্থনা আর রোগনিরাময়ের জন্ত লেখেন। বহু ভক্ত তাঁ'র দ্বারা গুরুতর ব্যাধি হ'তে সম্পূর্ণরূপে আরোগ্যলাভ করেছেন। তাঁ'র এক ভাই ফার্ডিনাণ্ড—বয়স তেইশবছর, তাঁ'র সঙ্গে আলাপ হ'ল। আমার বললে—প্রার্থনার বলে অপরের রোগের ভোগ নিজশরীরে ক্ষয় ক'রে নেবার শক্তি থেরেসার আছে। থেরেসা আহার ত্যাগ করতে স্মর করলেন যখন তাঁ'দের গির্জার একটি যুবক পাদ্রী হবার জন্তে প্রস্তুত হ'চ্ছিল ; সেই সময়ে তিনি প্রার্থনা করেন যে সেই যুবকের গলার ব্যাধি যেন তাঁ'র নিজের গলায় পরিচালিত হয়।

বৃহস্পতিবার বৈকালে আমাদের দলটি বিশপের বাড়ী গিয়ে পৌঁছল; বিশপ মহাশয় ত' আমার লম্বা চুল দেখে কতকটা বিস্মিতই হ'লেন। বাই হোক তিনি সম্বরই অনুমতিপত্রটি লিখে আমাদের হাতে দিলেন। অবশ্য তা'র জন্তে আমায় কোনরকম ফিঃ দিতে হয় নি।* চার্চের এই নিয়মটি হয়েছিল অলস কোতুহলী পর্যটকদের ভিড়ের হাত থেকে থেরেসাকে বাঁচাবার জন্ত। আগের আগের বছরে তা'রা প্রতি শুক্রবারে হাজারে হাজারে এসে জুটত।

শুক্রবার কোনারক্ষণে এসে পৌঁছলুম বেলা সাড়ে ন'টায়। দেখা গেল থেরেসার ক্ষুদ্র কুটিরটির একটা বিশেষ অংশে কাঁচের ছাদ দেওয়া আছে—যা'তে প্রচুর আলো আসতে পারে। প্রায় জনকুড়িক দর্শক সেখানে উপস্থিত, সবাইকার হাতে একটি ক'রে পারমিট বা অনুমতিপত্র। অনেকেই সেই অঙ্কিত “ভর” দেখাবার জন্তে বহু দূরদেশ থেকে এসেছেন।

থেরেসাকে আমার প্রথমপরীক্ষা হয়েছিল সেই প্রফেসরের বাড়ীতে। আমি যে তাঁ'কে আধ্যাত্মিক কারণে দেখতে এসেছি—শুধু অলস কোতুহল-চরিতার্থ করবার জন্তে নয়, তা' তিনি অন্তরের মধ্যে টের পেয়েছিলেন।

আমার দ্বিতীয়পরীক্ষা হয়েছিল এই রকম। উপরতলায় তাঁ'র ঘরে যাবার পূর্বে আমি যোগনিদ্রায় মগ্ন হ'লুম, উদ্দেশ্য ছিল দূরদর্শন আর দূরশ্রবণবিনয়ে তাঁ'র সঙ্গে একাক্ষ হয়ে যাওয়া। তাঁ'র কক্ষে গিয়ে প্রবেশ করলুম, দেখি তা' দর্শকে পরিপূর্ণ; শয্যার উপর একটি শ্বেতবসনে আবৃত হয়ে থেরেসা শয়ন ক'রে যাচ্ছেন। রাইট সাহেবও পিছনে পিছনে আসছিল। আমি চৌকাঠ পেরিয়ে ঘরের ভিতরে ঢুকেই একটা অঙ্কিত আর ভয়ঙ্কর দৃশ্য দেখে ভয়ে ও বিস্ময়ে গুপ্তিত হ'য়ে গেলুম।

থেরেসার নীচের চোখের পাতা থেকে প্রায় একইক্ষি পরিমাণ চওড়া একটি রক্তশ্রোত পাতলাভাবে অনবরত বইছে। তাঁ'র উর্দ্ধদৃষ্টি ক্রমশঃ তৃতীয়নেত্রের দিকে নিবদ্ধ। তাঁ'র মাথায় যে কাপড় জড়ান ছিল, তা' কাটার মুকুটের ক্ষতস্থান হ'তে নিঃসৃত রক্তে প্লাবিত হয়ে গেছে! তাঁ'র বুকের উপরকার শ্বেতবস্ত্র তাঁ'র পাঁজরার ক্ষতস্থান হ'তে বারারক্তে একেবারে লাল হয়ে গেছে।

*১৯৩৪ সাল পর্যন্ত কোন অনুমতিপত্র প্রয়োজন হ'ত না : কিন্তু হিটলার প্রতি শুক্রবারে দেখানো হাজার হাজার দর্শনার্থীদের আগমন বন্ধ ক'রে দিতে চাইলে অনুমতিপত্রের প্রয়োজন হয়।

আশ্চর্যের বিবর, ঠিক যে জায়গায় যীশুখৃষ্ট বহুবৃগপূর্বে সৈনিকের বর্শাকলকের দ্বারা আঘাত পেয়েছিলেন ঠিক সেই জায়গা থেকেই রক্ত বারে পড়ছে !

থেরেসার হস্তদুটি জননীর স্নেহকরণায় প্রসারিত...অল্পনয়ে নিঃশব্দ, আননে যুগপৎ বস্ত্রণা ও ক্লেশের ছায়া আর স্বর্গীয় আভা ! দেখে বোধ হল, শুধু স্থূল নয়, হৃদয় উপায়েও তাঁর পরিবর্তন সাধিত হয়ে শরীরটি পূর্বাপেক্ষা একটু যেন পাতলাগোছের হয়ে গেছে। আপনমনে বিড়বিড় ক'রে কি একটা বিদেশীভাষার কথা কহিতে কহিতে তাঁর ঠোট দুটি কাপছে—বোধ হয় তাঁর অন্তর্দৃষ্টির সামনে যে সব ব্যক্তিদের আবির্ভাব হয়েছিল তাঁদেরই সঙ্গে কথা কইছিলেন।

তাঁর মনের সঙ্গে তখন আমার যোগস্থত্র স্থাপন করা হয়ে গেছে। আমিও তাঁর স্বপ্নের সব দৃশ্যই দেখতে পেলুম। যীশুখৃষ্ট যখন বিদ্রূপকারী জনতার মধ্য দিয়ে ক্রুশের কাঠ বহন ক'রে নিয়ে যাচ্ছিলেন, তখনকার সব দৃশ্য থেরেসা দেখেছিলেন।* হঠাৎ তিনি ঝড়মড় ক'রে মাথা উঁচু ক'রে তুলে ধরলেন—কঠোর ভারের চাপে যীশুখৃষ্টের পতন ঘটল, দৃশ্যটিও অন্তর্হিত হ'ল। উদগ্র অন্তর্ভূতিতে ক্লান্ত হয়ে থেরেসা বালিসের উপর গভীরভাবে মাথা এলিয়ে দিয়ে শুয়ে পড়লেন।

ঠিক এইসময়ে আমি আমার পিছনেই যেন মাছুষ পড়বার মত একটা ভারি শব্দ শুনতে পেলুম। মুহূর্তের জন্তে মাথা ফিরিয়ে দেখি যে দুটি লোক একটি লম্বমান দেহ বহন ক'রে নিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু সেই সময় আমার গভীর যোগনিদ্রার ঘোর তখনও কাটেনি ব'লে লোকটি যে কে পড়ে গেছে, তা' তখনই ঠিক চিন্তে পারলুম না। আবার থেরেসার মুখের উপর আমার দৃষ্টি নিবদ্ধ হ'ল...রক্তের স্রোত রয়েছে ব'লে সে মুখ মৃত্যুপাপ্তুর, বিবর্ণ, কিন্তু তা'থেকে একটা পবিত্র স্বর্গীয় আভা বেরুচ্ছে। তা'রপর আমি পিছন ফিরে দেখি যে রাইটসাহেব গালে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে—গাল দিয়ে রক্ত বারছে।

* আমার সেখানে উপস্থিত হ'বার পূর্বেই মহাপ্রভু যীশুখৃষ্টের শেবজীবনের কতকগুলি ঘটনার স্বপ্নদর্শন থেরেসার ইতিমধ্যেই ঘটে গিয়েছিল। সাধারণত তাঁর "ভর" আরম্ভ হয় যীশুখৃষ্টের "শেব সাক্ষ্যভোজের পরবর্তী কতকগুলি ঘটনার দৃশ্য হ'তে আর তাঁর স্বপ্নদর্শনের পরিসমাপ্তি ঘটে যীশুর ক্রুশের উপর মৃত্যু অথবা কখনও কখনও তাঁর সমাধির সঙ্গে সঙ্গে।

অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হয়ে জিজ্ঞাসা করলুম, “ডিক্, তুমিই কি পড়ে গিয়েছিলে?”

“আজ্ঞে হ্যাঁ, আমি এ ভীষণদৃশ্য সহ্য করতে না পেরে মুচ্ছা গিয়েছিলুম।”

সান্ত্বনা দিয়ে বললুম “বাক্, তোমার সাহস আছে দেখছি—ফিরে এসে আবার এ দৃশ্য দেখতে এসেছ।”

বহু দর্শকেরা তখন নীচে নীরবে অপেক্ষা করছে স্বরণ ক’রে গিষ্টার রাইট আর আমি থেরেসার কাছ থেকে নীরবে বিদায়গ্রহণান্তে তাঁর পবিত্রসান্নিধ্য ত্যাগ ক’রে অগ্রসর হ’লুম।*

তাঁর পরদিন আমাদের ক্ষুদ্রদলটি মোটরে ক’রে দক্ষিণদিকে অগ্রসর হ’ল। একটা স্তম্ভিধা ছিল যে আমাদের ট্রেনের উপর নির্ভর করতে হয় নি—গ্রামের ধারে যেখানে ইচ্ছা আমাদের ফোর্ডগাড়ী থামিয়ে সব দেখতে সন্তোষ পেয়েছি। জার্মানী, হল্যান্ড, ফ্রান্স, সুইজারল্যান্ডের আল্প্ প্রভৃতি ভ্রমণের সময় প্রতিটিমুহূর্ত আমার উপভোগ করেছে; ইটালির মধ্যে আসিসিতে বিনয়ের অবতার সেন্ট ফ্রান্সিস্কে† দর্শন করবার জন্তে আমাদের

* ১৯৪৮ সালের ২৬শে মার্চ তারিখে জার্মানী থেকে আই এন এস প্রেরিত সংবাদে প্রকাশিত, “এবারে গুডফ্রাইডের দিন একটি জার্মান কুমকরমণীকে দেখা গেল যে, সে তাঁর শয্যায় শায়িতা, তাঁর মাথা, হাত আর কাঁধ ছুটিতে রক্তচিহ্ন, যীশুখৃষ্ট ক্রুশবিদ্ধ হ’বার আর কটকমুকুট ধারণ করবার পর কাঁটার আর পেরেকের যে যে স্থানে ক্ষতচিহ্ন হ’তে রক্ত ঝরেছিল ঠিক সেই সেই স্থান হতে রক্ত ঝরছে। ভীতিবিমুঢ় সহস্র সহস্র জার্মান ও আমেরিকান থেরেসা নিউম্যানের কুটিরশয্যার পাশ দিয়ে তাঁকে দর্শন ক’রে একে একে অগ্রসর হচ্ছিল।”

† থেরেসা নিউম্যানের মত সেন্ট ফ্রান্সিস্ (১১৮২—১২২৬ খৃষ্টাব্দ) ও তাঁর নিজ পুণ্যশরীরে “পবিত্র ক্রুশক্ষতচিহ্ন” ধারণ করেছিলেন। অস্বাস্থ্য খৃষ্টীয় “ক্রুশক্ষতচিহ্ন”ধারীরা হচ্ছেন মহাত্মা ষ্টেফান কুইনজানি (১৪৫৭—১৫৩০ খৃঃ অব্দ) এবং সেন্ট কাথারাইন দ্য রিকি (১৫২২—১৫৯০)। ডি. স্মাকভিল ওয়েষ্ট, লিখেছেন, “পুণ্যাত্মা ষ্টেফান আনাসের প্রভুর কশাবাতগ্রহণ, কটকমুকুট ধারণ আর ক্রুশে পেরেকবিদ্ধ হওয়ায় সমস্ত ক্রিয়াকলাপই প্রদর্শন করতেন...ক্রুশবিদ্ধ হওয়ার দৃশ্যে তাঁর হস্তদ্বিটি বিস্তৃত হলে দেখা যেত যে তাঁর বামহস্ত তাঁর সম্ভাবিক দৈর্ঘ্য হতে অধিকতর বিস্তৃত, আর এই হস্তটির সঙ্গে দেখা যেত যে জেনোয়ার সেন্ট কাথারাইনের যে হস্তটি অনুরূপ অবস্থায় পাঁচ ইঞ্চি পরিমাণ দৈর্ঘ্যে বিস্তৃতি লাভ করত বলে কথিত, তাঁর সঙ্গে সাদৃশ্য তাঁর আছে।” (ইংলিশ এবং ফ্রান্সী : ডবল্ডে, ডোরাস এণ্ড কোং কর্তৃক প্রকাশিত। এই পুস্তকটি আভিলার সেন্ট টেরেসা ও লিনিউর সেন্ট থেরেসার একটি সুন্দর জীবনআলেখ্য।)

যে সব পুণ্যাত্মা খৃষ্টীয়ান অনাহারে বহুবৎসর ধরে বেঁচেছিলেন বলে জানা গেছে—তাঁরা আবার ক্রুশক্ষতচিহ্নধারীও ছিলেন, তাঁদের মধ্যে হচ্ছেন, শীডামের সেন্ট লিডউইনা, রেণ্টের পুণ্যশীলা এলিজাবেথ, সিয়েনার সেন্ট কাথারাইন, ডোমিনিকা, লাজারি, ফেলিনোর পুণ্যময়ী এঞ্জেলা আর ঊনবিংশ শতাব্দীর লুইসি লেটো। ফ্লিউয়ের সেন্ট নিকোলাসও (ব্রডার রস—পঞ্চদশশতাব্দীর তপস্বী) তাঁর মিলনের জন্ত আকুল আহ্বান ষ্ট্যান্সের ডায়েটে সুইস কনফেডারেশনকে রক্ষা করেছিল) বিশ্ববৎসর অনাহারে বেঁচেছিলেন।

বিশেষভাবে যাত্রা হয়েছিল। ইউরোপভ্রমণ আমাদের শেষ হ'ল গ্রীসে এসে। এখানে আমরা এথিনিয়ান মন্দির আর যে কারাগারে সক্রটিস* বিবপান করেছিলেন সেই কারাগার দর্শন করলুম। গ্রীকেরা যে দেশের সর্বত্র তা'দের কল্পনা এ্যালাব্যাষ্টারে রূপায়িত ক'রে তুলেছে, তা' দেখে আশ্চর্য্যান্বিত হতে হয়।

তা'রপর রৌদ্রকিরণোজ্জ্বল ভূমধ্যসাগরে এসে জাহাজ ধরলুম, এসে নামলুম প্যাালেষ্টাইনে। দিনের পর দিন সেই পুণ্যভূমিতে বিচরণ ক'রে মনে বুঝলুম যে তীর্থভ্রমণের মূল্য কি! প্যাালেষ্টাইনে যীশুখৃষ্টের মহিমা সর্বত্র পরিব্যাপ্ত। মনে হ'ল আমি বেথেলহেম, গেথসিমেণ, ক্যালাভেরি, পবিত্র মাউন্ট অফ অলিভ্‌স্, জর্ডন নদী, গ্যালিলীর সমুদ্র, সবই তাঁ'র পাশে পাশে ভক্তিপ্লুতহৃদয়ে দেখতে দেখতে বেড়িয়ে চলেছি।

আমাদের ছোট্টদলটি নিয়ে তাঁ'র জন্মস্থান “অশ্বের তোজনপাত্র,” জোসেফের ছুতারের কারখানা, ল্যাজারাসের কবর, মার্থা ও মেরীদেবর বাড়ী, শেষভোজের হলঘরটি সব দেখে বেড়ালুম। প্রাচীনকালের অন্ধকারা হ'তে উদ্ঘাটিত দৃশ্যের পর দৃশ্যে দেখলুম যীশুখৃষ্ট যুগযুগান্তরের জন্তে যে সব স্বর্গীয় নাটক অভিনয় ক'রে গেছেন।

মিশরে প্রবেশ করলুম, দেখলুম এর আধুনিক সহর কাইরো আর তা'র প্রাচীন পিরামিড। তারপরে রেড্‌সী দিয়ে আমাদের জাহাজ আরব সমুদ্রে গিয়ে পড়ল, তা'রপরেই এল ভারতবর্ষ।

* ইউসেবিয়াসের এক স্থানে সক্রটিস্ এবং একটি হিন্দুমুনির একটি কৌতূহলোদ্দীপক তর্কযুদ্ধের বিষয় বর্ণিত আছে, “সঙ্গীতবিশারদ এরিস্টোজেনাস্ ভারতীয়দের সম্বন্ধে নিম্নলিখিত গল্পটি বলেন। এ'দের মধ্যে একজন এথেন্স নগরীতে সক্রটিসের সঙ্গে সাক্ষাৎ ক'রে তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন তাঁর দর্শনের বিষয় কি। সক্রটিস্ উত্তর দিলেন, ‘মানবজীবনের ব্যাপারে অনুসন্ধান।’ এই উত্তরে ভারতবাসীটি উচ্চৈঃশব্দে হাস্ত ক'রে বললেন, ‘মানবজীবনের ব্যাপারে অনুসন্ধান ক'রে মানুষ কি করবে যখন সে দৈবব্যাপারের বিষয়ে একেবারে অজ্ঞ।’

গ্রীক আদর্শ, যা' পাশ্চাত্যদর্শনে প্রতিবিম্বিত, তা' হচ্ছে ‘মানব, নিজেকে জান।’ একজন হিন্দু বলবে, ‘মানব, তোমার পরমাত্মাকে অবগত হও।’ ভারতবাসীর চক্ষে ডেকার্টের বিখ্যাত নীতিমূল ‘আমি চিন্তা করি, সুতরাং আমি আছি,’ বুদ্ধিসহ নয়। বিচারশক্তি মানবের চরম অস্তিত্বের উপর আলোকপাত করতে পারে না। মানবমন, বাইরের বিশ্বপ্রকৃতির মত—যা'র সঙ্গে এ পরিচিত—চিরপরিবর্তনশীল, তা' কোন চরম সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারে না। বুদ্ধিবৃত্তির চরিতার্থতাই চরম লক্ষ্য নয়। ঈশ্বরানুসন্ধিৎসু ব্যক্তিই হচ্ছেন নিত্যসত্যো(বিজ্ঞা)র প্রকৃত উপাসক : আর সকলই অবিজ্ঞা—আপেক্ষিক জ্ঞান।

৪০শ পরিচ্ছেদ

ভারতবর্ষে প্রত্যাবর্তন

ভারতবর্ষের তটভূমি! সাগরের নীলোন্মিমালা মস্তকে ফেনপুঞ্জের শুভ্রমুকুট ধারণ ক'রে লক্ষ লক্ষ বাহু মেলে কি আকুল উন্মাদনায় এর কোলে এসে আছড়ে পড়ছে। কিসের এ আকুলতা, কিসের এ উন্মাদনা? ডেকে দাঁড়িয়ে দেখলুম,—অনন্তবিস্তৃত মহাসমুদ্রের চলোন্মিপুঞ্জ নর্থনটননৃত্যে ভারতবর্ষের পুণ্যভূমির পাদবন্দনা করতে অগ্রসর! তা'দের উদ্যমগতি, তা'দের অসীম ব্যাকুলতায় আর অধীর আবেগে কি আমারই গৃহাভিমুখী মনের ছায়াপাত হয়েছে? ভারতবর্ষের তটভূমি আজ তা'র দিগন্তবিস্তৃত মহাবাহু প্রসারিত ক'রে আমার তা'র কোলে টেনে নেবার জন্তে ক্রমশঃই এগিয়ে আসছে। বহুদিনের প্রবাসী ত্বিতি উন্মুখমন কি এক অপূর্ব পুলকরসে অভিসিঞ্চিত হয়ে উঠল। আমার ভারতবর্ষ! আজ আমি ভারতবর্ষের দারদেশে দণ্ডায়মান। সক্রতজ্ঞভাবে ভারতের পুণ্যবায়ুতে নিঃশ্বাস টেনে নিলুম—বুক ভরে গেল।

১৯৩৫ সালের ২২শে আগষ্ট আমাদের 'রাজপুতানা' নামে বড় জাহাজখানা বোম্বাইসহরের প্রকাণ্ড ডকে এসে ভিড়ল। জাহাজ থেকে নেমে প্রথমদিনেই টের পেলুম যে সামনের একটি বছর আমার কিরকম অবিরাম কর্মশ্রোতের মধ্য দিয়ে কাটাতে হবে। বন্ধুরা সব ফুলেরমালা নিয়ে ডকে অভ্যর্থনার জন্তে এসেছেন। তাজমহল হোটেলে গিয়ে উঠলুম—শীগ'গিরই রিপোর্টার আর ফটোগ্রাফারদের ভিড় লেগে গেল।

বোম্বাই সহরটা আমার কাছে নতুনই লাগল; দেখলুম অতিআধুনিক পশ্চিমের অনেক নতুনউন্নতির আমদানি সেখানে হয়েছে। প্রশস্ত রাজপথের দু'ধারে পামগাছের সারি; বিরাট সৌধশ্রেণী প্রাচীন মন্দিরগুলির সঙ্গে প্রতিযোগিতায় উন্নতশিরে দণ্ডায়মান। যা'ই হোক, সহরদেখার সময় খুব

অল্পই পাওয়া গেল ; আমার শ্রদ্ধেয় গুরুদেব আর প্রিয়জনদের সঙ্গে সাক্ষাতের অধীরআগ্রহে মন তখন ব্যাকুল। ফোর্ডগাড়ীটাকে মালগাড়ীতে চালান ক'রে দিয়ে আমরা কলকাতার গাড়ীতে চেপে বসলুম।*

হাওড়া স্টেশনে পৌঁছে দেখি যে আমাদের অভ্যর্থনা করতে এসে এতবড় বিরাট জনতার সৃষ্টি হয়েছে যে খানিকক্ষণ আমরা ট্রেন থেকে নামতেই পারলুম না। অভ্যর্থনাসমিতির পক্ষ থেকে কাশিমবাজারের তরুণ মহারাজা আর আমার ভাই বিষ্ণু অগ্রসর হয়ে এল। অভ্যর্থনার বিরাট স্বাগত আর আন্তরিকতার জগ্লে আমরা মোটেই প্রস্তুত ছিলাম না।

আপাদমস্তক পুষ্পমাল্যে ভূষিত হয়ে, মিস্ ব্রেচ, মিষ্টার রাইট আর আমি ধীরে ধীরে বাড়ীর দিকে এগোতে লাগলুম। আমাদের গাড়ীর সামনে একটি শোভাযাত্রাও ছিল, তা'তে ছিল মোটরগাড়ী আর মোটর সাইকেলের সারি, ঢাক আর আর শঙ্খধ্বনির সঙ্গে আনন্দকোলাহল করতে করতে শোভাযাত্রাটি ঠিক আমাদের গাড়ীর পুরোভাগে থেকে ধীরে ধীরে অগ্রসর হচ্ছিল।

বৃদ্ধ পিতা আনন্দোদ্বেলিত হৃদয়ে আমায় আলিঙ্গন করলেন, বেন পুনর্জন্ম লাভ করে ফিরে এসেছি। আনন্দে আমরা উভয়েই নির্ঝাঁক—পরস্পরের দিকে অপলক দৃষ্টিতে শুধু চেয়েই রইলুম। ভাই, বোন, খুড়ো, খুড়ী, খুড়তুতো ভাইয়েরা, ছাত্র, বহুদিনের বন্ধুরা সকলেই এসে আমাদের ঘিরে দাঁড়াল, আমাদের ভিতর কারুরই চক্ষু তখন শুষ্ক ছিল না। স্মৃতির মণিকোঠায় লুকিয়ে থাকলেও পুনর্জন্মের সে সব স্নেহের দৃশ্য এখনও মনে প্রত্যক্ষভাবে পরিস্ফুট, তা' কি জীবনে কখনও ভুলতে পারি ? শ্রীবক্তেশ্বর গিরিজির সঙ্গে সাক্ষাতের বিষয় বর্ণনা করতে গেলে আমি ভাষা খুঁজে পাই না ; আমার সেক্রেটারীর লেখা নীচের এই বর্ণনাটি দিলেই যথেষ্ট হবে।

মিষ্টার রাইট তাঁ'র ভ্রমণের দিনলিপিতে লিখেছে, “কি অসীম আগ্রহ আর আশা নিয়ে আজ আমি যোগানন্দজীকে কলকাতা থেকে শ্রীরামপুরে গাড়ীতে নিয়ে গেলুম ! রাস্তার দুধারে বিচিত্রবর্ণের দোকানের সারি, তা'দের মধ্যে একটি ছিল যোগানন্দজীর কলেজজীবনের প্রিয় আহারস্থান—তা' পেরিয়ে গিয়ে ঢুকলুম একটি সরু গলিতে, তা'র দুধারে দেওয়াল। হঠাৎ বা

* মধ্যপ্রদেশে ওয়ার্দ্ধায় মহাত্মা গান্ধীকে দর্শনের জন্য আমরা মধ্যপথে বাস্ত্রভঙ্গ করি। সেখানকার কথা সব ৪৪শ পরিচ্ছেদে বর্ণিত হয়েছে।

দিকে ঘুরতেই দোতলা আশ্রমবাড়ীটি চোখে পড়ে গেল—বাড়ীটি অনাড়ম্বর হ'লেও খুব বড়। দেখে মনে প্রেরণা জাগে ; এর স্পেনীয় ধরণের বারান্দা উপরের দোতলা থেকে রাস্তার দিকে বেরিয়ে এসেছে। মনের মধ্যে একটা প্রগাঢ় শান্তিময় নির্জনতার ছাপ এসে পড়ল।

“গভীর ভক্তিনতহৃদয়ে আমি যোগানন্দজীর পিছন পিছন গিয়ে আশ্রমের উঠানেতে প্রবেশ করলুম। হৃদয় দ্রুত আলোড়িত হচ্ছে ; আমরা উভয়ে পুরাতন সিমেন্টের সিঁড়ি দিয়ে উপরে এসে উঠলুম,—এই সেই সিঁড়ি যে পথে বহু সত্যায়েশী বছরব্যবহৃত যাতায়াত করেছেন। উপরে উঠতে মনের চাঞ্চল্য ক্রমশঃই বাড়তে লাগল। আমাদের সামনে সিঁড়ির মাথায় নীরবে এসে দাঁড়ালেন মহাত্মা স্বামী শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজি—প্রশান্তবদন, সৌম্যমূর্তি, প্রাচীন ধ্বির দৃষ্ট মহিমায় ! তাঁর মহানু সান্নিধ্যে উপস্থিত হ'বার অপরিণী সৌভাগ্যলাভে আমার অন্তঃকরণ ভাবের প্রাবল্যে আলোড়িত হয়ে উঠল। আমার আগ্রহব্যাকুল দৃষ্টি চোখের জলে ঝাপসা হয়ে এল যখন আমি দেখলুম যে যোগানন্দজী নতজানু হয়ে অবনতমস্তকে গুরুর চরণকমল হস্তদ্বারা স্পর্শ ক'রে হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন ক'রে তাঁদের বন্দনা করলেন, তারপর তাঁতে মস্তক স্পর্শ করিয়ে হৃদয়ের ভক্তি নিবেদন করলেন। উঠে দাঁড়াতেই শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজি তাঁকে বক্ষের উভয় পাশে মেহতরে ধারণ ক'রে আলিঙ্গন করলেন।

“প্রথমে কোন কথাই শুরু হ'ল না, কিন্তু মনের গভীর ভাব অন্তরের নীরব বাণীতেই পরস্পরের কাছে প্রকাশিত হ'ল। তাঁদের আত্মার পুনর্মিলনের আনন্দের উষ্ণতায় তাঁদের উভয়েরই চক্ষু উজ্জ্বল হয়ে উঠল। সেই নীরব বারান্দার মধ্যে এক স্নিগ্ধকোমল মধুরভাবের ঝঙ্কার—স্বর্ষ্যও তখন হঠাৎ মেঘ থেকে বেরিয়ে পড়ে যেন জ্যোতির প্লাবনে ভাসিয়ে দিলে !

“নতজানু হয়ে তাঁর চরণবুগল স্পর্শ ক'রে আমি পরমগুরুদেবকে আমার অন্তরের ভক্তি ও ধন্যবাদ নীরবভাবে নিবেদন করলুম। তিনিও আমায় আশীর্বাদ করলেন। উঠে দাঁড়িয়ে দেখলুম, গভীর দুটি সুন্দর নীল চোখ অন্তর্দৃষ্টির জ্যোতিঃতে উদ্ভাসিত, আনন্দে উজ্জ্বল। তারপর তাঁর বৈঠকখানায় গিয়ে আমরা বসলুম ; এর সারা পশ্চিম ধারটাতেই বারান্দা, যেটা রাস্তা থেকে দেখা যায়। পরমগুরুদেব একটা পুরান সোফায় ঠেসান দিয়ে সিমেন্টের মেঝের

উপর একটা গদির উপর বসেছিলেন। যোগানন্দজী আর আমি পরম-
শুরুদেবের চরণপ্রান্তে গিয়ে উপবেশন করলুম। মাহুরের উপর আরামে
বসবার জন্তে গেরুয়ারঙের গোটাকতক গির্দাও ছিল।

“তুই স্বামীজিদের মধ্যে কথাবার্তা হ’তে লাগল বাংলায়, তা’ ভেদ করবার
জন্তে আমি প্রাণপণে চেষ্টা করতে লাগলুম কারণ দেখলুম যে এখানে এখন
ইংরেজি একেবারে অচল, যদিও স্বামীজিমহারাজ, ইংরেজিতে বেশ কথা-
বার্তা কইতে পারেন আর প্রায়ই তা’ কন। আমি কিন্তু সেই মহাপুরুষের
বিরাট মহিমা উপলব্ধি করলুম—তাঁ’র গন কেড়ে নেওয়া হাসিতে আর
আনন্দোজ্জল চোখদুটিতে। তাঁ’র গভীর অথচ প্রফুল্ল সদালাপে একটা
শুণ অতি সহজেই দেখা যেত যে তাঁ’র উক্তিগত একটা দৃঢ় নিশ্চয়তা থাকত—
জ্ঞানীব্যক্তির লক্ষণ, যিনি জানেন যে তিনি জানেন, কারণ ভগবানকে তিনি
জানতে পেরেছেন। তাঁ’র গভীরজ্ঞান, উদ্দেশ্যের স্থিরতা আর মতের দৃঢ়তা
সব রকমেই প্রকাশ পেত।

“সময়ে সময়ে তাঁ’কে সশ্রদ্ধভাবে বিশ্লেষণ ক’রে আমি দেখেছিলুম যে
তাঁ’র দীর্ঘবপু, বলিষ্ঠদেহ, সংসারের পরীক্ষা আর ত্যাগের মহিমায় উজ্জল।
আকৃতি উন্নত। ঈষৎনিম্ন কপাল তাঁ’র দেবতুল্য শরীরে সর্ব্বাঙ্গেই নজরে
পড়ে। নাসিকাটি ঈষৎ দীর্ঘ আর স্থূল—মাবে মাবে তা’ নিয়ে ছোট
ছেলেদের মত একটু নেড়েচেড়ে হাসিতামাসা করতেন। তীক্ষ্ণোজ্জল
কালো ঘনকৃষ্ণবর্ণ গভীর চক্ষুদুটিতে আকাশের স্তনীল দ্ব্যতি। মাথার
মাঝখানে চেরাসিঁথি সাদা থেকে স্বর্ণাভ হয়ে শেষে ধূসরে পরিণত হয়েছে।
শুষ্ক শুষ্ক কেশ তাঁ’র কাঁধের উপর এসে লুটিয়ে পড়েছে। শ্মশ্রুশুষ্ক ঘন বলা
চলে না—অন্ন বা পাতলাই, কিন্তু তা’তেই তাঁ’র মুখের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি পেয়েছে—
তাঁ’র প্রকৃতির মতই একাধারে গভীর আর হাল্কা।

“স্মৃতিতে, হাসির উচ্ছ্বাসে তাঁ’র সারাশরীর কাঁপে, তা’ সতিই
আনন্দোদ্বেলিত আর আনন্দিক! মুখ আর শরীরের গঠনে শক্তিমত্তার
পরিচয়—পেশীবহুল অঙ্গুলিগুলিও দৃঢ়। উন্নতদেহে সুদৃঢ় পদক্ষেপে আভি-
জাত্যের লক্ষণ প্রকাশিত।

“পরিধানে তাঁ’র সাধারণ ধৃতি আর কামিজ। দুটোই গেরুয়ারঙের
কিন্তু একটু ফিকে হয়ে গিয়ে কমলালেবুর রঙে দাঁড়িয়েছে।

“ঘরের চারিদিকে তাকিয়ে দেখে বুঝলুম যে এই ভগ্নপ্রায় হতশ্রী ঘরের মালিকের সাংসারিক স্মৃতির প্রতি কোনই আসক্তি নেই। সেই লম্বা ঘরটির সাদা দেওয়ালগুলি জলবায়ুতে বিবর্ণ হয়ে গিয়ে তা’তে মাঝে মাঝে ফিকে নীল প্লাষ্টারের দাগ হয়েছে। ঘরের একদিকে লাহিড়ী মহাশয়ের ছবিতে মালা দেওয়া রয়েছে—অনাডম্বর সরল ভক্তির পরিচয়। সেখানে যোগানন্দজীরও একখানি ছবি ছিল—ছবিতে তিনি বোষ্টন সহরে প্রথম এসে যখন ধর্ম-মহাসম্মেলনে যোগদান করেন তখন অগ্ন্যাত্ত প্রতিনিধিদের সঙ্গে দাঁড়িয়ে রয়েছেন।

“দেখলুম সেখানে আধুনিক আর প্রাচীন ভাবের এক অদ্ভুত সমাবেশ। একটা প্রকাণ্ড বেলোয়ারীকাঁচের বাতির ঝাড়, মাকড়সার জালে ঢাকা পড়ে গেছে—ব্যবহার নেই ব’লে আর দেওয়ালে একটু রঙচঙে নতুন দিনপঞ্জিকা। সারা ঘরটির ভিতর থেকে একটা নীরব স্নিগ্ধশাস্তির মধুর সৌরভ ছড়িয়ে পড়েছে। বারান্দার ওধারে দেখলুম যে বড় বড় নারকেল গাছ আশ্রমের উপর সগর্বে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে।

“পরমগুরুদেব কাউকে ডাকতে হলেই কেবল একটু মুহূর্ত হাততালি দিতেন আর তা’ শেষ হতে না হতেই, একজন না একজন বালকশিষ্য এসে হাজির হ’ত তাঁ’র আজ্ঞাপালন করতে—দেখতে বেশ মজার। তা’দের মধ্যে একজনের সঙ্গে আমার খুব ভাব হয়ে গিয়েছিল—নাম হচ্ছে প্রফুল্ল,* মাথায় কাঁধ অবধি লম্বা একরাশ চুল, একজোড়া উজ্জল তীক্ষ্ণ চোখ আর মুখে স্বর্গীয় হাসি লেগেই রয়েছে ; হাসলে চোখ দুটি মিট মিট করে, আর মুখের কোণদুটি একটু উপর দিকে ওঠে—যেন সান্ন্যাসগগনে এক ফালি চাঁদের ওপর তারা জলছে।

“তাঁ’র ‘সৃষ্টি’ তাঁ’র কাছে ফিরে এসেছে দেখে শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজির যানন্দ আজ উথলে উঠেছে (আর তাঁ’র ‘সৃষ্টির’ সৃষ্টি সম্বন্ধেও তাঁ’র কিঞ্চিৎ আগ্রহ রয়েছে তা’ও দেখা গেল)। সে যা’ই হোক, দেখলুম যে এই মহাপুরুষের প্রকৃতিতে জ্ঞানভাবের প্রাবল্য তাঁ’র ভাবের উচ্ছ্বাসের বহিঃপ্রকাশকে বাধা দেয়।

* প্রফুল্ল হচ্ছে সেই ছেলেটি যে শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজির নামনে একটা কেউটে সাপ বেকবাব নদয় সেখানে উপস্থিত ছিল। (১৪২ পৃ: দ্রষ্টব্য)।

“গুরুদর্শনে গেলে শিষ্যকে কিছু ভক্তিঅর্থ নিয়ে যেতে হয়। যোগানন্দজী তাঁকে কতকগুলি জিনিষ উপহার দিলেন। তাঁরপর আমরা খেতে বসলাম; রান্না সাদাসিধে হলেও খেতে বেশ চমৎকারই হয়েছিল। সব পদগুলিই নিরামিষ তরকারি আর ভাতের ছিল। শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজি আমাদের কতকগুলি ভারতীয় প্রথার ব্যবহার, যেমন কাঁটাচামচের বদলে হাত দিয়ে খেতে দেখে খুসিই হ’লেন।

“ষট্ঠাকতক ধ’রে মাঝে মাঝে বাংলায় নানারকম আলাপআলোচনা, স্নিগ্ধহাসি আর উৎকুল দৃষ্টিবিনিময়ের পর তাঁর চরণে প্রণাম ক’রে আমরা বিদায় গ্রহণ করলাম। এবার কলকাতায় ফেরা। এই পুণ্যদর্শন আর গুরুবন্দনার পবিত্রস্মৃতি আমার মনে চিরজাগরুক থাকবে। যদিও আমি তাঁর ব্যক্তিত্বের বহিঃপ্রকাশের অম্লার ধারণাসম্বন্ধে প্রধানতঃ লিপছি কিন্তু তাঁর সাধুজীবনের মূলভিত্তি যে আধ্যাত্মিক গৌরব, সে বিষয়ে আমি সর্বদাই সচেতন ছিলাম। তাঁর অপূর্ণ শক্তি আমি অনুভব ক’রে এসেছি, সেটাই আমি দেবতার আশীর্বাদের মত শিরে বহন ক’রে দেশে ফিরব।”

ইউরোপ, আমেরিকা, প্যালেষ্টাইন প্রভৃতি নানাদেশ থেকে আমি শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজির জন্মে নানা উপহার এনেছিলাম। সেগুলি তিনি সহায়-বদনে গ্রহণ করলেন, কিন্তু কোন রকম মন্তব্য প্রকাশ করলেন না। আমার নিজের জন্ম আমি জার্মানী থেকে একটা লাঠির ভিতরে ছাতা এনেছিলাম, ভারতে এসে সেটিকে গুরুজীকে উপহার দেবার মনস্থ করলাম।

পেয়ে বললেন, “এ জিনিষটি ভারি পছন্দসই বটে!” ব’লে আমার দিকে চেয়ে সমস্ত দৃষ্টিপাত করলেন; কোনটার জন্মে কখনও কোন কিছু বলেন নি কিন্তু এটার কথা এবারে বললেন। বস্তুগুলি জিনিস দিয়েছিলাম, তাঁর মধ্যে সেই লাঠিটি নিয়েই সকলকে দেখাতেন।

শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজির বাঘছাল একটা ছেঁড়া র্যাগের উপর পাতা দেখে বললাম, “গুরুদেব, বৈঠকখানা ঘরের জন্মে একটা নতুন কার্পেট আনবার আমার অনুমতি দিন।”

কোন প্রকার উৎসাহপ্রদর্শন না ক’রেই তিনি বললেন, “এনে খুসি হও ত’ আনগে। কেন, আমার বাঘছালটিত’ বেশ পরিষ্কার আর সুন্দর—আমার এ ক্ষুদ্ররাজ্যে আমি ত’ রাজা গো। বাইরে বিশালজগৎ পড়ে রয়েছে,

সেখানে শাইরের জিনিসের উপরেই লোকেদের টান থাকে বেশী, সে দিকেই তাঁদের বেশী নজর।”

তাঁর এই কথাগুলি বলবার সময় মনে হ'ল আবার আমি আগেকার দিনে ফিরে গেছি—আবার আমি যেন তাঁর সেই ক্ষুদ্র শিবাটি, দৈনিক শাসনের ফলে অগ্নিশুদ্ধ হচ্ছি।

শ্রীরামপুর আর কলকাতা হতে কোন রকমে নিজেকে ছিঁড়ে বাঁর ক'রে নিয়ে মিষ্টার রাইটকে সঙ্গে ক'রে রাঁচি যাত্রা করলুম। কি অভ্যর্থনা সেখানে—একটা মন্থম্পর্শী বিজয়োল্লাস! চোখদুটি আমার জলে ভরে এল যখন দেখলুম যে বাঁদের রেখে আমি আমেরিকা যাত্রা করেছিলুম, সেই সব শিক্ষকেরা আমার পনের বছরের অনুপস্থিতির মধ্যেও বিদ্যালয়ের পতাকা সর্গোরবে উড্ডীয়মান রেখেছেন; তাঁদের সব আলিঙ্গন করলুম। সেখানকার আবাসিক আর দৈনিক ছাত্রদের মুখের হাসি আর আনন্দোজ্জল মুখ দেখে মনে হল যে তাঁদের বহুবিভাগবিশিষ্ট বিদ্যালয় আর যোগশিক্ষাদানের উপযোগিতার তাঁরা সব এক একটি জলন্ত উদাহরণ।

তবুও ছায়, রাঁচিবিদ্যালয় তখন দারুণ অর্থকষ্টে পড়েছে। বৃদ্ধ মহারাজা, শ্রীরামচন্দ্র নন্দী এক্ষণে মৃত। তাঁর কাশিমাজার প্রাসাদ বিদ্যালয়-গৃহে পরিণত করা হয়েছিল—আর তিনি দানও করেছিলেন প্রচুর! কিন্তু আরু তিনি কোথায়! জনসাধারণের যথোপযুক্ত সাহায্যের অভাবে বিদ্যালয়ের অনেক বিনামূল্যে জনহিতকর সেবার অনুষ্ঠান এখন বিশেষ বিপদাপন্ন।

আমেরিকায় থাকতে অনিশ্চি তাঁদের কায চালাবার উপযোগী কার্য্যকরী অভিজ্ঞতা, আর বাধাবন্ধের সম্মুখে তাঁদের অদম্যসাহস সক্ষম শিক্ষা না ক'রে আমি বুথাই এতগুলি বছর সেখানে কাটিয়ে আসিনি। সম্ভ্রান্তানেক ধ'রে আমি রাঁচিতে রইলুম—নানাজটিল প্রশ্ন, নানা বাক্যাট-বামেলার সঙ্গে ধ্বস্তাধ্বস্তি ক'রে। তাঁরপরে কলকাতায় ফিরে এসে বড় বড় নেতা, আর শিক্ষাব্রতীদের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ চল্ল, কাশিমাজারের নতুন মহারাজার সঙ্গে দীর্ঘ আলাপআলোচনা, পিতার নিকট পুনরায় অর্থসাহায্যের আবেদন, তাঁরপরেই ভগবৎরূপায় বিদ্যালয়ের পতনোন্মুখ ভিত্তি আবার ক্ষুদ্র হয়ে উঠল। আমার আমেরিকান শিষ্যদের কাছ থেকে অনেক

দান—তা'র মধ্যে খুব বেশীটাকার একখানা চেকও ছিল, ঠিক সময়মত এসে পড়ে সব বাঁচিয়ে দিলে।

ভারতবর্ষে আসবার মাসকতকের মধ্যেই রাঁচিবিদ্যালয় আইনতঃ রেজিষ্ট্রি হয়ে গেল দেখে ভারি আনন্দিত হলুম। চিরস্থায়ী বৃত্তির বন্দোবস্তে যোগ-শিক্ষার কেন্দ্রস্থাপনার আমার জীবনব্যাপী স্বপ্ন আজ সার্থক হ'ল। এই স্বপ্নই ১৯১৭ সালের গোড়ার দিকে মাত্র সাতটি ছেলে নিয়ে বিদ্যালয় স্থাপনে আমায় উদ্বুদ্ধ করেছিল।

ছাত্রদের শুধু বিদ্যালয়ে শিক্ষাদান ছাড়া রাঁচিতে কার্যক্ষেত্রের পরিধি বহুগুণ বর্দ্ধিত হয়েছে আর বহু জনকল্যাণকর কার্যের ব্যাপক অনুষ্ঠানও এখন সেখানে হয়েছে।

রাঁচির যোগদা ব্রহ্মচর্য্য বিদ্যালয়ের উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে নিয়ন্ত্রণের আর উচ্চ-ইংরেজি বিদ্যালয়ের সকল বিষয়ই পড়ান হয়। সেখানকার আবাসিক আর দৈনিক ছাত্ররা কোন না কোন প্রকারের বৃত্তির শিক্ষালাভ করে। ছেলেরা তা'দের স্বপরিচালিত কমিটি দ্বারা তা'দের অধিকাংশ কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রিত করে। আমার শিক্ষাত্রী জীবনের গোড়ার দিকে আমি দেখে-ছিলুম যে, যেসব ছেলেরা দুইটুকি ক'রে শিক্ষকদের ফাঁকি দিয়ে মজা পায়, তা'রাই আবার তা'দের সহপাঠীদের তৈরী নিয়ম মেনে ঠিকমতই চলছে—আর ফাঁকিটাকি তখন আর সেখানে তা'দের চলে না। অবশ্য আমিও যে খুব একটা আদর্শ ছাত্র ছিলাম তা' নয়, তবুও ছাত্রদের ছেলেমানুষি, ফণ্টিনপিতে আর তা'দের নানা মুক্তিলের ব্যাপারে তা'রা আমার সহানুভূতিও পেত।

খেলাধুলার খুব উৎসাহ দেওয়া হয়, মাঠে হকি, ফুটবল প্রভৃতির চর্চা চলে। প্রতিযোগিতায় বিদ্যালয়ের ছেলেরা প্রায়ই জিতে আসে। মাঠের মধ্যে যে ব্যায়ামশালা আছে তা'র নাম দূরদূরান্তরে ছড়িয়ে পড়েছে। ইচ্ছাশক্তিবলে পেশীতে শক্তিসঞ্চালন হচ্ছে যোগদাপ্রণালীর একটা বৈশিষ্ট্য আর মানসিকশক্তিবলে যে শরীরের যে কোন অংশে প্রাণশক্তি সঞ্চালিত করতে পারা যায় এ সবই ছেলেরা জানে। ছেলেদের যোগাসন, তরবারি, লাঠিখেলা, যুগ্মসু প্রভৃতি সব শিক্ষা দেওয়া হয়। রাঁচি বিদ্যালয়ে যোগদা স্বাস্থ্যপ্রদর্শনী দেখতে হাজার হাজার লোক এসেছে।

প্রদেশস্থ আদিম অধিবাসী সাঁওতাল, কোল, মুণ্ডা প্রভৃতিদের হিন্দীতে

যোগিকথাযুত

প্রাথমিক বিষয়গুলি শিক্ষা দেওয়া হয়ে থাকে। বালিকাদের ক্লাসসকলও নিকটস্থ গ্রামগুলিতে ব্যবস্থা করা হয়েছে।

রাঁচি বিদ্যালয়ের অপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে ক্রিয়াযোগে দীক্ষা। বালকেরা প্রত্যহই অধ্যায়তত্ত্বের চর্চা, গীতাপাঠ ইত্যাদি করে আর সরলতা, স্বার্থত্যাগ, আত্মসম্মানজ্ঞান, সত্যাত্মশীলন প্রভৃতির বিষয় সব উদাহরণপ্রদান আর উপদেশপালনে তা'দের শিক্ষা দেওয়া হয়। বা'তে দুঃখকষ্ট আসে সেইটা মন্দ ব'লে তা'দের দেখিয়ে দেওয়া হয় আর বা' প্রকৃত সুখ এনে দেয় সেটাই সৎকায ব'লে তা'দের শিক্ষা দেওয়া হয়। খারাপ জিনিস, অসৎকার্য্য, বিষমেশান নধুর সঙ্গে তুলনা ক'রে তা'দের বুঝিয়ে দেওয়া হয় যে, সে সব লোভনীয় বটে কিন্তু শেষে তা'রা মৃত্যু ঘটায়।

গাচ মনঃসংযোগের প্রক্রিয়ায় দেহ ও মনের চাঞ্চল্যদমনে ছেলেদের মধ্যে খুব আশ্চর্য্যজনক ফল পাওয়া গেছে। ছোট্ট একটি ন'দশ বছরের ছেলে ভ্রমধ্যে তা'র দৃষ্টি স্থিরসংলগ্ন রেখে একঘণ্টা কি তা'রও বেশী একটানা যোগাসনে বসে আছে, এ দৃশ্য বিদ্যালয়ে দুর্লভ বা নতুন নয়।

সমুদ্রপৃষ্ঠ হতে রাঁচি ২০০০ ফিট উচ্চে; জলবায়ুও নাতিশীতোষ্ণ। প্রায় বিঘে পাঁচাত্তর বাগান, তা'র মধ্যে বড় একটা স্নানের পুকুরিণী। ভারতের মধ্যে একটা চমৎকার ফলের বাগান—আম, কাঁঠাল, পেয়ারা, লিচু, খেজুর প্রভৃতিতে প্রায় পাঁচশ' ফলের গাছ আছে। ছেলেরা তা'দের খাবার তরিতরকারী নিজেরাই তৈরী ক'রে আর সময়মত চরকা কাটে।

প্রতীচ্যের পর্য্যটকদিগের সুবিধার জন্ত অতিথিশালায় আতিথ্যসংকারের বন্দোবস্ত আছে। রাঁচি লাইব্রেরীতে বহু সাময়িকপত্রিকা আসে আর পূর্ব ও পশ্চিমের লোকেদের উপহার—প্রায় হাজারখানেক ইংরেজি ও বাংলা পুস্তকও আছে। পৃথিবীর নানাদর্শশাস্ত্রের সংগ্রহও এখানে আছে। একটি সুসজ্জিত যাদুঘরে, ভূতত্ত্ব, প্রত্নতত্ত্ব ও নৃতত্ত্বের নানা উপকরণ ও দ্রব্যাদি প্রদর্শিত আছে। নানা বৈচিত্র্যপূর্ণ এই বিশালজগতে আমার ভ্রমণের বহু-নিদর্শন ও সংগৃহীত দ্রব্যাদিও এখানে বহুল পরিমাণে রক্ষিত আছে।

বাগানে একটি শিবমন্দির—সেখানে যোগিরাজ লাহিড়ী মহাশয়ের মূর্তি প্রতিষ্ঠিত। বাগানের আয়তক্ষেত্রে দৈনিকপ্রার্থনা আর শাস্ত্রালোচনার রাস হয়।

শাখা উচ্চ বিদ্যালয়সমূহ, তা'তে বাসের ব্যবস্থা আর রাঁচির যোগ শিক্ষাদানের বৈশিষ্ট্য বজায় রেখে নানাস্থানে খোলা হয়েছে—আর সে সকল স্থানে উত্তরোত্তর উন্নতিও দ্রুত সাধিত হ'চ্ছে। ছেলেদের জন্তে বিহারের লক্ষণপুরে যোগদা সংস্কৃত বিদ্যাপীঠ আর মেদিনীপুরের এজমালিচকে যোগদা সংস্কৃত উচ্চ বিদ্যালয় আর আশ্রম প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

১৯৩৯ সালে দক্ষিণেশ্বরে ঠিক গঙ্গার উপর যোগদা মঠ নামে একটি প্রকাণ্ড মঠ প্রতিষ্ঠিত হয়। কলকাতার চারমাইল উত্তরে এই নূতন আশ্রমটি সহরবাসীদের পক্ষে একটি পরম রমণীয় শাস্তিগয় স্থান। এখানেও পশ্চিমের অতিথিদের থাকবার উপযুক্ত বন্দোবস্ত আছে, বিশেষতঃ তাঁদের জন্তে, যাঁ'রা আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্ত গভীর আন্তরিকতার সঙ্গে জীবন উৎসর্গ করেছেন। যোগদা মঠের কার্যকলাপের মধ্যে এস, আর, এফ্‌এর উপদেশ-গুলি ভারতের বিভিন্ন অংশে ছাত্রদের কাছে প্রতি পক্ষে পাঠান হয়।

সেখানকার লাহিড়ী মহাশয় মিশনের দাতব্য হাসপাতাল আর ডিস্পেন্সারী দূরগ্রামের বহু বহির্বিভাগের শাখা নিয়ে ইতিমধ্যে প্রায় ১,৫০,০০০ দরিদ্র ব্যক্তিদের চিকিৎসা ও ঔষধবিতরণে সেবা করেছে। সেবকেরা সব প্রাথমিক চিকিৎসায় শিক্ষিত আর তা'দের প্রদেশে বহু ও দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হ'লে সেই সঙ্কটকালে সেখানে তা'রা খুব প্রশংসনীয়ভাবেই কায করেছে। মিশনের হেডকোয়ার্টার হচ্ছে দক্ষিণেশ্বর।

বলা বাহুল্য যে এই সব শিক্ষাবিষয়ক আর জনহিতকর কার্যের জন্ত বহু শিক্ষক আর কর্মীদের নিঃস্বার্থ সেবা আর নিষ্ঠার প্রয়োজন হয়েছে। সংখ্যায় তা'রা বহু ব'লে এখানে তা'দের আর নামের উল্লেখ করলুম না কিংবা তা'দের প্রত্যেকের জন্তেই আমার অন্তরের মণিকোঠায় একটি ক'রে মেহের স্থান নির্দিষ্ট হয়ে আছে। লাহিড়ী মহাশয়ের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হ'য়ে এই সব শিক্ষকেরা, দীনভাবে সেবা আর বিরাট ত্যাগ ও মহৎ দানের জন্তেই তাঁদের সাংসারিক সকল উচ্চাকাঙ্ক্ষা পরিত্যাগ ক'রে এসেছেন।

মিষ্টার রাইটের রাঁচির ছেলেদের সঙ্গে খুব প্রগাঢ় বন্ধুত্ব হয়ে গিয়েছিল। সাদাসিধে একটা ধূতি পরে সে কিছুকাল তা'দের মধ্যে বাসও করেছিল। রাঁচি, কলিকাতা, শ্রীরামপুর, যেখানেই সে যাক না কেন, ডায়েরী বা'র ক'রে তা'র ভ্রমণের দিনলিপি সে রাখত আর সে সব বর্ণনা করতেও সে বেশ

মজবুত ছিল। একদিন সন্ধ্যার সময় আমি তা'কে একটি প্রশ্ন ক'রে বসলাম,—

“ডিক, তোমার ভারতবর্ষ সম্বন্ধে ধারণা কি?”

একটু চিন্তা ক'রে সে বসলে, “শান্তি, জাতির জীবন শান্তির ছটার উজ্জ্বল!”

* শান্তি ও অহিংসনীতির প্রতি একান্ত নিঃসঙ্গ ভারতবর্ষকে যুগ যুগ ধরে বাঁচিয়ে রেখে এসেছে আর বুদ্ধপ্রিয় প্রাচীন জাতিসমূহ আজ একেবারে বিলুপ্ত হয়ে গেছে। (এটাও লক্ষ্য করবার বিষয় যে হিন্দু আর চীনজাতির মত দুটি প্রাচীনজাতি, বা'দের দেশ খোঁটানের দ্বারা পরস্পর সংযুক্ত, তা'দের মধ্যে কখনও যুদ্ধবিগ্রহ উপস্থিত হয় নি। উপরন্তু দুইহাজার বৎসর পূর্বে ভগবান বুদ্ধের সঙ্কল্প অবলম্বনে মহাচীন ভারতবর্ষের নিকটে এমন একটা বন্ধু ও সংস্রুতির অচ্ছেদ্য বন্ধে ধনী, বা' চীনদেশবাসীরা সর্বদাই দমদমনে ও সন্তুষ্টিতে থাকার করে)।

এই ভারতভূমিতেই,—হায়! আর অল্প কোথাও নয়, যে একজন মহাত্মাগান্ধী জন্মগ্রহণ করতে পারেন আর যখন তিনি তাঁর অহিংসনীতির উপর প্রতিষ্ঠিত রাজনৈতিক কর্মপন্থার বিষয় প্রচার করেন তখন তাঁর অনুগামী কোটি কোটি লোক তাঁর মাহাত্ম্য উপলব্ধি করতে পারে। ভারতবর্ষ স্বাধীনতা প্রাপ্ত হ'লে (১৯৪৭) পৃথিবীর শত শত কৃতবিদ্য লেখক সব বিনা রক্তপাতে নসাবিত ভারতবর্ষের রাজনৈতিক জয়লাভের কথা উচ্চকণ্ঠে প্রশংসা ক'রে বলেছেন যে পৃথিবীর ইতিহাসে এরূপ ব্যাপার অভূতপূর্ব, একেবারে অতুলনীয়।

ইণ্ডিয়ার ভারত ও পাকিস্থানে খণ্ডিত হওয়ার মধ্যস্থদা ঘটনা আর দেশের কোন কোন স্থানে সাময়িক রক্তপ্লাবী দাঙ্গাহাঙ্গামা হচ্ছে অর্থনৈতিক কারণসম্মত, তা' মূলতঃ ধর্মোন্মত্ততা প্রসূত নয় (একটা গোণকারণ, বা প্রায়ই মুখ্যকারণ বলে প্রদর্শিত হয়)।

কোটি কোটি হিন্দু মুসলমান অতীতে এবং বর্তমানেও সম্ভাব্যের সঙ্গেই একত্রে বাস ক'রে এসেছে। এই উভয়মতাবলম্বী বহুসংখ্যক লোকেই “মতহীন” গুরু কবীরের (১৪৫০—১৫১৮ খৃঃ অঃ) শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিল : এবং আজ পর্যন্তও তাঁর মতাবলম্বী লক্ষ লক্ষ লোক আছে বা'রা কবীরপন্থী নামে অভিহিত। আকবরের রাজত্বের সময় (১৫৫৬—১৬০৫ খৃঃ অঃ) ভারতে সর্বত্র লোকদের নিজ নিজ ধর্মমতের অনুশীলনে প্রচুরতম স্বাধীনতা ছিল। আজও ভারতবর্ষের ৩৬ কোটি নবনারীর মধ্যে শতকরা ৯৫ জন—তা'দের মধ্যে অধিকাংশই হিন্দু ও মুসলমান, উভয়েই পরলোকগত মহাত্মাগান্ধীর মতাবলম্বী (৪৪শ পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)। প্রকৃত ভারত—গান্ধীজির ভারত, ভারতের কর্মক্ষেত্র সুবৃহৎ নগরনগরীতে খুঁজে পাওয়া বাবে না তা' বাবে “ছায়াস্তনিবিড় শান্তিরনোড়” ভারতের সাতলক্ষ গ্রামগুলির ভিতরে, যেখানে স্মরণাতীত কাল হ'তে স্বায়ত্তশাসনের সরল স্থায়ীতা প্রচলিত।

করাচির ভূতপূর্ব মেয়র লাজলি মেহরোত্র, যিনি ১৯৪৭ সালে ক্যালিফোর্নিয়ায় আমার আতিথ্য গ্রহণ করেছিলেন, তিনি বলেছিলেন যে বর্তমানে ব্রিটিশদের প্রতি ভারতবাসীর কোন বিদ্বেষভাব নাই আর দেশের বহুস্থানেই হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টিয়ান প্রভৃতি পরস্পরের প্রতি ভ্রাতৃত্ববোধ পোষণ করে। এই হচ্ছে ভারতবর্ষের আসল রূপ। আমেরিকা যেমন সকল জাতির মিলনক্ষেত্র, ভারতবর্ষকেও তেমনি সকল ধর্মের মিলনক্ষেত্র বলা যেতে পারে, যেখানে বহুবিচিত্রবর্ণের বিশ্বজদয় হ'তে “স্বজ্যোতিঃ” বিকীরণ হচ্ছে। বর্তমানে এই একমাত্র অর্থনৈতিক সঙ্কটের মূল সেই সব মহাপুরুষদের নেতৃত্বেই উৎপাটিত হ'বে, ভারতের বুকে বা'দের আবির্ভাব কখনও নিশ্চল হয় নি এবং ভবিষ্যতেও নিশ্চয় কখনও হ'বে না। দেশ হতে চিরশত্রু দারিদ্র্যবিভাটনের বিরূপ প্রচেষ্টা ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গেছে।

৪১শ পরিচ্ছেদ

দাক্ষিণাত্যের পল্লীভ্রমণ

“তুমিই হচ্ছে প্রথম সাহেব, ডিক্, যে এ পর্য্যন্ত এই তীর্থস্থানে ঢুকতে পেরেছে। আর সকলে বুথাই চেষ্টা করে মরেছে!”

কথাগুলো শুনে মিষ্টার রাইট চমকে উঠল তারপর একটু খুসিও হ'ল। দক্ষিণ ভারতের মহীশূররাজ্যে পাহাড়ের উপর পরমরমণীয় চামুণ্ডীদেবীর মন্দির থেকে তখন আমরা বেরিয়ে আসছি। মহারাজার কুলদেবতা চামুণ্ডীদেবীর মন্দির দর্শন করতে গিয়েছিলুম। স্বর্ণ ও রৌপ্যখচিত সিংহাসনের উপর দেবী আসীন, আমরা সকলে প্রণাম করলুম।

কতকগুলি প্রসাদীনির্ম্মালা সযত্নে তুলে রেখে রাইটসাহেব বললে, “আমার এই অভূতপূর্ব সন্মানলাভের স্মৃতিচিহ্নস্বরূপ পুরোহিতের গোলাপজল দেওয়া এই গোলাপপাপড়ি ক’টি আমি চিরকাল সযত্নে রেখে দেব।”

১৯৩৫ সালের নভেম্বর মাসটা আমাদের মহীশূরষ্টেটের অতিথি হয়েই কাটল। মহারাজা হিজ্ হাইনেস্ শ্রীকৃষ্ণরাজ ওয়াদিয়ার একজন আদর্শ নৃপতি, প্রজাপুঞ্জের প্রতি তাঁ’র গভীর বাৎসল্য। নিষ্ঠাবান্ হিন্দু হয়েও তিনি উপযুক্তবোধে মিরজা ইসমাইল নামে একজন মুসলমানকেই তাঁ’র দেওয়ানপদে অভিষিক্ত করেছেন। মহীশূরে সন্তরলক্ষ লোকের বাস। এসেম্বরী ও ব্যবস্থাপরিষদে জনসাধারণের প্রতিনিধি প্রেরিত হয়।

মহারাজার উত্তরাধিকারী, হিজ্ হাইনেস্, যুবরাজ শ্রার শ্রীকৃষ্ণ নরসিংহ-রাজ ওয়াদিয়ার তাঁ’র রাজ্যে শিক্ষা ও উন্নতিবিস্তার পরিদর্শনের জন্ত আমাদের আমন্ত্রণ করলেন। গত পক্ষকালমধ্যে আমাকে টাউন হল, মহারাজার কলেজ, ইউনিভার্সিটি মেডিক্যাল স্কুল প্রভৃতিতে হাজার হাজার সহরবাসী আর ছাত্রদের সম্মুখে বক্তৃতা দিতে হয়। ব্যাঙ্গালোরে গ্রাশঙ্কাল হাইস্কুল, ইন্টারমিডিয়েট কলেজ আর চেষ্টা টাউন হলে তিনটে বিরাট মিটিংএ

বক্তৃতা দিতে হয়েছিল। তিনহাজারের উপর লোক যোগদান করেছিল। আমেরিকার যে উজ্জ্বল চিত্র তাঁদের সম্মুখে আমি উপস্থাপিত করেছিলুম, তাতে আগ্রহশীল শ্রোতৃবর্গের কোন প্রশংসা ছিল কিনা জানিনা; কিন্তু যখনই উল্লেখ করেছি যে পূর্ব পশ্চিমের বা' কিছু সং, বা' কিছু শ্রেয় ও প্রেয় তা'র পরস্পরের আদানপ্রদানে উভয়েই উপরুত হবে, তখনই আনন্দধ্বনি হয়ে উঠত প্রবলতম।

রাইটসাহেব আর আমাতে মিলে সেখানে শান্তি আর আরামে দিন কাটাচ্ছি।* রাইটসাহেবের ভ্রমণের দিনলিপি থেকে তা'র মহীশূর সম্বন্ধে যা' ধারণা, তা' এখানে উদ্ধৃত হ'ল;—

“পাহাড়ের তলায় গাঢ় সবুজরঙের ধানক্ষেত, মাঝে মাঝে এক এক গোছা আকের ক্ষেতের ফালি। চতুর্দিকে বিস্তৃত সবুজ মরকতের মত প্রাকৃতিক দৃশ্যের মধ্যে ছোট ছোট পাহাড় ইতস্ততঃ ছড়ান—উঁচু পাহাড়ের পিছনে সূর্য্য হঠাৎ অন্ত গলে সে দৃশ্যে রঙের খেলা তখন বাড়ে।

“আকাশের চিত্রপটে নিয়ত পরিবর্তনশীল দৃশ্যে ভগবান তুলি দিয়ে যে রঙের খেলা খেলেন তা'র বৈচিত্র্য, তা'র মাধুর্য্য, তা'র গরিমা, সে কি ভাষায় বর্ণনা করা যায়, না তা' করা সম্ভব?

“কতক্ষণ ধ'রে যে আনমনে বসে বসে সেই সব দৃশ্য দেখতুম তা'র ঠিকানা নেই। যে বাত্বকর আকাশে বসে রঙের খেলা দেখাচ্ছেন, তাঁ'র রঙ কি কোন মানুষে ফলাতে পারে? মানুষের হচ্ছে তেলের রং আর তাঁ'র হচ্ছে আলোর রং; মেঘের কোণে একটু আলোর ছোপ লাগিয়ে দিলেন—দাঁড়িয়ে গেল সেটা সিঁতুরের মত, আবার একটু তুলি বুলিয়ে দিলেন—বদলে গেল সেটা কমলা লেবু থেকে সোনালি। ঘনমসীকৃষ্ণবর্ণ মেঘের বুকে অন্তগামী সূর্য্যের শেষ রশ্মিরেখা বুক ফুঁড়ে বেরিয়ে এসেছে—যেন মেঘের বুক থেকে এক বলক রক্ত তীব্রবেগে বেরিয়ে আসছে। সকালসন্ধ্যায় তাঁ'র এই খেলা চলছে—চিরনূতন, চিরপরিবর্তনশীল; কোন পরিকল্পনা, কোন প্রতিলিপি, মানুষের হাতের তৈরী কোন রঙই তা'র অনুকরণ করতে পারে না। ভারতের আকাশে দিন যখন রাত্রির কোলে চলে পড়ে, সেরকম অপক্লপ দৃশ্য অগ্নি আর

* মিস ব্লেচ, মিল্টার রাইট আর আমার সঙ্গে দ্রুত পরিভ্রমণের তাল রাখতে না পেরে কলকাতায় আমার আত্মীয়বর্গের সঙ্গেই সানন্দে রয়ে গেল।

কোথাও দেখতে পাওয়া যায় না। আকাশকে দেখায় যেন ভগবানের হাতে রঙের পাত্র—তা'তে স্বর্গের বিচিত্রবর্ণের হোলিখেলা চলছে।

“এবার আমি বৃক্ষরাজসাগর বাঁধের* কথা বলব। বাঁধটি প্রকাণ্ড—গোধূলিতে তা'র দৃশ্য নয়নাভিরাম। যোগানন্দজী আর আমি একটি ছোট ছেলেকে “সরকারী গাইড” হিসেবে সঙ্গে নিয়ে একটা ছোট বাসে চড়ে বাঁধ দেখতে বেরোলুম। মহীশূর থেকে বার মাইল দূরে বাঁধটি অবস্থিত। মাটির রাস্তা, বেশ সমতল—অন্তগমনোন্মুখ হুঁয় তখন তা'র গাঢ় রক্তিমরাগরঞ্জিত শেব কিরণলেখা নিয়ে পশ্চিম দিকচক্রবালরেখার দিকে চলে পড়েছে।

“আমাদের বাত্মা জ্বর হ'ল চারিদিকের চৌকো ধানক্ষেতের পাশ দিয়ে পত্রবহুল ছায়াশীতল বটগাছের সারির ভিতর দিয়ে। দুইপাশে উন্নতশীর্ষ নারিকেলকুঞ্জ; ঘনজঙ্গলের মত বৃক্ষলতার প্রাচুর্যে সবুজের সমারোহ—তারপরে একটি পাহাড়ের মাথায় উঠেই একেবারে এসে পড়লুম সেই বিরাট কৃত্রিম হ্রদের মুখোমুখি—নক্ষত্র ও তাল আর অগ্ন্যস্ত্র গাছের ছায়া জলে পড়েছে। চারধারে ধাপে ধাপে বাগান উঠে গিয়ে হ্রদটি ঘিরে রেখেছে—বাঁধের ধারে ধারে বিজলীবাতি, নীচে বাঁধের উচ্ছৃসিত জলস্রোতে আলো পড়ে ইন্দ্রধনুর বর্ণবৈচিত্র্যের সৃষ্টি করেছে। তলায় দেখলুম ফোয়ারার উপর রঙিন আলোর খেলা—লাল, হলদে, সবুজ, নীল রঙের আলোর বারুণা,—যেন আকাশের কোল থেকে বারে পড়েছে। হাতীরা শুঁড় দিয়ে জল উদগীরণ করছে—চিকাগো ওয়ার্ল্ড মেলার একটি ক্ষুদ্র দৃশ্য; আর সেই ধানক্ষেতের প্রাচীন দেশ আর সরল লোকেদের নিয়েও সেখানে আধুনিক উন্নতির এতদূর সমাবেশ যে আমার ভয় হয় যে যোগানন্দজীকে আবার আমেরিকায় যে ফিরিয়ে নিয়ে যাব, তা' বোধ হয় আমার শক্তি বা ক্ষমতায় আর কুলোবে না।

* এই বাঁধটি হচ্ছে একটি প্রকাণ্ড জল হ'তে বিদ্যুৎ উৎপাদনের কারখানা, আর এ থেকে সারা মহীশূর সহর আর রেশম, সাবান এবং চন্দন তৈলের কারখানা প্রভৃতিতে বৈদ্যুতিক শক্তি সরবরাহ হয়। মহীশূরের চন্দনকাষ্ঠের স্মারকদ্রব্যগুলি হতে একটি মনোরম সৌরভ বিহীর্ণ হয় যা কালে কখনও নষ্ট হয় না। একটু ছুঁচ ফুটোলেই আবার তা' থেকে সুগন্ধ নির্গত হ'তে থাকে। মহীশূর রাজ্যে ভারতবর্ষের কতকগুলি সবুহ প্রমশিল্পের আদি প্রতিষ্ঠান আছে, তা'র মধ্যে রয়েছে কোনার স্বর্ণখনি, মহীশূরের চিনির কারখানা, ভদ্রাবতীর বিরাট লৌহ ও ষ্টিলের কারখানা আর একটি এরোপ্লেন ফ্যাক্টরী; রাজ্যের ৩০,০০০ বর্গমাইলের মধ্যে অধিকাংশ স্থানই মূলতঃ ও সুপরিচালিত মহীশূরস্টেট রেলওয়ে দ্বারা সংযুক্ত।

“আর একটা অতি দুর্লভ স্বেদন পাওয়া গেল—সেটা হাতীতে চড়া। গতকাল দুবরাজ তাঁ’র একটি হাতীতে চড়বার জন্তে আমাদের নিমন্ত্রণ করেছিলেন; হাতীটা ছিল অতি প্রকাণ্ড! হাওদার চড়বার জন্তে সিঁড়ি দিয়ে উঠলুম। হাওদাটি বাক্সের মত, সিল্কের গদি দেওয়া। তা’রপর হেলুতে দুলুতে, সামনে পিছনে টান খেতে খেতে চললুম—একবার যেন নীচে নেমে তলিয়ে যাচ্ছি আর একবার যেন ঠেলে উপরে উঠছি—সে এক অপূর্ণ অভিজ্ঞতা, জীবনে কখনও ত’ হাতীতে চড়িনি! সে কি রোগাধরকর তত্ত্বভূতি আর অপূর্ণ উল্লাস! মনে খুব ক্ষুধার সঙ্গে সঙ্গে আবার একটু একটু ভয়ও করছে। পৈতৃক প্রাণটা না হারাই সেই ভয়ে প্রাণের দায়ে হাওদাটা আঁকড়ে ধরে বসে রইলুম।”

দাক্ষিণাত্যে বহু ঐতিহাসিক আর পুরাতত্ত্বের মালমশলা, প্রাচীন ভগ্নাবশেষ প্রমত্তি সব চারিদিকে ছড়িয়ে আছে। তা’দের বর্ণনা করা যায় না। মহীশূরের উত্তরে ভারতবর্ষের সর্বাপেক্ষা বৃহৎ ষ্টেট হচ্ছে হায়দরাবাদ। বিরাট গোদাবরী নদীর দ্বারা বেষ্টিত অসিতাকাভূমি—চারিদিকে প্রশস্ত উর্বর সমতল ভূমি। সুন্দর নীলগিরি পর্বত আর অগ্ন্যাগ্ন বহুস্থানে চূণাপাথর বা গ্র্যানাইটের অল্পবর্ষের পাহাড়।

হর্ম্যাশিল্প, ভাস্কর্য্য আর চিত্রশিল্পে সারা ভারতবর্ষের মধ্যে তা’র অপূর্ণ নিদর্শনের একত্র সমাবেশে একমাত্র প্রাচীন পর্বতগোদিত ইলোরা আর অজন্তা গুহাতেই দেখতে পাওয়া যায়। ইলোরার কৈলাসগুহা একখণ্ড প্রকাণ্ড প্রস্তরে গোদিত মন্দির—তা’তে নানা দেবদেবী, নরনারী, পশুপক্ষীর মূর্তি, মিকায়েলএঞ্জেলের অপূর্ণ সুসমঞ্জস স্ফটিক গঠনের অদ্বিত কীর্তির প্রকাশ। অজন্তায় পাঁচটি অলিন্দশোভিত মন্দির আর পঁচিশটি মঠ আছে। সবই পাথরে খোদা ফ্রেস্কোর কার্যকর থামের ওপর দাঁড়িয়ে, শিল্পী শিল্পচাতুর্য্য আর ভাস্কর্য্যের প্রতিভা সেখানে অমর হয়ে রয়েছে।

আর হায়দরাবাদে আছে ওসমানিয়া ইউনিভার্সিটি এবং মক্কামসজিদের বিরাট হর্ম্যাবলী; মসজিদে দশহাজার মুসলমান একত্র বসে উপাসনায় যোগদান করতে পারে।

মহীশূরেষ্টেটও দৃশ্যবৈচিত্র্যে অপূর্ণ; সমুদ্রপৃষ্ঠ হ’তে তিন হাজার ফিট উঁচু, চারিদিকে গভীর জঙ্গল—বগহস্তী, বাইসন, ভল্লুক, প্যাংগার, ব্যাঘ্র

প্রভৃতির আবাসভূমি। এর দুটি প্রধান সহর মহীশূর আর ব্যাঙ্গালোর বেশ পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন; বহু সুন্দর সুন্দর পার্ক আর ভ্রমণের উদ্যানে স্থানগুলি বড়ই মনোরম আর চিত্তাকর্ষক।

একাদশ শতাব্দী হ'তে পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যে হিন্দুরাজগণের পৃষ্ঠপোষকতায় হিন্দু হস্তাশিল্প ও ভাস্কর্যের চরম উন্নতি সাধিত হয়। একাদশ শতাব্দীর ভাস্কর্যশিল্পের চূড়ান্ত নিদর্শন বেলুড়ের মন্দির—রাজা বিষ্ণুবর্দ্ধনের সময় নির্মিত হয়। সুস্ফুটকার্কে আর অপরূপ পরিকল্পনার প্রাচুর্যে জগতে অদ্বিতীয়।

উত্তর মহীশূরে যে সব শিলালিপি পাওয়া গিয়েছে তা' খৃষ্টপূর্ব তৃতীয় শতকের। সেগুলি সম্রাট অশোকের স্মৃতিরক্ষার উজ্জ্বল নিদর্শন।

একটি শিলালিপিতে লিখিত আছে :—“এই ধর্ম্মানুশাসনলিপি খোদিত হ'ল এইজন্তে যে আমাদের পুত্রপৌত্রেরা নূতন কোন দেশ জয় করবার প্রয়োজন বোধ করবে না, যে তরবারির সাহায্যে দেশ জয় করাকে তা'রা জয় বলে বিবেচনা করবে না, যে তা'রা এতে ধ্বংস আর অত্যাচার ছাড়া আর কিছুই দেখতে পাবে না, যে তা'রা ধর্ম্মের জয় ছাড়া আর কিছুতেই সত্যকার জয় ব'লে উপলব্ধি করতে পারবে না। ইহজগতে আর পরজগতে এই রকম জয়েরই মূল্য আছে!”

অশোক ছিলেন দুর্দর্শ মোর্যসম্রাট চন্দ্রগুপ্তের নাতি। (গ্রীকদের নিকট চন্দ্রগুপ্ত স্রাণ্ডোকেটাস্ ব'লে পরিচিত ছিলেন)। যৌবনে আলেকজান্ডার

* ত্রয়োদশ শিলালিপি। সম্রাট অশোক ভারতের নানাস্থানে ৮৪,০০০ স্তূপ নির্মাণ করেন। তিনি চতুর্দশটি শিলালিপি ও দশটি শিলাস্তম্ভও প্রতিষ্ঠা করেন। প্রত্যেকটিই পূর্তকাব্য, স্থাপত্যশিল্প এবং ভাস্কর্যের চরম নিদর্শন। বিভিন্ন ভাষায় উৎকীর্ণ অশোকের শিলা অনুশাসনে তৎকালীন বহুবিধৃত শিক্ষাপ্রচারের পরিচয় পাওয়া যায়। ষষ্ঠ শিলালিপিতে সর্বজনপ্রিয় সম্রাট অশোক তাঁর প্রজাবর্গকে সরকারী কার্যের জন্ত “দিনরাত্রির মধ্যে যে কোন সময়ে” তাঁর সঙ্গে পরামর্শের জন্ত আহ্বান করছেন; তা'তে আরও লেখা আছে যে তাঁর রাজকর্তব্যসকল বিশ্বস্তভাবে পালন করে তিনি এইরূপে “তাঁর স্বদেশবাসীদের কাছে তাঁর ধর্ম্ম হতে নিজের মুক্তিলাভ করছেন।”

ভারতের একপ্রান্ত হ'তে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত সম্রাট অশোক, জলাশয়, বাঁধ, জলপ্রপাতের স্রোতস্রাব, রাজপথ এবং পথিকদের জন্ত মধ্যে মধ্যে বিশ্রামগৃহসম্বলিত ছায়াতরুসমাক্ষরিত বহু পথ, ভৈষ্ণব সংগ্রহের জন্ত ভৈষ্ণব উদ্যান আর মানব ও পশুদিগের নিমিত্ত বহু আরোগ্যশালা নির্মাণ করিয়েছিলেন। দশম শিলালিপিতে তিনি ঘোষণা করছেন যে প্রজাসমূহের নৈতিক উন্নতিলাভের সাহায্যের উপরেই রাজার প্রকৃত গৌরব নির্ভর করে। একাদশ শিলালিপিতে তিনি বর্ণনা করছেন, “সত্যকারে দান” হ'বে কোন বস্তু নয়, তা' হ'বে “শিবম্” অর্থাৎ মঙ্গল—সত্যের প্রচার।

দি গ্রোটের সঙ্গে এঁর সাক্ষাৎ হয়। পরে চক্রগুপ্ত ভারতে পরিত্যক্ত ম্যাসিডোনিয়ান সৈন্যদলকে বিধ্বস্ত করেন এবং পাঞ্জাবে সেলিউকসের আক্রমণকারী গ্রীকসৈন্যদের পরাজিত করেন। তারপরে হেলেনিক দূত মেগাস্থিনিসকে পাটলিপুত্রের রাজসভায় সম্বন্ধিত করেন। এই মেগাস্থিনিসই সমৃদ্ধিশালী ও উন্নতিশীল ভারতবর্ষের চিত্র স্তম্ভিপুণ্যভাবে অঙ্কিত ক'রে গেছেন।

ভারতবর্ষ আক্রমণ অভিযানে আলেকজান্ডারের সঙ্গে বা তাঁ'র অনুসরণে যে সব গ্রীক ঐতিহাসিক এবং অগ্রান্ত ব্যক্তির। এসেছিলেন, তাঁ'র। অতিশয় কৌতূহলোদ্দীপক ঘটনাবলী পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে লিপিবদ্ধ ক'রে গেছেন। আরিয়ান, ডায়োডোরস্, প্লুটার্ক আর ভূগোলজ্ঞ ষ্ট্রাবোর বিবরণ ডাঃ জে, ডব্লিউ ম্যাকক্রিগল্ সাহেব অনুবাদ করেছেন প্রাচীন ভারতের ইতিহাসে আলোকপাত করবার জন্তে। আলেকজান্ডারের বিফল আক্রমণের সর্বাপেক্ষা প্রশংসাযোগ্য ব্যাপার হ'চ্ছে তাঁ'র হিন্দু দর্শনশাস্ত্র, যোগী ও সাধুসন্ন্যাসীদের প্রতি গভীর আগ্রহপ্রদর্শন—যা'দের সঙ্গে মধ্যে মধ্যে তিনি সাক্ষাৎ করতেন আর যা'দের সঙ্গে তিনি সাগ্রহে কামনা করতেন। উত্তর ভারতে তক্ষশীলায় আক্রমণের অব্যবহিত পরেই তিনি অনিসিক্রিটস্ নামে ডায়োজিনিসের হেলেনিক মতাবলম্বী এক শিষ্যকে দূতস্বরূপে পাঠান তক্ষশীলার সন্ন্যাসীবর ভারতের জ্ঞানগুরু দণ্ডামিস্কে আনবার জন্তে।

অনিসিক্রিটস্ তাঁ'র আরণ্যআশ্রমে দণ্ডামিস্কে খুঁজে বা'র ক'রে বল্লেন, “স্বাগত হে ব্রাহ্মণগুরু! সর্বশক্তিমান ঈশ্বর জিউসের (দ্যোঃ?) পুত্র হচ্ছেন আলেকজান্ডার—যিনি পৃথিবীর সকলদেশের একচ্ছত্র অধিপতি, তিনি আপনাকে তাঁ'র কাছে যেতে আদেশ করছেন। আপনি যদি তা' পালন করেন তবে তিনি আপনাকে বহু মহার্ঘ্য উপঢৌকনে পুরস্কৃত করবেন, কিন্তু অস্বীকার করলে তিনি আপনার শিরশ্ছেদন করবেন।”

যোগিবর এই প্রকার বাধ্যতামূলক নিমন্ত্রণ শাস্ত্যভাবেই শ্রবণ করলেন, তাঁ'রপর “এমন কি পরিশ্রম। থেকে মাথাও তুল্লেন না।”

প্রত্যুত্তরে তিনি বল্লেন, “আলেকজান্ডার যদি তা'ই হন, তা'হ'লে

* প্রাচীন ভারত, ছয় খণ্ডে সম্পূর্ণ (চক্রবর্তী, চ্যাটার্জী এণ্ড কোং, ১৫নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা; ১৮৭৯, পুনঃ প্রকাশিত ১৯২৭)।

আমিও জিউসের পুত্র। আলেকজান্ডারের যা' কিছু আছে তা'র কিছুই আমি চাই না। কারণ আমার যা' আছে তা'তেই আমি সন্তুষ্ট; আর আমি দেখছি যে তিনি লোকজন নিয়ে জলস্থলে সর্বত্র ঘুরে বেড়াচ্ছেন— তা'তে তাঁ'র কোনই লাভ হচ্ছে না আর তাঁ'র ঘোরারও কখনও শেন হচ্ছে না।*

“যাও, আলেকজান্ডারকে ব'ল গিয়ে যে রাজারাজা পরমপিতা পরমেশ্বর কখনও স্পর্ধাজনিত অসংকার্যের মালিক ন'ন পরন্তু তিনি সংসারে আলোক, শাস্তি, জীবন, জল, মনুষ্যদেহ ও আত্মার স্রষ্টা; মৃত্যু যখন মানবগণকে মুক্তি দেয় তখন তিনি তা'দের সকলকেই গ্রহণ করেন, কোনরূপেই তা'দের আর কালব্যাপির অধীন হ'তে হয় না। একমাত্র তিনিই আমার প্রণম্য ঈশ্বর, হত্যাকাণ্ড বাঁ'র কাছে ঘৃণিত, হৃদে যিনি কখনও প্ররোচনা দেন না।”

তা'রপর সেই মহাপ্রাণ ঋষিবর নীরব উপেক্ষার সঙ্গে বলতে লাগলেন, “আলেকজান্ডার ত' ঈশ্বর ন'ন—কারণ তাঁ'কে ত' মৃত্যুর কবলে নিশ্চয়ই পড়তে হ'বে। তিনি যখন অমৃতরাজ্যের সিংহাসনে এখনও প্রতিষ্ঠিত হ'ন নি, তখন তাঁ'র মত ব্যক্তি কি ক'রে জগতের প্রভু হ'তে পারেন? তিনি ত' এখনও সশরীরে পরলোকেও প্রবেশ করেন নি, আর পৃথিবীর মধ্যস্থল দিয়ে সূর্য্যের যে গতিপথ তাও তাঁ'র জানা নেই আর তা'র সীমানার চারিদিকে যেসব জাতি আছে তা'রা ত' বলতে গেলে তাঁ'র নামই জানে না।”

“সসাগরা ধরণীর অধিপতি”র কর্ণে বোধ হয় একরূপ কটু তিরস্কারবাক্য আর কখনও প্রবেশ করেনি! যাইহোক তা' শেষ ক'রে বিদ্রূপের সুরে ঋষিবর বললেন, “আলেকজান্ডারের বর্তমান রাজত্বসকল যদি তাঁ'র মন ভরবার মতন প্রশস্ত না হয়, তা' হ'লে তাঁ'কে গঙ্গাপার হ'তে ব'ল গিয়ে; সেখানে তাঁ'র এমন স্থান মিলবে যে তাঁ'র সব লোক সেখানে ধ'রে যাবে।*

“যাইহোক, এটা ঠিক জেনে রেখো যে আলেকজান্ডার যা' প্রস্তাব করছেন বা যে উপহার দিতে চাইছেন তা' আমার কাছে একেবারেই নিরর্থক; যে

* আলেকজান্ডার অথবা তাঁ'র কোন সৈন্যধাক্কই কখনও গঙ্গানদী অতিক্রম করেননি। উত্তর-পশ্চিমে দৃঢ় বাধা প্রদর্শন দেখে ম্যাসিডোনিয়ান সৈন্যগণ আরও অধিক অগ্রসর হ'তে বিদ্রোহ উপস্থিত করলে; আলেকজান্ডার ভারতবর্ষ পরিত্যাগ করতে বাধ্য হ'লেন। তিনি পারশ্বজয়ের আরও নানা প্রচেষ্টা করেছিলেন।

সব জিনিস আমি সত্যিই চাই আর যা' সব আমার পক্ষে বাস্তবিকই গ্রহণযোগ্য তা' হচ্ছে এই পর্ণশয্যা—এই আমার বাড়ী, এই সব ফলসুগাছ যা' আমার দৈনিক আহার যোগায় আর জল, যা' আমার একমাত্র পানীয় ; এ ছাড়া আর সমস্ত জিনিস যা' সব অতি কষ্টে আর যত্নে সংগৃহীত করতে হয়,—তা' যা'রা করে, তা'দের পক্ষে তা' ধ্বংসেরই কারণ হয়—এ মরজগতের সকলেই যা'র অধীন আর যা' এসব দুঃখ আর অশান্তিই ডেকে আনে। আমার জন্মে আর কি দরকার, আমি এই পাতার বিছানায় শয়ন করি, আর পাহারা দেবার জন্মে কোন জিনিস কাছে না থাকাতে নিশ্চিন্তে পরমশান্তিতে ঘুমোতে পারি ; আর নজর রাখবার মতন যদি কিছু আমার থাকত, তা'হলে ঘুম ত' তখনই ছুটে যেত ! না যেমন শিশুকে দুগ্ধদান করে, তেমনি আমার এই ধরিত্রীমাতা আমায় সব কিছুই দিচ্ছেন। সেখানে খুসী আমি যেতে পারি—কোন বাধা নেই, কোন ভাবনা চিন্তা আমার নেই, যা'তে পড়ে আমায় বিব্রত হ'তে হয়।

“আলেকজান্ডার আমার মাথাটা কেটে ফেললেও আমার আত্মার ত' সে বিনাশ সাধন করতে পারবে না, আমার মাথাটি তখন কেবল নীরব হয়ে পড়েই থাকবে—শরীর পৃথিবীতে পড়ে থাকবে একখণ্ড ছিন্নবজ্রেরই মত, যেখান থেকে এর উপাদান সব সংগৃহীত হয়ে এর সৃষ্টি হয়েছিল ; তা'রপর আমি আত্মারূপে আমার ভগবানের কাছে গিয়ে পৌঁছব, যিনি আমাদের সকলকে রক্তমাংসের দেহে বন্দী ক'রে এ পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন এই প্রমাণ করতে যে, আমরা এখানে নেমে এসে তাঁ'র শাসন মেনে চলতে পারি কি না আর যিনি আমাদের সকলের কাছ থেকে চান যে, যখন আমরা এখান থেকে তাঁ'র সামনে গিয়ে হাজির হ'ব, তখন তাঁ'র কাছে গিয়ে আমাদের জীবনের সকল কাষেরই কৈফিয়ৎ দিতে হবে, কেননা তিনিই হচ্ছেন সকল গর্বোদ্ধত, সকল প্রকার অন্তায়কাষের একমাত্র বিচারক ; তাঁ'র এমনি বিচার যে অত্যাচারিতের মর্শ্ববৃন্দ যন্ত্রণাই শেষে অত্যাচারীর শাস্তি হয়ে দাঁড়ায় !

“তা' হ'লে আলেকজান্ডার কেবল তা'দেরকেই এই সব ব'লে ভয় দেখান, যা'রা ধনসঞ্চয়ের কামনা করে, যা'রা মৃত্যুকে ভয় করে—কারণ আমাদের বিরুদ্ধে এসব অস্ত্র কোন কাষেই আসবে না, এ দুটো অস্ত্রই আমাদের বিরুদ্ধে

সমভাবেই শক্তিহীন। ব্রাহ্মণেরা কাঞ্চনের মায়া করেন না বা তাঁদের মৃত্যুভয়ও নেই! তা'হলে এবার যাও, গিয়ে আলেকজান্ডারকে এই কথা বল যে,—আপনার কোন কিছুতেই দণ্ডামিসের কিছুমাত্র প্রয়োজন নেই আর সেই জন্তে তিনি আপনার কাছে যাবেনও না, আর আপনার যদি কিছু দণ্ডামিসের কাছ থেকে চাইবার থাকে, তা'হলে আপনিই তাঁ'র কাছে যান।”

গভীর মনোযোগের সঙ্গে আলেকজান্ডার অনিসিক্রিটসের কাছ থেকে যোগিবরের বার্তা শুনলেন, এবং “তাঁ'র দণ্ডামিসকে দেখবার ইচ্ছা আরও প্রবল হয়ে উঠল—যিনি বৃদ্ধ আর দিগম্বর হ'লেও একমাত্র প্রতিযোগী, যাঁ'র মধ্যে বহুরাজ্যবিজেতা সেই দুর্দ্বর্ষ যোদ্ধা দেখতে পেয়েছিলেন যে তিনি তাঁ'র চেয়েও ঢের বেশী শক্তি ধরেন।”

আলেকজান্ডার কতকগুলি ব্রাহ্মণ তপস্বীকে তক্ষশিলায় নিমন্ত্রণ করেন। তাঁ'রা জ্ঞানগর্ভ দার্শনিক প্রশ্নের সমাধানে পারদর্শী ছিলেন। প্লুটার্ক একটা বাকবুদ্ধের বিবরণ দিয়েছেন; আলেকজান্ডার নিজে তা'র সমস্ত প্রশ্ন রচনা ক'রে দিয়েছিলেন।

“জীবিত আর মৃতদের মধ্যে সংখ্যায় বেশী কে?”

“জীবিত, কারণ মৃতেরা ত' আর নেই।”

“প্রাণীরা কোথায় বেশী, সমুদ্রে না ভূমিতে?”

“ভূমিতে, কারণ সমুদ্র ভূমিরই একটা অংশ।”

“পশুদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা চতুর কোন্টি?”

“যা'র সঙ্গে মানুষের এখনও পরিচয় ঘটে নি।”

(মানুষ অজানাকেই ভয় করে বেশী)।

“আগে কোন্টা ছিল—দিন কি রাত?”

“একদিন আগে ব'লেই দিন আগে ছিল।” এই উত্তরে আলেকজান্ডার বিস্ময় প্রকাশ করেন; তা'তে ব্রাহ্মণটি বলেন, “অসম্ভব প্রশ্নের অসম্ভব উত্তর।”

“সবচেয়ে কি সজুপায়ে একজন মানুষ নিজেকে সকলের প্রিয়পাত্র ক'রে তুলতে পারে?”

“মানুষ সকলের প্রিয়পাত্র হয়, যদি সে বিরাটশক্তি ধারণ ক'রেও কারুরই ভয়ের কারণ হয় না।”

“নান্দুব দেবতা হতে পারে কি ক’রে?”*

“নান্দুবের পক্ষে বা অসম্ভব তাই ক’রে।”

“জীবন আর মৃত্যুর মধ্যে কে বেশী শক্তিশালী?”

“জীবন—কারণ এ কত দুঃখকষ্ট, কত অমঙ্গল সছ করতে পারে।”

আলেকজান্ডার তাঁর গুরুরূপে একজন প্রকৃত যোগীকে ভারতবর্ষ থেকে নিয়ে যেতে সমর্থ হ’ন। এই ব্যক্তি কল্যাণ (স্বামী ফিনিস) নামে পরিচিত, গ্রীকরা তাঁকে “কালানস্” ব’লে ডাকত। মুনিবর আলেকজান্ডারের সঙ্গে পারশ্বদেশে গমন করেন। একটি নির্দিষ্ট দিনে, পারশ্বদেশের সূসানা নামক স্থানে তিনি সমগ্র মাসিডোনিয়ান সৈন্যদের সমক্ষে তাঁর জরাজীর্ণ দেহ নিয়ে জলন্তচিতায় প্রবেশ ক’রে নিজেকে অগ্নিতে আহুতি দেন। ঐতিহাসিকেরা বর্ণনা করে গেছেন যে উক্ত যোগিবরের কোনরূপ যন্ত্রণা বা মৃত্যুর ভয় না দেখে সমস্ত সৈন্যেরা বিস্ময়ে একেবারে স্তম্ভিত হয়ে যায়; তিনি চিতাগ্নিতে দগ্ধ হবার সময় একবারও স্থানচ্যুত হ’ন নি। চিতায় প্রবেশ ক’রবার পূর্বে কালানস্ তাঁর সমস্ত অন্তরঙ্গ সঙ্গীসাপথীদের আলিঙ্গন করেন, কিন্তু আলেকজান্ডারের কাছ থেকে বিদায়গ্রহণে বিরত থাকেন; তাঁকে সেই হিন্দুধর্মি কেবল মাত্র বলেন,—

“আমি শীঘ্রই তোমার সঙ্গে ব্যাবিলনে সাক্ষাৎ ক’রব।”

আলেকজান্ডার পারশ্বদেশ পরিত্যাগের এক বৎসর পরে ব্যাবিলনে মারা যান। তাঁর ভারতীয় গুরুর কথাই ছিল যে তিনি আলেকজান্ডারের জীবনমরণে সর্বদা উপস্থিত থাকবেন।

গ্রীক ঐতিহাসিকেরা ভারতীয়সমাজের বিষয়ে বহু প্রত্যক্ষ আর উদ্দীপনাময়ী বর্ণনা দিয়ে গেছেন। আরিয়ান বলেন, হিন্দু আইন জনগণকে রক্ষা করে যার “বিধান দেয় যে তা’দের মধ্যে কেউই কোন অবস্থাতেই ক্রীতদাস হ’বে না; আর নিজেরা যে স্বাধীনতা উপভোগ করে তা’তে যে সকলেরই অধিকার আছে সে কথা মান্বে। কারণ তা’রা ভেবেছিল যে যা’রা কারুর উপর

* এই প্রশ্ন হ’তে আমরা অনুমান করতে পারি যে “ঈশ্বরের পুত্র”র যে ইতিমধ্যেই নিঃশ্রেয়স লাভ হয়েছে এ বিষয়ে তাঁর মাঝে মাঝে সন্দেহ উপস্থিত হ’ত।

কর্তৃত্ব করা বা তা'দের নিকট অবনত হওয়া শিক্ষা করেনি, তা'রাই ভাগ্যপরিবর্তনের সকল অবস্থার সর্বাপেক্ষা উপযোগী জীবনলাভ করবে।*

আর একটি পুস্তকে লেখা আছে, “ভারতবাসীরা টাকা হুদে খাটাতে অথবা ঋণ কেমন ক’রে করতে হয় তা’ জানে না। কোন ভারতবাসীর কোন অন্ময় করা বা তা’ সহ্য করা প্রচলিত প্রথার বিরোধী, সেই জন্তে তা’দের কোন একরারনামা বা জামিন প্রয়োজন হয় না।” কথিত আছে যে রোগ-মুক্তি সরল আর স্বাভাবিক উপায়েই হ’ত। “ঔষধপ্রদান অপেক্ষা পথ-নিয়ন্ত্রণেই রোগনিরাময়ের ব্যবস্থা। ঔষধহিসাবে মলম আর প্রলেপেই আদর হয় সমধিক। আর সব খুব বেশীপরিমাণেই অপকারক ব’লে বিবেচিত হয়।” হৃদ্যব্যবসায় ক্ষত্রিয়বর্ণের মধ্যেই নিবদ্ধ ছিল। “শত্রুরা ভূমিতে কর্ষণরত কোন কৃষকের উপর আপতিত হয়ে তা’র কোনও ক্ষতিসাধন করবে না—কারণ এই শ্রেণীর লোকেরা জনসাধারণের উপকারী ব’লে বিবেচিত হ’য়ে সকল প্রকার ক্ষতি হ’তে রক্ষিত হয়। ভূমিও এই রকমে অত্যাচারের হাত এড়িয়ে গিয়ে প্রচুর শস্য উৎপাদন করে—জীবন উপভোগ্য করবার সব রকম উপকরণ অধিবাসীবৃন্দকে যোগায়।”

সম্রাট চন্দ্রগুপ্ত যিনি খৃঃ পূঃ ৩০৫ শতাব্দীতে আলেকজান্ডারের সেনাপতি সেলিউকস্কে পরাজিত ক’রেছিলেন—সাতবছর পরে ভারত-সাম্রাজ্যের শাসন তাঁ’র পুত্রের হস্তে তুলে দিতে মনস্থ ক’রলেন। দাক্ষিণাত্যে গমন ক’রে চন্দ্রগুপ্ত তাঁ’র জীবনের শেষ দ্বাদশবৎসর কপর্দকহীন সন্ন্যাসীর মত কাটিয়ে দিয়েছিলেন। তথায় তিনি আত্মজ্ঞানলাভের জন্ত শ্রবণবেলগোলা নামক একটি পর্বতগুহায় জীবন অতিবাহিত করেন। শ্রবণবেলগোলা এখন মহীশূররাজ্যের মধ্যে একটি প্রসিদ্ধ তীর্থস্থান। নিকটেই সাধু গোমতেশ্বরের একটি মূর্তি ৯৮৩ খৃষ্টাব্দে জৈনদের দ্বারা একটি বিরাট প্রস্তরখণ্ড

* সকল গ্রীক পর্ধাবেক্ষকগণ ভারতবর্ষে ক্রীতদাসপ্রথার সম্পূর্ণ অভাবের বিষয়ে বর্ণনা ক’রে গেছেন ; এ ব্যাপার গ্রীক সমাজগঠনের সম্পূর্ণ বিরোধী লক্ষণ।

অধ্যাপক বিনয়কুমার সরকার কৃত “ক্রিস্টিভ ইণ্ডিয়া”তে ভারতবর্ষের প্রাচীন ও আধুনিক নানা কৃতিত্ব এবং অর্থনীতি, রাজনীতি, সাহিত্য, শিল্প ও সমাজবিজ্ঞানের প্রাধান্ত্যসূচক গুণবিবেচনের একটি সংক্ষিপ্ত চিত্র প্রদর্শিত হয়েছে। (মতিলাল বেনারসীদাস, লাহোর ; প্রকাশক : ১৯৩৭,

৭১৪ পৃঃ।)

হ'তে পোদিত হয়ে প্রতিষ্ঠিত আছে। পৃথিবীর মধ্যে হচ্ছে এটি সর্বাপেক্ষা বৃহৎ প্রতিমূর্তি।

মহীশূরের প্রায় সর্বত্র ছড়ান তীর্থস্থানগুলি থেকে দক্ষিণভারতের বহু সাধুসন্তদের পরিচয় পাওয়া যায়। এই সব সাধুসন্তদের মধ্যে থাযুম্নবর নামে একজন এই অপূর্ণ কবিতাটি লিপিবদ্ধ ক'রে গেছেন :—

“দমন করিতে পার প্রমত্ত বারণ,—

আর ঋক্ষশাদ্বূলের বদন ব্যাদান,

পশুরাজ সিংহোপরি করি আরোহণ,

কালসর্পসাথে ক্রীড়া, তুচ্ছ করি প্রাণ।

রসায়নবলে তব জীবিকা অর্জন,

ছন্নবেশে ভ্রমিবারে পার পৃথ্বীময়।

দাসত্বশৃঙ্খলে বাধি সর্ব দেবগণ,

সুচির যৌদন করি দেহে উপচয়।

জলের উপর ভ্রমি', অগ্নিমধ্যে বাস,

মনের দমন কিন্তু কঠিন প্রয়াস।”

ভারতবর্ষের পাদদেশে একেবারে সূদূর দক্ষিণপ্রান্তে ত্রিবাঙ্কুররাজ্য ; স্থানটি উর্বর ও অতিশয় মনোরম। এখানে অধিকাংশস্থানে নদী, খাল, বিল প্রভৃতি জলপথেই লোকেদের যাতায়াত চলে। কবে কোন সূদূর অতীতে ত্রিবাঙ্কুর-রাজ্যে কতকগুলি ছোট ছোট রাজ্য বুদ্ধবিগ্রহাদি দ্বারা সংযোজিত করা হয়েছিল বলে তা'র দরুণ সঞ্চিত পাপের জন্মে আজও মহারাজা বংশপরম্পরানুক্রমে প্রতিবৎসরই প্রায়শ্চিত্ত ক'রতে বাধ্য। বৎসরের মধ্যে ছাপ্রান্নদিন মহারাজা বেদউচ্চারণ ও স্তোত্রপাঠ শোন্বার জন্মে দৈনিক তিনবার ক'রে মন্দিরে যান। প্রায়শ্চিত্ত শেষ হয় “লক্ষদীপম্”এ অর্থাৎ মন্দিরটিতে একলক্ষ দীপে সজ্জিত আলোক উৎসব পালন ক'রে।

প্রাচীন ভারতের ব্যবস্থাকর্তা মনু,* রাজকর্তব্যাসকল নিম্নলিখিতভাবে

* মনু হচ্ছেন সর্বজনীন বিধিপ্রবর্তক, কেবলমাত্র হিন্দুসমাজের জন্ত নয়—সমগ্র বিশ্বেরই জন্ত। মনুর আদর্শেই সমস্ত সমাজশাসননীতি এমন কি ন্যায়বিচার পর্যন্ত গঠিত। নীটশে এই বলে প্রশংসা করেছেন যে, “মনুসংহিতা ছাড়া অল্প কোথাও যে নারীর বিষয়ে এত সুবিবেচিত আর দরদী জিনিস আছে এমন কোন পুস্তক আমার জানা নাই। ঐ সব পক্ষশূত্র বৃহগণ আর সাধুসন্তরা নারী-ম্বাদী একপভাবে পোষণ করতেন যে তা' বোধ হয় আর অল্প কোথাও দেখতে পাওয়া যায় না ...

স্থির ক'রে দিয়েছেন, “তিনি ইচ্ছের ত্রায় দাক্ষিণ্য প্রকাশ করবেন ; জল হতে সূর্য্যের বাষ্পগ্রহণের মত তিনি শুষ্কাদি নিতান্ত অজানিতভাবে সংগ্রহ করবেন ; সর্বত্রগামী বায়ুর মত তিনি তাঁ'র প্রজার জীবনে প্রবেশ করবেন ; যমের ত্রায় সকলকে ত্রায়বিচার দান করবেন ; বিধিলজ্জনকারীদের বক্রণের ত্রায় পাশে বদ্ধ করবেন ; সকলকে চন্দ্রের ত্রায় আনন্দ দান করবেন, ছুট শত্রুদের অগ্নিদেবতার ত্রায় ভগ্ন করবেন ; আর সকলকে সর্বসংস্হা বস্তুস্বরূপ ত্রায় ধারণ করবেন ।”

“বুদ্ধে রাজা বিবাক্ত বা আগ্নেয় অন্তঃশস্ত্র ব্যবহার করবেন না । দুর্বল, শত্রুহীন বা বুদ্ধে অপ্রস্তুত শত্রু বা ভীতজন অথবা শরণাগত বা পলায়নপর ব্যক্তিকে বধ করবেন না । কেবলমাত্র শেষ উপায়স্বরূপ বুদ্ধ অবলম্বিত হ'বে । বুদ্ধে ফলাফল সর্বদাই অনিশ্চিত ।”

ভারতবর্ষের দক্ষিণপূর্ব উপকূলে মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সীর অন্তর্গত সমুদ্র-বলয়িত মাদ্রাজ সহর আর কাঞ্চীপুরম্—শেষোক্ত সহরটি পল্লবরাজবংশের হিন্দুরাজগণের রাজধানী আর তাঁ'দের রাজ্যকাল ছিল খৃষ্টীয় শতাব্দীর প্রথম দিকে । বর্তমানে মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সীতে মহাত্মা গান্ধীর অহিংসনীতি খুবই বিস্তারলাভ করেছে । ষ্ঠেতবর্ষের গান্ধীটুপি প্রায় সর্বত্রই দেখতে পাওয়া যায় । দক্ষিণভারতে মহাত্মা গান্ধী অস্পৃশ্যদের জগৎ বহু মন্দিরের দ্বার উন্মুক্ত আর জাতিভেদেরও বহু সংস্কারসাধন করেন ।

জাতিবিভাগের আদি উৎপত্তি সুপ্রসিদ্ধ ব্যবস্থাপক মনু কর্তৃক বা' প্রবর্তিত তা' বাস্তবিকই প্রশংসার্হ । তিনি স্পষ্ট দেখতে পেয়েছিলেন যে মনুজাতি স্বাভাবিক বিবর্তনে চারটি প্রধানশ্রেণীতে বিভক্ত ; দৈহিক শ্রমের দ্বারা বা'রা সমাজকে সেবা করতে সমর্থ (শূদ্র) ; বা'রা মননশক্তি, কার্য্যপটুতা, কৃষি, শিল্প, ব্যবসায়বাণিজ্য বা সাধারণ বণিকবৃত্তির দ্বারা সমাজকে সেবা করে (বৈশ্য) ; বা'দের প্রতিভা, শাসন পালন অথবা রক্ষাকার্য্যে ক্ষুরিত অর্থাৎ বা'রা শাসক বা যোদ্ধাশ্রেণী (ক্ষত্রিয়) ; বা'দের প্রকৃতি ভগবচ্ছিত্তা পূজাঅর্চনা, শাস্ত্রপাঠ ইত্যাদিতে রত (ব্রাহ্মণ) । মনু বলে গেছেন, “এই

...একটি অতুলনীয় সৃষ্টিস্থিত আর শ্রেষ্ঠ রচনা ... মহৎভাবে পরিপূর্ণ, এতে একটা চরম উৎকর্ষের ভাব বিদ্যমান—জীবনের সার্থকতার আশ্বাসে আর এ নিজের এবং জীবনের মঙ্গলকামনার জয়োল্লাসে পূর্ণ ; সমগ্র পুস্তকটি জ্ঞানগরিমার গৌরবদীপ্তিতে সমুজ্জ্বল ।”

চারি বর্ণের* কর্তব্য হ'চ্ছে অহিংসা, সত্যবাদিতা, সততা, পরিচ্ছন্নতা ও আলসংযম অভ্যাস এবং পালন।" মহাভারতে লিখিত আছে যে, "জন্ম বা দশবিধ সংস্কারপালন, বিদ্যার্জন বা বংশগৌরব মানবকে দ্বিজাতিতে (ব্রাহ্মণত্বে) উন্নীত ক'রতে পারে না—কেবল চরিত্র ও শীলতাই পারে।" মনু সমাজকে তা'র লোকেদের জ্ঞান, প্রাচীনত্ব, নৈকট্য এবং সর্বশেষ ঐশ্বর্য্য অনুসারে ষথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শন ক'রতে ব'লে গেছেন। বৈদিকভারতে, ধন সঞ্চিত বা দাতব্যকার্যের জন্ত অপ্রাপ্য হলে ত' সেরূপ ধনকে ঘৃণাই করা হ'ত। প্রভূত অর্থশালী রূপণ অথবা অল্পদারব্যক্তিকে সমাজের নিম্নস্তরে স্থান দান করা হ'ত।

গুরুতর অমঙ্গল দেখা দিলে, যখন জাতিভেদ শতাব্দীর পর শতাব্দীর

* ১৯৩৫ সালের জানুয়ারী সংখ্যার "ইষ্ট ওয়েস্টে" লিখিত হয়েছে,—“এই চারিটি বর্ণের অঙ্গীভূত হওয়াটা আদিতে মানুষের জন্মের উপর নির্ভর ক'রত না, তা' ক'রত তা'র স্বাভাবিক শক্তি বা সামর্থ্যের উপর, যা' তা'র জীবনের পরমপুরুষার্থ বা চরমলক্ষ্য নির্বাচনে প্রদর্শিত হ'ত। এই লক্ষ্য হ'তে পারত (১) কাম—অর্থাৎ কামনা, ইন্দ্রিয়ভোগসম্পন্ন জীবনের ক্রিয়াশীলতা (শূদ্রাবস্থা), (২) অর্থ—মানে লাভ, অর্থাৎ বাসনাপূরণ তবে সংযতভাবে (বৈশ্যাবস্থা), (৩) ধর্ম—আত্মসংযম-শিক্ষা, সংকার্য ও দায়িত্বপূর্ণ জীবন (ক্ষত্রিয়াবস্থা), (৪) মোক্ষ বা নির্বাণমুক্তি—আধ্যাত্মিক ও ধর্মশিক্ষার জীবন (ব্রাহ্মণাবস্থা)। এই চারি বর্ণ মানবজাতির সেবা করে (১) দেহ (২) মন (৩) ইচ্ছাশক্তি আর (৪) ঈশ্বরারামনার দ্বারা।

“এই চারিটি অবস্থা প্রকৃতির এইসব নিত্য গুণের সঙ্গে সমগুণাঙ্কিত,—তমঃ, রজঃ, সত্ত্ব, —ব্যাঘাত, ক্রিড়া ও বিস্তার অথবা ভর, শক্তি ও বুদ্ধিবৃত্তি। এই চারিটি জাতি এই চারিটি গুণে গুণাঙ্কিত, যথা, (১) তমঃ (অবিদ্যা) (২) তমঃ-রজঃ, (অবিদ্যা ও ক্রিয়াশীলতার সংমিশ্রণ), রজঃ-সত্ত্ব (সংকার্য ও জ্ঞানের সংমিশ্রণ) আর সত্ত্ব (জ্ঞান)। এইরূপে প্রকৃতিদেবী প্রত্যেক মানবকে এক বা একাধিক গুণের সংমিশ্রণে তা'র জাতি নির্দিষ্ট ক'রে দিয়েছেন। অবশ্য প্রত্যেক মানুষেরই অল্পাধিক পরিমাণে এই তিনটি গুণই বর্তমান আছে। গুরুই প্রকৃতপক্ষে মানুষের বর্ণ সঠিকভাবে নির্ধারণ বা নিরূপিত করতে পারেন।

সকল দেশের আর সকল জাতির লোকেরা মতবানহেতু না হ'লেও কার্যতঃ অন্ততঃ ধানিকটাও জাতিভেদের লক্ষণ মেনে চলে বইকি! যেখানে অবাধ অধিকার অথবা তথাকথিত স্বাধীনতা আছে, বিশেষতঃ স্বাভাবিক জাতিদের ভিতর দুই বিপরীত শ্রেণীর মধ্যে আন্তর্জাতিক বিবাহ, সেখানে জাতিটির লোকসংখ্যা ক্রমশঃ ক্রীণ হতে ক্রীণতর হয়ে এসে একেবারে লুপ্ত হয়ে যায়। পুরাণ-সাহিত্যে একরূপ সংযোগের ফলে সম্ভাব্যের অন্ততঃ মতন বন্ধাসঙ্করের সঙ্গে তুলনা করা হ'য়েছে : এদের নিজেদের জাতের বংশবৃদ্ধি ঘটে না। কৃত্রিম জাতিসকল পরিণামে নির্মূল হ'য়ে যায়। অসংখ্য বড় বড় জাতি যা'দের জীবিত বংশধরদের আর কোন চিহ্নই মেলে না, এমন বহু বহু উদাহরণ আজকাল ইতিহাসে মেলে। ভারতবর্ষের বহু চিন্তাশীল মনীষীরা বলেন যে, ভারতের বর্ণপ্রমথর্ম নিকটাত্মীয় গ্রহণের প্রতিবন্ধক হয়ে জাতির বিলুপ্ততা সংরক্ষণ ক'রে একে যুগযুগান্তের মধ্যে নানা উত্থানপতনের হাত হ'তে বাঁচিয়ে আজকে নিরাপদ স্থানে এনে দাঁড় করিয়েছে—আর সে জায়গায় দৃষ্টান্ত জাতির বিলুপ্তির অতলগহ্বরে সব একেবারে লুপ্ত হ'য়ে গিয়েছে।

পালনে বংশপরম্পরানুক্রমে সমাজের গলায় কাঁসির দড়ির মতই শক্ত হয়ে চেপে বসে। মহাত্মা গান্ধী এবং ভারতের বহুসংখ্যক সমাজের প্রতিনিধিরা জাতিভেদের প্রাচীন অর্থ যা' জন্মের উপর নয়, একমাত্র স্বাভাবিক গুণকর্ম-বিভাগের উপরেই যা' প্রতিষ্ঠিত, তা' পুনঃপ্রবর্তনের জন্য ধীর অথচ নিশ্চিত উন্নতির চেষ্টা করেছেন। পৃথিবীর সকল জাতির মধ্যেই দুঃখজনক কর্মফল আছে আর তা' দূর করার ব্যবস্থাও করতে হয়। ভারতবর্ষও তা'র অদম্য উৎসাহ আর বহুমুখী প্রচেষ্টার দ্বারা জাতিভেদসংস্কারের কার্যে নিজের যোগ্যতা প্রদর্শন করতে সমর্থ হবে।

দক্ষিণভারত এতদূর চিন্তাকর্ষক যে রাইট সাহেব আর আমি, আমাদের ভ্রমণ আরও দীর্ঘতর করবার জন্য লালায়িত হলুম। কিন্তু সময়ের অন্ত্যবশতঃ আমাদের আতিথ্যগ্রহণ আর বেশীদিন বিলম্বিত করতে পারা গেল না। শীঘ্রই আমরা কলিকাতায় ভারতীয় দর্শন কংগ্রেসের অধিবেশন শেষে বক্তৃতা দেবার জন্য ডাক পড়ল। মহীশূরভ্রমণের শেষে ইণ্ডিয়ান একাডেমী অফ সায়েন্সের প্রেসিডেন্ট স্যার সি ভি রমণের সঙ্গে আমার আলাপআলোচনা হয়েছিল। এই জগদ্বিখ্যাত হিন্দু পদার্থতত্ত্ববিদ তাঁ'র অপূর্ব মনীষাবলে ১৯৩০ খৃষ্টাব্দে নোবেল প্রাইজ লাভ করেন। তাঁ'র আবিষ্কৃত আলোক-বিচ্ছুরণ—“রমণ একফেক্ট” নামে এখন সর্বসাধারণের নিকট পরিচিত।

আমাদের মাদ্রাজী বন্ধু ও ছাত্রদের কাছ থেকে নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও বিদায় গ্রহণ ক'রে আমরা কলকাতার দিকে অগ্রসর হলুম। মধ্যপথে আমরা সদাশিবব্রাহ্মণের* স্মৃতিপূত একটি ক্ষুদ্রতীর্থে নামলুম, দর্শনের জন্য। অষ্টাদশ শতাব্দীতে এ'র জীবনকথা নানা অলৌকিক ঘটনায় পূর্ণ। নেরুর নামক স্থানে আর একটি বৃহত্তর তীর্থ আছে। পন্নকোটের রাজা এটি নির্মাণ করিয়ে দেন—এখানে দৈবশক্তিবলে রোগমুক্তির জন্য বহু তীর্থযাত্রীর সমাবেশ হয়। বংশপরম্পরাক্রমে পন্নকোটরাজগণ শাসনকার্যে রত রাজার ভ্রাত্তে রাজ্যপরিচালনা বিষয়ে ১৭৫০ খৃষ্টাব্দে সদাশিব কর্তৃক লিখিত কতকগুলি ধর্মোপদেশ আজও পর্য্যন্ত পবিত্র ব'লে সম্বল রক্ষা ক'রে এসেছেন। সদাশিব

* তাঁ'র পূর্ণ উপাধি ছিল শ্রীসদাশিবেন্দ্র সরস্বতী স্বামী। তাঁ'র আধ্যাত্মিক খ্যাতি ভারতবর্ষে ও উচ্চ যে শৃঙ্গেরি মঠের বর্তমান অধ্যক্ষ পূজ্যপাদ জগদগুরু শ্রীশঙ্করাচার্য্যদেব সদাশিব সম্বন্ধে এক উদ্ভূতনাময়ী প্রশস্তিগাথা রচনা করেছেন।

ব্রাহ্মণ ব্রহ্মহুত্র এবং পতঞ্জলির যোগহুত্রের উপর গভীর পাণ্ডিত্যপূর্ণ দুইখানি টিকা রচনা ক'রে ভারতের শাস্ত্রালোচনাকে অধিকতর সমৃদ্ধ করেছেন।

দক্ষিণভারতের গ্রামবাসীদের মধ্যে পূর্ণজ্ঞান পরমপ্রিয় সদাশিব সম্বন্ধে বহু অদ্ভুত অদ্ভুত গল্প সব এখনও প্রচলিত আছে। কাবেরীনদীর তীরে একদিন তাঁকে সমাধিমগ্ন অবস্থায় হঠাৎ বজ্রার জলে ভেসে যেতে দেখা যায়। হস্তাকতক বাদে দেখা গেল যে তিনি কোইম্বাটুর জেলায় কোডুমুডি নামক স্থানে মাটির চিপির তলায় চাপা পড়ে রয়েছেন। গ্রামবাসীরা খুঁড়ে বা'র করবার সময় কোদালের আঘাত তাঁর গায়ে লাগাতে তাঁর সমাধিভঙ্গ হয়, তখনই তিনি উঠে পড়ে তাড়াতাড়ি সেস্থান পরিত্যাগ ক'রে চলে যান।

জনৈক বয়োজ্যেষ্ঠ বৈদাস্তিক পণ্ডিতকে তর্কবুদ্ধে পরাস্ত করাতে সদাশিবের গুরু সদাশিবকে এই ব'লে তিরস্কার করেন, “তুমি একটি বালকমাত্র, তোমার এত বাক্যব্যয় কেন, কবে তোমার রসনা সংযত হ'বে?” তা'তে সদাশিব উত্তর দেন, “আপনার আশীর্ব্বাদে, এই মুহূর্ত্ত হ'তেই।” তদবধি সদাশিব মৌনব্রতাবলম্বন করেন এবং তা'রপর মুনি ব'লে খ্যাত হ'ন।

সদাশিবের গুরু ছিলেন শ্রীপরমশিবেন্দ্র সরস্বতী স্বামী; ইনি দহরবিজ্ঞা-প্রকাশিকার রচয়িতা এবং উত্তরগীতার একটি অপূর্ব পাণ্ডিত্যপূর্ণ টিকাও রচনা ক'রে গেছেন; তিনি যে তাঁর সেই বিরাট যোগিশিষ্যের বিষয়ে গর্ভানুভব করতেন এবং তা' যে যথোপযুক্তই ছিল তা' এই নিম্নলিখিত ঘটনাটি থেকেই জানতে পারা যায়। কতকগুলি সাংসারিক ব্যক্তি, ভগবৎ-প্রেমান্বিত সদাশিবের রাস্তার উপর যা'কে বলে “লজ্জা সরমের মাথা খেয়ে” উন্মাদের মত নৃত্যে মগ্ন হ'ত হয়ে তাঁর গুরুদেবের কাছে গিয়ে নালিশ ক'রে বললে, “ম'শায়, আপনাদের সদাশিব একটি বদ্ধ পাগল।”

কিন্তু পরমশিবেন্দ্র তা' শুনে হাস্তোৎফুল্ল বদনে বললেন, “আহা, এমনি পাগল যদি সবাই হ'তে পারত!”

সদাশিবের জীবনে ভগবানের বহু অদ্ভুত আর অপূর্ব লীলাসকল প্রদর্শিত হয়েছে। এ জগতে আপাতদৃষ্টিতে অনেক কিছু অবিচারই দেখা যায়; কিন্তু ঈশ্বর-ভক্তের নিকট তাঁর অমোঘ জ্ঞানের বিধানের বহু উদাহরণের সত্ত্ব পরিচয় পাওয়া যায়। এক রাত্রিতে সমাধিমগ্ন অবস্থায় সদাশিব এক সম্পন্ন গৃহস্থের শব্দের গোলায় কাছে উপস্থিত হ'লে, পাহারারত তিনটি ভৃত্য সাধুবরকে

প্রহারের জন্ত মস্তকোপরি যষ্টি উত্তোলন করতেই দেখা গেল যে তাঁদের হাতগুলো সব একেবারে আটকে গেছে! সদাশিবের প্রভুত্ব সোঁতান ত্যাগ ক'রে চলে যাবার সময় পর্য্যন্ত উক্ত তিনটি ভূতাবরকে ঐরকমভাবে হাত তুলে পাথরের মূর্তির মতই সারারাত দাঁড়িয়ে থাকতে হয়েছিল।

আর একটি উপসঙ্গে সদাশিবকে জোর ক'রে এক সর্দার তাঁর কুলির দলে জ্বালানি বইবার কাষে লাগিয়ে দেয়। মৌনী সদাশিব নীরবে বোঝাটি মাথায় ক'রে নির্দিষ্টস্থানে উপস্থিত হ'য়ে একটা প্রকাণ্ড স্তূপের উপর সেটিকে রাখতেই জ্বালানির সেই বিরাট স্তূপটিতে সঙ্গে সঙ্গে আগুন ধ'রে যায়!

সদাশিব ত্রৈলোক্য স্বামীর মত উলঙ্গ অবস্থায় থাকতেন। একদিন সকালবেলা সেই নগ্ন বৌগী অগমনস্কভাবে একটি মুসলমান সর্দারের তাঁবুতে প্রবেশ করে ফেলেন। সর্দারটির মহিলা আত্মীয়ারা ভয়ে চিংকার শুরু ক'রে দেন; সৈনিকপ্রবর ত' তরবারির প্রবল আঘাতে তাঁর একটি হস্ত দেহ হ'তে একেবারে বিচ্ছিন্ন ক'রে ফেললেন। বৌগিবর নিরুদ্ভিগ্নভাবে সে স্থান হ'তে প্রস্থান করলেন। অল্পতাপে দগ্ধ হয়ে মুসলমান সর্দারটি ছিন্নহস্তটি মেঝে থেকে তুলে নিয়ে তাঁর পিছনে পিছনে ছুটলেন। সদাশিব নীরবে ছিন্নহস্তটি তাঁর কাছ থেকে নিয়ে রক্তস্রাবী ক্ষতস্থানে সংলগ্ন ক'রে দিলেন। আঘাতের আর কোন চিহ্নই রইল না। মুসলমান বোদ্ধাটি যখন সশ্রদ্ধচিত্তে ও ভক্তিনত হৃদয়ে তাঁর কাছ থেকে কিছু আধ্যাত্মিক উপদেশ চাইলেন, সদাশিব তখন বালুকার উপর অঙ্গুলিদ্বারা নিম্নলিখিত কথা কয়টি লিখে দেন,—

“তুমি যা' চাও তা' কোরো না, তা' হলে তোমার যা' ইচ্ছে হ'বে তাই তখন করতে পারবে।”

মুসলমান সর্দারের এই বাণী লাভ ক'রে মনে এক অপূর্ণ পবিত্রতাবের সঞ্চার হলো। আর সেই সাধুটির অদ্ভুতভাবে উপদেশ হৃদয়ঙ্গম ক'রে বুঝলে যে অহংতাবের দমনেই আত্মার মুক্তি। সেই সামান্য কথা কয়টিতে এতদূর আধ্যাত্মিক শক্তি ছিল যে, তাঁর বলেই সেই সর্দারটি ক্রমে তাঁর একজন উপযুক্ত শিষ্যে পরিণত হয়েছিল; পূর্বজীবনের সঙ্গে তাঁর আর কোন সম্পর্কই রইল না।

গ্রামের ছেলেরা একদিন সদাশিবের কাছে গিয়ে জানালে যে তাঁদের

বড়ই ইচ্ছে যে মাহুরায় তখন কি একটা ধর্মোৎসব আর তা'র মেলা চলছে তা' গিয়ে তা'রা দেখে আসে। মাহুরা সেখান থেকে ১৫০ মাইল দূরে। যোগিবর সদাশিব তখন সেই সব ছোট ছোট ছেলেদের ইঙ্গিত করলেন যে তা'রা যেন তাঁ'র গা স্পর্শ ক'রে থাকে। আশ্চর্য্য! মুহূর্ত্তমধ্যে সেই সমগ্রদলটি মাহুরায় গিয়ে হাজির। ছেলেগুলো তারি স্তুতিতে হাজার হাজার তীর্থ-যাত্রীদের সঙ্গে খুব আমোদেই খানিকক্ষণ বেড়িয়ে বেড়ালে। তা'রপরে ষষ্টীকতক বাদে তিনি আবার সেই রকম ক'রে তা'দের বাড়ী ফিরিয়ে আনলেন। বিশ্রামে স্তম্ভিত সেই সব ছেলেপুলেদের পিতামাতারা সেখানকার প্রতিমার শোভাযাত্রা প্রভৃতির প্রত্যক্ষ বর্ণনা তা'দের কাছ থেকে শুন্লে, আর তা'রা দেখে আশ্চর্য্য হয়ে গেল যে কতকগুলো ছেলেদের হাতে তখনও মাহুরার নানারকম মিষ্টি রয়েছে।

একটা অবিশ্বাসী ছোকরার কিছু সাধুটি আর তাঁ'র এই অদ্ভুত ঘটনাটির কথা আর কিছুতেই বিশ্বাস হ'ল না। উন্টে সে ঠাট্টামস্কর্য্য আরম্ভ করলে। এর পরেরবারের উৎসবে সে সদাশিবের কাছে হাজির হয়ে বেশ একটু টিটকিরি দিয়েই বল্লে, “প্রভু, সেবারে যেমন হোঁড়াদের মাহুরায় নিয়ে গিয়েছিলেন আমারও আজ তেমনি ক'রে নিয়ে চলুন না?”

সদাশিব কি আর করেন, তেমনি ক'রে সেই ছোকরাটিকে মাহুরায় নিয়ে গিয়ে ফেললেন। ছোকরাটি সেই মুহূর্ত্তে দেখলে যে, সে মাহুরায় পৌঁছে গেছে। চারদিকে সহরের লোকজনেরা যুবেকিরে বেড়াচ্ছে। যাক্, পৌঁছে ত' সে গেল, কিন্তু তা'র একটু শিক্ষা হওয়াও যে দরকার। তা'ই ফেরবার যখন তা'র সময় হ'ল তখন সে আর সদাশিবকে খুঁজেই পেল না—এখন উপায়? টাকাকড়ি ত' সঙ্গে ক'রে সে কিছুই আনে নি, এখন বাড়ী ফেরে কি ক'রে? আর কি ক'রে! যাই হোক সারা রাস্তাটি হেঁটে আধমরা হয়ে তবে বাছাধনকে বাড়ী ফিরে আসতে হয়েছিল।

৪২শ পরিচ্ছেদ

গুরুর সঙ্গে শেষ দেখা

শ্রীরামপুর আশ্রমে এলুম সঙ্গে কিছু গোলাপফুল আর ফলমূল ইত্যাদি নিয়ে। প্রণাম সেরে বল্লুম, “গুরুজি, আজ আমার ভাগ্য ভাল, আজ সকালে আপনাকে একলা পেয়েছি!” শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজী অত্যন্ত নিরীহভাবে আমার দিকে তাকালেন।

“তোমার মতলব কি বল ত’?” বলে ঘরের চারদিকে এমনভাবে তাকাতে লাগলেন যে, দেখে বোধ হ’ল যেন পালাবার স্রোযোগ খুঁজছেন!

“গুরুজি, আপনার সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ লাভ হয় আমি যখন স্কুলে পড়ি; আর আমি এখন বড় হ’য়ে উঠেছি এমন কি দু’একটা চুলও হয়ত এখন মাথায় পেকেছে। যদিও প্রথম সাক্ষাতের ক্ষণ থেকেই আপনি আমায় নীরবে স্নেহ ক’রে আসছেন, কিন্তু আপনার মনে আছে কি যে আমাদের প্রথম সাক্ষাতের দিনটি কেবল একটিবার মাত্র আপনি আমায় বলেছিলেন যে, ‘আমি তোমায় ভালবাসি’?” বলে তাঁর দিকে মিনতিপূর্ণ দৃষ্টিতে চাইলুম।

গুরুদেব দৃষ্টি অবনত ক’রে বল্লেন, “যোগানন্দ, আমার ভাবাহীন অন্তরের মধ্যে যে প্রগাঢ় স্নেহ লুকিয়ে রয়েছে তা’কে কি ভাবার ক্রতায়ই প্রকাশ করতে হবে?”

“গুরুজি, আমি জানি যে আপনি আমায় ভালই বাসেন, কিন্তু তবু একটু তা’ শুনতে বড় ইচ্ছে হয়।”

“আচ্ছা বেশ, তবে শোন, আমার বিবাহিতজীবনে আমি একটি পুত্রসন্তান চেয়েছিলুম, তা’কে যোগের পথে শিক্ষা দেব বলে মনে বড় আশা ছিল; কিন্তু তা’ হ’ল না। তা’রপর তুমি এলে আমার জীবনে, আমি সুখীই হ’লুম; কারণ তোমাকে পেয়েই আমার পুত্রের সখ মিটল।” দুটি বড় বড় অশ্রুর ধারা শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজীর চক্ষু হ’তে গড়িয়ে এল, শুধু বল্লেন, “যোগানন্দ আমি ত’ তোমায় সর্বদাই ভালবাসি।”

তাঁর স্নেহমাখা কথাগুলিতে আমার হৃদয় বিগলিত হ'ল, বুক থেকে একপাশা যেন পাথর সরে গেল, বল্লুম, “আপনার উত্তর পেয়ে নিশ্চিন্ত হ'লুম যে স্বর্গের দুয়ার আমার জন্তে খোলাই রইল।” তাঁর নীরবতায় আমি প্রায়ই আশ্চর্য্য হয়ে ভাবতুম যে তাঁর মনে কি আছে? অবশ্য তিনি যে ভাবোচ্ছ্বাসহীন আর আত্মস্থ এ আমি জানতুম, কিন্তু তবুও মাঝে মাঝে মনে ভয় হ'ত যে হয়ত আমি গুরুর উপযুক্ত সেবা ক'রে তাঁর পূর্ণ সন্তোষ বিধান করতে পারি নি। তাঁর প্রকৃতি ছিল অদ্বিত, তাঁর পুরোপুরি পরিচয় কেউ পেত না। সে প্রকৃতি ছিল স্থির, গভীর, বাইরের জগতের কাছে ছুরধিগম্য, তাঁর সব আকর্ষণ, সব আসক্তি বহুপূর্বে সে তা' অতিক্রম করেছে।

দিনকতক পরে কলকাতার এলবার্ট হলে আমায় যখন এক বিরাট জনসভায় বক্তৃতা দিতে হয় তখন শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজী, সন্তোষের মহারাজা আর কলকাতার মেয়রের সঙ্গে প্ল্যাটফরমে আমার পাশে বসতে সম্মত হ'লেন। যদিও গুরুদেব আমায় তখন কোন কথাই বলেন নি, তবুও বক্তৃতা দেবার সময় মাঝে মাঝে তাঁর দিকে তাকাচ্ছিলুম; মনে হ'ল যেন তাঁর চোখ দুটি আনন্দে হাসছে।

তা'রপর আমাদের শ্রীরামপুর কলেজের ছাত্রদের সামনে কথাবার্তা হ'ল। আমার পুরান সহপাঠীদের দিকে যখন চাইলুম আর তা'রাও যখন তাঁদের “পাগলা সন্ন্যাসী”র দিকে তাকালে, চোখের কোণে আনন্দাশ্রু এসে জমে দাঁড়াল। আমাদের বাকপটু দর্শনের অধ্যাপক ডাঃ ঘোষাল আমায় অভ্যর্থনা করতে এগিয়ে এলেন—কালের ঐক্যজালিক স্পর্শে পুরান আমাদের সকল মনান্তরই তখন তিরোহিত হয়েছে।

শ্রীরামপুর আশ্রমে ডিসেম্বর মাসের শেষে উত্তরায়ণসংক্রান্তির উৎসব হ'ত। নিকট দূর বহুস্থান হ'তেই শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজীর শিষ্যেরা সব এসে তা'তে যোগদান করতেন। মধুর নামসঙ্কীর্তন, কেষ্ঠদার অমিয়মধুর গলার গান, আশ্রমের ছাত্রদের তৈরী প্রসাদ গ্রহণ, তা'রপর গুরুদেবের আশ্রমের উঠানে মুক্ত বাক্যশতলে জনসভায় তাঁর জ্ঞানগর্ভ বক্তৃতা! আঃ, সে সব কি সুখের গতি, কি আনন্দের দিনই গিয়েছে—বহুদিন আগেকার সব আনন্দোৎসব। শ্রীজকের দিনে হয়ত কিছু একটু নতনত্ব থাকতে পারে!

গুরুদেব বল্লেন, “যোগানন্দ, আজকের সভায় বক্তৃতা দাও— ইংরেজিতেই।” এই রকম দারুণ অস্বাভাবিক অহুরোপ ক’রে গুরুদেবের চোখে কৌতূকের হাসি দেখা গেল; তিনি জাহাজে আমার প্রথম ইংরেজিতে বক্তৃতা দেবার অব্যবহিত পূর্ব্বেকার ছুববস্তার কথা ভাবছিলেন না কি? আমি সে গল্প আমার গুরুভাইদের শুনিয়া গুরুদেবের আশীর্বাদের জোরে আমার কি পরিমাণ রতকার্য্যতা লাভ হয়েছিল তা’র কথাও আন্তরিক ভক্তির সঙ্গে নিবেদন ক’রে শেষ করলুম।

আমি বল্লুম, “গুরুদেবের সর্ব্বগত সাহায্য যে শুধু কেবল সেই সমুদ্রের মাঝে জাহাজেই আমার কাছে এসে পৌঁছেছিল তা’ই নয়, আমেরিকার মতন বিরাট মহাদেশে আজ এই পনরবছর ধ’রে প্রত্যহই তা’ আমার সঙ্গে সঙ্গে ফেরে।”

নিমন্ত্রিতেরা বিদায় নিলে শ্রীবুদ্ধেশ্বর গিরিজী আমাকে সেই ঘরে ডাক দিলেন, যেখানে—গোড়ার দিকে থাকবার সময় একটা উৎসবের পর কেবল একটিবারমাত্র—আমি তাঁ’র কাঠের তক্তপোষে শোবার অল্পমতি পেয়েছিলুম। আজকে দেখি গুরুদেব সেখানে নীরবে বসে আছেন, শিগেরা সব তাঁ’কে অর্দ্ধচন্দ্রাকারে বেষ্টন ক’রে তাঁ’র চরণতলে উপবিষ্ট। আমি ঘরে দ্রুত প্রবেশ করতেই একটু হেসে তিনি বল্লেন, “যোগানন্দ, তুমি এখনিই কলকাতায় ফিরছ নাকি? আচ্ছা, কাল একবার এখানে এসো, তোমার আমার গোটাকতক কথা বলবার আছে।”

তা’রপরদিন বৈকালে, কতকগুলি আশীর্ববাণী উচ্চারণ ক’রে শ্রীবুদ্ধেশ্বর গিরিজী আমায় পরমহংস* উপাধি দান করলেন।

আমি নতজানু হয়ে তাঁ’র সামনে বসতে তিনি বল্লেন, “এখন তোমার পূর্ব্বেকার ‘স্বামী’ উপাধির জায়গায় পরমহংস উপাধি হ’ল।” এই ‘পরমহংসজি’† কথাটা উচ্চারণ ক’রতে আমার মার্কিন শিগেরা যে কিরূপ গলদবর্ষ হ’বে, তা’ ভেবে তখন মনে মনে একটু হাসলুম।

* পরমহংস—শাস্ত্রকাহিনীতে রাজহংস ব্রহ্মার বাহন বলে উল্লিখিত আছে; সদস্য বিচারে প্রতীকস্বরূপ স্বেত রাজহংস জলমিশ্রিত দুগ্ধ হতে ‘সোম’ অমৃত পৃথক্ করতে সমর্থ বলে বিবেচিত। হং-স শব্দ দু’টির মন্তোচ্চারণ নিঃশ্বাসপ্রশ্বাস ত্যাগের শব্দের অনুরূপ। অহম্-সঃ—অর্থাৎ হংসঃ, মানে “আমিই তিনি”।

† ‘পরমহংসজি’ সম্বোধনে তা’রা আমায় ম’শায় বলে ডাকার হাত এড়িয়ে গেছে।

গুরুদেবের চক্ষু ছুটি স্থির, স্নিগ্ধ। শাস্ত্রস্বরে বললেন, “সংসারের কাঁচ আনার এখন কুরিয়েছে; তোমায়ই এবার সব চালাতে হ’বে।” শুনে ত’ ভয়ে বুক ধড়াস্ ধড়াস্ করতে লাগল।

শ্রীবুদ্ধেশ্বর গিরিজী বলতে লাগলেন, “পুরীতে আমাদের আশ্রমের ভার নেবার জন্তে কাঁকেও পাঠিয়ে দাও। তোমার হাতে আমি সবই দিয়ে যাচ্ছি। তুমি তোমার জীবন আর এই প্রতিষ্ঠানের তরী ঠিকই সাফল্যের সঙ্গে পারে লাগিয়ে ভিড়োতে পারবে।”

অশ্রুপ্লাবিত নয়নে আমি তাঁ’র পা’ছুটি জড়িয়ে ধরলুম; তিনি উঠে দাঁড়িয়ে আমাকে স্নেহে আশীর্বাদ করলেন।

তা’র পরদিন রাঁচি থেকে স্বামী সেবানন্দ নামে একটি শিষ্যকে ডাকিয়ে এনে তা’কে আশ্রমের ভার দিয়ে পুরী পাঠিয়ে দিলুম।* তা’রপরে আমার গুরুদেব তাঁ’র বিষয়সম্পত্তির বিলিব্যবস্থা সম্বন্ধে কতকগুলি আইনের খুঁটিনাটি ব্যাপার নিয়ে আলোচনা করলেন—কারণ তাঁ’র ভয় ছিল যে তাঁ’র আত্মীয়স্বজনেরা কোনরকম মামলামোকদ্দমা ক’রে হান্ধামা বাধাতে পারে, সেটা নিবারণ করা প্রয়োজন; তাঁ’র মৃত্যুর পর তাঁ’র দুইটি আশ্রম আর অত্যাশ্রম সম্পত্তি সব দখলের জন্তে তাঁ’র আত্মীয়স্বজনদের মামলামোকদ্দমা জুড়ে দেবার সম্ভাবনা ছিল—কাষেই তাঁ’র ইচ্ছা ছিল যে তাঁ’র সম্পত্তি সব একমাত্র জনহিতকর কার্যের উদ্দেশ্যে দান ক’রে যান।

একদিন বৈকালে অমূল্যাবু নামে এক গুরুভাই আমার বললেন, “গুরুদেবের সম্পত্তি খিদিরপুরে যাবার ব্যবস্থা হয়েছিল, কিন্তু তিনি যেতে পারেন নি।” শুনে কি একটা অজ্ঞাত আশঙ্কার শীতল শিহরণ সর্বাস্ত্র দিয়ে বয়ে গেল। বার বার পীড়াপীড়ি করাতে শ্রীবুদ্ধেশ্বর গিরিজী শুধু এইটুকু-মাত্র বললেন যে, “খিদিরপুরে আর আমার যাওয়া হ’বে না!” মুহূর্তের জন্তে গুরুদেব যেন সপ্তস্তু শিশুর মত কেঁপে উঠলেন।

(পতঞ্জলি লিখেছেন,† “দেহের প্রতি স্বভাবজ আসক্তি, [অর্থাৎ স্মৃতি-

* বর্তমানে পুরী-আশ্রম ব্রহ্মচারী রবিনারায়ণ কর্তৃক পরিচালিত। বালকদের যোগবিদ্যালয় এবং বয়স্কদের সংস্কার অধিবেশন এখানে হয়। সময়ে সময়ে সাধুসভার অধিবেশন ও বিদ্বজ্জন-সমাগমও এখানে হয়।

† স্বরসবাহী বিদ্বমোহপি তথাক্রোহভিনিবেশঃ ॥ (পাতঞ্জলদর্শনম্. সাধনপাদঃ—৯ শ্লোক।)

বহিভূত কারণ হ'তে উৎপন্ন, মৃত্যুর অতীত অভিজ্ঞতা। খুব বড় বড় নান্দুদের মধ্যেও ঈশ্বর পরিমাণে বর্তমান।” মৃত্যু সম্বন্ধে আলোচনাকালে আমার গুরুদেব প্রায়ই বলতেন, “বহুদিন খাঁচায় বন্ধ পাখী যেমন দরজা খুলে দিলেও উড়ে যেতে ইতস্ততঃ করে।”)

অশ্রুধ্বকণ্ঠে আমি মিনতি ক'রে বল্লুম, “গুরুজি, ও কথা বলবেন না! আমার সামনে ওসব কথা আর কখনও উচ্চারণ করবেন না।”

শ্রীবক্তেশ্বর গিরিজীর মুখ প্রশান্ত হাসিতে স্নিগ্ধ হয়ে উঠল। একাশী বছরে পড়ছেন, তবুও তাঁকে দেখতে স্বাস্থ্যবান আর বলিষ্ঠ!

দিনের পর দিন গুরুদেবের নীরব অথচ মুখের স্নেহধারায় অভিমুক্ত হয়ে তাঁর ভাবী তিরোভাবে নানা ইঙ্গিত সব একে একে মন থেকে মুছে ফেল্লুম।

পাঁজিতে তারিখ দেখিয়ে বল্লুম, “ম'শায়, এবারে কুম্ভমেলা এই মাসে প্রয়াগে হচ্ছে।”*

“তুমি কি সত্যিই কুম্ভমেলায় যেতে চাও নাকি?”

শ্রীবক্তেশ্বর গিরিজীর যে আমায় ছাড়তে ইচ্ছে নয়, তা' ঠিকমত বুঝতে না পেরে আমি ব'লে চল্লুম, “প্রয়াগে একবার কুম্ভমেলায় বাবাজীর সঙ্গে আপনার সাক্ষাৎলাভের সে ভাগ্য হ'য়েছিল—বোধ হয় এবারে আমারও সেই রকম সৌভাগ্য লাভ হয়ে যেতে পারে।”

* সুবিখ্যাত চৈনিক পরিব্রাজক হিউয়েন সাঙ, ৬৪৪ খৃষ্টাব্দে প্রয়াগে যে বিরাট কুম্ভমেলা হয়, তাঁর একটি বিবরণ রেখে গেছেন। এই উপলক্ষ্যে উত্তরভারতের বিশাল সাম্রাজ্যের অধিপতি রাজা হর্ষ, মেলায় সমবেত যতী সন্ন্যাসী ও দরিদ্রদিগের মধ্যে তাঁর রাজকোষ উন্মুক্ত ক'রে তাঁর সম্পূর্ণ সঞ্চিত্তন (পাঁচবৎসরের) নিঃশেষে দান করেন। চৈনিক লেখক বলেন যে, রাজা হর্ষের দৈনিক লানধ্যানের মধ্যে ১৫০০ বোদ্ধ ও ব্রাহ্মণসন্ন্যাসীদের ভোজনের ব্যবস্থা ছিল। হিউয়েন সাঙ ভারত ত্যাগ ক'রে চীনদেশে প্রত্যাবর্তনের সময় রাজা হর্ষ কর্তৃক উপহৃত দুপ্রাপ্য ও অমূল্য রত্নরাজি এবং দশসহস্র স্বর্ণমুদ্রা অবহেলায় ত্যাগ ক'রে ৬৫৭ খানি হস্তলিখিত ধর্মগ্রন্থের পুঁথি, অধিকতর মূল্যবান বিবেচনা ক'রে স্বদেশে নিয়ে যান। রাজা হর্ষ অনবদ্য কবিতা ও নাটকের রচয়িতা ছিলেন—এঁর জীবনী, আর, মুখার্জি লিখিত ও ম্যাকমিলান কোম্পানী কর্তৃক প্রকাশিত, “মেন এণ্ড থট ইন্ এন্সিয়েন্ট ইণ্ডিয়া”তে লিখিত হয়েছে, এতে আরও চারটি ভারতসম্ভানের জীবনী আছে, যথা,—যাজ্ঞবল্ক্য, বৈদিকঋষি রাজর্ষিজনকের সহিত ষাঁর ব্রহ্মবিদ্যার আলোচনা হয়েছিল; ভগবান তথাগত; মহান সম্রাট অশোক এবং বিদগ্ধকুলাগ্রগণ্য সমুদ্রগুপ্ত—চতুর্থ শতকের “ভারতীয় নেপোলিয়ন”।

“আমার ত’ মনে হয় না যে তুমি এবারে সেখানে তাঁ’র দেখা পাবে।” বলে তিনি নীরব হয়েই রইলেন—আমার মতলবে বাধা দিবার তাঁ’র কোন ইচ্ছা ছিল না।

তা’রপরদিন সকালে যখন ক্ষুদ্র একটি দল নিয়ে আমি যাত্রার উদ্ভোগ করলুম—গুরুদেব আমায় তখন শুধু নীরবে আশীর্বাদ করলেন। গুরুদেবের যাচরণের অর্থ কি তা’ ঠিক স্পষ্টতঃ আমি তখন অনুমান ক’রে উঠতে পারি নি। তা’র কারণ বোধ হয় আমার গুরুর মহাপ্রস্থান আমায় নিতান্ত নিক্রপায় আর অসহায় ভাবে দেখতে হবে, এটা বোধ হয় ভগবানের যতিপ্রেত ছিল না। আর আমার জীবনে এটা সর্বদাই ধটেছে যে আমার যতি প্রিয়জনের মৃত্যুর সময় ভগবান দয়া করে আমায় সে করুণদৃশ্য থেকে রবাবরই দূরে সরিয়ে রেখে এসেছেন।*

১৯৩৬ সালের ২৩শে জাছুয়ারী আমাদের দলটি কুস্তমেলায় গিয়ে পৌঁছল। প্রায় বিশলক্ষ লোকের জনতা, সে এক বিরাট ও অপূর্ব দৃশ্য। ভারত-বাসীদের, এমন কি দীনতম ক্লবকদের মধ্যেও ঠাকুরদেবতা আর সব সাধু-দয়ালু, যাঁরা ভগবানলাভের জন্তে সংসারের সকল প্রকার বন্ধন ছিন্ন ক’রে, সব কিছু ত্যাগ ক’রে এসেছেন, তাঁ’দের উপর একটা স্বাভাবিক ভক্তি আছে। অবশ্য ভণ্ড আর বুজবুজও সেখানে যথেষ্টই আছে, কিন্তু তবুও ঈশ্বরের কতকগুলি প্রকৃত সাধুসন্ত, যাঁদের আবির্ভাবে সারাদেশ দেবতার আশীর্বাদপূত হয়ে ধ্বংস হয়ে গেছে, কেবল তাঁ’দেরই জন্তে নিষ্কিঁচায়ে সকলকেই ভক্তিপ্রদ্বা প্রদর্শন করে। প্রতীচ্যবাসীরা যাঁরা এ বিরাট দৃশ্য দেখছিলেন তাঁ’রা দেশের নাড়ীর স্পন্দন আর কালের গতির সম্মুখে গরত তা’র আধ্যাত্মিক উৎসাহবলে যে অদম্য প্রাণশক্তি পেরেছে, তা’র দ্বারা একটা অপূর্ব সুযোগ পেলেন।

প্রথম দিন আমাদের শুধু চারদিক ঘুরেফিরে সব দেখে শুনে বেড়িয়ে যাতেই কেটে গেল। এখানে অসংখ্যালোকে পাপক্ষালনের জন্তে হাজার পুণ্যসলিলে অবগাহন করছে, ওখানে কোথাও পূজাহোম বা যাগযজ্ঞ

* আমার মাতা, জ্যেষ্ঠভ্রাতা অনন্তদা, জ্যেষ্ঠাভগিনী রমাদিদি, গুরুদেব, পিতৃদেব এবং আমার অল্পক অন্তরঙ্গ শিষ্যবর্গের কারুরই মৃত্যুসময়ে আমি উপস্থিত ছিলাম না।
পিতা ১৯৪২ খৃঃ অব্দে কলিকাতায় একাশীবৎসর বয়সে পরলোক গমন করেন।)

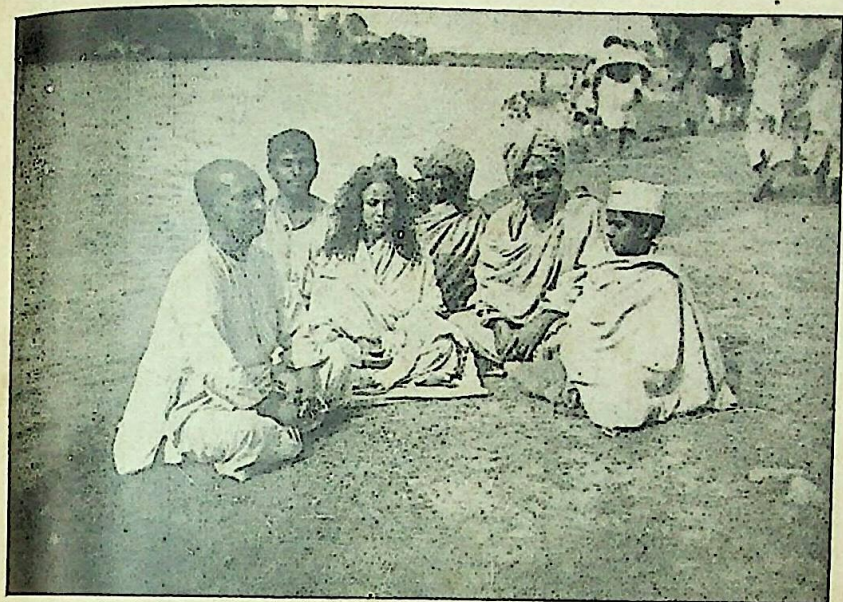
চলছে। কিছু দূরে দেখা গেল সাধুসন্ন্যাসীদের চরণে লোকজন নানা উপকরণ নিয়ে ভক্তিঅর্ঘ্য নিবেদন করছে। মাথা ফিরিয়ে দেখি, সারি সারি হাতীর দল, নানা আভরণে সজ্জিত অশ্বদল, মহরগতি উষ্ট্রের দল সব ধীরে ধীরে চলেছে। আবার দেখা গেল যে সিদ্ধ বা ভেলভেটের নিশান বা কাণ্ডা আর স্বর্ণ বা রৌপ্যের দণ্ড নিয়ে নাগাসন্ন্যাসীর দল সব চলেছে।

কৌপীনধারী সন্ন্যাসীগণ ক্ষুদ্রক্ষুদ্র দলে বিভক্ত হয়ে নীরবে বসে রয়েছেন; তাঁদের শরীর শীতাতপনিবারণের জন্ত ভগ্নাঙ্গুলিষ্ঠ, কপালে একটিমাত্র চন্দনের ফোঁটা—তৃতীয়নেত্রের প্রতীক। গৈরিকবসন, মুণ্ডিতমস্তক, দণ্ডকমণ্ডলু-ধারী সন্ন্যাসীর দল হাজারে হাজারে সেখানে এসে উপস্থিত হয়েছেন। কি শিষ্যদের সঙ্গে ধ্যানালোচনায়, কি ভ্রমণকালে, তাঁদের মুখে ত্যাগের শাস্ত-মহিমার একটা অনির্বাক্য জ্যোতিঃ।

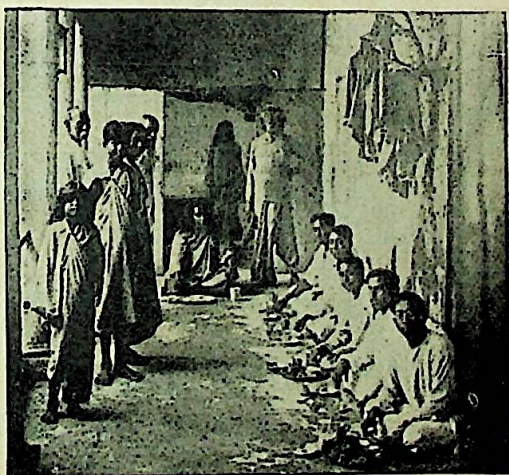
এখানে ওখানে গাছতলায় বড় বড় ধূনি জালিয়ে সাধুরা* সব বসে রয়েছেন, মাথার উপর জটা বিড়ে ক'রে পাকান। কতকগুলির আবার প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড দাড়ি, কয়েকফুট ক'রে লম্বা আবার উগায় একটা ক'রে গাঁট বাধা। তাঁরা নীরবে ধ্যানে বসে আছেন অথবা চলমান জনতাকে হস্তোত্তোলনে আশীর্বাদ বিতরণ করছেন—ভিক্ষুক, হস্তীপৃষ্ঠে রাজামহারাজা, বিচিত্রবর্ণের শাড়ীপরিহিতা নারীর দল—হাতে তাঁদের কারুকার্যশোভিত কঙ্কণ, পায়ে তাঁদের মল, বন্ধার তুলছে রিগিঝিনিঝিনি; কোথাও বা উল্লবাহ সন্ন্যাসী অদ্ভুতভাবে হস্তোত্তোলন ক'রে বসে রয়েছেন; ব্রহ্মচারীদের সঙ্গে রয়েছেন আশা; উপবিষ্ট সাধুদের অসাধারণ স্ব বাইরে থেকে বিশেষ কিছু বোকা যায় না—তাঁদের গান্ধীর্ঘ্য তাঁদের অস্তরের পরমানন্দকে লুকিয়ে রেখেছে। হট্টগোল ছাপিয়ে উঠছে মন্দিরের অবিরত ঘণ্টাধ্বনি।

মেলায় দ্বিতীয়দিনে আমরা নানাআশ্রম আর কুটির বা কোপ্‌ডাতে সাধুসন্ন্যাসীদের দর্শন আর প্রণাম ক'রে ঘুরেঘুরে বেড়ালুম। গিরিসম্প্রদায়ের

* লক্ষ লক্ষ ভারতীয় সাধুগণ ভারতের সাতটি প্রধান ধর্মসম্প্রদায়ের অধিপতি, সাতজন মণ্ডলেশ্বর কর্তৃক গঠিত একটি কার্যনির্বাহক সমিতি কর্তৃক পরিচালিত হন। বর্তমান মহামণ্ডলেশ্বর অর্থাৎ প্রেসিডেন্ট হচ্ছেন জয়েন্ড পুরী। এই মহাপ্রাণ সাধু অত্যন্ত স্বল্পবাক—তিনটি মাত্র বাক্যে তাঁর আলাপ নমাপ্ত—সত্য, প্রেম ও কৰ্ম্ম! এইই হচ্ছে তাঁর প্রচুর বাক্যালাপ।



ভেলঙ্গ স্বামীর শিষ্য শঙ্করী মায়ী জীউ মধ্যস্থলে উপবিষ্টা, পাশেই স্বামী বিনয়ানন্দ ।
১৯১৮ সালে হরিদ্বারের কুম্ভমেলায় ছবি খানি গৃহীত, শঙ্করী মায়ী জীউর
বয়স তখন ১১২ বৎসর ।

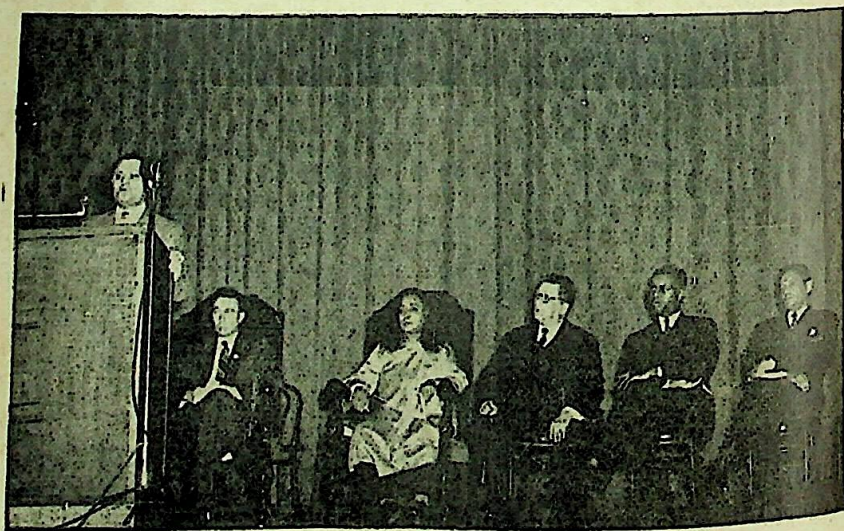


(বামে) কৃষ্ণানন্দ ১৯০৬ সালের কুম্ভমেলায় তাঁর নিরামিষাশী সিংহী সহ উপবিষ্ট ।
(দক্ষিণে) শ্রীরামপুর আশ্রমের দোতলার বারান্দায় ভোজনরত নিমন্ত্রিতগণ ।
মধ্যস্থলে গুরুপদতলে আমি উপবিষ্ট ।



ভারত ভবন

আমেরিকার ক্যালিফোর্নিয়া প্রদেশস্থ, লস্ এঞ্জেলিস্, সহরে পরমহংস যোগানন্দজী কঙ্ক প্রতিষ্ঠিত ভারতীয় শিক্ষা ও সংস্কৃতির কেন্দ্র।



ভারত ভবনের উদ্বোধন উৎসবে উপস্থিত অতিথি গণেরসহিত
উপবিষ্ট পরমহংস যোগানন্দ ।

মণ্ডলেধরের সঙ্গে সাক্ষাৎ হ'তে তাঁ'র আশীর্বাদ লাভ করলুম ; ক্ষীণদেহ, চক্ৰটি তপঃপ্রভাবে স্নিগ্ধোজ্জল ! তাঁ'রপরে আমরা একটি আশ্রমে গেলুম, সেখানকার গুরুমহারাজ নয়বৎসর ধ'রে মৌনব্রত পালন করছেন, একমাত্র ফলই আহার ক'রে থাকেন । আশ্রম হলের মাঝখানের বেদীতে পাগলাচক্ষু নামে একটি অন্ধ সাধু বসে—গভীর শাস্ত্রজ্ঞান তাঁ'র ; সর্বসম্প্রদায় কর্তৃক সম্মানিত ।

• হিন্দীতে বেদান্ত সম্বন্ধে অল্পকিছু বলবার পর আমি সঙ্গীদের নিয়ে সেই শান্তিময় আশ্রমকুঞ্জ পরিত্যাগ ক'রে নিকটবর্তী আর একটি সাধুর আশ্রমে গিয়ে উপস্থিত হ'লুম । সাধুটির নাম কৃষ্ণানন্দ, সুন্দর আকৃতি, রক্তিম গণ্ড, সুদৃঢ় স্বক্ৰদেশ । তাঁ'র পাশেই লম্বমান হয়ে শুয়ে রয়েছে একটি পোষা সিংহী । সাধুটির আধ্যাত্মিক প্রভাবে—অবিশ্রি তাঁ'র বলিষ্ঠ দেহের শক্তির জন্তে নয়, এটা আমি ঠিক জানি !—জঙ্গলের এই হিংস্র মাংসাশী পশুটি সব রকম মাংসাহার পরিত্যাগ ক'রে শুধু ভাত আর দুধ খেয়েই প্রাণধারণ করে । স্বামীজি সেই পিঙ্গলদেহ সিংহীকে 'ওম্' উচ্চারণ করতে শিখিয়েছেন—আর তা' বেরোর বেশ একটা শ্রুতিস্বত্বকর গম্ভীর গর্জনে—বিড়ালের জাত ত', বিড়াল তপস্বী আর কি !

তা'রপর দর্শন হ'ল একটি শিক্ষিত তরুণসাধুর সঙ্গে । রাইট সাহেবের ভ্রমণের দিনলিপি হ'তে তাঁ'র বর্ণনা এখানে উদ্ধৃত হ'ল,—

“আমরা ফোর্ডগাড়ীতে গঙ্গা পার হ'লুম । গঙ্গা এখানে নিতান্ত অগভীর । নৌকোর উপর পোল পার হ'তে ক্যাচ্‌ক্যাচ্‌ শব্দ করে । তাঁ'রপরে সুরু ঝাঁকঝাঁক রাস্তার ভিতর দিয়ে মর্পিলগতিতে চললুম গড়িয়ে গড়িয়ে । পথে যেতে যেতে যোগানন্দজী নদীতীরে যেখানে বাবাজীর সঙ্গে শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজীর সাক্ষাৎ হয়েছিল সেই জায়গাটি আমার দেখালেন । অল্পক্ষণ পরেই আমরা গাড়ী থেকে নেমে কিছুদূর হেঁটে চললুম । রাস্তায় বালিতে পা হড়্‌কে যায়, তাঁ'র উপর ধূনির আগুনের গাঢ়ধোঁয়া । তারপর গিয়ে পৌঁছলুম গড়মাটি দেওয়া ছোট ছোট কতকগুলি কুঁড়েঘরের কাছে । এদেরই মধ্যে একটার সামনে এসে দাঁড়ালুম, নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর একটি অস্থায়ী কুটীর, প্রবেশপথ অতি ক্ষুদ্র, কোন দরজা নাই—এইই হচ্ছে করপত্নীজির আশ্রয় । করপত্নীজি নবীন পরিত্রাজক সাধু । অসাধারণ বুদ্ধিমত্তার জন্ত প্রসিদ্ধ । সেখানে তিনি একগাদা খড়ের উপর পদ্মাসনে বসে আছেন ; তাঁ'র

একমাত্র আচ্ছাদন—আর বোধ হয় তাঁ’র ঐ একমাত্রই সম্পত্তি—একটি গৈরিকবর্ণের বস্ত্রখণ্ড, স্বন্ধের উপর বিলম্বিত !

“কোনরকমে হামাগুড়ি দিয়ে সেই ঝোপড়ার ভিতর ঢুকে প্রণাম সারতেই দেখলুম, মুখে তাঁ’র কি অপরূপ হাসি—বাস্তবিকই স্বর্গীয় স্মরণ্য ভরা, পরমশাস্তি বিকীরণ করছে ; ছুরারের কাছে কেরোসিন লণ্ঠনের আলো মিটমিট করে জলে ছাওয়াদেওয়ালের উপর নানারকম অদ্ভুতমূর্তির সৃষ্টি করছে। তাঁ’র মুখটি, বিশেষতঃ তাঁ’র চক্ষুটি আর স্নন্দর দন্তপংক্তি হাসিতে উজ্জল। তাঁ’র হিন্দীভাষণে আমি একটু বিব্রত বোধ করলেও তাঁ’র ভাব সহজেই বোধগম্য ছিল ; প্রেম, আধ্যাত্মিক গৌরব ও উদ্দীপনায় পূর্ণ তিনি। তাঁ’র বিরাট স্বস্থল্যে কারুরই মনে কোন সন্দেহ থাকে না।

“কল্পনা করুন—সাংসারিক আসক্তিবিশীন, পরমনিশ্চিত, নিকরদেগ ও স্ত্রী জীবন ; অশনবসনের কোন ভাবনা নাই, ভিক্ষারও প্রয়োজন হয় না, একদিন অন্তর পক্কান গ্রহণ করেন—হস্তে ভিক্ষাপাত্র নাই ; সর্বপ্রকার অর্থচিত্তার জটিলতা হ’তে মুক্ত, টাকাকড়ি স্পর্শও করেন না, কোন সঞ্চয় নাই। ভগবানে তাঁ’র সদা গভীর বিশ্বাস ; যাতায়াতের কোন হাঙ্গামা পোহাতে হয় না, গাড়ীতে কখনও চড়েন না ; কিন্তু স্থানান্তরে যেতে হ’লে সর্বদা নদীর ধার দিয়েই যাতায়াত করেন ; কোথাও একস্থায়ী বেশী থাকেন না, পাছে সেখানে মন বসে যায় !

“আর কি বিনয়নম্র ভাব ! বেদে তাঁ’র অসাধারণ পাণ্ডিত্য, বনারস হিন্দু ইউনিভার্সিটির এম, এ, ও শাস্ত্রী উপাধিধারী। তাঁ’র চরণতলে উপবেশন করতে একটা মহান উদারভাব আমার মনে উদয় হ’ল ; বুঝলুম যে, আমি যে সত্যকারের প্রাচীন ভারতের সন্মানে বেরিয়েছি এখানে তাঁ’র উত্তর পেলাম—কারণ আমার কাছে বোধ হ’ল যে এইসব বিরাট বিরাট সাধু-সন্ন্যাসী, মুনিঋষি, যোগীতপস্বিদের দেশের ইনিই হচ্ছেন প্রকৃত প্রতিনিধি।”

করপত্রীজিকে তাঁ’র পরিব্রাজকজীবনের কথা জানতে চেয়ে জিজ্ঞাসা করলুম, “শীতের জন্মে বেশী কাপড়চোপড় রাখেন না ?”

“না, এইই যথেষ্ট !”

“বই সঙ্গে রাখেন কি ?”

“না, বাঁরা আমার কাছ থেকে শুনতে চান, তাঁদের আমি স্মৃতির সাহায্যে শিক্ষা দি।”

“আর কি করেন?”

“গঙ্গার ধারে ঘুরে বেড়াই।”

কি চমৎকার সরল ও সুন্দর জীবন! তাঁর জীবনের মধুর সারল্য, নিরুদ্বেগ শান্তি আর নিশ্চিত জীবনযাত্রা আমার মনকে সবলে আকর্ষণ করলে। আমেরিকার কথা মনে পড়ল আর আমার স্বক্ষে গ্রস্ত নানাকাণ্ডের দায়িত্বভার। কল্প মনে ভাবলুম, “না যোগানন্দ, এ জীবনে গঙ্গার ধারে ঘুরে বেড়ান তোমার চলবে না—অনেক কাষ তোমার এখনও বাকী।”

সাদুটি গুটিকতক আধ্যাত্মিক অনুভূতি আমার কাছে বিরত করবার পর আমি হঠাৎ তাঁকে প্রশ্ন ক’রে বসলুম, “আপনি কি এ সব বর্ণনা শাস্ত্রকথা থেকে বলছেন, না অন্তরের উপলব্ধি থেকে?”

সরল হেসে তিনি উত্তর দিলেন, “অর্ধেক বই থেকে আর বাকী অর্ধেকটা অনুভূতি।”

আমরা বসে রইলুম খানিকক্ষণ সেখানে নীরব ধ্যানের শান্তিতে, উঠতে ইচ্ছা হচ্ছিল না। তাঁর পবিত্রসামিধ্য ত্যাগ ক’রে বাইরে এসে রাইট মাহেবকে বললুম, “রাইট, রাজাকে দেখলে—সোনার খড়ের সিংহাসনের উপর বসে?”

রাত্রে সেই মেলাক্ষেত্রে ভূমির উপর বসেই মুক্ত আকাশের তলায় আমরা মাহারপর্ক শেষ করলুম। শালপাতায় থাওয়া, বাসনকোসন মাজার কোন গলাই নেই!

কুস্তমেলায় আরও ছ’দিন কেটে গেল। তারপরে যমুনার তীর দিয়ে উত্তরপশ্চিম দিকে আগ্রানগরীতে গিয়ে পৌছলুম। তাজমহলের দিকে চাইতে মনে পড়ে গেল, জিতেছে মন্মথস্বপ্নের অপূর্ণসৌন্দর্য্যে অভিভূত হয়ে আমার পাশেই দাঁড়িয়ে!

তারপর চললুম বৃন্দাবনে স্বামী কেশবানন্দজীর আশ্রমে।

কেশবানন্দজীকে খুঁজে বাঁর করবার উদ্দেশ্য ছিল এই পুস্তকসংক্ৰান্ত সাপারে। শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজীর অনুরোধ ছিল যে আমি লাহিড়ী মহাশয়ের গীকনী লিপি, তা’ আমি কখনও ভুলিনি। ভারতবর্ষে অনস্থানকালে যোগাবতার

লাহিড়ী মহাশয়ের আত্মীয়স্বজন আর তাঁর সাক্ষাৎ শিষ্যবর্গের সঙ্গে সংযোগস্থাপনের প্রত্যেকটি সুযোগ আমি গ্রহণ করছিলাম। তাঁদের সঙ্গে আলাপআলোচনা বিস্তারিতভাবে লিপিবদ্ধ করে আমি প্রত্যেকটি ঘটনা সন তারিখ মিলিয়ে নিয়েছি আর ফটোগ্রাফ, পুঁজান চিঠি ও অতীত দলিলপত্রাদিও সংগ্রহ করেছি। লাহিড়ী মহাশয়ের জীবনীর উপকরণ দিন দিন সংগ্রহ করে বেশ বেড়ে উঠল। তাঁরপর একটু ভয়ও হ'ল যে এবার আমার সামনে গুরুতর শ্রমসাধ্য পুস্তকপ্রণয়নের যে বিরাট কর্তব্য এসে পড়েছে—তা' সম্পন্ন করি কি করে। ভগবানের কাছে প্রার্থনা জানালুম যে এই মহাগুরুর জীবনীলেখক হিসাবে আমার কর্তব্য যেন সূচাক্রমে সম্পন্ন করতে পারি। তাঁর শিষ্যদের মধ্যে কারও কারও মনে আশঙ্কা হ'ল যে তাঁদের গুরুর বিষয়ে লিখিত বিবরণে হয়ত তাঁদের গুরুকে খাটো করে ফেলা হ'বে অথবা তাঁর ভুল বর্ণনা দেওয়া হ'বে।

তাঁর এক প্রধান শিষ্য শ্রীপঞ্চানন ভট্টাচার্য্য মহাশয় একবার আমায় বলেছিলেন, “দেবতার যিনি অবতার, তাঁর জীবনী শুধু ছোটো নীরস কথা সাজিয়ে লিখলে কি তাঁর প্রতি পূর্ণ বিচার করা হবে?”

অতীত শিষ্যরাও তেমনি চেয়েছিলেন যে, তাঁদের অমরগুরু তাঁদের অন্তরের অন্তঃস্থলেই লুকোন থাক—তাঁর কথা আর বাইরে প্রকাশ করে কান নেই। যাই হোক তাঁর জীবনী সম্বন্ধে লাহিড়ী মহাশয়ের ভবিষ্যদ্বাণী স্বরণ করে আমি তাঁর বাহ্যজীবনের ঘটনাসকল সংগ্রহ আর তাঁদের সত্যতা প্রমাণের চেষ্টার কোন ক্রটি করিনি।

বৃন্দাবনে কেশবানন্দজী আমাদের সাদর অভ্যর্থনা করলেন তাঁর কাত্যায়নী পীঠ আশ্রমে। বাড়ীটি ইঁটের, বড় বড় কাল থাম দেওয়া—চারিদিকে সুন্দর বাগান। তিনি তখনই আমাদের একটি বৈঠকখানায় নিয়ে গিয়ে বসালেন—লাহিড়ী মহাশয়ের একটি বড় এনলাজ মেন্ট ঘরের মধ্যে শোভা পাচ্ছে। স্বামীজির বয়স নব্বুইএর কাছাকাছি, কিন্তু তাঁর পেশীবহল দেহ হ'তে শক্তি আর স্বাস্থ্যের জ্যোতিঃ বিচ্ছুরিত হচ্ছিল। দীর্ঘকেশ, তুবারশুল শ্রু, চকু দুটি আনন্দে উজ্জল—প্রাচীন ঋষিদের মতই সৌম্যদর্শন। আমি তাঁকে বললুম যে ভারতের গুরুদের সম্বন্ধে আমার পুস্তকে তাঁর বিষয় আমি উল্লেখ করতে চাই।

বড় বড় যোগীরা সাধারণতঃ কোন কিছু প্রকাশ করতে চান না। তবুও আমি একটু হেসে অল্পনয়ের স্বরে বললুম, “দয়া ক’রে আপনার বাল্যজীবনের কথা কিছু বলুন না, শুনি?”

কেশবানন্দজীর ভাবে বিনয় ও নম্রতা প্রকাশ পেল। বললেন, “আমার জীবনে বলবার আর বিশেষ কি আছে? বলতে গেলে আমার সারা জীবনটাই হিমালয়ের নির্জন পাহাড়ে, এক গুহা থেকে আর এক গুহায় পায়ে হেঁটে বেড়িয়ে বেড়াতেই কেটে গেছে। কিছু দিনের জন্তে আমি হরিদ্বারের বাইরে একটা আশ্রম করেছিলুম—চারদিকে বড় বড় গাছের ঝোপে ঘেরা। জায়গাটি খুব শান্তিপূর্ণ। বাজীরা বড় কেউ একটা সেখানে ধেমত না—কারণ জায়গাটাতে অনেক কেউটে সাপের বাসা ছিল।” ব’লে কেশবানন্দজী একটু হেসে আবার শুরু করলেন, “তা’রপর একদিন গঙ্গায় বান এসে আশ্রমটির সঙ্গে সঙ্গে কেউটেসাপগুলোকেও কোথায় ভাসিয়ে নিয়ে চলে গেল তা’কে জানে। তা’রপর আমার শিষ্যদের সাতাষাে বন্দাবনে এই আশ্রমটি তৈরী হয়েছে।”

আমাদের দলের মধ্যে একজন স্বামীজীকে প্রশ্ন ক’রে বসল যে তিনি হিমালয়ের বাঘের হাত থেকে আত্মরক্ষা ক’রতেন কি ক’রে?*

তিনি মাথা নেড়ে বললেন, “হিমালয়ের মতন অত উঁচু একটা আধ্যাত্মিক ভূমিতে বন্যপশুরা কদাচিৎ যোগীঋষিদের উপর অত্যাচার করতে আসে। একবার আমি জঙ্গলের ভিতর বাঘের মুখে পড়েছিলুম। আমার হঠাৎ চিংকারে বাঘটা যেন জমে পাথর হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।” স্বামীজি পুরান কথা মনে ক’রে আবার একটু হাসলেন।

* ব্যাঘ্রকে ভীতিপ্রদর্শনের নানা উপায় আছে। ব’লে বোধ হয়। ফ্রান্সিস্ বাটল্‌স্ নামে জনৈক অষ্ট্রেলিয়ান অভিযাত্রী বর্ণনা করেছেন যে তিনি ভারতের জঙ্গলপ্রদেশকে “বিচিত্র, সুন্দর ও নিরাপদ” বলেই দেখতে পেয়েছেন। তা’র মন্তব্যগুলি ছিল—মাছি আটকাবার কাগজ; তিনি এর কারণ ব্যাখ্যা ক’রে বলেছেন, “প্রতি রাত্রে আমি কতকগুলো মাছিমা’রা কাগজ আমার তাঁবুর চারধারে ছড়িয়ে রাখতুম, তা’র কারণটা হচ্ছে মনস্তাত্ত্বিক। ব্যাঘ্র হচ্ছে এমন একটি প্রাণী যা’র বেশ টনটনে জান আছে। অতি নম্রপণে সে ঘুরে বেড়ায় মানুষকে আক্রমণের জন্তে, তা’রপর যেই সে মাছিমা’রা কাগজের কাছে এসে পৌঁছয়, অমনি সে সরে পড়ে! একবার চট্‌চটে মাছিমা’রা কাগজের উপর বসবার মজা টের পেয়ে আর সে কখনও মানুষের সামনে আসতে সাহস করে না।”

“মাঝে মাঝে এই নির্জনবাস ছেড়ে আমি গুরুদর্শনের জন্ত কালী যেতুম। হিমালয়ের জঙ্গলে অনবরত ঘুরে বেড়ানর জন্তে তিনি আমার খুব ঠাট্টা করতেন।

“একবার তিনি আমার বলেছিলেন, ‘তোমার ভবঘুরে রুত্তি আর ঘুল না দেখছি। হরদমই ত’ এখানেসেখানে ঘুরে বেড়াও। যাক্, রক্ষে যে হিমালয়পাহাড়ের মতন বিরাট জায়গা পেয়েছ, খুব ঘুরে বেড়াতে পারবে।’”

কেশবানন্দজী বলতে লাগলেন, “লাহিড়ীমহাশয়ের তিরোধানের পূর্বে আর পরে বছর তিনি আমার সামনে সশরীরে আবিভূত হয়েছেন। হিমালয়ের উচ্চতাও তাঁ’র মতন লোকের কাছে ত’ অনধিগম্য নয়।”

ঘণ্টা দুই পরে তিনি আমাদের একটি খাবার দালানে সঙ্গে ক’রে নিয়ে গেলেন। আমি সভয়ে একটি নীরব দীর্ঘশ্বাস ফেল্লুম—হায়রে, এখানেও দেখি যে সেই বোড়শোপচারে আহারের ব্যবস্থা! ভারতে এসেছি—এখনও বছর ভর্তি হয় নি, ওজনে পঞ্চাশপাউণ্ড বেড়ে গেছি! তবুও আমার সম্মানে সবত্রে প্রস্তুত এইসব নানাবিধ উপাদেয় ভোজ্যসামগ্রী গ্রহণ করতে অস্বীকার করাটাও অভদ্র-তা’র চূড়ান্তই হ’বে ব’লে মনে হ’ল! ভারতবর্ষে (হায়রে, আর কোথাও নয়!) বেশ দৃষ্টপৃষ্ঠ নধরদেহ সাধু একটি মনোরম দৃশ্যই বটে!*

আহারের পর কেশবানন্দজী একটি নির্জন কোণে আমায় টেনে নিয়ে গিয়ে বললেন, “আপনার আসা আমার কাছে একেবারে অপ্রত্যাশিত নয়, আপনার জন্তে একটা খবর আছে।”

আমি বিস্ময়ে চমকে উঠ্লুম। কেশবানন্দজীকে দর্শন করার মতলব আর কেউত’ জান্ত না, তবে ইনি জানতে পারলেন কি ক’রে?

তিনি বলতে লাগলেন, “গেলবছর হিমালয়ের উত্তরপ্রদেশে বদরী-নারায়ণের কাছে আমি বেড়াতে বেড়াতে পথ হারিয়ে ফেলি। ঘুরতে ঘুরতে দেখি যে বেশ প্রশস্ত একটি গুহা, একবারে খালি, আশ্রয় নিলুম; ভিতরে দেখি যে পাথরের মেঝেতে একটা গর্ভে ধুনির আগুন জলছে। এই নির্জনস্থানে কে বাস করেন? কা’র এ ধুনি? মনেমনে এই সব তোলাপাড় করতে করতে চারদিকে ঘুরে বেড়ালুম কিন্তু কিছুই সেখানে দেখতে পেলুম না। ধুনির পাশে

* আমেরিকায় আসবার পর আমার ওজন ৬৫ পাউণ্ড হ্রাস হয়।

গিয়ে বসে পড়লুম, দৃষ্টি স্থির রাখলুম গুহার প্রবেশ পথের মুখে, সেখান দিয়ে সূর্যের আলো আসছে।

“পিছন থেকে কে যেন ব’লে উঠল, ‘কেশবানন্দ, তুমি এখানে যে এসে পড়েছ তা’তে আমি খুসি হয়েছি।’ চমকে পিছন ফিরে তাকিয়ে দেখি, বাবাজী মহারাজ! অপূর্ব জ্যোতিঃতে উদ্ভাসিত সেই মূর্তি দর্শনে চোখ বন্সে যা’বার উপক্রম। সেই পর্বতকন্দরে মহাগুরু তখন সশরীরে আবিভূত হয়েছেন। বহুবৎসর বাদে পুনরায় তাঁ’র দর্শন লাভ ক’রে আনন্দে অভিভূত হইয়ে তাঁ’র পবিত্র চরণতলে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করলুম।

“বাবাজী বলতে লাগলেন, ‘আমিই তোমায় এখানে এনেছি! সেই জন্মেই তুমি পথ হারিয়ে আমার এই গুহার বাসায় এসে হাজির হয়েছ। আগাদের শেষ সাক্ষাৎ হয়েছিল বহুদিন আগে; যাক, আবার তোমার সঙ্গে দেখা হয়ে আমি খুব খুসীই হয়েছি।’

“তারপর সেই মহামহিমময় অমর মহাগুরু কতকগুলি আধ্যাত্মিক উপদেশের কথা ব’লে আমার আশীর্বাদান্তে বললেন, ‘যোগানন্দের জন্মে তোমায় একটা কথা বলছি। ভারতে ফিরে এসে সে তোমার সঙ্গে দেখা করবে। তাঁ’র গুরু আর লাহিড়ীর জীবিতশিষ্যদের সংক্রান্ত বহুব্যাপারে সে নানাকাষে বিশেষ ব্যস্ত থাকবে। তা’কে বোলো যে, খুবই আগ্রহের সঙ্গে আশা করলেও এবার আমি তাঁ’র সঙ্গে দেখা করতে পারব না; আর এক সময় তা’কে দেখা দেব।’ ”

বাবাজীর মধুর আশ্বাস কেশবানন্দজীর মুখ থেকে শুনে আমার অন্তর গভীরভাবে আলোড়িত হয়ে উঠল। মনের গোপন কোণে একটু ক্ষোভের যে নক্ষর হয়েছিল—তা’ও সঙ্গেসঙ্গে অন্তর্হিত হ’ল। শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজী আগেই না’ ইঙ্গিতে জানিয়েছিলেন, শেষপর্যন্ত তা’ই হয়ে দাঁড়াল—কুন্তুমেলাতে বাবাজীর সাক্ষাৎ পাওয়া গেল না, তা’র জন্মেও আর দুঃখ রইল না।

আশ্রমে একরাত্রি আতিথ্যলাভ ক’রে তা’র পরদিন বৈকালে কলকাতার নিকে আমাদের দল রওনা হ’ল। যমুনার পোলের উপর দিয়ে গাড়ী চলল, সন্ধ্যাবনের দিক্চক্রবালরেখার অপূর্ব মহিমময় সৌন্দর্য্য চোখের সামনে ভেসে উঠল—সূর্য্য তখন সারা আকাশে আগুনের হোলি খেলে পাটে বসেছেন;

যমুনার স্তিরজলে সে বড়ের ছায়া প্রতিবিম্বিত হয়ে নদীর জল রক্তরাঙা ক'রে তুলেছে।

শ্রীকৃষ্ণের মধুর বাল্যলীলার পুণ্যস্থতিতে যমুনাতীর পবিত্র। গোপিনীদের সঙ্গে এখানে তিনি বাল্যকালে সরল মধুর লীলা প্রদর্শন করেন—ঈশ্বরের অবতার আর তাঁর ভক্তজনের মধ্যে যে চিরন্তন ভগবৎপ্রেম বর্তমান, তাঁর লীলায় তাইই প্রকটিত। বহু পাশ্চাত্য টিকাকার শ্রীকৃষ্ণের জীবন সন্যাক্ত উপলব্ধি করতে পারেন নি—অনেকেই ভুল বুঝেছেন।* শাস্ত্রের রূপক শুধু

* বাইবেল বা অজ্ঞাত বুদ্ধশাস্ত্রের মত হিন্দুধর্মশাস্ত্রসমূহেও প্রাচীন অন্তর্নিহিত ভাবসকল সঙ্গে সঙ্গে ব্যক্ত করা হয় নি। পূর্ববর্তী চীনদেশীয় পণ্ডিতগণ কর্তৃক হিন্দুধর্মশাস্ত্রের প্রতি যে সম্ভ্রান্ত প্রদর্শিত হয়েছিল তা' বাস্তবিকই প্রশংসাহ। ভারতীয় ধর্মশাস্ত্র অধ্যয়ন করবার উৎসাহে তাঁরা চীনদেশ হতে ভারতবর্ষে আগমনের সূচী আঁর বিপজ্জনক পথ অতিক্রমের দারুণ ক্রেশ সানন্দ বহন করেছিলেন। সপ্তম শতাব্দীর ই-এসিঙ্ নালন্দা মঠের বিশ্ববিদ্যালয়ে দশবৎসর অতিবাহিত করেন আর চীনে প্রত্যাবর্তনের সময় বৌদ্ধ ধর্মশাস্ত্র হ'তে প্রায় ৫,০০,০০০ পাঁচ লক্ষ শ্লোক সংগ্রহ ক'রে নিয়ে যান। কতকগুলি চীনা পণ্ডিতদের লিখিত বিবরণ স্ত্রামুয়েল বীলের "বুটিষ্ট্ রেকর্ডস অফ্ দি ওয়েষ্টার্ন ওয়াল্ড"-এর ইংরেজি অনুবাদে (চীনবাসীদের নিকট ভারতবর্ষ প্রতীচী ব'লে পরিচিত ছিল) : চীনের "হিউয়েন সাঙ-এর জীবনী" (উপরোক্ত উভয় গ্রন্থই কেগান পল, ট্রেঞ্চ, ট্রাবনার—লণ্ডন হ'তে প্রকাশিত) : আর টনাস ওয়াটার্স-এর "অন্ যুন চাঙ্ (হিউয়েন সাঙ্) ট্রাভেল্ ইন্ ইণ্ডিয়া, ৬২৯-৬৪৫ খৃঃ পূঃ" (রয়েল এশিয়াটিক সোসাইটি, ১৯০৪-৫), এতেও পাওয়া যায়। বিহারের নালন্দা (ন+অলম্+দা) বিশ্ববিদ্যালয়, যা'র সহস্র সহস্র বিদ্যাধিগণের মধ্যে চীন ব্যতীত এশিয়ার অজ্ঞাত অংশেরও বহু যুবক ছিল, প্রাচীন ভারতের বহু বিরাট শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে কেবল মাত্র একটি। স্মরণাতীতকাল হতে কাশী শিক্ষাস্থলের মধ্যে সর্বপ্রাণ্য। উত্তরপশ্চিম প্রদেশে তক্ষশীলা বিশ্ববিদ্যালয় যেখানে "চতুর্বেদ ও অষ্টাদশ পুরাণ" বিদ্যাধিগণকে শিক্ষা প্রদত্ত হ'ত, আলেকজান্ডারের (খৃঃ পূঃ ৪র্থ শতক) সঙ্গে আগত গ্রীক বৈজ্ঞানিকগণ তাঁর বহুল প্রশংসা ক'রে গেছেন। এই সব বিরাট বিশ্ববিদ্যালয়গুলির প্রত্যেকটি তা'দের বিস্তারিত পাঠ্যতালিকা থাকা সত্ত্বেও কতকগুলি বিষয়ে বিশিষ্ট দক্ষতার খ্যাতি অর্জন করেছিল যেমন, উচ্ছয়িনী—গণিত ও জ্যোতির্বিজ্ঞান : তক্ষশীলা—ভৈষজ্যবিজ্ঞান, ব্যবহারশাস্ত্র এবং শিল্প ও কারুবিদ্যা : কাশী, নালন্দা, পাটলিপুত্রের নিকট ছেতবন বিহার এবং দক্ষিণভারতের কাম্বিপুত্র—ব্রহ্মবিদ্যা, জ্যোতিষশাস্ত্র, সাহিত্য ও দর্শন।

নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রগণ সম্বন্ধে হিউয়েন সাঙ-ব'লেন যে, তা'দের শীলবত্তা ও চরিত্র, পুত ও অনিন্দনীয় : নৈতিক উপদেশ তা'রা বিশ্বস্তভাবেই পালন করে : সজ্ঞারাম বা বিহারের বিধিনিয়ম সকল অত্যন্ত কঠিন।" সাতশত বৎসরের মধ্যে মাত্র কয়েকটি শান্তিপ্রদানের প্রয়োজন উপস্থিত হয়েছিল। "নালন্দাভ্রাতা" কথাটি পৃথিবীর সর্বত্রই সম্মান আকর্ষণ করত। "অপূর্ব কারুকাব্য শোভিত চূড়া এবং পরীস্থানের সৌন্দর্য্যবিশিষ্ট মিনারেটগুলি উর্ধ্বমুখ পর্বতশিখরের মতই শোভা পেত : সর্বোচ্চতল এবং মান-মন্দিরগুলি প্রাতঃকালীন কুজ্জলিকার মধ্যে অদৃশ্য হয়ে যেত।"

পূর্ববর্তী চৈনিক পরিব্রাজকগণ ভারতীয় সমাজের বহু উজ্জ্বল চিত্র অঙ্কিত ক'রে গেছেন। দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের সময় (পঞ্চম শতকের প্রথমভাগ) কা হিয়েন তাঁর ভারতবর্ষে নয়বৎসর অবস্থানকালের একটি বিশদ বিবরণ লিখে রেখে গেছেন। তিনি বলেন, "সারা দেশের মধ্যে কেউই কোনপ্রকার প্রাদিহত্য করে না অথবা মদ্যপান করে না তা'রা শূকর অথবা পক্ষিপালন করে না : গবাদি পশু

অদ্বীতবিশ্ব লোকেদের মনের ধারণার অতীত। জৈনিক অত্ববাদকের একটি নারায়ণক ভুল এখানে উদাহরণস্বরূপ উদ্ধৃত করা যেতে পারে। গল্পটি মধ্য-বৃগের এক উচ্চদরের সাধক চর্য্যকার রবিদাস সম্বন্ধে। সমগ্র মানবজাতির মধ্যে যে আধ্যাত্মিক মহিমা লুকিয়ে, তা' তিনি নিজ বৃত্তির ভাবায় সরল প্রাণে গেয়েছিলেন,—

“বিশাল নীল গগন মাঝে,

চন্দ্রে ঢাকা ঠাকুর রাজে।”

একজন পাশ্চাত্য রূতবিশ্ব লেখকের রবিদাসের কবিতার একটা ‘পথচলতি’ এই ব্যাখ্যা শুনে আর কেউ হাস্ত সম্বরণ করতে পারবেন না। ব্যাখ্যাটি হচ্ছে এই,—

“তিনি তারপর একটি কুটির নির্মাণ করেন, তা'তে একটি মূর্তি প্রতিষ্ঠা করলেন। মূর্তিটি চন্দ্রে নির্মিত। তারপর সেটি পূজা করা শুরু করলেন।”

রবিদাস ছিলেন ভক্তশ্রেষ্ঠ কবীরের গুরুভ্রাতা। রবিদাসের বিশিষ্ট শিষ্যবর্গের মধ্যে ছিলেন চিতোরের রানী। তিনি গুরুর সম্মানে একবার এক বিরাট ভোজে বহু ব্রাহ্মণকে চিতোরে নিমন্ত্রণ করেন। কিন্তু জাত্যাভিমানী ব্রাহ্মণগণেরে গর্কিত নিমন্ত্রিতের দল নীচ মুচির সঙ্গে একত্র আহ্বান করতে দ্বন্দ্বত হলেন না। তাঁ'রা বসলেন এক স্বতন্ত্র ঠাইয়ে—নিজেদের গুচিভা নবদ্বৈ রক্ষা ক'রে, জাত বাঁচিয়ে। তখন হ'ল এক ভারি মজা, নিমন্ত্রিত ব্রাহ্মণবটুরা দেখলেন যে, তাঁ'দের প্রত্যেকের পাশে এক একজন ক'রে রবিদাস বসে। কারুরই পাশ খালি নেই! ব্যাপার দেখে ত' সকলেই অবাক। বা'ক্, ফলে হ'ল এই যে এই ব্যাপারের পর গোঁড়ামি আর তট্টা বজায় রইল না। চিতোরে একটা বিরাট আধ্যাত্মিক জাগরণ পানিত হ'ল।

আমাদের ছোট দলটি অল্প কয়েকদিনের ভিতরেই কলকাতায় গিয়ে পৌছল। শ্রীবুদ্ধেশ্বর গিরিজীর সঙ্গে দেখা করবার আগ্রহ নিয়ে এসে শুনে

কোন প্রকার ক্রয়বিক্রয় নাই। কসাইখানা অথবা মদচোলাইএর কোন কারখানা নাই। ভ্রমণশীল ব্রহ্মপুত্রোহিত প্রভৃতি অথবা আবাসীদের জন্য অন্ন বস্ত্র ও গদিপিছানাদিমেত বাসগৃহসমূহ সদাসর্বদাই প্রস্তুত থাকত আর এ ব্যবস্থা সকলজাই অনুসৃত হ'ত। পুরোহিতেরা ব্রত পূজাপার্বাদির অনুষ্ঠান হইয়া পোতপাঠাদিতে রত থাকতেন; অথবা ধ্যানধারণাদিতে কালনির্বাহ করতেন। কা' হিয়েন কোন যে ভারতবাসীরা স্থানী, নং ও নমুনিশালী ছিল। মুতাদও অপরিচিতই ছিল।

হতাশ হলাম যে তিনি শ্রীরামপুর আশ্রম থেকে পুরী চলে গেছেন। পুরী কলকাতার প্রায় তিনশত মাইল দক্ষিণে অবস্থিত।

৮ই মার্চ তারিখে শ্রীঅতুলচন্দ্র রায়চৌধুরী নামে এক গুরুভ্রাতা—ইনি গুরুদেবের একজন কলকাতার শিষ্য, একটা টেলিগ্রাম পাঠালেন, “পুরী আশ্রমে এখুনিই চলে আসুন!” টেলিগ্রামের সংবাদ কাণে পৌঁছেতেই এর অর্থ কি বুঝতে আর দেরী হ’ল না—পা ছুটো ভেঙ্গে পড়ল—নতজানু হয়ে ভগবানের কাছে আঁকুল প্রার্থনা জানাতে লাগলাম, গুরুদেবের জীবন যেন এ যাত্রা তিনি রক্ষা ক’রে দেন। ট্রেন ধরবার জন্তে বাড়ী থেকে বেরোতেই অন্তরের মধ্যে এক দৈববাণী শুনতে পেলুম,—

“পুরীতে আজ রাত্রে যেও না। তোমার প্রার্থনা সফল হবার নয়।”

হৃৎখে যন্ত্রণায় অভিভূত হয়ে বললাম, “প্রভু, পুরীতে গেলে যে তোমার আমার মধ্যে জীবনমৃত্যুর টানাটানি চলবে, সে ত তোমার ইচ্ছা নয় দেখছি; সেখানে গেলে ত’ গুরুদেবের জীবন বাঁচবার জন্তে আমার অবিরত প্রার্থনা তোমায় সবই বিফল ক’রে দিতে হবে। তবে কি আরও উচ্চতর কর্তব্যের আহ্বানে তাঁকে তোমার কাছেই ফিরে যেতে হবে?”

আমার অন্তরের বাণী শিরোধার্য্য ক’রে সে রাত্রি ত’ আমি পুরী যাত্রা স্থগিত রাখলাম। তাঁর পরদি নসন্ধ্যাবেলা গাড়ীতে চড়ে বসলাম। তখন প্রায় সাতটা বাজে। একটা ঘন কৃষ্ণবর্ণ স্তম্ভ মেঘ হঠাৎ কোথা থেকে এসে আকাশ আচ্ছন্ন ক’রে ফেললে।* তারপরে দেখলাম আমাদের ট্রেন যখন পুরীর দিকে ছুটে চলেছে, শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজীর মূর্তি তখন হঠাৎ আমার সম্মুখে আবিভূত হ’ল। তাঁকে দেখলাম আসনে উপবিষ্ট, অত্যন্ত গম্ভীর মূর্তি, তাঁর দুইধারে দুইটি আলো।

করযোডে অহুন্নয় ক’রে বললাম,—“সব কি শেষ হয়ে গেছে?”

তিনি একটু মাথা নেড়ে ধীরে ধীরে অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

তাঁর পরদিন পুরী প্ল্যাটফরমে দাঁড়িয়ে, সব আশাই তখন ঘুচে গেছে—আর বাকী রইল কি ভাবছি এমন সময় একটি অপরিচিত লোক আমার কাছে উপস্থিত হ’য়ে বললে, “গুনেছেন কি, আপনার গুরুদেব দেহরক্ষা করেছেন?” ব’লেই আর একটিমাত্র কথা না করেই লোকটা চলে গেল; লোকটা যে

* এই সময় শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজী দেহত্যাগ করেন—সন্ধ্যা ৭টা, ৯ই মার্চ ১৯৩৬।

কে আর আমাকে এখানেই বা কি করে খুঁজে পাবে বা তা' সে জান্লে কি করে তা'র কোনও খোঁজখবর কখনও করি নি।

চলৎশক্তি লোপ পেয়েছে, পা টলছে, হতভয় হয়ে প্লাটফর্মের দেওয়াল ধরে দাঁড়িয়ে পড়লুম—বুঝলুম যে নানাউপায়ে আমার গুরুদেব আমায় এই জরুরিবিদারী ঘটনা জানাতে চাচ্ছেন। মনের মধ্যে একটা প্রচণ্ড বিদ্রোহের ঝড়। অন্তর অগ্নিগর্ভ আগ্নেয়গিরির মত। পুরী আশ্রমে পৌছবার সময় আমার ত' একেবারে সঙ্গীন অবস্থা। অন্তরের বাণী তখন স্নিগ্ধস্বরে ধ্বনিত হচ্ছে—
“দৈর্ঘ্য ধর, শাস্ত হও, স্থির হও!”

আশ্রমের ঘরে প্রবেশ করলুম, গুরুদেবের দেহ কল্পনাভীতভাবে জীবন্তের মত, পরাসনে উপবিষ্ট—তখনও স্বাস্থ্য আর কন্যায়তায় অঙ্গ সমৃদ্ধ, মহাসমাপিতে মগ্ন হয়েছেন। তাঁর তিরোধানের অল্প কিছুদিন আগে তাঁর একটুমাত্র জর হয়েছিল, তা'রপর তাঁর স্বর্গারোহণের পূর্বদিবসে তাঁর দেহ সম্পূর্ণভাবে স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল। যতবারই তাঁর প্রিয়মুর্তির দিকে বারবার তাকাই না কেন, আমি কিছুতে বুঝতে পারছি না যে প্রাণ তাঁর দেহ ত্যাগ করে চলে গেছে। তখনও তাঁর গাত্রচর্ম মৃণ্ময় আর কোমল; আননে তাঁর একটা স্বর্গীয় পরমানন্দময় শান্তির ভাব প্রকটিত। রহস্যময় অস্তিম আত্মানন্দের শেষমুহুর্তে তিনি সজ্ঞানে দেহত্যাগ করেছেন।

অভিভূতের মত চিৎকার করে বলে উঠলুম, “বাংলার সিংহ আজ চলে গেল।”

১০ই মার্চ তারিখে আমি তাঁর পারলৌকিক কৃত্যাদি সম্পন্ন করলুম। পুরী আশ্রমের বাগানের মধ্যে সাধুসন্ন্যাসীদের প্রাচীন শাক্তবিধি অনুসারে শ্রীবৃক্তেশ্বর গিরিজীর পুণ্যদেহের সমাধি* দেওয়া হ'ল। পরে এক মহাবিবুধ সংক্রান্তিতে, তাঁর তিরোভাব উৎসবে গুরুর প্রতি শ্রদ্ধানিবেদনের জন্য রেদুবাগুর হ'তে তাঁর বহুশিষ্য সেখানে সমবেত হয়েছিলেন। কলিকাতার প্রসিদ্ধ অমৃতবাজার পত্রিকায় তাঁর চিত্রসম্বলিত নিম্নলিখিত এই বিবরণটি প্রকাশিত হয়,—

“২১শে মার্চ তারিখে পুরীধামে, শ্রীমৎ স্বামী শ্রীবৃক্তেশ্বরগিরি মহারাজ

* হিন্দুধর্মে শেখকৃত্যাদিতে গৃহদেব পক্ষেই দাহের ব্যবস্থা আছে। সাধুসন্ন্যাসী প্রভুত্বদেব না করে সমাধি দেওয়া হয় (অবশ্য মাঝে মাঝে তা'র ব্যতিক্রমও হয়)। সাধু প্রভুত্বদেব দেহ জ্ঞানগ্রহণের সময় জ্ঞানাপ্তিতে দগ্ধ বলে বিবেচিত হয়।

৮১ বৎসর বয়সে মহাপ্রয়াণ করেন। তিরোভাব উপলক্ষ্যে ভাণ্ডারা দেওয়া হয়, এজ্ঞ তাঁর বহুশিষ্য পুরীধামে উপস্থিত হয়েছিলেন।

“স্বামী মহারাজ কাশীধামের যোগিরাজ শ্রীশ্রীশ্রীমাচরণ লাহিড়ী মহাশয়ের শিষ্য ছিলেন। তিনি ছিলেন শ্রীমদ্ভগবতগীতার একজন শ্রেষ্ঠ টিকাকার ও ব্যাখ্যাতা। স্বামী মহারাজ ভারতবর্ষে যোগদা সংসদ্বের কয়েকটি কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠাতা—আর যোগপ্রচারের প্রধান উৎসাহস্থল ছিলেন। এই যোগ-প্রচারকার্য তাঁর প্রধান শিষ্য স্বামী যোগানন্দ পশ্চিমে বহন করে নিয়ে যান। শ্রীবুদ্ধেশ্বর গিরিজীর ভবিষ্যদৃষ্টি আর তাঁর গভীর উপলব্ধি স্বামী যোগানন্দকে সমুদ্রযাত্রা করে আমেরিকায় গিয়ে ভারতের ধর্মগুরুদের বাণী প্রচারে উদ্বুদ্ধ করে।

“তাঁর গীতা ও অজ্ঞাত শাস্ত্রগ্রন্থের ব্যাখ্যা শ্রীবুদ্ধেশ্বর গিরিজীর প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শনশাস্ত্রসম্বন্ধে গভীর জ্ঞানের পরিচয় প্রদান করে, আর তা’ প্রাচ্য আর প্রতীচ্যের ঐক্যসাধনে সকলের কাছে পথপ্রদর্শক স্বরূপ হয়ে আছে। শ্রীবুদ্ধেশ্বর গিরিজী সকল ধর্মবিশ্বাসের মূলগত ঐক্যে বিশ্বাস করতেন বলে তিনি বিভিন্ন সম্প্রদায় ও মতের প্রধানপ্রধান ব্যক্তিদের সাহায্যে ‘সাধুসভা’ নামে একটি সভা স্থাপন করেন, ধর্মের মধ্যে বৈজ্ঞানিক ভাবের সঞ্চারের জন্তে। তাঁর মৃত্যুকালে তিনি ‘সাধুসভা’র সভাপতি হিসাবে স্বামী যোগানন্দ গিরিজীকে তাঁর উত্তরাধিকারী মনোনীত করে যান।

“ভারত আজ এরূপ একজন মহৎ ব্যক্তিকে হারিয়ে বাস্তবিকই অধিকতর দীন হয়ে পড়ল। তাঁর সঙ্গলাভের সৌভাগ্য তাঁদের হয়েছিল, শ্রীবুদ্ধেশ্বর গিরিজীর মধ্যে যে ভারতীয় সংস্কৃতি ও সাধনার ভাব মূর্ত হয়ে উঠেছিল তা’ তাঁদের মধ্যে প্রসারিত হোক।”

কলকাতায় ফিরলুম। তাঁর সহস্র পুণ্যানুতিনিজ্জড়িত শ্রীরামপুর আশ্রমে ফিরবার মতন আমার মন এখনও ঠিক হয় নি দেখে তাঁর সেই প্রকৃত নামে ছোট শিষ্যটিকে শ্রীরামপুর আশ্রম থেকে ডেকে আনিয়ে রাঁচি বিদ্যালয়ে ভর্তি করার সব বন্দোবস্ত ঠিক করে দিলুম।

প্রকৃত আমার বন্ধু ছিল, “যেদিন সকালে আপনি এলাহাবাদে কুস্তমেলার যাবার জন্তে বেরিয়ে পড়লেন, গুরুজী সোফার উপর ধপ্ করে বসে পড়ে বলতে লাগলেন, ‘যোগানন্দ চলে গেল, এঁয়া, যোগানন্দ চলে গেল? তা’হলে

তা'কে ত' দেখছি অত কোন উপায়ে বলতে হ'বে।' তা'রপর ঘটাকতক ধ'রে নিথর নিষ্পন্দ হয়ে বসে রইলেন।"

তারপর আমার দিনগুলো কাটতে লাগল বক্তৃতা দেওয়া, ক্লাস নেওয়া, দেখাসাক্ষাৎ করা আর পুরান বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে পুনর্মিলনের মধ্য দিয়ে। শুকনো হাসির তলার চাপা আর অবিরত কন্দ্ব্যস্ত জীবনের মধ্য দিয়ে একটা বন অন্ধতমিশ্র বিনাদের শ্রোত বা' ব'য়ে চলেছিল, তা' আমার সকল অমুভূতির বাণুতটের মধ্য দিয়ে ছ'কুল পরিপ্লাবিত ক'রে যে আনন্দের নদী এতদিন ধ'রে অবিরামগতিতে বয়ে চলেছিল তা' একেবারে পক্ষিল ক'রে তুললে।

শোকদিশ্রু বিনাদশিত্র অন্তর থেকে একটা নীরব ক্রন্দন অবিরাম ধ্বনিত হয়ে উঠতে লাগল, "দেবতা আমার, গুরুজি আমার, কোথায় গেলেন?"

কোন উত্তর এল না!

মন শুধু এই আশ্বাস দিলে, যাত্র এইটুকু সাস্থনা পেলাম যে "গুরুদেবের সেই পরমানন্দময়ের সাথে পরিপূর্ণ মিলন হয়েছে। তিনি সেই অনন্তস্বর্গে সেই অমরলোকে আজ চিরবিরাজমান।"

মন ডুকরে কঁদে উঠে বললে, "আর ত' তুমি কখনও তাঁ'কে শ্রীরামপুরের বাড়ীতে দেখতে পাবে না। আর ত' তুমি তোমার বন্ধুবান্ধবদের ডেকে এনে তাঁ'কে দেখিয়ে সগর্বে বলতে পারবে না, 'তোমরা দেখ গো সব দেখ, ঐ ভারতের জ্ঞানাবতার বসে রয়েছেন।'"

জুন মাসের গোড়ার দিকে রাইট সাহেব বোম্বাই থেকে আমাদের সবাইকার যা'বার ব্যবস্থা ক'রে ফেললে। মে মাসের দিন চৌদ্দ বিদায় অভিনন্দন বক্তৃতা দিতে কলকাতায় কাটাবার পর, মিস্ ব্লেচ্, মিষ্টার রাইট আর আমি ফোর্ডগাড়ীতে ক'রে বোম্বাইএর পথে বেরিয়ে পড়লাম। আমাদের এসে পৌঁছবার পর জাহাজ কর্তৃপক্ষ আমাদের যাত্রা স্থগিত রাখবার জন্তে বললে, কারণ ফোর্ডগাড়ীটির সে জাহাজে স্থান হ'বার কোন উপায় ছিল না অথচ ইউরোপে আবার সেটিকে নিতান্তই দরকার।

মুখ অন্ধকার ক'রে রাইট সাহেবকে আমি বললাম, "কুছ পেরোয়া নেই, আমি আবার পুরীতেই ফিরে যাব।" মনে মনে বললাম, "গুরুজীর সমাধি যাবার আমায় দুটিবিন্দু নয়নের জলে সিক্ত হয়ে উঠুক।"

৪৩শ পরিচ্ছেদ

শ্রীমুক্তেশ্বর গিরিজীর পুনরুত্থান

বোম্বাইয়ের রিজেন্ট হোটেলে আমার ঘরের ভিতর বসে আছি। রাস্তার ওপারে একটা প্রকাণ্ড উঁচু বাড়ী। চারতলার ঘরের খোলা বড় জানালার ভিতর দিয়ে তাঁর ছাতের দিকে চেয়ে আছি—হঠাৎ চোখের সামনে একটা অদ্ভুত দৃশ্য ভেসে উঠল। একটা বিরাট অত্যুজ্জ্বল জ্যোতির্লিঙ্গগুলের মধ্যবর্তী ভগবানের অবতার শ্রীকৃষ্ণের পূর্ণাবয়ব পুণ্যমূর্তির আদির্ভাব। কি অপরূপ সে রূপের মাধুরী! নীলেন্দ্রবরতুল্য সুন্দর স্ত্রীমাং দেহে সে কি স্নিগ্ধ গ্রামকান্তি; নয়নে করুণাময়িধারা, অধরে ভুবনভোলান অপরূপ কি সে মধুর হাসি! চেয়েই রইলুম—চেয়ে চেয়ে চোখ আর ফেরে না, আশা আর মেটে না—“জনম জনম হাম রূপ নিরখিছু, নয়ন না তিরপিত ভেল।”

বহুজন্মের সাধনার ধন, বহু তপস্কার ফল পূর্ণব্রহ্ম নারায়ণ দর্শনদানে কৃতার্থ ক’রে আজ আমার মূঢ়হাসিতে মাথা নেড়ে ডেকে কি ইঙ্গিত করছেন। তাঁর ইঙ্গিতের মর্ম্ম সম্যক অবগত হতে না পারাতে তিনি আশীর্বাদ ক’রে প্রস্থান করলেন; জীবন ধাড়া হ’ল, মন অনাবিল গভীর আনন্দরসে পরিপূর্ণ হ’য়ে উঠল—বুঝলুম কোন ভবিষ্য আধ্যাত্মিক ঘটনার এ একটা পূর্বসংসার!

আমার পশ্চিমগমন তখন সাময়িকভাবে স্থগিত রইল। বাংলায় ফিরে আসবার পূর্বে বোম্বাইয়ে আমার গোটাকতক বক্তৃতা দেবার ব্যবস্থা হয়েছিল।

১৯৩৬ সালের ১৯শে জুন তারিখে বেলা ৩টা নাগাদ বোম্বাইয়ের হোটেলে আমার বিছানার উপর বসে আছি—সেটা আমার শ্রীকৃষ্ণের মূর্তি-দর্শনের ঠিক এক সপ্তাহ পরে—হঠাৎ একটা অপরূপ সুন্দর স্বর্গীয় জ্যোতিঃ-ক্ষুরণে আমার ধ্যান টুটে গেল। আমার উন্মুক্ত আর বিশ্ময়বিস্ফারিত

নয়নের সন্মুখে এক অদ্ভুত পরিবর্তন ঘটে গেল—সারা ঘরটা যেন একটা অপরূপ জগতে রূপান্তরিত হ'ল। স্বর্ঘ্যালোক পরিবর্তিত হয়ে এসে দাঁড়িয়েছে এক স্বর্গীয় আলোর দীপ্তি!

চোখের সামনে দেখলুম, রক্তমাংসের শরীরে শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজী আমার সামনে দাঁড়িয়ে! প্রচণ্ড আনন্দের স্রোত আমার সর্বশরীর দিয়ে ব'য়ে গেল। গুরুদেবের মুখে অমিয়নিবান্দী দেবত্বভ ভ্রমধুর হাসি! স্নিগ্ধকোমল কণ্ঠে বললেন, 'বৎস যোগানন্দ!'

জীবনে এই প্রথম গুরুর চরণতলে নতজানু হয়ে প্রণাম করতে ভুলে গেলুম। কিন্তু মুহূর্তমধ্যে তাঁকে বাহ্যগুণে আঁকড়িয়ে ধ'রে আমার ত্বনিত ক্ষুধার্ত হৃদয়ে আকর্ষণ করবার জগ্গে মন উদ্দাম হয়ে উঠল। অপূর্ব মুহূর্ত! গত কয়েকমাসের বিরহবন্ত্রণাক্লিষ্ট মনের গুরুভার লঘু হ'য়ে গিয়ে আজকের এই আনন্দের পাগলাবোরার মাঝে তলিয়ে গিয়ে কোথায় হারিয়ে গেল, তা'কে জানে?

“গুরুজি আমার, অন্তরের ধন, কেন আপনি আমায় ছেড়ে গেলেন—কেন, কেন?” আনন্দে উন্মত্ত হয়ে কি যে সব তখন আবোলতাবোল বক্তে লাগলুম কিছুই তা' মনে নেই। “কেন আপনি আমায় কুন্তমেলায় বেতে দিলেন? আপনাকে ছেড়ে চলে আসার ভুলের জগ্গে নিজেকে যে কি পরিমাণ শাস্তি দিয়েছি তা' আর কি বলব!”

“বাবাজীর সঙ্গে আমি প্রথম যেখানে সাক্ষাৎ লাভ ক'রেছিলুম, সে তীর্থস্থান দর্শন করবার তোমার সুখের আশায় ত' আমি বাধা দিতে ইচ্ছা করি নি। তোমাকে ছেড়ে এসেছি এই ত' অল্প কিছু সময়ের জগ্গে; আবার ত' তোমার কাছে ফিরে এসেছি।”

“কিন্তু, কিন্তু গুরুদেব, একি সত্যিই কি আপনি সেই ঈশ্বরের সিংহ, ধামাদের মহাগুরু জ্ঞানাবতার? পুরীর নিষ্ঠুর মাটির তলায় যে দেহ সমাধি দিয়ে এসেছি, আপনি কি সেই রকম একটা দেহ ধারণ ক'রে আসেন নি? বলুন! বলুন!”

“হ্যাঁ, বৎস; আমিই সেই! এটা রক্তমাংসেরই শরীর জেনো! যদিও আমার কাছে এটা স্থূল কিন্তু তোমার দৃষ্টিতে এটা জড়দেহ। তোমার স্বপ্ন-জগতের পুরীধামে স্বপ্নবালুকার নীচে বিশ্বস্বপ্নে গড়া যে জড়দেহ সমাধি

দিয়ে এসেছ ঠিক তা'রই মত একটি সম্পূর্ণ নূতন দেহ আমি মহাব্যোমপরমাণু থেকে সৃষ্টি ক'রে নিয়েছি। সত্যি কথা বলতে গেলে মৃত্যবস্থা থেকে আমি পুনরুত্থিত হয়েছি—তা' এ পৃথিবীতে নয়—স্বপ্ন জগতে। পৃথিবীর লোকেদের চেয়ে সেখানকার অধিবাসীরা আমার উচ্চাবস্থার সম্মুখীন হ'তে বেশী সমর্থ। সেখানে তুমি আর তোমার অতি আদরের প্রিয়তম আত্মীয়-স্বজনেরা এককালে সকলেই আমার কাছে আসবে।”

“মরণঞ্জয়ী গুরুদেব, বলুন বলুন, আরও কিছু আমায় বলুন!”

গুরুজী একটু দ্রুত উচ্চহাস্য ক'রে বললেন, “আরে বাপু, ছাড়, ছাড়, একটু চিলে ক'রে ধর!”

“আচ্ছা, কেবল একটুখানি!” অষ্টপদ অক্টোপাসের মত নাগপাশে আমি তাঁ'কে প্রাণপণে জড়িয়ে ধরেছিলুম—যে বাঁধুনি কমে আমি তাঁ'কে ধ'রে-ছিলুম তা'তে তিনি তা' বলবেন বই কি! তা' বাক্—তাঁ'র কথায় আমার দৃঢ়সম্বন্ধ আলিঙ্গন কিঞ্চিৎ শিথিল ক'রে দিতে হ'ল। পূর্বে তাঁ'র শরীরের যে বৈশিষ্ট্য ছিল ঠিক সেই একই রকম মৃদু সুরভির স্বাভাবিক গন্ধই টের পেলাম। যখন সেই আনন্দোজ্জ্বল গৌরবময় পরমমুহূর্ত্তগুলির কথা মনে পড়ে, তখন তাঁ'র সেই দিব্যশরীরের প্রাণোন্মাদনাকারী স্পর্শ আজও আমার দুইবাছ ও করতলের মধ্যে অনুভব করি।

শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজী বলতে লাগলেন, “জড়জগতে মানুষকে কর্মক্ষয়ের জ্ঞান সাহায্য করতে মহাপুরুষেরা যেমন প্রেরিত হন—আমিও তেমনি এক স্বপ্নজগতে মুক্তিদাতারূপে কায করবার জন্মে ঈশ্বর কর্তৃক আদিষ্ট হয়েছি। আমি যেখানে এসেছি সে জায়গাটার নাম হচ্ছে হিরণ্যলোক। সেখানে আমি উচ্চস্তরের জীবদের তা'দের স্বপ্নজগতের কর্মফল থেকে মুক্ত হয়ে স্বপ্নজগতে পুনর্জন্ম থেকে মুক্তি পাবার জন্মে সাহায্য করছি। হিরণ্যলোক-বাসীরা আধ্যাত্মিকতায় খুব উচ্চাবস্থা লাভ করেছেন; তা'দের মধ্যে সকলেই তাঁ'দের শেষ পার্থিবজন্মে মৃত্যুকালে সমাধিমগ্ন হয়ে সজ্ঞানে দেহত্যাগ করবার ক্ষমতা ধ্যানবলে লাভ করেছেন। আর পৃথিবীতে বারা সবিকল্প সমাধির অবস্থা অতিক্রম ক'রে নির্বিকল্প সমাধির উচ্চাবস্থায় না পৌঁছেছেন, তাঁ'দের মধ্যে কেউই হিরণ্যলোকে প্রবেশ করতে পারেন না।*

* সবিকল্প সমাধিতে সাধক আধ্যাত্মিক উন্নতিবলে অস্তরে ঈশ্বরের সহিত মূল্যবস্থা লাভ করতে

“হিরণ্যালোকের অধিবাসীরা সাধারণ প্রেতলোকের স্তরগুলি অতিক্রম করে এসেছেন যেখানে মৃত্যুর পর পৃথিবীর প্রায় সকল প্রাণীদের যেতে হয়; সেই সব প্রেতলোকে তাঁরা তাঁদের বহু প্রাক্তনকর্মের অঙ্কুরের বিনাশ সাধন করে এসেছেন। খুব অগ্রসর আর উচ্চস্তরের জীব ছাড়া পরলোকে এরকম মুক্তিসাধক কাণ্ড আর কেউ কৃতিত্ব আর সাফল্যের সঙ্গে করতে পারে না। তারপর তাদের হৃদয়শরীরের মধ্যে অবস্থিত আত্মাকে বিন্দুমাত্রও কর্মের গুণবিন্দন কেটে পরিপূর্ণ মুক্তি দেবার জন্যে বিশ্ববিধানে পরিচালিত হয়ে এই সব উচ্চস্তরের জীব হিরণ্যালোকে নূতন দেহ ধারণ করে আবার পুনরায় জন্মগ্রহণ করে। হিরণ্যালোক হচ্ছে পরলোকের স্বর্গ বা পারলৌকিক স্বর্গ, যেখানে তাঁদের সাহায্য করবার জগ্গেই আমি পুনরুত্থিত হয়েছি। অবশ্য হিরণ্যালোকে আরও অধিকতর উচ্চাৱস্থার জীব আছেন, যারা আরও শ্রেষ্ঠ, সূক্ষ্মতর, কারণজগৎ হ’তে এসেছেন।”

গুরুদেবের মনের সঙ্গে আমার মনের এখন এমন পরিপূর্ণ ঐক্য সংসাদিত হয়েছিল যে তিনি আংশিক বাক্যের দ্বারা আর আংশিক চিন্তাপরিচালনার দ্বারা আমার মনে একটি সম্পূর্ণ শব্দচিত্র অঙ্কিত করে দিচ্ছিলেন। তা’ই তাঁর মূর্ত্ত ভাবসকল আমি অতি সহজেই গ্রহণ করতে সমর্থ হয়েছিলুম।

গুরুদেব বলতে লাগলেন, “তুমি ত’ শাস্ত্রে পড়েছ যে ঈশ্বর মানবাত্মাকে পর্যায়ক্রমে তিনটি শরীরে আবদ্ধ করে রেখেছেন—ভাব অথবা কারণশরীর; হৃদয় আতিবাহিক দেহ—মানবের মানসিক আর ভাবপ্রকৃতির স্থান; তারপর এই পাঞ্চভৌতিক জড়দেহ। মানুষ পৃথিবীতে এসে তা’র জড় ইঞ্জিয়ানু-ভূতিগুলি লাভ করে। কিন্তু একজন আত্মিক তা’র চেতনজ্ঞান, অনুভব আর “প্রাণকণিকা”* সংগঠিত দেহ নিয়ে কাণ্ড করে। কারণশরীরধারী জীব

পারেন বটে কিন্তু তাঁর এই সমাধিতে তিনি নিশ্চল তন্দ্রাবস্থা ভিন্ন অবস্থান করতে পারেন না। দীর্ঘ ও গভীর ধ্যানের সাহায্যে তিনি আরও উচ্চতর অবস্থা নিকটবর্ত্ত সমাধির অবস্থায় আরোহণ করতে পারেন, যেখানে থেকে তিনি ঈশ্বরোপলব্ধিচ্যুত না হয়ে তিনি সংসারে ইচ্ছামত বিচরণ করেন, এবং সাংসারিক কর্তব্য সকলও পালন করেন।

কল্প মানে কাল, সবিকল্প মানে কাল অথবা পরিবর্ত্তনের অধীন; প্রকৃতি অথবা জড়ের সঙ্গে তাঁর কিছু সংযোগ থাকে। নিকটবর্ত্ত মানে কালাতীত, নিত্য, “নিকৌজ”।

* শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজী “প্রাণ” শব্দটি ব্যবহার করেছিলেন; আমি একে “লাইফ-ট্রন” অথবা “প্রাণকণিকা” (?) ব’লে উল্লেখ করেছি। হিন্দুশাস্ত্রে যে কেবল শুধু “অণু” এবং পরমাণু অথবা হৃদয়তর পরমাণবিক শক্তির উল্লেখ আছে তাই নয়; “প্রাণ” অর্থাৎ “স্বজনকম প্রাণকণিকাশক্তি”রও

আনন্দময় ভাবরাজ্যে বিচরণ করে। আমার কাব হচ্ছে তাঁদের সঙ্গে, বা'রা কারণজগতে প্রবেশ করবার জন্তে তৈরী হচ্ছেন।”

“পূজ্যপাদ গুরুদেব, বলুন বলুন, পরজগৎ সম্বন্ধে আরও কিছু আমায় বলুন।” তখনও কিছু শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজীকে আমি তেমনি আকড়ে ধরে, যদিও তাঁর অনুরোধে একটু আলুগা করে আমি তাঁকে ধরেছিলুম, কিছু একেবারে ছাড়িনি। তখনও হুঁহাত দিয়ে তাঁকে জড়িয়ে ধরে। আর ছাড়বই বা কি করে, আমার জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ ধন, আমার হারান রতন আজ ফিরে পেয়েছি—আর পেয়েছিই বা কি রকম করে—আমার গুরুদেব আজ মৃত্যুকে দলিত, মণিত, পর্যাদস্ত করে আমার কাছে এসে এখন পৌঁছেছেন, তখন তাঁকে কি আজ আর ছাড়তে পারি ?

গুরুদেব বলতে লাগলেন, “এমন সব হৃদয়জগৎ বা গ্রহ আছে যেখানে বহু বহু আল্লিকের বাস। সেই সব গ্রহবাসীরা হৃদয়স্তর অথবা আলোকপিণ্ডের সাহায্যে গ্রহ হ'তে গ্রহান্তরে পরিভ্রমণ করেন—বিদ্যুৎ আর তেজস্ক্রিয়শক্তি সকলের চাইতেও দ্রুততর।

“আল্লিক বা পারলৌকিক জগৎ কিসের তৈরী জান ? আলোক আর বর্ণের বিভিন্ন হৃদয়স্পন্দনে সে সব গঠিত, আর তারা' হচ্ছে এই জড়বিশ্ব হতে শত শত গুণ বড় ! এই সমগ্র বিশ্বশ্রুতিটা একটা ছোট্ট কঠিন বুড়ির মত পরলোকের স্তরের প্রকাণ্ড আলোর বেলুনের তলায় বুলুছে ! মহাশূন্যে যেমন আমাদের জড়জগতের বহু সূর্য্যচন্দ্র গ্রহনক্ষত্ররা সব পরিভ্রমণ করে, পরলোকেও তেমনি অসংখ্য সৌর আর নক্ষত্রজগৎ আছে। তাঁদের গ্রহনক্ষত্রদেরও তেমনি চন্দ্রসূর্য্য আছে, তা'রা আমাদের এই জড়জগতের চন্দ্রসূর্য্যের চেয়ে ঢের ঢের বেশী সুন্দর। পরলোকের জ্যোতিষ্কমণ্ডল আমাদের পৃথিবীর মেরুচ্ছটার ছায় দেখতে—পরলোকের সূর্য্যমেরুচ্ছটা স্নিগ্ধকিরণ চন্দ্রমেরুচ্ছটার চেয়ে অধিকতর উজ্জ্বল। পরলোকের দিনরাত পৃথিবীর দিনরাতের অপেক্ষা দীর্ঘতর।”

“পরলোক এখানকার চেয়ে অপরিমিত সুন্দর, পরিচ্ছন্ন, পবিত্র আর সুশৃঙ্খল। সেখানে কোন নিজ্জীব গ্রহ বা অন্তর্কর ভূমি নাই। আমাদের

উল্লেখ আছে। অনুগমনার্থ বা বিহ্বলিতনসকল অন্ধশক্তি : “প্রাণ” স্বতঃই চৈতন্যময়। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে যে, শুক্রকীট এবং গীড়িষে “জীবনীশক্তিবিশিষ্ট প্রাণকণিকা”(?)সকল কর্ম-বন্ধাপ্রসারে জগৎবৃদ্ধির গতি নিয়ন্ত্রণ করে।

এই পৃথিবীর অভিশাপগুলো—আগাছা, জীবাণু, পোকামাকড়, সাপ প্রভৃতি—সেখানে একবারেই নাই; পৃথিবীর মত সেখানে পরিবর্তনশীল জলবায়ু বা ঋতু নাই; সেই সব গ্রহে আছে চিরবসন্তের নাতিশীতোষ্ণ বায়ু আর মাঝেমাঝে আলোকোজ্জ্বল স্তম্ভ তুবারপাত আর বিচিত্রবর্ণের আলোকবৃষ্টি! পরলোকের গ্রহে আছে বিচিত্রবর্ণের হ্রদ, উজ্জ্বল সমুদ্র, আর রামধনু-রঙের নদী।

“সাধারণ যে প্রেতলোক—যা’ হিরণ্যালোকের সূক্ষ্মতর পরলোকের স্বর্ণ নয়—সেখানে পৃথিবী হ’তে মৃত বা তৎপূর্বে আগত কোটি কোটি আত্মিকের দ্বারা পূর্ণ; আর আছে সেখানে অসংখ্য পরী, মৎসনারী, মৎসকুল, জীবজন্তু, অপদেবতা, বামন, উপদেবতা আর প্রেতাত্মাসকল—এরা বিভিন্ন প্রেতলোকে তা’দের নিজ নিজ কৰ্ম্মাছুসারে স্থান পেয়েছে। নানাবিধ স্তরের অট্টালিকা অথবা স্পন্দনভূমি মুক্ত বা হুঁষ্ট আত্মিকদের জগ্রে বাবস্থা করা আছে। মুক্তাত্মারা সর্বত্র অবাধে বিচরণ করতে পারেন কিন্তু হুঁষ্ট আত্মাদের গতিবিধি নির্দিষ্ট স্থান পর্য্যন্ত সীমাবদ্ধ। পৃথিবীতে যেমন মানুষ ধরাপৃষ্ঠে বাস করে, মাটিতে কীটপতঙ্গ, জলেতে মৎসকুল, আকাশে পক্ষী তেমনি বিভিন্নস্তরের আত্মিকগণের জগ্রে বিভিন্নস্তরের উপযুক্ত স্পন্দনবিশিষ্ট স্থান বাসের জগ্রে নির্দিষ্ট করা আছে।

“যে সব পতিত দেবদূতেরা অথ জগৎ হতে বিতাড়িত হ’য়ে এসে পড়ে, তা’দের মধ্যে “প্রাণ”পরমাণবিক বোমা অথবা মানসিক মন্ত্রশক্তির সাহায্যে সংঘর্ষ বা যুদ্ধ বাধে।* তা’রা প্রেতলোকের অন্ধকারাচ্ছন্ন নিম্নস্তরে বাস ক’রে তা’দের হুঁষ্ট কৰ্ম্মক্ষয় করে।”

“এই যে প্রেতলোকের অন্ধকার কারাগার তা’র উপরে যে সকল বিরাট-ভূমি রয়েছে সেখানে যা’ কিছু আছে সবই উজ্জ্বল, সবই সুন্দর। পরজগৎ যাবতঃই ঈশ্বরের অভিপ্রায় আর পূর্ণতালাভের পরিকল্পনায় পৃথিবী অপেক্ষা অধিকতর উপযোগী। সূক্ষ্মজগতের প্রত্যেক বস্তুই প্রধানতঃ ঈশ্বরের ইচ্ছায়

* এইসব মন্ত্র হচ্ছে উচ্চারিত শব্দবীজ, যা’ মনে মনে গভীর ধ্যানসংযোগে কামানের মত সব নিষ্কণ্টক হয়। পুরাণে দেবাত্মদের মধ্যে এইরূপ মন্ত্রযুদ্ধের বিষয় বর্ণনা করা আছে। একবার এক অশুর একটি দেবতাকে শক্তিশালী মন্ত্রপ্রয়োগে হত্যা করার চেষ্টা করে। কিন্তু ভুল উচ্চারণবশতঃ মন্ত্র সব প্রতিক্রিয়াশীল হয়ে বিপরীত ক্রিয়াপ্রকাশে অবশেষে সেই অশুরকেই হত্যা করে।

আর আংশিকভাবে আত্মিকগণের ইচ্ছার আস্থানে প্রকাশিত হয়। ঈশ্বরসৃষ্ট যে কোন বস্তুর আকৃতি বা কমণীয়তার পরিবর্তন বা পরিবর্দ্ধন করবার ক্ষমতা এইসব আত্মিকগণের আছে। ভগবান তাঁ'র পরলোকের সন্তানদের পরজগতে স্বল্পবস্তুর ইচ্ছামাত্র পরিবর্তন বা পুনঃসংযোজনের স্বাধীনতা আর বৈশিষ্ট্য দান করেছেন। পৃথিবীতে কোন কঠিন বস্তুকে তরল বা অথ কোন আকারে পরিবর্তিত ক'রতে হ'লে স্বাভাবিক কিম্বা রাসায়নিক প্রক্রিয়ার আবশ্যক, কিন্তু পরলোকের কোন কঠিনবস্তু, তৎক্ষণাৎ সেখানকার তরল বা বায়বীয় অথবা কোন প্রকার শক্তিতে পরিণত হয়, সেখানকার অধিবাসীদের একমাত্র ইচ্ছাশক্তিবলেই।”

গুরুদেব বলতে লাগলেন, “পৃথিবী আজ জলে, স্থলে, অন্তরীক্ষে, সর্বত্র বৃদ্ধবিগ্রহ আর হত্যাকাণ্ডে কলঙ্কিত, কিন্তু পরলোকের রাজ্যে একটা সুখময় সাম্য আর সুসঙ্গতির শান্তি চিরবিরাজমান। স্বল্পশরীরীগণ ইচ্ছামাত্র রূপ পরিগ্রহ করতে পারেন বা অদৃশ্য হ'তে পারেন। সেখানকার ফুল, মাছ বা জীবজন্তু, সাময়িকভাবে তা'দের নিজেদেরকে পরলোকবাসীদের মূর্তিতে রূপান্তরিত করতে পারে। সকল স্বল্পদেহীদেরই যে কোন আকৃতি ধারণ করবার স্বাধীনতা আছে, আর তা'রা অতি সহজে পরস্পরের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করতে পারে। কোনরকম স্থির, নির্দিষ্ট, প্রাকৃতিক নিয়ম তা'দের বেঁধে রাখেনি—উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে যে, পরলোকের একটা গাছ থেকে সেখানকার আম, কিম্বা অথ কোন ফল, ফুল বা যে কোন ঈষিত বস্তু সফলতার সঙ্গে উৎপন্ন করা যেতে পারে। অবশ্য কৰ্ম্মজনিত কতকগুলো পার্থক্য রয়েছে বই কি, কিন্তু পরলোকে বিভিন্ন প্রকারের আকৃতিধারণে ইচ্ছার মধ্যে কোন প্রভেদ নাই। সেখানকার সবই ভগবানের সৃষ্টির আলোকে দেদীপ্যমান !

“নারীগর্ভে সেখানে কারুর জন্ম হয় না ; সন্তান আবির্ভূত হয় বিশিষ্ট রূপধারণ ক'রে, পরলোকের মূর্ত্যপ্রকাশে, সেখানকার অধিবাসীদের ইচ্ছাশক্তির সাহায্যে। সত্ত্ব জড়দেহমুক্ত জীব পরলোকের পরিবারের মধ্যে এসে পড়ে তা'দের আস্থানে—একই রকম মানসিক আর আধ্যাত্মিক বৃত্তির আকর্ষণে।

“স্বল্পদেহ শীতোষ্ণ বা অথ কোনপ্রকার প্রাকৃতিক অবস্থার বশীভূত নয়। স্বল্প শরীরসংস্থানে আছে স্বল্পমস্তিষ্ক অর্থাৎ জ্ঞানালোকের সহস্রদল

পদ্ম, আর সুধুম্বা নাড়ীতে ছয়টি প্রস্ফুটিত পদ্ম বা স্তম্ভমস্তিস্ক-কশেরুচক্র।
 দুঃপিণ্ড স্তম্ভমস্তিস্ক থেকে মহাজাগতিক শক্তি আর আলোক গ্রহণ করে
 আর তা' স্তম্ভমায় এবং দেহকোষ অথবা "প্রাণকণিকা"সমূহে পরিচালনা
 করে। পরলোকবাসীরা "প্রাণকণিকা"শক্তি অথবা মন্ত্রশক্তিবলে তা'দের
 শরীরের উপর ক্রিয়া প্রকাশ করতে পারে।

"স্তম্ভশরীর হ'চ্ছে শেষ জড়দেহের অবিকল প্রতিলিপি। আত্মিকদের
 দেহ তা'দের পূর্বজনমের পাণ্ডিত্যদেহের যৌবনকালীন অবস্থার মত ; কখন
 কখনও তা'রা ইচ্ছা করলে, এই আমার মত, তা'দের বৃদ্ধবয়সের মূর্তিও
 ধারণ করতে পারে।" ব'লেই গুরুদেব যৌবনমূলভ উল্লাসের সঙ্গে হাসিতে
 উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন।

তা'রপর শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজী বলতে লাগলেন, "স্তম্ভজগৎ তিন
 আয়তনের বিস্তৃতিবিশিষ্ট পঞ্চেন্দ্রিয়গ্রাহ্য জড়জগতের মতন নয়, সেখান-
 কার বিভিন্নস্তর, আর একটি ইন্দ্রিয়, বস্তুেন্দ্রিয়—যা'কে অমুভব ব'লে, তা'র
 দ্বারা সব কিছু দেখা যায়। মাত্র কেবল সহজ মানসিক অমুভূতি দ্বারা
 সকল স্তম্ভশরীরীরা দেখা, শোনা, গন্ধ, স্পর্শ, স্বাদ গ্রহণকরা, সব কাষই
 চালাতে পারে। তা'দের তিনটি নয়ন, দুটি সাধারণতঃ অন্ধনির্মীলিত থাকে।
 আর তৃতীয়টি—যেটি প্রধান, সেটি কপালের মাঝখানে লম্বাঅস্থিভাবে থাকে,
 সেটি উন্মুক্ত। আত্মিকদের সকল প্রকার বহিরিন্দ্রিয়ই আছে—চক্ষু, কণ,
 নাসিকা, জিহ্বা, স্বক,—কিন্তু তা'রা শরীরের যেকোন অংশ দিয়েই অমুভব-
 শক্তির সাহায্যে সব রকম ইন্দ্রিয়ামুভূতিই পেতে পারে ; কণ, নাসিকা,
 এমন কি চর্ম্মের সাহায্যেও তা'রা সব কিছু দেখতে পারে। জিহ্বা বা চক্ষুর
 সাহায্যে তা'রা শ্রবণ করতে পারে কিম্বা কণ বা স্বকের সাহায্যে তা'রা
 আশ্বাদ গ্রহণ করতে পারে, এমনি সব আর কি।*

"মানুষের জড়দেহ অসংখ্য বিপদের সম্মুখীন, আর তা' সহজেই
 আঘাতপ্রাপ্ত বা অঙ্গহীন হতে পারে ; কিন্তু ইথারের আত্মিকদেহ কখন
 কখনও হয় ত' বা কেটে যেতে বা আঘাতপ্রাপ্ত হ'তে পারে, কিন্তু ইচ্ছামাত্র
 তা' আবার সুস্থ হয়ে উঠতে পারে।"

* এমন কি এই পৃথিবীতেও হেলেন কেলার এবং অন্যান্য অনন্তসাধারণ বিরলজনের মধ্যে একরূপ
 শক্তির উদাহরণের অভাব নাই।

“গুরুদেব, পরলোকবাসীরা কি দেখতে সবাই সুন্দর ?”

শ্রীবক্তেশ্বর গিরিজী উত্তর দিলেন, “স্বপ্নজগতে সৌন্দর্য্য হচ্ছে একটা আধ্যাত্মিকগুণ, সেটা কোন বাহ্যিক সৌন্দর্য্য নয়। কাষে কাষেই পরলোকবাসীরা মুখের সৌন্দর্য্য বাড়ানর দিকে আর বেশী নজর দেয় না। কিহু তা’দের আর একটা বিশেষ সুবিধা আছে এই যে, তা’রা ইচ্ছামাত্র বর্ণোজ্জল নব আঙ্গিকদেহ গঠন ক’রে নিতে পারে। উৎসব উপলক্ষ্যে পৃথিবীর মানুষেরা যেমন নতুন কাপড়চোপড় পরে, আঙ্গিকেরাও তেমনি সেইরকম কোন উপলক্ষ্যে বিশেষ কোন রূপ ধারণ ক’রে নিজেদের সুসজ্জিত করবার সুযোগ লাভ করে।

“হিরণ্যলোকের মত পরলোকের উচ্চতর স্বপ্নস্বরে পারলৌকিক আনন্দোৎসব শুরু হয়, যখন কোন জীব আধ্যাত্মিক উন্নতিবলে আঙ্গিক জগৎ হ’তে মুক্তিলাভ ক’রে কারণজগতের স্বর্গে প্রবেশ করবার জন্তে প্রস্তুত হয়। এইসব উপলক্ষ্যে আমাদের নয়নের অগোচর পরমপিতা পরমেশ্বর, আর যে সব সাধুসন্তরা তাঁ’র কোলে আশ্রয় পেয়েছেন, তাঁ’রা তা’দের ইচ্ছামত রূপধারণ ক’রে পারলৌকিক উৎসবে যোগদান করেন। তাঁ’র প্রিয়ভক্তকে সন্তুষ্ট করবার জন্তে ভগবান যে কোন ঈশ্বিত রূপ ধারণ করেন। শুদ্ধাভক্তি নিয়ে সাধনা করলে ভক্ত তাঁ’কে জগজ্জননীমূর্তিতে দর্শন পায়। যীশুখৃষ্টের কাছে ভগবানের পিতৃভাবই অগ্ৰাভ্য ভাবের চেয়ে বেশী প্রিয় ছিল। সৃষ্টিকর্তা তাঁ’র সৃষ্টজীবদের প্রত্যেককে যে স্বাভিত্তা, যে স্বাধীনতা দিয়েছেন, তা’তে ক’রে ভগবানের অনন্তরূপের মধ্যে, যতরকম সম্ভাব্য আর অসম্ভাব্য আকাঙ্ক্ষা আছে, তা’রা তা’র প্রার্থনা করে, কাষেই ভক্তের মনোবাঞ্ছা পূরণ করতে তাঁ’কেও সেইপ্রকার রূপ ধারণ ক’রে তা’দের তৃপ্ত করতে হয়।” গুরুদেব আর আমি দুজনেই একসঙ্গে হেসে উঠলুম।

বাঁশীর মতন মনোহর সুমধুরস্বরে শ্রীবক্তেশ্বর গিরিজী বলতে শুরু করলেন, “অগ্ৰাভ্য জনমের বন্ধুরা পরস্পর পরস্পরকে অতি সহজেই চিন্তে পারে! দুঃখ আর মোহময় পার্থিবজীবনের অবসানকালে প্রেমের অবিনশ্বরতা সম্বন্ধে যে সন্দেহ উপস্থিত হয়, আবার তা’রা পরস্পরের সঙ্গে মিলিত হওয়ার সুযোগ পেয়ে আর অক্ষয় বন্ধুত্বের আনন্দ উপভোগ ক’রে তা’রা প্রেমের অমরত্ব সহজেই উপলব্ধি করতে পারে।

“সুন্দরীরাীদের অল্পভব অন্ধকার যবনিকা ভেদ ক’রে পৃথিবীর মাছুষের সমস্ত ক্রিয়াকলাপই দেখতে পায়, কিন্তু মাছুষে পরলোকের কিছুই দেখতে পায় না—যতক্ষণ না তা’র বস্টেন্দ্রিয় অন্ততঃ কতকটাও পরিপুষ্টি লাভ করে। অবশ্য এটাও সত্যি যে হাজার হাজার পৃথিবীর লোকে অন্ততঃ ক্ষণিকের জন্তেও পরলোক বা সেখানকার অধিবাসীদের দেখা পেয়েছে।

“হিরণ্যলোকের উচ্চাবস্থাপ্রাপ্ত অধিবাসীরা পরলোকের দীর্ঘ রাত্রি বা দিবসের অধিকাংশভাগই পরমানন্দময় জাগ্রত অবস্থায় যাপন করে আর তা’দের কাষ হচ্ছে বিশ্ব নিয়ন্ত্রণব্যাপারে জটিলপ্রশ্নের সমাধান, আর পৃথিবীবদ্ধ আত্মা, সংসারবদ্ধ জীবের মুক্তিসাধনে সাহায্য করা। হিরণ্যলোকের অধিবাসীরা নিদ্রা গেলে মাঝে মাঝে তা’দের স্বপ্নের মত আত্মিকদর্শন লাভ হয়। তা’দের মন সাধারণতঃ চেতন, নির্বিকল্প সমাধির সর্বোচ্চ অবস্থার অনাবিল আনন্দে নিমগ্ন থাকে।

“কিন্তু তা’হ’লে কি হয়, পরলোকের সকল অংশের অধিবাসীরা তবুও মানসিক দুঃখ, কষ্ট, যন্ত্রণাভোগের অধীন থাকে, তা’ থেকে তা’দের একেবারে পূর্ণ মুক্তিলাভ তখনও ঘটেনা। হিরণ্যলোকের মত গ্রহের উচ্চতর জীবদের সংবেদনশীল মনে কোন সদাচরণ অথবা সত্যোপলব্ধি বিষয়ে কোন ভুলভ্রান্তি উপস্থিত হ’লে তা’রা দারুণ যন্ত্রণাই ভোগ করে। এই সব উচ্চাবস্থার জীবেরা তা’দের প্রত্যেক কার্য বা চিন্তা আধ্যাত্মিকবিধি অনুসারে নিয়ন্ত্রিত করার জন্তে প্রাণপণে চেষ্টা করে।

“পরলোকবাসীদের মধ্যে পরস্পরের সঙ্গে সংযোগরক্ষা সম্পূর্ণভাবে পারলৌকিক দূরদর্শন বা দূরশ্রবণ ব্যাপারের সাহায্যেই সম্পাদিত হয়; লেখ্য আর কথ্য ভাষার মধ্যে যে ভুল বোঝাপড়া পৃথিবীর লোকেদের মধ্যে হ’তে বাধ্য, সেরকম কোন গোলমাল বা ভুলভ্রান্তি কখনও সেখানে হয় না। সিনেমার পর্দায় যেমন কতকগুলি আলোর ছবির সাহায্যে লোকেরা চলাফেরা করছে, কাষকর্ম করছে বা হাত পা নাড়ছে দেখে বোধ হয়, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা’রা কোন শ্বাসপ্রশ্বাস ত্যাগ করে না, তেমনি পরলোকবাসীরাও উপরিচালিত আর সুবিম্বল আলোর ছবিদের মতই চলাফেরা করে, কাষকর্ম করে, তা’র জন্তে তা’দের অল্পজ্ঞান থেকে শক্তিগ্রহণের কোন প্রয়োজন হয় না! মাছুষকে জীবনধারণের জগ্ন নির্ভর করতে হয়, কঠিন, তরল, বায়বীয়

পদার্থ সমূহ আর শক্তির উপর আর পরলোকবাসীরা প্রাণধারণ করে থাকে প্রধানতঃ মহাকাশের আলোক বা বিশ্বজ্যোতির উপর।”

জিজ্ঞাসা করলুম, “গুরুদেব, পরলোকবাসীরা কিছু খায় কি?” গুরুদেবের পরলোকতত্ত্বের অপূর্ব ব্যাখ্যা আর সেখানকার বিশদ বিবরণ আমি আমার সকল গ্রহণক্ষম মনোবৃত্তি—আমার সমস্ত মন, হৃদয় আর আত্মা দিয়ে যেন পান করছিলাম। সত্যের অতীন্দ্রিয় অল্পভূতি শাস্ত্রতত্ত্ব এবং আর অপরিবর্তনীয়। কিন্তু ক্ষণস্থায়ী ইন্দ্রিয়ানুভূতি আর মনের মধ্যে যে ছাপ, তা’ সাময়িক বা আপেক্ষিকভাবে সত্য ব’লে বোধ হওয়া ছাড়া আর বেশী কিছু হয় না, আর স্মৃতির মধ্যে তা’দের স্পষ্টতা অতি শীঘ্রই হারিয়ে যায়। আমার গুরুদেবের কথাগুলি আমার মানসপটে এমন গভীরভাবে মুদ্রিত হয়ে গিয়েছে যে, আমায় মনকে সেই অবস্থায় উপনীত করে আমি সেই দিব্য অভিজ্ঞতা যে কোন সময়ে পুনরুজ্জীবিত করতে পারি।

তিনি উত্তর করলেন, “পরলোকের মৃত্যুকাতে উজ্জল আলোর রশ্মির মত তরিতরকারী জন্মে। পরলোকবাসীরা এইসব তরিতরকারী আহার করে আর পরলোকের নদী, স্রোতস্বিনী আর উজ্জল আলোকের উৎস হতে প্রবাহিত অমৃতধারা পান করে। ইথার তরঙ্গের মধ্য থেকে যেমন লোকেদের মৃত্তি-সকল টেলিভিশন (দূরদর্শন) যন্ত্রসাহায্যে ধরে দৃষ্টিগোচর করা যায় আবার তা’ মহাশূন্যে মিলিয়ে দিতে পারা যায়, তেমনি ঈশ্বরসৃষ্ট, ইথারে ভাসমান শাকসব্জী, বৃক্ষলতাদির অদৃশ্য পারলৌকিক রেখাচিত্রাঙ্কন সব সেখানকার গ্রহের অধিবাসীদের ইচ্ছামাত্রই মূর্ত্ত ক’রে উৎপন্ন করা যায়। ঐরকম একই উপায়ে এই সব জীবদেহের উদ্দাম কল্লনানুযায়ী স্নগন্ধি ফুলের সম্পূর্ণ ধাগানকেই রূপদান ক’রে পরে আবার অদৃশ্য ইথারের মধ্যে বিলীন ক’রে দেওয়া যায়। যদিও হিরণ্যলোকের মত আকাশের গ্রহবাসীদের খাওয়াদাওয়ার প্রায় কিছুই দরকার হয় না কিন্তু কারণজগতের প্রায় পূর্ণমুক্ত আত্মাদেহ বন্ধনহীন জীবন আরও উচ্চস্তরের; তাঁদের পরমানন্দের অমিয়ধারা পান ছাড়া আর কিছুই দরকার লাগে না।

“পৃথিবী হ’তে মুক্ত আত্মা এখানে এসে তা’র নানা জনমের পিতামাতা ভাইভগ্নী, স্ত্রীপুত্রপরিবার প্রভৃতি অসংখ্য প্রিয়জনদের সাক্ষাৎ পায়; এঁরা

* ভগবান বুদ্ধদেবকে একবার প্রশ্ন করা হয়েছিল যে মানুষ সবাইকে সমানভাবে ভালবাসবে

নাথো মাথো পরলোকের রাজ্যে নানান্তরে এসে দেখা দেয়। তা'তে ক'রে সে বেচারা বড় মুক্ছিলেই পড়ে যায়—কারণ কা'কে যে সে বেশী ক'রে ভালবাসবে তা' সে ঠিক ক'রে উঠতে পারে না; কাষেকাষেই তা'কে এইরকম ক'রে সবাইকে ঈশ্বরের সন্তান আর তাঁ'র ব্যক্তিগত মূর্ত প্রকাশ ব'লে সকলের প্রতি সমানভাবে দিব্যপ্রেম বিতরণ করতে শিক্ষা করতে হয়। কোন বিশেষ আত্মার শেষজীবনে, কোন নূতন গুণ বা প্রকৃতির উন্নতি অনুসারে যদিই বা সেইসব প্রিয়জনের ব্যক্তিগত আকৃতির অন্তবিস্তার পরিবর্তন ঘটে, তবুও পরলোকবাসী তা'র সহজ ও নিভুল অনুভবের সাহায্যে অগ্রগৃহে বা স্তরে, এককালে যা'রা তা'র অতিশয় প্রিয় ছিল, তা'দের তৎক্ষণাৎ চিনতে পেরে তা'দের নতুন পরলোকের গৃহে আবার তা'দের অভ্যর্থনা ক'রে নিয়ে আসে। সৃষ্টির প্রতি অল্পপরমাণুর মধ্যে অষ্টবিধা প্রকৃতির* ভাবগত বৈশিষ্ট্য চিরবর্তমান থাকাতে—কোন আত্মিকবন্ধকে অতি সহজেই চেনা যায়, তা' সে যে রকমই রূপধারণ করুক না কেন; কি রকম জ্ঞান অভিনেতার সাজসজ্জা বা ছদ্মবেশ যতই ভাল হোক না কেন, তা'র আসলরূপ একটু খুঁটিনাটি ক'রে দেখলেই ধরা পড়ে যায়, তেমনি আর কি!

“পৃথিবীর চেয়ে পরলোকের আয়ুষ্কাল আরও অধিক দীর্ঘ। পৃথিবীর সময়ের পরিমাপে একজন সাধারণ পরলোকবাসীর জীবন পাঁচশ থেকে এক-হাজার বৎসর পর্য্যন্ত দীর্ঘ হয়। যেমন কতকগুলো রেডউড্ গাছ অত্যাগ্নি গাছদের চেয়ে শতশত বছরেরও বেশী বাঁচে, অথবা যেমন কোন কোন যোগী কয়েকশত বৎসর ধ'রে বাঁচেন, যদিও অধিকাংশলোকেরই ষাটবছরের আগেই মৃত্যু ঘটে তেমনি কতকগুলি আত্মিকেরা সাধারণ পারলৌকিক জীবনের চেয়েও অধিকদিন বেঁচে থাকে। পরলোকে প্রবিশ্ট জীবেরা তা'দের জড়জগতের কর্মফলের গুরুত্বানুসারে সেখানে অল্প অথবা বেশীদিন বাস

কেন? তা'তে সেই মহান ধর্মপ্রবর্তক উত্তর দিয়েছিলেন, “কারণ প্রত্যেক মানবের অগণিত আর বিচিত্র জীবনধারার মধ্যে অপর প্রত্যেকেই কোন না কোনকালে তা'র প্রিয় ছিল।” ঈশা উপনিষদে এইভাবে একটি বিভিন্ন বাখ্যা আছে যে, “যে অ'পনার মধ্যে সর্বভূতকে এবং সর্বভূতের মধ্যে আপনাকে দর্শন করে, সে কাহাকেও ক্রোধ দান করে না।”

* অণুপরাণু হ'তে মানুষ পর্য্যন্ত সকল সৃষ্টজীবের মধ্যে অষ্টবিধা প্রকৃতির গুণ বর্তমান—ক্ষিতি, মপ, তেজঃ, মরুৎ, বোম, মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার। (শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা—৪র্থ অধ্যায়, ৪ শ্লোক।)

করতে পারে, তা'রপরে নির্দিষ্ট সময় মধ্যে তা'দের কর্মফল আবার তা'দের পৃথিবীতে টেনে আনে।

“পরলোকবাসীদের আর একটা সুবিধা হচ্ছে এই যে তা'দের জ্যোতিষ্ময় দেহ ত্যাগ করবার সময় মরণের সঙ্গে আর যজ্ঞদায়ক বৃদ্ধ করতে হয় না। কিন্তু তা'হলে কি হয়, তবুও তা'দের মধ্যে অনেকেই পারলৌকিক দেহ ত্যাগ করে সুক্ষ্মতর কারণশরীর ধারণ করবার চিন্তায় একটু ভীত হয়ে পড়ে বই কি। পরলোক কিন্তু অনভীষিত মৃত্যু, জরা বা ব্যাধি থেকে মুক্ত। এই তিনটি ভয়ই হচ্ছে পৃথিবীর অভিশাপ, যেখানে মানুষের আত্মজ্ঞান তা'র নশ্বর জড়দেহের সঙ্গে প্রায় সম্পূর্ণভাবেই জড়িয়ে গিয়ে তা'র দেহটাকেই তা'র একমাত্র অস্তিত্ব বলে কল্পনা করে, আর সেই ক্ষণভঙ্গুর দেহটার অস্তিত্ব বজায় রাখতে গেলে তা'কে সর্বদাই বায়ু, আহার, নিদ্রা প্রভৃতির উপর সম্পূর্ণভাবেই নির্ভর করতে হয়।

“জড়দেহের মৃত্যু হ'লে, স্বাসলোপ পেয়ে শরীরকোষগুলি বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। আর সুক্ষ্মদেহের মৃত্যু ঘটলে তা'র “প্রাণকণিকা”গুলির বিক্ষেপণ ঘটে। প্রাণশক্তির প্রকাশ এই “কণিকা”সমূহের এককগুলি হ'তেই সুক্ষ্মদেহীদের প্রাণ সংগঠিত। জড়দেহের মৃত্যুতে জীব তা'র অস্থিমাংসের দেহ-জ্ঞান হারিয়ে সে তা'র পরলোকের সুক্ষ্মদেহের বিষয় অবগত হয়। যথাকালে পরজগতে মৃত্যুর আশ্বাদন লাভ করে জীব এই প্রকারে পরলোকের জন্ম ও মৃত্যুর অভিজ্ঞতা থেকে ফিরে গিয়ে আবার জড়জন্ম ও মৃত্যুর জ্ঞান লাভ করে। এইরকম পরলোক আর পার্থিব জন্মমৃত্যুর আবর্তনচক্রসকল অজ্ঞানী লোকেদের অপরিহার্য বিধিলিপি। স্বর্গ আর নরকের শাস্ত্রের বর্ণনাতে কখনও কখনও মানুষের পরলোকের সুখময় আর পার্থিব জগতের হতাশাপূর্ণ দীর্ঘ অভিজ্ঞতাসমূহ তা'র অবচেতন-মনের-চেয়ে-গভীরতর স্মৃতিকে আলোড়িত করে তোলে।”

আমি জিজ্ঞাসা করলুম, “পূজ্যপাদ গুরুদেব, আপনি পৃথিবীতে আর সুক্ষ্ম এবং কারণজগতে পুনর্জন্মের বিবরণ একটু বিশদভাবে বলবেন কি?”

আমার পরমারাধ্য গুরুদেব তখন বুঝিয়ে বললেন, “মানুষ জীবাত্মারূপে আসলে হচ্ছে কারণশরীরবিশিষ্ট। সেই শরীরটা হচ্ছে ঈশ্বর কর্তৃক মূল অপর্যায় কারণ চিন্তাশক্তিরূপে গৃহীত পঁয়ত্রিশটি ভাবের আকর—যা' তিনি

পরে বিভাগ ক'রে উনবিংশতিতত্ত্ববিশিষ্ট হৃদ্যদেহ এবং নোড়শতত্ববিশিষ্ট স্থূল জড়দেহ নির্মাণ করেন।

“অতিবাহিকদেহের উনবিংশতিতত্ত্বসকল হচ্ছে মনোময়, ভাবময় আর প্রাণময়। এই উনিশটি উপাদান হচ্ছে বুদ্ধি; অহংকার; সংবেদন; মন (ইন্দ্রিয়জ্ঞান); চক্ষু, কণ, নাসিকা, জিহ্বা আর ত্বক্, এদের জ্ঞানের হৃদ্য প্রতিকল্প হচ্ছে পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়; প্রজনন, নিঃসারণ, বাক্যালাপ, ভ্রমণ এবং হস্তসম্পাদ্য ক্রিয়াসাধনের মানস প্রতিকল্প হচ্ছে পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়। আর হ'চ্ছে পঞ্চপ্রাণবায়ু—প্রাণ, অপান, সমান, উদান, ব্যান, এরা শরীরের মধ্যে কেলাস-গঠন, দেহসাংকরণ, নিঃসারণ, পুষ্টিগ্রহণ এবং সঞ্চালন ক্রিয়াসকলের শক্তিবিশিষ্ট। বোলটি স্থূল জৈব রাসায়নিক উপাদানে গঠিত জড়দেহের মৃত্যুর পরও উনবিংশতিতত্ত্বের এই হৃদ্য অবয়ব বর্তমান থাকে।

“কারণশরীরের পঁয়ত্রিশটি ভাবপর্যায়ের মধ্যে ভগবান মানুষের উনিশটি হৃদ্য আর বোলটি জড় প্রতিকল্পের সকল বৈশম্যের উৎকর্ষ সাধন করেছেন। স্পন্দনশক্তিকে প্রথমতঃ হৃদ্য পরে জড়রূপে ঘনীভূত ক'রে, তিনি মানুষের হৃদ্যশরীর, পরে তা'র জড়দেহ তৈরী করলেন। আপেক্ষিকবাদের নিয়মানুসারে—যা'তে ক'রে আদি কৈবল্যভাব বহু জটিল বৈচিত্র্যে প্রকাশিত হয়েছে, —যেমন কারণজগৎ আর কারণশরীর, হৃদ্যজগৎ আর হৃদ্যদেহ থেকে স্বতন্ত্র, তেমনি এই জড়জগৎ আর স্থূলদেহ সৃষ্টির বিভিন্নরূপ থেকে স্বভাবতঃই স্বতন্ত্র !

“ঈশ্বর তাঁ'র বিভিন্ন পরিকল্পনা স্বয়ং চিন্তাধারা সমাধান ক'রে স্বপ্নে তা' প্রক্ষেপিত করেছেন। বিশ্বস্বপ্নের মায়াসুন্দরী এইরকমে আপেক্ষিকবাদের বিশালরূপ আর সংখ্যাভীত অলঙ্কারে ভূষিতা হয়ে বেরিয়ে এলেন।

“মর্ত্যশরীর হচ্ছে সৃষ্টিকর্তার স্বপ্নের নির্দিষ্ট বস্তুরূপ। পৃথিবীতে দ্বৈততান চিরনিরাজমান; স্বাস্থ্য আর ব্যাধি, সুখদুঃখ, লাভক্ষতি। মানুষ দেখে যে তিন আয়তনের জড়রূপই তা'র সীমা আর প্রতিবন্ধক। ব্যাধি বা অল্প কোন কারণে মানুষের বাঁচবার অভিপ্রায় যখন গুরুতরভাবে বিচলিত হয় তখনই তা'র মৃত্যু আসে; আর তা'র আত্মার অস্থিমাংসের আবরণ তখন গাময়িকভাবে পরিত্যক্ত হয়। তখনও আত্মা কিছু হৃদ্য কিম্বা কারণশরীরে আবদ্ধ

থাকে। আর যে সংহতিবলে এই তিনটি অবয়ব একত্র সংলগ্ন থাকে* সেটা হচ্ছে বাসনা। আর এই অতৃপ্ত কামনা বা বাসনার শক্তিই হচ্ছে মানুষের সর্ববিধ বন্ধন বা দাসত্বের মূল।

“অহঙ্কার আর ইন্দ্రిয়সুখ হ’তেই পার্থিব বাসনা বা কামনার উৎপত্তি। ইন্দ্రిয়ানুভূতির তাড়না বা প্রলোভন হৃদয়শরীরের আসক্তি বা কারণ অবস্থার অনুভূতিসংশ্লিষ্ট বাসনাশক্তির চেয়েও প্রবলতর।

“পরলোকের কামনাবাসনাসকল স্পন্দনভাবের উপভোগেই কেন্দ্রীভূত হয়ে থাকে। হৃদয়জগতের জীবেরা মহাব্যোমের বিশ্বসঙ্গীত (প্রণবধ্বনি) শ্রবণ করে আর সকল সৃষ্টিই যে পরিবর্তনশীল আলোর অদুরন্ত প্রকাশ, সে দৃশ্য দেখে তা’রা আনন্দে উল্লসিত হয়। হৃদয়দেহীরা আলো থেকেই গন্ধ, স্বাদ আর অনুভূতি পায়। এইরূপে হৃদয়জগতের কামনাবাসনাসকল হৃদয়শরীরের সকল বস্তু আর জ্ঞানকে আলোর রূপে অথবা প্রগাঢ় চিন্তা বা স্বপ্নে পরিণত করার শক্তির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট।

“কারণজগতের কামনাবাসনা সব, কেবল অনুভূতি বা প্রত্যক্ষজ্ঞানের দ্বারাই পূর্ণ হয়। প্রায়মুক্ত জীবেরা, যা’রা কেবল কারণদেহে আবদ্ধ থাকে, তা’রা এই সারা বিশ্বটাকে ভগবানের স্বপ্ন-ভাবের মূর্ত প্রকাশ ব’লেই দেখতে পায়; কেবলমাত্র চিন্তার দ্বারাই তা’রা যে কোন জিনিসের রূপদান করতে পারে। আর সেই জন্তেই কারণশরীরীরা পার্থিব অনুভব কিম্বা হৃদয়জগতের আনন্দও তা’দের আত্মার হৃদয়তর অনুভবের পক্ষে নিতান্ত স্থূল আর স্বাসরোধী ব’লে মনে করে। কারণশরীরীরা তা’দের বাসনার ক্ষয় করে তা’দের তৎক্ষণাৎ রূপ দান করে।† যারা কেবলমাত্র কারণজগতের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অবয়বে আবদ্ধ, তা’রা এমন কি সৃষ্টিকর্তারই মত বিশ্বরচনা প্রকাশ করতে পারেন। যে হেতু সকল সৃষ্টিই যখন বিশ্বস্বপ্নজালে তৈরী তখন অতিসূক্ষ্ম কারণশরীরে আবদ্ধ আত্মারও বিরাট শক্তির অনুভূতি থাকে।

* দেহ মানেই কোষবদ্ধ আত্মা, তা’ সে জড়ই হোক আর সূক্ষ্মই হোক। এই তিনটি শরীর হচ্ছে “নন্দন পক্ষীর” পিঞ্জর।

† এমন কি বাবাজী মহারাজ ও লাহিড়ীমহাশয়কে তাঁর কোন অতীতজীবনের অবচেতন মনে এক রাজপ্রাসাদের বাসনা থেকে মুক্ত হ’বার জন্তে সাহায্য করেছিলেন, সে ঘটনা ৩৪শ পরিচ্ছেদে বর্ণিত হয়েছে।

আত্মা স্বভাবতঃই একেবারে অদৃশ্য ব'লে কেবল এর শরীর বা অবয়ব-গুলির দ্বারাষ্ট একে চিনতে পারা যায়। কেবলমাত্র কোন শরীর দেখলেই বোঝা যায় যে এর অস্তিত্ব অতৃপ্ত বাসনার দ্বারাষ্ট সম্ভব হয়েছে।*

যতদিন পর্য্যন্ত মানুষের আত্মা অবিজ্ঞা ও বাসনার ছিপি দ্বারা একটি, দু'টি বা তিনটি দেহাধারের মধ্যে দৃঢ়ভাবে আবদ্ধ থাকে ততদিন পর্য্যন্ত সে সচ্চিদানন্দ সাগরে মিশে যেতে পারে না। মৃত্যুর কঠিন আঘাতে যখন তা'র স্থূল জড়দেহ বা আধার চূর্ণ হয়, অপর দুটো আবরণ—সূক্ষ্ম আর কারণ—তখনও সর্বব্যাপী প্রাণসাগরে আত্মার সজ্জান প্রবেশ করার পক্ষে প্রতিবন্ধক হয়ে থাকে। জ্ঞানের সাহায্যে যখন বাসনাশূন্য হ'তে পারা যায় তখন তা'র সেই জ্ঞানশক্তি বাকী দুটো আধারকে একেবারে চূর্ণ ক'রে ফেলে। অবশেষে সেই ক্ষুদ্র মানবাত্মা মুক্ত হয়ে বেরিয়ে প'ড়ে অনাদি অনন্ত পরমাত্মার সঙ্গে এক হয়ে যায়।”

গুরুদেবকে তখন আমি উচ্চ আর রহস্যময় কারণজগৎ স্বপক্ষে আরও বিস্তৃততর বর্ণনা দেবার জেতে অনুরোধ করাতে তিনি বল্লেন,—

“কারণজগৎ এত সূক্ষ্ম যে তা' বর্ণনা করা যায় না; এ বুঝাতে গেলে, জীবের গভীর ধারণার একরূপ বিরাটশক্তি থাকা দরকার যে, সে চোখ বন্ধ করেই সূক্ষ্মজগৎ আর এই বিরাট জড়বিশ্ব—যেন একটা আলোর বলুনের সঙ্গে একটা কঠিন ঝুড়ি—তা' কেবল ভাবরূপেই আছে ব'লে দেখতে পায়। যদি কেউ এই রকম অতিমানবিক গভীর ধারণাবলে তা'দের সব কিছু বৈচিত্র্যসমেত এই দু'টি বিশ্বকে কেবলমাত্র ভাবরূপে পর্য্যবসিত করতে পারে, তা'হলে সে কারণজগতে পৌঁছে মনোজগৎ আর জড়জগতের মিলনের সীমারেখায় উপস্থিত হতে পারে। সেখানে গিয়ে তা'র এই প্রত্যক্ষ জ্ঞানলাভ হয় যে—সকল সৃষ্টবস্তু, কঠিন, তরল, বায়বীয়পদার্থ, বিদ্যুৎ, শক্তি, সকলপ্রাণী, দেবতা, মানুষ, জীবজন্তু, বৃক্ষলতাদি, বীজাণু—জ্ঞানেরই

* “এবং তিনি তা'দের বল্লেন, শরীর যেখানেই থাকুক না কেন, সেখানেই শকুনপক্ষীরা সব সমবেত হ'বে।” বাইবেল লুক ১৭ : ৩৭।

যেখানেই কোন আত্মা, স্থূল, সূক্ষ্ম অথবা কারণশরীরে আবদ্ধ হোক না কেন, সেখানেই বাসনা-বাসনার শকুনপক্ষীসকল—যারা মানুষের ইন্দ্রিয়দোকলাকে অথবা কোন সূক্ষ্ম বা কারণজগতের সাদৃশ্যের উপর আক্রমণ করে—আত্মাকে বন্দী ক'রে রাখবার জন্য সমবেত হয়।

সব একটা একটা রূপ, যেমন মানুষ চক্ষু মূদে সে অহুভব করে যে সে আছে, সে বর্তমান—তা'র অস্তিত্ব সে বেশ টের পাচ্ছে, যদিও তা'র জড়দৃষ্টির সামনে তা'র দেহ অদৃশ্যই হয়ে থাকে আর তা'র কাছে সেটা কেবল ভাবরূপেই বর্তমান।

“মানুষ যা’ কল্পনায় করে, কারণশরীরী তা’ বাস্তবভাবে সম্পন্ন করতে পারে। অতিবিরাট আর প্রচণ্ড কল্পনাশ্রবণ মানববুদ্ধি কেবল মনের ভিতরেই এক চিন্তার শেষ সীমা থেকে অপর এক চিন্তার শেষ সীমায় উপনীত হ’তে পারে, মনোমনেই সে গ্রহ হ’তে গ্রহান্তরে পরিভ্রমণ করতে পারে, অতল গভীর অনন্ত গহ্বরের সীমাহীন তলদেশে সে যেতে পারে অথবা খড়্গের মত তারকাখচিত নীল নভোদেশে অতিবেগে উদ্ধে উৎক্ষিপ্ত হতে পারে কিম্বা ছায়াপথে অথবা নক্ষত্রপুঞ্জশোভিত মহাব্যোমে সে সন্ধানীআলোর মত দীপ্তি প্রকাশ ক’রে সে চলতে পারে। কিন্তু কারণজগতের জীবদেহের এর চেয়েও বেশী স্বাধীনতা আছে—তা’রা বিনা আয়াসে তা’দের চিন্তাকে তৎক্ষণাৎ বস্তুর রূপদান করতে পারে—তা’তে কোনরূপ জড় বা হৃদয় প্রতিবন্ধক বা কর্মের সীমাবদ্ধতা কোনপ্রকার বাধা দিতে পারে না।

“কারণশরীরীরা উপলব্ধি করতে পারে যে জড়বিশ্ব প্রধানতঃ ইলেক্ট্রন বা বিদ্যুতিন্ দ্বারা সৃষ্ট নয় বা হৃদয়জগৎ মূলতঃ “প্রাণকণিকা”র ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত নয়—এ দুটোই বস্তুতঃ হচ্ছে ঈশ্বরের অতি হৃদয় চিন্তাকণিকার দ্বারাই সৃষ্ট—মায়া বা আপেক্ষিকবাদের দ্বারা খণ্ডিত আর বিভক্ত, যা’তে ক’রে সৃষ্টির সঙ্গে স্রষ্টাকে আপাতদৃষ্টিতে পৃথক ক’রে রাখে।

“কারণজগতে আত্মারা পরস্পর পরস্পরকে সেই আনন্দময় পরমাঙ্গার ব্যক্তিগত প্রকাশ ব’লেই জানে, তা’দের চিন্তাবস্তুসকলই কেবল একমাত্র জিনিস যা’ তা’দের চারধার ঘিরে থাকে। কারণশরীরীরা তা’দের দেহ আর চিন্তার মধ্যে যে পার্থক্য, তা’ কেবলমাত্র ভাবরূপেই দেখতে পায়। মানুষ চোখ বুঁজে যেমন অতি উজ্জল সাদা আলো কিম্বা ক্ষীণ নীল আলোর আভাস দেখতে পায়, কারণশরীরীরাও তেমনি কেবলমাত্র চিন্তার দ্বারাই শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ সবই অহুভব করতে পারে ; হৃদয় মানসশক্তির দ্বারা তা’রা যে কোন জিনিসের সৃষ্টি বা বিলোপসাধন করতে পারে।

“কারণজগতে মৃত্যু আর পুনর্জন্ম এ দুটোই কেবলমাত্র চিন্তাতেই আছে।

কারণশরীরীরা কেবলমাত্র চিরনূতন জ্ঞানানন্দের অমৃত ভোজন করে। তা'রা শাস্তির নিবারণী থেকে পান করে, অল্পভূতির পথহীন ভূমির উপর ভ্রমণ করে আর পরমানন্দের অনন্ত সাগরের সীমাহীনতার মধ্যে সন্তরণ ক'রে বেড়ায়। আহা দেখ! তা'দের উজ্জল চিন্তাশরীর সব, ঈশ্বরসৃষ্ট কোটি কোটি গ্রহউপগ্রহ, নবজাত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডসকল, অসীম নীলাকাশের বুকে তাসমান স্বর্ণ নীহারিকার অপার্থিব আলোকস্বপ্ন—তা'দের মধ্য দিয়ে বিদ্যুৎগতিতে অতিক্রম করছে।

“কারণভগতে বহু জীব হাজার হাজার বছর ধ'রে অবস্থান করে। গভীরতর পরমানন্দ লাভ ক'রে মুক্তাশ্রা ক্ষুদ্র কারণশরীর থেকে নিজেকে প্রত্যাহত ক'রে নিয়ে কারণবিশ্বের বিরাটরূপ ধারণ করে। সকলপ্রকার ভাবধারার বিভিন্ন আবর্তসমূহ, শক্তি, প্রেম, ইচ্ছা, আনন্দ, শাস্তি, অল্পভব, স্বৈর্য্য, আত্মসংঘম আর ধারণার নানা তরঙ্গরূপ সব, পরমানন্দসাগরেই গিয়ে লয় হয়। তখন আত্মা তা'র আনন্দকে জ্ঞানের একটা বিশিষ্ট তরঙ্গরূপ ব'লে আর মনে করে না—তা'র অনন্ত হাসি, উত্তেজনা, পুলক, কম্পন, একের মধ্যে বহুবাঞ্ছিত বৈচিত্র্যের তরঙ্গসব নিয়ে সেই এক অখণ্ড মহাব্যোমে বিলীন হয়ে যায়।

“যখন কোন আত্মা প্রজাপতির মত এই তিনটি অবয়বের গুটি ভেদ ক'রে বেরিয়ে আসে তখন সে চিরতরে আপেক্ষিকবাদ থেকে মুক্ত হয়ে যনির্বচনীয়া শাস্ত্রতী স্থিতি লাভ করে।* সেই সর্বব্যাপিত্বের প্রজাপতিকে লক্ষ্য কর, দেখ তা'র পক্ষদ্বয়ে চন্দ্রস্বৰ্ণ গ্রহতারা সব বাল্মলু করছে। আত্মা পরমাত্মার বিস্তার লাভ ক'রে আলোকহীন আলো, তমিস্রাহীন অন্ধকার, চিন্তাহীন চিন্তার রাজ্যে ঈশ্বরের বিশ্বসৃষ্টির স্বপ্নের পরমানন্দে মগ্ন হয়ে একলাই থাকে।”

বিশ্বয়ে অভিভূত হয়ে ব'লে উঠলুম, “মুক্ত আত্মা?”

গুরুদেব বলতে লাগলেন, “যখন কোন আত্মা এই তিনটি শরীরকোষের মাঝ থেকে সম্পূর্ণ ভাবে মুক্ত হয়ে বেরিয়ে আসে,—তখন সে পরমাত্মার সঙ্গে এক হয়ে যায় কিন্তু তা'র ব্যক্তিত্বের কোন লোপ বা হ্রাস হয় না।

* “যে জয় করে, তা'কে আমি আমার ঈশ্বরের মন্দিরে শুশ্রূষরূপ করব আর সে কখনও বাইরে যাবে না (অর্থাৎ তা'র আর কখনও পুনর্জন্ম হবে না)... আসি যেমন জয় করেছি আর আমার পিতার সঙ্গে সিংহাসনে বসেছি, তেমনি যে জয় করে, তা'কে আমি আমার সঙ্গে আমার সিংহাসনে পুতে দেব।” বাইবেল—ঈশ্বরের বাণী ৩ : ১২, ২১।

খৃষ্টের এমন কি যীশুরূপে জন্মগ্রহণ করবার পূর্বেই এরূপ চরম মুক্তিলাভ ঘটেছিল। তাঁ'র অতীত জীবনের তিনটি অবস্থায়—যা' তাঁ'র পার্থিবজীবনে মৃত্যু ও পুনরুত্থানের তিনদিনের অভিজ্ঞতায় মূর্ত্ত হইয়ে রয়েছে, তা'তে তিনি ব্রাহ্মীস্থিতি লাভ করবার পূর্ণশক্তি অর্জন করেছিলেন।*

“এই তিনটি শরীর থেকে মুক্তিলাভ করতে গেলে অপরিণত মানবকে তা'র অসংখ্য পার্থিব, স্থূল আর কারণশরীরের মধ্য দিয়ে জন্ম নিতে হয়। যখন তিনি এইরূপ চরমমুক্তি লাভ করেন, তখন তিনি ইচ্ছা করলে, ধর্মোপদেষ্টারূপে অগাধ মানবদের ঈশ্বরসান্নিধ্যে ফিরিয়ে আনবার জন্তে পুনরায় পৃথিবীতে ফিরে আসতে পাবেন অথবা আমার মত তিনি স্থূলজগতে বাস করতে পারেন। সেখানে কোন মুক্তিদাতা সেখানকার অধিবাসীদের কিছু কর্মফল গ্রহণ ক'রে এইরূপে স্থূলজগতে তা'দের বারম্বার যাতায়াতের অবসান ঘটিয়ে দিয়ে কারণজগতে চিরতরে বাস করার জগ্গ তা'দের সাহায্য করেন। অথবা কোন মুক্তান্না কারণজগতে প্রবেশ ক'রে সেখানকার অধিবাসীদের কারণশরীরে অবস্থানকাল সংক্ষেপিত ক'রে তা'দের কৈবল্য-প্রাপ্তিতে সাহায্য করেন।”

“অমরদেবতা, যে কর্মফলের প্রভাবে আমরা এই তিনটি জগতে ফিরে আসতে বাধ্য হই, তা'র বিষয়ে আরও কিছু বলুন, শুনতে বড়ই ইচ্ছে হয়।” মনে হ'ল, আমার সর্বদর্শী গুরুদেবের কথা যেন অনন্তকাল ধ'রেই আমি শুনে যেতে পারি। তাঁ'র পার্থিবজীবনে আমি তাঁ'র কাছথেকে একদিনে ত' এত সব জ্ঞানের কথা কখনও শুনাতে পাইনি। আজ আমি এই প্রথম জীবনমৃত্যুর গভীর রহস্যময় অন্তঃপ্রদেশে সুস্পষ্ট আর প্রকৃত অন্তর্দৃষ্টি লাভ করছি।

গুরুদেব মধুরস্বরে ব্যাখ্যা শুরু ক'রে বললেন, “স্থূলজগৎসমূহে মানুষের বাস চিরস্থায়ী হ'বার সম্ভাবনার পূর্বেই তা'কে অতিঅবশ্যই পার্থিব কর্মফল বা বাসনা সব সম্পূর্ণভাবে ক্ষয় ক'রে ফেলতে হবে। স্থূলজগতে দু'রকমের জীব

* শ্রীমুক্তেশ্বর গিরিজীর কথার অর্থ এই ছিল যে, তাঁ'র পার্থিব জীবনে তিনি যেমন মাঝে মাঝে তাঁ'র শিষ্যদের কর্মক্ষয়ের উদ্দেশ্যে তা'দের রোগভার নিজশরীরে গ্রহণ করতেন, তেমনি স্থূল-জগতেও মুক্তিসাধকরূপে তাঁ'র জীবনের কর্তব্য হ'চ্ছে হিরণ্যলোকবাসীদের; কোন কোন স্থূল কর্মফল গ্রহণ ক'রে তা'দের উচ্চতর কারণজগতে দ্রুত উন্নীত হ'তে সাহায্য করা।

বাস করে ; যারা চিরস্থায়ী বাসিন্দা আর যাদের পার্থিব কৰ্মক্ষয় করা এখনও বাকী আর সেই জন্তে তাদের কৰ্মের ঋণ পরিশোধ করবার জন্তে জড় পার্থিবদেহে পুনরায় তা'দেরকে বাস করতেই হবে—জড়দেহের অবসান ঘটলে, তা'দেরকে সৃষ্টিজগতের “চিরস্থায়ী বাসিন্দা” অপেক্ষা “দু'দিনের অতিথি”ই বলা যায়।

“যাদের পার্থিব কৰ্মক্ষয় হয় নি সেইসব জীবদের সৃষ্টিজগতে মৃত্যু ঘটলেও বিশ্বপরিকল্পনার উচ্চতর কারণস্তরে তা'রা প্রবেশ লাভ করতে পারে না ; তা'রা কেবল জড় আর সৃষ্টিজগতে বাতায়াত করে আর পর্যায়ক্রমে তা'রা ষোড়শ জড়তত্ত্ববিশিষ্ট স্থলদেহ আর ঊনবিংশতি সৃষ্টিতত্ত্ববিশিষ্ট আতিবাহিক দেহ সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করে। উপরন্তু প্রত্যেক জড়দেহ নাশের পর পৃথিবীর অপরিণত জীব অধিকাংশকালই মরণনিদ্রার ঘোর অজ্ঞান অন্ধকারে আচ্ছন্ন থাকে আর মনোরম সৃষ্টিজগতের দিব্যে তা'র কদাচিৎ জ্ঞানলাভ ঘটে। সৃষ্টিজগতে কিছুকাল বিশ্রামের পর এক্রপ মানবাত্মা আবার জড়জগতে ফিরে আসে আরও শিক্ষা, আরও সাধনার জন্তে। আর বার বার বাতায়াতের ফলে ক্রমশঃ সে সৃষ্টিস্তরের জগতে থাকতে নিজেকে অভ্যস্ত ক'রে তোলে।

“সৃষ্টিজগতের সাধারণ অথবা বহুদিনের বাসিন্দারা, উপরন্তু যারা সকল-রকম জড়বাসনা হ'তে চিরতরে মুক্ত হয়ে গেছে, তাদের আর কখনও পার্থিব জড়ভূমিতে ফিরে আসবার প্রয়োজন হয় না। এইসব জীবদের কেবলমাত্র সৃষ্টি আর কারণজগতের কৰ্ম সকল ক্ষয় করতে হয়। সৃষ্টিজগতে তা'দের মৃত্যু ঘটলে তা'রা অপরিসীম সুন্দর আর সৃষ্টিতর কারণজগতে প্রবেশ করে। বিশ্ববিধানে নির্দিষ্ট সময় অস্তে, কারণশরীরের ভাবরূপ পরিত্যাগ ক'রে এই সব উচ্চতর অবস্থাপ্রাপ্ত জীবেরা হিরণ্যলোক অথবা সেইরকম কোন উচ্চ সৃষ্টিস্তরে প্রবেশ ক'রে সৃষ্টি নবকলেবরে পুনর্জাত হ'য়ে তা'দের সৃষ্টি-জগতের বাকী কৰ্ম সব ক্ষয় করে।

শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজী বলতে লাগলেন, “বৎস, এখন তুমি পরিপূর্ণভাবেই বৃত্তে পারবে যে আমি বিভিন্ন বিধানেই মৃত্যু হ'তে পুনর্জীবন লাভ করেছি—কেন জান ? পৃথিবী থেকে যে সব আত্মা সৃষ্টিজগতে এসে প্রবেশ করেছে তা'দের চেয়ে বিশেষভাবে কারণজগৎ থেকে যেসব আত্মা সৃষ্টি

জগতে নেমে এসে পুনরায় জন্মগ্রহণ করছে, তা'দের মুক্তিসাধনের জন্তে। পৃথিবী থেকে যা'রা আসছে তা'দের যদি বিন্দুমাত্র জড়জগতের কর্ম বাকী থাকে, তা' হ'লে তা'রা আর হিরণ্যালোকের মত অতি উচ্চস্তরে কখনও আরোহণ করতে পারে না।

পৃথিবীতে যেমন অধিকাংশ লোকই ধ্যানলব্ধ আত্মিকদর্শনের সাহায্যে স্বপ্ন-জগতের উচ্চতর সুখকর অবস্থা আর তা'র পরমানন্দ উপলব্ধি করতে শেখেনি, আর সেই জন্তেই মৃত্যুর পরে পৃথিবীর সসীম আর অপূর্ণ আনন্দেই আবার ফিরে যেতে চায়, তেমনি বহু স্বপ্নশরীরীরা, তা'দের স্বপ্নদেহের স্বাভাবিক বিলয়ের সময় কারণজগতের আধ্যাত্মিক আনন্দের উচ্চাবস্থা কল্পনাই করতে পারে না; আর স্বপ্নজগতের অধিকতর স্থূল আর উচ্ছৃল আনন্দের চিন্তা মনের মধ্যে লালন ক'রে আবার স্বপ্নজগতের স্বর্গেই পুনরায় ফিরে আসতে চায়। স্বপ্নজগতের গুরু কর্মফল এই সকল জীবদের স্বপ্নজগতে মৃত্যু ঘটবার আগেই তা' সব ক্ষয় ক'রে নিতে হয়, তা' না হ'লে তা'রা কারণ ভাবজগতে চিরস্থায়ী বাসিন্দা হ'তে পারে না—আর এই কারণ ভাবজগৎ আর স্রষ্টার মধ্যে বিভেদ খুব অল্পই।

“কেবল যে জীবের আর নয়নাভিরাম স্বপ্নজগতের অভিজ্ঞতালাভের কোন ইচ্ছা থাকে না, আর কোন প্রলোভনই তা'কে সেখানে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে পারে না, তখনই কেবল সে কারণজগতে থাকতে পায়। সেখানে থেকে কারণজগতের সমস্ত কর্ম অথবা অতীতজীবনের সমস্ত বাসনার বীজ নাশ করবার সাধনা শেষ ক'রে বদ্ধজীব তিনটি অজ্ঞান আবরণের শেষ কারণ-অবয়ব ভেদ ক'রে বেরিয়ে প'ড়ে সেই অনন্তপুরুষের সঙ্গে পরিপূর্ণভাবে মিলিত হয়।

গুরুদেব অতি স্নিগ্ধমধুর হেসে বল্লেন, “এখন সব বুঝতে পারছ'?”

“আজ্ঞে হ্যাঁ, আপনার রূপায় পারছি বটে। স্বতন্ত্রতায় আর আনন্দে আমি আর ভাষা খুঁজে পাই না।”

কোনো সঙ্গীতে, কোনো আখ্যায়িকায় আমি এমন উদ্দীপনাময় আর উচ্চভাবের জ্ঞানের কথা কখনও শুনি নি। শাস্ত্রে যদিও এই সব কারণ এবং স্বপ্নজগৎ আর মাহুয়ের এই তিনটি অবয়বের কথা উল্লেখ আছে তবুও আমার এই গুরুপ্রতিষ্ঠিত গুরুদেবের এ রকম অপূর্ব মৌলিকতার সঙ্গে ব্যাখ্যার তুলনায়

তা'দের কতদূর অস্পষ্ট, অসংলগ্ন বা অর্থহীনই না মনে হয়! তা'র কাছে বাস্তবিকই এমন কোন—

“অচিন্ দেশের কথা জানা নাই তা'র,

কভু নাহি ফিরে পায়, সীমা হ'তে যা'র।”

গুরুদেব বলতে লাগলেন, “মানুষের এই তিনটি শরীরের অল্পবেশ তা'র ত্রিবিধা প্রকৃতির মধ্য দিয়ে নানাভাবে প্রকাশিত হয়েছে। পৃথিবীতে মানুষ তা'র জাগ্রত অবস্থায় তা'র এই তিনটি অবয়বের বিষয় অল্পবিস্তর সচেতন। যখন তা'র মন শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস গন্ধ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়ে অতিনিবিষ্ট, তখন সে প্রধানতঃ তা'র জড়শরীর দিয়েই কাষ করে। দর্শনক্রিয়া বা ইচ্ছাপ্রকাশের সময় সে প্রধানতঃ তা'র সূক্ষ্মশরীরের ভিতর দিয়ে কাষ করে। আর মানুষ যখন কোন চিন্তা বা গভীর অন্তঃস্পর্শন অথবা ধ্যানের মধ্যে ডুবে যায় তখন তা'র কারণশরীরের মাধ্যম প্রকাশ পায়; আর যে মানবের নিয়মিতভাবে কারণশরীরের সংস্পর্শ ঘটে, দিব্যতাবের সূক্ষ্ণচিন্তাসকল তা'র কাছে উদয় হয়। এই অর্থে কোন ব্যক্তিকে ‘জড়জীব,’ ‘শক্তিমান’ ও ‘বুদ্ধিজীবী’ এই তিনটি প্রধান ভাগে বিভক্ত করা যায়।

“মানুষ দৈনিক প্রায় ঘোলঘটা ধ'রে তা'র জড় অবয়বটিকেই নিজেকে ব'লে মনে করে—তা'রপর সে নিদ্রা যায়; যখন সে স্বপ্ন দেখে তখন সে সূক্ষ্ম-শরীরে অবস্থান করে, আর সে সময় সে বিনা আয়্যাসে সূক্ষ্মশরীরীদের মতই যে কোন জিনিষ সৃষ্টি করতে পারে। আর মানুষের স্মৃষ্টি যদি গভীর আর স্বপ্ননিহীন হয় তা' হ'লে ঘণ্টাকতক ধ'রে সে তা'র চেতনা অথবা অমিতজ্ঞানকে তা'র কারণশরীরে পরিচালিত করতে পারে; এক্ষণ নিদ্রা পুনরুজ্জীবক। যে স্বপ্নদৃষ্টা, কারণশরীরে নয়, সূক্ষ্মশরীরের সংস্পর্শে আসে, তা'র নিদ্রা কিছু পরিপূর্ণভাবে শান্তি অপনোদনকারী হয় না।” গুরুদেবের এই ম্পর্ক ব্যাখ্যা প্রদানকালে আমি তাঁকে ভক্তিবিনত চিত্তে দেখতে দেখতে বল্লুম, “গুরুদেব, আপনার শরীর কিছু পুরী আশ্রমে আপনার দেহরক্ষার সময় যা দেখেছিলুম, ঠিক অবিকল তেমনটিই দেখতে।”

“হ্যা, তা' বটে, আমার এ নতুন শরীর সেই পুরোন শরীরটার অবিকল প্রতিরূপ। পৃথিবীতে থাকতে যা' করতুম, তা'র চেয়েও ঢের বেশী বার

পৃথিবীতে থাকতে আমি যত না করতুম, তা'র চেয়ে বেশীবার আমি ইচ্ছামত যেকোন সময় আমার এই মূর্তি ধারণ করি বা অদৃশ্য ক'রে ফেলি। এখন আমি আলোর গতিতে চোখের পলকে গ্রহ হ'তে গ্রহান্তরে যাই, অথবা বস্তুতঃই সূক্ষ্ম থেকে কারণ কিম্বা জড়জগতে ফিরে যাই।” তা'রপর গুরুদেব একটু হেসে বললেন, “যদিও তোমরা আজকাল এত তাড়াতাড়ি যাতায়াত করতে পার, আমার কিম্বা তোমায় বোম্বাইয়ে খুঁজে পেতে বিন্দুমাত্রও দেরী হয় নি।”

“গুরুদেব আপনার মৃত্যুতে আমার যে কি গভীর দুঃখ হ'চ্ছিল।”

“আহা হা, আমি মরলুমই বা কোথায়? তোমার কথার মধ্যে কিছু বিপরীত উক্তি আছে নয় কি?” ব'লে শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজী সম্মেহ কৌতুকের হাসি হাসলেন।

তা'রপর তিনি বলতে লাগলেন, “যোগানন্দ তুমি কেবল এই পৃথিবীর স্বপ্ন দেখেছিলে; আর সেই পৃথিবীর উপর তুমি আমার স্বপ্নদেহই দেখেছিলে। পরে সেই স্বপ্নগড়া মূর্তিকেই তোমরা সমাধি দিয়েছিলে। এখনকার আমার এই আরও সূক্ষ্মতর মর্ত্যদেহ—যা তুমি এখন দেখছ আর শুধু দেখছই বা বলি কেন, এমন শক্ত ক'রে এখন জড়িয়ে ধ'রে আছ!—তা' ঈশ্বরের আর একটা সূক্ষ্মতর স্বপ্নজগতে পুনর্জন্ম লাভ করেছে। কোন দিন হয় ত' বা সেই সূক্ষ্মতর স্বপ্নদেহ আর স্বপ্নজগৎ সবই মিলিয়ে যাবে; তা'রাও সব আর কিছু চিরকালের জগ্গে নয়। পরমজাগরণের চরমস্পর্শে এই সব স্বপ্নবুদ্ধি অবশেষে সকলই ফাটবে! যোগানন্দ, পুত্র আমার, স্বপ্ন আর সত্যের মধ্যে প্রভেদ কর, বুঝে নাও কোন্টা স্বপ্ন আর কোন্টা সত্য।

বৈদাস্তিক* পুনরুজ্জীবনের এই ভাব আমার বিশ্বয়ে অভিভূত করলে। পুরীতে গুরুদেবের প্রাণহীন দেহ দেখে যে শোকাকুল হয়ে পড়েছিলুম তা' মনে পড়াতে লজ্জাই বোধ হ'ল। অবশেষে আমি এই উপলব্ধি করলুম যে, পৃথিবীতে তাঁ'র আবির্ভাব ও তিরোভাব আর তাঁ'র আজকের এই পুনর্জীবনলাভ এসব বিশ্বস্বপ্নে ঈশ্বরের কল্পনার মধ্যে একটা আপেক্ষিকসম্বন্ধ

* জীবন আর মৃত্যু হ'চ্ছে চিন্তার কেবলমাত্র আপেক্ষিকভাব। বেদান্ত প্রমাণ করে যে ঈশ্বরই হচ্ছেন একমাত্র সৎবস্তু—পদার্থ আর সব কিছু হচ্ছে অ-পদার্থ, অবিদ্যা বা মায়। এই অদৈতবাদ শঙ্করাচার্যের উপনিষদের ভাষ্য পরাকাষ্ঠা লাভ করেছে।

ছাড়া আর কিছুই নয়, এই ভেবে আমার গুরুদেব সর্বদাই ঈশ্বরভাবে নিমগ্ন থাকতেন।

“যোগানন্দ, তোমায় আজ আমি আমার জীবন, আমার মৃত্যু, আমার পুনরুত্থানের সব সত্যই এখন বলুম। আমার জন্মে আর শোক কোনো না, বরং ঈশ্বরের স্বপ্নেগড়া মাছুষের পৃথিবী থেকে আরেকটি ঈশ্বরস্বপ্নরচিত সূক্ষ্ম-শরীরীদের লোকে আমার পুনর্জন্মের কথা তুমি সর্বত্র প্রচার কর গিয়ে। দুঃখে উন্নত, মরণভয়ে ভীত, পৃথিবীর স্বপ্নদর্শীদের অন্তরে নতুন আশার সঞ্চার হবে।”

বলুম—“আজ্ঞে হ্যাঁ, তা’ বলব বই কি!” ভাবলুম তাঁ’র পুনর্জন্মলাভে সবাইকার সঙ্গে আমারও কি আনন্দই না লাভ হবে!

তিনি স্নিগ্ধকোমলস্বরে বলতে লাগলেন, “পৃথিবীতে আমার প্রকৃতি খুব অস্বস্তিকরগোছের কড়া ছিল, অনেকেরই পক্ষে তা’ বরদাস্ত করা কঠিন ছিল,—ঠিক খাপ খেত না। তোমায় হয়ত’ আমি প্রয়োজনের চেয়েও অনেক বেশীবার ভৎসনা করেছি। কিন্তু তুমি সে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছ; আমার সকল তিরস্কার, সকল কঠিনশাসনের মেঘের মধ্য দিয়ে তোমার ভক্তির উজ্জল রশ্মির ছটা প্রকাশ পেয়েছে।” তারপর স্নেহকোমল স্বরে বলতে লাগলেন, “আজ আমি তোমায় বলতে এসেছি যে আর তুমি সে কঠিন তিরস্কারের রুদ্ধদৃষ্টি আমার কাছে দেখতে পাবে না; আর তোমায় আমি কখনও তিরস্কার করব না।”

হায়রে—আমার পরমদয়াল গুরুদেবের সেই সম্মেহ তিরস্কারও হারিয়ে আজ আমার মন কি দারুণ অন্ধকারে আচ্ছন্ন! তা’রা যে সব চলার পথের অন্ধকারে এক একটি দেবদূতের মত আমায় রক্ষা ক’রে আমায় সাবধানে পথ দেখিয়ে নিয়ে চলত। তা’ই বা সে সব আজ কোথায়?

“পরমারাধ্য গুরুদেব, আমায় হাজারবার বকুন,—এখনই আপনি আমার ভৎসনা ক’রে আবার আগেকার মত আমায় শাসন করুন।”

“না যোগানন্দ, আর তোমায় আমি কখনও বকব না,” তাঁ’র স্বর্গীয় কণ্ঠস্বর এখন গম্ভীর, অন্তঃসলিলা ফল্লুর মত তা’তে হাসির গুপ্তধারা প্রবাহিত। “ঈশ্বরের মায়াস্বপ্নে আমাদের এই ছোটো মূর্তি যতদিন আলাদা হয়ে থাকবে ততদিন আমরা দুজনেই একসঙ্গে আনন্দের হাসি হাসব। শেষে আমরা

দুজনে এক হয়ে গিয়ে সেই পরমাত্মায় মিশে যাব—আমাদের হাসি হবে তাঁ'রই হাসি, আমাদের দুজনের মিলিত আনন্দসঙ্গীত ঈশ্বরভাবে ভাবিত আত্মাদের কাছে ধ্বনিত হবে অনন্তকাল ধরে।”

তারপর শ্রীবক্তৃৎস্বর গিরিজী কতকগুলি বিষয়ে আমার কিছু উপদেশ দিলেন, যা' আমি এখানে এখন প্রকাশ ক'রে বলতে পারি না। সেই বোম্বাইয়ের হোটেলঘরে যে দু'ঘণ্টা তিনি আমার সঙ্গে কাটিয়েছিলেন সেই সময় তিনি আমার প্রত্যেকটি প্রশ্নের উত্তর দিয়েছিলেন। সেই ১৯৩৬ সালের জুনমাসে তিনি যেসব ভবিষ্যদ্বাণীগুলি ক'রে গিয়েছিলেন—তা' সব ইতিমধ্যেই ঘটে গিয়েছে।

“প্রিয় বৎস আমার, এবার আমি তা' হ'লে চলি।” শ্রীবক্তৃৎস্বর গিরিজীর কথাগুলি বলার সঙ্গে সঙ্গেই টের পেলুম যে আমার দৃঢ়সংবদ্ধ আলিঙ্গনের মধ্য থেকে তাঁ'র দিব্যদেহ যেন বিগলিত হয়ে মহাশূণ্ডে মিলিয়ে যাচ্ছে।

আমার আত্মাকাশে তাঁ'র সেই অপূর্ণ কণ্ঠধ্বনি বদ্ধত হয়ে উঠল, “বৎস, যখনই তুমি নির্বিকল্প সমাধিতে প্রবেশ ক'রে আমার ডাক দেবে, তখনই আমি তোমার কাছে এই রকম রক্তমাংসের শরীরে এসে হাজির হ'ব,—আজ যেমন এসেছি।”

তাঁ'র এই দিব্যপ্রতিজ্ঞার সঙ্গে সঙ্গে শ্রীবক্তৃৎস্বর গিরিজী আমার দৃষ্টির গোচর থেকে অদৃশ্য হয়ে গেলেন। মধুরসঙ্গীতের মূর্ছনায় তাঁ'র কণ্ঠস্বর মেঘমল্ল-ধ্বনিতে বদ্ধত হয়ে উঠল, “সকলকে বোলো যোগানন্দ!—বোলো যে যিনিই হোন না কেন, নির্বিকল্প সমাধি লাভ ক'রে জানতে পেরেছেন যে এই পৃথিবী ঈশ্বরের একটা স্বপ্ন বই আর কিছু নয়, তিনি স্বপ্নমৃষ্ট সূক্ষ্মতর হিরণ্যালোকে আসতে পারবেন—আর সেখানে আমার ঠিক পার্থিব শরীরের মতই সূক্ষ্মশরীরে পুনরুজ্জীবিত দেখতে পাবেন; যোগানন্দ, বোলো সকলকে এ কথা।”

আজ বিচ্ছেদের আমার সকল ব্যথা দূর হ'ল। তাঁ'র মৃত্যুর জ্ঞাত বেদনা আর শোক—যা' এতদিন ধরে আমার সকল শাস্তি হরণ ক'রে আসছিল, তা' আজ যেন লজ্জায় কোথায় মুখ লুকাল। আত্মার নবউন্মুক্ত অনন্ত রত্নপথে পরমানন্দের অমৃতধারা যেন এক বিরাট উৎস হ'তে সহস্রধারে উৎসারিত হয়ে প্রবেশ করতে লাগল। বহুদিনের অব্যবহৃত হৃদয়ের রুদ্ধদ্বার আজ কিসের

অপূর্ব আনন্দের এক বজ্রার বিভাডনে উদার উগ্ৰুক্ত হ'ল ; অন্তর পবিত্রতার ভরে গিয়ে আজ পূর্ণবিকশিত হয়ে উঠল। আজ আমার অন্তর ধ্বংস। আমার অতীতজীবনের ছায়াছবি সব চলচ্চিত্রের মত একে একে আমার অন্তঃকক্ষের সামনে ভেসে উঠল। আমার গুরুদেবের দিব্য আবির্ভাবের ফলে আমার ঘেরা স্বর্গীয় আলোকের মধ্যে আমার অতীতজীবনের সদস্য সবক'র্মই যেন মিলিয়ে গেল।

আমার আত্মজীবনীর এই অধ্যায়ে আমি গুরুআজ্ঞা শিরোদার্য্য ক'রে সেই আনন্দসংবাদ প্রচার করেছি, যদিও তা' বুঝতে অননুসন্ধিৎসু লোকেদের বুদ্ধি তা'তে বিপর্য্যস্তই হ'বে। ক্ষুদ্রতা, নীচতা, মাছুষের ভালরকমই জানা আছে ; হতাশাও তা'র অপরিচিত নয়—তবু এরা সব মনোবৈকল্যের ভাব, মাছুষের আসলস্বরূপের কোন অংশই নয়। যে দিন সে মনে দৃঢ়সঙ্কল্প গ্রহণ করবে সেই দিন থেকেই সে মুক্তির পথে পা বাড়াবে। “ধূলোর তুমি ধূলোর মিশ্রণে”, ছঃখবাদীদের এই চিন্তাবসাদক উপদেশই বহুদিন ধ'রে সে মনে এসেছে, শাপ্ত আত্মার চিরন্তন বাণীতে কখনও সে কর্ণপাত করে নি।

পুনরুজ্জীবিত মদীয় গুরুদেবকে যে কেবল একমাত্র আমিই দেখতে পেরেছিলুম তা' নয় ; আর একজনেরও সে সৌভাগ্য ঘটেছিল।

শ্রীবুদ্ধেশ্বর গিরিজীর শিষ্যাদের মধ্যে একটি বৃদ্ধা স্ত্রীলোক ছিলেন, সকলে আদর ক'রে তাঁকে “মা” ব'লে ডাকত। পুরী আশ্রমের কাছেই তাঁর বাড়ী। প্রাতঃসংগের সময় গুরুদেব প্রায়ই সেখানে এসে তাঁর সঙ্গে কথাবার্তা ক'রতেন। ১৯৩৬ সালের বোলই মার্চ তারিখে, “মা” আশ্রমে এসে তাঁর গুরুদেবকে দেখতে চাইলেন।

পুরী আশ্রমের তদানীন্তন ভারপ্রাপ্ত স্বামী সেবানন্দ তখন সেখানে,—বিবাদকরণ দৃষ্টিতে তাঁর দিকে চেয়ে বসে। “সেকি, গুরুদেব যে এক ষ্ট্রা হ'ল দেহরক্ষা করেছেন।”

তিনি হেসে বললেন, “তা কি হয় বাবা ! সে যে অসম্ভব, আপনার বোধে গুরুদেবের সঙ্গে আমার দেখাসাক্ষাৎ করতে দিতে মোটেই ইচ্ছে নাই। হাইরের লোকেদের হাও থেকে তাঁকে আড়াল ক'রতে চাইছেন—নয় ?”

সেবানন্দ বললে, “না, না, তা' নয়,” ব'লে তাঁর সমাধির সব বিবরণ দিয়ে

“মা”কে ডেকে বললে, “আচ্ছা আসুন, এই সামনের বাগানে শ্রীকৃষ্ণের গিরিজীর সমাধি দেখিয়ে দিচ্ছি!”

“ওসব কথা আমি কিছুই শুনতে চাইনে বাবা।” “মা” মাথা নেড়ে বললেন, “আরে না, না, এ সব কি কথা। তাঁ’র কোন সমাধিটমাধি হ’তেই পারে না। এই আজ সকালে যেমন তিনি বেড়াতে বেরোন, ঠিক তেমনি বেড়িয়ে বেলা দশটা নাগাদ আমার ছুরোরের সামনে দিয়ে যাচ্ছিলেন দেখলুম। দিনের বেলায় রাস্তায় দাঁড়িয়ে তাঁ’র সঙ্গে কথাবার্তা হ’ল খানিকক্ষণ ধ’রে। কি সব বলছেন আপনি! তিনি এমন কি আমায় বললেন পর্যাঙ্ক যে, ‘আজ সন্ধ্যাবেলা আমার আশ্রমে একবার এসো।’”

“তাই আমি এখন এসেছি বাবা! ভগবানের আশীর্বাদে গুরুদেব আমার চিরজীবী হোন! গুরুদেব আমার অমর, তাঁ’র কি কখনও মৃত্যু ঘটতে পারে? তা’ই আমার অমর গুরু আমায় জানিয়ে গেলেন যে কি দিব্যদেহে তিনি আজ সকালে আমায় দর্শন দিলেন!”

বিস্ময়ে হতবাক্ সেবানন্দ তাঁ’র সামনে নতজানু হয়ে বললে, “মা, আমার মন থেকে যে কি গুরু শোকের পাবাণভার আজ আপনি তুলে নিলেন, তা’ আর কি বলব! ঠিকই ত’, তাঁ’র তিরোভাব ত’ কখনও ঘটেনি, তা’ই তিনি পুনরুত্থিত হয়ে আবার দেখা দিয়ে গেলেন!”

৪৪শ পরিচ্ছেদ

ওয়ার্কায় মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে

আগষ্ট মাসের ভোরবেলা। ট্রেনের ধূলা আর গরমের হাত থেকে রেহাই পেয়ে মিস্ ব্রেচ, মিঃ রাইট আর আমি ওয়ার্কা স্টেশনে নেমে পড়লুম। মহাত্মা গান্ধীর সেক্রেটারী শ্রীবৃক্ত মহাদেব দেশাই আমাদের সম্বর্দ্ধনার জন্য সেখানে উপস্থিত।

“ওয়ার্কা স্বাগত!” বলে খদ্দেরের মালা দিয়ে শ্রীবৃক্ত দেশাই আমাদের আন্তরিক অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করলেন। মালপত্র একটা গরুর গাড়ীতে চালান করে দিয়ে আমরা একটা খোলা মোটর গাড়ীতে উঠে পড়লুম। সঙ্গে চললেন শ্রীবৃক্ত মহাদেব দেশাই আর তাঁ’র সঙ্গীগণ, বাবাগাহেব দেশমুখ আর ডাক্তার পিঙ্গলে। কর্দ্মাক্ত গ্রাম্যপথের উপর দিয়ে গাড়ী চলল। অল্পক্ষণ পরেই মগনবাদী পৌছলুম, ভারতের রাষ্ট্রপুঙ্কর আশ্রমে।

শ্রীবৃক্ত দেশাই আমাদের সরাসরি মহাত্মাজীর লেখবার ঘরে নিয়ে গিয়ে হাজির করলেন। মহাত্মা গান্ধী সেখানে মেঝের উপর বসে রয়েছেন, একহাতে কলম আর একহাতে কাগজ,—প্রশান্তবদনে উদার মধুর প্রাণখোলা হাসি।

সেদিন ছিল সোমবার, মহাত্মাজীর মৌনব্রত পালনের দিবস। কথা বলবার উপায় নেই। কাছেই তিনি লিখে জানালেন—অবশ্য হিন্দিতে, “স্বাগত!”

যদিও আমাদের এই প্রথম সাক্ষাৎ, তবুও মনে হ’ল যেন আমাদের কতকালের পরিচয়। দুইজনেই হাসলুম। ১৯২৫ সালে গান্ধীজী রাঁচি বিদ্যালয় পরিদর্শন করে তা’কে সম্মানিত করেন আর সেখানকার পরিদর্শকদের খাতায় বিদ্যালয় সম্বন্ধে উচ্চ মন্তব্যই লিখে দিয়ে এসেছেন।

মাত্র একশতপাউন্ডের এই ক্ষুদ্রকায় মহামানবটি থেকে যেন দৈহিক,

মানসিক আর আধ্যাত্মিক একটা স্বাস্থ্যের জ্যোতিঃ বিচ্ছুরিত হচ্ছিল। শিখ, খুসর চক্ষু দুটি আন্তরিকতা আর তীক্ষ্ণবুদ্ধির দীপ্তিতে উজ্জ্বল; রাষ্ট্রপুঙ্ক গান্ধীজী হাজাররকমের আইনসংক্রান্ত, সামাজিক আর রাজনৈতিক বুদ্ধে জরী হয়ে ফিরে এসেছেন। গান্ধীজী ভারতের কোটিকোটি মুক জনসাধারণের হৃদয়ে যে স্নানির্দিষ্ট স্থানটি অধিকার করেছেন, পৃথিবীতে আর কোন নেতা তেমনটি পারেন নি! তা'দের হৃদয়ের স্বতঃউৎসারিত শ্রদ্ধা তাঁ'র বিশ্ববিশ্রুত “মহাত্মা” নামেই প্রকাশ পেয়েছে। ভারতের উপেক্ষিত, পদদলিত জনসাধারণ—যা'দের এর চেয়ে আর বেশী কিছু জোটে না, কেবল তা'দেরই জন্তে গান্ধীজী সাধারণতঃ কটিবাসের অতিরিক্ত আর কিছু পরিধান করেন না।

শ্রীযুক্ত মহাদেব দেশাই গান্ধীজীর লেখবার ঘর থেকে আমাদের অতিথিশালায় নিয়ে যাবার সময় মহাত্মাজী তাঁ'র স্বভাবসুলভ সৌজাত্যের সঙ্গে এই ক'টি কথা তাড়াতাড়ি লিখে আমার হাতে দিলেন, “আশ্রমবাসীরা সকলেই আপনাদের সেবার জন্ত প্রস্তুত; কোন কিছু'র প্রয়োজন হ'লেই দয়া ক'রে তা'দের সব জানাবেন।”

শ্রীযুক্ত দেশাই আশ্রমের ফলকুলের বাগানের ভিতর দিয়ে আমাদের নিয়ে গিয়ে তুললেন একটা টালি দিয়ে ছাওয়া বাড়ীতে—জানালাগুলো সব জাক্‌রি দেওয়া। সামনের উঠানে একটা কুয়া, প্রায় পঁচিশফুট চওড়া, শ্রীযুক্ত দেশাই বললেন গবাদি পশুর জলপানের জন্ত ব্যবহৃত হয়; খানভানার জন্তে কাছেই একটা ঘোরাবার সিমেণ্টের চাকা রয়েছে। আমাদের প্রত্যেকের ছোট ছোট শোবার ঘরে—একেবারে যা' না হ'লে আর চলে না—সেই একটিনাত্র ক'রে হাতে তৈরী দড়ির খাটিয়া। চুণকামকরা রান্নাঘরের এক কোণে একটি জলের কল আর আরেক কোণে রাধ'বার জন্তে আগুনের আখা। সরল গ্রাম্যপরিবেশের মধ্যে যে সব শব্দ কাণে আসতে লাগল—তা' হচ্ছে কাকচড়াইএর ডাক, গরুবাছুরের হাঙ্গারব আর পাথরকাটার জন্ত বাটালির শব্দ!

রাইট সাহেবের ভ্রমণ ডায়েরী দেখে শ্রীযুক্ত দেশাই একটি পাতা খুলে

* তাঁ'র পিতৃদত্ত নাম, মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী। তিনি নিজেকে কখনও “মহাত্মা” বলে উল্লেখ করতেন না।

সত্যাগ্রহীদের সত্যাগ্রহের* প্রতিজ্ঞাগুলি সব একে একে লিখে দিলেন, যথা :—“অহিংসা, সত্য, অচোর্যা, কৌমার্যা, অপরিগ্রহ, কার্যিক পরিশ্রম, রসনাসংযম, নির্ভীকতা, সকল ধর্মের প্রতি সমান শ্রদ্ধাপ্রদর্শন, স্বদেশী দ্রব্যব্যবহার আর অস্পৃগতা পরিহার। এই এগারটি নিত্যন্ত অমুগতভাবে ব্রতস্বরূপ পালন করতে হবে।”

(মহাত্মা গান্ধী স্বয়ং এই পাতাটি তাঁর পরেরদিন স্বাক্ষর করেছিলেন, তারিখ দিয়েছিলেন—২৭শে আগষ্ট ১৯৩৫।)

আমাদের পৌছবার ঘণ্টাটুই পরে আমাদের সঙ্গীদের নিয়ে খেতে বাবার ডাক পড়ল। তাঁর পড়াশোনার ঘর থেকে একটু তফাতে উঠানের ওপারে আশ্রমের ছাওয়া বারান্দা। তাঁর তলায় তিনি ইতিমধ্যে বসে গেছেন। প্রায় পঁচিশটি নগ্নপদ সত্যাগ্রহীও সেই সঙ্গে বসেছেন, সামনে পিতলের খালাবাটি। আহারের পূর্বে সমবেত প্রার্থনা। তাঁরপর একটা প্রকাণ্ড পিতলের পাত্র হতে ঘি মাখান চাপাটি দেওয়া হ'ল। তাঁর সঙ্গে তালসরি (টুকুরো টুকুরো শাকসব্জী সিদ্ধ) আর একটু লেবুর আচার।

মহাত্মাজী খেলেন চাপাটি, বীটসিদ্ধ, কিছু কাঁচা শাকসব্জী আর কমলালেবু। তাঁর খালার একধারে বড় একতাল নিমপাতা বাটা—রক্ত পরিকারক গুণের জন্তে প্রসিদ্ধ! তাই থেকে খানিকটা চামচে দিয়ে ভেঙ্গে নিয়ে আমার পাতে দিলেন। আমি আর কি করি, খানিকটা জল দিয়ে সেটা টোঁক করে গিলে ফেললুম। মনে পড়ল ছেলেবেলাকার কথা,—মা যখন আমায় এই অত্যন্ত অপ্রীতিকর বস্তুটির গলাধঃকরণে আমায় বাধ্য করতেন। গান্ধীজী কিন্তু বেশ টুকটুক করে সেই নিমবাটাটি খেয়ে ফেললেন, যেন ভীমনাগের সন্দেশ খাচ্ছেন আর কি।

অবশ্য ঘটনাটা নিত্যন্তই তুচ্ছ আর সাধারণ, কিন্তু তা'তেই আমি লক্ষ্য করলুম যে, ইচ্ছিবোধ থেকে ইচ্ছামাত্র মনকে বিবুক্ত করবার ক্ষমতা গান্ধীজীর আছে। মনে পড়ল বছরকতক আগে তাঁর উপাঙ্গে অঙ্গোপচার করা হয়েছিল, সে সময় অবসাদক প্রয়োগ উপেক্ষা করে গান্ধীজী সারা অঙ্গোপচারের সময় তাঁর শিষ্যদের সঙ্গে বেশ প্রকুলচিত্তেই গল্প করেছিলেন।

* সত্যাগ্রহ—মহাত্মা গান্ধী কর্তৃক প্রবর্তিত তাঁর নিখনিখাত অহিংস সংগ্রাম।

তাঁর হাসির উচ্ছ্বাসে টেরই পাওয়া গেল না যে তিনি কোন কষ্টবোধ করছেন।

সেই সময় গান্ধীজীর এক বিখ্যাত শিষ্যা, এক ইংরেজ নৌসেনাপতির কন্যা, মিস্ ম্যাডেলিন স্নেড্,—বর্তমানে মীরাবাই* নামে পরিচিতা, সেখানে বাস করছিলেন; বৈকালে তাঁর সঙ্গে আলাপের খানিক স্নযোগ পাওয়া গেল। কথাবার্তা কইলেন নিভুল হিন্দীতে; তাঁর দৈনন্দিন কার্যের বিবরণ দিতে দিতে তাঁর দৃঢ় ও শাস্ত বদন উৎসাহে প্রদীপ্ত হয়ে উঠল।

“গ্রাম পুনঃসংগঠনের কাষে পুরস্কার আছে! রোজ ভোর পাঁচটার সময় আমাদের একটি দল কাছাকাছি গ্রামের লোকেদের মধ্যে কাষ করতে যায় তাঁদের সরল স্বাস্থ্যবিধিগুলি শিখিয়ে দিতে। কাষের মধ্যে আমাদের একটা নিয়ম থাকে, তাঁদের আঁস্তাকুড়, পায়খানা প্রভৃতি আর মাটির কুঁড়েঘরগুলি পরিষ্কার করে দেওয়া। গাঁয়ের লোকেরা নিরক্ষর, কাষেই উদাহরণ না দেখালে ত’ আর তা’রা শিখতে পারবে না!” বলে হাসিতে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন।

প্রগাঢ় শ্রদ্ধায় আমি অবাক হয়ে চেয়ে রইলুম এই উচ্চকূলসমূহা সঙ্ঘশজাতা ইংরেজরমণীটির প্রতি, যাঁর প্রকৃত খ্রীষ্টানুগত্য কেবলমাত্র “অম্পৃশ্য”দের দ্বারাই যে কাষ হয়—সেই ময়লাপরিষ্কারের কাষ করবারও সামর্থ্য যাঁকে দিয়েছে!

তিনি আমাকে বললেন, “১৯২৫ সালে আমি ভারতে আসি; এদেশে এসে দেখলুম যে আমি ‘আমার ঘরে ফিরে এসেছি!’ এখন আমি আর আমার পুরান জীবন বা পুরান কাষে আর ফিরে যাচ্ছিনে!”

* কখনও কখনও মীরা বেহন বলেও অভিহিতা হন; মহাত্মা কর্তৃক তাঁকে লেখা কতকগুলি পত্র তিনি পুস্তকাকারে প্রকাশিত করেছেন, যাঁতে তাঁর গুরু কর্তৃক প্রদত্ত আত্মনিয়ন্ত্রণের শিক্ষাপ্রণালী প্রদর্শিত হয়েছে। (গান্ধীস্ লেটার্স টু এ ডিসাইপল্; নিউ ইয়র্ক; হার্পার এণ্ড ব্রাদার্স, ১৯৫০; মূল্য আড়াই ডলার)।

মীরাবাই এখন হরীকেশের কাছে পশুলোকে এক আশ্রমের ভার গ্রহণ করেছেন। সেখান থেকে বহু কৃষকদের কাছে গুণ্ডপত্রাদি আর কৃষিকার্য্যদক্ষতার নানা সাহায্য পাঠান হয়। তিনি গান্ধীজীর বাণী স্মরণ করে চলেন, “আমি মানবজাতির সেবার মধ্য দিয়েই ভগবানের দর্শনলাভের চেষ্টা করছি, কারণ আমি জানি যে তিনি উঁচু স্বর্গেও নেই আর নিচু পাতালেও নেই, তিনি অছেন সবার ভিতরে।”

আমেরিকা সম্বন্ধে কিছুক্ষণ কথাবার্তা হ'ল। তিনি বললেন, “ভারতে বেড়াতে এসে বহু আমেরিকান যে আধ্যাত্মিক বিষয়ে গভীর আগ্রহ প্রকাশ করে থাকেন, তা' দেখে আমি বাস্তবিকই খুব খুসী আর আশ্চর্য্যও বটে!”*

নীরাবাই সঙ্গে সঙ্গে চরকাঘোরান শুরু করলেন। অবিশ্রি না বললেও চলে যে আশ্রমের ঘরেঘরেই চরকা আর মহাত্মাজীর প্রভাবে ভারতের গ্রামে গ্রামে আজ সর্বত্রই চরকা বিস্তৃতি লাভ করেছে।

কুটিরশিল্প পুনঃপ্রবর্তনের জন্ত গান্ধীজীর অবশ্য গভীর অর্থনৈতিক আর সংস্কৃতিগত কারণ আছে, কিন্তু তা' হলেও তিনি উন্নাদের মত বর্তমান যুগের প্রগতিমূলক সবকিছু পরিহার করে চলতে বলেন না। যন্ত্রপাতি, রেলগাড়ী, মোটরগাড়ী, টেলিগ্রাফ সবই তা' তাঁ'র বিরূপ কৰ্ম্মজীবনে খুব বড় বড় অংশই গ্রহণ করেছে। পঞ্চাশবছরের জনসাধারণের সেবায়, কি কারাগারে, কি বাইরে থেকে, রাজনৈতিক জগতের কঠিন বাস্তবতা আর নানা খুঁটিনাটি সক্রিয়ব্যাপারের দৈনিক সংঘর্ষে এসে, তাঁ'র মানসিক স্থৈর্য্য, স্বজ্ঞতা, স্থিরবুদ্ধি আর এই অপরূপ মানবপ্রদর্শনীর তাঁ'র সরস গুণবিবেচন কেবল বর্দ্ধিতই করে তুলেছে।

বাবাসাহেব দেশমুখ আমাদের সাক্ষ্যভোজনে নিমন্ত্রণ করলেন, সন্ধ্যা ষ্টার সময়। সন্ধ্যা ৭টার মগনবাদী আশ্রমে ফিরে এলুম; আশ্রমের ছাদে প্রার্থনাসভায় গান্ধীজীকে অর্দ্ধচন্দ্রাকারে বেষ্টন করে রয়েছেন প্রায় জনবিশেক সত্যাগ্রহী। একটা মাদুরের উপর তিনি ব'সে। একটি পুরান ট্যাক্সিডি তাঁ'র সামনে ঝুলান রয়েছে। অস্তাচলগামী সূর্য্যের শেবকিরণলেখা মথ, তাল প্রভৃতি গাছের উপর ছড়িয়ে পড়ছিল। উচ্চিৎরে একঘেয়ে সুর ইতিমধ্যেই আরম্ভ হয়ে গেছে। চারদিকে একটা গভীর প্রশান্তি বিরাজ করছে। মন গভীর আনন্দে ভরে উঠল।

* মিস্ ক্লেডের বিষয় আমায় আর একটি বিশিষ্ট মার্কিন মহিলার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়—তিনি হাচ্চন মিস্ মার্গারেট উড্রো উইলসন; আমেরিকার স্বনামধন্য প্রেসিডেন্ট উড্রো উইলসনের প্রাণী কথা। নিউ ইয়র্ক সহরে তাঁ'র সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়। ভারতবর্ষ সম্বন্ধে তাঁ'র গভীর আগ্রহ কথা গেল। পরে তিনি পণ্ডিচেরীতে গমন করে তাঁ'র জীবনের শেষ পাঁচবৎসর শ্রীঅরবিন্দের পদতলে সন্মান্য অতিবাহিত করেন। শ্রীঅরবিন্দ যোনী ছিলেন, বৎসরের তিনটি দিবস কেবলমাত্র দর্শনার্থী নিয়মিত ও অতিথিঅভ্যাগতদিগকে নীরবে দর্শনদান করতেন। ইনি গত ৫ই ডিসেম্বর ১৯৫০, বয়সে অগ্রহায়ণ ১৩৫৭ মঙ্গলবার দেহরক্ষা করেন।

শ্রীবুদ্ধ দেশাই একটি স্তোত্র গভীরভাবে আবৃত্তি শুরু করলেন, নলের অত্যাশ্রয় সকলে তাঁর সঙ্গে যোগদান করলেন; তাঁরপরে গীতাপাঠ। মহাশয়াজী আমাদের শেষপ্রার্থনাটি করতে ইঙ্গিত করলেন। চিন্তা আর আশার কি দৈব-সম্মিলন। সন্ধ্যাতারার বিরাট চন্দ্রাতপতলে ওরাকীর আশ্রমের ছাদে ভগবৎ আরাধনা—এ আমার চিরদিনের স্মৃতি হ'য়ে রইল।

ঠিক রাত আটটার সময় গান্ধীজী তাঁর মৌন ভঙ্গ করলেন। তাঁর জীবনের যে বিরাট কাষ, তা'তে তাঁর সময় খুব হিসেব ক'রেই ভাগ ক'রে নিয়ে তাঁকে চলতে হয়।

“স্বাগত, স্বামীজী!” এবার আর তাঁর বাণী কাগজের মারফতে আমার কাছে এসে পৌঁছল না। এখন আমরা ছাদ থেকে নেমে এসে তাঁর লেখবার ঘরে প্রবেশ করলুম,—মেঝেতে নাচুরপাতা (চেরার নাই), একটা নীচু ডেস্ক, তা'তে বই, কাগজ আর গোটাকতক সাধারণ কলম (ফাউন্টেন পেন নয়); একটি অখ্যাত ও অজ্ঞাতকুলশীল ঘটিকাযন্ত্র ঘরের এককোণে অবস্থিতি ক'রে তা'র অস্তিত্ব জ্ঞাপন করছে। সর্বব্যাপী একটা গভীর প্রশান্তি আর নিষ্কার ভাব বিद्यমান। গান্ধীজীর প্রায় দস্তবিহীন মুখগহ্বরবিগলিত প্রাণখোলা হাসি পরম উপভোগ্য।

গান্ধীজী বললেন, “বছরকতক আগে আমি সপ্তাহে একদিন মৌনী থাকা আরম্ভ করলুম—আমার চিঠিপত্র দেখাশোনা ক'রার জন্তে। কিন্তু এখন সে চক্ৰিশযণ্টা আমার একটা দারুণ আধ্যাত্মিক প্রয়োজনে দাঁড়িয়ে গেছে। সাময়িক মৌনব্রতপালন, শাস্তি নয়—আশীর্বাদ!”

সর্বান্তঃকরণে আমি তা'তে সায় দিলুম।* আমেরিকা ইউরোপ সম্বন্ধে গান্ধীজী আমায় প্রশ্ন করলেন; তাঁরপর আমাদের ভারতবর্ষ আর পৃথিবীর পরিস্থিতি সম্বন্ধে আলোচনা চলল।

শ্রীবুদ্ধ দেশাই ঘরে ঢুকতেই গান্ধীজী বললেন, “মহাদেব, কালরাত্রি টাউন হলে স্বামীজীর যোগসম্বন্ধে বক্তৃতা দেবার ব্যবস্থা কর।”

তাঁরপর রাত্রে শয়নের পূর্বে বিদায় নেবার সময় গান্ধীজী অত্যন্ত বিবেচনাসহকারে আমায় এক শিশি লেবুর তেল দিয়ে হেসে বললেন,

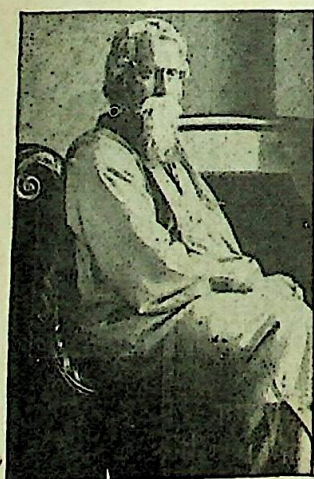
* আমার সেক্রেটারী ও অতিথিঅভাগতদিগের নানা অঙ্গবিধাসম্বন্ধে আমেরিকায় আমি বহু বৎসর ধ'রেই মৌনব্রত পালন ক'রে আসছি।



১৯৩৫ সালের আগষ্ট মাসে ওয়ার্কার আশ্রমে
মহাত্মা গান্ধীজীসহ ভোজনরত আমি ।



কলিকাতা কেন্দ্র—৪নং গড়পার রোড।



রবীন্দ্রনাথ।



বৃন্দাবনে স্বামী কেশবানন্দের “কাত্যাবনী
আশ্রমে” মিষ্টার রাইটসহ আমি।

“ওয়ার্কার মশার। কিন্তু আপনার ওসব অহিংসাতহিংসা* কিছুই মানে না, বুঝলেন স্বামীজি—একটু সাবধান হ’য়ে শোবেন।”

তা’র পরদিন সকালে আমরা সবাই দুধ আর গুড়ের সঙ্গে জুস্বাহু গমের ছাতুর মাগু দিয়ে প্রাতরাশ সম্পন্ন করলুম। বেলা প্রায় সাড়েদশটার সময় আমাদের সকলের খাবার ডাক পড়ল। গান্ধীজী আর অগ্ন্যাগ্ন সত্যগ্রহীরাও সব বসেছেন। আজকের খাবারের কর্দ হচ্ছে রাঙাচালের ভাত, নতুনধরণের তরকারী আর এলাচ দানা।

দুপুরে আশ্রমের জমিতে কিছুক্ষণ বেড়ালুম। মাঝে পড়ল কয়েকটি শাস্ত নিরীহ গাভীর গোচারণের মাঠ। গোরক্ষ গান্ধীজীর একটা বিশেষ রৌক।

মহাত্মাজী বলতে লাগলেন, “আমার কাছে গোজাতি মানে হচ্ছে সম্পূর্ণ মানবতর পৃথিবী...বা’র উপর মানুষের নিজের জাত ছাড়াও তা’র মহাত্মভূতি বিস্তৃত। এই গোজাতির মধ্য দিয়েই মানুষ সকল প্রাণীর সঙ্গে তা’র ঐক্য অনুভব করতে পারে। প্রাচীন ধর্মেরা কেন যে গোজাতিকে পূজার জন্তে নির্বাচিত করেছিলেন তা’ আমার কাছে বেশ স্পষ্ট! ভারতবর্ষের গোজাতিই হচ্ছে শ্রেষ্ঠ উদাহরণ; প্রাচুর্যের দাত্রী সে। কেবল-না যে সে দুগ্ধপ্রদানই ক’রে এসেছে তা’ নয়, কৃষিকার্য্যও সে সম্ভবপর ক’রে তুলেছে। শাস্তপ্রাণীদের কাছেই অনুকম্পা দেখতে পাওয়া যায়। গাভী হচ্ছে অনুকম্পার কাব্যরূপ। মানুষজাতির মধ্যে কোটিকোটি লোকেদের কাছে সে আর একটি মা! গোসংরক্ষণ মানে ভগবানের রাজ্যে সমগ্র মূক প্রাণীজাতির সংরক্ষণ। সৃষ্টির নিয়ন্ত্রণের আবেদন সব চেয়ে বেশী শক্তিশালী, কারণ তা’রা হচ্ছে মূক আর অসহায় জীব।”

নিষ্ঠাবান হিন্দুর অবশ্যপালনীয় তিনটি আত্মিকক্রিয়ার মধ্যে হচ্ছে একটি হৃতযজ্ঞ—পশুপক্ষীদের মধ্যে আহারবিতরণ। এই আচারপালন হচ্ছে সৃষ্টির নিয়ন্ত্রণের প্রাণীদের প্রতি মানুষের কর্তব্য উপলক্ষির প্রতীক; এরা সহজাত

* অহিংসা—গান্ধীমতবাদের মূলভিত্তি। তিনি গোড়া জৈনপরিবারে জন্মগ্রহণ ক’রেছিলেন; জৈনরা অহিংসাকেই ধর্মের মূল বলে মানে। হিন্দুধর্মের এক শাখা জৈনধর্মের প্রবল প্রচারক মহাবীর কর্তৃক ষোড়শশতাব্দীতে; তিনি ছিলেন বুদ্ধদেবের সমসাময়িক। মহাবীর—খ্যাতি শ্রেষ্ঠ বীর; আজ তিনি যেন এই শতাব্দীসমূহের গাঢ় অন্ধকার ভেদ ক’রে তাঁর এই বীরপুত্রের প্রতি করুণ নেত্রপাত করেন।

প্রবৃত্তি নিয়ে দেহবোধে আবদ্ধ, যা' মানবজীবনও ক্ষয় করে কিন্তু মানবজাতির যে বৈশিষ্ট্য—যুক্তিপ্রদায়িনী যে বিচার ও যুক্তি, তা' এদের মধ্যে নাই। ভূত-যজ্ঞ এইরূপে দুর্বল প্রাণীদের পুষ্টিদানের জন্ত মানুষের তৎপরতাকে দৃঢ় ক'রে তোলে। সেও আবার আর একদিক দিয়ে উচ্চতর অদৃশ্যজীবদের অগণিত মঙ্গল আকাঙ্ক্ষা প্রভৃতির দ্বারা সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্যলাভ করে। ভূমি, সমুদ্র, আর আকাশে প্রকৃতির যে অফুরন্ত সঞ্জীবন দান ছড়ান রয়েছে তা'র কাছের মানুষ ঋণী। এই যে মুকপ্রকৃতি, প্রাণী, মানুষ আর পরলোকের দূতদেব পরস্পরের মধ্যে আদানপ্রদানের যে বিবর্তনের বাধা রয়েছে, তা' এইরকম নীরব ভালবাসার কাষের দ্বারাই অতিক্রম করা যায়।

আর দুটি দৈনিক যজ্ঞ হচ্ছে পিতৃ আর নৃ। পিতৃযজ্ঞ হচ্ছে পিতৃপুরুষদের তর্পণ—তাঁদের কাছে ঋণের রূতজ্ঞতাস্বীকারের চিহ্ন, যাঁদের জ্ঞানের উৎকর্ষে আজ এ মানবজাতি আলোকিত। আর নৃযজ্ঞ হচ্ছে অপরিচিত অথবা দরিদ্রদের মধ্যে আহাৰ্য্যবিতরণ; এর উদ্দেশ্য হচ্ছে মানুষের বর্তমান দায়িত্ব—তাঁর সমসাময়িকদের প্রতি কর্তব্যপালন।

বিকালবেলা গান্ধী আশ্রমে ছোট ছোট মেয়েদের দেখতে গিয়ে আমি স্থানীয় পল্লীর মধ্যে নৃযজ্ঞ পালন করলুম। রাইট সাহেবও সঙ্গে গিয়েছিল, যেতে মিনিট দশেক লাগল। রঙবেরঙের শাড়ীর উপর মেয়েদের ছোট ছোট মুখগুলি যেন ফুলের মত ফুটে রয়েছে। কঁাকা জায়গায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হিন্দীতেই* কথাবার্তা চলছিল—হঠাৎ এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেল; কি আর করি, হেসে রাইট সাহেব আর আমি তাড়াতাড়ি গাড়ী চেপে মগনবাদীতে ফিরে এলুম। সারা পথে দারুণ বৃষ্টি!

অতিথিশালায় প্রবেশ ক'রে সর্বত্র অনাড়ম্বর সরলতা আর আত্মত্যাগের সাক্ষ্য দেখে যেন আবার নতুন ক'রে আশ্চর্য্য হয়ে গেলুম। অপরিগ্রহ গান্ধী-ব্রত তাঁর বিবাহিত জীবনের গোড়ার দিকেই শুরু হয়। মহাত্মাজী তাঁর বিরাট আইনের প্র্যাক্টিস, যা'তে ক'রে তাঁর বাৎসরিক প্রায় ৬০,০০০ টাকা আয় ছিল, তা' পরিত্যাগ ক'রে তাঁর যাবতীয় সম্পত্তি দরিদ্রদের মধ্যে বিতরণ ক'রে দেন। ত্যাগের সাধারণ অপ্রচুর ধারণাসম্বন্ধে শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজী উপহাস ক'রে বলতেন,—

* ৩৬৪ পৃষ্ঠার পাদটিকা দ্রষ্টব্য।

“ভিখারী ত’ ধনরত্ন দান করতে পারে না। কেউ যদি আক্ষেপ ক’রে বলে... ‘আমার ব্যবসা দেউলে হয়েছে, আমার স্ত্রী আমার ত্যাগ করেছে, আমি সব ত্যাগ ক’রে ফকিরী নো’ব—তা’তে ক’রে পৃথিবীতে তা’র ত্যাগের বড়াই আর থাকে কোথায়? সে ত’ ধনসম্পত্তি, মেহ, ভালবাসা ত্যাগ করেনি—তা’রাই সব তা’কে ত্যাগ করেছে।”

গান্ধীজীর মত মহাপুরুষেরা যে শুধু সাক্ষাৎ কোন বিশেষ ত্যাগ ক’রেই মহীয়ান তা’ নয়, তাঁদের ত্যাগ আরও কঠিন, আরও উচ্চ; তাঁরা তাঁদের সকলপ্রকার স্বার্থচিন্তা বা ব্যক্তিগত উদ্দেশ্য সব ত্যাগ ক’রে তাঁদের অন্তরতম আত্মাকে অশুভ মানবজীবনস্রোতে ভাসিয়ে দিয়েছেন।

গান্ধীজীরও স্বনামধন্য স্ত্রী কস্তুরাবাই, যখন গান্ধীজী তাঁর নিজের আর তাঁর সন্তানসন্ততিদের জন্মে তাঁর নিজ সম্পত্তির কোনও অংশ স্বতন্ত্র ক’রে রাখতে অসমর্থ হলেন, তখনও তিনি কোন আপত্তি করেন নি। প্রথম-যৌবনে গান্ধীজী বিবাহিত হয়েছিলেন—তা’রপর শুটিকতক সন্তানসন্ততি-লাভের পরঃ গান্ধীজী ও তাঁর স্ত্রী ব্রহ্মচর্য্যপালনের প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করেন। এই গভীর নাটকে বা’তে তাঁদের উভয়ের জীবন অভিনীত, তা’তে কস্তুরাবাই হচ্ছেন একজন বীর স্থির নায়িকা, কোন বিপদেই বিচলিত হন নি—অকম্পিতপদে স্বামীর সঙ্গে কারাবাসে গেছেন, তাঁর তিনসপ্তাহব্যাপী উপবাসে অংশ গ্রহণ করেছেন, এবং তাঁর বহুবিধ দারিদ্র্যের ভারগ্রহণে অংশ নিয়েছেন। তিনি গান্ধীজী সম্বন্ধে এই কথাগুলি বলেছেন :—

“তোমার জীবনসঙ্গিনী আর সহকর্মিনী হবার সৌভাগ্যলাভে আমি

* “দি ষ্টোরী অফ্‌ মাই এন্ট্রপেরিমেন্টস্‌ উইথ্‌ টুথ্‌” (আমেদাবাদ, নবজীবন প্রেস হ’তে দুই খণ্ডে প্রকাশিত, ১৯২৭-২৯) নামক পুস্তকে গান্ধীজী তাঁর জীবনের সকল তথ্যই নির্দ্বন্দ্বভাবে উদ্ঘাটিত করেছেন। এই আত্মজীবনীটি জন হেনস্‌ হোমসের মুখবন্দনযুক্ত এবং সি, এফ, এণ্ড্‌ জ্‌ কর্তৃক সম্পাদিত “মহাত্মা গান্ধী—হিজ্‌ ওন্‌ ষ্টোরী” (ম্যাক্সিমিলান্‌ কোং, নিউ ইয়র্ক, ১৯৩০ সালে প্রকাশিত) নামক পুস্তকে সংক্ষেপিত হয়েছে।

বিখ্যাত বিখ্যাত ব্যক্তিদ্বয়ের নাম আর নানা বিচিত্র ঘটনার বিবরণপূর্ণ বহু আত্মজীবনীতেই কিন্তু লেখকের আত্মবিশ্লেষণ অথবা আত্মবিকাশের কোন ধারার সম্বন্ধে তাঁরা প্রায় একেবারেই নীরব থাকে। এইগুলি পড়ে পাঠককে কতকটা অভূতপূর্ব সঙ্গের বইটি নামিয়ে রেখে যেন বলতে হয়,— “জীবনী ধাঁ’র পড়লুম, তিনি ত’ অনেক বড় বড় লোকদেরই পরিচয় পেয়েছিলেন, কিন্তু এতে দেখছি যে তিনি নিজের পরিচয় কখনও পান নি; গান্ধীজীর আত্মজীবনী পড়ে একরূপ প্রতিক্রিয়া কখনও হয় না, তিনি তাঁর নিজের দোষত্রুটি, ছলকপটতা প্রভৃতি, সত্যের প্রতি তাঁর এমন অবিকলিত শ্রদ্ধার সঙ্গে দেখিয়েছেন যে কোন যুগের ইতিহাসে তেমন লেখা আর কোথাও দেখা যায় নি।

তোমাকে ধন্যবাদ দিই। আর ধন্যবাদ দিই পৃথিবীতে সর্বাপেক্ষা আদর্শ বিবাহের জন্তে যা' ব্রহ্মচর্যের উপর প্রতিষ্ঠিত—বৌনলিঙ্গার উপর নয়। ধন্যবাদ দিই ভারতের জন্ত তোমার জীবনের কাষে তোমার সমান ভেবে আমার গ্রহণ করেছ ব'লে। আর তুমি যে সেইসব স্বামীদের মতন, যা'রা জুরা, ঘোড়দোড়, সুরা, নারী আর গানবাজনাতেই সময় কাটিয়ে দেয় আর ছোটছোট ছেলেদের যেমন শীঘ্রই তা'দের খেলনার উপর ক্লাস্তি এসে পড়ে তেমনি তা'দের স্ত্রীপুত্রের উপরও বিরাগ দেখা দেয়—সেরকমটি নও ব'লে আমি তোমায় ধন্যবাদ দিই। আর আমি যে কত কৃতজ্ঞ যে তুমি পরের শ্রম অপহরণ ক'রে বড়লোক হবার জন্তে যা'রা সময় ব্যয় করে, তা'দের মতন স্বামী নও ব'লে!

“আর ধন্যবাদ দিই যে তুমি ঈশ্বর আর দেশকে যুবের উঁচুতে স্থান দিয়েছ, যে তোমার আত্মবিশ্বাস, সাহস আর ঈশ্বরের উপর পরিপূর্ণ আর অখণ্ড বিশ্বাস আছে। আমার এমন স্বামীকে ধন্যবাদ দিই যে তিনি ভগবান আর তাঁ'র দেশকে আমার চেয়েও উঁচুতে স্থান দিতে পেরেছেন। আর আমি কৃতজ্ঞ তোমার কাছে তোমার অপরিমিত সহশৃঙ্খলের জন্তে, আমার যৌবনের দোষ, ত্রুটি সব মার্জনা ক'রে নেওয়াতে—তখন অত প্রাচুর্যের মধ্য থেকে অত অশ্বচ্ছলতার মধ্যে গিয়ে পড়ে আমাদের জীবনযাপনের ধারা পরিবর্তন করাতে কত না আক্ষেপ, কত না বিদ্রোহ তোমার বিরুদ্ধে করেছি।

“ছোট শিশু অবস্থায় তোমাদের বাড়ীতেই আমি গাছুষ হই; তোমার মা ছিলেন উচ্চমনা আর মহিয়সী নারী! তিনিই আমায় গড়ে তোলেন। তিনি আমায় শিক্ষা দেন কি ক'রে, সাহসী, দৃঢ়চেতা আর উপযুক্ত স্ত্রী হতে পারি, কি ক'রে তাঁ'র পুত্র—আমার ভবিষ্যৎ স্বামীর ভালবাসা আর সম্মান বজায় রাখতে পারি। বছরের পর বছর কাটতে লাগল—তুমিও ভারতে সর্বাপেক্ষা প্রিয় জননায়ক হলে, তখন আমার সে ভয় আর রইল না যে স্বামী উন্নতির সর্বোচ্চ শিখরে আরোহণ করলে স্ত্রী যেমন দূরে পড়ে থাকে, আমার ভাগ্যেও তাই ঘটবে—যা' সচরাচর অগ্রাগ্র দেশে ঘটে থাকে! আমি জানি যে মরণেও আমরা সেই স্বামীস্ত্রী দুজনে এক হয়েই থাকব।”

গান্ধীজী যে কোটিকোটি টাকা তুলেছিলেন, সেই ধনভাণ্ডারের ধন-রক্ষকের কর্তব্য কস্তুরাবাই বহুদিন ধ'রে স্মারকরূপে পালন করেছিলেন।

এসম্বন্ধে অনেক মজার মজার গল্প আছে যে গয়নাটয়না প'রে স্ত্রীরা যদি কোন গান্ধীগিটিং শুনতে যায় তা'হলে স্বামী বেচারাদের হৃৎকম্প উপস্থিত হয়— কারণ গিটিংএ মুক্, অসহায়, দরিদ্র ও পদদলিত জনসাধারণের জন্তে গান্ধীজীর চিত্তদ্রবকারী আবেদনে ধনী স্ত্রীরা গলা থেকে হীরার নেকলেস্ আর হাত থেকে সোনার ব্রেসলেট খুলে সোজাশুজি ভিক্ষার ঝুলিতে দিয়ে বসে !

একদিন আমাদের ধনভাণ্ডারের ধনরক্ষক কস্তুরাবাই মাত্র চারটি টাকার খরচের আর হিসেব মেলাতে পারলেন না। গান্ধীজী হিসেবনিকেশের রিপোর্ট যথাযথরূপে প্রকাশিত করলেন—দেখা গেল তা'তে তাঁ'র স্ত্রীর হিসেবের গরমিল বেশ স্পষ্ট তিরস্কারের সঙ্গে দেখান আছে।

আমার আমেরিকান শিষ্যদের ক্লাসে আমি প্রায়ই এই গল্পটি করতুম। একদিন সন্ধ্যাবেলা একটি মহিলা রাগে চিৎকার ক'রে ব'লে উঠলেন,—

“স'শায়, তিনি মহাত্মাই হো'ন আর যাই-ই হো'ন না কেন, তিনি যদি আমার স্বামী হ'তেন, তা'হলে আমার সাধারণের সামনে এরকম অযথা অপমানের জন্তে ঠেঙিরে তাঁ'র চোখে কালশিরে পড়িয়ে দিতুম।”

যাই হোক মার্কিন আর হিন্দুস্ত্রী সম্বন্ধে আমাদের মধ্যে কতকগুলি সরস কথা কাটাকাটির পর আমি তখন আর একটু বিস্তারিতভাবে বললুম,—

“শ্রীমতী গান্ধী মহাত্মাজীকে শুধু তাঁ'র স্বামী ব'লেই বিবেচনা করেন না, তাঁ'র গুরু ব'লেই মনে করেন, তাঁ'র সামান্যতম ভুলেরও বা'র সংশোধন ক'রে দেবার অধিকার আছে। কস্তুরাবাইয়ের সর্বসাধারণের সম্মুখে ভৎসিত হ'বার পর রাজনৈতিক অপরাধে গান্ধীজী জেলে যান। তিনি যখন শাস্ত্যভাবে স্ত্রীর কাছ থেকে বিদায়গ্রহণ করছিলেন, তখন কস্তুরাবাই তাঁ'র পদতলে পতিত হয়ে অতি দীনভাবে বললেন, ‘প্রভু, আমি যদি কখনও আপনার চরণে অপরাধ ক'রে থাকি, তা'হলে দয়া করে আমার ক্ষমা করবেন।’”*

* ১৯৪৪ সালের ২২শে ফেব্রুয়ারী শ্রীমতী কস্তুরাবাই গান্ধী কারাগারেই দেহত্যাগ করেন। স্বভাবতঃই ভাবোচ্ছ্বাসবিহীন গান্ধীজী নীরবে অশ্রুপাত করেন। অল্পকাল মধ্যেই তাঁ'র গুণানুরাগী ব্যক্তিবর্গের প্রচেষ্টায় এক কস্তুরাবাই স্মৃতিভাণ্ডার প্রতিষ্ঠিত হয়, তা'তে ভারতের সর্বত্র হাতে প্রায় এক কোটি পিচি লক্ষ টাকা চাঁদা ওঠে। গান্ধীজীর ব্যবস্থানুসারে ভাণ্ডারের অর্থ মহিলা ও শিশুদিগের মধ্যে ঋণমোড়বিধায়ক কার্যে ব্যয়িত হয়। ‘হরিজন’নামক ইংরেজী সাপ্তাহিকে তা'র কার্যাবিবরণী প্রকাশিত হয়।

ওয়ার্দ্ধায় সেদিন বৈকালে বেলা তিনটার সময়, পূর্ববন্দোবস্ত অনুযায়ী আমি মহাত্মাজীর লেখবার ঘরে গিয়ে হাজির হলাম,—গান্ধীজী, যিনি নিজের স্ত্রীকে একনিষ্ঠা শিষ্যা তৈরী ক’রে নিতে সমর্থ হয়েছিলেন,— একটা পরমাশ্চর্য ব্যাপার! গান্ধীজী মুখ তুলে চাইলেন—মুখে সেই হাসি, যা’ কখনও ভোলবার নয়।

খোলা মাহুরের উপর তাঁ’র পাশে বসে পড়ে আমি বললাম, “মহাত্মাজি, আপনার ‘অহিংসা’ মানে কি?”

“চিন্তায় বা কাষে কোন প্রাণীর প্রতি ক্ষতির ভাব পরিহার করা।”

“চমৎকার আদর্শ! কিন্তু সকলেই ত’ বলবে যে, একটা শিশুকে অথবা নিজেকেই রক্ষা করবার জন্তে কেউ কি একটা কেউটে সাপও মারতে পারবে না?”

“কেউটে সাপ মারতে গেলে আমার দুটো প্রতিজ্ঞা,—নির্ভীকতা আর অহিংসা এ দুটো না ভেঙ্গে চলে না। তা’র চেয়ে তা’কে বরং মনোমনে আমি ভালবাসার অনুভূতি দ্বারা জয় করবার চেষ্টা কোরবো। অবস্থার প্রয়োজনে আমার আদর্শ আমি নীচু না’ও করতে পারি।” তা’রপর তাঁ’র অপূর্ণ সারল্যের সঙ্গে তিনি বললেন, “অবশ্য এ আমাকে স্বীকার করতেই হবে যে কেউটে সাপের সামনে পড়লে যে আমি এরকম ভাবে কথাবার্তা কইতে পারতুম না, সে কথাও ঠিক!”

ডেস্কের উপরে খাদ্যসম্বন্ধে লেখা অতি আধুনিক কতকগুলি বিলাতী বই পড়েছিল—তা’দের সম্বন্ধে কিছু মন্তব্য করাতে তিনি একটু হেসে বললেন, “সব জায়গায় যেমনি, সত্যাপ্রহ আন্দোলনেও তেমনি আহারের বিচারও একটা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ব্যাপার। অবিবাহিতদের জন্তে আমি সব চেয়ে উপযুক্ত খাদ্য নির্বাচন করবার চেষ্টা করছি। ইন্দ্রিয়সংযমের আগে রসনা-সংযম প্রয়োজন। অর্দ্ধাহার বা বিরুদ্ধভোজন এর উত্তর নয়। আগে ভিতরকার খাদ্যের লোভ সংবরণ ক’রে তবে সত্যাপ্রহী প্রয়োজনীয় সব খাদ্যপ্রাণ (ভিটামিন), খনিজপদার্থ, ক্যালোরি ইত্যাদি সমেত উপযুক্ত নিরামিষ আহারের ব্যবস্থা সব অনুসরণ ক’রে চলবে। খাদ্যসম্বন্ধে অন্তঃ ও বহিঃজ্ঞানের দ্বারা সত্যাপ্রহীর বীর্ঘ্য তা’র শরীরে প্রাণশক্তিরূপে সহজেই পরিণত হয়।”

মহাত্মাজী ও আগাতে মিলে মাংসের পরিবর্তে কি ভাল জিনিষ ব্যবহার করা যায় তা'র বিষয় আলোচনা করলুম। আমি বললুম, “এভোকেডোই হচ্ছে সব চেয়ে ভাল, আমার ক্যালিফোর্নিয়া কেন্দ্রে অসংখ্য এভোকেডো কুঞ্জ আছে।”

গান্ধীজীর আনন উৎসাহে প্রদীপ্ত হয়ে উঠল। তিনি বললেন, “আমি ভাবছি যে সে সব কি ওয়ার্কায় জন্মাবে? তা' হ'লে সত্যগ্রহীরা একটা নতুন খাবার পেয়ে খুসীই হবে।”

আমি বললুম, “লস্ এঞ্জেলিসে ফিরে গিয়ে ওয়ার্কায় আমি নিশ্চয়ই এভোকেডো গাছ পাঠাব।* ডিম হচ্ছে প্রোটিনবহুল একটি খাদ্য, কিন্তু তা'কি সত্যগ্রহীদের পক্ষে গ্রহণ করা বারণ?”

গান্ধীজী কি ভেবে একটু হেসে বললেন, “বাওয়া ডিম অবিশ্বি নয়। কিন্তু তা' হ'লেও বহুবছর ধ'রেই আমি তা'দের তা' ব্যবহার করতে দিই নি— এমন কি এখনও পর্যন্ত আমি নিজে তা' খাই না। আমার একটি পুত্রবধূ একবার পুষ্টিহীনতার জন্তে ভুগ'ছিল—তা'র ডাক্তার তা'কে ডিম খাওয়ানোর জন্তে পীড়াপীড়ি করতে লাগল; আমি রাজী না হয়ে তা'কে ডিমের বদলে অল্প কিছু ব্যবস্থা করবার উপদেশ দিলুম।

“ডাক্তার বললেন, ‘গান্ধীজি, বাওয়াডিমে কোন প্রাণের বীজ নেই; এতে প্রাণীহত্যার আশঙ্কা নেই, আপনি অনায়াসে ডিম খেতে দিতে পারেন।’

“তখন আমি খুসী হয়ে পুত্রবধূটিকে ডিম খেতে অনুমতি দিলুম; শীঘ্রই সে স্বাস্থ্য ফিরে পেলে।”

আগের দিন রাতে, গান্ধীজী লাহিড়ীমহাশয়ের ক্রিয়াযোগ গ্রহণ করবার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন। মহাত্মাজীর সরল মন আর প্রশ্নের আন্তরিকতা দেখে আমি অভিভূত হয়ে গিয়েছিলুম। তাঁ'র ঈশ্বরানুসন্ধিৎসা ছিল শিশুদেরই মত সরল, যে সারল্য শিশুদের হৃদয়কে পবিত্র আধারস্বরূপে প্রকাশিত করে দেখে যীশুখৃষ্ট প্রশংসা ক'রে বলেছেন, “এর ভিতরেই স্বর্গরাজ্য আছে।”

আমার উপদেশ দেবার নির্ধারিত সময় এল। জনকয়েক সত্যগ্রহী

* আমেরিকায় ফিরে আসার পরই আমি ওয়ার্কায় জাহাজ মারফৎ কতকগুলি এভোকেডো গাছ পাঠাই। কিন্তু দু'খের বিষয় গাছগুলি দীর্ঘ সমুদ্রযাত্রার কষ্ট সহ্য করতে না পেরে পথের মাঝখানেই যারা যায়।

তখন ঘরের ভিতরে প্রবেশ করলেন,—শ্রীবৃদ্ধ দেশাই, ডাক্তার পিস্তুলে, এবং আরও জনকতক, ... যাঁরা "ক্রিয়া" নিতে ইচ্ছুক ছিলেন।

প্রথমে আমি সেই ছোট ক্লাসটিতে যোগদার শারীরিক ব্যায়াম কৌশলগুলি শিখিয়ে দিলাম। শরীরকে বিশটি অংশে বিভক্ত ব'লে দেখতে হয়। মন তাঁরপর ক্রমেক্রমে তাঁদের প্রত্যেক অংশে শক্তি প্রেরণ করে। ব্যায়াম অভ্যাসের ফলে শীঘ্রই প্রত্যেকে আমার সামনে একটি ক'রে মানবমোটর-রূপে স্পন্দিত হ'তে লাগলেন। গান্ধীজীর বিশটি দেহাংশে চেউ খেলানর মত যোগাভ্যাসের ক্রিয়ার ফল সহজেই প্রত্যক্ষ হ'ল... সব সময়েই তাঁ সম্পূর্ণভাবে দৃষ্টিগোচর! খুব রোগা হলেও তাঁকে দেখতে একেবারে বেনামান নয়, শরীরের স্বক তাঁর মন্থণ আর বলিহীন।

তারপরে তাঁদের আমি সব "ক্রিয়া"-যোগের মুক্তিদায়িনী প্রক্রিয়াতে দীক্ষিত করলাম।

মহাত্মাজী পৃথিবীর সকল ধর্মের বিবরণই শ্রদ্ধাসহকারে আলোচনা করেছেন। গান্ধীজীর অহিংসসত্যের মূলে জৈনশাস্ত্র, বাইবেলের নূতন টেষ্টামেন্ট আর টেলষ্টেমেন্ট* সমাজতত্ত্ববাদ সম্বন্ধে লেখা—এই তিনটি প্রধান উপাদান। তাঁর মতবাদ সম্বন্ধে গান্ধাজী এই কথা বলেছেন :—

"বেদের মতনই আমি বাইবেল, কোরাণ আর জেন্দাবেস্তাকে† ঈশ্বরের বাণী ব'লেই মনে করি। আমি গুরুবাদে বিশ্বাস করি, কিন্তু এ যুগে সাধারণ লোকেদের কোনরকম গুরু না ক'রে ই চলা উচিত, কারণ পূর্ণজ্ঞান আর পরিপূর্ণ পবিত্রতার সমাবেশ একত্র দেখতে পাওয়া নিতান্তই দুর্লভ। কিন্তু নিজ ধর্মের সত্য কখনও জানতে পারবেনা ব'লে কারুর হতাশ হওয়ার কোন প্রয়োজন নেই, কারণ সকল বড় বড় ধর্মমতেরই মত হিন্দুধর্মের মূলসত্য অপরিবর্তনীয় আর সহজে বোধগম্য।

"প্রত্যেক হিন্দুর মত আমিও ঈশ্বর এবং একেশ্বরবাদ আর পুনর্জন্ম ও মুক্তিতে বিশ্বাস করি। হিন্দুধর্মসম্বন্ধে আমার মনোভাব আমার নিজ স্ত্রীর প্রতি যা' তাঁর চেয়ে বেশী বর্ণনা করতে পারি না। তিনি আমার বেরকম ভাবে

* প্রতীচ্যের আরও তিনটি লেখক—ধোরো, রাফিন ও ম্যাজিনির সমাজনীতিসম্বন্ধীয় মতবাদও গান্ধীজী সম্বন্ধে অধ্যয়ন করেছিলেন।

† ১০০০ খৃষ্ট পূর্বাব্দে জয়খন্ডকর্তৃক রচিত পারস্তদেশের বন্দশাস্ত্র।

পরিচালিত করেন—পৃথিবীতে অল্প কোন স্ত্রীলোক তেমন পারে না। তাঁ'র যে কোন দোষ নেই তা' নয়; আমি ভাল ক'রেই ব'লেতে পারি যে তাঁ'র এমন অনেক কিছু দোষ আছে যা' আমি নিজে দেখতে পাই না। কিন্তু তবুও সেখানে একটা অচ্ছেদ্য বন্ধনের ভাব বিद्यমান। সেইরকম আমি হিন্দুধর্মকে তা'র সব দোষ আর সঙ্গীর্ণতা সত্ত্বেও আমি তা'কে শ্রদ্ধা করি। গীতার শ্লোক আর তুলসীদাসের রামায়ণের চেয়ে আর কিছু আমার বেশী আনন্দ দেয় না। যখন মনে হ'ত আমার জীবনদীপ নির্ঝাপিত হয়ে এসেছে, গীতাই তখন আমার একমাত্র শান্তির স্থল হয়ে দাঁড়াত।

“হিন্দুধর্ম কোন বিশিষ্ট ধর্ম নয়। এ ধর্মের মধ্যে পৃথিবীর সকল মহা-পুরুষদের শ্রদ্ধার ও পূজার স্থান আছে।* সাধারণ ভাষায় যা'কে ব'লে প্রচারকদের ধর্ম, এ তা' নয়। এ কথা নিঃসন্দেহ যে হিন্দুধর্ম বহুজাতিকে আপন অঙ্কে স্থান দিয়েছে...কিন্তু এই গ্রহণ বিবর্তনপ্রসূত, আর তা' অজানিত-ভাবেই ঘটেছে। হিন্দুধর্ম প্রত্যেকেই তা'র নিজ নিজ বিশ্বাস বা ধর্ম+ অমুসারে ঈশ্বরকে ভজনা করতে বলে—আর তাইতে অল্প কোন ধর্মের সঙ্গে এর কোনই বিরোধ নেই।”

যীশুখৃষ্ট সম্বন্ধে গান্ধী লিখেছেন, “আমার স্থির বিশ্বাস যে যদি তিনি এ সময়ে এখানকার লোকেদের মধ্যে বাস করতেন, তা' হ'লে তিনি অনেকের জীবনকেই আশীর্বাদপূত করতেন, যা'রা তাঁ'র নাম পর্য্যন্তও কখন শোনে নি—যেমন তাঁ'র বাণীতে আছে, ‘যা'রা কেবল আমার শুধু হে প্রভু, হে প্রভু ব'লেই ডেকেছে, তা'রা সকলেই যে স্বর্গরাজ্যে প্রবেশ করতে পারে তা' নয়, কিন্তু কেবল সেই যে আমার পিতার ইচ্ছা পালন করেছে।”† যীশু

* পৃথিবীর ধর্মসকলের মধ্যে হিন্দুধর্মের অপূর্ব বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে একজনমাত্র কোন বিশিষ্ট ধর্মপ্রবর্তকের দ্বারা যে এ প্রতিষ্ঠিত, তা' নয়; এর উৎপত্তি হ'চ্ছে অপৌরুষেয় বৈদিক শাস্ত্রসকল হতে। তাই হিন্দুধর্মের ক্রোড়ে সকল যুগ আর সকল দেশের ধর্মোপদেষ্টাদের শ্রদ্ধার স্থান পাবার সুযোগ আছে। বৈদিকশাস্ত্রসকল, মানবের প্রত্যেক কার্য ধর্মামুযায়ী পরিচালিত করবার প্রচেষ্টায় যে শুধু পূজার্ত্তনা তাই নয়, অতি প্রয়োজনীয় সামাজিকবিধি ও প্রথাসকলও নিয়ন্ত্রিত করে।

† ধর্ম—ধৃ (ধারণ করা) + ম। স্থায়িবিধি অথবা দেশবিশেষ বা জাতিবিশেষের পাপপুণ্যাদি নিরাক বিশ্বাস ও তদনুসরণে উপাসনাপদ্ধতি। বৃত্তিবাদিমতে ক্ষেত্রবিশেষে মানুষের কর্তব্য-পালনই ধর্ম। শাস্ত্রসমূহে ধর্মের সংজ্ঞা এইরূপ দেওয়া আছে যে, “প্রাকৃতিক বিশ্ববিধি যা'র পালনে মানুষ নিজেকে অধোগতি আর দুঃখভোগের হাত হ'তে রক্ষা করতে পারে।”

‡ বাইবেল—ম্যাথিউ ৭; ২১।

তাঁর নিজের জীবনের আদর্শে মানবজাতিকে যে বিরাট উদ্দেশ্য আর একমাত্র লক্ষ্য প্রদর্শন করেছিলেন তাঁর লাভের প্রতিই আমাদের সকলের প্রয়াস করা উচিত। আমি বিশ্বাস করি যে কেবল একমাত্র খৃষ্টানদেরই যে তিনি তাঁ' নয়—তিনি সকল দেশ, সকল জাতি, সমগ্র পৃথিবীর তিনি।”

ওয়ার্কা ত্যাগের শেষের দিন সন্ধ্যায় শ্রীযুক্ত দেশাই কর্তৃক টাউন হলে আহঁত একটি সভায় আমার বক্তৃতা দিতে হ'ল। যোগসম্বন্ধে বক্তৃতা শোনবার জন্তে প্রায় চারশ' লোকের জনতায় ঘরটি জানালার পাড় পর্য্যন্ত পূর্ণ হয়ে গিয়েছিল। প্রথমে হিন্দীতে পরে ইংরেজিতে ব'লতে হ'ল। আমাদের ছোট্টদলটি ঠিক সময়মত আশ্রমে ফিরতে পেরেছিল। শুভরাত্রি ইচ্ছা করতে এসে দেখলুম, গান্ধীজী পরিপূর্ণ শান্তির মধ্যে লেখাপড়ায় ব্যস্ত।

ভোর পাঁচটায় উঠলুম—রাত তখনও রয়েছে। গ্রামের মধ্যে জীবনের স্পন্দন সুরু হয়েছে। প্রথমে আশ্রমদ্বারের সামনে দিয়ে একটি গরুর গাড়ী গেল, তাঁরপর একটি রুসক একটা প্রকাণ্ড মোট বিপজ্জনকভাবে মাথার উপর বসিয়ে চলেছে দেখা গেল। প্রাতরাশের পর আমরা তিনজন বিদায়প্রণাম সেরে নেবার জন্তে গান্ধীজীর সন্ধ্যানে গেলুম। গান্ধীজী উবাকালীন প্রার্থনার জন্তে আরও ভোরে ওঠেন—ভোর ৪টায়।

নতজানু হয়ে পাদস্পর্শ ক'রে বললুম, “মহাত্মাজি, প্রণাম, এবার বিদায় দিন। আপনার পরিচালনায় ভারত আজ নিরাপদ!”

ওয়ার্কা ভ্রমণের পর বহুবৎসর অতীত হয়ে গেছে। জল, স্থল, অন্তরীক্ষ আজ পৃথিবীর মহাবুদ্ধে ঘনমসীলিপ্ত। পৃথিবীর বড় বড় নেতাদের মধ্যে একলা গান্ধীজীই কেবল শশস্ত্র শক্তির বিরুদ্ধে একমাত্র সক্রিয় অহিংস প্রতিবেদক বা'র করেছেন। সকল অত্যাচার, অবিচারের প্রতিকারে মহাত্মাজী অহিংসপন্থা অবলম্বনেরই ব্যবস্থা করেছেন আর বারম্বার তাঁ' সফলতাই লাভ করেছে। তাঁ'র মত তিনি নিম্নলিখিত ক'টি কথায় ব্যক্ত করেছেন :—

“আমি দেখেছি যে ধ্বংসের মধ্যেও জীবন আছে। তা'হলে মৃত্যু বা ধ্বংসের চেয়েও কোন উচ্চতর বিশ্ববিধান অবশ্যই আছে। কেবলমাত্র সেই নিয়মের অধীনেই সুশৃঙ্খল সমাজ সহজবোধ্য হবে আর জীবনও উপভোগ্য হবে।

“জীবনের যদি এইই বিধি হয়, তা'হলে আমরা প্রাত্যহিক জীবনে অবশ্যই

তা' পালন ক'রে যাব। যেখানেই যুদ্ধ হোক না কেন, আমরা ভালবাসা দিয়েই তা'কে জয় ক'রব। আমি দেখেছি যে ভালবাসার কতকগুলি ধারা আমার জীবনে বহু প্রশ্নের সমাধান করেছে, যা' ধ্বংসবিধি কখনও করতে পারেনি।

“ভারতে এই বিধির কার্যকারিতার চাক্ষুষ পরিচয় আমরা লাভ করেছি। আমি অবশ্য একথা বলিনে যে ভারতের ত্রিশকোটি বাটলফ লোকের ভিতরেই অহিংসামগ্ন প্রবেশ লাভ করেছে কিন্ত এ কথা আমি নিঃসংশয়ে বলতে পারি যে অল্প যেকোন মতের চেয়ে এ অবিধাত্তরকম কম সময়ের মধ্যে লোকের অন্তরে খুব গভীরতর ভাবেই প্রবেশ করেছে।

“মনে অহিংসভাব আনবার চেষ্টা বেশ পরিশ্রম আর শিক্ষাসাপেক্ষ বটে। সৈনিকের মতন ঠিক নিয়মনিষ্ঠ জীবনযাপন করা চাই। পরিপূর্ণ অবস্থা তখনই লাভ হয়, যখন বাক্য, দেহ, মন সব সুসমঞ্জসভাবেই থাকে। সত্য আর অহিংসভাবই যদি আমাদের মূলমন্ত্র হয়, তা'হলে জীবনের প্রত্যেক সমস্যারই সমাধান মেলে।”

পৃথিবীর রাজনৈতিক ঘটনাবলীর রূঢ় অগ্রগতি নিষ্ঠুরভাবে এই সত্যই স্মরণ করিয়ে দেয় যে, আধ্যাত্মিক দৃষ্টির অভাবে মানুষের ধ্বংস অবশ্যস্তাবী। ধর্ম না হ'লেও বিজ্ঞানই মানবজাতির মনে একটা বিপদের আভাস আর এমনকি সমস্ত পাখিব বস্তুর একটা অনিত্যতাবোধের ভাবও জাগিয়ে তুলেছে। সত্যই মানুষ এখন তা'র আদিকারণ ও তা'র অন্তরস্থিত সেই পরমাত্মার কাছে ছাড়া আর কোথায়ই বা যেতে পারে ?

ইতিহাস পর্যালোচনা ক'রে যে কেউ ত্রায়সঙ্গতভাবেই বলতে পারে যে মানবজাতির সমস্তা পশুশক্তির সাহায্যে কখনও সমাধান হয় নি। প্রথম মহাবুদ্ধের পৃথিবীব্যাপী যুদ্ধজনিত পাপের কস্মকলে দ্বিতীয় মহাবুদ্ধের উৎপত্তি হ'ল। কেবল একমাত্র বিশ্বভ্রাতৃত্বের প্রেমমন্দাকিনীধারাই এই যুদ্ধের পাপজনিত কস্মফলের হিমালয়প্রমাণ বিরাট স্তূপ ভাসিয়ে নিয়ে গিয়ে ধুয়েমুছে দিতে পারে, তা' না হ'লে তা' থেকে আবার তৃতীয় মহাবুদ্ধের উৎপত্তি হ'তে পারে। বিংশ শতাব্দীর অমঙ্গলত্রয়ী! বিবাদবিসম্বাদ মিটাবার জগে মানুষের যুক্তির বদলে পংশবিক যুক্তি প্রয়োগ করলে পৃথিবী জঙ্গলেই পরিণত হবে। নিরবচ্ছিন্ন ও শান্তিময় জীবনধারণের মধ্যে ভাইয়ে ভাইয়ে মিলন না

হ'লে তা'দের মিলন হবে সর্বগ্রাসী ভীষণ মৃত্যুর কোলে গিয়ে। এইরূপ ভাবের ঘৃণ্য হীনতার জন্ত ভগবান মন্থনকে স্নেহবশে আণবিকশক্তির উন্মেষণ আবিষ্কারে অনুমোদন দান করেন নি।

বুদ্ধ আর পাপ শেষ পর্যন্ত কখনও লাভজনক হয় না। কোটিকোটি টাকা, যা' সব বিস্ফোরকের ধোঁয়ার শূন্যতায় মিলিয়ে গেল, তা' দিয়ে আর একটা নতুন পৃথিবী গড়া যেতে পারত—যে পৃথিবী হ'ত প্রায় আধিবাধি-শূন্য আর দারিদ্র্যের কবল হ'তে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত! ভয়, বিশৃঙ্খলা, দুর্ভিক্ষ, ও মহামারী প্রভৃতির প্রলয়নাচনের এ পৃথিবী নয়—এ পৃথিবী হচ্ছে শান্তি, সুখ, সৌভাগ্য আর জ্ঞানপ্রসারের একটা বিরাট ক্ষেত্র।

মানুষের সর্বোচ্চ বিবেকে গান্ধীজীর অহিংস বাণীর আবেদন পৌঁছবেই। আজ পৃথিবীর সকল জাতিই একত্র সম্মিলিত হো'ক মৃত্যুর মধ্য দিয়ে নয়—জীবনের ভিতর দিয়ে, ধ্বংসের মধ্যে নয়...সৃষ্টির ভিতর দিয়ে, সংহারকর্তার অধীনে নয়...সৃষ্টিকর্তার আশ্রয়ে।

মহাভারতে আছে যে, “মানুষের যে কোন ক্ষতিই হোক না কেন, তা'র জন্তে তা'র ক্ষমা করা উচিত। কথিত আছে যে মানুষ ক্ষমাশীল হওয়ার জন্তই জীবনধারা অব্যাহত। ক্ষমা পুণ্য; ক্ষমার দ্বারাই জগৎ ধৃত। ক্ষমাই হচ্ছে শক্তিমানের শক্তি। ক্ষমা হচ্ছে ত্যাগ, ক্ষমাতে মনের শান্তি। সংঘর্ষী যা'রা, তা'দের গুণই হচ্ছে ক্ষমা আর সৌজন্ম—এরা অনন্তগুণেরই পরিচয় দেয়।”

অহিংসা হ'চ্ছে ক্ষমা আর প্রেমের ধারার স্বাভাবিক পরিণতি। গান্ধীজী বলেন, “ধর্মযুদ্ধে যদি প্রাণসংহার করা নিতান্তই প্রয়োজন হয়, তা'হলে লোকে যীশুখৃষ্টের মত, যেন তা'র নিজের রক্তই দান ক'রতে প্রস্তুত হয়, আর কান্না নয়। পরিণামে পৃথিবীতে রক্তক্ষয় একেবারে কমে আসবে।”

ভারতের সত্যপ্রহীদের বিষয়ে হয়ত কোন দিন কোন মহাকাব্য লিখিত হবে—যা'রা ঘৃণাকে ভালবাসা দিয়ে, হিংসাকে অহিংসা দিয়ে জয় করেছে, যা'রা প্রতিহিংসাগ্রহণের পরিবর্তে নিজেদেরকে নির্দয়ভাবে হত্যা করতে দিয়েছে। ফলে হয়েছে এই যে, কোন কোন ঐতিহাসিক ঘটনার সশস্ত্র বিপক্ষদল তা'দের হাতের বন্দুক ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে দারুণ লজ্জায় পালিয়েছে; যা'রা নিজেদের জীবনকে তুচ্ছ ক'রে পরের জন্তে আত্মদান করতে প্রস্তুত,

সে সব লোকেদের দেখে তা'দের অন্তর গভীরভাবে আনোড়িত হয়ে উঠেছে।

গান্ধীজী বলেন, “যদি দরকার হয় ত’ আমি বুগুগাস্ত ধ’রেও অপেক্ষা করতে প্রস্তুত আছি—কিন্তু রক্তপাতের পন্থায় আমি কখনও দেশের স্বাধীনতা চাইব না।” বাইবেল আমাদের এই ন’লে সাবধান ক’রে দেয় যে, “যা’রা তরবারি গ্রহণ করে, তা’দের তরবারিতেই মৃত্যু ঘটবে।”* গান্ধীজী লিখেছেন—

“আমি নিজেকে জাতীয়তাবাদী বলি—কিন্তু আমার জাতীয়তাবাদ বিশ্বের মত উদার। এর কোলে পৃথিবীর সকল জাতির ঠাই।† আমার জাতীয়তাবাদ সারা পৃথিবীর মঙ্গল কামনা করে। এ আমি চাইনা যে, আমার ভারত অগ্ন্যাগ্ন জাতির ভ্রমাবশেষের উপর গড়ে ওঠে। আমি চাই না ভারত একটিমাত্র লোককেও শোষণ করে। আমি চাই যে ভারত শক্তিশালী হয়ে উঠুক, যা’তে ক’রে সে অপর জাতিদের মধ্যেও তা’র শক্তি সঞ্চারিত করতে পারে। আজকে ইউরোপে একটা জাতিরও মধ্যে তা’ নেই; তা’রা আর অপরাপর জাতিদের কোন শক্তিই দান করতে পারে না।

“প্রেসিডেন্ট উইলসন তাঁ’র চমৎকার চতুর্দশটি মত উল্লেখ করেছেন, কিন্তু বলেছেন, ‘পরিশেষে শক্তির সত্ত্ব যদি আমাদের এই প্রচেষ্টা বিফল হয়, তা’হলে আমাদের অস্ত্রের উপরই নির্ভর করতে হবে।’ আমি সে ব্যবস্থাটা উল্টে দিয়ে বলতে চাই, ‘আমাদের অস্ত্রশস্ত্র ইতিমধ্যেই বিফল ব’লে প্রমাণিত হয়েছে; এখন আমাদের নতুন একটা কিছু খুঁজে বা’র করা যাক। এখন আমাদের প্রেমের শক্তি আর ঈশ্বর যিনি পরম সত্য, এই দু’টি জিনিষের পরীক্ষা ক’রে দেখা যাক।’ আমরা যখন সেটা পা’ব তখন আর আমাদের আর কিছু চাইবার বাকী থাকবে না।”

* বাইবেল—ম্যাথিউ, ২৬ : ৫২। বাইবেলে এই রকম অসংখ্য পংক্তি আছে যাতে মানুষের জ্ঞানান্তরবাদের সুস্পষ্ট অর্থ সূচিত কবে। (১৬শ পরিচ্ছেদ—আদম ও ইভ প্রসঙ্গ দ্রষ্টব্য)। কর্শ-ফলের স্তায়ের বিধি জানা থাকলে জীবনের বহু জটিল ব্যাপারের অর্থ সহজবোধ্য আর সরল হয়ে আসে।

† “মানুষ যেন না গৌরব করে, বিতরিয়া প্রেম দেখে,

সে যেন দরং গন্ধিত হয়, স্বজাতিরে ভালবেসে।”

পারস্ব প্রবাদ।

মহাত্মাজীর দ্বারা শিক্ষিত হাজার হাজার খাঁটি সত্যগ্রহীরা (যাঁ'রা এই পরিচ্ছেদের প্রথমাংশে বর্ণিত এগারটি কটিন প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করেছেন), তাঁ'রা আবার সত্যগ্রহ প্রচার করেন,—অহিংসার আধ্যাত্মিক এবং পরিবেশে পাণ্ডিত্য উপকার উপলব্ধি করবার জন্তে ভারতের জনসাধারণকে ধৈর্যের সঙ্গে শিক্ষা দিয়ে; অবিচারের সঙ্গে অসহযোগ, অস্ত্রগ্রহণ অপেক্ষা অপমান, কারাবাস এমন কি মৃত্যুবরণ করবার ইচ্ছা, এই সব অহিংস অস্ত্রে তাঁ'র বাহিনী সজ্জিত ক'রে সত্যগ্রহীদের মধ্যে বীরজনোচিত অগণিত আত্মোৎসর্গের উদাহরণের মধ্য দিয়ে জগতের লোকদের সহানুভূতি আকর্ষণ ক'রে গান্ধীজী যুদ্ধ ব্যতিরেকে বিবাদবিসম্বাদ নিষ্পত্তি করবার জন্তে অহিংসার সক্রিয়ভাবে মহান শক্তি নাটকীয়ভাবে চিত্রিত করেছেন।

বন্দুকের গুলিচালনা ব্যতীত কোন দেশের কোন নেতা তাঁ'র দেশের জন্ত যতটা করতে পেরেছেন গান্ধীজী অহিংস উপায়ে তাঁ'র চেয়ে ঢের ঢের বেশী রাজনৈতিক জুবিধা ইতিমধ্যে আদায় ক'রে নিতে পেরেছেন। সকল অস্ত্রায়, সকল দুঃখ, অহিংস উপায়ে উন্মূলিত করবার প্রণালী রাজনৈতিক ক্ষেত্রেই যে শুধু প্রয়োগ করা হয়েছে তা' নয়, ভারতের সমাজসংস্কারের সূক্ষ্ম আর জটিল ক্ষেত্রেও এর প্রয়োগ করা হয়েছে। হিন্দুমুসলমানের বহুদিনের বহু বিবাদ-বিসম্বাদ গান্ধীজী আর তাঁ'র অনুগামীরা দূর করতে পেরেছেন; লক্ষলক্ষ মুসলমান গান্ধীজীকেই তাঁ'দের নেতা ব'লে মনে করেন। অস্পৃশ্যরা গান্ধীজীকে তাঁ'দের নিভীক আর বিজয়ী নেতা ব'লে মনে করে। গান্ধীজী লিখেছেন, “আমার কপালে যদি পুনর্জন্ম লেখা থাকে, তা'হ'লে আমি পারিয়াদের মধ্যে একজন পারিয়া হয়েই জন্মাতে চাই—কারণ তা' হলে তাঁ'দের মধ্যে আরও বেশী কায করতে পারব।”

মহাত্মা বাস্তবিকই মহান আত্মা; ভারতের অশিক্ষিত জনসাধারণেই কিন্তু তাঁ'কে এ উপাধি দিয়েছে। এই শাস্ত্র মহাপুরুষটি ভারতের কোটিকোটি জনসাধারণের অন্তরে এক প্রগাঢ় শ্রদ্ধা আর সম্মানের আসন অধিকার ক'রে রয়েছেন। গান্ধীজীর উচ্চ আশা নিম্নতম কৃষকদের মধ্যেও ফলবতী হয়ে উঠেছে। মাছুষের অন্তরে যে একটা সহজাত ঐদার্য আছে, তা' গান্ধীজী সর্বাস্তঃকরণে বিশ্বাস করেন। অবশ্যগতাবী নিষ্ফলতাও গান্ধীজীকে কখনও বিব্রান্ত করে নি। তিনি লিখেছেন, “কোন প্রতিকূলাচারী যদি কোন

সত্যগ্রহীর সঙ্গে বিশ্বাস মিথ্যাচরণ বা প্রবঞ্চনা করে, তা'হলে সেই সত্যগ্রহী একুশবারের বারও তা'কে বিশ্বাস করতে প্রস্তুত... কারণ মানবপ্রকৃতিতে অবিচলিত ও অখণ্ড বিশ্বাস স্থাপনই হচ্ছে তা'র অন্তর্গত মতের সার পদার্থ।”*

একজন সমালোচক একবার এই মন্তব্যটি করেছিল—“মহাত্মাজি, আপনি একজন অসাধারণ লোক। আপনি নিশ্চয়ই আশা করতে পারেন না যে আপনি যেমনটি করবেন, বিশ্বসংসারও ঠিক তেমনটিই ক'রে চলবে।”

গান্ধীজী উত্তর দিলেন, “শরীরের উন্নতিসাধন করা যেতে পারে বটে কিন্তু আত্মার সুপ্তশক্তি জাগ্রত করা একান্ত অসম্ভব এই করণা ক'রে আমরা নিজেদের কি অদ্ভুত ভাবেই না ঠকাই। আমি দেখাতে চেষ্টা করছি যে আমরা মধ্যে যদি তেমন কোন শক্তি থাকে ত', তা'হলেও আমি আর পাঁচজনেরই মত নম্বর দেহধারী; আমার নিজের মধ্যে কোন অসাধারণত্ব কখনও ছিল না, আর এখনও নাই। আমি একজন অতি সাধারণ ব্যক্তি, অত্যাশ্র লোকেদের মত আমারও ভুলভ্রান্তি হতে পারে, তবে আমি একথা বলতে পারি যে আমার নিজের ভুলভ্রান্তি স্বীকার ক'রে তা' শুধরে নেবার মত যথেষ্ট দীনতা আমার আছে। আমি একথা জোর ক'রেই বলব যে ঈশ্বর আর তাঁর মঙ্গলময়তাবের প্রতি অবিচলিত বিশ্বাস আর সত্য আর প্রেমের প্রতি গভীর অনুরাগ আমার আছে, কিন্তু সে জিনিষটা কি সকলের অন্তরে সুপ্ত নেই?” তা'রপর তিনি বললেন, “যদি আমরা জড়জগতে নতুন আবিষ্কার করতে পারি, তা' হ'লে কি আধ্যাত্মিক জগতে গিয়ে আমাদের একেবারে দেউলে হ'য়ে যেতে হ'বে? ব্যতিক্রমের সংখ্যা বাড়িয়ে তা'দের নিয়মে

* “তখন পীটার তাঁর কাছে এসে বললেন, প্রভু, আমার ভাতা আমার কাছে কতবার অপরাধ করলে তা'কে আমি ক্ষমা করব? সাতবার পর্যন্ত? যীশু তা'কে বললেন, তোমাকে বলছি না যে কেবল সাতবার পর্যন্ত, কিন্তু সত্তরগুণ সাতবার পর্যন্ত।” বাইবেল, ম্যাথিউ—১৮; ২১-২২।

এরূপ একটা অসম্ভব উপবেশ বোঝবার ক্ষেত্রে আমি গভীরভাবে প্রার্থনা করেছিলাম। প্রতিবাদ-রূপ বলেছিলুম, “প্রভু, এ কি সম্ভব?” তখন তা'তে একটা জ্যোতিঃপ্লাবন সারাহৃদয় শাস্ত ক'রে দেববাণীতে ঝঙ্কত হ'ল, “হে মানব, তোমাদের প্রত্যেককে আমি দিনের মধ্যে কতবার না ক্ষমা করি।”

পরিণত করাটা কি এতই অসম্ভব? মানুষ কি কেবল সূর্যদাই আগে পশু
তা'র পরে মানুষ হবে—যদি আদৌ হয়?*

পেনসিলভ্যানিয়ায় উইলিয়াম পেনের সপ্তদশ শতাব্দীতে উপনিবেশ
স্থাপনের সফল অহিংসপরীক্ষার কথা আমেরিকাবাসী আজও সগর্বে খুব ভাল
করেই স্মরণ করতে পারে। সেখানে “কোন কেল্লা, কোন সৈন্য, কোন
যোদ্ধাদল এমন কি কোন অস্ত্রশস্ত্র” পর্যন্তও ছিল না। রেড ইন্ডিয়ান আর
নতুন বসতকারীদের মধ্যে যে হিংস্র সীমান্তযুদ্ধ আর নৃশংস হত্যাকাণ্ড
চলছিল, একমাত্র পেনসিলভেনিয়ার কোয়েকারেরাই সে অত্যাচার থেকে
মুক্ত ছিল। “কতক বা হত, কতক বা দলবদ্ধভাবে বিরাট হত্যাকাণ্ডে নিহত
হয়েছিল; কিন্তু একটি মাত্রও কোয়েকার রমণী অত্যাচারিত হয় নি, একটিমাত্র
কোয়েকার শিশু হত বা একটিমাত্রও কোয়েকার পুরুষ যন্ত্রণা ভোগ করে
নি।” শেষ পর্যন্ত যখন কোয়েকারদের প্রদেশের শাসনভার ছেড়ে দিতে
বাধ্য হতে হ’ল, তখন “দুই বেধে গেল আর কতকগুলো পেনসিলভেনিয়ানরাও
নিহত হ’ল। কিন্তু কোয়েকারেরা নিহত হ’ল মাত্র তিনজন, আর কেবল
সেই তিনজন—যা’রা আত্মরক্ষার জন্তে অস্ত্রবহন না করার বিশ্বাস হ’তে চ্যুত
হয়েছিল।

ফ্রান্স লিন ডিকজেন্স্ট বলেছেন, “প্রথম মহাযুদ্ধে বলপ্রয়োগ শাস্তি আনতে
পারে নি। যুদ্ধে জয়পরাজয় সমানই বন্ধ্য। এ শিক্ষা পৃথিবীর গ্রহণ করা
উচিত ছিল।”

লাও ৎসু বলেছেন.—“যতটুকু বেশী প্রাণীহিংসার অস্ত্রশস্ত্র সব বেরোবে,
মানবজাতির দুঃখ ততটুকু বাড়বে। অত্যাচারের বিজয়গর্বের পরিণতি ঘটে
শোকের উচ্ছ্বাসেই।”

গান্ধীজী বলেছেন, “বিশ্বব্যাপী শান্তি ছাড়া আর কিছুর জন্তে আমার
লড়াই নয়। অহিংস সত্যাগ্রহের ভিত্তিতে যদি ভারতীয় আন্দোলন চালিয়ে
সাফল্যলাভ করা যায় তা’হ’লে এ দেশপ্রেমিকতার, আর যদি সবিনয়ে
নিবেদন ক’রে বলা যায়, তা’হ’লে জীবনেরও একটা নতুন মানে এনে দেবে।”

প্রতীচ্য গান্ধীজীর কল্পপন্থা স্বপ্নবিলাসীর স্বপ্ন ব’লে পরিত্যাগ করবার পূর্বে
সে একবার যীশুখৃষ্টের সত্যাগ্রহের সংজ্ঞা সম্বন্ধে আগে বিবেচনা করুক :—

* ৩৬১ পৃষ্ঠার পাদটিকা দ্রষ্টব্য।

“তোমরা শুনেছ যে বলা হয়েছে—চোখের বদলে চোখ আর দাঁতের বদলে দাঁত চাই; কিন্তু আমি তোমাদিগকে বলি যে তোমরা ছুষ্টের প্রতিরোধ কোরো না; কিন্তু যদি কেউ তোমাদের দক্ষি গণ্ডে চপেটাঘাত করে, তা’হ’লে তা’র দিকে তোমরা অপর গণ্ডটাও ফিরিয়ে দিও।”

বিশ্বনিয়ন্তার কালের বিধানে গান্ধীজীর যুগ নিখুঁত সুন্দরভাবে বেড়ে গিয়েছে সেই শতাব্দীতে—যা দুটো বড় বড় বিশ্বযুদ্ধে একেবারে ছিন্নভিন্ন হয়ে ধ্বংসের পথে এগিয়ে চলেছে। ঈশ্বরের হস্তলিপি তা’র জীবনের মর্ম্মর বেদীতে লিখিত হয়েছে : তা’ পুনরায় ভায়ে ভায়ে রক্তপাতের বিরুদ্ধে তা’র অমর সাবধানবাণী।

* অর্থ্যাৎ—পাপের দ্বারা পাপের প্রতিকার কোরো না। বাইবেল—ম্যাথিউ ৫ : ৩৮-৩৯।

মহাত্মা গান্ধীর হস্তলিপি

(হিন্দিতে)

इंदा एवम्भी मे सनिकार मे उमनिआइना हुं इस संस्था
 का मेरे मनपर अच्छे पड़ा है. आवेकी प्रवृत्ति मे आह।
 गांधी एवम्भी माया एवम्भी हुं

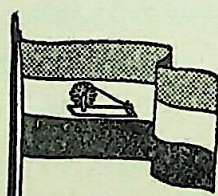
मा. २०

मोहनदासगंधी

মহাত্মা গান্ধী রাঁচিতে আমার যোগদা ব্রহ্মচর্য বিদ্যালয় পরিদর্শন করেন। রাঁচির পরিদর্শকদের মন্তব্যপুস্তকে তিনি অল্পগ্রহপূর্বক উপরোক্ত পংক্তিগুলি লিখে দিয়েছেন; এর অল্পবাদ হচ্ছে,—“এই বিদ্যালয় আমার মনে গভীরভাবে রেখাপাত করেছে। আমি মনে এই উচ্চ আশা পোষণ করি যে এই বিদ্যালয় চরকার অধিকতর প্রচলনে উৎসাহ দান করবে।

(স্বাঃ) মোহন দাস গান্ধী।

১৭ই সেপ্টেম্বর ১৯২৫।



১৯২১ সালে গান্ধীজী ভারতের জাতীয় পতাকার পরিকল্পনা করেন। পতাকার তিনটি রঙ হচ্ছে—কমলালেবু, সাদা আর সবুজ মাঝখানে ঘন নীলরঙে চরকা।

তিনি লিখেছেন, “চরকা হচ্ছে শক্তির প্রতীক; ভারতের ইতিহাসে অতীতের ঐশ্বর্যময় বৃগে হাতে সূতাকাটা আর অগ্ন্যাগ্নি কুটিরশিল্প সকলই যে সর্বপ্রধান ছিল, চরকা আমাদের তা’ স্বরণ করিয়ে দেয়।

৪৫শ পরিচ্ছেদ

“আনন্দময়ী মা”

আমার ভাইবো অমিয়া বস্তু একদিন আমায় বললে, “নির্মলা দেবীকে না দেখে আপনি ভারতবর্ষ ত্যাগ ক’রে যাবেন না। তাঁ’র ভগবদ্ভক্তি অতি গভীর আর ‘আনন্দময়ী মা’ ব’লেই তিনি সকলের কাছে পরিচিত।” চোখে মুখে কুটে উঠল তাঁ’র গভীর আগ্রহ।

বল্লুম, “নিশ্চয়ই, তাঁ’কে দেখে যাব বই কি? তাঁ’র ঈশ্বরভাবের উচ্চাবস্থার কথা সব আমি পড়েছি। আমারও তাঁ’কে দেখতে বড়ই ইচ্ছে আছে। বছরকতক আগে ইষ্ট-ওরেষ্ট পত্রিকায় তাঁ’র বিষয়ে একটি ছোট প্রবন্ধও বেরিয়েছিল।”

অমিয়া বলতে লাগল, “আমি তাঁ’কে দর্শন করেছি। আমরা যেখানে থাকি সেই জামসেদপুর সহরে সম্প্রতি তিনি এসেছিলেন। একবার এক শিষ্যের অনুরোধে আনন্দময়ী মা একটি মরণাপন্ন লোকের বাড়ীতে যান। তাঁ’র মৃত্যুশয্যার পাশে ব’সে লোকটির কপালে হাত বুলিয়ে দিতেই তাঁ’র মৃত্যুবঞ্ছনা সব থেমে গেল। রোগও সঙ্গেসঙ্গে অন্তর্হিত হ’ল; আনন্দে বিশ্বয়ে লোকটি দেখলে যে সে একেবারে আরাম হয়ে গেছে।”

দিনকতক বাদে শোমা গেল যে আনন্দময়ী মা কলকাতার ভবানীপুর অঞ্চলে তাঁ’র এক শিষ্যের বাড়ীতে অবস্থান করছেন। রাইট সাহেব আর আমি এই দু’জনে মিলে আমাদের কলকাতার বাড়ী থেকে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়লুম। ভবানীপুরের সেই বাড়ীটির কাছে আমাদের ফোর্ডগাড়ী পৌছতে রাইট সাহেব আর আমার রাস্তার উপর একটা অদ্ভুত দৃশ্য চোখে পড়ল।

আনন্দময়ী মা একটা ছাদখোলা মোটর গাড়ীতে দাঁড়িয়ে, প্রায় শতখানেক শিষ্য তাঁ’কে ঘিরে রয়েছে, দেখে বোধ হ’ল কোথাও যাবার জগে হয়ত’

“বাবা, বলুন, এখন আপনি কোথায় থাকেন?” তাঁর স্বর অতি পরিষ্কার, যেন সঙ্গীতের মধুর বজ্রার।

“বর্তমানে কলকাতা কিম্বা রাঁচি, কিন্তু শীগ্গিরই আমেরিকায় ফিরে যাচ্ছি।”

“আমেরিকা?”

“হ্যাঁ, সেখানকার ধর্মপিপাসু লোকেরা আপনার মত ভারতীয়া সাধিকাকে দেখলে নিশ্চয়ই আন্তরিকভাবে শ্রদ্ধা করবে—যাবেন আপনি?”

“বাবা নিয়ে গেলেই, বাব!”

উত্তর শুনে ত’ সেখানকার শিষ্যেরদল সব চমকে উঠলেন।

একজন তাঁর মধ্যে এগিয়ে এসে আমাকে দৃঢ়স্বরে বললেন, “শুধু ম’শায়, আমাদের মধ্যে এই জনকুড়ি কি তাঁরও বেশী আমরা আনন্দময়ী মায়ের সঙ্গে সঙ্গে সর্বদাই ভ্রমণ করি! ঠুকে ছেড়ে আমরা কোথাও থাকতে পারব না। উনি যেখানে যাবেন আমরাও সেখানে যাব, বুঝলেন?”

নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও মতলবটি ছাড়তে হ’ল,—দেখলুম যে এ একেবারে অসম্ভব, কারণ শুধু শুধু দল বেজায় ভারি হয়ে যায়।

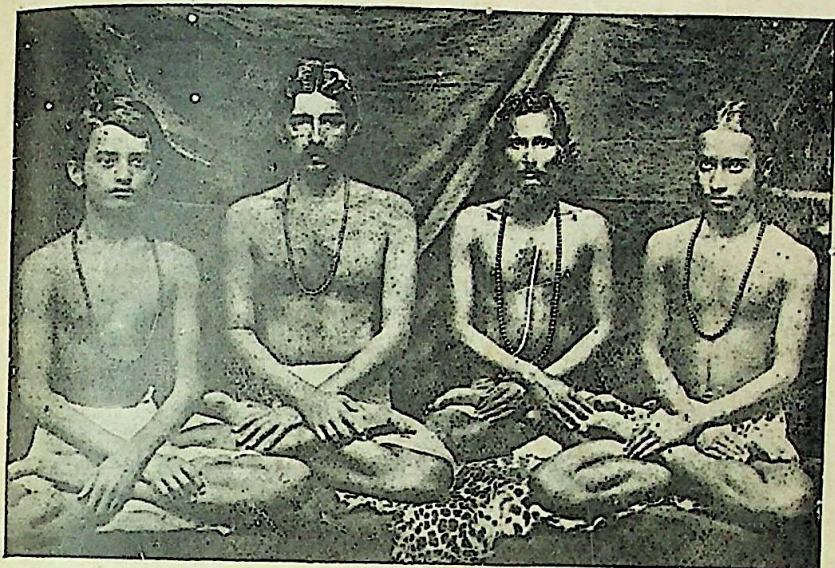
বিদায় নিয়ে বললুম, “অন্ততঃ রাঁচিতে ত’ আসুন, আপনার শিষ্যদের নিয়ে। আপনি নিজে একজন ঈশ্বরের ‘শিশু,’ আমার রাঁচি বিদ্যালয়ের শিশুদের দেখেও ভারি আনন্দ পাবেন।

“বাবা আমার যখনই নিয়ে যাবেন, তখনই খুসী হয়ে যাব।”

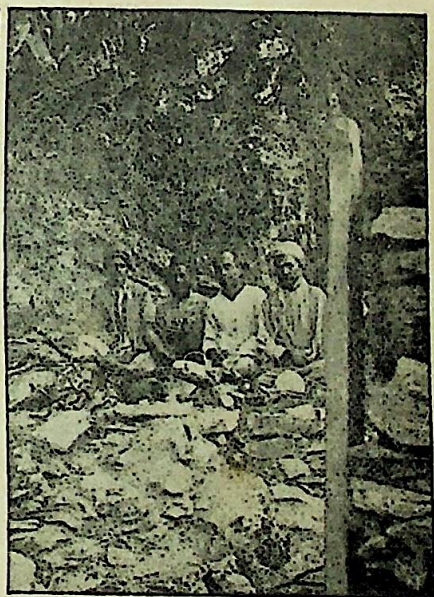
অল্প কিছুদিন পরেই আনন্দময়ী মা’র রাঁচি বিদ্যালয়ে আসার কথা শোনা গেল। ছেলেরা তাঁর আগমন উপলক্ষ্যে বিদ্যালয়বাটি ও প্রাঙ্গণ উৎসবের বেশে সজ্জিত ক’রে তুললে। তাঁদের আনন্দ তখন দেখে কে; গড়াশোনার হাঙ্গামা নেই, গান, ভুরিভোজন, কত কি হবে,—স্বর্ভূতির চূড়ান্ত!

যে দিন তিনি এসে পৌঁছলেন, গেটের কাছে ছেলেরা চিৎকার ক’রে অভ্যর্থনা জানালে,—“জয়! আনন্দময়ী মায়ি কি জয়!” করতাল, শঙ্খধ্বনি আর মৃদঙ্গবাজের সঙ্গে সঙ্গে গাঁদাফুলের বৃষ্টি! আনন্দময়ী মা রৌদ্রকরোজ্জ্বল বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে হাশুমুখে চতুর্দিক পরিভ্রমণ ক’রে বেড়াতে লাগলেন—যেন একটি সচল দেবী প্রতিমা।

প্রধানগৃহ যেটি সেখানে আমি তাঁকে নিয়ে যেতে আনন্দময়ী মা ব’লে



বুদ্ধাবন ভ্রমণের সঙ্গী (বাম হইতে দক্ষিণে) জিতেন্দ্র মজুমদার, ললিত দা,
স্বামী কেবলানন্দ, 'শাস্ত্রী মহাশয়' ও আমি ।



আনন্দময়ী মা (বামে) হিমালয়ের রাণী ক্ষেতের নিকট প্রোনগিরি পর্বতস্থিত
বাবাজী অধ্যুষিত গুহা । (স্বৈত বসনে) আনন্দ মোহন লাহিড়ী,
লাহিড়ী মহাশয়ের পৌত্র ।



শ্রীকৃষ্ণ ।

[শ্রীহরিবারাধন বসু কঙ্কণ অঙ্কিত]

উঠলেন, “এ জায়গাটি ত’ ভারি সুন্দর!” শিশুসুলভ সরল হাসি হেসে তিনি আমার পাশেই বসে পড়লেন। তাঁকে পেয়ে লোকের মনে হয় যেন তিনি আপনা হতেও আপন... অথচ একটা দূরত্বের আভাস যেন সর্বদা তাঁকে ঘিরে রয়েছে—সর্বব্যাপিত্বের একি রহস্যময় স্বাতন্ত্র্য!

বল্লুম, “আপনার জীবন সম্বন্ধে কিছু বলুন।”

“বাবা ত’ সবই জানেন, তবে আবার বলা কেন?” হয়ত তিনি মনে ক’রেছিলেন যে, একটা জন্মের ঘটনার ক্ষুদ্র ইতিহাস... সে আর ধর্মব্যবস্থার মধ্যেই নয়, তা’ আবার বলবে কি!

একটু হেসে আমি আবার একবার বল্লুম। কি আর করেন, সুন্দর স্তম্ভাঙ্গন ছুটিহস্ত হতাশাহুচক ভঙ্গীতে প্রসারিত ক’রে বললেন, “বাবা, বলবার আর কি আছে, কিছুই নেই। আমার জ্ঞান কখনও এই নখর দেহটার সঙ্গে জড়িত হয় নি। এই পৃথিবীতে আসবার আগে, বাবা, ‘আমি সেই একই ছিলাম’। ছোট্ট একটি মেয়ে যখন ছিলাম তখনও ‘আমি সেই’, নারীত্ব পৌঁছে তখনও ‘আমি সেই’। যে পরিবারের মধ্যে জন্মেছিলাম—তাঁরা বখন এই দেহটার বিবাহ দিতে চাইলে তখনও ‘আমি সেই’। তা’রপর লালসামন্ত স্বামী আমার কাছে এসে যখন সোহাগের বাণী গুঞ্জরণ ক’রে মুহূর্তে আমার শরীর স্পর্শ করতে গিয়ে সঙ্গে সঙ্গে বজ্রাঘাতের মত একটা তীব্র বৈদ্যুতিক আঘাত পেলেন সে সময়েও ‘আমি সেই’।

“আমার স্বামী নতজানু হয়ে, করষোড়ে আমার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করলেন।

“তিনি বললেন, ‘মা, আপনার দেহমন্দিরে যে আমার জী নয়, জগন্মাতা বিরাজ করছেন, তা’ না জেনে মনে মনে কামচিন্তা পোষণ ক’রে আমি তা’ স্পর্শ ক’রে অপবিত্র করেছি, তা’র জন্তে আজ থেকে এই প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করলুম যে আপনার শিষ্যত্ব গ্রহণ ক’রে আমি আজীবন চিরকৌমার্যব্রত পালন করব; দাসরূপে আপনার নীরব সেবায় জীবন উৎসর্গ করব আর যতদিন জীবন থাকবে ততদিন আর কারুর সঙ্গে কখনও বাক্যালাপ করব না। আজ আপনার প্রতি... আমার গুরুর উপর যে পাপ করেছি, তা’র প্রায়শ্চিত্ত আমি এমনি ক’রেই করব।’

“আমার স্বামীর বখন ঐ প্রস্তাব নীরবে গ্রহণ করলুম, তখনও ‘আমি সেই

একই ছিলুম'। আর বাবা এখন আপনার সামনেও 'আমি সেই একই আছি।' আর এই অনন্তের কোলে আমার ঘিরে সৃষ্টির লীলা যতই চন্টুক, নিত্যকালের জন্তে 'আমি সেই একই থাকব'।

তারপর আনন্দময়ী মা যেন গভীর ধ্যানের মধ্যে ডুবে গেলেন। মৃষ্টি তাঁর মর্ম্মরপ্রতিমার মত নিখর, স্থির। মন কার ডাকে যেন কোন স্বদূরে উধাও হয়ে ছুটে বেরিয়েছে; গভীর, কালো চোখদুটি তাঁদের অতলস্পর্শিতা হারিয়ে প্রাণহীন, নিশ্চভ—কাঁচের মত। সাধুসত্তরা যখন জড়দেহ হ'তে তাঁদের চৈতন্য অপসারিত করেন, তখন প্রায়ই তাঁদের এই রকম ভাব বর্ত্তমান থাকে। সে সময় বোধ হয় দেহটা যেন একটা নিশ্চাণ মাটির পুতুলের মত। ঘণ্টাখানেক ধরে দুজনেই আমরা তখন ধ্যানানন্দে মগ্ন হয়ে রইলুম। সে যে কী আনন্দ! ছোট্ট একটি উচ্ছ্বাসিত হাসিতে টের পেলুম—আনন্দময়ী মার সন্ধিৎ ফিরে এসেছে।

বললুম, "আনন্দময়ী মা, দয়া করে আমার সঙ্গে বাগানে আসুন। রাইট সাহেব গোটাকতক ছবি নেবে।

"আচ্ছা বেশ বাবা, আপনার ইচ্ছাই আমার ইচ্ছা।" অনেকগুলো ছবি তোলা হ'ল—ভক্তির দীপ্তিতে উদ্ভাসিত তাঁর নয়নবুগলে তখনও সেই দিব্যজ্যোতিঃ অপরিবর্তিত!

তারপর এল খাবার পালা। আনন্দময়ী মা কমলাসনে বসলেন...একজন শিষ্যা পাশে বসে তাঁকে খাওয়াতে লাগলেন...শিষ্যাটি আনন্দময়ী মার মুখে খাবার তুলে দিতে ঠিক ছোট্ট শিশুটিরই মত শান্তভাবে খেতে লাগলেন। খেতে খেতে দেখা গেল যে খেয়েই যাচ্ছেন—তরকারী আর গিষ্টিতে যে স্বাদের কোন পার্থক্য আছে, আনন্দময়ী মার কাছে তাঁর কোন প্রকার বোধ কিছুমাত্র নেই!

সন্ধ্যা হয়ে এল—আনন্দময়ী মা তাঁর শিষ্যদের সঙ্গে নিয়ে আশ্রম থেকে বিদায় গ্রহণ করলেন; যাবার সময় আর একদফা তাঁদের উপর সেই রকম গোলাপফুলের পাপড়িবৃষ্টি; তিনিও ছেলেদের হাত তুলে আশীর্বাদ করতে লাগলেন। স্বতঃউৎসারিত ভক্তির উচ্ছ্বাসে ছেলেদের মুখ উজ্জল। তাঁদের সে এক কী আনন্দের দিন!

যীশুখৃষ্ট ঘোষণা করেছেন, "তুমি তোমার প্রভু ঈশ্বরকে ভালবাসবে

তোমার সকল অন্তঃকরণ, সকল আত্মা, সকল মন আর সকল শক্তি দিয়ে ; এই হচ্ছে আমার প্রথম আজ্ঞা ।”*

নব রকম তুচ্ছ আকর্ষণ পরিত্যাগ ক’রে আনন্দময়ী মা ভগবানে একান্ত-ভাবে পরিপূর্ণরূপেই আত্মসমর্পণ করেছেন। পণ্ডিতদের চুলচেরা বিচারে নয়, কিন্তু বিশ্বাসের প্রবৃত্তিতে এই আপনাতোলা শিশুর মত সরল সাধিকা মানব জীবনের একমাত্র সমস্তার সমাধান করেছেন—সেটা হচ্ছে ভগবানের সার্বজ্জ্য লাভ ! মানুষ আজ এই একমাত্র সহজ সরল সত্যটা একেবারে ভুলে গেছে ; লক্ষকোটি সাংসারিক তুচ্ছ ব্যাপারে, অনাবশ্যক ক্ষণিক দিবয়ে এই শাস্ত্রচিহ্নিত সত্যটা পৃথিবীর মলিনতায়, সংসারের ধোঁয়ার ঢাকা পড়ে গেছে। এক ও অদ্বিতীয় ভগবানের প্রতি প্রেম অস্বীকার ক’রে জাতিসকল বাইরের মানবহিতৈষণার প্রতি নিষ্ঠা প্রদর্শন ক’রে তা’দের নাস্তিকতা লুকায়। অবশ্য এইসব মানবকল্যাণকর প্রচেষ্টাগুলিও সৎ,—কারণ তা’রা মানুষের মল সাময়িকভাবে তা’দের নিজেদের কাছ থেকে সরিয়ে দেয় বটে কিন্তু যীশুখৃষ্ট প্রথম আজ্ঞায় যা’ বলেছেন, জীবনের সেই একমাত্র দায়িত্ব থেকেও তা’ আর মানুষকে মুক্ত করে না। ঈশ্বরকে ভালবাসার যে উন্নততর কর্তব্য, তা’ তা’র একমাত্র দাতার মুক্তহস্তের দান—প্রথম শ্বাসগ্রহণের সঙ্গেসঙ্গেই এসে পড়ে।

রাঁচিতে যাওয়ার পর আর একবার আনন্দময়ী মায়ের সঙ্গে দেখা হয়েছিল, শ্রীরামপুর ষ্টেশনে শিব্যদলের সঙ্গে গাড়ীর জন্তে তখন তিনি অপেক্ষা করছিলেন।

তিনি বল্লেন, “বাবা, হিমালয়ে ধ্বাচ্ছি ; আমার শিষ্যেরা দেবদেব আমার জন্তে একটি আশ্রম তৈরী ক’রে দিয়েছে।”

গাড়ীতে চড়লেন...দেখে অবাক হয়ে গেলুম যে, কি ভিড়ের মধ্যে, কি ট্রেনে, কি ভোজনে, কি নীরব ধ্যানে বসে, কোন উপলক্ষ্যেই তাঁ’র দৃষ্টি ঈশ্বর থেকে কখনও দূরে ফেরান নয়। অন্তরের মধ্যে এখনও সেই অপরিসীম বধুমাথা বাণীর প্রতিধ্বনি শুনি,—

“দেখুন, এখন আর সর্বদাই পরমাত্মার সঙ্গে এক হয়ে ‘আমি চিরকাল সেই একই আছি !’ ”

* বাইবেল—মার্ক ১২ : ৩০।

৪৬শ পরিচ্ছেদ

“নিরাহারা যোগিনী”

রাইট সাহেব ফোর্ড গাড়ী চালাচ্ছিল...জিজ্ঞাসা করলে, “ন’শায়, আজ সকালে কোথায় যাওয়া হবে?” ব’লে রাস্তার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে আমার দিকে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইল। কারণ দিনের পর দিন তা’কে যে রকমভাবে বেরিয়ে পড়তে হ’ত, তা’তে বেচারা জানতেই পারত না যে আগামী কাল তা’কে বাংলার কোন্ অংশ আবিষ্কারের জন্তে ছুটতে হবে।

সোৎসায়ে উত্তর দিলুম, “ঈশ্বরের যদি ইচ্ছা হয়, তা’ হ’লে আমরা আজ বেরুচ্ছি পৃথিবীর অষ্টম আশ্চর্য দেখতে—একটি সাক্ষী মহিলা, যিনি মাত্র বায়ু ভোজন ক’রেই থাকেন।”

রাইট সাহেব সমান আগ্রহে হেসে বললে, “থেরেসা নিউম্যানের পর আবার এক আশ্চর্য ব্যাপার!” আর উৎসাহের চোটে গাড়ীর গতিও সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধি ক’রে দিলে। তা’র ভ্রমণ ডায়েরির মধ্যে এ একটা অত্যাশ্চর্য বিবরণ আর সেটা কোন সাধারণ পর্যটকের পক্ষে সহজলভ্যও নয়!

রাঁচি বিদ্যালয় সবে মাত্র আমরা পিছনে ছেড়ে এলুম; সূর্যোদয়ের পূর্বেই আমরা সব উঠেছি। দলের মধ্যে আমার সেক্রেটারী আর আমি ছাড়া আরও তিনটি বাঙালী বন্ধু ছিলাম। ভোরের বাতাস শরীরে একটা অপূর্ণ পুলকশিহরণ এনে দিচ্ছিল। আমাদের গাড়ীর চালককে তখন অতি সন্তর্পণে গাড়ী চালিয়ে নিয়ে যেতে হচ্ছিল। ভোরবেলায় কৃষকেরা সব বেরিয়েছে উচ্চকবুদ্ বলদেটানা ছুঁচাকার গাড়ী নিয়ে—তা’দের রাজ্যে ভঁক্ ভঁক্ ক’রে মোটর গাড়ীর অনধিকার প্রবেশ তা’রা সহজে বরদাস্ত করবে কেন? তাই প্রতিবাদস্বরূপ ধীর মস্থরগতিতে সর্বপ্রকার সতর্কতার চেষ্টাকেই উপেক্ষা ক’রে তা’রা আপন মনের খেলায় খুসীতেই চলল।

রাইট সাহেব বললে, “ম’শায়, এঁর সম্বন্ধে আর কিছু বলুন না, শুনতে বড় ইচ্ছে হ’চ্ছে।”

আমি শুরু করলুম, “এঁর নাম হচ্ছে গিরিবালা। বহুবছর আগে স্থিতি লাল নন্দী নামে একটি শিক্ষিত ভদ্রলোকের কাছে থেকে এঁর বিষয় আমি প্রথম শুনি। তিনি আমার ভাই বিষ্ণুকে পড়াতে আমাদের গড়পারের বাড়ীতে প্রায়ই আসতেন।

“স্থিতিবাবু আমাকে বলেছিলেন, ‘আমি গিরিবালাকে বেশ ভাল ক’রেই জানি ; তিনি এমন একটা বিশেষ যোগপ্রক্রিয়া অভ্যাস করেন, যা’তে ক’রে তিনি আহাৰ বিনা জীবন ধারণ করতে পারেন। ইচ্ছাপুরের কাছে নবাব-গঞ্জে তাঁ’র বাড়ী ; তিনি আমাদের অতি নিকটপ্রতিবেশিনী ছিলেন। তাঁ’র উপর খুব ভালভাবে লক্ষ্য রেখে অনেক দিন ধ’রে দেখলুম ; কিন্তু তাঁ’র পান-ভোজনের প্রমাণ একটা দিনের জন্তেও বা’র করতে পারলুম না। আমার আগ্রহ তখন এতদূর বেড়ে উঠল যে শেষপর্যন্ত আমি বর্ধমানের মহারাজার কাছে গিয়ে তাঁ’কে ব্যাপারটার একটা তদন্ত করবার জন্তে অনুরোধ করলুম। ব্যাপারটা শুনে ত’ অবাক হয়ে মহারাজা গিরিবালাকে তাঁ’র প্রাসাদে নিমন্ত্রণ করলেন। গিরিবালা মহারাজার পরীক্ষায় সম্মত হয়ে তাঁ’র প্রাসাদের এক অংশে মাস দুই অতিবাহিত করেন—সে অংশটা চাবি দেওয়া থাকত। পরে তিনি একবার এসে দিনকুড়ি আর তৃতীয় বার এসে দিনপনের থেকে যান। মহারাজা নিজে আমাকে বলেছেন যে, এই তিনটে খুব কঠিন পরীক্ষায় নিঃসন্দেহরূপে প্রমাণিত হয়েছে যে বাস্তবিকই তিনি নিরঙ্কু উপবাস ক’রে থাকেন—কিছুই খান না।’

তা’রপর বললুম, “স্থিতিবাবুর এই গল্পটি পঁচিশ বছরেরও উপর আমার মনের মধ্যে রয়েছে। আমেরিকায় বসে কখনও কখনও আমি ভাবতুম যে এই অপূৰ্ণ যোগিনীর সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হ’বার পূর্বে কালশ্রোত তাঁ’কে গ্রাস ক’রে ফেলবে না ত’ ? এখন অবশ্য তিনি খুবই বৃদ্ধা হয়ে পড়েছেন। তিনি এখন কোথায়, এমন কি বেঁচে আছেন কিনা তা’ও ত’ জানি না। যাক্,

* অধুনা পরলোকগত হিজ হাইনেস সার বিজয় চাঁদ মহতাব। মহারাজের গিরিবালাকে তিনবার পরীক্ষা করার ফল নিঃসন্দেহ তাঁ’র রাজপরিবারের কাছে রক্ষিত আছে।

আর ঘণ্টাকতক বাদেই পুরুলিয়ায় গিয়ে পৌছব ; সেখানে তাঁ'র ভাইয়ের বাড়ী আছে ।”

সাড়েদশটার সময় আমরা পৌছলুম পুরুলিয়ায় শ্রীযুক্ত লম্বোদর দে মহাশয়ের বাড়ীতে—পুরুলিয়ার তিনি একজন উকীল । কথাবার্তা শুরু হ'ল ।

আমাদের প্রশ্নের উত্তরে লম্বোদর বাবু বললেন, “আজ্ঞে হ্যাঁ, আমার ভগ্নী এখন বর্তমান । কখনও কখনও তিনি এখানে আমার কাছেও এসে কিছুদিন থাকেন,—কিন্তু এখন তিনি বিউরে আমাদের দেশের বাড়ীতে আছেন ।” তাঁ'রপর লম্বোদর বাবু ফোর্ডগাড়ীটার প্রতি একটা সন্দিগ্ধ দৃষ্টিনিষ্ফেপ ক'রে বললেন, “স্বামীজি, আমার ত' মনে হয় না যে কোন মোটরগাড়ী ‘পশ্চাত্ত বিউর অবধি গিয়ে ঢুকতে পেরেছে । এখন গরুর গাড়ীর কাকানব হাতে আপনাদের আত্মসমর্পণ করা ছাড়া আর কোন গতান্তর নাই দেখছি !”

ডেট্রয়েটের গৌরব আমাদের ফোর্ডগাড়ীটির প্রতি দলের সকলেই সম্মতের আনুগত্য জানালে ।

আমি বললুম, “ফোর্ডগাড়ীটি আমেরিকা থেকে এসেছে—এ বেচারাকে যদি বাংলার বুকের সঙ্গে পরিচয় ঘটতে দেবার সুযোগ থেকে বঞ্চিত করা হয়, তা' হ'লে সেটা তাঁ'র প্রতি নিতান্তই অবিচার করা আর বড় লজ্জার বিষয় হ'বে !” কি আর করেন, অবশেষে লম্বোদর বাবু একটু হেসে বললেন, “সিদ্ধিদাতা গণেশ আপনাদের সহায় হো'ন !” তাঁ'রপর সৌজ্ঞ্য প্রকাশ ক'রে বললেন, “যদি একবার সেখানে পৌছতে পারেন, তা' হ'লে গিরিবাদা যে আপনাদের দেখে খুব খুসীই হবেন এ কথা আমি নিশ্চয় ক'রে বলতে পারি । বয়স তাঁ'র প্রায় সত্তর হয়ে এল, কিন্তু স্বাস্থ্য তাঁ'র এখনও খুব চমৎকারই আছে ।”

মনের দপণ হচ্ছে মাহুবেব দুটি চোখ ; সোজাসুজি তাঁ'র সেই স্ব-প্রকাশক চোখদুটির উপর দৃষ্টি স্থাপন ক'রে জিজ্ঞাসা কবলুম, “ম'শায়, আচ্ছা দয়া ক'রে আমায় বলুন ত', তিনি যে একদম কিছুই খান না, এটা কি খাঁটি সত্যি ?”

“খাঁটি সত্যি ম'শায় ।” দৃষ্টি তাঁ'র সরল ও অকপট । তাঁ'রপর তিনি বললেন, “পঞ্চাশ বছরেরও উপর আমি ত' তাঁ'কে কখন একগালও খেতে দেখিনি । আজ যদি পৃথিবী হঠাৎ প্রলয়ে ধ্বং হ'য়ে যায়, তা' হ'লে আমি

যত না আশ্চর্য্য হ'ব, তা'র চেয়ে বেশী আশ্চর্য্য হ'ব আমার ভগ্নীকে খেতে দেখলে!"

এ ছোটো নৈসর্গিক ঘটনার অসম্ভাব্যতার বিনয় স্বরণ ক'রে আমরা হু'জনেই হেসে উঠলুম।

লম্বোদরবাবু বলতে লাগলেন, "গিরিবালা দেবী তাঁ'র যোগসাধনে কখনও এমন নির্জনতা খোঁজেন নি যেখানে কেউ প্রবেশ করতে পারে না। সারা জীবনটাই তাঁ'র সংসার আর আত্মীয়পরিজনের সাহচর্য্যেই কেটেছে। তাঁ'র এইরকম অলৌকিক অবস্থা এখন তাঁ'দের কাছে সব সয়ে গেছে। তাঁ'দের মধ্যে এমন একজনও কেউ নেই যে গিরিবালা দেবীকে খাত্তগ্রহণ করতে দেখলে একেবারে বিশ্বমে স্তম্ভিত না হয়ে যাবে। স্বভাবতঃই ভগিনী একটু আড়ালে থাকেন—হিন্দুবিধবার যেমন হয়, কিন্তু পুকলিয়া আর বিউরে আমাদের ছোট পরিবারের সকলেই জানে যে, বলতে গেলে প্রকৃত-পক্ষেই তিনি একজন 'অসাধারণ' স্ত্রীলোক।"

ভগিনীর প্রতি ভ্রাতার অগাধ বিশ্বাস সুস্পষ্টভাবেই প্রতীয়মান হ'ল। আমরা সকলে তাঁ'কে আন্তরিক ধন্যবাদ দিয়ে বিউরের দিকে অগ্রসর হলুম। রাস্তার ধারে এক খাবারের দোকানের কাছে দাঁড়ান গেল, কিছু খেয়ে নেবার জন্তে, লুচি আর তরকারী; সঙ্গে সঙ্গে রাস্তায় ছোঁড়াদের বেশ ভিড় লেগে গেল—তা'রা রাইট সাহেব বিনা কাঁটাচামচেতে হিন্দুদের মতন* হাতের আঙুল দিয়ে লুচি ছিঁড়ে খাচ্ছে দেখে ত' তাজ্জব ব'নে গেল; এঁ'রা, সাহেব—সে কিনা কাঁটাচামচে বিনা শুধু হাত দিয়ে খায়! যাক্, আমাদের সবাইকার তখন ক্ষিধেও পেয়েছিল বেশ, বিকেলে কি জুটবে না জুটবে ভেবে সকাল সকাল সব সেরে নেওয়া গেল... কেন না এরপর বহুৎ ঘোরাঘুরি আছে।

গাড়ী দৌড়ল বর্দ্ধমান জেলার ভিতর দিয়ে পূবদিকে, চারধারে রোদে-পোড়া ধানের ক্ষেত। রাস্তার দু'ধারে ছায়াঘন গাছপালার সারি; প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ছাতার মত গাছের ডালে সব ময়না, বুলবুল আপন মনে শীষ দিচ্ছে.

* শ্রীমন্তেশ্বর গিরিজী বলতেন, "ভগবান পৃথিবীতে আমাদের উপভোগের জন্ত নানা ফলমূল দিয়েছেন। আমরা আমাদের ভোজ্য দেখতে চাই, তাঁ'দের গন্ধ বা স্বাদ নিভে চাই—হিন্দুরা ঘাবার তা' স্পর্শও করতে চায় : খাবার সময় কেউ হাজির না থাকলে, "শোনা" ব্যাপারটাও মন্দ লাগে না।"

গান করছে। লোহার হালবাঁধান চাকার গ্রাম্য গরুরগাড়ীর ক্যাচকোচ্ শব্দের সঙ্গে মনেমনে তুলনা করতে লাগলুম সহরের অভিজাত পিচবাঁধান রাস্তায় মোটর টায়ারের সরস্ব শব্দ।

গাড়ী উদ্দামগতিতে ছুটে চলেছে। হঠাৎ টেঁচিয়ে ব'লে উঠলুম, “ডিক্, দাঁড়াও, দাঁড়াও! দেখ দেখি, আমগাছটা যেন ফলে ভেঙ্গে পড়েছে। এ সাদর নিমন্ত্রণ উপেক্ষা করলে বৃক্ষরাজের প্রতি নিতান্ত অসম্মান প্রদর্শন করা হয়, কি ব'ল?”

আমার হঠাৎ অমুরোধে ফোর্ড গাড়ীটা একটা বাঁকুনি খেয়ে থেমে গেল।

পাচজনে আমরা গাড়ী থেকে নেমে পড়ে ছোট ছোট ছেলেদের মতন ছুটলুম সেই আমতলায়; রাশিরাশি পাকা আম চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে রয়েছে।

আমি একটি সুপ্রসিদ্ধ কবিতার অম্লকৃতি ক'রে বললুম—

“বহু সুরসাল রসাল ফলেছে চোখের অন্তরালে,

হারাতে তা'দের মধুর আশ্বাদ পাথুরে জমির 'পরে”

শৈলেশ মজুমদার নামে আমার একটি ছাত্র একগাল হেসে বললে, “আমেরিকায় আর এমনটা হতে হয় না, কি বলেন স্বামীজি, এঁ্যা?”

অত্যন্ত পরিভ্রাণ্ডসহকারে আশ্রয় আশ্বাদন ও তজ্জনিত সন্তোষলাভের আনন্দরসে আপ্লুত হয়ে অকপটেই স্বীকার ক'রতে হ'ল যে, “না, এমনটি নয় বটে। আমেরিকায় থাকতে আমি না পেয়ে কত দুঃখ হ'ত। আম ছাড়া বাঙালীর স্বর্গ একেবারে কল্পনাই করা যায় না!”

খুব উঁচু ডালে একটা বেশ বড় আর পাকা আম ঝুলছিল; একটা ইঁটের ঘায়ে সেটাকে পেড়ে ফেললুম। দেখা গেল রোদে সেটা গরম হয়ে রয়েছে। তা'রপর সেই অমৃতফল আশ্বাদনের মাঝে মাঝে জিজ্ঞাসা করলুম, “ডিক্, আমাদের সব ক্যামেরাগুলোই কি গাড়ীতে আছে?”

“আজ্ঞে হ্যাঁ ম'শায়, ব্যাগেজ্ কম্পার্টিমেন্টে!”

“দেখি, যদি গিরিবালা সত্যিকারেরই একজন খুব উঁচুদের সাধিকা হ'ন, তা'হ'লে আমেরিকায় গিয়ে তাঁ'র সম্বন্ধে আমি কিছু লিখব। এমন অপূর্বশক্তির আধার এই হিন্দু যোগিনী যে লোকচক্ষুর অন্তরালে থেকে

ইহজগৎ পরিত্যাগ ক'রে যাবেন সে হতে পারে না,...এই আমগুলোর
যা দশা হচ্ছিল আর কি! কি বল?"

আরও আধঘণ্টা কাটল, তখনও আমরা ছারাপুনিবিড় ম্লান শাস্তির
মধ্যে আনন্দে পরিভ্রমণ করছি।

রাইট সাহেব বললে, "ম'শায়, গিরিবালা দেবীর বাড়ী আমাদের
স্বর্গাস্তের আগেই পৌছান দরকার, যা'তে ক'রে ফটো নেবার জন্তে যথেষ্ট
আলো তখনও পাওয়া যেতে পারে।" তা'রপর একটু হেসে বললে,
"মুশ্কেল হচ্ছে আমেরিকানরা একটু সন্দিক্তপ্রকৃতির কিনা, তাই এ'র সম্বন্ধে
কিছু বিশ্বাস করাতে হ'লে ফটো বিনা তা' আর চলবে না!"

এ সহুপদেশের উপর আর তর্ক চলে না, কায়েই লোভ সম্বরণ ক'রে
গাড়ীতে পুনঃপ্রবেশ করা গেল।

যেতে যেতে সখেদে দীর্ঘশ্বাস পরিত্যাগ ক'রে বললুম, "ডিক্, তোমার
কথাই সত্যি! আমেরিকার বস্তুতত্ত্বের বেদীতে আজ আমের স্বর্গ আমি
বলি দিলুম। যাক্, ফটোগ্রাফ্ কিম্বদন্তি আমাদের নিতেই হবে!"

রাস্তা ক্রমশঃই ক্ষীণ হ'য়ে আসতে লাগল; গরুর গাড়ীর চাকার দাগ,
শক্ত মাটির ঢেলা—যেন বার্কক্যের জরাজীর্ণ অবস্থা! মাঝে মাঝে গাড়ী
থেকে নেমে আমরা সকলে চারজন মিলে গাড়ীটাকে পিছন দিক দিয়ে ঠেলে
এগিয়ে দিতে লাগলুম, যা'তে ক'রে মিষ্টার রাইট ফোর্ডগাড়ীটাকে আরও
একটু সহজে চালিয়ে নিয়ে যেতে পারে।

শৈলেশ বললে, "লম্বোদর বাবুর ঠিকই বলেছিলেন, এখন দেখছি যে
গাড়ী আমাদের বয়ে নিয়ে যাচ্ছে না, আমরাই গাড়ীকে বয়ে নিয়ে যাচ্ছি!"

গাড়ীতে আমাদের অনবরত ওঠা আর নামার একঘেয়েমি দূর হচ্ছিল
মাঝে মাঝে যখন একটা গ্রাম এসে পড়ছিল—অপরূপ সুন্দর, সরল
গ্রাম্যদৃশ্য! মনটা তবুও একটু হাল্কা হয়।

এবার রাইট সাহেবের ডায়েরি থেকে খানিকটা ভুলে দিই—তারিখ
১৯৩৬ সালের ৫ই মে, "সভ্যতার কৃত্রিমতাসম্পর্কশূন্য প্রাচীন গ্রামগুলি
বনের ছায়ার কোলে বাসা বেঁধেছে; তা'র ভিতরে তালবনের পাশ দিয়ে
আমাদের গাড়ী এঁকেবেঁকে পথ ক'রে নিয়ে চলল। মাটির দেওয়াল দিয়ে
ঘেরা কুঁড়েঘরগুলো দেখতে ভারি চমৎকার। দরজায় এক একটা ঠাকুরের

নাম লেখা। ছোট ছোট উলঙ্গ শিশুরদল নিঃশব্দচিত্তে খেলা করছে। গাড়ী যখন উর্দ্ধশ্বাসে তা'দের গ্রামের ভেতর দিয়ে দৌড়ছে, কেউবা তখন দাঁড়িয়ে হাঁক'রে তা' দেখছে আর কেউবা তা' দেখেই প্রাণপণে ছুটে পালাচ্ছে। এ কিরকম গাড়ী? প্রকাণ্ড কালোরঙের—তা'তে বলদ যোতা নেই,—আপনিই দৌড়ছে! গ্রাম্যনারীরা আড়াল থেকে ঘোমটার ফাঁক দিয়ে কোতুহলী দৃষ্টি নিক্ষেপ করছে আর পুরুষেরা রাস্তার ধারে গাছের তলায় অলসভাবে ঠেসান দিয়ে বসে রয়েছে। এক জায়গায় সব গ্রামবাসীর একটা বড় পুকুরে নেমে স্নান করছে দেখা গেল। (গায়ে শুকনো কাপড় জড়িয়ে ভিজ়ে কাপড় তখন ছেড়ে ফেলছে)। মেয়েরা বড় বড় পেতলের ঘড়া ক'রে জল নিয়ে যাচ্ছে।

“রাস্তায় চড়াই উৎরাই। গাড়ীতে থাক্কা খেয়ে টাল্ সামলাতে সামলাতে ছোট ছোট নদীনালা পার হয়ে, একটা অসমাপ্ত বাঁধ ঘুরে, একটা শুকনো বালিভরা নদীগর্ভ দিয়ে ধীরে ধীরে এগিয়ে অবশেষে বেলা ৫টা নাগাদ আমাদের গন্তব্যস্থল বিউরের নিকটস্থ হ'লুম। বাঁকুড়া জেলার মধ্যে ছোট্ট এই গ্রামটি, চারিদিকে ঘন গাছপালার আড়ালে লুকোন; বর্ষায় জলের স্রোত যখন উদ্দামবেগে প্রবাহিত হয় আর সর্পিল রাস্তা কাদায় ভরা থাকে তখন পথিকদের গ্রামে পৌছবার আর কোন উপায় থাকে না।

“একটা নির্জন মাঠের মাঝে এক মন্দির থেকে পূজো সেরে একটা দল তখন ফিরছিল; রাস্তা জিজ্ঞাসা করতে, ডজনখানেক প্রায় নেংটিপরা ছোঁড়ার দল তড়াঙ্ক ক'রে ফুটবোর্ডে উঠে প'ড়ল—সবাই বলে যে, গিরিবালা দেবীর কাছে আমাদের নিয়ে যাবে।

“রাস্তাটা একটা খেজুরঝোপে ঘেরা কতকগুলো মাটির কুঁড়ের দিকে গিয়েছে, সেখানটায় পৌছবার আগেই হঠাৎ ফোর্ড গাড়ীটা একটা বিপজ্জনক কোণে হেলে পড়ে বারকতক লাফিয়ে উঠল। সরু রাস্তাটা চলল—গাছের সারি, পুকুরধার, উঁচুপাড়, গভীর গর্ভ আর খাদের ভিতর দিয়ে। গাড়ীটা গিয়ে আটকাল একটা ঝোপের ধারে, তা'রপরে একটা উঁচু টিলার কাছে গিয়ে মাটিতে বসে গেল। কতকগুলো মাটির চাঙড় সরিয়ে ধীরে ধীরে অতি সস্তর্পণে আমরা তখন এগিয়ে চললুম। হঠাৎ রাস্তাটা গিয়ে থামল গরুর গাড়ীর চাকার দাগের মাঝখানে একটা নলখাগড়ার ঝোপের মতন

জায়গায়; আবার ঘুরতে হ'ল একটা মজাপুকুরের খাড়া পাড়ের উপর দিয়ে, একবার পড়লে আর রক্ষে নেই! আর শাবলকোদাল বাইস দিয়ে রাস্তা খুঁড়ে কেটে তবে উদ্ধার। বারম্বারই দেখা গেল যে রাস্তায় আর চলা যায় না; কিন্তু কি করা যায়, যাত্রা ত' আর স্থগিত করা যায় না, এগোতেই হবে। অচুগত ছোকরারদল, কোদালটোদাল এনে রাস্তার মাঝখানের সব বাধাবন্ধ সাফ ক'রে পথ বানিয়ে দিলে (সিদ্ধিদাতা গণেশের সব চেলা আর কি!) আর শতশত গাঁয়ের লোক আর ছোড়ারদল সব হাঁ ক'রে আমাদের দিকে তাকিয়ে।

“আমরা এগোতে লাগলুম; একধারে মেয়েরা তা'দের কুঁড়েঘরের দরজা থেকে বিশ্বয়বিস্ফারিত চক্ষে চেয়ে, আর একধারে পুকুরেরা সব পাশেপাশে আর পিছনপিছন আসতে লাগল, ছোড়াগুলো লাফাতে লাফাতে এসে শোভাযাত্রাটির কলেবরের বৃদ্ধিসাধনে তৎপর হ'ল...সে এক অপক্লপ দৃশ্য! আমাদের গাড়ীটিই বোধ হয় এ রাস্তায় প্রথম প্রবেশ করলে; গরুর গাড়ীর একাধিপত্য যেখানে, সেখানে এ একটা অভূত ব্যাপার বই কি! কি যে চাঞ্চল্য তখন সৃষ্টি করেছিলুম আমরা সেখানে—একজন আমেরিকান এক গর্জনশীল মোটরগাড়ীতে একটা দল চাপিয়ে তা'দের গ্রাম্যভূর্গের একেবারে ছুরারের গোড়ায় এসে হাজির—এতদিনের পুরোন আবু এইবার বুঝি গেল!

“গাড়ী গিয়ে দাঁড়াল একটা সরু গলির মুখে, সেখান থেকে গিরিবালা দেবীর বাপের বাড়ী একশত ফুট হ'বে। রাস্তার সঙ্গে লম্বা লড়াই ক'রে প্রান্তরাস্ত হ'য়ে অবশেষে গন্তব্যস্থলে পৌঁছে আমাদের মন তখন বিজয়গর্বে উৎকুল হয়ে উঠল। চারদিকে সব মাটির কুঁড়েঘরের মাঝে একটা বড় দোতলা পাকাবাড়ী—তখন মেরামত চলছে, কারণ তখনও বাড়ীটার চারদিকে বাঁশের তারা বাঁধা।

“অন্তরের চাপা উল্লাসে আর আগ্রহে উন্নত হয়ে খোলা দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়ালুম তাঁ'র বাড়ীতে—ভগবান যাঁকে ক্ষুধার ক্লেশ থেকে মুক্তি দিয়ে অপার করুণা প্রদর্শন করেছেন। গ্রামবাসীরা—ছেলেবুড়ো, ছাংটা, কাপড়-পরা সবাই হাঁ ক'রে তাকিয়ে। মেয়েরা একটু দূরে দূরে বটে কিন্তু তা'দেরও কৌতূহলের আর সীমা নেই—ছেলেবুড়ো সবাই এই অভূতপূর্ব দৃশ্য দেখতে দেখতে অসঙ্কোচে আমাদের পিছুপিছু আসতে লাগল।

তারপরেই দো'রগোড়ায় দেখা গেল একটি ক্ষুদ্রমূর্তি, গিরিবালা দেবী স্বয়ং, তসরের কাপড়পরা! ঘোমটার তলা থেকে সলজ্জ দৃষ্টি নিক্ষেপ ক'রে অত্যন্ত সঙ্কোচের সঙ্গে এগিয়ে এলেন। ঘোমটার ছায়াতলে চোখ দু'টি হ'তে এক অপূর্ব জ্যোতিঃ বিকীর্ণ হচ্ছে। স্নিগ্ধ, শান্ত, সৌম্যমূর্তি, পার্থিব আকর্ষণমুক্ত, ঈশ্বরোপলক্ষিত্যে এক মহিমময় প্রশান্তিতে মুখখানি উদ্ভাসিত।

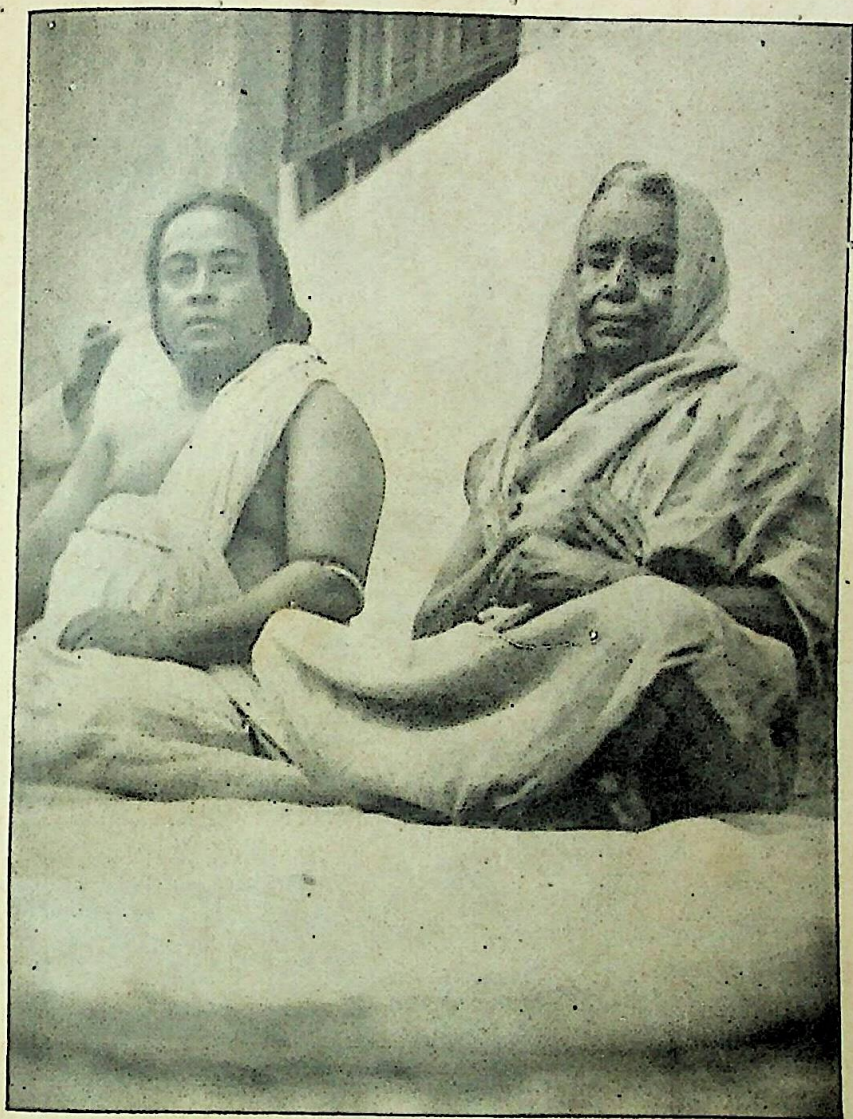
“দীর্ঘ শাস্ত্রপদে তিনি এগিয়ে এলেন। তাঁ'র নীরব সম্মতি পেয়ে আমরা তাঁ'র ‘স্থির’ আর ‘চলচ্চিত্র’ তুলে নিলুম।* আগাদের ক্যামেরা ঠিক ক'রে নেওয়া, আলোর ব্যবস্থা করা আর ঠিক হয়ে বস; প্রভৃতি ব্যাপারের হাঙ্গামা তিনি ধৈর্য্যসহকারে সহ্য ক'রে অপেক্ষা ক'রে বসে রইলেন। অবশেষে তাঁ'র অনেকগুলি ফটো গ্রহণ করা গেল—ভবিষ্যতে সাক্ষী রাখবার জন্তে যে তিনিই পৃথিবীতে একমাত্র নারী যিনি গত পঞ্চাশ বৎসরেরও উপর নিরন্তর উপবাস ক'রে আছেন (থেরেসা নিউম্যান অবশ্য ১৯২৩ সাল থেকে উপবাস ক'রে আছেন)। গিরিবালা দেবী আমাদের সামনে এসে দাঁড়ালেন—আননে অপূর্ব মাতৃভাব, দেহ সম্পূর্ণরূপে বজ্রাবৃত; ছোট্ট দু'টি পা, হাত আর মুখটি ছাড়া আর কিছু দেখা যায় না, দৃষ্টি অবনত। মুখে গভীর প্রশান্তির ছাপ, নাসিকাটি স্ফুটোল, শিশুদের মত ওষ্ঠাধর, উজ্জল দুটি চোখ আর মুখে অপরূপ হাসি।”

গিরিবালা দেবী সম্বন্ধে রাইট সাহেবের যা' ধারণা আমারও তা'ই। তাঁ'র স্নিগ্ধোজ্জল অবগুণ্ঠনের মত আধ্যাত্মিক ভাবের একটা অপরূপ জ্যোতিঃ তাঁ'কে ঘিরে রয়েছে। প্রণাম করলেন আমাকে—গৃহস্থ যেমন সাধুসন্ন্যাসী দেখে করে। তাঁ'র সরল মধুরভাব আর নীরব স্নিগ্ধহাসি, মধুমাখা অভ্যর্থনা-বানীর চেয়েও বেশী আন্তরিকতার সঙ্গে আমাদের স্বাগত সম্ভাষণ জানালে। ধূলোমাখা পথের কঠিনভ্রমণের সব কষ্ট একনিমেষে দূর হয়ে গেল।

গিরিবালা দেবী বারান্দায় গিয়ে ভূমিতে উপবেশন করলেন; বার্কিকোর চিহ্ন দেখা গেলেও তিনি ক্ষীণদেহ ছিলেন না। বর্ণ ছিল তাঁ'র গৌর। পরিষ্কার আর স্বাস্থ্যের জ্যোতিঃতে উজ্জল।

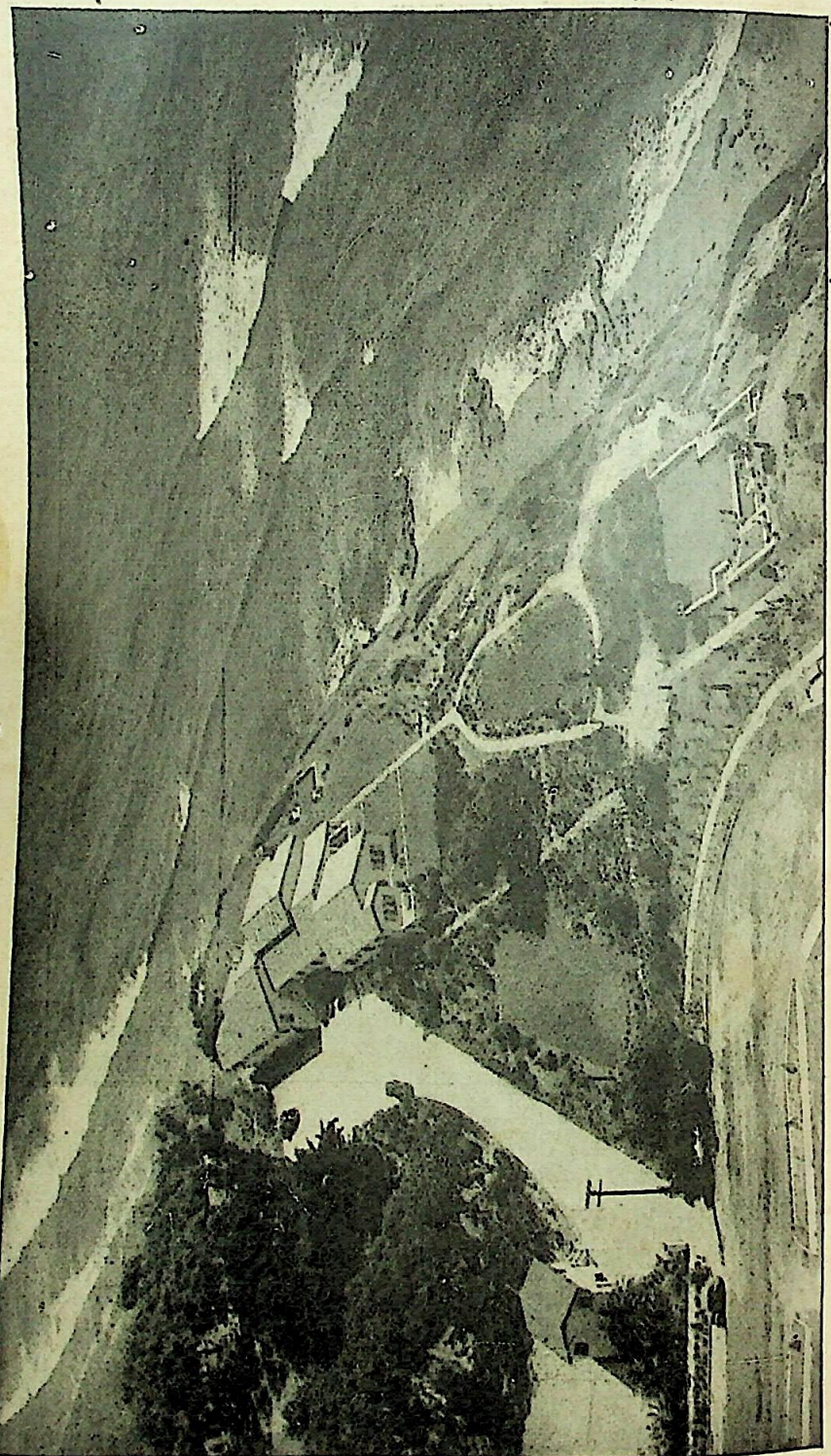
আমি তাঁ'কে বললুম,—অবশ্য বাংলাতে, “মা, পঁচিশবছরের উপর

* শ্রীরামপুরে তাঁ'র শেষ জীবনব্যবস্রাতির উৎসবে রাইট সাহেব শ্রীমুক্তেশ্বর গিরিজীরও চলচ্চিত্র তুলে নিয়েছিল।



নিরাহারা গিরিবালা

১৮৮০ সাল থেকে গিরিবালা কোন খাদ্য বা পানীয় কিছুই গ্রহণ করেননি। তাঁর সঙ্গে আমার এই ছবিটি তাঁদের বাসস্থান বিউর গ্রামে তোলা হয় ১৯৩৬ সালে। বর্ধমানের মহারাজা তাঁর নিরাহারা অবস্থা সম্বন্ধে খুব কঠিন পরীক্ষা ক'রে দেখেছিলেন। ইথার, সূর্য্যরশ্মি এবং বায়ু থেকে তিনি ব্যায়ামশক্তি সংগ্রহ করবার জন্য একপ্রকার যৌগিক প্রক্রিয়ার অনুশীলন করতেন।



ক্যাভিফোর্মিয়া প্রদেশস্থ এনসিনিটাসে প্রাপ্ত মহাসাগরের তটে অবস্থিত অটালিকা এবং এস, আর, এক্ এর ভূমির কিসদংশ

আমি আপনার দর্শন কামনা ক'রে আসছি। আপনার এ শূণ্যজীবনের কথা স্থিতিলাল নন্দী বাবুর কাছ থেকেই শুনেছিলুম।”

তিনি মাথা নেড়ে বললেন, “হ্যাঁ, তিনি নবাবগঞ্জে আমাদের বাড়ীর পাশেই থাকতেন।”

“এই সময়ের মধ্যে আমি সমুদ্রযাত্রা ক'রে বিদেশে গেছি কিন্তু একদিন এসে আপনার দর্শনলাভ করতে হবে, পূর্বেরকার এ আকাজ্জক কথা আমি কখনও ভুলিনি। মাগুবের অন্তরে ভগবানের অনন্ত করুণাধারার কথা সংসার বহুদিন ভুলে গেছে। আপনি নীরবে নিভৃতে ভগবানের যে মহিমা প্রদর্শন করছেন, তা'র কথা সারা পৃথিবীতে প্রচার হওয়া উচিত।”

মিনিটখানেক দৃষ্টি তুলে ধ'রে চেয়ে রইলেন, মুখের হাসিতে গভীর আগ্রহ। তা'রপর শাস্ত্রস্বরে বললেন, “বাবাই সব জানেন।”

তিনি যে কোন অপরাধ নিলেন না,—তা'তে আমি খুব খুসী হ'লুম। প্রচার হ'লে যোগী না যোগিনীরা যে কি রকম ব্যবহার করবেন, তা' কেউ ব'লতে পারে না। সাধারণতঃ তাঁ'রা এ সব পরিহার ক'রে গভীর আধ্যাত্মিক সাধনা নীরবেই ক'রে যেতে ইচ্ছে করেন। জিজ্ঞাসু ব্যক্তিদের উপকারের জন্য তাঁ'দের জীবনলীলা প্রকাশ্য প্রদর্শনের উপযুক্ত সময় উপস্থিত হ'লেই তাঁ'রা অন্তরের মধ্যে সাড়া পান।

আমি বলতে লাগলুম, “মা, তা' হ'লে দয়া করে আমার ক্ষমা করবেন যদি বেশী কিছু জিজ্ঞাসাবাদ ক'রে আপনাকে বিরক্ত করি। যেটা খুসী হয় সেটাই উত্তর দেবেন, না হ'লে দেবেন না—আপনি চুপ ক'রে থাকলেও আমি তা' সব বুঝে নিতে পারব।”

মধুর ভঙ্গীতে হস্তদ্বিটি প্রসারিত ক'রে তিনি বললেন, “নিশ্চয়, খুসী হয়েই উত্তর দেব আমি, তবে বাবা আমার মত অকিঞ্চন ব্যক্তি যতটা ভাল ক'রে উত্তর দিতে পারে সেই অবধি, তা'ব বেশী আর কি পারব?”

অন্তরের সঙ্গে প্রতিবাদ ক'রে বললুম, “না, না, মা, অকিঞ্চন কি ব'লছেন! আপনি কত উচ্চ, কত মহান।”

“কি যে বলেন বাবা, দীনাতিদীনা আমি, সকলের অচ্যুততা দাসী,” তা'রপর তিনি অপূর্ব সারল্যের বললেন, “তবে লোককে রেঁধে খাওয়াতে আমি বড় ভালবাসি।”

ভাবিলুম এত' ভারি অদ্ভুত সখ—নিশেষতঃ এই নিরাহারা সাধবীর পক্ষে!

“আচ্ছা না, আপনি নিজমুখে বলুন ত’—আপনি কি সত্যিই একেবারে অনাহারে থাকেন?”

“হ্যাঁ বাবা, সত্যি!” মিনিটকতক চুপ ক’রে বসে রইলেন; তা’রপরের কথাতে বোঝা গেল যে মনেমনে তিনি হিসেব কষছিলেন। তা’রপর তিনি বললেন, “বারবছর চারমাস বয়স থেকে আজকে এই আটবট্টিবছর বয়স পর্যন্ত ছাপ্পানবছরের উপর আমি খাবার কি জল, কিছুই খাই নি।”

“খেতে কখনও লোভ হয় না?”

“খাবার ইচ্ছে হ’লে, আমায় খেতে হ’ত বইকি বাবা।”

সরল হ’লেও এই মহিমাদীপ্ত উত্তরদানে তিনি এই স্বতঃসিদ্ধ সত্য প্রকাশ করলেন, যা’ দিনে অন্ততঃ তিনবার ক’রে ভোজনক্রিয়ায় রত পৃথিবীর কাছে অত্যন্ত সুপরিচিত।

“কিন্তু নিশ্চয়ই আপনি কিছু খান বই কি!” একটু প্রতিবাদের স্বরে বললুম।

চট্ ক’রে বুঝে নিয়ে একটু হেসে তিনি বললেন, “নিশ্চয়ই!”

“স্বর্ঘ্যের আলো আর বাতাসের সূক্ষ্মতর শক্তিঃ আর যে ব্যোমশক্তি মস্তিস্কের মধ্য দিয়ে আপনার শরীরে শক্তি সঞ্চার করে, তা’থেকেই আপনি পুষ্টি গ্রহণ করেন, কি বলেন?”

* ১৯৩৩ সালের ১৭ই মে তারিখে মেন্‌ফিস সহরে ক্লেভল্যান্ডের ডাঃ জর্জ ডব্লিউ ক্রাইল্ এক চিকিৎসাসম্মেলনে যে বক্তৃতা দিয়েছিলেন, তা’র কতকংশ নিম্নলিখিতভাবে প্রকাশিত হয়েছিল,—

“আমরা যা’ আহাৰ করি তা’ হচ্ছে তাপবিকীরণ; আমাদের খাদ্য হচ্ছে ততটা শক্তির পরিমাণ। এই সর্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় তাপবিকীরণ, যা’ স্নায়ুজাল বা শরীরস্থ বিদ্যুৎ-চক্রে বৈদ্যুতিক শক্তি সঞ্চারিত করে, তা’ সূর্য্যকিরণই খাদ্যের মধ্যে সঞ্চিত করে। ডাঃ ক্রাইল্ বলেন, অণুপরমাণুরা সব যেন সৌরমণ্ডল। কৃষ্ণিত স্প্রিংএর মত সৌরদীপ্তিপূর্ণ অণুপরমাণুরাই শক্তির বাহক। এই সব অসংখ্য অণুপরমাণুপূর্ণ শক্তিই খাদ্যরূপে গ্রহণ করা হয়। এই সব অতি ক্ষুদ্রাকার অণুপরমাণুসকল একবার মানবশরীরের জীবকোষে প্রবেশ ক’রেই শরীরের তাপবিকীরণকারী নূতন রাসায়নিক শক্তি ও নূতন বৈদ্যুতিকপ্রবাহ উৎপন্ন করে। ডাঃ ক্রাইল্ বলেছেন, ‘তোমার শরীর এই রকম অণুপরমাণুতে সংগঠিত। তা’রাই চক্ষুকর্ণের মত তোমার পেশী, মস্তিষ্ক, এবং ইন্দ্রিয়গ্রাম।’”

বিজ্ঞানীরা হয়ত কোনদিন আবিষ্কার করবে যে মানুষে সাক্ষাৎ সৌরশক্তি হ’তে কিরূপে বেঁচে থাকতে পারে। দি নিউইয়র্ক টাইম্‌সে উইলিয়াম এল্, লরেন্স লিখছেন, “পত্রহরিৎ হচ্ছে প্রকৃতির মধ্যে জ্ঞাত একমাত্র পদার্থ যা’ ‘সূর্য্যকিরণ ধরা ফাঁদের’ মত কাষ করবার কোন প্রকার শক্তি

“বাবাই ত’ সব জানেন।” ব’লে আবার তিনি নীরব হয়ে পড়লেন, তাঁ’র ভাব আশ্বাসসূচক ও অপ্রগল্ভ।

“মা, আপনার ছেলেবেলাকার কথা সব বলুন। ভারতের সবাইকার কাছে এ একটা গভীর আগ্রহের বিষয়—এমন কি সমুদ্রপারে আমাদের যে সব ভাইবোনেরা আছে, তা’দের কাছেও।”

গিরিবালা দেবী তাঁ’র স্বভাবসিদ্ধ গান্ধীর্ষ্য পরিত্যাগ ক’রে আলাপ আলোচনায় মগ্ন হ’য়ে বসলেন,—স্বর তাঁ’র মৃদু অথচ দৃঢ়, “আচ্ছা তবে বলি, আমার জন্ম এই জঙ্গলের দেশেই। আমার ছেলেবেলাকার কথায় বিশেষত্ব কিছুই নেই, কেবল একটামাত্র কথা ছাড়া যে আমার ক্ষিধে ছিল রাক্ষসে। ছেলেবেলাতেই আমার বিয়ের কথাবার্তা হয়।

“মা আমাকে প্রারম্ভে বকতেন, ‘বাছা, ক্ষিধে চাপ্তে চেষ্টা করো। স্বপ্নের ঘরে গিয়ে যখন অজানা লোকেদের মানখানে তোমার বাস করতে হবে, তখন সারাদিন তোমার খাইখাই করা দেখে তা’রা সব কি ভাববে ব’ল দেখি?’

“তিনি যে বিপদের সম্ভাবনা আগে থেকেই দেখতে পেয়েছিলেন অবশেষে তাইই ঘটল। নবাবগঞ্জে যখন স্বপ্নের ঘর করতে গেলুম, তখন আমার বয়স মাত্র বার বছর। আমার সর্বদা খাইখাই স্বভাব দেখে স্বাশুড়ী ঠাকুরণ দিনেছপুয়ে রাতবিরাতে অনবরত বকেবকে লজ্জা দিয়ে অনর্থ বাধাতে লাগলেন। বাইহোক তাঁ’র বকুনি ছিল শাপে বর! তা’ আমার মধ্যে স্তম্ভ আধ্যাত্মিক বৃত্তি ক্রমশঃ জাগিয়ে তুললে। একদিন তিনি যে টিটকিরি আর বকুনি দিলেন, তা’ একেবারে নিশ্চয়ম. হৃদয়হীন।

“অন্তরের অন্তঃস্থলে দারুণ মর্শ্বেদনা পেয়ে আমি ব’লে ফেললুম, ‘আমি আপনাদের কাছে শীগ্গিরই প্রমাণ ক’রে দেব যে, যতদিন আমি বাঁচব, ততদিন আমি আর কোন খাবারই ছোঁব না।’

ধারণ করে। এ স্ব্যাকিরণ ‘ধ’রে উদ্ভিদমধ্যে তা’ সঞ্চয় ক’রে রাখে। এ ছাড়া প্রাণের অস্তিত্ব থাকে সম্ভবপর হ’ত না। আমাদের বাঁচবার জন্তে যে শক্তির দরকার, তা’ আমরা পাই সৌরশক্তি হ’তে—আর তা’ সঞ্চিত থাকে আমাদের উদ্ভিজ্জখাদ্যে অথবা উদ্ভিদভোজী প্রাণীদের মাংসের মধ্যে। কয়লা অথবা তেলের মধ্যে আমরা যে শক্তি পাই তা’ হচ্ছে সেই সৌরশক্তি, লক্ষলক্ষ বৎসর পূর্বে উদ্ভিদজীবনে ক্লোরোফিল (পত্রহরিৎ) যা’ ফাদ পেতে ধ’রে রেখেছিল। ক্লোরোফিল(পত্রহরিৎ)এর মাধ্যমেই আমরা স্ব্যাদেবের রূপায় বেঁচে আছি।”

“স্বীশুড়ী ঠাকুরণ তাচ্ছিল্যের হাসি হেসে বললেন, ‘বটে ? ওমা তা’ই নাকি গো ? বলি, ও বোমা, যখন তুমি একবার খাওয়ার উপর আবার না খেয়ে থাকতে পার না তখন একেবারে না খেয়ে থাকতে পারবে কি ক’রে গো, এঁা, বল কি বোমা ?”

“এ মন্তব্যে আর কোন জবাব চলে না ! কিন্তু তবুও মনে বল এনে দিলে এক লৌহকঠিন দৃঢ়প্রতিজ্ঞা । একটু নিরালা জায়গায় গিয়ে ঈশ্বরের কাছে অনবরত প্রার্থনা ক’রতে লাগলুম, ‘ভগবান, দয়া ক’রে আমায় এমন গুরু পাঠাও যিনি তোমারই আলোয় বেঁচে থাকতে আমায় শিখিয়ে দিতে পারবেন—খাওয়াতে নয় !’

“মনে এল একটা স্বর্গীয় আনন্দ ! কি একটা অপরূপ আনন্দের ঘোরে নবাবগঞ্জের গঙ্গার ঘাটের দিকে চললুম । রাস্তায় দেখা হ’ল আমার শ্বশুর-বাড়ীর পুরুতঠাকুরের সঙ্গে ।

“তা’র উপর ভরসা ক’রে জিজ্ঞাসা করলুম, ‘ঠাকুরমশাই, দয়া ক’রে বলুন না, না খেয়ে কি ক’রে বেঁচে থাকা যায় ?’

“ঠাকুরমশায় ত’ প্রশ্ন শুনে অবাক । মুখে তা’র কোন উত্তর যোগাল না, শুধু ফ্যালফ্যাল ক’রে চেয়েই রইলেন । অবশেষে যেন একটু আশ্বাস দেবার জন্তে বললেন, ‘বাছা, আজ সন্ধ্যার সময় মন্দিরে এসো, তোমার জন্তে একটা বিশেষ বৈদিক ক্রিয়া করব ।’

“এই অস্পষ্টগোছের উত্তরে আমি তৃপ্তিলাভ করতে পারলুম না, এ উত্তর ত’ আমি চাই নি ; আবার ঘাটের দিকে এগোতে লাগলুম । সকালবেলা সূর্যের আলো গঙ্গার জলে ছড়িয়ে পড়েছে । স্নান সেরে নিয়ে পবিত্র হলুম, যেন আমার তখন পুণ্য দীক্ষা হবে । ঘাট ছেড়ে ভিজেকাপড়ে যখন এগিয়ে আসছি, তখন সেই দিনের আলোর মাঝখানে আমার গুরুদেব আমার সামনে সেখানে সশরীরে আবির্ভূত হলেন !

“স্নেহকোমল স্বরে তিনি বললেন, ‘মা, আমিই তোমার গুরু, ভগবান আমায় এখানে পাঠিয়েছেন তোমার ব্যাকুল প্রার্থনা পূরণ করবার জন্তে । এরকম অদ্ভুত প্রার্থনার ভাবে তিনিও গভীরভাবে বিচলিত হয়ে উঠেছেন ! আজ হ’তে তুমি হৃদয়শক্তির বলে জীবন ধারণ করবে—তোমার শরীরের অণুপরমাণু সেই অনন্ত শক্তির সাহায্যেই পুষ্ট হ’বে ।’

গিরিবালা দেবী নীরব হ'লেন। রাইট সাহেবের কাছ থেকে আমি প্যাড্‌ আর পেন্সিল নিয়ে কতকগুলো জিনিষ তাঁর বুঝবার জন্তে ইংরেজিতে লিখে দিলুম।

আবার তিনি তখন বলতে শুরু করলেন, তাঁর শাস্ত্রস্বর এত মৃদু যে শ্রুতিগোচর হয় না, “যাট তখন নির্জন, কিন্তু আমার গুরুদেব তখন আমাদের চারধারে এমন একটা আলোর ছটা সৃষ্টি করলেন যে হঠাৎ কেউ স্নান করতে এসে না পরে আমাদের বিরক্ত করে। তিনি তখন আমায় এমন একটি ক্রিয়া-যোগে দীক্ষিত করলেন যা’তে ক’রে এই জড়দেহের উপযোগী কোন খাণ্ডের উপরই শরীরকে নির্ভর করতে হয় না। প্রণালীটির ভিতর প্রধানতঃ একটি মন্ত্রের* ব্যবহার আর শ্বাসপ্রশ্বাসের ব্যায়াম আছে, যা’ সাধারণতঃ কোন লোকের পক্ষে করা অত্যন্ত কঠিন। এতে কোন ওষুধবিষুধও নেই, আর কোন ভোজবাজিও নেই, ‘ক্রিয়া’ ছাড়া এতে আর কিছুই নেই।”

আমেরিকার সংবাদপত্রের রিপোর্টারদের কেরামতি, যা’ আমি নিজের অজ্ঞাতসারেই খানিকটা আয়ত্ত ক’রে ফেলেছিলুম, তা’ দিয়ে আমি গিরিবালা দেবীকে বহুবিষয়ে প্রশ্ন করলুম এই ভেবে যে, তা’তে জগতের বহুলোকের উপকার হবে। একটু একটু ক’রে তিনি এইসব খবর বললেন,.....

“ছেলেপুলে আমার কখনও হয় নি; বহুবছর আগে বিধবা হই। যুমোই খুব অল্পই, কারণ জাগা আর ঘুমোন ও দুটোই আমার কাছে সমান। দিনে ঘরসংসারের কাযকর্ম সব করি, রাত্রে একটু জপতপ, ধ্যানধারণায় বসি। ঋতুপরিবর্তন অবশ্য একটু বোধ করি। জীবনে কখনও অসুস্থ হইনি বা রোগভোগও কখনও করিনি। হঠাৎ কোথাও আঘাত লেগে গেলে সেখানে

* মন্ত্র শব্দ মন্ ধাতু হ’তে উৎপন্ন। মন্ ধাতুর অর্থ চিন্তা করা। ব্রহ্মে লীন হ’বার এও একটি পথ বলে বর্ণিত হয়েছে। “মননাৎ ত্র্যয়তে যস্মাৎ তস্মান্নম্রতঃ প্রকৌত্তিতঃ”—তন্ত্রসারঃ, ২৮। যা’র মনন দ্বারাই মুক্তি হয়, তা’রই নাম মন্ত্র।

শব্দই ব্রহ্ম। মন্ত্র শব্দব্রহ্মের প্রকাশক, মতাস্তরে শক্তির প্রকাশক। শব্দের সূচনায় প্রথমে অনাহত ধ্বনি, প্রণব বা “ওঁ”কার শব্দ ধ্বনিত হয়। এর আর একটি অর্থ হ’চ্ছে ব্রহ্ম সকল পদার্থেই বিদ্যমান। সৃষ্টির প্রথম শব্দ বা মন্ত্রই হ’চ্ছে এই প্রণব।

মন্ত্রশাস্ত্রে ব্রহ্মকে বিন্দু বলা হয়েছে। বীজ এর শক্তি। তত্ত্বে এই বীজকে শক্তি বা প্রকৃতি নাম দেওয়া হয়েছে। প্রকৃতির ভিতরে সগুণ ব্রহ্মের প্রকাশ, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর—সৃষ্টি, স্থিতি, লয়—এই তিন দেবতার মধ্য দিয়েই এঁরা একই ব্রহ্মের বিভিন্ন অবস্থা-শক্তি দ্বারা সৃষ্ট আর এঁদের সমষ্টিভূত কার্যাবলীকে শব্দব্রহ্মের নাদ বলে।

কেবলমাত্র ঈশ্বর বেদনা অনুভব করি। মলমূত্রত্যাগের কোন প্রয়োজন হয় না। হুংপিও আর শ্বাসপ্রশ্বাস সংযত করতে পারি। স্বপ্নে প্রায়ই আমার গুরুদেব আর অত্যাচ্ছ মহাপুরুষদেরও দর্শনলাভ হয়।”

জিজ্ঞাসা করলুম, “আচ্ছা না, আর কাউকে না খেয়ে বেঁচে থাকবার উপায়টা শিখিয়ে দেন না কেন?”

হায়, হায়, পৃথিবীর কোটিকোটি কুখ্যাত জনসাধারণের মুক্তির উচ্চ আশা আমার তখন অন্ধুরেই বিনষ্ট হয়ে গেল!

তিনি মাথা নেড়ে বললেন “না, তা’ হয় না; গুরুদেব এ রহস্য প্রকাশ করা বিশেষভাবেই নিবেদন করেছেন। তাঁ’র এ ইচ্ছা নয় যে ভগবানের সৃষ্টিনাটকে কোন বাধা উৎপন্ন হয়। বহু লোককে আমি যদি না খেয়ে বেঁচে থাকবার উপায় শিখিয়ে দি, তা’হলে চাবীরা তা’ আগে আমায় তেড়ে আসবে। এমন স্তরসাল ফলমূল সব মাটিতেই গড়াগড়ি যাবে। হুংপ, অনাহার আর ব্যাধি, এসব তা’ কর্মেরই ফল ব’লে বোধ হয়; এরাই শেষ অবধি আমাদের জীবনের সত্যিকারের অর্থ খোঁজবার জন্তে চালিয়ে নিয়ে যায়।”

আমি ধীরে ধীরে বললুম, “আচ্ছা না, আপনিই যে একলা না খেয়ে বেঁচে আছেন, এটার মানে কি?”

জ্ঞানালোকদীপ্ত আননে স্নিগ্ধ মধুরস্বরে তিনি বলতে লাগলেন, “মানুষ যে আত্মা তা’ প্রমাণ করবার জন্তে! আধ্যাত্মিক উন্নতির বলে মানুষ যে শুধু অগ্নে নয়—ঈশ্বরের জ্যোতিঃতে বেঁচে থাকতে ক্রমশঃ শিক্ষা করতে পারে, তা’ প্রদর্শন করবার জন্তে।”*

* গিরিবালার লব্ধ নিরাহার অবস্থা হচ্ছে একপ্রকার বৌগিকশক্তি; পাতঞ্জলির বৌগিকত্বে বিভূতিপাদে ৩১ নং শ্লোকে এ বিষয়ে উল্লেখ আছে। তিনি এমন একটি শ্বাসের প্রক্রিয়া অবলম্বন করেন যা মেরুদণ্ডস্থিত যক্ষ্মশক্তির কেন্দ্র পঞ্চমচক্র বিশুদ্ধাখ্যাকে তা’ প্রভাবিত করে। কণ্ঠের বিপরীত দিকে অবস্থিত এই বিশুদ্ধচক্র, পঞ্চমভূত—আকাশ অথবা ইথারকে প্রভাবিত করে। এই ইথার আবার জড়কোষসমূহের অণুপরমাণুদের মধ্যবর্তী শূন্যস্থান বোপে রয়েছে। এই চক্রে মনঃসংযোগ করলে সাধক ইথারের শক্তিবলে প্রাণধারণ করতে সমর্থ হ’ন।

থেরেসা নিউম্যান কিন্তু জড়খাচ্ছ গ্রহণ করে জীবনধারণ অথবা অনাহারে অবস্থান করবার জন্য কোন প্রকার বৌগিকপ্রক্রিয়া বা কিছুই সাধন করেন না। এর ব্যাখ্যা ব্যক্তিগত কর্মক্ষমতার ভ্রান্তিতার মধ্যে লুক্কায়িত। থেরেসা নিউম্যান অথবা গিরিবালা ছাড়াও অনুরালে বহু ঈশ্বরোপাসিত জীবন আছে, কিন্তু তা’দের বহিঃপ্রকাশের পথই স্তম্ভ। খৃষ্টীয় সাধুগণের মধ্যে বাঁ’রা অনাহারে জীবনধারণ ক’রতেন (তাঁ’রা খৃষ্টপ্ৰত্যক্ষধারীও ছিলেন) শীডামের সেন্ট লিডউইন, রেণ্টের পুণ্যাত্মা এলিজাবেথ, সিয়েনার সেন্ট ক্যাথারাইন, ডোমিনিকা ল্যাজারি, ফলিনো’র পুণ্যাত্মা এঞ্জেল প্রভৃতি...৪৫২ পৃঃ পাদটিকা দ্রষ্টব্য।

তা'রপর গিরিবালা দেবী গভীর ধ্যানের মধ্যে ডুবে গেলেন। 'দৃষ্টি অন্তর্মুখী। চোখের গভীর শান্ত্যাব, ক্রমশঃ ভাবলেশবিহীন হয়ে গেল। একটা দীর্ঘনিশ্বাস পড়ল—শ্বাসবিহীন আনন্দময় সমাধির পূর্বাভাস! কিছুকালের জন্য তিনি ভেসে চললেন সেই আনন্দশ্রোতে, বা' তাঁকে তাঁর অন্তরেই পরমানন্দের স্বর্গরাজ্যে পৌঁছে দেয়।

রাত্রির অন্ধকার গাঢ় হয়ে এল। অনেকগুলি গাঁয়ের লোক অন্ধকারে চুপচাপ ব'সে। একটা ছোট কেরোসিনের আলো তা'দের মুখের উপর ছড়িয়ে পড়েছে। রাত্রির কালো মথমলের চন্দ্রাতপতলে দূরের লণ্ঠনের আলো আর জোনাকিপোকাক দীপ্তি যেন চুম্বকি ফুটিয়ে তুলছে। বিদায়কাল ঘনিরে এল; মনটা বিচ্ছেদবেদনায় ভারী হয়ে উঠল, সামনে সূদীর্ঘপথ—একঘেয়ে, মহুর, কষ্টকর যাত্রা!

গিরিবালা দেবী চক্ষু উন্মীলন করতেই আমি বললুম, “মা, আপনার একটা কিছু স্মৃতিচিহ্ন আনায় দিন—আপনার শাড়ীর একটা ফালি!”

তিনি অবিলম্বে বনারসী কাপড়ের একটা টুকরো হাতে ক'রে নিয়ে এসে মাটিতে ভূমিষ্ঠ হয়ে আমায় প্রণাম করলেন।

আমি ভক্তিভরে তখন ব'লে উঠলুম, “মা, আমাকে আবার প্রণাম করা কেন...বরং আমায় আপনার গুণ্যচরণ স্পর্শ ক'রে প্রণাম করতে দিন!”*

* ১৩৪৩ সালের ৭ই জ্যৈষ্ঠ বৃহস্পতিবার তারিখে প্রকাশিত অধুনালুপ্ত সাপ্তাহিক “অগ্রগতি”র প্রথম বর্ষের চতুর্বিংশতি সংখ্যার ৭৬৯ পৃষ্ঠায় নিম্নলিখিত সংবাদটি প্রকাশিত হয় :—

“অনাহারী রমণী—বাঁকুড়া থেকে ছ' একদিন পূর্বে সংবাদ এসেছে যে, সোনামুখীনিবাসী লক্ষ্যদেব দেবমহাশয়ের ভগ্নী শ্রীমতী গিরিবালা দেবী গত ছাপ্পান বৎসর অনশনব্রত গ্রহণ কোরে বেঁচে আছেন। গিরিবালা দেবী বিবাহের পর দ্বাদশ বৎসর বয়সে তাঁর গুরুর নিকট থেকে দীক্ষা গ্রহণ করেন ... সেই থেকে তিনি অনাহারেই দিন কাটাচ্ছেন। কিছু না খাওয়ার জন্য তাঁর শরীরের সামর্থ্য একটুও কমেনি বরং সংসারের অন্তান্ত লোকের মতো তিনি পুরোদস্তুর পরিশ্রম করেন। আমেরিকা যাত্রাগত একজন হিন্দু যোগী তাঁর সাথে দেখা কোরে তাঁকে আমেরিকায় যাওয়ার জন্য অনুরোধ করেন, কিন্তু তিনি তাঁর জন্মভূমি ছেড়ে যেতে স্বীকৃত হ'ন নি।”

৪৭শ পরিচ্ছেদ

আমেরিকায় প্রত্যাবর্তন

লণ্ডনে যোগসঙ্ঘকে ক্লাস হচ্ছিল, সেখানে বন্‌লুম,—“ভারতে আর আমেরিকায় আমি যোগসঙ্ঘকে বহু উপদেশ দিয়েছি কিন্তু একজন ভারতীয় হিন্দু হিসেবে আমি স্বীকার করতে বাধ্য যে ইংরেজ ছাত্রদের ক্লাস ক’রতে পেয়ে আমি ভারি খুসী।”

শুনে সেখানকার সদস্যরা বিশেষ আপ্যায়িত হয়ে হাসলেন ; রাজনৈতিক কোন গণ্ডগোল আমাদের যোগালোচনায় কোন রকম শান্তির ব্যাঘাত ঘটাতে পারে নি।

ভারতবর্ষ এখন স্থিতিতে পর্যাবসিত। ১৯৩৬ সালের সেপ্টেম্বর মাস—আবার ইংলণ্ডে ফিরে এসেছি ; বোলমাস পূর্বে প্রতিজ্ঞা ক’রে গিয়েছিলুম যে আবার লণ্ডনে এসে বক্তৃতা দেব।

অনাদিকালের যোগের কথা শুনতে ইংলণ্ডে সমুৎসুক। গ্রাভনার হাউসে আমার কোয়ার্টারে রিপোর্টার, সংবাদচিত্রের ক্যামেরাম্যান প্রভৃতির ভিড় লেগে গেল। ওয়ার্ল্ড ফেলোশিপ অফ ফেথের ব্রিটিশ ক্লাব ক্লাউপিল ২৯শে সেপ্টেম্বর একটা সভার আয়োজন করলেন হোয়াইটফিল্ডের কংগ্রেগেশনাল চার্চে—সেখানে বক্তৃতা দিতে হ’ল। বিষয়টি গুরুতর, “সংসঙ্গে বিশ্বাস—সত্যতারক্ষার উপায়”। ক্যান্সটন হলে রাত আটটার বক্তৃতায় এত লোকসমাগম হয়েছিল যে দু’রাত ধ’রে অতিরিক্ত জনতাকে উইগ্‌স হাউস প্রেক্ষাগারে রাত সাড়ে ন’টার আমার দ্বিতীয় বক্তৃতার জগ্‌থে অপেক্ষা করতে হয়েছিল। তা’র পরের সপ্তাহগুলিতে যোগের ক্লাস এমন বেড়ে গেল যে রাইট সাহেবকে আর একটা হলের বন্দোবস্ত করতে হ’ল।

আধ্যাত্মিক সঙ্ঘদের ভিতর ইংরেজী রক্ষণশীলতার একটা প্রকৃষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। আমার প্রস্থানের পর লণ্ডনে যোগের ক্লাসের ছাত্ররা

নিজেদের মধ্যে একটা সংসদ-কেন্দ্র গঠন ক'রে অমন সব দারুণ যুদ্ধের সারা বছরগুলির মধ্যেও নিয়মিত সাপ্তাহিক অধিবেশন সম্পন্ন ক'রত।

ইংলণ্ডে অবস্থানকালীন সাপ্তাহগুলি অবিস্মরণীয়; লণ্ডনে সহর পরিদর্শন, তা'রপর সুন্দর গ্রামাঞ্চলে পরিভ্রমণ। সেখানকার বড় বড় কবি আর ব্রিটিশ ইতিহাসে প্রসিদ্ধ দেশপূজ্য ও বরেন্য ব্যক্তিদের জন্মস্থান আর সমাধি প্রভৃতি রাইটসাহেব বিশ্বস্ত ফোর্ডগাড়ীতে ক'রে আমাদের নিয়ে বেড়িয়ে সব দেখালে।

অক্টোবরের শেষের দিকে আমাদের ক্ষুদ্রদলটি সাদাম্পটন থেকে 'ত্রিমন' জাহাজে আমেরিকায় যাত্রা করলে। নিউ ইয়র্ক বন্দরে স্বাধীনতার বিরাট প্রতিমূর্ত্তি দেখে আনন্দের ভাবাবেগে শুধু যে মিস্ ব্রেচ্ আর রাইট সাহেবের হৃদয় উদ্বেল হয়ে উঠেছিল, তা' নয়—আমারও!

ফোর্ডগাড়ীটা যদিও প্রাচ্যদেশে নানা দুর্গমপথ পরিভ্রমণ ক'রে কিঞ্চিৎ বিবর্ণ ও ভগ্নপ্রায় হয়ে পড়েছিল, কিন্তু তখনও সেটা বেশ মজবুত! যাই হোক আমেরিকার মাটিতে নেমে সে নিউইয়র্ক থেকে ক্যালিফোর্নিয়া পর্যন্ত এক মহাদেশাতিক্রম্য পাড়ি জমালে। ১৯৩৬ সালের শেষে—মাউন্ট ওয়াশিংটন!

বড়দিনের উৎসব লস্ এঞ্জেলিস্ কেন্দ্রে পালিত হয়—প্রতিবৎসরই ২৪শে ডিসেম্বর তারিখে। আট ঘণ্টা সংসদের অধিবেশনের (আধ্যাত্মিক খৃষ্টমাস) উৎসব, তা'রপরদিন খাওয়াদাওয়ার (সামাজিক খৃষ্টমাস) উৎসব। এ বছরের উৎসব দেখছি খুব জোর হবে, কারণ দূরসহর থেকে বহু ছাত্র, শিষ্য, প্রিয়বন্ধুরা সব এসেছেন এই ভূপর্ঘটকত্রয়কে গৃহপ্রত্যাবর্তনে স্বাগত সন্তোষ জানাতে।

খৃষ্টমাসদিবস পালন উপলক্ষ্যে আনন্দভোজে যে সব উপাদেয় আহার্যের উপকরণাদি সংগ্রহ করা হয়েছিল, তা' সব এসেছে পনরহাজার মাইল দূর থেকে; কান্সার থেকে “গুচ্ছি” ব্যাণ্ডের ছাতা, টিনের কৌটোয় রসগোল্লা, আমসত্ত্ব, পাপড়, কেওড়ানির্ঘ্যাস—আইসক্রীম্ জুগন্ধি করবার জন্তে। সন্ধ্যাবেলায় আমরা একটা প্রকাণ্ড “খৃষ্টমাস বৃক্ষে”র চতুর্দিকে ঘিরে বসলুম—নিকটস্থ অগ্নিকুণ্ডে জুগন্ধি সাইপ্রেস গাছের কাঠ জলছে।

এইবার সব উপহার বিতরণের পালা। পৃথিবীর চতুর্দিক থেকে কত দূরদূরান্তর দেশ হ'তে নানাবিধ উপহারের জিনিষ সব আনা হয়েছে,—

প্যালেষ্টাইন, মিশর, ভারতবর্ষ, ইংলণ্ড, ফ্রান্স, ইটালি। বিদেশে কোন জংশনে পৌঁছেই রাইট সাহেব যে কত যত্নে আর কত হুঁসিয়ারির সঙ্গে লাগেজগুলো সব গুণে তুলতো—পাছে আমাদের এই আমেরিকায় প্রিয়জনেরদের জন্তে আনা মূল্যবান উপহারগুলো সব পথের মাঝেই চুরি যায়। পুণ্যভূমির (প্যালেষ্টাইনের) পবিত্র জলপাইগাছের প্রাচীরচিত্র, ইল্যাণ্ড আর বেলজিয়মের স্থল কারুকার্যকরা সব লেস্ আর এম্ব্রিডারী, পারস্যদেশের কার্পেট, কাশ্মীরী শাল, মহীশূরের স্নগন্ধি চন্দনকাঠের ট্রে, মধ্যপ্রদেশের পাথর, বহুকাললুপ্ত রাজত্বকালের সব প্রাচীন ভারতীয় মুদ্রা, রত্নখচিত ফুলদানি ও কাপ। মিনিয়োর আর কাপড়েরতোলা ছবি, ধূপ, অগুরু, চন্দন চূয়া প্রভৃতি পূজার স্নগন্ধি, স্বদেশী ছাপাকাপড়, কাঠের উপর গালার কাষ, মহীশূরের গজদন্তের কারুকার্য, লম্বা শুঁড়ওয়ালা পারস্যদেশের চটিজুতা—সচিত্র প্রাচীন হস্তলিপি, মখমল, কিংখাব, গান্ধীটুপি, মাটির জিনিষ, টালি, পিতলের বাসনপত্র, প্রার্থনা করবার র্যাগ্ (আসন)—তিনটে মহাদেশ লুট করে সব আনা হয়েছে।

গাছের তলায় বিরাট স্তূপ থেকে সুন্দর সুন্দর রঙীন কাগজে মোড়া সব পুলিশ একে একে বের করে নিয়ে সবাইকে বিতরণ করলুম।

“মিষ্টার জ্ঞানমাতা” ... একটা লম্বা বাঁকো ছিল সোনার জরি দেওয়া সোনালী রঙের বনারসী সাড়ী, এঁর জন্তেই এনেছিলুম। এই মার্শিয়ন মহিলা সাধনপথে বেশ অগ্রসর হয়েছেন; মধুর, শাস্তমূর্তি। আমার অল্পপস্থিতির সময় মাউন্ট ওয়াশিংটনের সব ভার গ্রহণ করেছিলেন। উপহারটি পেয়ে খুব খুসী—বললেন, “ধন্যবাদ মহাশয়, সাড়ী পেয়ে মনে হ’ল আমি ভারতবর্ষের সব দৃশ্য চেষ্টের সামনে দেখছি!”

“মিষ্টার ডিকিন্সন্।” এর উপহারটি কিনেছিলুম কলকাতার বাজার থেকে। সে সময় ভেবেছিলুম যে মিষ্টার ডিকিন্সন্ এটা পেয়ে খুব খুসীই হবে। ডিকিন্সন্ আমার একটি প্রিয়শিষ্য, ১৯২৪ সালে মাউন্ট ওয়াশিংটনের প্রতিষ্ঠা থেকে প্রতি বৎসরই খৃষ্টমাস উৎসবের সময় উপস্থিত থাকে। আজ এই একাদশ বার্ষিক উৎসবের দিনে সে আমার সামনে দাঁড়িয়ে, তাঁর ছোট চৌকোনো উপহারের বাঁকটির ফিতে খুলেই অবাক বিশ্বয়ে ব’লে উঠল... “রূপোর কাপ্!”

মনে তখন তা'র কি ভাবের ঝড় উঠেছিল তা' জানি না, তবে বোধ হ'ল যে বেচারী তা'র সঙ্গে প্রাণপণে যুদ্ধ করছে—উপহারটির দিকে ফ্যান্ ফ্যান্ ক'রে তাকিয়ে রইল; উপহারটা বেশী কিছুই নয় একটা লম্বা পানপাত্র “রূপোর কাপ্”। খানিকক্ষণ পরে একটু দূরে গিয়ে সে বসে রইল—যেন হতভম্ব হয়ে গেছে। পুনরায় সার্ভাট ক্রসের পাট অভিনয় করবার পূর্বে আমি সম্মেহে তা'র দিকে চেয়ে একটু হাসলুম।

আনন্দকলরবে মুখরিত সান্ধ্যউৎসবের পরিসমাপ্তি ঘটল—সকল দানের যিনি দাতা, তাঁ'র প্রতি প্রার্থনা নিবেদন ক'রে। তা'রপরে হ'ল দলবদ্ধ হয়ে খৃষ্টমাস ক্যারলের গান।

কিছুদিন বাদে আমাদের দুজনের কথাবার্তা হচ্ছিল। ডিকিন্সন্ বল্লে, “ম'শায়, রূপোর কাপের জন্তে এখন আমার আন্তরিক ধন্যবাদ গ্রহণ করুন। খৃষ্টমাস রাতে আমি তখন আপনাকে ধন্যবাদ দেবার ভাষাই খুঁজে পাই নি। আমার অন্তর তখন এক অপরূপ ভাবে পরিপূর্ণ ছিল।”

“আমি তোমার জন্তেই বিশেষ ক'রে এ উপহারটি বেছে এনেছি। পছন্দ হয়েছে ত'?”

সঙ্কুচিতভাবে আমার প্রতি দৃষ্টিপাত ক'রে ডিকিন্সন্ বল্তে লাগল, “আজ তেতাল্লিশ বছর ধ'রে আমি এই রূপোর কাপটির প্রত্যাশা ক'রে আসছি। সে অনেক কথা, আজ পর্যন্ত আমি সে সব কথা কাউকে বলি নি। আরম্ভটা হয়েছিল নাটকীয় ধরণে। আমি জলে ডুবে যাচ্ছিলুম। আমরা তখন নেত্রাস্কার একটা ছোট সহরে। জলের ধারে খেলা করতে করতে আমার বড় ভাই আমায় জলে ঠেলে ফেলে দিলে। আমি তখন মাত্র পাঁচ বছরের। দ্বিতীয়বার ভেসে উঠে আবার যখন ডুবতে যাচ্ছি তখন হঠাৎ একটা রামধনুরঙের উজ্জল আলো জলে উঠে আমার চোখ যেন বাল্‌সে দিলে। আলোর চারিদিক ছেয়ে গেল, তা'র মাঝখানে দেখা গেল একটি লোকের মূর্তি—প্রশান্ত দৃষ্টি, মুখে অভয় হাসি। তৃতীয়বারের বার যখন আমার শরীর আবার ডুবে যাবার উপক্রম হ'ল, আমার ভাইয়ের এক সঙ্গী একটা লম্বা উইলোগাছের ডাল ছুইয়ে জলের ধারে এমন ভাবে ধরলে যে আমি সেটার নাগাল পেয়ে প্রাণপণশক্তিতে সেটা ধ'রে ফেলে কোন ক্রমে ভেসে রইলুম—তা'রপর পাড়ের উপর ছেলেগুলো আমায় তাড়াতাড়ি ধ'রে জল

থেকে টেনে তুলে ফেললে, তারপর প্রাথমিক সাহায্য দিয়ে তা'রা আমার আরাম করে।

“বার বছর বাদে—বয়স তখন আমার সতের, মায়ের সঙ্গে শিকাগো নগরে একবার বেড়াতে গিয়েছিলুম। সেটা তখন ১৮৯৩ সাল। মা আর আমি একটা বড় রাস্তা দিয়ে চলেছি, আবার তখন সেখানে দেখলুম সেই উজ্জ্বল জ্যোতির স্মরণ! কয়েক পা এগিয়ে যেতেই দেখা গেল যে সেই একই ব্যক্তি ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছেন—যাঁকে আমি বছরছর আগে স্বপ্নে দর্শন করেছিলুম। একটা প্রকাণ্ড প্রেক্ষাগারের কাছে এসে তিনি দরজার মধ্য দিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

“টেনিয়ে ব'লে উঠলুম, ‘মা, মা, ঐ সেই লোকটি, যিনি আমার ডুবে যাবার সময় আবির্ভূত হয়েছিলেন।’

“মা আর আমি তাড়াতাড়ি চললুম সেই বাড়ীর দিকে; লোকটি বক্তৃতা দেবার মঞ্চের উপর বসেছিলেন। তখনিই জানা গেল যে তিনি আর কেউ ন'ন, স্বামী বিবেকানন্দ, ভারতবর্ষ থেকে এসেছেন। তাঁ'র একটি হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা শেষ হ'বার পর আমি তাঁ'র সঙ্গে সাক্ষাতের জন্তে এগোলুম। আমাকে দেখে তিনি মধুরভাবে হাসলেন, যেন আমরা দু'জন পুরান বন্ধু—কতকালের পরিচয়। আমি তখন এত ছোট যে মনের ভাব কি ক'রে প্রকাশ করতে হয় তা' জানিনি, কিন্তু অন্তরের অন্তঃস্থলে আমি এ আশা পোষণ করছিলুম যে তিনি আমার গুরু হ'তে সক্ষম হবেন। তিনি আমার মনের কথা সব বুঝতে পারলেন।

“স্বামী বিবেকানন্দজী তখন আমার দুই চক্ষুর উপর তাঁ'র দু'টি সুন্দর চক্ষুর গভীরদৃষ্টি স্থাপিত ক'রে আমায় বললেন, ‘না, বাছা, আমি তোমার গুরু নই। তোমার গুরু পরে আসবেন, তিনি তোমার একটি রূপের কাপ দেবেন।’ তা'রপর একটু থেমে তিনি হেসে বললেন, ‘তুমি এখন যা' বহন করতে সমর্থ, তা'র চেয়েও বেশী আশীর্বাদ তিনি তোমার উপর বর্ষণ করবেন।’”

মিষ্টার ডিকিনসন্ ব'লতে লাগল, “দু'চারদিনের মধ্যেই আমি শিকাগো ছেড়ে চলে এসুম—কিন্তু সেই মহাপুরুষ বিবেকানন্দজীর আর দর্শন পেলুম না। কিন্তু তাঁ'র উচ্চারিত প্রত্যেক কথাটি আমার অন্তরের

অন্তঃস্থলে যেন খোদিত হয়ে রয়েছে। বছরের পর বছর কাটতে লাগল, কিন্তু আমার আর কোন গুরু এলেন না। ১৯২৫ সালে একদিন রাত্রে আমি গভীরভাবে প্রার্থনা করলুম—‘প্রভু, আমার কাছে আমার গুরু পাঠিয়ে দাও’। ষণ্টাকতক বাদে আমি ঘুম থেকে জেগে উঠলুম অতি স্নমধুর সঙ্গীতের ধ্বনি শুনে। দেখলুম স্বর্গের কতকগুলি দেবদূত বাঁশী আর অগ্ন্যস্ত্র বাণ্যস্ত্র সব নিয়ে আমার সম্মুখে আবিভূর্ত হয়েছেন। দিব্যসঙ্গীতে বায়ুমণ্ডল পরিপূর্ণ করে দেবদূতেরা ধীরে ধীরে অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

“তা’র পরেরদিন সন্ধ্যাবেলায় লস্ এঞ্জেলিসে আমি সর্বপ্রথম আপনার বক্তৃতায় যোগদান করলুম এবং তখনই টের পেলুম যে আমার অন্তরের প্রার্থনা মঞ্জুর হয়েছে।”

নীরবে আমরা উভয়ে হাস্তা বিনিময় করলুম।

মিষ্টার ডিকিন্সন্ বলতে লাগল, “আজ এগারবছর ধরে আমি আপনার ক্রিয়াযোগের শিষ্য। কখনও কখনও আমি রূপোর কাপের কথা ভেবে আশ্চর্য্য হ’তুম; তখন আমার প্রায় এই বিশ্বাসই দাঁড়িয়ে গিয়েছিল যে বিবেকানন্দজীর কথাগুলি রূপকমাত্র। কিন্তু সেই রাত্রে আপনি যখন খৃষ্টমাসের গাছের কাছে সেই চৌকো বাক্সটি আমার হাতে দিলেন, তখন জীবনে তৃতীয়বার আমি সেই উজ্জ্বল জ্যোতিঃর স্ফুরণ দেখতে পেলুম। তা’রপরেই আমার হাতে এল আমার গুরুর উপহার, যা’ বিবেকানন্দজী তেতাল্লিশ বছর আগে আমার জন্তে দেখতে পেয়েছিলেন—একটি রূপোর কাপ।”

৪৮শ পরিচ্ছেদ

ক্যালিফোর্নিয়ায় এন্সিনিটাসে

“আপনাকে অবাক ক’রে দেবার ব্যবস্থা হয়েছে ম’শায়! বিদেশে যখন আপনি বেড়াতে বেরিয়েছিলেন তখন আমরা এন্সিনিটাসে এই আশ্রমটি তৈরী ক’রে ফেলেছি—আপনার গৃহে প্রত্যাগমনের এটি একটি ভক্তি উপহার!” ব’লে সিষ্টার জ্ঞানমাতা একটি গেটের ভিতর দিয়ে আমাকে নিয়ে ছায়াঢাকা পথ দিয়ে অগ্রসর হ’লেন।

দেখলুম বাড়ীটি নীল সমুদ্রের দিকে মুখ বাড়িয়ে—যেন প্রকাণ্ড একটা যাত্রীবাহী জাহাজ। প্রথমে খানিকক্ষণ অবাক হয়ে তা’রপর ওহ্, আহা ইত্যাদি বিস্ময়হৃৎক শব্দ উচ্চারণে তা’রপরে আনন্দ আর রুতজ্ঞতায় বাক্য হারিয়ে আশ্রমটি ঘুরে বেড়িয়ে দেখতে লাগলুম। বাড়ীটির মধ্যে ঘোলটি খুব বড় বড় ঘর, প্রত্যেকটাই সুন্দর করে সাজান।

বাড়ীটির মাঝখানের হলঘরটির জানালাগুলি সব প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড, প্রায় কড়িকাঠ স্পর্শ করে—তা’র ভিতর দিয়ে দেখা যায়, তৃণাচ্ছাদিত ভূমি, সমুদ্র আর নীল আকাশ, প্রকৃতিরাগীর বসনাঞ্চলে যেন পান্না, উপলমণি আর নীলা বসান! হলের মাঝখানে প্রকাণ্ড অগ্নিকুণ্ডের ম্যাণ্টেলের উপর লাহিড়ী মহাশয়ের ফ্রেমে বাঁধান ছবি। এই প্রশান্ত মহাসাগরের তীরে রচিত নূতন স্বর্গের উপর, তিনি তাঁ’র হাসির আশীর্বাদ বর্ষণ ক’রে পূত করছেন।

হলের ঠিক নীচেই, সমুদ্রতীরের ঢালু জমিটার উপরেই দুটি নির্জন গুহা তৈরী হয়েছে, ধ্যানধারণার জন্তে—সামনে দিগন্তবিস্তৃত অথও মহাসমুদ্র, মাথার উপরে অসীম নীলাকাশ। চারধারে বারান্দা, সূর্যালোকিত নিভৃত কোণ, বিঘার পর বিঘা ফলের বাগান, ইউক্যালিপ্টাস কুঞ্জ, গোলাপ আর পদ্মফুলের মধ্য দিয়ে পাথরবাঁধান রাস্তা নিভৃত কুঞ্জ অবধি গিয়েছে, লম্বা সিঁড়ি নির্জন সমুদ্রতটপ্রান্তে নেবে বিশাল

জলরাশির ধারে গিয়ে শেব হয়েছে—আর কি চাই! স্বপ্ন কি কখনও এত সত্য হ'তে পারে?

আশ্রমের একটি দ্বারসংলগ্ন “জেন্দাবেস্তা” থেকে “আবাসের জন্ত প্রার্থনা” উদ্ধৃত করা রয়েছে, “শুদ্ধচেতা, বীর্যবান্ আর রূপালু পুণ্যাত্মগণ এখানে আসুন, তাঁদের সম্মুখীন হয়ে আর শুভ আশীর্বাদ বিতরণে তাঁরা আমাদের মঙ্গল সাধন করুন—যা হ'বে পৃথিবীর মত বিস্তৃত, নদীর মত সুদূরপ্রসারী, সূর্যের ত্রায় উজ্জ্বল, যা'তে ক'রে লোকে আরও উন্নত হয়, যা'তে ক'রে প্রাচুর্য আর গৌরব আরও বৃদ্ধি পায়।”

“এই বাটিতে অল্পগত্য যেন অবাধ্যতাকে জয় করতে পারে, শাস্তি যেন বিশৃঙ্খলাকে, অকুণ্ঠদান আর বদাশ্রয়তা যেন ধনলোভকে, সত্যকথন যেন চাতুরীকে পরাজয় করতে পারে, শ্রদ্ধা যেন স্বর্ণকে বিদূরিত করতে পারে। আমাদের মনে আনন্দ সঞ্চারিত হোক, আমাদের আত্মা উন্নত হোক, আমাদের দেহ মহিমাময় হোক; হে স্বর্গের আলোক, আমরা যেন তোমার দর্শন লাভ করতে পারি, তোমার দিকে অগ্রসর হয়ে তোমার নিকটে পৌঁছতে পারি, পরিশেষে তোমার পরিপূর্ণ সম্ভ্রমলাভ ক'রে ধৃত হ'তে পারি!”

এই সংসঙ্গ আশ্রমটি রচনা করা সম্ভব হয়েছিল কয়েকটি আমেরিকান শিষ্যের বদাশ্রয়তায়, তা'রা বড় বড় ব্যবসাদার, অগণিত দায়িত্ব তা'দের, তবুও তা'রা প্রত্যহ ক্রিয়াযোগসাধনের সময় ক'রে নেয়। ভারতবর্ষে আর ইউরোপে থাকবার সময় এই আশ্রমতৈরীর কথার বিন্দুবিসর্গও আমার কাণে পৌঁছতে দেওয়া হয় নি। তাই বিশ্বয় আর আনন্দ আমার জন্তে অপেক্ষা করেছিল!

আমেরিকায় থাকার গোড়ার দিকে আমি ক্যালিফোর্নিয়ার উপকূলে খোঁজ ক'রে বেড়িয়েছিলুম একটি ছোট্ট জায়গা,—সমুদ্রতীরে আশ্রমস্থাপনার জন্তে। যখনই একটা উপযুক্ত স্থান খুঁজে পাই তখনই একটা না একটা বাধা উপস্থিত হয়ে কাষে ব্যাঘাত জন্মায়। আজ এন্সিনিটাসের* জমিতে ভক্তিবিনত চিত্তে দাঁড়িয়ে দেখলুম যে শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজীর বহুদিন পূর্ব্বেকার ভবিষ্যদ্বাণী, “সমুদ্রতীরে আশ্রম” তা' আজ বিনা আয়াসেই পূর্ণ হয়েছে।

* ১০১ নং কোষ্ট হাইওয়ের উপর একটি ক্ষুদ্র সহর, লস এঞ্জেলিসের ১৫০ মাইল দক্ষিণে আর পানডিয়েগোর ২৫ মাইল উত্তরে।

মাস কতক পরে, ১৯৩৭ সালে ইষ্টারে, আমি এন্সিনিটাসের ভূগাছাদিত মঙ্গলভূমিতে প্রথম উষাপ্রার্থনা শুরু করলুম। কয়েকশত ছাত্র সে প্রার্থনাসভায় যোগদান করেছিল। তখনকার দৃশ্য অতি মনোরম। পূর্বগগনে নব অরুণোদয়—পুরাকালের ম্যাজিদের ছাত্র সকলে ভক্তিপ্লুত হৃদয়ে তা'র দিকে তাকিয়ে, পশ্চিমে অনন্ত প্রশান্ত মহাসাগর তা'র উদ্গিত্তো গভীর বন্দনা শুরু করেছে। দূরে ছোট্ট একটি সাদা পালতোলা নৌকা; একটি সীগান্ পক্ষী একাকীই নীল আকাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে। “বীণুখুষ্ট, আজ তুমি জাগ্রত!” কেবলমাত্র গ্রীষ্মের সূর্যের সঙ্গে নয়—আত্মার জাগরণের অনন্ত উষার মধ্যে!

মাস কতক সুখেই কাটল। পরিপূর্ণ সৌন্দর্যের নিরবচ্ছিন্ন শান্তির মধ্যে আশ্রমে বসে আমি। বহুদিনের মনের মধ্যে পোষিত একটা কাষ শেষ করে ফেললুম—সেটা “অনন্তের সঙ্গীত”। প্রায় চল্লিশটি গান, কতকগুলি মৌলিক আর কতকগুলি পুরাতনসুরের রচা ইংরেজি কথা আর বিলাতী সঙ্গীতের স্বরলিপিতে লেখা হ'ল। এর মধ্যে ছিল, “নমৃত্যন শঙ্কা”, শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজীর দু'টি অতি প্রিয় সঙ্গীত, “গেল, গেল, গেল কাল,” “বাসনা আমার পরম শত্রু,” সংস্কৃত—“ব্রহ্মানন্দং পরমসুখদং,” রবিঠাকুরের—“মম মন্দিরে কে আসিল রে” আর বাকী সব আমার রচনা, “আমি সদা তোমারই,” “স্বপন পারের দেশে,” “নীরব গগন হ'তে নেমে এস,” “শোন মোর অন্তরের ডাক,” “শান্তি মন্দিরে,” “তুমিই আমার জীবন।”

এই সঙ্গীতপুস্তকের মুখবন্ধ হিসেবে প্রাচ্যের ভক্তিভাবের সুর প্রতীচ্য কেমন আগ্রহের সঙ্গে গ্রহণ করেছিল, তা'র আমার প্রথম অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেছিলুম। উপলক্ষ্যটা ছিল একটা জনসাধারণের সামনে বক্তৃতা, কাল ১৯২৬ সালের ১৮ই এপ্রিল, স্থান নিউইয়র্কের কার্ণেগী হল। আমার একটি আমেরিকান ছাত্রকে বললুম, “মিষ্টার হান্সিকার, আমি মনে করছি, শ্রোতৃবৃন্দকে একটি প্রাচীন হিন্দু ভজনগান গাইতে বলব, ‘এ হরি সুন্দর, এ হরি সুন্দর!’”

মিষ্টার হান্সিকার প্রতিবাদ করে বললে, “ম'শায়, আমেরিকানরা সব ভারতীয় গানটান ভাল করে বোঝেটোঝে না, আর এসব শুরু করলে যদি

লোকগুলো পচা টম্যাটো ছুঁড়ে মারতে শুরু করে দেয় তা'হ'লে কি কেলেকারিটাই না হবে বলুন দেখি।”

আমি হেসে উড়িয়ে দিয়ে বললাম, “সঙ্গীত হচ্ছে সার্বজনীন ভাষা—আমেরিকানরাও এ রকম মনপ্রাণমাতান গানের উচ্চভাব গ্রহণ করতে কখনও অসমর্থ হ'বে না।” গানটি এখানে উদ্ধৃত ক'রে দেওয়া হ'ল।*

গিষ্ঠার হান্সিকারের সন্দেহ অমূলক ব'লে প্রতিপন্ন হ'ল। শুধু যে সেই অপ্রার্থিত বস্তুটি—পচা টম্যাটোর আবির্ভাব ঘটল না, তাই নয়, উপস্থিত শ্রোতৃবৃন্দের তিনসহস্রকণ্ঠের সমবেতসঙ্গীতে একঘণ্টা ধ'রে অবিরতভাবে সেই ভজন গান চলল। সে এক অপূর্ব উদ্গাদনা, অভিনব দৃশ্য! নিউ ইয়র্ক বাসিগণ! তোমাদের সকলের অন্তর ভগবানের মহিমাকীর্তনের আনন্দের প্রবল উচ্ছ্বাসে আজ কোথায় উধাও হয়ে নিরুদ্দেশ যাত্রায় বেরিয়ে পড়েছে! সেই সন্ধ্যায় গানের মাঝখানে ভক্তিপ্লুত হৃদয়ে ভগবানের পুণ্যনামগানে ভক্তদের মধ্যে দৈবশক্তিবলে কতক রোগনিরাময়ও সাধিত হয়েছিল।

পূর্ণ কর্মোত্তমে বছরগুলি স্মৃখেই কাটল। এন্সিনিটাসে সেল্ফ-রিয়ালাইজেশন ফেলোশিপ্ (এস্ আর এফ্) ওয়ার্ল্ড ব্রাদারহুড্ কলোনি ১৯২৭ সালে স্বপ্নে আবির্ভূত আর ১৯৪৭ সালে পূর্ণ প্রতিষ্ঠিত হয়ে কয়েকটি ছোট ছোট এস্ আর এফ্ কলোনির আদর্শস্বরূপ হয়ে রয়েছে। এন্সিনিটাসে নব্বুই বিঘা জমির উপর বাড়ীগুলির মধ্যে হচ্ছে কতকগুলি আশ্রম, একটি উপহারদ্রব্যের দোকান, একটি ক্যাফে আর—এস্ আর এফ্ এবং সাধারণের জন্য একটি হোটেল। এই সব সুন্দর বিস্তৃতভূমি সকলের

* এ হরি সুন্দর, এ হরি সুন্দর,
তেরে চরণ পর শির নমসি হরি।
বনা বনামে গ্রামল গ্রামল,
গিরি গিরি মে উন্নত উন্নত।
সলিল সলিল চঞ্চল চঞ্চল,
সাগর সাগর গন্তীর হে হরি!
প্রেমিক জনাকে প্রেম প্রেম কর,
দুখী জনাকে বেদন বেদন
সুখী জনাকে আনন্দ হে হরি।

মধ্যে একটি পদ্মপুকুর আর একটি সাঁতার দেবার বড় পুঙ্করিণীও আছে। রাজপথের সম্মুখস্থ শ্বেত স্তম্ভশ্রেণী স্বর্ণকমলে স্নুশোভিত।*

কলোনির কার্যাবলীর মধ্যে এস্ আর এফ্-এর আদর্শে শিব্যদের বহুমুখী শিক্ষার ব্যবস্থা এবং এন্সিনিটাস্ ও লস্ এঞ্জেলিস্ কেন্দ্রের এস্ আর এফ্ আবাসিকদের তাজা শাকসবজী সরবরাহের জন্ত একটি বিরাট কৃষিকার্যের পরিকল্পনার বিরুদ্ধিসাধনও অন্তর্গত।

“তিনি সকল মানবজাতিকে এক রক্তেতেই সৃষ্টি করেছেন।”† এই বুদ্ধবিসম্বাদে শতাব্দীদীর্ঘ ছিন্নভিন্ন পৃথিবীতে, আধ্যাত্মিক ভিত্তির উপর অগণিত বিশ্বভ্রাতৃসঙ্ঘের উপনিবেশ প্রতিষ্ঠা হওয়া অবিলম্বেই প্রয়োজন। “বিশ্ব ভ্রাতৃসঙ্ঘ” একটা খুব বড় কথা, কিন্তু মানুষ নিজেকে বিশ্ববাসী ব’লে মনে ক’রে অবশ্যই তা’র সহানুভূতি বর্দ্ধিত করা উচিত। যে সত্য সত্যই বুঝতে পারে যে, এ “আমারই আমেরিকা, আমারই ভারতবর্ষ, আমারই ফিলিপাইন্স, আমারই ইউরোপ, আমারই আফ্রিকা” ইত্যাদি, তা’হ’লে তা’র সার্থক আর স্মৃথময় জীবনযাপনের স্ফোরকের কখনও অভাব হ’বে না।

যদিও শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজীর দেহ ভারতবর্ষ ছাড়া আর অত্র কোন মাটির উপর বাস করে নি, তবুও তিনি বিশ্বভ্রাতৃসঙ্ঘের এই মহাসত্যটি জানতেন,

“সারা জগৎটাই আমার আপন ঘর।”

* স্বর্ণপত্রাস্ত্র কমল, যা’ এস্ আর এফ্-এর আশ্রমবাটিকাসমূহের অলঙ্করণে বিস্তৃতভাবে ব্যবহৃত হয়েছে, তা হ’চ্ছে সন্তিকের মধ্যস্থিত “ব্রহ্মজ্যোতির সহস্রদল পদ্মের” (সহস্রার চক্র) প্রতীক।

† বাইবেল—এক্টস্, ১৭ : ২৬।

৪৯শ পরিচ্ছেদ*

১৯৪০—১৯৫১

“ভগবচ্চিত্তা আর ধ্যানের প্রকৃত মূল্য কি তা’ আজ আমরা সত্যই বুঝতে পেরেছি। আর এও জানি যে পৃথিবীতে কোন কিছুই আমাদের অন্তরের শান্তি নষ্ট করতে পারবে না। গত কয়েক সপ্তাহের অধিবেশনের সময় আমরা বিমান আক্রমণের সতর্কধ্বনি শুনেছিলুম আর বিলম্বিত-ক্রিয়ার বোমার বিস্ফোরণের শব্দও আমাদের কানে এসেছিল কিন্তু এখানকার ছাত্রেরা তবুও একত্র সমবেত হ’য়ে আমাদের সংসঙ্গে সাগ্রহে যোগদান করে।”

আমেরিকার দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে যোগদানের ঠিক অব্যবহিত পূর্বেই যুদ্ধ-বিশ্বস্ত ইংলণ্ড থেকে ও ইউরোপ থেকে অনেক চিঠি আমার কাছে আসে। সেই সকল চিঠিপত্রের মধ্যে এই পরম নির্ভরতার সংবাদটি লণ্ডন এস্ আর এফ্ কেম্ব্রের অধ্যক্ষ কর্তৃক প্রেরিত হয়েছিল। “দি উইজ্‌ডম্ অফ্‌ দি ইষ্ট্‌ সিরিজের” বিখ্যাত সম্পাদক ডাক্তার জ্যান্মার-বিঙ্‌ আমায় ১৯৪২ সালে লিখেছিলেন, “যখন আমি ইষ্ট্‌-ওয়েস্ট্‌ গড্‌লুম, মনে হ’ল যে আমরা কত দূরদূরান্তরে রয়েছি—যেন আমরা দুটো স্বতন্ত্র জগতে বাস করি। লস্‌ এঞ্জেলিস্‌ থেকে সৌন্দর্য্য, শান্তি, শৃঙ্খলা, স্বস্তি আর ‘হোলি গ্রেল’এর আনন্দ আসে আমার কাছে যেন অবরুদ্ধ নগরে প্রবেশ করার মত—জাহাজে বোঝাই হ’য়ে আশীর্বাদ, সুখ, স্বাচ্ছন্দ্য আমাদের বন্দরে এসে পৌঁছয়। আমি যেন স্বপ্নে দেখি, আপনাদের তালকুঞ্জ—এন্‌সিনিটাসের মন্দির—তা’র সামনে অনন্তবিস্তৃত মহাসাগর—পার্বত্যদৃশ্য—আর সবার উপরে আধ্যাত্মিক ভাবানুপ্রাণিত নরনারীর সংসঙ্গ—যে গোষ্ঠি একতায় বদ্ধ, সৃষ্টির কার্য্যে

* এই পুস্তকের তৃতীয় (ইংরেজী) সংস্করণে (১৯৫১) অনেক নূতন বিষয় সন্নিবেশিত হ’য়েছে। প্রথম দুই সংস্করণের (ইংরেজী) বহুসংখ্যক পাঠকের আগ্রহাতিশয্যে আমি এই পরিচ্ছেদে ভারতবর্ষ, বোগসাধন ও বৈদিক তথ্য সম্বন্ধে বহু প্রশ্নের উত্তর দিতে চেষ্টা করেছি।

নিবিষ্টচিত্ত, ধ্যানে পরিপুষ্ট। সকল সংসঙ্গিদের কাছে একজন সাধারণ সৈনিকের অভিনন্দন পাঠালুম—ওয়াচ টাওয়ারের উপর লেখা, উবার অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছি এখন”

যে সব লোক জীবনে কখনও কোন শাস্ত্রগ্রন্থের পাতাও ওপ্টারিনি তা'দের মধ্যেও যুদ্ধের বছরের সব ভয়াবহ হত্যাকাণ্ড মনের মধ্যে একটা বিশেষ পরিবর্তন সাধিত ক'রে আধ্যাত্মিক জাগরণ এনে দিয়েছিল। যুদ্ধের অতি তিক্ত গাছগাছড়ার তির্যকপাতনে বেরুল মধুর নির্ঘাস। পৃথিবীর সর্বত্র হ'তে— আধ্যাত্মিক উপদেশ আর শান্তি প্রার্থনা ক'রে বহু পত্র আমার নিকট এসেছিল।

১৯৩৭ হ'তে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত এই দশ বৎসরকাল আমার প্রায় প্রতি পক্ষে এক সপ্তাহ এন্সিনিটিসে আর এক সপ্তাহ লস্ এঞ্জেলিসে অতিবাহিত করতে হ'ত। রবিবাসরীয় উপাসনা, ক্লাস নেওয়া, ক্লাব, কলেজ, চার্চ প্রভৃতিতে বক্তৃতাপ্রদান, নিকট বা দূর হ'তে আগত সব শিক্ষার্থীগণের সঙ্গে দেখাশুলাং, চিরবর্ধমান পত্রালাপ, এস্ আর এফ্ দ্বৈমাসিকের জন্ত প্রবন্ধ রচনা, ভারতবর্ষের বিভিন্ন অংশে যোগদা সংসঙ্গ বিদ্যালয় ও কেন্দ্র সকল এবং আমেরিকার বহু রাষ্ট্রে এবং কানাডা, মেক্সিকো, ইংলণ্ড, ইউরোপ, আফ্রিকা, ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ, হাওয়াই এবং কিউবার এস্ আর এফ্ এর ছোটবড় চার্চ এবং কেন্দ্রগুলির* কার্যপরিচালনার নির্দেশপ্রদান প্রভৃতিতেই এই সব সময় ব্যয়িত হ'য়েছে। পৃথিবীর চতুর্দিকস্থ যোগতত্ত্বাসুক্ষ্মজ্ঞগণ, যাঁরা দূরত্বের বাধা গ্রাহ্য না ক'রে জানুবার ইচ্ছায় বিশেষ আগ্রহ প্রদর্শন করতেন, তাঁ'দের জন্ত ক্রিয়াযোগ এবং এস্ আর এফ্ শিক্ষাবিষয়ক উপদেশাবলী প্রভৃতি রচনার জন্তও আমার সমস্ত সময়ের কতকাংশ ব্যয় করতে হ'ত।

১৯৩৯ সালে আমি বোষ্টন সহরের এস্ আর এফ্ কেন্দ্র পরিদর্শন করি। ওয়াশিংটনের এস্ আর এফ্ চার্চের প্রতিষ্ঠাতা স্বামী প্রেমানন্দ আমার সঙ্গে যায়। যুক্তরাষ্ট্রের রাজধানীতে সে লাহিড়ী মহাশয়ের অপূর্ব আদর্শের

* ১৯৫১ সালে দারা পৃথিবীতে এস্ আর এফ্—ওয়াই এস্ এস্ এর চুরাশীট কেন্দ্র, স্কুল, চার্চ, এবং উপনিবেশ স্থাপিত হয়েছে। আন্তর্জাতিক হেড্ কোয়ার্টার হচ্ছে লস্ এঞ্জেলিস; ভারতীয় হেড্ কোয়ার্টার হচ্ছে—যোগদা মঠ, দক্ষিণেশ্বর।

আলোকবর্তিকা চিরদেদীপ্যমান রেখেছে। বোষ্টন কেন্দ্রের পরিচালক ডাঃ এন্ড্রিউ লিউইস্, স্বামী প্রেমানন্দ ও আমার জন্ত একটি স্মৃতিচিহ্নস্বরূপে সজ্জিত স্মিথে বাসের বন্দোবস্ত ক'রে দিলেন।

ডাঃ লিউইস্ একটু হেসে বললেন, “ম'শায়, আপনি আমেরিকা আসবার গোড়ার দিকে এই সহরে বাস ক'রেছিলেন একটা মাত্র ঘরে, তা'তে আনার কোন মানের ঘরও ছিল না। এখন দেখুন বোষ্টন সহরে কেমন আরামদায়ক আর সাজান সব ঘর।”

দক্ষিণ ক্যালিফোর্নিয়ার ক্রমবর্ধমান প্রয়োজন মিটাতে ১৯৪২ সালে হলিউডে একটি এস্ আর এফ্ সর্বধর্মসম্মত মন্দির স্থাপিত হয়। ছোট ছোট কুলুঙ্গির ভিতরে লাহিড়ী মহাশয়, শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজী, শ্রীকৃষ্ণ, বুদ্ধদেব, কনফুসিয়াস, মোজেস, সেন্ট ফ্রান্সিস আর শেষভোজে বীণাধরের বিম্বকের প্রতিমূর্তি সব স্থাপিত। সেখান হ'তে তাঁ'রা সব বিশ্বব্যাপী শান্তির আশীর্বাদ বিতরণ করছেন।

১৯৪৩ সালে শ্রান্ ডিয়েগোতে একটি এস্ আর এফ্ সর্বধর্মসম্মত মন্দির স্থাপিত হয়, আর একটি হয় ১৯৪৭ সালে ক্যালিফোর্নিয়া প্রদেশের লং বীচ্ নামক সহরে। শ্রান্ ডিয়েগোর এই মন্দিরটি ইউক্যালিপ্টাসের ক্রমনিয় উপত্যকাভূমিতে অবস্থিত একটি নির্জন পর্বতচূড়ার উপর স্থাপিত, সামনেই শ্রান্ ডিয়েগো উপসাগরের সূর্য্যকিরণোজ্জ্বল বিস্তৃত জলরাশি। সহরের বিরাট প্রেক্ষাগারের নিকটে অবস্থিত লং বীচ্ মন্দিরটি নর্থ্যান্ রাজগণের মধ্যযুগের পদ্ধতির অপরূপ পরিকল্পনায় নিৰ্ম্মিত।

ক্যালিফোর্নিয়া প্রদেশে লতাপুষ্পের মোহনকুঞ্জশোভিত, পৃথিবীর মধ্যে একটি অপূর্ব ভূমিখণ্ড, এস্ আর এফ্কে উৎসৃষ্ট করা হয় ১৯৩৯ সালে। এই পঁয়ত্রিশবিঘা পরিমিত ভূখণ্ডটির স্বাভাবিক গঠন অদ্বৈতচক্রাঙ্কিত। লস্ এঞ্জেলিসের প্যাসিফিক্ প্যালিসেড্‌সের অন্তর্গত হরিৎবর্ণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পর্বতমালা বেষ্টিত। এই ভূসম্পত্তিটির পশ্চিমাংশ প্রশান্ত মহাসাগরের দিকে বিস্তৃত।

এই পরমরমণীয় স্থানটির অপূর্ব বৈশিষ্ট্য হ'চ্ছে একটি বিঘা ছয়েকের হ্রদ, পার্শ্বতমুকুটের মধ্যে যেন একটা উজ্জ্বল নীলকান্তমণি। এর নিম্নল ও স্বচ্ছ জলের জন্ত জায়গাটির নাম হ'য়েছে এস্ আর এফ্ হ্রদতীর্থ। গরম আর ঠাণ্ডা দুই রকমেরই গভীর বারণার জল এতে এসে পড়ে আর এতে ছোটবড়

মাছও আছে নানাজাতীয়। ঘণ্টাধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে মাছের ঝাঁক রুটির টুকরা খাবার জন্তে জলের উপর ভেসে ওঠে। পূর্বতটে নোঙ্গরবাঁধ রয়েছে একটি চীনদেশীয় জাহাজ আর দোতলা হাউসবোট।

গুয়াডালুপ পাম, চীনদেশীয় রাইসপেপার গাছ এবং আম, পেঁপে, পেয়ারা, চেরিময়া, ডুমুর, পেপিনো, কলা আর গোলাপজাতের গাছ সব হৃদতীর তট এবং ভূমিখণ্ডের অত্যাশ্চর্য অংশ শোভিত করেছে। নিসর্গদৃশ্য, কৃত্রিম পাহাড়রচনা আর বৃক্ষলতাগুল্ম এবং পুষ্পকুঞ্জরচনার অধিকাংশ কাষই এস্ আর এফ্ আবাসিক শিষ্যগণের স্বহস্তসম্পন্ন।

এস্ আর এফ্ হৃদতীরযাত্রীগণ ছায়াঢাকা গ্রীষ্মপ্রধানদেশের বৃক্ষে রচিত খিলানের তলা দিয়ে ছোটছোট পোলের উপর দিয়ে গিয়ে সেখানে পৌঁছান, পথের দুধারে স্নগন্ধি ফুলের গাছের সারি। বহু দর্শকই বলেছেন, “আমি যেন এক ভিন্নরাজ্যে উপনীত হই, যেখানে প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের দৃশ্যসৌন্দর্য্যের একত্র সমাবেশ।” আর এই নীরব উপবনের শান্তির মধ্যে বোঝাই যায় না যে, পর্বত এবং সমুদ্রবেষ্টিত হৃদটি এক কস্মচঞ্চল আধুনিক সহরের সীমানার মধ্যে অবস্থিত।

হৃদের পশ্চিমতটে রবিবাসরীয় প্রাতঃকালীন উপাসনার জন্ত মৃত্ত আকাশের তলে একটা ছাদবিহীন মন্দির—কেবলমাত্র বড় বড় স্বর্ণকমল চুড়ায় শোভিত শাদা শাদা থামে ঘেরা। এই থামেঘেরা খিলানপথ আর শান্ত হৃদের বুকে এর ছায়া প্রতিবিম্বিত দেখে, কোনটা আসল আর কোনটা নকল তা’ হঠাৎ বোঝা যায় না। নিকটেই প্রভু বুদ্ধদেব আর কোয়ান্ য়িন,— চীনদেশের বিশ্বমাতা, এঁদের সব মন্ম্বরমূর্তি স্থাপিত আছে। একটা ক্ষুদ্র জলপ্রপাতের উপর যীশুখৃষ্টের মূর্তি দণ্ডায়মান; এর মুখ আর সোনালি বস্ত্রাবরণ সব রাত্রিকালে উজ্জলভাবে আলোকিত করা হয়।

জমির মধ্যে ডাচ্ উইণ্ডমিলের বাড়ীর প্রতিকল্প একটি অপকল্প ইষ্টক নির্মিত বাড়িকা। এর উঠানের মধ্যে বাগানে একটি এস্ আর এফ্ কাফে আছে। একটা জায়গায় আদা, বাঁশ আর মানগাছের কুঞ্জ। সেখান হ’তে ছায়াস্তম্ভবিড় একটি নির্জনস্থানে গিয়ে পৌঁছান যায়,—ধানের উপযুক্ত স্থান; সল্টন সমুদ্রের প্রবালপ্রস্তরে নির্মিত তা’র প্রাকৃতিক গঠন।

একটি শান্তিময় চ্যাপেলে এস্ আর এফ্ ছাত্রদের বহু উপহার সংগ্রহে রক্ষিত; তা'র মধ্যে আছে একটি চীনাংশুকের র্যাগ, বিছুরের তৈরী ক্রশ, আর ১৫৪৯ খৃষ্টাব্দে জার্মানীতে মুদ্রিত একখণ্ড পবিত্র বাইবেল। ৬০০ বৎসরের পুরাতন অপূর্ব কারুকার্যময় বেদীর উপরকার দারুশিল্প জনৈক স্পেনদেশীয়া রাণীর চ্যাপেলের একটি স্মৃতিচিহ্ন। হুদটীর উত্তরপশ্চিম তীরে একটি সুন্দর নিম্নভূমি উদ্যানের উপরে একটি আবাসবাটী অবস্থিত। নিকটস্থ জলচালিত চক্রটি সময় সময় চালিত হয়।

আমেরিকায় এস্ আর এফ্ এর ত্রয়োদশ বার্ষিক উৎসবের স্থচনায় চারটি বিশেষ ঘটনার মধ্যে একটি হচ্ছে* ১৯৫০ সালের ২০শে আগষ্ট তারিখে “হুদতীর্থ”টি জনসাধারণের নিকট উৎসর্গীকরণ। সভার উদ্বোধনে প্রধান বক্তা ছিলেন, ক্যালিফোর্নিয়ার লেফ্ টেন্যান্ট্ গভর্নর অনারেবল্ গুড্ উইন জে নাইট্। প্রতিষ্ঠাউৎসবের সমাপ্তির সময়, বিদেশ হ'তে আগত বহু প্রধান অতিথিদের সাদর অভ্যর্থনা জ্ঞাপন ক'রেছিলুম, তা'র মধ্যে ছিলেন, নিউইয়র্কে যুগোশ্লাভিয়ার কনসাল-জেনারেল অনারেবল্ অস্কার গেব্রিলোভিচ্ এবং কানাডা, মেক্সিকো, হাওয়াই, ইংলণ্ড, ফ্রান্স, জার্মানী, কোরিয়া, চীন, ভারতবর্ষ এবং ইউনাইটেড নেশনস্ গ্রুপের প্রতিনিধিদল।

উৎসবের উদ্বোধনে প্রায় দেড়সহস্র দর্শকের দ্বারা “তারকা খচিত পতাকা” গানটি গীত হ'বার পর সেল্ফ্ রিয়্যালাইজেশন অর্ডারের ১৩০ জন সন্ন্যাসী ও সন্ন্যাসিনীদের দ্বারা “এ হরি সুন্দর” ইংরেজীতে আবৃত্তি ও গীত হয়। অতঃপর সমাগত দর্শকবৃন্দ এস্ আর এফ্ যুবকদের দ্বারা শরীর ও মনের স্বাস্থ্যবিধায়ক যোগাসনের বৈজ্ঞানিক ব্যায়ামপ্রদর্শনে তৃপ্তিলাভ করেন।

ঐ দিবসেই একটি পবিত্র অনুষ্ঠান পালিত হয় মহাত্মা গান্ধী ওয়ার্লড্ পীস্ মেমোরিয়্যাল (বিশ্বশান্তি স্মৃতিমন্দির) এর উদ্বোধন ক'রে। ভারতবর্ষ

* অপর তিনটি বার্ষিক উৎসব ছিল : মাউন্ট্ ওয়াশিংটন এষ্টেট্‌সে ১৩ই আগষ্ট তারিখে ৭০০ এস্ আর এফ্ ছাত্রদের একটি উদ্যানসম্মিলন। দক্ষিণ ক্যালিফোর্নিয়ার বিভিন্ন অংশে অবস্থিত এস্ আর এফ্ কেন্দ্রসমূহে দূর সহর হ'তে আগত এস্ আর এফ্ সদস্যগণের জন্ম আয়োজিত ছুটি ভ্রমণব্যাপার; আর ২৭শে আগষ্ট তারিখে পালিত একটি পুণ্য গোলাপবর্তিকা উৎসব, যা'তে ক'রে আমি প্রায় ৫০০ শিক্ষার্থীগণকে “ক্রিয়াযোগে” দীক্ষিত ক'রেছিলুম।

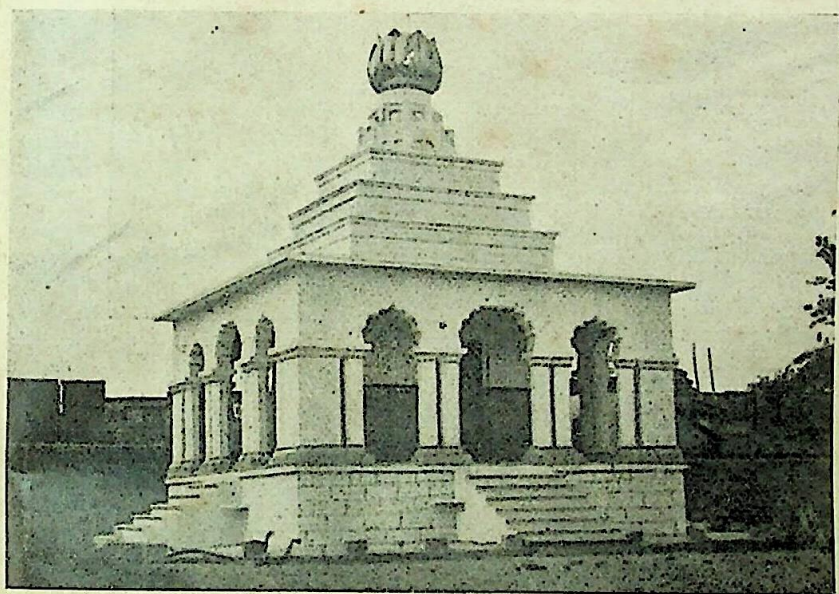
হ'তে প্রেরিত তাঁ'র পবিত্র চিত্তাভঙ্গের কিয়দংশ সহস্রবৎসরের পুরাতন একটি প্রস্তরপেটিকাতে সম্বন্ধে রক্ষিত হয়ে হ্রদের নিকটস্থ একটি ক্ষুদ্র পর্বতের উপরিস্থিত স্মৃতিমন্দিরে স্থাপিত হয়। এই স্মৃতিরক্ষার উৎসব উপলক্ষ্যে আমার মধ্যম ভ্রাতা শ্রীমান্ সনন্দলাল ঘোষ কর্তৃক অঙ্কিত মহাত্মা গান্ধীর একটি পূর্ণাবয়ব স্মৃতিচিত্র শ্রদ্ধার নিদর্শনস্বরূপ ভারতবর্ষ হ'তে আমেরিকায় প্রেরিত হয়।

এস্ আর এফ্ হ্রদতীর্থটি সর্বসাধারণের জন্ম উন্মুক্ত। প্রতিষ্ঠাদিবস হ'তে গত আটমাসের মধ্যে প্রায় দশহাজার লোক স্থানটি পরিদর্শন করেছে। বহু দর্শকই প্রকৃতির স্নিগ্ধশাস্তির সঙ্গে আধ্যাত্মিক শান্তিও লাভ করেছেন।

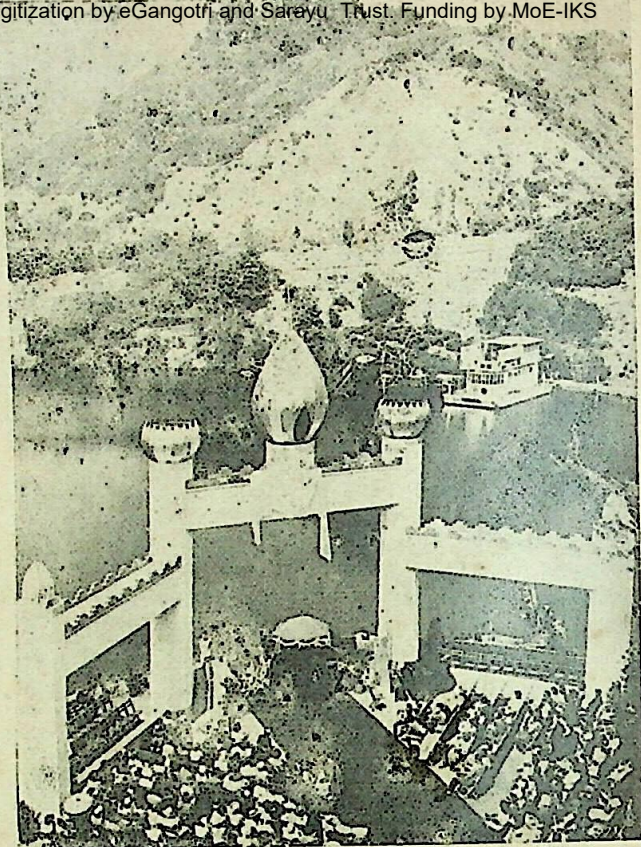
১৯৫০-৫১ সালে এস্ আর এফ্ এর কর্মস্বল্প কর্তৃক নির্মিত আমেরিকায় প্রথম সংস্কৃতিভবন “ইণ্ডিয়া হল” ক্যালিফোর্নিয়ার হলিউড্ সহরে উৎসৃষ্ট হয়...১৯৫১ সালের ৮ই এপ্রিল তারিখে। উৎসবের উদ্বোধনে লোকসেবার জন্ম আটটি ১৯৫০ সালের এস্ আর এফ্ স্বর্ণপদক বিতরিত হয়।* এই প্রতিষ্ঠা উৎসবে ক্যালিফোর্নিয়ার লেফ্ টেণ্যান্ট্ গভর্নর নাইট এবং ভারতের কনসাল-জেনারেল এম্ আর আহজা অংশ গ্রহণ করেন। উৎসবের প্রারম্ভে আমেরিকা, ভারতবর্ষ এবং ইউনাইটেড নেশানের পতাকা-সমূহ উত্তোলিত হয়।

প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের মিলনক্ষেত্র “ইণ্ডিয়া হলে” আছে একটি এস্ আর এফ্ ইণ্ডিয়া ক্যাপে, একটি গান্ধী স্মৃতিগ্রন্থশালা এবং পাঠাগার; এখানে প্রাচ্য হ'তে প্রেরিত বহু পুস্তক এবং সাময়িক পত্রপত্রিকাদিও আছে, আর বক্তৃতা ও ক্লাসের জন্ম ৩৫০ জন লোকের জন্ম একটি প্রেক্ষাগারও আছে। কমলসুস্ত-শোভিত একটি বিরাট খিলানের ভিতর দিয়ে এর বিস্তৃতভূমিতে প্রবেশ

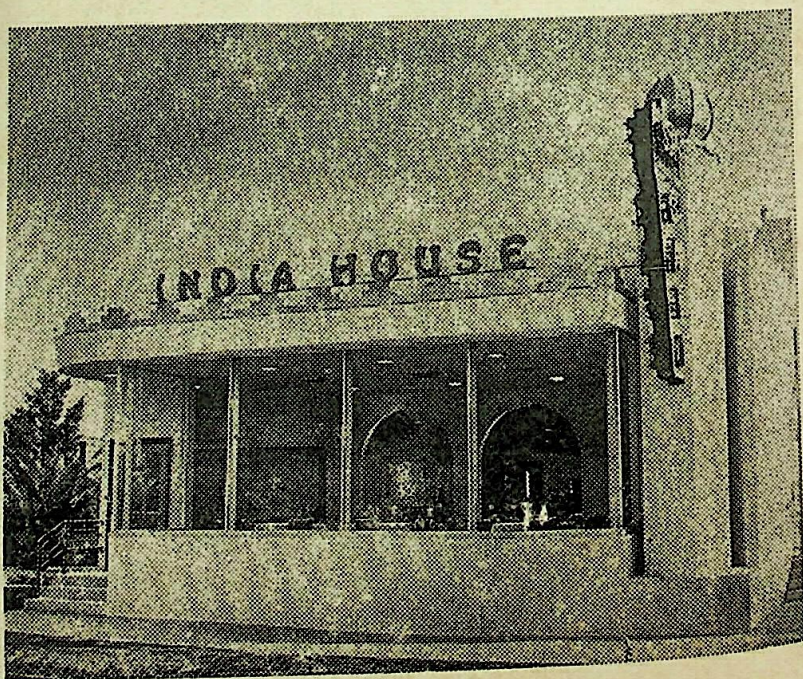
* এস্ আর এফ্ স্বর্ণপদকের পরিকল্পনায় আছে একটি ক্রশ্ একটি পঞ্চকোণ তারকার মধ্যস্থলে জ্ঞাননেত্র আর একটি পদ্ম—এর মূল পঙ্কমধ্যে নিমজ্জিত আর শীর্ষদেশ সূর্য্যমণ্ডলের মধ্যে অবস্থিত, নরত্ত হ'তে দেবদেউ উপনীত হ'বার প্রতীক। এই পদকগুলি প্রতিবৎসর জনমঙ্গলসাধকদের প্রদত্ত হয়, ধর্ম, শিল্পকলা, বিজ্ঞান এবং জনসেবার জন্ম। এস্ আর এফ্ তাঁ'র সদন্তগণকে সমাজ হ'তে দূরে থাকতে বলে না; বরং ধ্যান, ধারণা এবং সংসারের গঠনমূলক কার্যের সুসঙ্গত জীবন যাপন করতেই উৎসাহিত করে।



পুরীধামে ষোগদা-আশ্রমে শ্রীমৎ স্বামী
শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজীউর সমাধি-মন্দির।



ইন্দুতীর্থ এবং মহাত্মা গান্ধী শান্তি স্মৃতি-মন্দির
প্যাসিফিক প্যালিসেড্‌স, ক্যালিফোর্নিয়া।



করা যায় ; এখানে চারটি বড় বড় বাড়ী আছে। ইণ্ডিয়া হল* ; ১৯৪২ সালে উৎসৃষ্ট, এস্ আর এফ্ সর্বধর্মসম্মত মন্দির, এস্ আর এফ্ কশ্মিরবৃন্দের বাসস্থান আর একটি এস্ আর এফ্ উপহারদ্রব্যের বিপণি† তৃণাস্তৃত ভূমিতে জনবহুল সানসেট বুল্ডারের পশ্চিমগণ প্রবেশ লাভ ক'রে সেখানকার প্রস্তরাসন গ্রহণ ক'রে কিছু সময় সেখানে শান্তিতে অতিবাহিত করে।

ভারতবর্ষে এস্ আর এফ্ এর প্রতিকল্প যোগদা সংসদও তাঁর আধ্যাত্মিক ও জনহিতকর কার্যাবলীর প্রসার বৎসরের পর বৎসর বর্ধিত ক'রে চলেছে। কলিকাতার নিকটেই দক্ষিণেশ্বরে অবস্থিত ভারতীয় প্রধান কেন্দ্র “যোগদা মঠ” ধর্ম্মাধ্যক্ষ ব্রহ্মচারী শ্রীপ্রকাশের পরিচালনায় আছে। দক্ষিণেশ্বরে স্থাপিত মুদ্রাযন্ত্রে মুদ্রিত ইংরেজী ত্রৈমাসিক পত্রিকা “যোগদা”ও

* ইণ্ডিয়া হলের প্রথম পরিদর্শকদের মধ্যে হচ্চেন “কালিদাসের ভারত”, “সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস” প্রভৃতি ও ভারত সম্বন্ধে অসংখ্য অটোপানি পুস্তকের রচয়িতা এবং রাষ্ট্রপুতানা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক বি, এস্, উপাধ্যায় এবং জুপিও ও মস্তিষ্কসম্বন্ধে গবেষণার জ্ঞাত সুবিখ্যাত সার্জন ডাক্তার নগেন্দ্রনাথ দাস। ডাঃ দাস হ'চ্চেন আমার প্রিয় বাল্যবন্ধু ; পিতা আমায় রেলের পাস্ দিলে ভারতবর্ষে দেশভ্রমণে তিনি আমায় প্রায়ই সঙ্গী হতেন। বন্ধুবর এখন ভারতবর্ষে ওয়াই এস্ এস্ এর কার্যাবলীর সঙ্গে সক্রিয়ভাবে সংশ্লিষ্ট।

১৯৫১ সালে ইণ্ডিয়া হলে আমেরিকান বক্তাগণের মধ্যে হচ্চেন সিম্ফনি অর্কেস্ট্রার প্রথম মহিলা পরিচালক ডাঃ এণ্টনিয়ো ব্রিকো, আর ভার্জিনিয়া ইউনিভার্সিটির বিখ্যাত প্রাচ্যভাষাবিদ প্রফেসর ক্যুর্ট লিডেকার।

† হলিউড এবং এনসিনিটাসের উপহারদ্রব্যের দোকানগুলিতে যে সমস্ত জিনিষ বিক্রয় হয় সে সব এস্ আর এফ্ এর সদস্য এবং শুভানুধ্যায়ীদের কাছ হ'তে পাওয়া। বিক্রয়লব্ধ অর্থ সমস্তই দাতব্য কার্যে ব্যয়িত হয়। এস্ আর এফ্ উপহারদ্রব্যের দোকান আর কান্টিনগুলিতে যে সকল কশ্মিরগণ কায করেন, তাঁরা সকলেই সেল্ফ রিয়ালাইজেশন্স অর্ডারের ত্যাগী সম্মানী ; তাঁদের সকলেরই জীবন বিশ্বভ্রাতৃত্বের উন্নতিকল্পে এবং নিজ নিজ জীবনে এস্ আর এফ্ আদর্শ উপলব্ধি করবার জন্য উৎসৃষ্ট। কাষের জন্য তাঁরা কোন বেতন পান না এবং তাঁদের প্রদত্ত সমস্ত অর্থপুরস্কার এস্ আর এফ্ ওয়েলফেয়ার ধনভাণ্ডারে দিয়ে দেন। এই ধনভাণ্ডার হ'তে যোগদা সংসদ সোসাইটির রাঁচিহিত দাতব্য চিকিৎসালয়ে ঔষধপত্রাদি সরবরাহ এবং ভারতবর্ষে ও ইউরোপে শিশুদের জন্য খাদ্য প্রেরণ করা হয়।

লস্ এঞ্জেলিসে এস্ আর এফ্ এর একটি প্রার্থনা সংসদ, যে কোন লোক তাঁর ব্যক্তিগত সমস্যার সমাধান বা নিরাকরণের জন্য সাহায্য প্রার্থনা করলে তাঁকে বিনামূল্যে সাহায্য প্রেরণ করেন।

প্রকাশিত হয়। উক্ত পত্রিকায় ভারতবর্ষের বিভিন্ন কেন্দ্রের এবং লক্ষণপুর, মেদিনীপুর, রাঁচি ব্রহ্মচর্য বিদ্যালয় প্রভৃতির কার্যাবলীর চিত্র ও বিবরণাদিও প্রকাশিত হয়। বর্তমানে শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজী প্রতিষ্ঠিত “সাধুসভা”র মুখপত্র “সাধুসম্বাদ”ও নবপর্যায়ে উপযুক্ত পরিচালনাধীনে ত্রৈমাসিকরূপে নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হচ্ছে।

যোগদা সংসঙ্গ সোসাইটীর কলিকাতা কেন্দ্রের অধিবেশন আমাদের পৈতৃক বাসভবন ৪নং গড়পার রোডস্থিত বাড়িতে আমার ভ্রাতা শ্রীসনন্দলাল ঘোষের পরিচালনায় সম্পাদিত হয়। ১৯৫০ সালে কলিকাতার উপকণ্ঠে বরাহনগর সিঁতি নামক স্থানে যোগদা সংসঙ্গের কেন্দ্রের জন্ম আর একটি সুন্দর ও সুবিস্তৃত মূল্যবান সম্পত্তি সংগৃহীত হয়। প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের ভক্তশিষ্যদের উৎসাহ ও আত্মকূল্যে সমুদ্রতীরবর্তী পুরীর যোগদা আশ্রমে একটি তীর্থ প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা এখন চলছে; এখানে পূজ্যপাদ জ্ঞানাবতার শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজী মহারাজের সমাধিমন্দির অবস্থিত।

প্রতীচ্যে একটি এস্ আর এফ্ প্রতিষ্ঠান, একটি “আধ্যাত্মিক মধুর মধুচক্র” স্থাপনার ভার আমার পূজ্যপাদ গুরুদেব শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজী ও আমার পরমপরমগুরুদেব বাবাজী মহারাজ কর্তৃক আমার উপর অর্পিত হয়। যেমন সব বড় বড় কাষেই হয়, তেমনি এই পবিত্র কর্তব্যপালনেও নানাবিধ বাধাবিপ্লবের আবির্ভাবের অভাব ঘটে নি।

এস্ আর এফ্ চার্চের সান্ ডিয়েগো কেন্দ্রের অধ্যক্ষ ডাক্তার লয়েড্ কেনেল এক সন্ধ্যায় আমায় এই ক্ষুদ্র প্রশ্নটি ক’রে বসলেন, “আচ্ছা পরমহংসজি, ঠিক ক’রে বলুন ত’, সত্যিই কি এসব সার্থক হ’য়েছে?” আমি তাঁ’র প্রশ্নের ভাবে বুঝলুম যে তিনি ব’লতে চান, “আপনি কি আমেরিকায় এসে সুখী? এই যে ভুলভাঙা, অসুন্দার, কেন্দ্রের অধ্যক্ষ—যা’রা ঠিকমত পরিচালনা করতে পারেন না, ছাত্ররা—যা’দের উপযুক্তরূপে শিক্ষিত করতে পারা যায় না, তা’দের কথা কি সব ভেবেছেন?”

বললুম, “ডাক্তার, ঈশ্বর যা’কে পরীক্ষা করেন সেই ত’ ভাগ্যবান; আমার উপর পরীক্ষাভার চাপাতেই ত’, তিনি আমায় সর্বদা স্বরণ ক’রছেন।” ভাবলুম তখন সেই সব বিখণ্ড লোক, আর আমেরিকার অন্তরে যে ভালবাসা, ভক্তি, যা’তে আমেরিকার হৃদয় উজ্জল—তা’র সব কথা। ধীরে ধীরে দৃঢ়স্বরে

আমি বলতে শুরু করলুম, “কিন্তু আমার উত্তর এই:—হাঁ, হাজারবার আমি বলব, হাঁ, এ সত্যিই সার্থক হ’য়েছে; পূর্ব আর পশ্চিমকে একমাত্র শাস্ত্রত আধ্যাত্মিক বন্ধনে আবদ্ধ হ’তে দেখা—এ আমার স্বপ্নেরও অগোচর ছিল।”

ভারতের ধর্ম মহাপুরুষগণ যাঁরা প্রতীচ্যের প্রতি গভীর আগ্রহ প্রদর্শন ক’রেছেন, তাঁঁরা আধুনিক অবস্থা খুব ভালভাবেই বুঝেছেন। তাঁঁরা জানেন যে যতদিন পর্যন্ত না প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের প্রধান গুণগুলি সকল জাতির মধ্যে উত্তমরূপে গৃহীত না হয়, ততদিন পর্যন্ত আর পৃথিবীর অবস্থার কোন উন্নতির সম্ভাবনা নাই। দুই গোলাক্কেের মধ্যে পরস্পরের সর্বোৎকৃষ্ট গুণগুলির অল্পশীলন একান্ত প্রয়োজন।

পৃথিবী পরিভ্রমণকালে আমি নানাস্থানে বহু দুঃখহৃদিশা সব দর্শন ক’রে মগ্নহতই হ’য়েছি। প্রাচ্যে দুঃখক্লেশ প্রভৃতি জডস্তরে আবদ্ধ আর প্রতীচ্যে প্রধানতঃ মানসিক বা আধ্যাত্মিক স্তরে। পৃথিবীর সকল জাতি এখন একমুখী সভ্যতার কবলে পতিত।* ভারতবর্ষ, চীন ও অন্যান্য প্রাচ্যদেশ-সকল, আমেরিকার মত প্রতীচ্যজাতিসমূহের ঐহিক কল্যাণসাধনের প্রচেষ্টায় প্রতিযোগিতা থেকে বহুলপরিমাণে উপরূত হ’তে পারবে। আবার প্রতীচ্যবাসীদেরও জীবনের আধ্যাত্মিক ভিত্তির বিষয়ে স্মৃগভীর জ্ঞান থাকা দরকার, বিশেষতঃ মানুষের সচেতন ঈশ্বরোপলব্ধিকল্পে ভারতবর্ষ প্রাচীন-কালে সে সব বৈজ্ঞানিক প্রশ্নালীর উদ্ভাবন করেছিল, সে বিষয়ে।

সভ্যতার চরম উৎকর্ষের আদর্শ একেবারে অলীক কল্পনা নয়। কারণ

* আমরা যেহিঁয়া গরজে সে বাণী স্বরূপ সিন্ধুনম :—

“তোমার ধরা কি এত আশাহত,

চূর্ণ হয়েছে ধূলিকণামত ?

হারিয়েছ আজ সবকিছু হার, ছাড়ি’ আশ্রয় মম।

যা’ কিছু তোমার নিয়েছিল কেড়ে, শুধু এইটুকু তরে,

তোমা’ ক্ষতি তরে নয়,

আবার সে সব ধুঁজে নেবে তুমি, প্রসারিত মম করে।

হারান যা’ কিছু ভয়,

সকলি তোমার শিশুর ভাস্তি ; সবি আছে মোর ঘরে।

তোমা’ ত’রে সব সঞ্চয় করি, রেখেছি ঘরের মাঝ,

ওঠ এবে তুমি, ধর মোর হাত, এস মোর কাছে আজ।”

—ফ্রান্সিস টম্পসন, “দি হাউও অফ হেভেন।”

সহস্রসহস্র বৎসর ধরে ভারতবর্ষ আধ্যাত্মিক জ্ঞান ও বিরাট ঐশ্বর্যের রত্নভূমি ছিল। ভারতবর্ষের সুদীর্ঘ ইতিহাসে, গত দুইশত বৎসরের দারিদ্র্য তা'র কর্মফলের একটা সাময়িক অবস্থা মাত্র। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে “ভারতের ঐশ্বর্যের” প্রবাদ পৃথিবীতে সুপ্রচলিত ছিল। বিশ্ববিধান

* ঐতিহাসিক বিবরণে প্রতিপন্ন হয় যে ভারতবর্ষ অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত পৃথিবীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা বিস্তারিত জাতি ছিল। ৩৪৮ পৃঃ পাদটিকা দ্রষ্টব্য।

বাইবেলে উল্লেখ আছে যে “টারশিশের জাহাজ সকল” রাজা সলোমনের জন্ত ওফির (বোম্বাই উপকূলের সোপারা) হতে “স্বর্ণ ও রৌপ্য, গজদদন্ত, বানর এবং ময়ূর” আর “সুপ্রচুর এলমাস (অথবা এলগাম,—সম্ভবতঃ ভারতের চন্দন) বৃক্ষ এবং মহামূল্য পশুর সমূহ” এনেছিল। গ্রীকদূত মেগাস্থিনিস (খৃঃ পূঃ ৪র্থ শতাব্দী) হিন্দুস্থানের বিরাট ঐশ্বর্যের বিষয়ে এক পুথানুপুথ্য বর্ণনা লিপিবদ্ধ করে গেছেন। প্লিনি (খৃঃ পূঃ ১ম শতাব্দী) বলেন যে রোমানরা ভারতবর্ষ হতে বাৎসরিক পাঁচকোটি সেন্টারের (রোমান মুদ্রা—প্রায় আড়াইকোটি টাকা) পণ্যদ্রব্য আমদানি করত—আর সে সময়েও ভারতের একটা বিরাট নৌশক্তি ছিল।

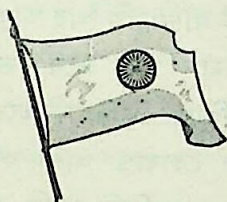
চৈনিক পরিব্রাজকেরা ভারতবর্ষের ঐশ্বর্যগরিমামণ্ডিত সভ্যতা, এর অপূর্ব রাজ্যশাসনপ্রণালী এবং বিরাট শিক্ষা বিস্তার প্রভৃতির প্রত্যক্ষ বর্ণনা দিয়ে গেছেন। (রয়্যাল এশিয়াটিক সোসাইটি হতে প্রকাশিত টমাস ওয়াটাসের “অনু য়ুন চ্যাঙ্ ট্রাভেলস ইন্ ইণ্ডিয়া, ৬২৯-৬৪৫ খৃঃ অঃ” দ্রষ্টব্য। হিউয়েন সাঙ্ (য়ুন চ্যাঙ্) এর সময়ে প্রজারঞ্জক রাজা হর্ষ সমগ্র উত্তর ভারতের অধিপতি ছিলেন। হিউয়েন সাঙ্ চীনে প্রত্যাবর্তনকালে রাজা হর্ষের বিদায় উপহার দুস্ত্রাপ্য মণিরত্নাদি এবং দশ সহস্রঃ স্বর্ণমুদ্রা গ্রহণ অস্বীকার করে তা'র দেশের পক্ষে অধিকতর মূল্যবান বিবেচনায় ৬৫৭ খানি ধর্মপুস্তকের পাণ্ডুলিপি হস্তগত করে নিয়ে যান।

পঞ্চদশ শতাব্দীতে কলহাস নূতন মহাদ্বীপ অর্থাৎ আমেরিকা আবিষ্কার করার সময় প্রকৃত পক্ষে ভারতবর্ষের জন্ত বাণিজ্যপথেরই অনুসন্ধানে বেরিয়েছিলেন। বহুশতাব্দী ধরেই ইউরোপ ভারতবর্ষের মিল্লিখিত পণ্যদ্রব্যগুলি সংগ্রহে চেষ্টিত ছিল, যথা—রেশম, হৃষ্মবস্ত্র (এত হৃষ্ম যে তা'দের নাম দেওয়া হয়েছে অদৃশ্য কুহেলী প্রভৃতি) কিংখাব, চিকণের কাষ, রাগ, ছুরি, কাঁচি, অস্ত্রশস্ত্র, হাতির দাঁত এবং হাতির দাঁতের কাষ, স্বর্গন্ধ, ঔষধাবলী, প্রলেপ, নীল, চাউল, মসলা, প্রবাল, স্বর্ণ, রৌপ্য, মূল্য, চুনি পাথর ও হীরা প্রভৃতি।

পর্টুগীজ ও ইটালীয় বণিকেরা বিজয়নগর রাজ্যের (১৩৩৬-১৫৬৫ খৃঃ অঃ) সর্বত্র বিশাল ঐশ্বর্য ও বিরাট সমৃদ্ধির পরিচয় পেয়ে তা'দের বিপুল বিশ্বয় লিপিবদ্ধ করে গেছে। এর রাজধানীর গৌরব বর্ণনাকালে আরবদূত আবদুল রজাক বলেন যে, “তা' এমন বিরাট যে পৃথিবীতে তা'র সমকক্ষ যে কোনও জায়গা আছে তা' চোখেও দেখা যায় নি আর কানেও শোনা যায় নি।”

ভারতবর্ষের সুদীর্ঘ ইতিহাসে, ষোড়শ শতাব্দীতে ভারত অখণ্ডভাবে প্রথম অহিন্দুরাজের অধীনে আসে : ১৫২৪ খৃঃ অঃে তুর্কী খাবর ভারত আক্রমণ করে মুসলমান রাজবংশের পতন করেন। এই প্রাচীন ভূমিতে বাসস্থাপন করেও কিন্তু নূতন সম্রাটেরা এর ঐশ্বর্যসম্ভার ‘নিঃশেষিত করেন নি। অতঃপর আভ্যন্তরীণ বিবাদবিসম্বাদে ঐশ্বর্যশালী ভারতবর্ষ সপ্তদশ শতাব্দীতে কতকগুলি ইউরোপীয় জাতির কৃষ্ণিগত হয় ; ইংলণ্ডই অবশেষে রাজশক্তিরূপে পরিণত হয়। পরিশেষে ভারতবর্ষ ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্ট শান্তিপূর্ণ উপায়ে স্বাধীনতা লাভ করে।

বহু ভারতবাসীর মত, আমারও একটি এখন-বলা-যেতে-পারে-গোছের কাহিনী আছে। কোন একটি যুবকদল বা'দের সঙ্গে কলেজে আমার পরিচয় ছিল, তা'রা প্রথম মহাযুদ্ধের সময় একদিন আমার কাছে এসে একটি বিদ্রোহীদল পরিচালনা করবার জন্তে অত্যন্ত পীড়াপীড়ি স্বীকৃত করে। আমি



নবস্বাধীনতালব্ধ ভারতবর্ষের (১৯৪৭) পতাকা ত্রিবর্ণ রঞ্জিত,—
 বোর কমলালেবু, সাদা আর গাঢ় সবুজ ; মধ্যস্থলে গাঢ় নীল রঙের
 ধর্মচক্র, খৃঃ পূঃ তৃতীয় শতকে সম্রাট অশোক কর্তৃক নির্মিত সারনাথের
 প্রস্তরস্তম্ভ হতে গৃহীত ।

চক্রটি ধর্মের সনাতন বিধির প্রতীকরূপে নির্বাচিত হয়েছে এবং
 প্রসঙ্গতঃ পৃথিবীর সর্বজনমাগ্ন সম্রাটের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধাপ্রদর্শনের
 জ্ঞাও । ইংরেজী ঐতিহাসিক এইচ জি রলিন্সন বলেন, “তাঁর চল্লিশ
 বৎসরের রাজত্বকালের তুলনা কোন ইতিহাসে মেলে না । বহুবার
 তিনি, মার্কস্, অরেলিয়াস্, সেন্টপল্ এবং কনষ্ট্যান্টাইনের সঙ্গে
 উপমিত হয়েছেন …… যীশুখৃষ্টের আবির্ভাবের আড়াইশত
 বৎসর পূর্বে সম্রাট অশোক বুদ্ধসাক্যল্যের পরিণামে তা’র ভয়াবহ
 ক্রফলের জ্ঞা ভীতি এবং অহুতাপ প্রকাশের সংসাহস প্রদর্শন করেছেন
 এবং বুদ্ধ রাষ্ট্রনীতির পহাস্বরূপে পরিত্যজ্য, তা’ মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা
 ক’রে গেছেন ।

অশোকের উত্তরাধিকারহুত্রে প্রাপ্ত রাজ্যসমূহের মধ্যে হচ্ছে ভারত-
 বর্ষ, নেপাল আফগানিস্থান এবং বেলুচিস্থান । প্রথম আন্তর্জাতিক
 হিসেবে তিনি বহু উপচৌকন এবং শুভেচ্ছা ও আশীর্বাদের সঙ্গে
 ধর্ম ও সংস্কৃতিগত প্রচারকদল, বর্ম্মা, সিংহল, মিশর, সীরিয়া এবং
 মাসিডোনিয়াতে প্রেরণ করেন ।

মনীষী পি, ম্যাসন্ আওয়ারসেল লিখেছেন, “মৌর্যবংশের
 তৃতীয় সম্রাট ছিলেন……একজন মহান ঐতিহাসিক দার্শনিক সম্রাট ।
 তিনি যেমন করেছিলেন তেমনি আর কেউ শক্তির সঙ্গে সহৃদয়তা,

তায়বিচারের সঙ্গে অহুকম্পার সমন্বয় ঘটাতে পারেন নি। তিনি ছিলেন তাঁ'র কালের একটি জীবন্তমূর্ত্তি আর আধুনিক কালের প্রতীক-রূপেও তিনি আমাদের সামনে এখন এসে উদয় হ'ন। তাঁ'র সুদীর্ঘ রাজত্বকালে তিনি সেই কৃতিত্বের অধিকারী হয়েছিলেন, যা' আমাদের কেবলমাত্র স্বপ্নে ছাড়া আর কোথাও আশা করা যায় না; চরমতম পার্থিব শক্তির অধীশ্বর হয়েও তিনি শাস্তি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তাঁ'র নিজ সুদূর বিস্তৃত সাম্রাজ্যেরও বহুদূরে তিনি উপলব্ধি করেছিলেন, যা' ছিল কতকগুলি ধর্মের স্বপ্নের বিষয়—বিশ্ববিধি, যে বিধি সকল মানবজাতিকে একতা-সূত্রে আবদ্ধ করে।

“ধর্ম সকল প্রাণিগণেরই সুখকামনা করে।” তাঁ'র পর্বতগাত্রে খোদিত অহুশাসন ও শিলালিপিতে—যা' অত্যাধি বিদ্যমান, সম্রাট অর্শোক তাঁ'র বহুদূরবিস্তৃত সাম্রাজ্যের প্রজাবর্গকে স্নেহভরে এই উপদেশই দিয়ে গেছেন যে সুখের মূল হচ্ছে নীতিবোধ আর ধর্ম-প্রাণতায়—আর কিছুতে নয়।

আধুনিক ভারত তা'ই এদেশের বহুগুণ্যাপী গৌরব আর ঐশ্বর্য্য পুনঃপ্রতিষ্ঠা প্রচেষ্টায় তা'র নূতন পতাকায় সম্রাট ধর্ম্মাশোকের গুণ্যস্বতির প্রতি শ্রদ্ধার নিদর্শনস্বরূপ ধর্ম্মচক্র অঙ্কিত ক'রে রেখেছে।

অথবা ঐহিক পুণ্য বা “ঋতে”র ভাবভ্যোতক হ’চ্ছে পার্থিব ও আধ্যাত্মিক প্রাচুর্য। ঈশ্বরের প্রসাদ অথবা তাঁ’র লীলারূপিনী প্রাচুর্য্যসম্পন্না প্রকৃতি-দেবীর নিকট কোন বিষয়ে কিছুই কার্পণ্য নাই।

হিন্দুশাস্ত্র এই শিক্ষা দেয় যে মানব এই পৃথিবীতে আবৃষ্ট হ’য়ে আসে, তাঁ’র পরম্পরাগত প্রত্যেক জীবনে সকল পার্থিব অবস্থার মধ্যে যে ভগবানের অনন্তলীলার প্রকাশ, সে বিষয়ে পূর্ণশিক্ষা লাভের জন্ত। পূর্ব ও পশ্চিম উভয়েই এই মহাসত্য বিভিন্ন উপায়ে শিক্ষালাভ করেছে আর তা’দের এইসব আবিষ্কার সানন্দে পরম্পরের মধ্যে বণ্টন ক’রে নেওয়া উচিত। ভগবান যে তাঁ’র এজগতের সন্তানেরা দারিদ্র্য, রোগ, অজ্ঞান থেকে মুক্ত এক আদর্শ সভ্যতা পৃথিবীতে বিস্তারের জন্ত প্রাণপণে চেষ্টা করেছে তা’ দেখে যে তিনি নিশ্চয়ই খুসী হ’বেন এ কথা নিঃসন্দেহ। যামুকের তা’র আত্মিক উৎপত্তির বিষয়ে অজ্ঞতা, যা’ তা’র স্বাধীন ইচ্ছার অপব্যবহারজনিত ফল—তা’ হ’চ্ছে তা’র সকল রকম দুঃখদুর্দশার মূল কারণ।

“সমাজ” নামে মানবরূপী ভগবানের শূন্যগর্ভ কল্পনাতে আরোপিত যে

তা’দের এই ব’লে প্রত্যাখ্যান করি, “ইরেজ ভ্রাতাদের হত্যা ক’রে ভারতের কোন মহল সাধিত হ’বে না, তা’র মুক্তি আসবে গোলাগুলির দ্বারা নয়, তা’ আসবে আধ্যাত্মিক শক্তি ভিতর দিয়ে।” আমি তা’রপর তা’দের এই ব’লে সাবধান ক’রে দিয়েছিলুম যে অন্তশাস্ত্রে বোঝাই জার্মান জাহাজ যা’র উপর তা’দের একান্ত নির্ভর ছিল, তা’ ডায়মণ্ড হারবারের কাছে বৃটিশে কাছে ধরা পড়ে যাবে। যুবকদল কিন্তু সে কথায় কর্ণপাত না ক’রে তা’দের মতলব অনুযায়ী অগ্রসর হতে গিয়ে শেষে দেখলে যে আমার পূর্বকথিত আশঙ্কানুযায়ী তা’দের সকল চেষ্টাই বিফল হ’ল। আমার বন্ধুগণ অবশেষে কারাগার হ’তে মুক্তিলাভ ক’রে বেরল। তা’দের প্রচণ্ড মত পরিত্যাগ ক’রে তা’দের মধ্যে কেউ কেউ মহাত্মাগান্ধীর আদর্শ রাজনৈতিক আন্দোলনে তখন যোগদান করলে। পরিশেষে অবশ্য তা’রা দেখতে পেলে যে ভারতের অপূর্ব “যুদ্ধ”জয় শান্তিযুগ উপায়েই সম্ভবপর হয়েছে।

অতঃপর ৪৭১ পৃষ্ঠার পাদটিকা দ্রষ্টব্য।

* কার্যতে স্বাধীন মোরা

কারণ মোদের স্বাধীন প্রেম—

ভালবাসা বা না বাসা শুধু ইচ্ছামাত্র হয়,

ইহাতেই আমাদের জয় পরাজয়।

কাহারও পতন ঘটে অবাধ্যতা তরে,

এইরূপে স্বর্গ হ’তে গভীর নরকে।

হায়রে পতন ঘটে কি আনন্দের

উচ্চাবস্থা হ’তে পরে কি গভীর দুখে।”

মিল্টন—প্যারাডাইস লষ্ট।

সব কুফল তা' বস্তুতঃ প্রত্যেক মানবেরই প্রতি আঘোপিত হ'তে পারে।*
 রামরাজ্যের কল্পনা পৌরগুণাবলীর মধ্যে পুষ্পিত হ'য়ে ওঠ'বার আগে তা'
 ব্যক্তিবিশেষের অন্তরে উদয় হওয়া প্রয়োজন, অন্তরের শুদ্ধির দ্বারা স্বাভাবিক-
 ভাবে বাইরের সংস্কার সাধন ক'রে। যে মানুষ নিজেকে সংশোধন করতে
 পেরেছে সে হাজারহাজার লোকের সংস্কারসাধন করতে পারে।

কালের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ পৃথিবীর সকল ধর্মশাস্ত্রই মূলতঃ এক, মানবকে
 তা'র উন্নতির পথে অগ্রসর হ'বার প্রেরণা যোগায়। আমার জীবনের
 একটি সর্বাপেক্ষা স্মৃথময় কাল অতিবাহিত হ'য়েছে এনসিনিটাসে আমার
 সেক্রেটারীদের নিকট—“খৃষ্টের জীবনের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা”র অনুলেখনের
 সময়।† খৃষ্টের নিকট আমি সকাতে প্রার্থনা ক'রেছিলুম এই ব'লে যে
 তাঁ'র বাণীর প্রকৃত অর্থ উদ্ঘাটন ক'রতে তিনি যেন আমার পথপ্রদর্শন
 করেন—যে সব বাক্যের অধিকাংশেরই অর্থ আজ এই দু'হাজার বৎসর
 ধ'রেই মারাত্মক রকমের ভ্রমপ্রমাদপূর্ণ ছিল।

এনসিনিটাস আশ্রমে একরাত্রে আমি নীরবধ্যানে বসে, আমার
 বস'বার ঘরটি হঠাৎ এক অপূর্ণ ওপ্যাল রঙের নীল আলোকে উদ্ভাসিত
 হ'য়ে উঠ'ল। নয়নসম্মুখে প্রতিভাত হ'ল প্রভু যীশুখৃষ্টের জ্যোতির্ময় মূর্তি।
 যুবা আকৃতি, বয়স অনুমান পঁচিশ, স্বল্প শ্মশ্রুশৃঙ্খলশোভিত মুখমণ্ডল, তাঁ'র
 সুদীর্ঘ কৃষ্ণকেশপাশ মধ্যস্থলে দ্বিধাবিভক্ত, উজ্জ্বল স্বর্ণবর্ণের ছটায় বেষ্টিত।

অনন্তরহস্তময় অতল গভীর তাঁ'র দু'টি চোখ, তাঁ'র দিকে চেয়েই রইলুম—
 চোখের ভাব অনন্ত, গভীর ও নিয়ত পরিবর্তনশীল! তা'দের ভাবের
 প্রত্যেক দিব্য অভিব্যক্তির সঙ্গেসঙ্গে যে জ্ঞান প্রকাশ পাচ্ছিল তা' অন্তরে

* ঈশ্বরের দিব্যালীলার পরিকল্পনা—যা'তে ক'রে প্রাতিভাসিক জগৎসমূহের আবির্ভাব, তা'
 হচ্ছে সৃষ্ট আর সৃষ্ট জীবের মধ্যে অস্বাভাবিক ভাব। মানুষ ভগবানকে একমাত্র যা' দান করতে
 পারে, তা' হচ্ছে প্রেম; এইই তাঁ'র উচ্ছলিত করুণাধারা আকর্ষণ করবার পক্ষে প্রচুর। “তুমি
 আমার এমন কি এই সমগ্র জাতির অপহরণ ক'রেছ। তোমাদের প্রাপ্য ফসলের দশমাংশ সমস্তই
 ভাঙার ঘরে আন, যা'তে ক'রে আমার ঘরে খাদ্য পাওয়া যা'বে আর আমার কাছে এখানেই এখন
 প্রমাণ দাও, তা'রপর গৃহস্থানীটির প্রভু বল্লেন ‘যদি তোমাদের কাছে আমি স্বর্গের বাতায়ন উন্মুক্ত
 না করি—আর তোমাদের কাছে এ আশীর্বাদ বর্ষণ না করি যা' ধারণ করবার মত স্থান
 থাকবে না।’ বাইবেল—মালাকি ৩:২-১০।

† বর্তমানে সেল্ফ-রিয়ালাইজেশন ম্যাগাজিন (পূর্বনাম ইষ্ট-ওয়েস্ট) পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে
 প্রকাশিত হচ্ছে।

অনুভব ক'রলুম। তাঁ'র মহিমাদীপ্ত নয়নবুগলে দেখলুম সেই শক্তি, যা' লক্ষকোটি জগৎ ধারণ ক'রে র'য়েছে। তাঁ'র মুখে দেখা গেল সেই পবিত্র পানপাত্র (হোলি গ্লেস)—আত্মোপলব্ধি, তা' আমার গুণপ্রাপ্ত স্পর্শ ক'রে আবার যীশুখৃষ্টের নিকট ফিরে গেল। কয়েকমুহূর্ত্ত পরে তিনি আমায় মধুর আশ্বাসবাণীতে কতকগুলি কথা বললেন, তা' সেগুলি এতই ব্যক্তিগত যে, সে সব প্রকাশে বিরত হ'য়ে আমি তা' অন্তরেই নিবদ্ধ রাখলুম।

১৯৫০ সালে মোজাতে মরুভূমির কাছে এস্ আর এফ-এর এক আশ্রমে অবস্থানকালে আমার আর একটি পুস্তকরচনা শেষ হয়, সেটি হ'চ্ছে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার সটিক অনুবাদ! পুস্তকটির নাম হ'চ্ছে “ঈশ্বরার্জুন সংবাদ” (গড্ টক্স্ উইথ্ অর্জুন)।* এতে যোগের নানা পথের বিশদ বিবরণ প্রদত্ত হ'য়েছে।

যোগপ্রণালী সম্বন্ধে দুইবার† বিশেষভাবে উল্লেখ, (গীতায় যা'র একমাত্র উল্লেখ আছে আর সেই একই প্রণালী, যা' বাবাজী মহারাজ শুধুমাত্র দু'টি কথায় উল্লেখ ক'রেছেন—ক্রিয়াযোগ) ভারতের সর্বপ্রধান ধর্মশাস্ত্র কার্য্যকরী এবং নৈতিক শিক্ষা প্রদান ক'রেছে। আমাদের স্বপ্নজগতের মহাসাগরে শ্বাস-প্রশ্বাস হচ্ছে মায়ার বাত্যাবিশেষ, যা' ব্যক্তিগত তরঙ্গের জ্ঞান উৎপাদন ক'রে—মানুষের আকৃতি ও অগ্রাগ্র জড়পদার্থসমূহ মানুষের ব্যক্তিগত প্রকাশের দুঃস্বপ্ন হ'তে জাগরিত করবার পক্ষে মাত্র দার্শনিক আর নৈতিক জ্ঞানই যে যথেষ্ট নয়, তা' বুঝে শ্রীকৃষ্ণ সেই পুণ্যগ্রন্থে প্রমাণ ক'রেছেন যে, যোগী তাঁ'র শরীরের উপর ক্ষমতা বিস্তার ক'রে ইচ্ছামত তা'কে বিশুদ্ধশক্তিতে পরিণত করতে পারেন।

হিন্দুশাস্ত্র যে যোগবিজ্ঞানের প্রশংসা করে, তা'র কারণ এ সর্ব-সাধারণের দ্বারা সাধনযোগ্য। অবশ্য এ কথা সত্য যে শ্বাসপ্রশ্বাসরহস্ত কখনও কখনও নিয়মিত যোগপ্রক্রিয়া বিনাই ভেদ হ'য়েছে—যেমন কতক-

* ১৯৫১ সালে প্রকাশিত। প্রিয় শিষ্য অর্জুনকে শ্রীকৃষ্ণের উপদেশপ্রদান শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার বিষয়বস্তু। পঞ্চপাণ্ডবগণের তৃতীয় ভ্রাতা ছিলেন অর্জুন। আধুনিক দিল্লীর নিকট পাণ্ডবগণের রাজধানী ছিল। হিন্দু পণ্ডিতগণের মতে শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুনের আবির্ভাবের তারিখ ছিল ৩১০০ খৃঃ পূর্বাব্দ—২৪০০০ বর্ষব্যাপী সায়নবৃত্তের শেষ ত্রেতাযুগের সমাপ্তির সময় পূঃ ২১৪ ও পূঃ ২১৫র পাদটিকা দ্রষ্টব্য।

† শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, ৪র্থ অধ্যায় ২৯ শ্লোক এবং পঞ্চম অধ্যায় ২৭-২৮ শ্লোক।

গুলি অহিন্দু মিষ্টিকদের ক্ষেত্রে, যাঁরা ঈশ্বরের প্রতি অচলা ভক্তির বলে অলৌকিক শক্তিসমূহের অধিকারী। এরূপ ঋষ্টান, মুসলমান এবং অত্যাচারী সাধু-সন্তদের প্রকৃতই স্বাসপ্রশ্বাসবিহীন এবং নিশ্চল অবস্থায় দেখা গিয়েছে (সবিকল্প সমাধি),* যাঁর অভাবে কোন মানুষই ঈশ্বরানুভূতির প্রথম অবস্থায় পৌঁছতে পারে না। (কোন সাধুর নির্বিকল্প অর্থাৎ সর্বোচ্চ সমাধির অবস্থায় পৌঁছবার পর তাঁর ব্রাহ্মীস্থিতি লাভ হয় আর সে স্থান হ'তে কখনও তিনি ছ্যাত হ'ন না—তাঁ' তিনি বিগতশ্বাস বা স্বাসপ্রশ্বাসসম্পন্ন অথবা সক্রিয় কিম্বা নিশ্চল যাইই হোন না কেন।)

সপ্তদশ শতাব্দীর খ্রীষ্টানসাধু ব্রাদার লরেন্স বলেন যে, তাঁ'র ঈশ্বরানুভূতির প্রথম আভাস আসে একটা বৃক্ষদর্শন থেকে। প্রায় সকল মানুষই ত' বৃক্ষদর্শন করেছে; কিন্তু হয় অতি অল্পলোকেই সেই বৃক্ষদর্শন থেকে বৃক্ষের স্রষ্টার দর্শন লাভ করতে পেরেছে। কি পূর্ব কি পশ্চিম সকল ধর্মপথেই যে সব “একাত্তী” সাধুদের দর্শন মেলে সেই সব “একমনা” সাধুদের যে দুর্বীর ভক্তিবল তাঁ' অধিকাংশ লোকই সংগ্রহ করতে অসমর্থ। তবুও সাধারণ লোক+ সে জন্ত ভগবৎসঙ্গলাভের সম্ভাবনা থেকে বঞ্চিত নয়। ভগবচ্ছিত্তার জন্ত তাঁ'র ক্রিয়াযোগের প্রশালীর নৈতিক উপদেশসমূহ দৈনিক পালন আর ভগবানকে প্রাণ খুলে ডাকা, “প্রভু তোমার অদর্শন আর সহ্য করতে পারছি না, দেখা দাও প্রভু, দেখা দাও!” ‡ এ ছাড়া কিছুই আর তাঁ'র প্রয়োজন হয় না।

এইভাবে ভক্তির প্রাবল্য, যা' সাধারণ মানুষের অনুভূতির গভীর বাইরে, তাঁ' অপেক্ষা দৈনিক সাধনযোগ্য বৈজ্ঞানিকপ্রণালী অবলম্বনে, ভগবৎসান্নিধ্যলাভ করবার জন্ত যোগের সার্বজনীন উপযোগিতা আছে।

২৯৫ পৃঃ ও ৫১২ পৃষ্ঠার পাদটিকা দ্রষ্টব্য। ঋষ্টিয়ান সাধুদের মধ্যে যাঁদের নির্বিকল্প সমাধির অবস্থায় দেখা গেছে তাঁদের মধ্যে আভিলার সেন্ট থেরেসার নাম উল্লেখ করা যেতে পারে। এ'র শরীর এত দৃঢ়ভাবে নিশ্চল হয়ে যেত যে, তাঁ'র কন্ডেক্টের বিশ্বয়শূন্যিতা সন্ন্যাসিনীগণ তাঁ'র অবস্থার পরিবর্তন বা তাঁ'র বাহ্যজ্ঞান ফিরিয়ে আনতে একেবারেই অসমর্থ হ'তেন।

+ “সাধারণ মানুষকে আধ্যাত্মিক পথে যাত্রা শুরু করতে হ'বে কোন স্থানে কোন না কোন সময়ে। লাও-ৎসু বলেছেন, “হাজার মাইলের ভ্রমণ শুরু হয় একটা মাত্র পদবিক্ষেপে।” বুদ্ধদেবও বলেছেন, “পরম মঙ্গলের বিষয় কেউ যেন তুচ্ছভাবে এই বলে চিন্তা করে না যে এ আর আমার কাছে আসবে না।” বিন্দু বিন্দু বারিপাতে জলপাত্র পূর্ণ হয়; অতি অল্প অল্প ক'রে সঞ্চয় ক'রলেও জ্ঞানী ব্যক্তি পরিশেষে পূর্ণ মঙ্গল লাভ করেন।”

‡ “যে ভগবানকে দ্বিতীয় স্থান প্রদান করে, সে তাঁকে কোন স্থানই দেয় না।” রাব্বিন।

ভারতের বিভিন্ন ধর্মগুরুগণ “তীর্থকর” ব’লে অভিহিত হ’য়েছেন, কারণ তাঁরা সেই পথ প্রদর্শন করেছেন, যে পথ অবলম্বন ক’রে পথভ্রান্ত মানবজাতি ঘোর বাত্যাভিক্রম সংসারসমুদ্র (অর্থাৎ কর্মচক্র—জন্মমৃত্যুর পুনরাবর্তন) অতিক্রম ক’রে পারে পৌছতে পারে। সংসার (সম্যকরূপে চলে যে—মায়া প্রভাবে) মানুষকে সবচেয়ে কম পরিশ্রমের পথ অবলম্বন ক’বতেই প্ররোচিত করে।) “তা’ হ’লে যে কেউই জগতের বন্ধু হ’বে, সেইই হ’বে ভগবানের শক্র।”* ভগবানের সখ্যালাভ করতে গেলে মানুষকে তা’র নিজ কর্মফল, যা’ তা’কে পৃথিবীর মায়ামোহের হস্তে নিরুপায়ভাবে আত্মসমর্পণ ক’রতে বাধ্য করে, তা’র কুফল তা’কে অবশ্যই এড়াতে হ’বে। কর্মফলের লৌহবিধির বিষয়ে জ্ঞান প্ররত সত্যাত্মসন্ধিৎসু ব্যক্তিকে তা’দের বন্ধন হ’তে মুক্তিলাভের উপায় বা’র করতে উৎসাহিত করে। মানুষের কর্মফলের দাসত্বের মূল হ’চ্ছে যখন অবিজ্ঞাত কামনাবাসনার অন্তরে, তখন যোগী কেবলমাত্র মনঃসংযোগের বিষয়ই চিন্তা করেন।† কর্মজ অবিজ্ঞার নানা আবরণ যখন অপসারিত হয়, তখন মানুষ নিজ স্বরূপ উপলব্ধি করতে পারে।

* বাইবেল—জেনেস, ৪ : ৪।

† নির্বাত স্থানের দীপ টলে না যেমন,
 নংন্যো যোগীর চিন্তে স্থিরতা তেমন।
 অভ্যাসে যখন চিন্তে স্থিরতা উদয়,
 আত্ম-দরশনে মন তুষ্ট অতিশয়,
 জ্ঞানগম্য চিদানন্দ উদয় যখন,
 বাক্যাতীত অতীন্দ্রিয় স্থখে মগ্ন মন,
 আত্ম-দরশনে চিত্ত অবিচল থাকে,
 অপূর্ব অবস্থা সেই যোগ বলে তাকে।
 মধুময় যে অবস্থা লাভে ধনঞ্জয়,
 জগতের বত লাভ তুচ্ছ বোধ হয়,
 মহাদুঃখে দুঃখ বোধ নাহি থাকে আর,
 অপূর্ব অবস্থা সেই যোগ নাম তা’র।
 কষ্টসাধ্য ব’লি’ যেন অবদ্র না হয়,
 কাতরতাশূন্য চিত্ত করি’ ধনঞ্জয়,
 যোগের ব্যাঘাতকারী কামনা ছাড়িয়া,
 ইন্দ্রিয় সংযত করি’ মনোবল দিয়া,
 গুরু-উপদেশে বৃদ্ধি করিয়া নিশ্চয়,
 করিবে সে যোগাভ্যাস পাণ্ডুর তনয়।

সুধাকরকৃত—শ্রীমদ্ভগবদগীতা ;—৬ : ১৯-২৪।

জীবনমৃত্যুরহস্ত, যা'র সমাধানের একমাত্র উদ্দেশ্যের জন্ত মানুষের এই পৃথিবীতে আগমন, তা' স্বাসপ্রশ্বাসের সঙ্গে ওতঃপ্রোতঃভাবে বিজড়িত। স্বাসহীনতা মানেই মৃত্যুহীনতা। এই সত্য উপলব্ধি ক'রে ভারতের প্রাচীন যোগীঋষিগণ একমাত্র স্বাসপ্রশ্বাসের সূত্র অবলম্বনে বিগতস্বাস হ'বার এক যুক্তিসিদ্ধ বিজ্ঞান উদ্ভাবন ক'রলেন। জগতে ভারতের আর কোন দানই যদি না থাকত, তা' হ'লে এই একমাত্র “ক্রিয়াযোগ”ই তা'র রাজোচিত দান ব'লে বিবেচিত হ'ত।

বাইবেলে এমন কতকগুলি পংক্তি আছে যা'তে ঈশ্বর যে স্বাস-প্রশ্বাসকেই দেহ ও আত্মার মধ্যে সূক্ষ্মসংযোগসূত্র ব'লে তৈরী ক'রেছেন— তা' যে হিব্রু ধর্মোপদেষ্টাগণ ভালরকমই জানুতেন, তা'র পরিচয় পাওয়া যায়। বাইবেলের জেনেসিসে আছে, “প্রভু ভগবান মানুষকে ভূমির মৃত্তিকা হ'তে সৃষ্টি করলেন আর তা'র নাসারন্ধ্রে প্রাণবায়ু প্রদান করলেন, আর মানুষ একটি জীবন্ত প্রাণীতে পরিণত হ'ল।”* মানবশরীর রাসায়নিক আর ধাতব উপাদানে গঠিত, যা “ভূমিতলের মৃত্তিকা”তেও পাওয়া যায়। এই জড়-মাংস, যা প্রস্তর অথবা মৃত্তিকার চেয়ে বেশীকিছু নয়, তা' কোন ক্রিয়াশীলতা অথবা শক্তি বা গতি প্রকাশ ক'রতে পারে না, যদি না আত্মা কর্তৃক দেহের মধ্যে, অজ্ঞানী লোকেদের কাছে স্বাসপ্রশ্বাসের (বায়ব্যাশক্তির) মাধ্যমে, তা'তে প্রাণশক্তি সঞ্চারিত হচ্ছে ব'লে বোধ হ'ত। মানবশরীরে পঞ্চপ্রাণ সূক্ষ্ম প্রাণশক্তিরূপে প্রকাশিত। প্রাণশ্রোত হচ্ছে সর্বব্যাপী পরমাত্মার প্রণবরন্ধারের বহিঃপ্রকাশ।

আত্মধারণ হ'তে উদ্ভূত প্রাণের যে আলোক জড়দেহের প্রতি কোষকে আলোকিত করছে, তা'র চিন্তাই মানবের দেহাসক্তির একমাত্র কারণ। অবশ্য একথা ঠিক যে সে এই একটা মৃত্তিকাপিণ্ডরূপ মানবদেহের প্রতি কখনও প্রবল শ্রদ্ধা পোষণ করবে না। মানুষ তা'র জড়মূর্ত্তির সঙ্গে তা'র একাত্মবোধ মিথ্যা ক'রেই অমুভব করে, কারণ আত্মা হ'তে প্রাণশ্রোত, অস্থিমাংসের দেহে নিঃস্বাসপ্রশ্বাসের মাধ্যমে এত প্রবলবেগে প্রবাহিত হয় যে মানুষ কার্যটাকেই কারণ ব'লে ভুল ক'রে,—দেহের নিজেরই প্রাণ আছে করনা ক'রে দেহটাকেই পূজা করে।

* বাইবেল—জেনেসিস, ২ : ৭।

মানুষের চৈতন্যাবস্থা হ'চ্ছে তা'র দেহ আর শ্বাসপ্রশ্বাসের জ্ঞান। নিদ্রাবস্থায় ক্রিয়াশীল তা'র মগ্নচৈতন্য, তা'র মানসিক এবং শরীর ও শ্বাসপ্রশ্বাসের সাময়িক বিচ্ছেদের সঙ্গে সংযুক্ত। তা'র তুরীয়াবস্থা হ'চ্ছে শরীর আর শ্বাসপ্রশ্বাসের উপর যে মানুষের “অস্তিত্ব” নির্ভর করে, সেই ত্রাস্তি হ'তে মুক্তি। † ঈশ্বর ত' শ্বাসপ্রশ্বাস বিনাই রয়েছেন, তাঁ'র প্রতিক্রমে নির্ম্মিত মানব প্রথমে বিগতশ্বাস হ'লে পরে তবে নিজস্বরূপ উপলব্ধি করতে পারে।

বিবর্তনপ্রস্থ কর্মের দ্বারা আত্মা ও দেহের যখন শ্বাসগ্রহি ছিন্ন হয়, তখন “মৃত্যু” নামে অভিহিত হঠাৎ অবস্থান্তর উৎপন্ন হয়; জড়কোষগুলি তা'দের স্বাভাবিক নিষ্ক্রিয় অবস্থায় ফিরে যায়। ক্রিয়াযোগীর পক্ষে কিন্তু শ্বাস-গ্রহিচ্ছেদ বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের দ্বারা ইচ্ছাবলেই সংসাধিত হয়, সেখানে কর্ম-ফলের সবল ও অনধিকার প্রবেশের কোন প্রয়োজন থাকে না। প্রত্যক্ষ অনুভূতিবলে যোগী তাঁ'র অশরীরী মূল অবস্থার কথা ইতিমধ্যে জ্ঞাত হন আর মৃত্যুর কতকটা স্পষ্ট ইঙ্গিত যে মানুষের জড়শরীরের উপর নির্ভর করা নিরতিশয় ভ্রম, সে বিষয়ে তা'র আর কোন জ্ঞানের প্রয়োজন হয় না।

জন্মজন্মান্তর পরিগ্রহণকালে প্রত্যেক মানুষই (তা'র নিজগতিবলে, তা' সে যতই অনির্দিষ্ট হো'ক না কেন) নিজেকে দেবত্বে উন্নীত করবার পথে অগ্রসর হয়। মৃত্যু এই অগ্রগতির পথে বাধাস্বরূপ না হ'য়ে কেবলমাত্র স্বল্পজগতের অধিকতর উপযুক্ত অবস্থাপ্রাপ্তির সুযোগ দান করে, যেখানে থেকে সে তা'র সবকিছুরই মালিক হ'তে মুক্ত হ'য়ে শুচিশুদ্ধ হয়। “তোমাদের হৃদয় যেন উদ্বিগ্ন না হয় আমার পিতার বাটীতে বহু

* “এ পৃথিবী তোমার সম্যক উপভোগ করা কখনই ঘটবে না যতক্ষণ পর্যন্ত না তোমার শিরোউপশিরার মধ্যে সাগরের বিশালতা প্রবাহিত হয়, যতক্ষণ পর্যন্ত না তুমি দিব্যভূষণে সজ্জিত হ'য়ে শিরে নক্ষত্রের মুকুট ধারণ ক'রে উপলব্ধি কর যে এই নিখিল জগতের তুমিই হ'চ্ছ একমাত্র উত্তরাধিকারী বা তা'র চেয়েও বেশী, কারণ এখানে এমন লোকেরা আছে যা'রা প্রত্যেকেই তোমারই মতন একমাত্র উত্তরাধিকারী; যতক্ষণ পর্যন্ত না তুমি রাজার রাজদণ্ড ধারণ অথবা কৃপণের ধনসঞ্চয়ের মত ভগবানের গুণগানে আনন্দ লাভ কর, যতক্ষণ পর্যন্ত না তুমি তোমার অন্ত্যস্ত চলাফেরা বসাদাঁড়ান মত ভগবানের সকল যুগের লীলার সঙ্গে তেমনি পরিচিত হও; যতক্ষণ পর্যন্ত না তুমি সেই রহস্যময় শূন্যতা, যা' থেকে এই পৃথিবী সৃষ্ট হয়েছিল তা'র গভীর পরিচিতি লাভ কর।” টমাস ট্রাহার্ণ,—সেঞ্চুরীস অফ্ মেডিটেশন্স।

বাসস্থান আছে।* ভগবান বোধ হয় এই বিশ্বরচনাতে তাঁর সবকিছু কৃতিত্ব শেষ করে ফেলে পরলোকে এক বীণাবাদন ছাড়া আর বেশী কিছু আগ্রহোদ্দীপক আমাদের জগৎ রাখেন নি, প্রায়শ্চত এই যে আশঙ্কা এর মূলে কোন প্রকৃত সত্য থাকতে পারে না।

মৃত্যু একেবারে অস্তিত্বের বিলোপ অথবা জীবন থেকে চরম মুক্তি নয়; মৃত্যু অমরত্বেরও প্রবেশদার নয়। পার্থিব স্রুতের মধ্যে যে তাঁর আত্মাকে নিমগ্ন করেছে সে পরলোকের সূক্ষ্মসৌন্দর্যের মধ্যে তাঁকে আর পুনরাবিষ্কার করতে পারবে না। সেখানে সে কেবলমাত্র সূক্ষ্মতর অল্পভব আর 'শিবম্ সুন্দরম্' বা 'মূলতঃ এক, তাঁর সূক্ষ্মতর অল্পভূতি সঞ্চয় করে। পৃথিবীর এই স্থূলভূমির উপরেই যুদ্ধশীল মানবকে তাঁর আধ্যাত্মিক অক্ষয় স্বর্ণকে আবিষ্কার করে নিতে হবে। সর্বভুক্ত মৃত্যুর একমাত্র গ্রহণযোগ্য দান সেই কষ্টার্জিত স্বর্ণপিণ্ড হাতে নিয়ে মানব পরিণামে জুড়দেহ হ'তে চরম মুক্তি লাভ করে।

কয়েক বছর ধরে আমি এন্সিনিটাসে ও লস্ এঞ্জেলিসে পতঞ্জলির যোগসূত্র এবং অগ্ন্যায় ভারতীয় দর্শনের ক্লাস পরিচালনা করেছিলুম।

একদিন সন্ধ্যাকালে ক্লাসে একটি ছাত্র প্রশ্ন করে বসল, "ঈশ্বর দেহ ও আত্মার সংযোগ সাধন করলেন কেন?—এর বিবর্তনশীল বিশ্বনাট্যের প্রথম সূত্রপাত ও তাঁর পরিচালনায় তাঁর কি উদ্দেশ্য ছিল?" এরূপ ধরনের প্রশ্ন অসংখ্য লোকেই করেছে; দার্শনিকেরা কিন্তু বৃথাই তাঁদের পূর্ণ সমাধানের চেষ্টা করেছেন।

শ্রীবৃন্তেশ্বর গিরিজী হেসে বলতেন, "ও গোড়াকতক রহস্যের সমাধান অনন্তের পথ বেয়েই চলুক। মাছুষের সসীম যুক্তিবল কি সেই 'অবাঙ্গনস-গোচর' অজ, স্বয়ম্ভু, সনাতন পুরুষের দুর্বাধিগম্য অভিপ্রায় বুঝতে পারে?"

* বাইবেল : — জন : ১৪ : ১-২।

† প্রভু বলেছেন,—"কারণ আমার চিন্তাসকল তোমাদের চিন্তা নয়, তোমাদের পথ আমার পথ নয়। স্বর্গ যেমন পৃথিবীর চেয়েও উঁচু, তেমনি আমার পথ তোমাদের পথের চেয়ে আর আমার চিন্তা তোমাদের চিন্তার চেয়েও উঁচু।" বাইবেল :—ঈশাইয়া ৫৫:৮-৯। দান্তে, "দি ডিভাইন কমিডি"তে বর্ণনা করে গেছেন :—

"তাহারি আলোকে হৃদয় সেই স্বর্গভূমির মাঝে

গিয়েছিল আর দেখেছিল আমি যে সব ব্যাপার সেখা,

অনাহত ধ্বনি

কোথা হ'তে, কোথা হ'তে আসে এই ধ্বনি অনাহত,
 যা র মাঝে ডুবে যায়, পৃথিবীর দুঃখশোক যত ?
 আনন্দসাগরতটে আছাড়ি' গরজে "ওম্" স্বর—
 হ্যালোক, ভুলোক আর সব কিছু কাঁপে থরথর !
 বাসনাবন্ধনরজ্জু টুটে সব যায় অকস্মাৎ,
 কিসের কম্পন জাগে, কোথা হ'তে হয় উদ্ঘাপাত !
 স্পন্দিত হৃদয় দ্রুত আর প্রাণসঙ্গীবনী বায়ু,
 আর তা'রা পারিবেনা কেড়ে নিতে কভু যোগী আয়ু ।
 যুগায় নিখিলবিশ্ব স্নিগ্ধ মৃদু আঁধারের কোলে,
 মাথার উপরে আজ তারার আলোর মালা দোলে ;
 স্বপন সুবুপ্তি যবে মিলে গিয়ে হয় একাকার
 তখনই শোনা যায় প্রণবের মধুর বাঙ্কার ;
 ভ্রমরগুঞ্জনধ্বনি "মূলাধারে" বাঙ্কারিছে নিতি—
 প্রণবশিশুর শোন ! অক্ষুট ও মধুময় গীতি !
 শ্রীকৃষ্ণের বংশী হ'তে কি অমিয় মুরলীআহ্বান,
 "স্বাধিষ্ঠানে" গুঞ্জরিছে বেণুরবে ওঙ্কারের গান !
 "মণিপুরে" অগ্নিবীণা গাহে আজ প্রণবের সুর !
 "ওম্" ! "ওম্" ! "ওম্"রূপে বীণা তা'র বাজে স্তমধুর ।
 "অনাহত" চক্রমাবে ওঙ্কার উঠিছে রণরণি',
 ঘণ্টানিনাদেতে তা'র ওঠে ধ্বনি আর প্রতিধ্বনি !
 মেরুদণ্ডচক্র বেয়ে উর্দ্ধপথে কর অভিযান,
 কাণ পেতে শোন এবে বিশ্বসঙ্গীতের কলতান !
 প্রণব বাঙ্কার—সেই অনাহতধ্বনি মাঝে হ'তে,
 অন্ধকার অতিক্রমি' চল তুমি আলোকের রথে ।
 ওঙ্কারের বুকে দোলে মহাবিশ্বসঙ্গীতমালিকা,
 ওঙ্কারে ঘিরিয়া ভাসে প্রকৃতির অশ্রুহেলিকা ।
 স্বরগ মরত আর যেখানেতে যাহা কিছু সব,
 নিখিল ভুবন ব্যাপি' বাঙ্কারিছে "ওম্" "ওম্" রব ।

মানুষের যুক্তি বা' এই জড়জগতের কার্যকারণবিধির কণ্ঠিন নিগড়ে আবদ্ধ, তা' অনাদি, কারণাতীত ঈশ্বরের রহস্যের কাছে একেবারেই নিষ্ফল হ'য়ে যায়। যদিও মানবমনের যুক্তি সৃষ্টিরহস্য ভেদ করতে পারে না, তবুও ভক্তের কাছে ভগবান স্বয়ং পরিণামে সকল রহস্যেরই সমাধান ক'রে দেন।"

যা'র জ্ঞানলাভের জন্য আন্তরিক ব্যাকুলতা আছে, তিনি জীবনের "আইনষ্টাইন থিয়োরী"র (আপেক্ষিকবাদের), নিভুল গণিতিক রেখাচিত্র আগে হ'তেই দাবী না ক'রে, সেই দিব্য আদর্শের কতকগুলি সরল নীতির ক, খ, গ, শিক্ষা ক'রেই তাঁ'র ঈশ্বরানুসন্ধানে সমৃদ্ধ থাকেন।

"কোন মানুষ কোন সময়েই ঈশ্বরের দর্শন পায় নি (মানুষের আপেক্ষিকতা, * 'কালের অধীন কোন মানবই অসীমকে উপলব্ধি করতে পারে না); একমাত্র তাঁ'র জাত পুত্র যিনি পিতার বক্ষে আশ্রয় পেয়েছেন (বহিঃপ্রতিফলিত খুঁটচৈতন্য অথবা শুদ্ধজ্ঞান অথবা প্রণববাক্যের মধ্য দিয়ে, যা' সকল সৃষ্টির ব্যাপারকে পরিচালিত ক'রে, তা' বক্ষ: অর্থাৎ স্বয়ম্ভূ দিব্যভাবেব গভীর অন্তঃস্থল থেকে একের মধ্যে বহুর বৈচিত্র্যপ্রকাশের জন্য উৎপন্ন হ'য়েছে), তিনি তা'কে ঘোষণা (রূপপরিগ্রহ অথবা প্রকাশিত) ক'রেছেন।"†

যীশু ব্যাখ্যা ক'রে ব'লেছেন, "আমি নিশ্চয় ক'রে বলছি, পুত্র নিজ হ'তে কোন কিছুই ক'রতে পারেন না, কিন্তু তিনি যা' কিছু দেখেন, তা' সব

সেখা হ'তে যে'বা ফিরে আসে, তা'র কোন কৌশলজ্ঞান
নাহিক কিছুই; কিছু নাই তাঁ'র কহিতে সে বারতা;
কারণ তাহার লক্ষ্যভূমিতে হ'লে ক্রমে আশ্রয়ান
বুদ্ধি মোদের অভিজুত হয় এতই গভীর ভাবে,—
আবার সে আর ফিরিতে পারে না—একদা যে পথ ধ'রে
চ'লেছিল যবে পুনরায় সেই পথে।
মনের গহনে সঞ্চিত মোর বাহা কিছু স্মৃতিবলে,
সেই হ'বে মোর বিষয়বস্ত্ত পুণ্যদেশের কথা;
কণ্ঠেতে মোর ধ্বনিবে স্দাই, এ গান না হ'লে শেষ।"

* পৃথিবীর আক্ষিকগতিতে আলো থেকে অন্ধকার আর; অন্ধকার থেকে আলো হ'চ্ছে মানুষের কাছে সৃষ্টির মায়াধীনতা বা বিপরীতাবস্থার নিত্যস্মারক। (সুতরাং প্রদোষ ও সন্ধ্যা, দিবসের এই পরিবর্তন অথবা সমগুণী কালসমূহ ধ্যানের পক্ষে অতি প্রশস্ত ব'লেই বিবেচিত হয়।) মানুষের বৈতণ্ড্যের অবগুণ্ঠন ভেদ ক'রে যোগী অতীন্দ্রিয় ঐক্যের উপলব্ধি ক'রতে পারে।

† বাইবেল;—জন ১ : ১৮।

পিতাই সম্পন্ন করেন; কারণ বা' কিছু তিনি করেন, সে সকলই পুত্রও সমানভাবে করেন।*

ঈশ্বরের ত্রিবিধা প্রকৃতি, যা'তে তিনি নিজেকে বাহ্যজগতে প্রকাশিত করেন, তা' হিন্দুশাস্ত্রে সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়ের প্রতীক ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বররূপে বর্ণিত হয়েছে। সারা সৃষ্টিপ্রবাহের মধ্য দিয়ে তাঁ'দের এই ত্রিবিধা প্রকৃতির কার্যস্রোত নিরন্তর প্রবাহিত। নিগূর্ণ ব্রহ্ম যখন মানুষের ধারণাশক্তির অতীত, তখন হিন্দু তখন তাঁ'কে এই মহান ত্রিমূর্তিরূপেই পূজা করে।†

যা'ই হোক বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের এই যে সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের ভাব, তা' ঈশ্বরের চরম, এমন কি তাঁ'র মূল প্রকৃতিও নয় (কারণ বিশ্বসৃষ্টি তাঁ'র লীলা)।‡ এমন কি তাঁ'র ত্রিমূর্তির সকল রহস্য ভেদ ক'রেও তাঁ'র অন্তর্গত ভাব আবিষ্কার করা যা'বে না, কারণ তাঁ'র বহিঃপ্রকৃতি, যা' বিধিবদ্ধ আণবিক প্রবাহে প্রকাশিত, তা' তাঁ'কে প্রকাশিত না ক'রে শুধু কেবল তাঁ'র আভাস মাত্র প্রদান করে। ঈশ্বরের চরম প্রকৃতি কেবল তখনই জ্ঞাত হওয়া যায়, যখন “পুত্র পিতার নিকট গমন করেন”।§ অগুপ্তমানব তখন সৃষ্টিরাজ্য অতিক্রম ক'রে আদিসত্তায় ফিরে যায়।

চরমরহস্যের সমাধানের প্রশ্নে সকল ধর্মোপদেষ্টাগণই নিরন্তর র'য়ে গেছেন। পাইলেট যখন জিজ্ঞাসা ক'রলেন, “সত্য কি?”+ যীশুখ্রীষ্ট কোনই উত্তর দিতে পারলেন না। পাইলেটের মতন বুদ্ধিজীবীদের সব আড়ম্বরপূর্ণ বড় বড় প্রশ্ন কদাচিৎ জলন্ত অম্লসন্ধিসার ভাব হ'তে উদয় হয়।

* বাইবেল—জন ৫ : ১৯।

† সৎ, তৎ, ওঁ অথবা পিতা, পুত্র, পবিত্রাত্মা এই ত্রয়ীবাদের সত্য হ'তে এ সত্য ধারণা। তৎ অর্থাৎ পুত্র সমগ্র সৃষ্টির মধ্যে অন্তর্নিহিত যে স্ফুটচৈতন্য, তা' পরব্রহ্মের ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর এই ত্রয়ী ভাবেরই প্রকাশ। এই ত্রিমূর্তির যে সব শক্তি, তা' সৃষ্টির মধ্য দিয়ে একমাত্র যে কারণশক্তি বা' সমগ্র বিশ্বকে ধারণ ক'রে আছে তাঁ'রই প্রতীক। (পৃ: ১৮৬ ও পৃ: ২৪৬র পাদটিকা দ্রষ্টব্য)।

‡ “হে প্রভু, ... তুমিই সকল কিছু সৃষ্টি করেছ। তোমারই আনন্দের জন্ম তাঁ'রা সব আছে, আর সৃষ্টি হয়েছে।” বাইবেল—রিভি: ৪:১১।

* বাইবেল—জন ১৪:১২।

† বাইবেল—জন ১৮ : ৩৮।

এরূপ ব্যক্তির বৃথা দম্ভভরেই কথা বলেন, যা'তে ক'রে “সবল মনের” চিহ্ন যে তা'র আধ্যাত্মিক মূল্য, * তা'র অভাবই সূচিত হয়।

“এই উদ্দেশ্যেই আমি জন্মগ্রহণ ক'রেছি আর এই কারণেই আমি পৃথিবীতে এসেছি, যা'তে ক'রে আমি সত্যের পক্ষে সাক্ষ্যদান করতে পারি; যে কেহ সত্যের, সেই আমার বাণী শুনতে পায়।”† এই সামান্য কয়টি অল্প কথায় যীশুখৃষ্ট অনেক কিছুই বলেছেন। ঈশ্বরের সম্ভান যিনি, তিনি তাঁ'র জীবনাদর্শে তা'র “সাক্ষ্য বহন” করেন। মূর্তিমান সত্য তিনি; তিনি তা'র ব্যাখ্যা করলেও সেটা তা'র পুনরাবৃত্তিই হ'বে।

সত্য কেবল অল্পমান বা ঔপপত্তিক বিষয় নয় অথবা দর্শনশাস্ত্রের কোন অল্পমানের প্রণালীও নয় বা কোন বুদ্ধিজাত অন্তর্দৃষ্টিও নয়। সত্য হ'চ্ছে বাস্তবসত্তা বা সদ্বস্তুর অবিকল প্রতিক্রিয়া। মানুষের পক্ষে সত্য হ'চ্ছে তা'র আসল প্রকৃতি, আত্মরূপে তা'র স্ব-রূপের অখণ্ড জ্ঞান। যীশুখৃষ্ট তাঁ'র প্রত্যেক-কার্য এবং বাক্যের দ্বারা প্রমাণ ক'রেছিলেন যে, ঈশ্বর হ'তে যে তাঁ'র উৎপত্তি—তাঁ'র জীবনের সেই সত্যের বিষয় তিনি অবগত ছিলেন। সর্বব্যাপী খৃষ্টচৈতন্য বা কূটস্থ চৈতন্যের সঙ্গে একাত্ম হ'য়ে গিয়ে তিনি চূড়ান্তভাবেই শুধু বলতে পারতেন; “যা'রা সত্যের, তা'রা সকলেই আমার বাণী শ্রবণ করে।”

বুদ্ধদেবও পরমতত্ত্বের উপর আলোকপাত করতে অস্বীকারই ক'রেছিলেন শুষ্কভাবে এই কথা ব'লে যে, পৃথিবীতে মানুষের ছ'দিনের বাস, তা'তে তা'র নৈতিক জীবনের উন্নতিসাধনেই ভালভাবে ব্যয় করা যায়। চৈনিক মিষ্টিক লাও-ৎসু ঠিকই ব'লেছেন যে, “যে জানে সে বলে না, আর যে বলে সে

* “প্রেম ধর্ম : মূল, একা বাধাবন্ধহীন,—

সেইই কেবল পারে শিখাইতে তোমা',

কি রকম ক'রে হয় আরোহিতে সেখা,

স্বরগ মণ্ডল হ'তে উচ্চতর স্থানে ;

অথবা সে ধর্ম যদি কভু হয় ক্ষীণ,

মর্ত্যে নেমে আসে স্বর্গ প্রেমধর্ম কাছে।”

সিন্টন, কোমাস।

† বাইবেল—জন ১৮ : ৩৭।

জানে না।" ঈশ্বরতত্ত্বের চরমরহস্য "তর্কের বিষয়ীভূত" নয়। তাঁ'র গুপ্তরহস্য ভেদ করা হচ্ছে এমন একটা বিদ্যাকৌশল যে তা' মানুষ মানুষকে দিতে পারে না; এখানে ভগবানই হচ্ছেন একমাত্র শিক্ষাদাতা গুরু।

"স্থির হও আর উপলব্ধি কর যে আমিই ঈশ্বর।"* ঈশ্বরের সর্ব-ব্যাপিত্বের জ্ঞান সাড়শ্বর ঘোষণার কোন প্রয়োজন হয় না, তাঁ'র পরিষ্কৃটবাণী নিশ্চল অন্তরের গভীর নীরবতার মধ্যেই শোনা যায়। নিখিল বিশ্বমাত্রে প্রতিধ্বনিত প্রণববাঙ্কাররূপে নাদব্রহ্ম ভগবন্তত্ত্বের হৃদয়ে মুহূর্ত্তমধ্যে সুস্পষ্ট বাণীরূপে প্রকাশিত হ'ন।

ঈশ্বরের সৃষ্টির উদ্দেশ্য কি তা' মানববুদ্ধির পক্ষে যতটা বোধগম্য, তা' বেদেতে ব্যাখ্যাত হ'য়েছে। ঋষিরা এই শিক্ষাই দিয়ে গেছেন যে প্রত্যেক মানবই ঈশ্বর কর্তৃক একটা আত্মা (জীব) রূপে সৃষ্ট হ'য়েছে, যা' তা'র নিগুণ অভেদত্বে ফিরে যা'বার পূর্বে সেই অসীম সত্তার কতকগুলি বিশেষগুণ অপূর্বভাবে প্রদর্শন করবে। সকল মানবই—যা'রা এই দিব্যবৈশিষ্ট্যের কান্ধি দ্বারা ভূষিত, তাঁ'রা সকলেই ভগবানের কাছে সমানভাবে প্রিয়।†

পৃথিবীর সকল জাতির মধ্যে অগ্রজ ভারতবর্ষ কর্তৃক সঞ্চিত জ্ঞানেতেও সমগ্র মানবজাতির সমান উত্তরাধিকার। সকল সত্যের মত, বৈদিক সত্যও সে ঈশ্বরেরই, একা ভারতবর্ষের নয়। মহাঋষিগণ, যা'দের মন বৈদিক দিব্যজ্ঞানের গভীরভাব ধারণ করবার নিশ্চল ও পবিত্র আধার, তাঁ'রা সমগ্র মানবজাতির সেবার জ্ঞান—অজ্ঞ কোন জগতে নয়, এই পৃথিবীতেই জাত মানবজাতির এক শাখা ছিলেন। সত্যের রাজ্যে জাতি বা রাষ্ট্রের মধ্যে ভেদজ্ঞান একেবারেই নিরর্থক; সেখানে একমাত্র গ্রহণযোগ্য গুণ হ'চ্ছে আধ্যাত্মিক উপযোগিতা।

ঈশ্বরই প্রেম,—তাঁ'র সৃষ্টির পরিকল্পনার মূল হ'চ্ছে একমাত্র প্রেম। এই অত্যন্ত সরলভাব,—যা' যে কোন বিরাট পাণ্ডিত্যপূর্ণ বিশ্বতত্ত্বের মহাগ্রন্থের

* বাইবেল—সামু ৪৬-১০।

† ঈশ্বর তাঁ'র কার্যের সূচনায়, তাঁ'র সৃষ্টির প্রারম্ভেই আমার মধ্যে আবির্ভূত হয়েছিলেন। শাশ্বত, সৃষ্টির আদি এবং পৃথিবীর জন্মের বহু পূর্বে হ'তেই আমার সৃষ্টি হয়েছিল।

বাইবেল—প্রবাদ ৮ : ২২-২৩।

চেয়েও ঢের ঢের বেশী বড়, তা' কি মানবহৃদয়ে কোনরূপ আশ্বাস প্রদান করে না? প্রত্যেক সাধকই, যিনি সংবস্তুর ভাব গভীরভাবে গ্রহণ করতে পেরেছেন—তিনিই এই মহাসত্য প্রচার ক'রে গেছেন যে, একটি দৈব বিশ্বপরিকল্পনা বর্তমান, আর তা' হচ্ছে পরম সুন্দর আর অসীম আনন্দময়।

ধর্মোপদেষ্টা ইশায়েকে ঈশ্বর তাঁ'র অভিপ্রায় এই ক'টি কথায় ব্যক্ত ক'রেছিলেন,—

“আমার মুখ হ'তে নির্গত আমার বাণী (সৃষ্টির মূল—প্রণববাঙ্কার) এইরূপই হ'বে, এ নিষ্ফল হ'য়ে আমার কাছে ফিরে আসবে না, কিন্তু আমি যা' ইচ্ছা করি সে তা'ই সাধন ক'রবে—আর আমি তা' যে বিষয়েই প্রেরণ ক'রে থাকি না কেন, তা'র উন্নতিই হ'বে। কারণ তুমি আনন্দেতে বিকশিত হ'বে এবং শান্তিতে নবজীবন লাভ ক'রবে। পাহাড়পর্বত হ'তে তোমার সম্মুখে গীতধ্বনি উথিত হ'বে এবং প্রান্তরের বৃক্ষসকল করতালি দেবে।”

“আনন্দেতে জীবন লাভ ক'রে শান্তিতে জীবনের সূচনা হ'বে।” এই বিংশশতাব্দীতে দুঃখযন্ত্রণাক্লিষ্ট মানব এই অপূর্ব প্রতিজ্ঞা কত না আগ্রহের সঙ্গে শ্রবণ করে! তবুও এর পরিপূর্ণ সত্যই সেই সব ঈশ্বরভক্তরা উপলব্ধি করতে পারেন, যাঁরা তাঁ'দের দৈব উত্তরাধিকার পুনঃপ্রাপ্তির জন্য সাহস ও অধ্যবসায়ের সঙ্গেই চেষ্টা করেন।

ঈশ্বরের আশীর্বাদপূত “ক্রিয়াযোগের” কার্য পূর্ব ও পশ্চিমে সবে মাত্র আরম্ভ হ'য়েছে বলা যায়, তা'র বেশী আর কিছু হয় নি। সকল মানুষেই জানুক যে মানবজাতির সকল দুঃখদুর্দশা অতিক্রম ক'রবার জন্যে আত্মোপলব্ধির এক সুনির্দিষ্ট বৈজ্ঞানিক পন্থা বর্তমান আছে।

উজ্জ্বল মণিমুক্তার মত পৃথিবীর চতুর্দিকে বিকশিত সহস্র সহস্র ক্রিয়া-যোগীদের নিকট প্রেমের তরঙ্গ প্রেরণ করবার সময় আমি প্রায়ই সক্রতজ্জচিত্তে ভাবি,—

“প্রভু, তুমি এই সন্ন্যাসীটিকে কত বড় সংসারই না দিয়েছ।”

(শ্রীশ্রীকৃষ্ণার্ণবমস্ত)।

স্মৃতি-তর্পণ

১৯৪৮ সালের ৩০শে জানুয়ারী মহাত্মা গান্ধী নতুন দিল্লীতে নিহত হ'লে ভারতের প্রধান মন্ত্রী নিম্নলিখিত কথাগুলি বলেন,—

“তিনি ছিলেন প্রকৃতপক্ষে জাতির পিতা আর এক উন্নত মানব তাঁকে হত্যা করেছে। কোটিকোটি নরনারী আজ তাঁর জন্ত গভীর শোক করেছে কারণ দীপ আজ নির্বাপিত ... যে আলোক এই ভূমিতে দীপ্তি প্রকাশ ক'রছিল, তা' সাধারণ আলো ছিল না। সেই অনির্বাক্য আলোকদীপ্তি সহস্র বৎসর ধ'রে এই দেশে বিকশিত হ'য়ে থাকবে আর সমগ্র জগৎও তা' দেখবে।”

মাত্র পাঁচমাস আগে ভারতবর্ষ শান্তিপূর্ণ উপায়ে দেশের রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা লাভ করে। ৭৮বৎসর বয়স্ক গান্ধীজীর জীবনের কাবের পরিসমাপ্তি; তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে তাঁর দিন ফুরিয়ে এসেছে। দুর্ঘটনার দিন প্রাতঃকালে তিনি তাঁর নাটনীকে ডেকে বললেন, “আভা, জরুরী কাগজপত্র সব এখনি নিয়ে এস, আমাকে আজকেই সব উত্তর দিতে হবে। কালকের দিন হয় ত' কখন না'ও আসতে পারে।”

উপবাসক্লিষ্ট দুর্বলদেহে উপযুপরি তিনবার গুলি বিন্ধ হ'য়ে মরণোন্মুখ মহাত্মা গান্ধী যখন ধীরে ধীরে মাটির উপর শুয়ে পড়লেন, তখন অন্তিমশয়নে শায়িত হ'য়ে হাত তুলে তিনি আততায়ীকে ক্ষমা ক'রেই চলে গেলেন। তাঁর নিঃস্বার্থ জীবনের সকলপ্রকার আত্মত্যাগই তাঁর চরমমুহুর্তে সেই প্রেমের অভিব্যক্তি সম্ভবপর ক'রে তুলেছিল।

মহাত্মা গান্ধীর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনে এলবার্ট আইনষ্টাইন লিখেছেন, “হ'তে পারে যে ভবিষ্যতে বহুগুণ ধ'রে লোকেরা হয়ত কদাচিত্ একথা বিশ্বাস ক'রবে যে এরূপ একজন লোক রক্ত মাংসের শরীর ধারণ ক'রে এই পৃথিবীর মাটির উপরই বিচরণ ক'রত।” রোমে পোপের রাজ-প্রাসাদ ভ্যাটিক্যান হ'তে প্রেরিত সংবাদে উল্লিখিত, “এই যুগ্য গুপ্তহত্যা এখানে গভীর শোকের সৃষ্টি করেছে; খ্রীষ্টীয় গুণাবলীর মূর্ত প্রকাশের দেবতাহিসেবে গান্ধীর জন্ত লোকে শোক প্রকাশ করেছে।”

কোন বিশিষ্ট সত্বদেহশাসাধনের জন্ত যে সকল মহৎ ব্যক্তি এই পৃথিবীতে আগমন করেন. তাঁদের সকলেরই জীবন অর্থপূর্ণ ইঙ্গিত ও নানা সম্ভাবনায় পূর্ণ। ভারতীয় ঐক্যসাধনে গান্ধীজীর নাটকীয় মৃত্যু দ্বন্দ্ববিরোধ বিবাদবিসম্বাদবিচ্ছিন্ন পৃথিবীর সকল দেশের চক্ষে তাঁর বাণী উজ্জলরূপে ফুটে উঠেছে। সেই বাণী তিনি ভবিষ্যতের ইঙ্গিতময় নিম্নলিখিত কথাগুলিতে প্রকাশিত করেছেন:—

“জনসাধারণের মধ্যে অহিংসনীতি বিস্তার লাভ করেছে আর এ স্থায়িত্ব লাভ করবে। পৃথিবীতে শান্তি আনবার এ হচ্ছে অগ্রদূত।”

পরিশিষ্ট

[নিম্নলিখিত পাদটিকাগুলি যথাস্থানে সন্নিবেশিত না
হওয়ায় পরিশিষ্টে দেওয়া গেল।]

পৃ: ২৪—পং ২০।—কবচটি অলৌকিক উপায়ে প্রস্তুত হয়েছিল। ক্ষণস্থায়ী পদার্থে গঠিত এরূপ দ্রব্যসকল আমাদের এ পৃথিবী হ'তে শেব পর্য্যন্ত অদৃশ্যই হয়ে যায়। (৪৩ পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)।

কবচটির উপর কতকগুলি মন্ত্র খোদিত ছিল। শব্দ এবং বাক্য অর্থাৎ মানব কণ্ঠস্বরের শক্তি সম্বন্ধে ভারতবর্ষে যেমন গভীর পাণ্ডিত্যপূর্ণ গবেষণা হয়েছিল, এমন আর কোথাও হয় নি। মহাবিশ্বের মধ্যে নিয়ত বাক্ত প্রণবন্ধনির (বাইবেলের বাক্য অথবা বহু সমুদ্রের গর্জ্জন) মধ্যে সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় এই তিনগুণের প্রকাশ (তৈত্তিরীয় উপনিষদ ১:৮)। মানবের প্রত্যেকবার শব্দ উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে প্রণবন্ধনির এই তিনটি গুণের একটি ক্রিয়া প্রকাশ করে। মানুষ যে সর্বদা সত্যকথা বলবে, সকল শাস্ত্রবিধির এই হ'চ্ছে শ্রায়সঙ্গত কারণ।

কবচের উপর খোদিত সংস্কৃত মন্ত্র, শুদ্ধরূপে উচ্চারিত হ'লে আধ্যাত্মিক শুভ শক্তিবিশিষ্ট হয়। পঞ্চাশটি বর্ণের আদর্শ সংস্কৃত বর্ণমালার প্রত্যেকটি বর্ণের একটি ক'রে নির্দিষ্ট উচ্চারণ আছে। ল্যাটিন উদ্ভূত ইংরেজি বর্ণমালা, যা'তে ছাব্বিশটি অক্ষরের শব্দভার বহনের নিষ্ফল চেষ্টা দেখা যায়, তা'র শব্দগত দৈত্বের উপর জর্জ বার্ণার্ড শ একটি সরস ও সূচিস্তিত প্রবন্ধ লিখেছিলেন। মি: শ তাঁ'র অভ্যস্ত নিঃস্বপ্ন পরিহাসের সঙ্গে (“ইংরেজি ভাষার জন্ম একটি ইংরেজি বর্ণমালার প্রচলনে যদি গৃহবিবাদ স্ক্র হয় ... তা'হ'লেও আমার কিছুমাত্র দুঃখ নাই”) বলেন যে বিয়াল্লিশ বর্ণের একটি বর্ণমালা গ্রহণ করা উচিত (নিউইয়র্ক, ফিলসফিক্যাল লাইব্রেরী হ'তে প্রকাশিত উইলসন সাহেব লিখিত “দি মির্যাকিউলাস্ বার্থ অফ্ ল্যাঙ্গোয়েজ্” নামক পুস্তকে তাঁ'র লেখা মুখবন্ধ দ্রষ্টব্য)। এরূপ একটি বর্ণমালা সংস্কৃতের স্বরসম্পূর্ণতার কাছাকাছি পৌঁছতে পারে—যা'র পঞ্চাশটি বিভিন্ন বর্ণে ভুল উচ্চারণের কোন সম্ভাবনা নাই।

সিদ্ধ উপত্যকায় কয়েকটি শীলমোহর আবিষ্কারে কয়েকজন পণ্ডিত, ভারতবর্ষ যে তা'র সংস্কৃত বর্ণমালা সেমিটিক মূল থেকে “ঋণ গ্রহণ”

করেছে, বর্তমানে প্রচলিত এই মতবাদ পরিত্যাগে উদ্বৃত্ত হয়েছেন। মহেঞ্জো-দাডো ও হারাপ্পার কাছে কয়েকটি দিরাট হিন্দুনগর আবিষ্কৃত হওয়াতে এমন একটি সুপ্রাচীন সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রমাণ পাওয়া গেছে, যা'র “ভারতভূমিতে এমন একটি সুদীর্ঘ ও প্রাচীন ইতিহাস ছিল যা'র আমাদের সেই যুগে পৌঁছে দেয়, যে যুগের বিষয় কেবল ক্ষীণভাবে অনুমান করা যেতে পারে মাত্র।” (সার জন্ নাশাল রূত মহেঞ্জো-দাডো ও সিন্ধু সভ্যতা, ১৯৩১)।

এই পৃথিবীতে মানবজাতির সভ্যতার নিরতিশয় সুপ্রাচীনত্ব সম্বন্ধে যদি ভারতীয় মতবাদ সত্য ব'লে গৃহীত হয়, তা' হ'লে পৃথিবীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রাচীন ভাষা সংস্কৃত সর্বান্নসুন্দরও কেন, তা' ব্যাখ্যা করা সম্ভবপর হয়। (১০৬ পৃঃ—১৩ পং পাদটিকা দ্রষ্টব্য)। এসিয়াটিক সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা, সার উইলিয়াম্ জোন্স বলেন, “সংস্কৃতভাষার প্রাচীনত্ব যা'ই হো'ক না কেন এর গঠন অতি অদ্ভুত,—গ্রীকভাষা অপেক্ষা অধিকতর উন্নত, ল্যাটিন অপেক্ষা প্রচুরতর আর উভয়ের অপেক্ষা অতি উচ্চতররূপে মার্জিত।”

এন্সাইক্লোপিডিয়া এমেরিকানাতে লিখিত আছে, সর্বোচ্চ শিক্ষা ও সভ্যতার পুনরুজ্জীবনে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে (প্রতীচ্য-পণ্ডিতগণের দ্বারা) সংস্কৃতভাষার পুনরাবিষ্কারের মত এত বড় একটা ঘটনা কৃষ্টি ও সংস্কৃতির ইতিহাসে আর দেখা যায় নি। ভাষাবিজ্ঞান, তুলনামূলক ব্যাকরণ অথবা পুরাণতত্ত্ব, ধর্মবিজ্ঞান.... হয় তা'দের সম্পূর্ণ অস্তিত্বই সংস্কৃতভাষার পুনরাবিষ্কারের উপর নির্ভর করে অথবা এর চর্চার দ্বারা তা'রা গভীরভাবে প্রভাবান্বিত হয়েছিল।”

পৃঃ ৩১—পং ১৯।—ব্রহ্মা বৃহ ধাতু (বিস্তার ক্ত) হ'তে উৎপন্ন; সৃষ্টিকর্তারূপে ঈশ্বরের প্রকাশ। ১৮৫৭ সালে যখন অ্যাটলান্টিক মছলী নামক পত্রিকায় ইমাস'নের “ব্রহ্ম” নামক কবিতাটি প্রকাশিত হয়, তখন অধিকাংশ পাঠকই ইতবুদ্ধি হয়ে পড়েছিলেন। ইমাস'ন একটু হেসে ব'লেছিলেন, “ওদের ‘ব্রহ্ম’র বদলে ‘জিহোভা’ ব'লতে ব'ল, তা'হলেই আর বুঝতে কিছুমাত্র গোল হ'বে না।”

পৃঃ ৩২এর পাদটিকার পর পঠিতব্য—আমাদের সাক্ষাতের সময় প্রণবানন্দজী প্রকৃতই পূর্ণজ্ঞানী সৎগুরুর পদ লাভ করেছিলেন। কিন্তু তাঁ'র কর্মজীবনের অবসান বহুবছর পূর্বেই ঘটেছিল, তখনও তিনি নির্বিকল্প সমাধিতে (৫১২ পৃষ্ঠার পাদটিকা দ্রষ্টব্য) স্থিরাবস্থা লাভ করতে পারেন নি। জ্ঞানের এই পরিপূর্ণ আর নিশ্চল অবস্থায় থেকে যোগীর কোন সাংসারিক কর্তব্যপালনে কিছুমাত্র অন্ত্রবিধা হয় না।

পতঞ্জলির যোগসূত্রে (২৮৪ পৃঃ পাদটিকা দ্রষ্টব্য) একাধিক দেহে

আবিভূত হওয়া “সিদ্ধি” ব’লে উল্লিখিত হয়েছে। একই সময়ে চুইদেহে আবির্ভাবের ঘটনা যুগে যুগে বহু সাধুসন্তদের জীবনেই প্রদর্শিত হয়েছে। “দি ষ্টোরি অফ্ থেরেসা নিউম্যান (ক্রিস্ পাবলিশিং কোং কর্তৃক প্রকাশিত) নামক পুস্তকে এ, পি শিয়ার্গ এই সমসাময়িক মহিয়সী খৃষ্টান সাক্ষীটির সাহায্যপ্রার্থী দূরস্থিত ব্যক্তিদের সম্মুখে আবিভূত হ’য়ে তা’দের সঙ্গে তাঁ’র কথাবার্তা কওয়ার কতকগুলি ঘটনার বিবরণ প্রদান করেছেন।

পৃ: ৫১—পং ৯।—অহঙ্কার হ’চ্ছে দ্বৈতবাদ অর্থাৎ মানব ও তা’র স্রষ্টার মধ্যে আপাতদৃষ্টিতে বিভেদের মূল কারণ। অহঙ্কার হ’তেই মায়ার উৎপত্তি, যা’তে ক’রে বিষয়ই বস্তু ব’লে মিথ্যা উপলব্ধি হয়। সৃষ্টজীবেরা নিজেদের স্রষ্টারূপে কল্পনা করে। (পৃ: ৫৩—পং ৯এর পাদটিকা, এবং পৃ: ৩২৬-৮ ও পৃ: ৩৩৯ এর শেষাংশের পাদটিকা দ্রষ্টব্য)।

| | | |
|------------------|---------------|-----------|
| শ্রীমদ্ভগবদগীতা— | ৫ম অধ্যায়— | ৮-৯ শ্লোক |
| ঐ | ১৩শ অধ্যায়— | ২৯ শ্লোক |
| ঐ | ৪র্থ অধ্যায়— | ৬ শ্লোক |
| ঐ | ৭ম অধ্যায়— | ১৪ শ্লোক |

পৃ: ৫৩—পং ৯।—মায়ী (মা. পরিমাণ করা + যন + আপ্)। মায়ী হচ্ছে সৃষ্টির, মধ্যে এক অলৌকিক শক্তির প্রকাশ যা’তে ক’রে অখণ্ড ও অবিভাজ্য ভাবের মধ্যে খণ্ডিত ও ভেদভাব পরিলক্ষিত হয়।

ইমার্শন “মায়ী” নামে নিম্নলিখিত কবিতাটি রচনা করেছিলেন :—

“অভেদ মায়ার লীলা ব্যাপ্ত সর্বকালে,
বয়ন করিয়া চলে সংখ্যাভীত জালে,
মানসমোহন দৃশ্য নানা মায়ীছবি,
একের উপরে আসি’ ঢাকা দেয় সবি,
মায়াবীরে সেইজন সত্য বলি’ মানে,
যেজন বঞ্চিত হ’তে চায় মনেপ্রাণে।”

পৃ: ৬১—পং ১২।—প্রতীচ্য মনস্তত্ত্ববিদগণের জ্ঞানসম্বন্ধে গবেষণা হচ্ছে প্রধানতঃ মনের অবচেতন স্তরের এবং যে সব মানসিক ব্যাধি মনোবিকলন এবং মানসিক চিকিৎসার দ্বারা চিকিৎসিত হয়। স্বাভাবিক মানসিক অবস্থা এবং তা’দের ভাব বা ইচ্ছাময় প্রকাশের আদি এবং মৌলিক প্রকৃতি সম্বন্ধে অতি অল্পই গবেষণা হয়েছে—আর সত্যই এ একটা মূল বিষয় যা’ ভারতীয় দর্শনেতে উপেক্ষিত হয় নি। সাংখ্য এবং যোগদর্শনে স্বাভাবিক মানসিক পরিণতির বিভিন্ন সংযোগ এবং বুদ্ধি, অহঙ্কার এবং মনের ক্রিয়াবৈশিষ্ট্যের সঠিক শ্রেণী বিভাগ করা হয়েছে।

পৃ: ৬১—পং ১৪।—এই নিখিল বিশ্ব, এর প্রতি অল্পপরিমাণে প্রতিবিম্বিত। প্রত্যেক জিনিষই মূলে একটি মাত্র অদৃশ্য বস্তুতে নিম্নিত। এক বিন্দু শিশিরকণায় এই বিশ্বের গোলাকৃতি প্রতিভাত। সর্বব্যাপিত্ব-বাদের প্রকৃত সত্য হচ্ছে ঈশ্বর তাঁর সকল কিছু অংশ নিয়ে প্রত্যেক শৈবালখণ্ডে এবং উৎপত্তির মধ্যে প্রকাশিত।—ইমার্সনরূত “কম্পেসেন্সন”।

পৃ: ৬১—পং ২৫।—“হাতে কায় করি, মুখে বলি হরি”—এর আদর্শ হচ্ছে সংসারের কর্মে লিপ্ত থাকার সময় মনও যেন সর্বদা ভগবচ্ছিত্তায় রত থাকে। কতকগুলি প্রতীচ্যদেশীয় লেখক এই প্রমাণ করতে চান যে হিন্দু জীবনাদর্শ হচ্ছে নৈষ্কর্ম্য আর একটা অসামাজিক “হাতপা শুটান ভাব”। মানবজীবনকে বৈদিক প্রথায় চারিভাগে বিভক্ত করাটা জনসাধারণের পক্ষে অতি সূষ্ট ব্যবস্থা; অর্ধেক বিদ্বার্জন এবং গার্হস্থ্য ধর্মপালন এবং বাকী অর্ধেক জপতপাদি ধ্যানধারণায় নিয়োগ করা (পৃ: ৩০৩—পং ২৭এর পাদটিকা দ্রষ্টব্য)।

আত্মজ্ঞান লাভ করবার জন্ত অবশ্য নির্জনতার প্রয়োজন হয় বই কি, কিন্তু ধর্মগুরুগণ আবার এই সংসারের কাষেই ফিরে আসেন—লোকসেবার জন্ত। এমন কি সাধুসন্তরা যাঁরা বাইরের কাষে কোন আত্মনিয়োগ করেন না, তাঁরা তাঁদের চিন্তা এবং পূণ্যপ্রেরণা দ্বারা পৃথিবীতে এরূপ অমূল্য হিতৈষণা দান করেন যা অজ্ঞানী লোকেদের অতি শ্রমসাধ্য জনহিতকর কার্যের দ্বারাও সম্ভবপর নয়। বড় বড় মহাপুরুষগণ তাঁরা নিজ নিজ পন্থায় আর প্রায়ই অতি প্রতিকূল অবস্থার ভিতর দিয়ে তাঁদের অনুগামীদের উদ্ধার এবং উন্নত করবার জন্তে নিঃস্বার্থভাবে চেষ্টা করেন। কোন হিন্দুর ধর্ম বা সামাজিক আদর্শ নেতিবাচক নয়। অহিংসা অর্থাৎ ক্ষতি পরিহার, মহাভারতে “সকলো ধর্ম” বলে অভিহিত হয়েছে—আর তা’ ভাবার্থে স্পষ্টই ধর্মের অনুশাসন বোঝায় এই কারণে যে অপরাপরকে যে না সাহায্য ক’রে, সে তা’দের কোন না কোন উপায়ে ক্ষতিই করে।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার ৩য় অধ্যায়ের ৪-৮ শ্লোকে কশ্ম শীলতা! মানবপ্রকৃতির সহজ ধর্ম বলে বর্ণিত হয়েছে। কশ্মশৈথিল্য হচ্ছে কেবলমাত্র গুণ “অপকশ্মতা”।

পৃ: ৭৭—পং ১৯।—প্রতীচ্যে ফরাসী অধ্যাপকগণ সর্বপ্রথম অতীন্দ্রিয় মনের সম্ভাবনার বিষয়ে বৈজ্ঞানিক গবেষণার জন্ত আগ্রহশীল হ’ন। ল্যোকোল্ গু সাইকোলজি অফ্ দি সরবোন্স এর মেম্বর, প্রফেসর জুলে-বোয়া ১৯২৮ সালে আমেরিকায় এক বক্তৃতা প্রদান করেছিলেন; তা’তে তিনি তাঁর শ্রোতৃবর্গকে বলেছিলেন যে ফরাসী বৈজ্ঞানিকগণ অতীন্দ্রিয় জ্ঞানের

অস্তিত্বের বিষয় স্বীকার ক'রে নিয়েছেন, “যা’ হ’চ্ছে ক্রয়েডের অবচেতন মনের সম্পূর্ণ বিপরীত এবং যে বৃত্তি মানুষকে প্রকৃতই মানুষ ক’রে তোলে—অতীজ্ঞ নয়। ম’সিয়ে জুলে-বোয়া বর্ণনা করেছিলেন যে, উচ্চতর জ্ঞানের উন্মেষ সম্বন্ধে “ক্যুরিজম্ অথবা হিপ্নটিজম্‌এর সঙ্গে ভুল করা উচিত নয়। দার্শনিকভাবে অতীন্দ্রিয় মনের অস্তিত্ব বহুকাল ধ’রেই স্বীকৃত হয়েছে, বস্তুতঃ যা’ হ’চ্ছে ইমার্শনকথিত পরমাত্মা কিন্তু তা’ কেবলমাত্র বর্তমানেই বৈজ্ঞানিকভাবে স্বীকৃত হয়েছে।” ফরাসী বৈজ্ঞানিকটি দেখিয়েছেন যে এই অতীন্দ্রিয় জ্ঞান (তুরীয়াবস্থা) থেকেই আসে প্রেরণা, আসে প্রতিভা, নৈতিক গুণাবলী। “এ ব্যাপারে বিশ্বাস কোন অলৌকিকত্ব নয়, যদিও গিষ্টিকেরা যে সব গুণের কথা প্রচার করে, তা’ সমস্তই এ স্বীকার করে।”

পৃ: ৮৩—পং ৯।—তাঁ’র পূর্ণনাম ছিল খ্রীশ্রীনাগেন্দ্রনাথ ভাদুড়ী মহাশয়।

খৃষ্টীয়ান জগতে “লখিমাসিদ্ধ” সাধুগণের মধ্যে সপ্তদশ শতাব্দীর কিউপার্টিনোর সেন্ট জোসেফের নাম উল্লেখযোগ্য। তাঁ’র অলৌকিক ক্রিয়াকলাপের বিষয়ে বহু প্রত্যক্ষদর্শীর প্রচুর সাক্ষ্য আছে। সেন্ট জোসেফের একপ্রকার পার্থিব অগ্ন্যম্নস্কতা দেখা যেত, যা’ হ’চ্ছে প্রকৃতপক্ষে দিব্যশ্রুতি ছাড়া আর কিছুই নয়। মঠের সন্ন্যাসীভ্রাতাগণ তাঁ’কে কখনও আহাৰ্য্য পরিবেশন ক’রতে দিতেন না, পাছে তিনি বাসনপত্র প্রভৃতি নিয়ে ধরের ছাদে গিয়ে ঠেকেন। সেন্ট জোসেফের একটা অদ্ভুত দোষ ছিল যে, তিনি সংসারের কোন কাষ করতে সমর্থ ছিলেন না, কারণ তিনি মাটির উপর অধিক্ষণ অবস্থান করতে পারতেন না। কোন সাধুর পবিত্র প্রস্তুতমূর্ত্তি দর্শনমাত্রেই সোজাসুজি তাঁ’র উর্দ্ধপথে গমন শুরু হত; আর দেখা যেত যে সেই দুইটি সাধু—একটি প্রস্তুতনির্দ্ভিত আর অপরটি রক্তমাংসের শরীরবিশিষ্ট, উভয়ে চক্রাকারে শূন্যপথে পরিভ্রমণ করছেন।

উচ্চ আধ্যাত্মিকশক্তিসম্পন্ন আভিলার সেন্ট থেরেসার কায়িক উর্দ্ধগতি, তাঁ’র মানসিক ভাববিপর্যয়ের সূচনা ক’রত। সংগঠনকার্যের গুরুতর দায়িত্বভারপ্রাপ্ত হ’য়ে তিনি তাঁ’র কায়িক উর্দ্ধগতি নিবারণের জন্য বৃথাই চেষ্টা করেছিলেন। তিনি লিখেছিলেন, “প্রভু যদি চান যে এ হ’বেই, তবে সামান্য সামান্য সতর্কতা সব বৃথাই হয়ে যায়।” স্পেনদেশস্থিত এলবায় অবস্থিত এক গির্জায় রক্ষিত সেন্ট থেরেসার শবদেহ পুষ্পসুবভিবেষ্টিত হ’য়ে চারশত বৎসর ধ’রে অবিকৃত আছে। স্থানটিতে বহু অলৌকিক ঘটনাও দৃষ্ট হয়েছে।

পৃ: ৯৪—পং ১৫।—রবীন্দ্রনাথের কবিতায় উল্লিখিত “সামমন্ত্র” চতুর্বেদের মধ্যে একটি। অপর তিনটি হচ্ছে ঋক্, যজুঃ আর অথর্ক। হিন্দুদের

এই ধর্মশাস্ত্রে ব্রহ্মের সত্ত্বাভাব—স্রষ্টারূপে ঈশ্বর, যিনি মানবদেহে জীবাত্মারূপে প্রকাশিত, তাঁর স্বরূপ বর্ণিত হয়েছে। ব্রহ্ম শব্দ বৃহৎ হ'তে উৎপন্ন মানে বিস্তার করা, বৈদিক অর্থে এর মানে হচ্ছে ঐশ্বরিক শক্তির স্বতঃপ্রসারণ অথবা সৃষ্টিক্রিয়াশীলতায় সম্প্রসারণ। বেদের সম্পূর্ণ অর্থ হ'চ্ছে পরব্রহ্মের সঙ্গে আত্মার সজ্ঞান মিলন।

বেদের সংক্ষিপ্ত সার বেদান্ত বড় বড় পাশ্চাত্য মনীষীদের অনুপ্রাণিত করেছে। ফরাসী ঐতিহাসিক, ভিক্টর কুজ'্যা বলেছেন, “যখন আমরা প্রাচ্যের—সর্বোপরি ভারতবর্ষের দার্শনিক গরিমার বিষয় মনোযোগ সহকারে পাঠ করি, তখন আমরা দেখতে পাই যে, সেখানে এমন সব গভীর সত্য আছে যে, যা'র পরিচয়ে আমরা প্রাচ্যদর্শনের সমুখে নতজানু হতে বাধ্য হই আর দেখি যে মানবজাতির এই ক্রোড়েতেই সর্বোচ্চ দর্শনের জন্মভূমি। প্লাগেল মন্তব্য করেছেন যে, “এমন কি ইউরোপের সর্বোচ্চ দর্শন গ্রীক দার্শনিকদের দ্বারা প্রচারিত বুদ্ধির আদর্শবাদ, প্রাচ্যের আদর্শবাদের প্রাণপ্রাচুর্য আর শক্তির তুলনায় মনে হয়, যেন মধ্যযুগ মার্ত্তণ্ডের প্রচণ্ড সূর্যালোকের বত্মাপ্রবাহের কাছে প্রমিথিয়ুস কর্তৃক আনীত অগ্নির একটি ক্ষীণ ফুলিঙ্গমাত্র।”

ভারতবর্ষের বিরাট সাহিত্যে বেদসকল (বিদ্যাত্মক অর্থে জানা) হচ্ছে এমন সব মূল রচনা, যা'তে কোন রচয়িতার নাম আরোপ করা যায় না। ঋগ্বেদে (১০, ৯০, ৯) মন্ত্বের উৎপত্তি অপৌরুষেয় ব'লে নির্দিষ্ট হয়েছে। ঋগ্বেদ বলে (৩, ৩৯, ২) যে তা'রা অতি প্রাচীনকাল থেকে প্রচলিত হয়ে এসে নতুন ভাষার আচ্ছাদনে পুনরাচ্ছাদিত হয়েছে। সত্যদ্রষ্টা ঋষিদের নিকট যুগেযুগে বেদসকল “নিত্যত্ব” অর্জন করেছে।

বেদসকল শ্রুতি ব'লে পরিচিত—ঋষিরা যা' শুনে শুনে মনে রাখতেন। মূলতঃ এ উচ্চারণ ও আবৃত্তির সাহিত্য। অতএব যুগযুগান্ত ধ'রে বেদের এক লক্ষ শ্লোক লিখিত হয়ে রক্ষিত হয় নি, ব্রাহ্মণদের দ্বারা মুখে মুখেই চলে এসেছে। প্রস্তর কিম্বা কাগজ উভয়েই কালের নিশিচ্ছকারী প্রভাবের অধীন। বেদ যে লোপ না পেয়ে যুগে যুগে রক্ষিত হয়ে এসেছে, তা'র কারণ ঋষিরা বুঝেছিলেন যে এর উপযুক্ত প্রচলনের পক্ষে জড়পদার্থের চেয়ে মন অধিকতর উপযোগী। “মানসপটে” যা' লিখিত থাকে, তা'র চেয়ে শ্রেষ্ঠ উপাদান আর কি হ'তে পারে?

“অনুপূর্বী, যা'তে বৈদিক শব্দসকল পাওয়া যায় তা' সংরক্ষণ ক'রে, সন্ধিপ্রকরণাদির শব্দবিজ্ঞানের নিয়মাবলীর সাহায্যে, বর্ণশুদ্ধি, সুর-স্বর, উদাত্ত-অনুদাত্ত স্বরিত-চিহ্নাদি প্রাচীন পন্থাবলম্বনে, বহু প্রাচীনকাল থেকেই ব্রাহ্মণগণ বেদের আদিম বিশুদ্ধতা অতি অপূর্ব উপায়ে সংরক্ষণ ক'রে এসেছেন। (৪০৮ পৃষ্ঠার পাদটিকা দ্রষ্টব্য)।

পৃ: ১১৬—পং ২৭।—শঙ্করাচার্য্য গত দুই হাজার বৎসরের মধ্যে ভারতবর্ষের সর্বশ্রেষ্ঠ দার্শনিক বলে প্রখ্যাত। তিনি গোবিন্দধর্মী এবং তদীয় গুরু গোড়পাদের শিষ্য ছিলেন। গোড়পাদরূত মাণ্ড্যকারিকার একটি স্মৃতিখ্যাত টিকাও তিনি রচনা করেছিলেন। শঙ্করাচার্য্য, তাঁ'র অকাট্য জ্ঞান এবং অপূর্ব প্রসাদগুণের সহিত বিশুদ্ধ অদ্বৈতভাবে বেদের ব্যাখ্যা করেছিলেন। অদ্বৈতবাদী শঙ্কর ভক্তিভাবের কবিতাও রচনা করেছিলেন। তাঁ'র “দেব্যপরাধ ক্ষমাপন” স্তোত্রের ধূম ছিল, “কুপ্তো জায়েত কচিদপি কুমাতা ন ভবতি”।

অতঃপর ৩৯০ ও ৩৯১ পৃষ্ঠার পাদটিকা দ্রষ্টব্য।

শঙ্করাচার্য্য একাধারে ছিলেন অদ্বিতীয় পণ্ডিত, সন্ন্যাসী ও কস্মী। মাত্র বত্রিশবৎসর তিনি জীবিত ছিলেন, কিন্তু তিনি এই স্বল্পপরিসর জীবনকালের মধ্যেই ভারতের নানাস্থানে কষ্টসাধ্য পরিব্রাজনে তাঁ'র অদ্বৈততত্ত্বের প্রচারে তিনি বহুবৎসর ব্যয় করেন। সেই নগ্নপদ নবীন সন্ন্যাসীর অধরনিঃসৃত শাস্তিপ্রদ জ্ঞানোপদেশাবলী শ্রবণের জন্ত লক্ষ লক্ষ লোক সাগ্রহে তাঁ'র নিকট সমবেত হ'তেন।

শঙ্করাচার্য্যের ধর্মসংস্কার কার্যের মধ্যে হচ্ছে প্রাচীন অদ্বৈতবাদী স্বামীসম্প্রদায়ের পুনর্বিজ্ঞাস (পৃ: ২৭৯—পং ১২২ পাদটিকা দ্রষ্টব্য)। তিনি ভারতের চারিটি স্থানে চারিটি মঠ স্থাপনা ক'রে গেছেন। দক্ষিণে মহীশূরে, পূর্বে পুরীধামে, পশ্চিমে দ্বারকায় এবং উত্তরে বদরীনাথে। মহীশূরের শৃঙ্গেরি মঠের খ্যাতি আজও অক্ষুণ্ণ; শঙ্করাচার্য্য উপাধি লাভ ক'রে যিনি এর অধ্যক্ষ হ'ন, তিনি রোমের হোলি ফাদারের মতন আধ্যাত্মিক পদমর্যাদা লাভ করেন।

জগদ্বিখ্যাত এই অদ্বৈতবাদী প্রতিষ্ঠিত এবং জনসাধারণ ও রাজত্ববর্গের অকুণ্ঠদানে পরিপুষ্ট এই মঠচতুষ্টয়ে সংস্কৃত, ব্যাকরণ, তর্কশাস্ত্র, এবং বেদান্তদর্শন সম্বন্ধে বিনামূল্যে শিক্ষাপ্রদান করা হয়। ভারতবর্ষের চারি কোণে চারিটি মঠের প্রতিষ্ঠায় শঙ্করাচার্য্যের উদ্দেশ্য ছিল এই সুবিশাল ভারতভূমির সর্বত্র ধর্ম ও জাতীয়তাবের উন্নয়ন। অতীতে যেমন, বর্তমানেও তেমনি ধর্মপ্রাণ হিন্দুগণ বদান্তব্যক্তিবর্গের সাহায্যপুষ্ট চৌপট্টী এবং সত্রম্ণ বিনামূল্যে আহার ও বাসস্থান পেয়ে থাকেন।

পৃ: ১৪৫—পং ২৬।—“অতএব আমি সত্য ক'রেই বলছি যে, যা' কিছু তুমি ইচ্ছা কর প্রার্থনাকালে যদি সত্যসত্যই বিশ্বাস কর যে, যা' কিছু বলবে তা'ই ঘটবে, তবে তোমার জন্ত সে সবই ঘটবে।” (বাইবেল—মার্ক ১১ : ২৪)। মহাশূরগণ যা'রা দিব্যদৃষ্টি লাভ করেছেন, লাহিড়ী-মহাশয় যেমন এক্ষেত্রে শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজীকে দিয়েছিলেন, তেমনি তাঁ'রা তাঁ'দের দিব্যানুভূতি তাঁ'দের উন্নত শিষ্যদিগকেও দান করতে

পারেন। “আর তাঁদের মধ্যে একজন মহাযাজকের ভৃত্যকে আঘাত ক’রে তা’র দক্ষিণ কর্ণ ছেদন ক’রে ফেলেন। কিন্তু যীশু কেবলমাত্র উত্তরে বললেন, এই পর্য্যন্ত ক্ষান্ত হও ; তা’রপর তিনি তা’র কর্ণস্পর্শ ক’রে তা’কে সুস্থ ক’রে তুললেন।” (বাইবেল—লুক ২২:৫০-৫১)।

পৃ: ১৪৮—পং ১৭।—“কোন পবিত্র বস্তু কুকুরদিগকে দিও না, আর শূকরদের সামনে মুক্তো ছড়িয়ে না, পাছে সে সব তা’রা তা’দের পা দিয়ে নাড়িয়ে ফেলে আবার ফিরে এসে তা’রা তোমাকেই ফেঁড়ে ফেলে। (বাইবেল—ম্যাথিউ ৭:৬)।

পৃ: ১৫৮—পং ১২।—মগ্নচৈতন্য কর্তৃক পরিচালিত মনের যুক্তিশীলতা অতীন্দ্রিয়জ্ঞানসম্ভাত সত্যের অদ্রাস্ত পথনির্দেশ হ’তে একেবারে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। সরবান্‌এর ফরাসী বৈজ্ঞানিকগণ কর্তৃক পথপ্রদর্শিত হয়ে পাশ্চাত্য চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ মানুষের মধ্যে দৈব উপলব্ধির সম্ভাবনার বিষয় অমুসন্ধান শুরু করেছেন।

১৯২৯ সালে রাবি ইস্রায়েল এইচ. লেভিহল দেখিয়েছেন যে, “গত বিশবৎসর ধ’রে মনস্তত্ত্বের ছাত্রগণ ফ্রয়েড কর্তৃক প্রভাবান্বিত হ’য়ে অবচেতন মনের স্তরসমূহের অমুসন্ধানে তা’দের সম্পূর্ণ সময়টাই ব্যয় করেছেন। এটা অবশ্য সত্য যে, অবচেতন মন অথবা মগ্নচৈতন্য এমন অনেক রহস্যই প্রকাশ করে, যা’তে ক’রে মানুষের ক্রিয়াকলাপের ব্যাখ্যা করা যায়। কিন্তু তা’ আমাদের সব কাষের ব্যাখ্যা করতে পারে না। এ অনেক অপ্রাকৃত ঘটনার ব্যাখ্যা করতে পারে বটে কিন্তু যে সব ঘটনা অতিপ্রাকৃত, তা’দের নয়। ফরাসী মতে প্রতিষ্ঠিত আধুনিকতম মনস্তত্ত্ব মানুষের মনের গহনে এক নতুন রাজ্যের সন্ধান পেয়ে সে তা’কে অতীন্দ্রিয় অবস্থা ব’লে অভিহিত করেছে। মগ্নচৈতন্যের রাজ্যে, যেখানে আমাদের প্রকৃতির গুপ্ত ফল্গুধারা প্রবাহিত, তা’র তুলনায় মানবপ্রকৃতি কত উচ্চে অধিরোহণ ক’রতে পারে, এ তা’রই উচ্চতর আভাস দেয়। মানুষের ব্যক্তিত্ব দু’টি নয়, তিনটি ; আমাদের চেতন ও অবচেতনের উপর আর একটি অতিমানসলোক প্রতিষ্ঠিত। ফরাসী মনস্তত্ত্ববিদ এফ. ডব্লিউ এইচ. মায়ার্স বলেছেন যে, ‘আমাদের মনের গহনে বালুকা-স্তূপের সঙ্গে সঙ্গে রক্তখনিও লুক্কায়িত আছে।’ মানুষের প্রকৃতিতে মগ্নচৈতন্যের বিষয়ে যা’র সমস্ত গবেষণা কেন্দ্রীভূত, তেমন মনস্তত্ত্বের সঙ্গে তুলনায় অতিমানসলোকের এই নতুন মনস্তত্ত্ব তা’র যা’ কিছু মনোনিবেশ সেই রক্তভূমির সন্ধানে গাঢ় সংবদ্ধ করেছে—একমাত্র কেবল সেই রাজ্যেই, যেখানে মানুষের মহান, নিঃস্বার্থ আর বীরোচিত কার্যের সন্ধান মেলে।”

পৃ: ১৬৫—পং ২৫।—উপনিষদ অথবা বেদান্ত ; বেদের কোন কোন অংশে

সংক্ষিপ্ত সারাংশ ব'লে পাওয়া যায়। উপনিষদে হিন্দুধর্মের মূলতত্ত্বের উপাদান পাওয়া যায়। শোপেনহোয়ার তা'দের উচ্ছৃঙ্খিত প্রশংসা ক'রে বলেছেন, “কি পরিপূর্ণরূপে বেদের পবিত্রভাবে সমগ্র উপনিষদাবলী ওতঃপ্রোতভাবে বিজড়িত! যে কোন ব্যক্তিই ঐ অতুলনীয় গ্রন্থটির পরিচিতি লাভ করেছে, তা'রই অন্তর তা'র গভীরভাবে আলোড়িত হয়ে উঠেছে! প্রত্যেক বাক্যটি হ'তে, একটা মৌলিক, গভীর আর মহিমময় ভাবের উদয় হয়। আর সমগ্রপুস্তকটি একটা মহান, পবিত্র আর গভীরভাবে পরিপূর্ণ...উপনিষদের সাহায্যে বেদে প্রবেশলাভ আমার চক্ষে বর্তমান শতাব্দী, অতীতের সকল শতাব্দী হ'তে সর্বশ্রেষ্ঠ দাবী ক'রতে পারে।”

পৃ: ১৭৮—পং ১১।—উষ্টয়ভঙ্কির মন্তব্য এখানে মনে পড়ে, “যে মানুষ এর কাছে মাথা নত ক'রতে পারে না, সে নিজের ভার বহন ক'রতে পারে না।”

পৃ: ১৮৫—পং ১৮।—“আদিতে বাক্য ছিল, বাক্য ঈশ্বরের সহিত সংযুক্ত ছিল এবং বাক্যই ঈশ্বর ছিল।” (বাইবেল—জন ১:১)।

পৃ ১৯৬—পং ৬।—১৯৩৯ সালে রেডিও অণুবীক্ষণ যন্ত্র আবিষ্কারে অন্ডাবখি অজ্ঞাত এক নূতন রশ্মিজগতের সন্ধান মেলে। এসোসিয়েটেড প্রেস বলেছেন, “মানুষ নিজে আর অনুমানসিদ্ধ সকলপ্রকার জড়পদার্থই যে সর্বদা রশ্মি প্রেরণ করেছে তা' সব এই যন্ত্র দেখতে পায়। বা'রা পরচিহ্নপ্রবেশ, দ্বিতীয়দৃষ্টি আর দিব্যদর্শনে বিশ্বাস করে, তা'রা এই ঘোষণায় সেইসব অদৃশ্য রশ্মির অস্তিত্বের প্রথম বৈজ্ঞানিক প্রমাণ পাবে যে, সকল রশ্মি সত্যসত্যই এক ব্যক্তির কাছ হ'তে অপর ব্যক্তির নিকট ভ্রমণ করে। এই রেডিও যন্ত্র প্রকৃতপক্ষে হচ্ছে রেডিও ফ্রিকোয়েন্সির বর্ণচ্ছত্রদর্শক যন্ত্র। বর্ণচ্ছত্রদর্শক যন্ত্রে যেমন রশ্মিবর্ণ বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, কি কি মূল উপাদানের অণুপরমাণুতে নক্ষত্রাদি গঠিত, এও ঠিক তেমনি শীতল অনুজ্জল জড়পদার্থের সেইরূপ বর্ণচ্ছটা বিশ্লেষণ করে, সব দেখায় মানুষ আর সকল সজীব পদার্থ হ'তে যে এরকম রশ্মি বা'র হয়, তা'র অস্তিত্বের বিষয় বৈজ্ঞানিকেরা বছ বছর ধ'রেই সন্দেহ ক'রে আসছিলেন। আজকে তা'দের অস্তিত্বের প্রথম বৈজ্ঞানিক প্রমাণ পাওয়া গেল। এই আবিষ্কারে প্রমাণিত হ'ল যে, প্রকৃতির মধ্যে প্রত্যেক অণু আর পরমাণু এক একটি অবিরাম বেতারতরঙ্গপ্রেরক যন্ত্রাগার। অতএব যে পদার্থটি পূর্বে মানবরূপী ছিল, মৃত্যুর পরেও সে তা'র অতি সূক্ষ্ম রশ্মি প্রেরণ করতে থাকে। এইসব রশ্মির তরঙ্গদৈর্ঘ্য বর্তমানে ব্যবহৃত বেতারতরঙ্গের যে কোন সর্বাপেক্ষা হ্রস্ব বা দীর্ঘ তরঙ্গ অপেক্ষাও হ্রস্ব অথবা দীর্ঘ। এই সব রশ্মিগুলির জটিলতা

কল্পনাভীত। কোটি কোটি রকমের রশ্মি আছে। একটি মাত্র বৈশ্ব বড়গোছের অণু একই সময়ে ১০,০০,০০০ বিভিন্ন তরঙ্গদৈর্ঘ্যের রশ্মি পাঠাতে পারে। এই ধরনের অপেক্ষাকৃত দীর্ঘগোছের তরঙ্গদৈর্ঘ্যসকল, সহজে এবং বেতারতরঙ্গের গতিতে চালিত হয়।.....বেতারতরঙ্গ আর আলো প্রভৃতির মত পরিচিত রশ্মিদের ভরঙ্গের সঙ্গে নূতন রশ্মির একটা অদ্ভুত পার্থক্য আছে। অতি দীর্ঘকাল—এমন কি হাজারহাজার বছর ধরেও এই সব বেতারতরঙ্গসকল, জড়পদার্থ হ’তে অবিরতই নির্গত হ’তে থাকবে।”

পৃ: ১৯৬—পং ১২।—কথাগুলি ঠিক ব্যবহার করা যায় না; হিটলার তাঁর অধিকতর উচ্চাশায় ধ্বংসের সঙ্গে প্রায় এটার ধ্বংসও সাধিত ক’রে গেছেন। ল্যাটিন মূল ধাতুর অর্থ হচ্ছে “আন্তর রক্ষা”। সংস্কৃত শব্দ “আগম” মানে সাক্ষাৎ আত্মানুভূতিলব্ধ সহজাত জ্ঞান; এই কারণে কতকগুলি শাস্ত্রগ্রন্থ ঋষিগণকর্তৃক “আগম” ব’লে অভিহিত হয়েছে।

পৃ: ১৯৯—পং ৭।—“অতএব যদি তোমার একটিমাত্র চক্ষু হয়, তবে তোমার সমস্ত দেহ জ্যোতিঃতে পূর্ণ হ’বে। (বাইবেল—ম্যাথিউ ৬:২২)। গভীর ধ্যানের সময় আধ্যাত্মিক চক্ষু বা অন্তঃচক্ষুঃ কপালের মধ্যভাগে দেখা যায়। এই সর্বদর্শী চক্ষু নানাশাস্ত্রে নানাভাবে বর্ণিত হয়েছে, যথা—তৃতীয় নেত্র, প্রাচ্যের তারকা, অন্তঃচক্ষুঃ, স্বর্গ হতে অবতীর্ণ পবিত্রাশ্রা, শিবনেত্র, জ্ঞাননেত্র, ইত্যাদি ইত্যাদি।

পৃ: ১৯৯—পং ২৫।—“যিনি কণ প্রদান করেছেন, তিনি কি শুনবেন না? যিনি চক্ষু প্রদান করেছেন; তিনি কি দেখবেন না?..... যিনি মানুষকে জ্ঞানলাভে শিক্ষাপ্রদান করেছেন, তিনি কি সব জানতে পারবেন না?” (বাইবেল—সাম ৯৪:৯-১০)।

পৃ: ২০২—পং ৩।—সকল দেশের উপকথার মধ্যে প্রকৃতির উপর মন্ত্রশক্তির প্রভাবের বিষয় উল্লেখ পাওয়া যায়। আমেরিকার ইণ্ডিয়ানগণ যে জল ও বায়ুর জন্তু মন্তোচ্চারণপ্রক্রিয়ার উন্নতিসাধন করেছিল, তা’ সর্বজন-বিদিত। জগৎপ্রসিদ্ধ ভারতীয় সঙ্গীতকার তানসেন তাঁর গানের শক্তিবলে অগ্নি নির্বাপিত করতে পারতেন। ১৯২৬ সালে নিউইয়র্কের একটি অগ্নি নির্বাপক দলের সম্মুখে ক্যালিফোর্নিয়ার প্রকৃতিতত্ত্ববিদ চার্লস্ কেলগ্ অগ্নির উপর স্বরতরঙ্গের প্রভাব প্রদর্শন করেছিলেন। “বেহালার ছড়ির মতন একটি প্রকাণ্ড ছড়ি একটা টিউনিং ফর্কের উপর অতিদ্রুত টান দিয়ে তিনি গভীর বেতার ষ্ট্যাটিকের মতন একটা অদ্ভুত চিৎকারের মতন শব্দ উৎপাদন ক’রতে সমর্থ হয়েছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে একটা শূণ্য কাঁচের নলের ভিতর দু’ ফুট লম্বা হলদে রঙের লকলকে এক গ্যাসের শিখা সঙ্কুচিত হ’য়ে গিয়ে ছয় ইঞ্চিতে দাঁড়াল, তা’রপরে স্ফুলিঙ্গশীল একটা

নীলাভ আঙুনে পরিণত হ'ল। আর একবার টান দিতেই আবার সেই রকম কম্পনের চিংকারশব্দ এবং সঙ্গেসঙ্গেই সেটি একেবারেই নিভে গেল।”

২০৩—পং ১১।—উল্লিখিত কুলকুণ্ডলিনী শক্তির জাগরণই যোগীর পরম-পবিত্র চরম লক্ষ্যস্থান। প্রতীচ্যের শাস্ত্রব্যাখ্যাতাগণ, নিউ টেষ্টামেন্টের “রিভিলেশন” অধ্যায়ে যে যোগবিজ্ঞানের অল্পরূপ ব্যাখ্যা আছে—যে বিষয় প্রভু যীশুখ্রীষ্ট জন এবং তাঁ’র অত্যাশ্চর্য্য অন্তরঙ্গ শিষ্যবর্গকে শিক্ষা দিয়েছিলেন, তা’ আদৌ বুঝতে পারেন নি। বাইবেলের উক্ত অধ্যায়ের ১ঃ২০ পংক্তিতে জন “সমুতারকার রহস্য” এবং “সাতটি গির্জা”র বিষয় উল্লেখ করেছেন; এই প্রতীকগুলি যোগশাস্ত্রবর্ণিত মস্তিষ্ককশেরুকাচক্রের সাতটি পদ্ম বা চক্রকে বোঝায়। দিব্যপরিকল্পিত এই নিষ্ক্রমণপথে যোগী বৈজ্ঞানিক ধ্যানের সাহায্যে দেহকারা হ’তে মুক্তিলাভ ক’রে তাঁ’র আদি সত্তায় ফিরে যায়। মস্তিষ্কস্থিত সমুদ্রচক্র, সহস্রদলকমলই হচ্ছে ব্রহ্মজ্ঞান বা ব্রহ্মানুভূতির স্থান। দিব্যজ্ঞানলাভ হ’লে যোগী স্বজনকর্তা ঈশ্বরকে ব্রহ্মা অথবা পদ্মজ বা পদ্মযোনি ব’লে উপলব্ধি করতে পারেন।

পদ্মাসন অভ্যাস হ’লে যোগী উক্ত আসনে উপবিষ্ট হ’রে মস্তিষ্ক-কশেরুকাচক্রের বিচিত্রবর্ণের পদ্মসকল অথবা চক্রসমূহ দর্শন করেন। প্রত্যেক পদ্মই বিভিন্ন দল অথবা প্রাণশক্তির বর্ণে রঞ্জিত। এই পদ্ম সকলই চক্ররূপে বর্ণিত।

প্রাচী ও প্রতীচীর জগ্ন সর্বোৎকৃষ্ট আসন হচ্ছে পদ্মাসন। এই আসনে উপবিষ্ট হ’লে যোগীর মেরুদণ্ড সরল ও দৃঢ় থাকে এবং সবিকল্প সমাধির অবস্থায় সামনে অথবা পিছনে পড়বার কোন ভয় থাকে না। পদ্মাসনে উপবিষ্ট হ’লে কতকগুলি স্নায়ুর উপর একরকম আরামদায়ক চাপ পড়ে, তা’তে শারীরিক ও মানসিক স্থৈর্য্য লাভ হয়। পশ্চিমের বয়স্ক লোকদের প্রথম প্রথম জাছু অথবা হাঁটুর উপর একটু বেদনাবোধ বা কষ্টবোধ হয় কিন্তু দৈনন্দিন মিনিটকতকের অভ্যাসে মাসকতকের ভিতরেই বেশ একটা আরামদায়ক সাফল্যলাভ করা যায়।

পৃঃ ২১৩—পং ১২।—আমার সঙ্গে বিবাহের জগ্ন যে কত পছন্দ করা হয়েছিল, তাঁ’র সঙ্গে পরে আমার খুড়তুত ভাই প্রভাস চন্দ্র ঘোষের বিবাহ হয়।

পৃঃ ২১৪—পং ১২।—১৯৩২ সালের সেপ্টেম্বর থেকে ১৯৩৩ সালের সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত শ্রীব্রহ্মেশ্বর গিরিজীর যুগ থিয়োরির বিষয়ে ১৩টি প্রবন্ধ ইষ্ট-ওয়েস্ট পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল।

পৃঃ ২১৫—পং ৮।—শ্রীব্রহ্মেশ্বর গিরিজীকল্পিত সরল ২৪,০০০ বর্ষব্যাপী

সায়নবৃত্ত অপেক্ষা হিন্দুশাস্ত্রে বর্ণিত কলিযুগের অন্তর্গত বর্তমান পৃথিবীর বয়স এক দীর্ঘতর যুগপর্য্যায় নিদিষ্ট। শাস্ত্রে বর্ণিত পৃথিবীর 'যুগ ৪৩০০,৫৬০,০০০ বর্ষব্যাপী আর এই কল্পকাল সৃষ্টির এক দিবস অথবা আমাদের বর্তমান সৌরমণ্ডলের জীবন বা অবস্থিতিকালের পরিমাণ। ঋষিপ্রদত্ত এই বিরাট সংখ্যা, সৌরবর্ষের দৈর্ঘ্য এবং পাই (৩.১৪১৬, বৃত্তের পরিধি ও ব্যাসের অনুপাত) এর গুণিতকের সম্বন্ধের উপর প্রতিষ্ঠিত।

প্রাচীন সত্যদ্রষ্টা ঋষিগণের মতানুযায়ী মহাবিশ্বের জীবনকাল হচ্ছে ৩১৪,১৫৯,০০০,০০০,০০০, সৌরবর্ষ অথবা "ব্রহ্মার একযুগ"।

বৈজ্ঞানিকগণ গণনায় স্থির করেছেন যে, পৃথিবীর বর্তমান বয়স দুই লক্ষকোটি বৎসর আর তাঁদের গণনা, প্রস্তরের মধ্যে তেজোবিকীরণের ফলে যে সমস্ত সীসকসঞ্চয় দেখতে পাওয়া যায়, সেইগুলির গবেষণার উপর প্রতিষ্ঠিত। হিন্দুশাস্ত্র বলে যে আমাদের জগতের মত কোন জগৎ খোলাপ পায় দু'টির মধ্যে একাট কারণে—হয় সেই জগতের অধিবাসীসকল চরম সং, না হয় চরম অসংপ্রকৃতির হয়ে পড়ে। এতে ক'রে বিশ্বময় এমন একটা প্রচণ্ড মানসশক্তি সঞ্চিত হয় যে তা'র বলে পৃথিবীর গঠনে সংহত অনুপরমাণুগুলি একেবারে ছিন্নবিচ্ছিন্ন হয়ে মহাপ্রলয়ে বিলীন হয়ে যায়।

মাঝে মাঝে "পৃথিবীর শেষদিন উপস্থিত" ব'লে এক একটা হুৎকম্পনকারী ঘোষণা প্রকাশিত হয়। সম্প্রতি প্যাসাডেনার রেভাঃ চার্লস জিলঙ্ পৃথিবীর অন্তিমকাল নিকটবর্তী ব'লে তিনি ১৯৪৫ সালের ২১শে সেপ্টেম্বর "শেষ বিচারের দিবস" ব'লে প্রকাশ্যে ঘোষণা করেছিলেন। ইউনাইটেড প্রেসের সাংবাদিকগণ এবিষয়ে আমার মত প্রার্থনা করাতে আমি তাঁদের নিকট এই বিবৃতি দিই যে এক দৈবপরিকল্পনা অনুযায়ী বিশ্বযুগ এক নিয়মানুগ উন্নতির পথে এগিয়ে চলেছে। উপস্থিত আমাদের এই গ্রহের হঠাৎ প্রলয়ের কোনই সম্ভাবনা নাই। অধিরোহী এবং অবরোহীভেদে সায়নবৃত্তের দুইলক্ষ কোটি বৎসর এখনও আমাদের এই বর্তমান আকৃতির গ্রহটির জন্ম সঞ্চিত আছে। ঋষিপ্রদত্ত পৃথিবীর নানা বয়সের সংখ্যাগুলি সম্বন্ধে প্রতীচ্যে বিশেষ গবেষণা হওয়া উচিত; টাইমস্ পত্রিকা (ডিসেম্বর ১৭, ১৯৪৫; পৃঃ ৬) ঐ গুলিকে "আত্মসংজনক পরিসংখ্যান" ব'লে অভিহিত করেছে।

পৃঃ ২১৫—পং ২৩।—বাইবেল, লুক ১১:৩৪-৩৫।

পৃঃ ২১৫—পং ২৪।—সাংখ্যদর্শনের প্রতিপাদ্য বিষয় হচ্ছে প্রকৃতি হ'তে পুরুষ পর্য্যন্ত পঞ্চবিংশতিতত্ত্ব উপলব্ধির পথে জীবের পরামুক্তি।

পৃঃ ২১৫—পং ২৪।—সাংখ্য, সমাধিপাদ ৯২।

পৃঃ ২১৬—পং ৯।—বাইবেল, ম্যাথিউ ২৪:৩৫।

পৃঃ ২১৬—পং ১৩।—বাইবেল, ম্যাথিউ ১২:৫০।

পৃঃ ২১৬—পং ১৭।—বাইবেল, জন ৮:৩১-৩২। সেন্ট জন বলেছেন:—

“কিন্তু যত লোক তাঁকে গ্রহণ করলে তা’দিগকে তিনি ঈশ্বরের সম্মান হ’বার শক্তি দান করলেন এমন কি তাঁ’দেরও, যাঁরা তাঁ’র নামে বিশ্বাস ক’রলে (এমন কি তাঁ’দের, যাঁ’দের খৃষ্টচৈতন্যের অমুভূতি লাভ হয়েছিল)।”

পৃঃ ২১৭—পং ৩।—আমরা উদ্ভানের বৃক্ষসকলের ফল সব ভক্ষণ করতে পারি বটে কিন্তু উদ্ভানমধ্যস্থ বৃক্ষটির ফল সম্বন্ধে ঈশ্বর বলেছেন, তুমি অবশ্যই এ ফল ভক্ষণ করবে না এমন কি স্পর্শও করবে না, পাছে তোমার মৃত্যু ঘটে। (বাইবেল—জেনেসিস ৩:২-৩)।

পৃঃ ২১৭—পং ৭।—যে জীলোককে আমার সঙ্গিনী হ’বার জন্তে দিয়েছিলেন, সেই বৃক্ষ থেকে আমার ফল দেয় এবং আমি তা’ ভক্ষণ করি। জীলোকটি ব’লে, সর্পটি আমার প্রলুব্ধ করে, তাইতেই আমি ফলটি ভক্ষণ করেছিলুম। (বাইবেল—জেনেসিস ৩:১২-১৩)।

পৃঃ ২১৭—পং ১০।—সুতরাং ঈশ্বর মানবকে নিজ প্রতিমূর্তিরূপে সৃষ্টি করলেন। ঈশ্বর তা’দিগকে আশীর্বাদ করলেন এবং ঈশ্বর তা’দেরকে বললেন, ফলবান হও এবং বংশবৃদ্ধি কর, পৃথিবী সম্পদে পূর্ণ কর এবং একে শাসন কর।” (বাইবেল—জেনেসিস ১:২৭-২৮)।

পৃঃ ২১৭—পং ১৫।—এবং প্রভু ঈশ্বর ভূমির মৃত্তিকা হ’তে মনুষ্যজাতির সৃষ্টি করলেন এবং তা’র নাসিকাবিবরে প্রাণবায়ুর শ্বাসপ্রশ্বাসের সঞ্চার করলেন এবং মানব একটি সজীব আত্মায় পরিণত হ’ল। (বাইবেল—জেনেসিস ২:৭)।

পৃঃ ২১৭—পং ২৬।—এক্ষণে সর্প (যৌবনশক্তি) হ’ল ভূমির যে কোন জন্তু (শরীরের যে কোন ইন্দ্রিয়বোধ) অপেক্ষা অধিকতর শক্তিশালী (বাইবেল—জেনেসিস ৩:১)।

পৃঃ ২১৮—পং ৮।—এবং প্রভু ঈশ্বর ইডেনের (স্বর্গোদ্ভানের) পূর্বদিকে একটি উদ্ভান রচনা করলেন; এবং তথায় তাঁ’র সৃষ্ট নরক প্রতিষ্ঠিত করলেন। (বাইবেল—জেনেসিস ২:৮)। অতএব প্রভু ঈশ্বর তা’কে পাঠালেন সেই ভূমি কর্ষণ করতে যেখান হতে সে সৃষ্ট হয়েছিল। (বাইবেল—জেনেসিস ৩:২৩)।

পৃঃ ২১৮—পং ৮।—ঈশ্বরসৃষ্ট প্রথম দিব্যমানবের জ্ঞান তা’র কপালের (পূর্বদেশ) সর্বদশী একটি মাত্র চক্রেই কেন্দ্রীভূত থাকত। এই স্থানে কেন্দ্রীভূত নিখিলসৃজনক্ষমতাবিশিষ্ট তা’র ইচ্ছাশক্তি, মানুষ যখন তা’র

জড়প্রকৃতির “ভূমিকর্ষণ” করবার চেষ্টা শুরু ক’রলে, তখনই তা’ লোপ পায়।

পৃ: ২১১।—পং ১৫।—হিন্দুদের “আদম্ ইভ্” গল্পটি সুপ্রাচীন শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার উল্লিখিত হয়েছে। প্রথম নর ও নারী (জড়দেহধারীরূপে) স্বয়ম্ভু (সৃষ্টিকর্তা হ’তে জাত) মনু আর তাঁ’র স্ত্রী শতরূপা (প্রকৃতরূপ) ব’লে কথিত হয়েছে। তাঁ’দের পাঁচটি সন্তানসন্ততি প্রজাপতিগণের (পূর্ণ জীব, যাঁ’রা জড়াকৃতি ধারণ করতে পারতেন) মধ্যে বিবাহের আদান-প্রদান প্রচলিত করেছিলেন; এই প্রথম দিব্যদেহধারী পরিবার হ’তেই মানবজাতির উৎপত্তি।

কি পূর্ব, কি পশ্চিম কোথাও আমি শ্রীবৃক্তেশ্বর গিরিজীর মতন এমন গভীর আধ্যাত্মিক অন্তর্দৃষ্টিবলে খৃষ্টীয়শাস্ত্র ব্যাখ্যা করতে কখনও শুনিনি। গুরুদেব বলতেন, “তত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতগণ, ‘আমিই একমাত্র পথ, সত্য ও জীবন; আমি ভিন্ন কেউই পিতার নিকট আগমন করতে পারে না, (বাইবেল—জন ১৪:৬) এই সব পংক্তিগুলির ভুল ব্যাখ্যা ক’রে গেছেন। যীশুখৃষ্ট কখনও একথা বলেন নি যে তিনিই ঈশ্বরের একমাত্র পুত্র; তিনি এই কথা বলেছিলেন যে, কোন মানবই সেই নিগূর্ণ পরমব্রহ্ম, সেই ইন্দ্রিয়াতীত ঈশ্বর, যিনি স্বয়ম্ভু, সৃষ্টির অতীত, সেই “পিতার” ভাব প্রাপ্ত হয় না, যতক্ষণ না সে প্রথমে সেই “পুত্রভাব” অর্থাৎ সৃষ্টির মধ্যে সক্রিয় বিশ্বচৈতন্যের ভাব প্রদর্শন ক’রতে পারে। যীশুখৃষ্ট যিনি খৃষ্ট-চৈতন্য অথবা বিশ্বচৈতন্যের সঙ্গে একীভূত হয়ে গিয়েছিলেন, তিনি তাঁ’র অন্তরে তাঁ’র সঙ্গে পরিপূর্ণভাবে একাত্ম হ’য়ে গিয়েছিলেন, কারণ তাঁ’র জীবাত্মবোধ একেবারেই লুপ্ত হয়েছিল। (১৮৬ পৃষ্ঠার পাদটিকা দ্রষ্টব্য)।

যখন পল লিখলেন, “ঈশ্বর ... যীশুখৃষ্ট দ্বারা সকল বস্তু সৃষ্টি করলেন, (বাইবেল—এফিসিয়ানস্ ৩:৯) এবং যখন যীশু বললেন, “এব্রাহামের জন্মের পূর্ব থেকে আমি আছি” (বাইবেল—জন ৮:৫৮) তখন, কথাগুলির সার অর্থ বোঝায় সম্পূর্ণ নৈর্ব্যক্তিকতা।

একপ্রকার আধ্যাত্মিক দৌর্বল্যবশত: সাংসারিক লোকে বেশ স্বচ্ছন্দ-চিন্তে এই কথা বিশ্বাস করে যে কেবল একটিমাত্র লোকই ঈশ্বরের পুত্র হতে পেরেছিলেন। তাঁ’দের বৃত্তি হচ্ছে, “যীশুখৃষ্টের সৃষ্টি হচ্ছে অপূর্ব, স্মরণ্য কেমন ক’রে আমি, এক নগণ্য মরজগতের অধিবাসী, তাঁ’র প্রতিদ্বন্দ্বী হ’তে পারি?” কিন্তু সকল মানুষই ত’ দিব্যভাবে সৃষ্ট হয়েছে আর তাঁ’রা একদিন না একদিন যীশুখৃষ্টের এই আদেশ মানতে বাধ্য হ’বে যে, “অতএব তুমি সেই পূর্ণতা লাভ কর, যে পূর্ণতা তোমার স্বর্গস্থ পিতার আছে।” (বাইবেল—ম্যাথিউ ৫:৪৮)। “দেখ, পিতা আমাদের উপর কি প্রেমই না দান করেছেন, যা’তে ক’রে আমরা

ঈশ্বরের পুত্র ব'লে অভিহিত হ'তে পারি।" (বাইবেল.—জন ৩:১)।

কর্মবিধি ও তা'র সিদ্ধান্ত উপলব্ধি ক'রতে পারলে দেখা যাবে যে পুনর্জন্মের বিষয় (পৃঃ ৩১৭ ও ৩২৬ পাদটিকা, এবং ৪৩ পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য) বাইবেলে অসংখ্য পংক্তিতে উল্লেখ আছে যথা, “যে কেহ মানুষের রক্তপাত করবে, মানুষের দ্বারাই তা'র রক্তপাত হ'বে।” (বাইবেল—জন ৯:৬)। প্রত্যেক নরহন্তা যদি ‘মানুষ দ্বারাই’ হত হয়, তা' হ'লে প্রতিক্রিয়ার নিয়মে স্পষ্টতঃ বহুক্ষেত্রে এই প্রয়োজন উপস্থিত হয় যে, একাধিক জীবনের প্রয়োজন। সমসাময়িক কোন শাস্তিবিধান সত্ত্বসত্ত্ব হয়ত' পাওয়া যায় না ব'লেই!

কর্মবিধি এবং পুনর্জন্মতত্ত্বের সত্যজ্ঞান তখনই লোপ পেলে যখন খৃষ্টীয় ধর্মযাজকগণ এই সব শিক্ষার বিলোপসাধনের জন্ত মনস্থির করলেন, কারণ তাঁ'রা এই কথা ভাবলেন যে জন্মজন্মান্তর ব্যোপে দেশ আর কালের যে রঙ্গভূমি বিস্তৃত রয়েছে, তা' এতই বিরাট যে তা'তে মানুষকে সত্ত্বসত্ত্ব মুক্তিলাভের জন্ত উৎসাহিত ক'রতে পারা যাবে না। কিন্তু প্রকৃত সত্য চাপ'তে গেলেই নানা পরস্পরবিরোধী ভ্রান্তিপ্রয়াদের উৎপত্তি হয়। পৃথিবীর কোটিকোটী লোক তা'দের “এক জীবন” ঈশ্বরলাভের জন্তই নিয়োজিত করে নি—করেছে এই জগৎ উপভোগ ক'রতে,—যা'র প্রাপ্তি তা'র অদ্ভুতভাবে ঘটেছে আর যা' অতিশীঘ্রই চিরতরে হারিয়ে যাবে। সংসারের লোকেদের এই যে সব ভ্রান্ত ধারণা, এদের সব বলা যেতে পারে যে অযৌক্তিক প্রতিজ্ঞা হ'তে আয়সিদ্ধান্ত।

পৃঃ ২২৭।—পঃ ২৭।—শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজী, বহু মনীষিগণের মতই বিংশ-শতাব্দীর শিক্ষাব্যবস্থার অসমপ্রকৃতির বিরুদ্ধে দুঃখপ্রকাশ করেছিলেন। মানবের প্রকৃতি ত্রিবিধা হ'লেও সাধারণতঃ কেবলমাত্র তা'র জড় আর মনোবৃত্তিসকল মেনে নিয়ে তা'দের উন্নতিসাধনের চেষ্টা করা হয়। আধ্যাত্মিক সত্যের শিক্ষার বিষয় যেখানে উপেক্ষা করা হয় সেখানেই নাস্তিকতার অভিশাপ নেমে আসে।

নাস্তিকেরা ভাবেন যে তাঁ'রাই মানুষের মধ্যে সব চেয়ে “মুক্তমন”। তাঁ'দের জীবন, স্বাসরোধকারী আয়ত্তরিতার গরলপূর্ণ হ'য়ে কখনও ঈশ্বরের সন্মুখে উন্মুক্ত হয় না। কিন্তু তবুও যেমন দুর্ব্যবহারপ্রাপ্ত, ভীকু একটি শিশু সহসা একটু অপ্রত্যাশিত প্রগাঢ় স্নেহের হাসি দেখতে পেলে তা'তে সাড়া দেয়, তেমনি ঈশ্বর কোন কোন নাস্তিকের, যেন নিতান্ত অশ্রমস্বভাবেই উন্মুক্ত তা'র হৃদয়ের অতি ক্ষুদ্র কোণেতেও প্রবেশ করেন।

“নাস্তিক” বুললে যে কোন ব্যক্তি যে কেবল তা'র কথাবার্তার ঈশ্বরশক্তি হ'তে তা'র “স্বাভাব্য” বা “স্বাধীনতা” ঘোষণা করে শুধু তাই

নয়, কিন্তু যে “ঈশ্বরকে ভয়” করে তা’র জীবন পরিচালিত করে না—অর্থাৎ তা’র সৃষ্টিকর্তাকে ভয় আর ভক্তি করে না।” ঐ অর্থে বহু “আস্তিক”ই, হায়, নাস্তিকের পর্যায়ে পড়ে যায়। বর্তমান শিক্ষা-প্রণালী, মূলতঃ নাস্তিক ভাবেরই উৎসাহ প্রদান করে। তরুণদের যদি এই শিক্ষা দেওয়া হয় যে মানুষ কেবলমাত্র একটা “উচ্চতর জীব”, তা’হ’লে তা’দের আর আত্মানুসন্ধানের প্রচেষ্টার কোন সম্ভাবনা থাকে না অথবা তা’র আদিসত্তা হচ্ছে মূলতঃ “ঈশ্বরের প্রতিক্রিয়া” এ বিষয়ও তা’রা চিন্তা করে না। ইমার্শন বলেছেন, “যেটুকুমাত্র আমাদের অন্তরে আছে,—ত’ আমরা বাইরেও দেখতে পারি। যদি আমাদের কোন ঈশ্বরের সাক্ষাৎ না মেলে,—তা’র কারণ হচ্ছে আমাদের অন্তরে তেমন গোছের কেউই নেই।” যে তা’র পশুপ্রকৃতিকেই তা’র প্রকৃতসত্তাব’লে কল্পনা করে, দৈবাকাজ্জ্বল্য হ’তে তা’র বিচ্ছেদ ঘটে।

যে শিক্ষাব্যবস্থা পরমাত্মাকে মানব অস্তিত্বের প্রধান বা চরম তথ্য ব’লে শিক্ষা না দেয়, সে ব্যবস্থা বিদ্যার পরিবর্তে অবিদ্যাই দান করে। “তুমি বলুছ যে আমি ধনী এবং নানাসম্পদশীল আর কোন কিছুই প্রয়োজন নাই; কিন্তু তুমি জান না যে তুমি হতভাগ্য, হুঃখী, দরিদ্র, অন্ধ এবং আশ্রয়হীন।” (বাইবেল—রিভিঃ, ৩:১৭)।

পৃঃ ২৪০—পং ৯।—“মনীষিগণের রাজা” সেন্ট টমাস্ একুইনাস্কে তা’র সেক্রেটারী “সামা থিয়োলজিয়া” শেষ ক’রবার জন্তে সকাতর অনুরোধ করাতে তা’র প্রত্যুত্তরে তিনি বলেছিলেন, “এসব বিষয়গুলি এখন আমার কাছে এইটুকুমাত্র বোধ হয় যে এপর্যন্ত আমি যা’ কিছু লিখেছি তা’দের মূল্য আমার চোখে একগাছি তুণের চেয়েও বেশী নয়।” ১২৭৩ সালে একদিন নেপলস্‌এর গির্জায় ভজনগানের সময় সেন্ট টমাস্‌এর এক গভীর অন্তর্দর্শন লাভ হয়। আর এই দিব্যজ্ঞানলাভের মহিমা তাঁকে এতদূর অভিভূত করেছিল যে তা’রপর থেকে তিনি আর বিদ্যাচর্চা বা জ্ঞানানুশীলনে কোন উৎসাহ প্রদান করেন নি।

(প্লেটোর ফিড্রাসের) সক্রটিসের বাক্যগুলি তুলনীয়ঃ—“আমার পক্ষে হচ্ছে আমি এইটুকুমাত্র জানি যে আমি কিছুই জানি না।”

পৃঃ ২৪১—পং ১০।—যদিও গুরুদেব কোন কিছু বলেন নি, তবুও তাঁ’র দুইবার গ্রীষ্মকালে কাশ্মীরভ্রমণে অনিচ্ছা প্রকাশে এই বোধ হয় যে সেখানে গিয়ে যে তিনি অসুস্থ হ’য়ে পড়বেন আর সে সময় যে তখনও আসে নি, তা’র পূর্বাভাস তিনি পেয়েছিলেন। (পৃঃ ২৫৩—পং ২৮ দ্রষ্টব্য)।

পৃঃ ২৪৬—পং ২৭।—পুরাণে পার্বতী হিমালয়কন্ঠা ব’লে বর্ণিতা হয়েছেন। যা’র বাসস্থান হচ্ছে তিব্বতপ্রান্তে কোন পর্বতশিখরে। বিশ্বয়বিমুক্ত

পথিকগণ সেই অনধিগমা পর্বতচূড়ার তলদেশ দিয়ে যেতে যেতে দেখতে পান যে, দূরে একটি বিরাট তুষারস্তূপ, নানাআকারের বরফে তৈরী চূড়া ও শীর্ষসমন্বিত—প্রকাণ্ড এক রাজপ্রাসাদের সঙ্গে বাঁ'র সাদৃশ্য রয়েছে।

জগজ্জননীর বিভিন্নরূপ—পার্বতী, কালী, দুর্গা, উমা প্রভৃতি নানারূপে অভিহিতা হয়েছে, বিশিষ্ট শক্তির খেলা দেখাবার জন্য। ঈশ্বর অর্থাৎ শিব তাঁ'র পরাপ্রকৃতিতে সৃষ্টিকার্যে অক্ষম। তাঁ'র শক্তি, সৃজনকারিণী প্রকৃতির শক্তিরূপে এই বিশ্বরচনায় অসীম অভিব্যক্তি প্রকাশ করে। অতঃপর ৪২৫-৬ পৃষ্ঠার পাদটিকা দ্রষ্টব্য।

হিন্দু চিত্রকলায় দিগম্বর শিবের একমাত্র আবরণ, ঘোরকুম্ভবর্ণ কুম্ভসার চর্ম ব'লে প্রদর্শিত হয়েছে। ঘোর কুম্ভবর্ণ হচ্ছে রাজির অন্ধকার আর রহস্যের প্রতীক। কতকগুলি শৈবায়ত, শিবের সম্মানে দিগম্বর হ'য়েই ভ্রমণ করেন—বাঁ'র কিছুই নেই অথচ সবই আছে।

কাশ্মীরের এক পুণ্যবতী সাধ্বী, চতুর্দশ শতকের লালা যোগীশ্বরীও ছিলেন একজন দিগম্বরী, শিব উপাসিকা। তদানীন্তন এক সন্ধীর্ণচেতা ব্যক্তি, তিনি নগ্নতা অবলম্বন ক'রে চলেন কেন জিজ্ঞাসা করাতে যোগীশ্বরী তীক্ষ্ণস্বরে উত্তর দেন, “কেনই বা নয়? আমি ত' কোথাও পুরুষ দেখতে পাই না!” যোগীশ্বরীর কতকটা উগ্রধরণের এই মত হ'চ্ছে যে ঈশ্বরানুভূতি বাঁ'র হয় নি, সে পুরুষপদবাচ্য নয়। তিনি ক্রিয়াযোগের সঙ্গে খুব বনিষ্ঠসম্বন্ধবিশিষ্ট একপ্রকার প্রণালী অবলম্বন ক'রে সাধনা ক'রতেন, যাঁ'র অপূর্ব গুণ তিনি অসংখ্য চৌপদীতে বর্ণনা ক'রে গেছেন। তাঁ'র একটির অনুবাদ এখানে উদ্ধৃত ক'রে দেওয়া গেল,—

“হুঃখের কি কালকূট আমি কত না করেছি পান ?

সংখ্যাতীত জনমসরণে চলে মোর অভিযান !

হায় ! অমৃত বিনা যে হিয়ার পাত্রখানি,

ধ্বাসের চুমুকে পূর্ণ হবে না জানি।”... ..

জড়মৃত্যুর অধীন না হ'য়ে তিনি নিজ দেহকে অগ্নিতে পরিণত ক'রে দেহের বিলোপসাধন করেছিলেন। পরে তিনি শোকসন্তপ্ত নগর-বাসীদের সম্মুখে আবিভূর্তা হয়েছিলেন—জীবন্তমূর্তি পরিগ্রহ ক'রে, স্বর্ণবর্ণ পরিচ্ছদে ভূষিতা হ'য়ে, শেষ পর্য্যন্ত সম্পূর্ণভাবে আচ্ছাদিতা হ'য়ে।

পৃ: ২৫৫—পং ৬।—থেরেসা নিউম্যান সমেত বহু খৃষ্টিয়ান সাধু দেহ হ'তে দেহান্তরে রোগ পরিচালনার বিষয় অবগত ছিলেন।

পৃ: ২৫৬।—পং ৫।—যীশুখৃষ্টকে ক্রুশবিদ্ধ করতে নিয়ে যাবার অব্যবহিত

পূর্বেই তিনি বলেছিলেন, “তুমি কি ভাব যে আমি এখন পিতার কাছে প্রার্থনা করলে তিনি দ্বাদশ বাহিনীর অধিক ‘স্বর্গদূত’ আমার কাছে পাঠিয়ে দিতে পারেন না? কিন্তু তা’হলে এই সব শাস্ত্রবাক্য কি ক’রে সফল হবে যে এরূপ হওয়া আবশ্যিক?” (নাইবেল—ম্যাথিউ ২৬:৫৩-৫৪)।

পৃ: ২৭৫—পৃ ৭।—পতঞ্জলির যোগসূত্রের বিভূতিপাদের ২৪ শ্লোকে উল্লেখ আছে যে অপরের মন এবং ঘটনাসকলের গতিনিয়ন্ত্রণ করবার শক্তি হচ্ছে একপ্রকার বিভূতি; সেখানে এর ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে “নলে সংযম করার পরাকাষ্ঠা” [যোগসূত্রের বিষয়ে দু’টি পাণ্ডিত্যপূর্ণ পুস্তক হচ্ছে “যোগ-সিষ্টেম্ অফ পতঞ্জলি,” (ভল্যুম ১৭, ওরিয়েণ্টাল সিরিজ; হার্ভার্ড ইউনি) আর দাশগুপ্তরূত “যোগ ফিলসফি” (ট্রান্স, লণ্ডন)]। সকল শাস্ত্রেই বলে যে ঈশ্বর তাঁ’র নিজের সর্বশক্তিমান প্রতিমূর্তিতে মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। বিশ্বের উপর প্রভাব অতিপ্রাকৃত বলেই বোধ হয় কিন্তু প্রকৃত সত্য হচ্ছে যাঁদের দৈবসত্তার বিষয়ে “সম্যক স্মৃতির” উদয় হয়, তাঁ’দের প্রত্যেকেরই কাছে এই শক্তি সহজ আর স্বাভাবিক ভাবেই থাকে। শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজীর মত ঈশ্বরোপলব্ধিসম্পন্ন ব্যক্তির অহঙ্কার এবং তজ্জনিত ব্যক্তিগত কামনাবাসনাশূন্য হ’ন; প্রকৃত সঙ্গুরুদের ক্রিয়াকলাপ “ঋতের” মতই অনায়াসলব্ধ। ইমার্শনের কথায় “মহৎব্যক্তির ‘গুণবান’ নয়— গুণই হয়ে যান; তা’হলেই সৃষ্টির উদ্দেশ্য সাংসাধিত হয়, আর ঈশ্বরও সন্তুষ্ট হ’ন।”

ঈশ্বরোপলব্ধ যে কোন ব্যক্তিই অলৌকিক ঘটনা প্রদর্শন করতে পারেন, কারণ বীজশৃঙ্খলের মতন, তিনি বিশ্বসৃষ্টির সূক্ষ্ম বিধিনিষেধের বিষয় অবগত আছেন; কিন্তু সকল সঙ্গুরুগণই যে এরূপ অলৌকিক শক্তি প্রয়োগ করতে চান তা’ নয়। (২৪শ পরিচ্ছেদের শেষ পাদটিকা দ্রষ্টব্য)।

প্রত্যেক সাধুই তাঁ’র ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য অনুসারে ঈশ্বর চিন্তা করেন; আর এ জগতে এই ব্যক্তিগত প্রকাশই হ’চ্ছে মূলীভূত কারণ, যেখানে দুইটি বালুকাকণা একেবারে সনান দেখতে পাওয়া যায় না।

ভগবদ্জ্ঞানসম্পন্ন সাধুদের জন্ম কোন স্তূনির্দিষ্ট বিধিনিয়ম রচনা করা যেতে পারে না; কেউ কেউ অলৌকিক শক্তি প্রদর্শন করেন, কেউবা করেন না। কেউ কেউ নিষ্ক্রিয় অবস্থায় থাকেন আর অপরে হয়ত রাজর্নি জনক অথবা আভিলার সেন্ট থেরেসার মত বৃহৎ কর্মে লিপ্ত থাকেন। কেউ কেউ উপদেশ দান করেন, ভ্রমণ করেন অথবা বহু শিষ্য গ্রহণ করেন; আবার কেউ কেউ বা নীরবে লোকচক্ষুর অন্তরালে থেকে ছায়ার মতন আত্মগোপন ক’রে থাকেন। পৃথিবীতে এমন কোন বিচারক আবিভূত হন নি যিনি প্রত্যেক সাধুর অতীত কর্মফলের রহস্য ভেদ ক’রে তা’দের জন্ম বিভিন্ন কর্মপন্থা নির্দিষ্ট করতে পারেন।

পৃ: ২৭৭—পং ২৯।—“এই আত্মাই ব্রহ্ম”—পরব্রহ্ম অচিন্ত্য, অব্যক্ত (নেতি, নেতি; এ নয়, এ নয়)—কিন্তু বেদান্তে এঁর বিষয় সৎ, চিৎ, আনন্দরূপেই উল্লিখিত হয়েছে।

পৃ: ২৭৯—পং ১১।—শঙ্করাচার্য্য বলেই অভিহিত। আচার্য্য মানে “ধর্মোপ-দেষ্টা”। শঙ্করের আবির্ভাবের তারিখ যথাবিহিতভাবে পণ্ডিতগণের তর্কের বিষয়ীভূত। কতকগুলি লিখিত বিবরণ হতে জানতে পারা যায় যে সেই জগৎপ্রসিদ্ধ অদ্বৈতবাদী ৫১০ হতে ৫৭৮ খৃ:পূ: অর্ধে বিদ্যমান ছিলেন; পাশ্চাত্য ঐতিহাসিকগণ তাঁ’র অবস্থানকাল অষ্টম শতাব্দীর শেষভাগ ব’লে নির্দিষ্ট করেন।

পৃ: ২৮১—পং ৫।—“চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ”—যোগসূত্র, সমাধিপাদ ২। পতঞ্জলির আবির্ভাবের তারিখ জানা যায় না, যদিও বহু পণ্ডিত তাঁ’র কাল খৃ: পূ: দ্বিতীয় শতক ব’লে নির্দেশ করেছেন। ঋষিগণ সকল বিষয়ে এক্রূপ গভীর অন্তর্দৃষ্টিবলে রচনা ক’রে গেছেন যে, কালের প্রভাব তা’তে কোন প্রাচীনত্ব আনতে পারে নি; তবুও পরবর্তীকালের ঐতিহাসিকেরা দেখে বিব্রত হয়েছেন যে ঋষিগণ তাঁ’দের রচনায় তাঁ’দের ব্যক্তিত্ব বা কাল অথবা তারিখ আরোপ করেন নি। তাঁ’রা জানুতেন যে তাঁ’দের জীবন সেই অনন্ত মহাজীবনের কেবল একটা সাময়িক স্ফুরণেরই মত আর সত্য হচ্ছে কালাতীত, তা’কে ব্যবসায়ীর চিহ্নে চিহ্নিত করা যায় না আর মেটা তাঁ’দের ব্যক্তিগত সম্পত্তিও নয়।

পৃ: ২৮২—পং ৪।—“অরিয়ট্টঙ্গিকো মগ্গো হচ্ছে:—

| | |
|-------------------|-------------------|
| ১। সম্মা দিঠ্ঠি | সম্যক্ দৃষ্টি |
| ২। সম্মা সংকপ্পো | সম্যক্ সঙ্কল্প |
| ৩। সম্মা বাচা | সম্যক্ বাক্ |
| ৪। সম্মা কম্মন্তো | সম্যক্ কর্ম |
| ৫। সম্মা আজীবো | সম্যক্ জীবনযাত্রা |
| ৬। সম্মা ব্যারামো | সম্যক্ প্রচেষ্টা |
| ৭। সম্মা সতি | সম্যক্ আত্মস্মৃতি |
| ৮। সম্মা সমাধি | সম্যক্ সমাধি |

এই অষ্টাঙ্গযোগ বৌদ্ধধর্মের উপরিউক্ত “অরিয়ট্টঙ্গিকো মগ্গো”র সহিত কেউ যেন না ভুল করেন।

পৃ: ২৮৩—পং ১৪।—ডা: জাং ১৯৩৭ সালে ইণ্ডিয়ান সায়েন্স কংগ্রেসে যোগদান করেন এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অনারারি ডিগ্রী লাভ করেন।

ডা: জাং এখানে হঠযোগের বিষয় উল্লেখ করেছেন। হঠযোগে শরীরের আসনাদি এবং স্বাস্থ্য ও দীর্ঘজীবন লাভের উপায়ের প্রণালী বর্ণিত

হয়েছে। হঠযোগ অবশ্য প্রয়োজনীয় এবং অদ্ভুত শারীরিক ফল প্রদর্শন করে, কিন্তু যোগের এই শাখা আধ্যাত্মিক মুক্তিকামী যোগীদের দ্বারা অতি অল্পই ব্যবহৃত হয়।

পৃ: ২৮৪—পং ১৫।—আণবিক বোমার বিষয়ে ‘মানবজাতির উদ্বোধনে একটা পরোক্ষ উপকার সংসাধিত হ’তে পারে’ যে তা’তে ক’রে তা’দের যা’কে বলতে পারা যায় “বোমারোহী আশ্রয়”—যোগবিজ্ঞানের সম্বন্ধে ক্রিয়াশীল আগ্রহ উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হতে পারে। যোগ সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ লোকেরা প্রায়ই যোগকে চমকপ্রদ শক্তিলাভের জন্য এক গুপ্ত ক্রিয়াকাণ্ডের প্রণালী বা ম্যাজিক ব’লে উল্লেখ করেন। যা’ই হোক প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিতেরা যখন যোগসম্বন্ধে উল্লেখ করেন তখন তাঁ’রা পতঞ্জলির যোগসূত্রে বর্ণিত প্রণালীর বিষয়ই বোঝেন। পুস্তকটিতে এমন অপূর্ব সুন্দর দার্শনিক তত্ত্বসকল বিষয়ীভূত হয়ে আছে যে পরমজ্ঞানী সদগুরু সদাশিবব্রহ্মপ্রমুখ ভারতের শ্রেষ্ঠ চিন্তামনীবিগণ তা’র টিকা বা ব্যাখ্যা রচনাতে উদ্বুদ্ধ হয়েছেন।

অপর পাঁচটি প্রাচীন বৈদিক দর্শনশাস্ত্রের মত যোগসূত্রে নৈতিক পবিত্রতার (যমনিয়মাদি অষ্টাঙ্গ) “ম্যাজিকে”র বিষয় আলোচিত হয়েছে, যা’ প্রাথমিক দার্শনিক তত্ত্বানুসন্ধানের পক্ষে একেবারে অপরিহার্য। এই ব্যক্তিগত প্রয়োজনীয়তা—পশ্চিমে যা’র অভাব দেখা যায়, ভারতীয় ষড়দর্শনের মধ্যে চিরস্থায়ী প্রাণশক্তি সঞ্চারিত করেছে। ‘ঋত’, যাতে এই বিশ্বজগৎ ধৃত, তা’ মানুষের অদৃষ্টনিয়ামক নীতিশাসন হতে পৃথক নয়। বিশ্বের মূল নীতিসূত্রগুলি যে পালনে অনিচ্ছুক, সে সত্যানুসন্ধান কখনও দৃঢ়সঙ্কল্প নয়।

যোগসূত্রের বিভূতিপাদে বিভূতি ও সিদ্ধি বিষয়ে যোগের নানা অলৌকিক শক্তির বিষয় উল্লিখিত হয়েছে। সত্যজ্ঞানই সর্বদা প্রবৃত্ত শক্তি। যোগপন্থা চারিটি অংশে বিভক্ত আর তা’র প্রত্যেক অংশের বিভূতির প্রকাশের বিষয় উল্লিখিত আছে। কতকটা শক্তি অধিগত হ’লে যোগী বুঝতে পারেন যে তিনি চারটি অবস্থার একটির পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছেন। বিশিষ্ট শক্তি সকলের সহসা আবির্ভাব যোগপ্রণালীর বৈজ্ঞানিক গঠনের সাক্ষ্য প্রদান করে, যেখানে সাধকের “আধ্যাত্মিক উন্নতির” বিষয়ে ভ্রান্ত কল্পনা দূরীভূত হয়,—প্রমাণ ত’ চাই।

যোগের পথে অগ্রসর হতে গিয়ে হঠাৎ বিভূতিদর্শন ইত্যাদি একটা সাময়িক ফললাভ মাত্র। পতঞ্জলি সাধকদের সাবধান ক’রে দিয়ে গেছেন যে পরমাত্মার সহিত পরিপূর্ণ সংযোগসাধনই চরম লক্ষ্য হওয়া উচিত। সেই অনন্ত দাতারই অনুসন্ধান করা উচিত—তা’র অপূর্ব দানের বিষয় নয়। তত্ত্বজিজ্ঞাসু ব্যক্তি, যে কতকগুলি তুচ্ছ প্রাপ্তিতেই সন্তুষ্ট

থাকে ঈশ্বর কখনও তা'র নিকট আত্মপ্রকাশ করেন না। কার্ণেই অধ্যবসায়শীল যোগী তাঁ'র বিভূতি বা সিদ্ধি প্রভৃতির শক্তিপ্রদর্শনে সর্বদাই বিরত থাকেন। পাছে সে সব মনে একটা মিথ্যা গর্ভ এনে পরিণামে কৈবল্যপ্রাপ্তির চরম অবস্থালাভের পথ থেকে তা'কে বিচ্যুত করে।

যোগী চরম লক্ষ্যে পৌছবার পর ইচ্ছামত বিভূতিপ্রদর্শনে অথবা তা' হ'তে বিরত থাকেন। তাঁ'র সকলপ্রকার ক্রিয়াকলাপ অলৌকিক হো'ক বা অগ্নিবিশ হো'ক, কর্মফলপ্রসূ না হয়েই তখন সম্পন্ন হয়। যেখানে অহঙ্কারের চূষক তখনও বর্তমান থাকে সেখানেই কেবল কর্মের লৌহচূর্ণ সকল আকৃষ্ট হয়।

পৃ: ২৮৯—পং ১২।—হিন্দুশাস্ত্রে বর্ণিত আছে যে যিনি সর্বদা সত্যকথা বলেন, তিনি বাক্-সিদ্ধি লাভের শক্তি সঞ্চয় করেন। মনেপ্রাণে তাঁ'রা যে অভুজ্জাই উচ্চারণ করেন, সত্যসত্যই তা' ফলে যেতে বাধ্য।

পৃ: ২৯১—পং ১২।—মুক্তা এবং অগ্নাশ্বর রত্নসকল এবং ধাতু ও মূল প্রভৃতি মানুষের শরীরের সাক্ষাৎ সংস্পর্শে এলে তা'র দেহকোষের উপর এক তাড়িত-চৌষক প্রভাব বিস্তার করে। মনুষ্যশরীরে অঙ্গার এবং নানাবিধ ধাতুর যে সব মৌলিক উপাদান আছে তা' সমস্তই রক্ষমূল, ধাতু বা রত্নের মধ্যেও বর্তমান আছে। ঋষিদের এই সব ক্ষেত্রে আবিষ্কার নিঃসন্দেহ একদিন শারীরতত্ত্ববিদগণের কাছে স্বীকৃতি লাভ করবে।

বৈদ্যাতিক প্রাণপ্রবাহবিশিষ্ট মানুষের স্পর্শপ্রবণ দেহ বহু রহস্যের কেন্দ্রস্থল, যা'র আজ পর্য্যন্ত কোন সমাধান হয় নি।

যদিও ধাতু ও রত্নবিশিষ্ট তাগা শরীরের পক্ষে রোগশাস্তিজনক, তবুও তা'দের ব্যবহারের জ্ঞান শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজীর নির্দেশদানের অল্প একটা কারণ ছিল। প্রকৃত সদগুরুরা নিজেরা কখনও ধনস্বরূপে আবিভূত হতে ইচ্ছা করেন না; ঈশ্বরই হচ্ছেন একমাত্র সর্বরোগহর; সেই জ্ঞান প্রকৃত সাধুসন্তরা ঈশ্বরের নিকট হতে যে সব শক্তি লাভ করেছেন, সে সব নানা ছদ্মবেশের আবরণে লুক্কায়িত রাখেন। মানুষ সাধারণতঃ প্রত্যক্ষদর্শনেই বেশী বিশ্বাস করে। রোগমুক্তিকামনায় লোকেরা যখন আমার গুরুদেবের কাছে আসত, তখন তিনি তা'দের কোন তাগা বা রত্ন ধারণ ক'রবার উপদেশ দিতেন,—প্রথমতঃ তাঁ'দের বিশ্বাস উদ্ভিক্ত করবার জ্ঞান আর দ্বিতীয়তঃ তাঁ'র প্রতি মনোযোগ অপসারিত করবার জ্ঞান। এই সকল তাগা বা রত্ন তা'দের অন্তর্নিহিত বৈদ্যাত-চৌষক রোগনিরাময়কারক শক্তি ব্যতীত গুরুদেবের গুপ্ত আশীর্বাদপূত ছিল।

পৃ: ২৯৩—পং ২৭।—মহুর মানবধর্মশাস্ত্র ভারতবর্ষে অজাবধি প্রচলিত।

ফরাসী পণ্ডিত লুই জ্যাকোবিও বলেন যে মনুষ্য আবির্ভাবের তারিখ “ভীরতবর্ষের প্রাগৈতিহাসিক যুগের নিশার অন্ধকারে হারিয়ে গেছে; এবং এমন কোন পণ্ডিত নাই যিনি মনুষ্যকে পৃথিবীর সর্বাঙ্গপেক্ষা প্রাচীনতম ব্যবস্থাকর্তার পদ দিতে অস্বীকার করতে সাহস করেন।” “লা বাইব্ল দ্য লিওঁ”র ৩৩-৩৭ পৃষ্ঠায় জ্যাকোবিও পুস্তকের মধ্যে সব সমান অর্থসূচক পংক্তি উদ্ধৃত ক’রে প্রমাণ করেছেন যে রোমীয় কোড্ অফ্ জাস্টিনিয়ান্ মনুষ্যসংহিতার খুব নিকট অনুসরণ করেই লিখিত হয়েছে।

পৃ: ২৯৪—পং ১৮।—বাইবেল, কোরিথিয়ান্ ১৫:৩১। “আমাদের আনন্দই” হচ্ছে সঠিক অনুবাদ; সাধারণতঃ যা’ দেওয়া হয়, “তোমাদের আনন্দ”—কথাগুলি ভুল। সেন্টপল্ এখানে খৃষ্টচৈতন্যের সর্বব্যাপিত্বের বিষয় উল্লেখ করেছেন।

পৃ: ২৯৭—পং ১৩।—লিনকন্ লাইব্রেরী অফ্ এসেসিয়ান্ ইন্ফরমেশন্স এর ১০৩০ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে যে মহাকর্ষ ২০০ হতে ৩০০ বৎসর পর্যন্ত বাঁচে।

পৃ: ৩০১—পং ৩০।—আধুনিক বিজ্ঞান শরীর ও মনের উপর স্বাস্থীনতার রোগনিরাময়কারী এবং নবশক্তিস্রোতের ফলের বিষয় আবিষ্কার করতে সক্ষম করেছে। নিউইয়র্কের কলেজ অফ্ ফিজিসিয়ান্স এবং সার্জন্স এর ডাঃ আন্ড্রান এল ব্যারাক্ এক প্রকার স্থানীয় ফুসফুস বিরাম চিকিৎসা প্রণালীর উদ্ভাবন করেছেন যা’তে ক’রে বহু ক্ষয়রোগাক্রান্ত রোগীগণ ব্যবহারে পুনরায় স্বাস্থ্যলাভ করতে পারে। সমান চাপ উৎপাদক কক্ষের রোগী স্বাস্থ্যরোধ করতে সমর্থ হয়। ১৯৪৭ সালের ১লা ফেব্রুয়ারী তারিখে নিউইয়র্ক টাইম্স্ ডাঃ ব্যারাকের বক্তব্য নিম্নলিখিতভাবে উদ্ধৃত করেছে—“মধ্য স্নায়ুচক্রে স্বাস্থ্যপ্রস্রাব স্থগিতের ফল বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। প্রত্যঙ্গাদিতে ইচ্ছাবাহী পেশীসমূহ পরিচালনার বেগ অদ্ভুতভাবে হ্রাস প্রাপ্ত হয়। রোগী কক্ষে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধ’রে হস্তপদাদি সঞ্চালন অথবা অবস্থার পরিবর্তন না ক’রেই থাকতে পারে। স্বতঃচালিত স্বাস্থ্যপ্রস্রাব যখন থেমে আসে তখন ধূমপানের পিপাসা একেবারে অন্তর্হিত হয়, এমন কি সেই সব রোগীদের মধ্যেও, যা’রা দৈনিক দুই প্যাকেট ক’রে সিগারেট খেতে অভ্যস্ত। বহুক্ষেত্রে এক্রপ ব্যাপার হয় যে রোগীর আর কোন আয়োজনপ্রয়োজনের প্রয়োজন থাকে না। ১৯৫১ ডাঃ ব্যারাক্ এই চিকিৎসা প্রণালীর উপকারিতা প্রকাশ্যে সমর্থন ক’রে বলেছিলেন যে, “এ কেবল ফুসফুসকেই নয়, সম্পূর্ণ শরীরটাকেও বিশ্রাম দেয়, এবং আপাতবোধে মনকেও। উদাহরণ স্বরূপ, বলা যেতে পারে যে হৃৎপিণ্ডের কায় এক তৃতীয়াংশ কমে

যায়। রোগীদের আর আক্ষেপের কারণ থাকে না, কেউই ক্লক হয় না।

এই সকল তথ্য হ'তেই জানা যায় যে চঞ্চলতা আসবার পক্ষে কোনপ্রকার মানসিক অথবা শারীরিক উত্তেজনা রহিত হ'য়ে দীর্ঘকাল ধ'রে কিরূপে যোগীদের পক্ষে নিশ্চল অবস্থায় বসে থাকা সম্ভব। কেবলমাত্র এইরূপ নিশ্চলতা অবলম্বনেই জীবাত্মা ঈশ্বরসান্নিধ্যলাভের পথের সন্ধান পায়। যদিও শ্বাসরহিত অবস্থার কতকগুলি সুফল লাভের জন্ত সাধারণ লোকদের পক্ষে সমান চাপ উৎপাদক কক্ষের মধ্যে থাকা একান্ত প্রয়োজন, কিন্তু যোগীদের পক্ষে শরীর ও মনের স্থৈর্য্য এবং আত্মজ্ঞানলাভের জন্ত এক ক্রিয়াযোগ ছাড়া আর কিছুই প্রয়োজন হয় না।

পৃ: ৩১১—পৃ ২০।—কেশবানন্দজীর সহিত আমার সাক্ষাৎ ৪২শ পরিচ্ছেদে বর্ণিত হয়েছে।

পৃ: ৩২০—পৃ ২৫।—সুবিখ্যাত ইংরেজলেখক এণ্ড্রু জু সাহেব মহাত্মা গান্ধীর অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন। ভারতে তাঁ'র বহু জনহিতকর কার্যের জন্ত তিনি সকলের সম্মানের পাত্র।

পৃ: ৩২২—পৃ ১৯।—“আত্মা প্রায়ই জন্মগ্রহণ করে, অথবা হিন্দুরা যেমন বলেন, ‘সহস্র সহস্র জনমের মধ্য দিয়ে জীবনের পথ ধ'রে চলে’,—তা'ই তাঁ'র কাছে এমন কোন বিষয়ই থাকে না যে যা'র সম্বন্ধে সে জ্ঞানসঞ্চয় না করেছে; আর এও আশ্চর্যের কথা নয় যে ... আগে বা' জানত সে বিষয়ে স্মরণ ক'রতে সমর্থ ... কারণ পরিপ্রশ্ন আর শিক্ষার সবটাই হ'চ্ছে স্মৃতি।”

পৃ: ৩২৪—পৃ ১০।—যদিও রবীন্দ্রনাথ ১৯৪১ সালে পরলোক গমন করেছেন, তবুও তাঁ'র বিশ্বভারতী উত্তরোত্তর উন্নতির পথে অগ্রসর হয়ে চলেছে। ১৯৫০ সালের জাছুয়ারী মাসে শান্তি নিকেতন হ'তে বিশ্বভারতীর বিদ্যালয় বিভাগের রেজ্টার শ্রীযুক্ত এস্ এন্ ঘোষালের নেতৃত্বে পঁয়ষট্টিজন শিক্ষক এবং ছাত্র রাঁচি যোগদান ব্রহ্মচর্যাশ্রমে এসে দশদিন অবস্থান করেন। শান্তি নিকেতনের ছাত্রবৃন্দ রবীন্দ্রনাথের “পূজারিণী” নাটিকা অভিনয় ক'রে রাঁচি বিদ্যালয়ের ছাত্রগণকে প্রচুর আনন্দ দান করেন। বর্তমানে ভারত গভর্নমেন্ট কর্তৃক বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়রূপে স্বীকৃত।

পৃ: ৩২৪র শেষাংশ—“চিত্ত যেথা ভয়শূন্য, উচ্চ যেথা শির,

জ্ঞান যেথা মুক্ত, যেথা গৃহের প্রাচীর

আপন প্রাক্গণতলে দিবস শরীরী,

বসুধারে রাখে নাই খণ্ড ক্ষুদ্র করি’;

যেথা বাক্য হৃদয়ের উৎস মুখ হ'তে,

উচ্ছৃসিয়া উঠে যেথা নিবারণিত স্রোতে।

দেশে দেশে দিশে দিশে কর্মধারা ধাক্ক,
 অজস্র সহস্রবিধ চরিতার্থতায়,
 যেথা তুচ্ছ আচাৰের মরু বালুরাশি
 বিচারের স্রোত পথ ফেলে নাই গ্রাসি'
 পৌরুষেবের করেনি শতধা নিত্য যেথা,
 তুমি সর্ব কর্মচিন্তা—আনন্দের নেতা
 নিজ হস্তে নির্দয় আঘাত করি পিতঃ,
 ভারতেরে সেই স্বর্গে কর জাগরিত।"

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

পৃ: ৩৩৯এর শেষাংশ।—সাধারণতঃ অতিপ্রাকৃত ঘটনাসকল বিধিনিয়মের
 বহির্ভূত কোন ব্যাপার বা কার্যের ফল স্বরূপ বিবেচিত হয়। কিন্তু
 আমাদের এই সুবিগ্নস্ত বিশ্বপ্রকৃতিতে সকল ঘটনাই বিধিনিয়মের
 অধীন হয়ে ঘটে আর বিধিসম্মত ভাবে তা'র ব্যাখ্যাও করা যায়। বড়
 বড় সুদৃষ্ট ঘটনাক্রমের তথাকথিত অলৌকিক শক্তি সব অন্তর্জ্ঞানের
 মহাবীর্ষে যে সব সুক্ষ্ম শক্তি ক্রিয়াশীল আছে, তা'দের সঠিক উপলব্ধির
 স্বাভাবিক পরিণতি।

জগতে যা' কিছু ঘটে তা' সবই আশ্চর্য্য ব্যাপার। এই গভীর অর্থ
 ছাড়া আর কোন কিছুকেই সত্যসত্যি অপ্রাকৃত বা অতিপ্রাকৃত ঘটনা
 বলা চলে না। আমাদের প্রত্যেকেই যে এক একটা জটিল শরীরে আবদ্ধ
 আর এমন একটা জগতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যেটা গ্রহনক্ষত্রদের মধ্য দিয়ে
 উন্নতবেগে ছুটে চলেছে,—এর চেয়ে বেশী কি সাধারণ ঘটনা অথবা
 অধিকতর আশ্চর্য্য ব্যাপার আছে ?

যীশুখৃষ্ট বা লাহিড়ী মহাশয়ের মত মহান ধর্মোপদেষ্টাগণ সাধারণতঃ
 অলৌকিক ক্রিয়া প্রদর্শন করতে পারেন। একপ ধর্মগুরুগণই মানব-
 জাতির কল্যাণসাধনের জন্ত কঠিন ও বিরাট আধ্যাত্মিক উদ্দেশ্য নিয়ে
 আবির্ভূত হন, আর শোকহঃখপীড়িত নরনারীদের সাহায্য করা তাঁদের
 কর্মজীবনের একটা অংশ ব'লেই বোধ হয়। (পৃ: ২৭৫—৭৬ ও ৬এর
 পাদটিকা দ্রষ্টব্য) হুরারোগ্য রোগনিরাময়ে আর মানবজীবনের জটিল
 সমস্যা সমাধানের জন্ত দৈবনির্দেশের প্রয়োজন হয়। কেপার নামে
 জনৈক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি কর্তৃক তাঁ'র মুমূর্ষু পুত্রটিকে আরোগ্য করবার জন্তে
 অমুরুদ্ধ হ'লে যীশুখৃষ্ট কিঞ্চিৎ বক্রোক্তির সঙ্গে উত্তর দিলেন, “অলৌকিক
 ঘটনা বা তা'র আভাস সব না দেখলে ত' আর তুমি কিছুই বিশ্বাস করবে
 না।” অবশেষে যীশু, বললেন, “যাও, তোমার ছেলে বেঁচে গেল।”
 (মাইকেল—জন ৪:৪৬-৫৪)। এই পরিচ্ছদে আমি জড়জগতে যে মায়ী
 অথবা ভ্রান্তির অতিপ্রাকৃত শক্তি অন্তর্নিহিত রয়েছে, তা'র বৈদিক ব্যাখ্যা

দিয়েছি। আণবিক “জড়” পদার্থের মধ্যে যে অনিত্যতার একটা আশ্চর্য্য বাপার বা অপ্রাকৃত ভাব লুক্কায়িত আছে তা’ পাশ্চাত্য বিজ্ঞান ইতিমধ্যেই আবিষ্কার করে ফেলেছে। যাই হোক, কেবলমাত্র যে প্রকৃতি তা’ নয়, মানুষও তা’র নশ্বরভাবে মারা, অর্থাৎ আপেক্ষিক ভাব, বৈপরীত্য, দ্বৈতভাব, ব্যতিক্রম, বাধ অথবা বিরোধ বা বাধাত দোষের অধীন।

এ মনে করলে ভুল হ’বে যে মায়ার তথ্যবিষয়ে যে কেবল ঋষিরাই অবগত ছিলেন তা’ নয়। ওল্ড টেষ্টামেন্টের ধর্মোপদেষ্টাগণ মায়াকে স্রাটান বা সয়তান (হিব্রু অর্থ শত্রু) ব’লে অভিহিত করেছেন। গ্রীক টেষ্টামেন্টে সয়তানের প্রতিশব্দ ডায়াবোলাস বা ডেভিল ব’লে উল্লিখিত হয়েছে। সয়তান বা মায়ার হচ্ছে বিশ্বরাজ্যের ষাট্কার, যে এক অখণ্ড অরূপ মহাসত্যকে ঢাকবার জন্তে নানা রূপের আবরণ সৃষ্টি করে, আর এই সয়তানের একমাত্র উদ্দেশ্য হ’চ্ছে মানুষকে আল্লা থেকে জড়ের ভ্রান্তপথে পরিচালিত করা।

যীশুখৃষ্ট মায়াকে সয়তান, নরঘাতক ও মিথ্যাবাদী ব’লে চিত্রিত করেছেন। “ডেভিল (সয়তান) ... আদি কাল হ’তেই নরঘাতক, সত্যো কখনও প্রতিষ্ঠিত থাকে নি, কারণ তা’র মধ্যে কোন সত্য নাই। যখন সে কোন মিথ্যা কথা বলে, তখন সে নিজের কথাই বলে, কারণ সে মিথ্যাবাদী, আর সে তা’র জনক।” (বাইবেল—জন ৮:৪৪)।

“ডেভিল (সয়তান) আদিকাল হতেই পাপ করছে। এই কারণেই ঈশ্বরের পুত্র আবিভূত হ’লেন, যাতে ক’রে তিনি ডেভিলের সমস্ত ক্রিয়াকলাপ লোপ করতে পারেন।” (বাইবেল—১ জন ৩:৮)। অর্থাৎ মানবের নিজ অন্তরে খৃষ্টচৈতন্যের প্রকাশ অবলীলাক্রমে মায়ার “ক্রিয়া” অথবা ভ্রান্তি সকল লোপ করতে পারে। যীশুখৃষ্ট এবং জন বলেছেন যে মায়ার অনাদি, কারণ জড়বিশ্বের সৃষ্টিকার্য্যে এ ওতঃ-প্রোতঃ ভাবে বিজড়িত আর সেই দৈব অনিত্যতার সতত বিরোধে এ চিরপ্রবাহিত।

পৃ: ৩৭৭—পং ২০।—“সত্য সত্যই আমি তোমাদিগকে বলছি যে, কেউ যদি আমার বাক্য পালন করে (খৃষ্টচৈতন্যে অখণ্ডভাবে অবস্থান করে), তা’ হ’লে তা’র কখনও মৃত্যুর সাক্ষাৎকার লাভ হবে না (বাইবেল—জন ৮:৫১)।

এই কথাগুলিতে যীশুখৃষ্ট জড়দেহে অমরজীবন লাভের কথা বলছেন না—যে একঘেষে জীবনের কারাবাসের শাস্তি পাপীদেরও দেওয়া যায় না, সাধুদের ত’ দূরের কথা। যীশুখৃষ্ট ঋ’র কথা বলছেন তিনি হ’চ্ছেন

আলোপলক সেই লোক যিনি অজ্ঞানের মহানিদ্রা হ'তে অনন্ত জীবনে জাগরিত হয়েছেন। (৪৩শ পরিচ্ছদ দ্রষ্টব্য)।

মানুষের আসল প্রকৃতি হচ্ছে সর্বব্যাপী অরূপ আত্মা। অনন্তজ্ঞানী বা কর্মবন্ধনে আবদ্ধ হয়ে জড়দেহ ধারণ করে হচ্ছে অবিজ্ঞা বা অজ্ঞানতার ফল। হিন্দুশাস্ত্র শিক্ষা দেয় যে মৃত্যু, জন্মের মতন মায়ায়ই লীলা বা প্রকাশ। এই দুই অবস্থাই হচ্ছে আপেক্ষিক জগতের ব্যাপার আর ঈশ্বরের স্বীয় মনেরই মতন জীবন্ত মহাশূন্যের জ্ঞানে এর আবির্ভাব ঘটে না।

বাবাজী কোন জড়শরীর বা এ জগতের কোন বিশেষ রূপে আবদ্ধ ন'ন। তিনি ঈশ্বরের অভিপ্রায়ে এ পৃথিবীতে কোন বিশেষ উদ্দেশ্য-সাধনে রত আছেন।

পৃঃ ৩৭৭—পং ২০।—প্রণবানন্দজীর মত সঙ্গুরুগণ (পৃঃ ৩১১—পং ২১ দ্রষ্টব্য) ঈশ্বর নবকলেবর ধারণ ক'রে এই পৃথিবীতে ফিরে আসেন, তা'র কারণ তাঁ'র নিজেরাই জানেন, অপর কেউ নয়। এ জগতে তাঁ'দের আবির্ভাব কর্মফলপ্রসূত নয়। একপ স্বেচ্ছায় প্রত্যাবর্তনকে ব্যাখ্যান অর্থাৎ মায়াপাশ ছেদ ক'রে পাথিব জীবনে প্রবেশ বোঝায়।

সাধারণ কি অসাধারণ যেকোন ভাবেই তাঁ'র দেহ ত্যাগ হো'ক না কেন, পূর্ণজ্ঞানী সঙ্গুরু নূতনদেহ ধারণ ক'রে জগৎবাসীদের চক্ষুর সন্মুখে পুনরায় আবিভূত হ'তে পারেন। মহান্ সৃষ্টিকর্তা, ঈশ্বর সৌরমণ্ডলীয় সংগণ গণনা করা যায় না, সেই পরমেশ্বরের সঙ্গে সংযুক্ত ব্যক্তির পক্ষে জড়-শরীর ধারণে অনুপরমাণুদের আকার দানে তাঁ'র শক্তির কোন অপহব ঘটে না।

বীণুশৃষ্ঠ ঘোষণা করেছেন, “আমি আপন প্রাণ সমর্পণ করি, ঈশ্বরে ক'রে, পুনরায় আমি তা' গ্রহণ করতে পারি। আমার তা' সমর্পণ করবার ক্ষমতা আছে এবং তা' পুনরায় গ্রহণ করবারও আমার ক্ষমতা আছে।” (বাইবেল—জন ১০:১৭-১৮)।

পৃঃ ৩৯৭—পং ৭।—বাইবেল, লুক ১:১৩-১৭।

ত্রি—পং ১৭।—বাইবেল, ম্যাথিউ ১৭:১২-১৩।

ত্রি—পং ১৪।—বাইবেল, ম্যাথিউ ১১:১৩-১৪।

ত্রি—পং ১৫।—বাইবেল, জন ১:২১।

ত্রি—পং ২৩।—বাইবেল, কিংস্ ২:৯-১৪।

ত্রি—পং ২৮।—বাইবেল, ম্যাথিউ ১৭:৩।

পৃঃ ৩৯৮—পং ৪।—বাইবেল, ম্যাথিউ ২৭:৪৬-৪৯।

পৃঃ ৪২৬—পং ৭।—বাইবেল, কেরিষ্টিয়ান্স ১৫:৫৪-৫৫।

পৃ: ৪৪৫—পং ১৯।—লিখ্যাত ইংরেজ জীবনতত্ত্ববিদ এবং ইউনোস্কোর পুরি-
চালক ডাঃ জুলিয়ান হাক্সলি সম্প্রতি বলেছেন যে তত্ত্বাবস্থায় প্রবেশ
অথবা স্বাসংযমনের বিষয়ে পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকগণের “প্রাচ্য প্রণালী-
সকল শিক্ষা করা উচিত।”

তিনি বলেছিলেন, “কি হয়?” “কেমন করে এ সম্ভব?” ১৯৪৮ সালের
২১শে আগষ্ট তারিখে লণ্ডন থেকে প্রেরিত এসোসিয়েটেড প্রেসের এক
ডেম্প্যাচে লিখিত আছে, “ডাঃ হাক্সলি নতুন ওয়ার্ল্ড ফেডারেশন ফর
মেট্যাল হেল্থকে বলেছিলেন যে প্রাচ্যের সাধনতত্ত্বের বিষয়
অল্পসন্ধান মঙ্গলজনক। তিনি মনস্তত্ত্ববিদগণকে এই উপদেশ দিয়েছিলেন
যে বৈজ্ঞানিক প্রণয় এইসব তত্ত্বের বিষয় অল্পসন্ধান করতে পারলে,
‘আমার মনে হয় আপনাদের ক্ষেত্রে বিরাট অগ্রগতির পথে পদবিক্ষেপ
সাধিত হ’বে।”

পৃ: ৪৬৯—পং ১৪।—কতকগুলি মনঃসংযোগের প্রক্রিয়ার ভারতবর্ষে যুগে
যুগে অসাধারণ ও বিরাট স্মৃতিশক্তির অধিকারী লোক তৈরী হয়েছে।
হিন্দুস্থান টাইমসে সারু টি. বিজয় রাঘবাচারী মাদ্রাজের আধুনিক
পেশাদারী “প্রথর স্মৃতিশক্তিসম্পন্ন” লোকেদের পরীক্ষার বিষয় বর্ণনা
করেছেন। তিনি লিখেছেন, “এসব লোক সংস্কৃতেও অসাধারণরূপে
শিক্ষিত। এক বিরাট জনতার মধ্যে উপবিষ্ট হ’য়ে তাঁদের প্রস্তুত
থাকতে হয়, সেখানকার কতকগুলি লোক একযোগে তাঁদের প্রতি
নানা পরীক্ষা শুরু করলে তাঁদের স্মৃতিশক্তি হ’তে। পরীক্ষাটা সাধারণতঃ
এই রকমভাবে হয়—একজন লোক ঘণ্টাধ্বনি শুরু করলে পরীক্ষার্থীকে
ঘণ্টাধ্বনির সংখ্যাগুলিকে স্মরণ রাখতে হয়। দ্বিতীয় জন হয়ত যোগ
বিশ্রাম গুণ ভাগ সমেত পাটিগণিতের এক বিরাট অঙ্ক কোন বই
থেকে উদ্ধৃত ক’রে শোনাতে; তৃতীয় ব্যক্তি হয়ত ‘রামায়ণ অথবা
মহাভারত থেকে এক সুদীর্ঘ শ্লোক উচ্চারণ ক’রতে শুরু ক’রলে,
সেটিকে পুনরায় আবৃত্তি ক’রতে হবে; চতুর্থ ব্যক্তি হয়ত এমন একটা
নির্দিষ্ট বিষয়ে শ্লোক রচনার ভার দিলেন, যা’তে সেই শ্লোক রচনাতে
উপযুক্ত ছন্দ যতি প্রভৃতির প্রয়োজন, এবং প্রত্যেক পংক্তিটি একটি
বিশেষ শব্দে শেষ হওয়া চাই। পঞ্চম ব্যক্তিটি ষষ্ঠ ব্যক্তির সঙ্গে
ঈশ্বরতত্ত্ব সম্বন্ধে তর্কে রত হলেন আর এই দুই তর্কিকের মধ্যে যে সব
ভাষা তর্ককালে ব্যবহৃত হয়েছিল তা’ আত্মোপাস্ত তাঁদের সঠিক
ক্রমানুসারে উদ্ধৃত ক’রে শোনাতে হ’বে; আর সপ্তম ব্যক্তিটি সর্বক্ষণ
একটি চাকা ঘুরিয়েই চলেছেন তা’র ঘূর্ণন সংখ্যাগুলি গণনা ক’রে রাখতে
হ’বে। পরীক্ষার্থী ব্যক্তিটিকে এ সব ব্যাপারগুলির কাষ সব এক সঙ্গেই
ক’রে রাখতে হবে আর তা’ সম্পূর্ণ মানসিকপ্রক্রিয়ার সাহায্যেই—কারণ

তা'কে কোন কাগজ বা পেমিল দেওয়া হবে না। অবশ্য না বললেও চলে যে এতে তা'র মনোবৃত্তির উপর অতি প্রচণ্ড চাপ পড়ে। এক অজ্ঞাত হিংসাভাবের বশবর্তী হয়ে সাধারণতঃ লোকেরা এরূপ প্রচেষ্টার লাঘবতা আনয়নের চেষ্টায় উদ্বৃত হয় এই ভেবে যে ওগুলি হচ্ছে মস্তিস্কের নিয়ন্ত্রিত ক্রিয়ার পরিচালনা। যাই হোক এসব কেবলমাত্র স্মৃতিশক্তির ব্যাপার নয়। এর মধ্যে সর্বপ্রধান ব্যাপার হচ্ছে বিরাট ও গভীর মনঃসংযোগ।”

